KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৫/১ স্ট্রী লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : বি. এন. সরকার
Title : চমৎকার	Size : 6·75"x9" 17·14x 22·86 c.m.
Vol. & Number : ১৩/2-১২	Year of Publication : ডিসেম্বর - টিসম্বর, ১৯৬০
	Condition : Brittle / Good
Editor :	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

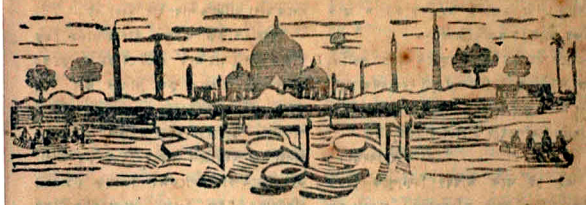

১৩শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ { ২য় সংখ্যা

প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বেদে কৃষ্ণ শব্দের উল্লেখ কয়েকবার আছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণ শব্দে বেদে কোন্ পদার্থকে কোথায় লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বিচার করিতে হইবে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৯ সূক্তের ৪র্থ ঋকে এক কৃষ্ণের কথা আছে—কিন্তু সেখানে শিকারী পক্ষী অর্থে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

সুপর্ণা বাচমক্রতোপ ব্যাখ্যরে কৃষ্ণা ইষিরা অনদিনুঃ।
অস্তভ্নি বৎসুপরস্য নিক্তবঃ পুরূরেতোদধিরে সূর্য্যশ্রিতঃ॥

অথর্ববেদের (১১।২।২) এবং শাঙ্খায়ন আরণ্যকের (১৪।২৭) দুই স্থানে এই অর্থেই কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এইরূপ তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫—২।৩।৫), (৭।১।৩।১) ও শতপথব্রাহ্মণে (১১।৪।১; ৩—২।১।৬।৮) মৃগ অর্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন কোন মহাত্মা ঐ অর্থের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এই সমস্ত স্থানের কৃষ্ণকে ঋষি করিয়া তুলিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। ইনি ৩য় ও ৪র্থ ঋকে আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

'অহং বাম ব্রবীমি অশ্বিনা হবতে বাজিনীবসূ।
মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।
শৃণুতাং জরিতুর্হবং কৃষ্ণস্য স্তবতো নরা।
মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।

অনুক্রমণী-কার বলেন, এই কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরার বংশ। ৮ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের রচয়িতা কৃষ্ণের পুত্র 'কাক্ষি' বা বিশ্বক। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে কৃষ্ণ শব্দ হইতে বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে 'কৃষ্ণিয়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে কৃষ্ণিয় আছে। ঋক্ দুইটী এই—

'অবস্যাতে স্তবতে কৃষ্ণিয়ায় ঋজূয়তে নাসত্যা শচীভিঃ।
পস্তং ন নষ্টমিব দর্শনায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায়॥'

'যুবং নরা স্তবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায়।
ঘোষাবিৎ চিৎপিতৃষদে দুরোণে পতি র্জূর্ণস্যা
অশ্বিনাবন্ধুরং॥ ৭

এই দুই ঋকে অশ্বিদ্বয় বিষ্ণাপুকে বিশ্বক কৃষ্ণিয়ের নিকট অর্পণ করিতেছেন। সুতরাং কৃষ্ণ বিষ্ণাপুর পিতামহ হইতেছেন। এই কৃষ্ণ এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণোক্ত কৃষ্ণ অভিন্ন। কৌষিতকী ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ আঙ্গিরস—তবে ইনি আঙ্গিরস ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ঋত্বিক্ সম্পর্কে ইনি সাক্ষা হোম দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছেন—

"তদ্ধ এতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী-পুত্রায় উক্ত্বা উবাচ আপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।"

অতঃপর অঙ্গিরসবংশীয় ঘোর দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আর তিনিও পিপাসা-শূন্য হইলেন। তুমি মরণকালে এই তিনটী মন্ত্রের আশ্রয় লইবে—এই তিনটী হইতেছে তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।" ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—স এবং যথোক্তজ্ঞানবিদ্ অন্তবেলায়াং মরণকালে এতৎত্রয়ং প্রতিপদ্যেত জপেদিত্যর্থঃ। প্রাণসংশিতং প্রাণন্যা সংশিতং সমাক্ তনুকৃতক্ষ সূক্ষ্মং তত্ত্বং অসি।

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কৃষ্ণকে পুরুষমন্ত্রের দ্রষ্টা উপদেষ্টারূপই দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও তিনি পুরুষযজ্ঞের যজ্ঞপুরুষ, এরূপ আভাস পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা এই—

বেদবর্ণিত কৃষ্ণ বলিলে, তাঁহার অধিক কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বেদে যে কয় বার কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহাতে কৃষ্ণ বলিতে ঋষি মাত্র বুঝায়। দ্যুতিন স্থান ছাড়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ঋষি বলিয়াই পরিচিত। ঋগ্বেদের ঋিসপ্তকে কৃষ্ণ পরম পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন বলিয়া ঋিসপ্তকের ভাষ্য-কারগণ মনে করিয়া থাকেন। ঋিসপ্তক (১০।১৯) বলিতেছেন—"কৃষ্ণ বিষ্ণো বাসুদেব জগৎকেশ নমস্তে"। ঋগ্বেদ, কৌষিতকী ব্রাহ্মণ, ও ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণকে আঙ্গিরস আখ্যা দিয়াছেন। পাণিনির ৪।১।৯৯ সূত্রে গণসম্পর্কে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ৪।১।৯৯ সূত্রে গণসম্পর্কে কার্ষ্ণায়ণ ও রাথায়ণ গোত্র নিষ্পত্তিকালে কৃষ্ণ ও রথ পদ দেওয়া হইয়াছে। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার মহাশয় বিশেষ যুক্তি দ্বারা এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই—কার্ষ্ণায়ণ ও রাথায়ণ, এ দুইটী বশিষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ গোত্রমাত্র। এই গোত্রের কিংবদন্তী কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধদিগের মধ্যেও অপরিজ্ঞাত ছিল না। কেন না, বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের আখ্যায়িকার অনেক স্থলেই অদ্ভুত বিবৃতি প্রদান করিলেও কিংবদন্তী হিসাবে তাহাদিগের গ্রন্থ হইতেও কখন কখন দু' একটা তথ্যের কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থে 'কণ্হ' এই নামটী "কণ্হে" পরিণত হইয়াছে। শঙ্খায়ন-শ্রৌত-সূত্রে কৃষ্ণ ও কণ্হ অভিন্ন। দীঘনিকায় নামক বৌদ্ধগ্রন্থে (৩।১২৩) কণ্হায়ন গোত্র ও কণ্হ ঋষির নাম আছে। "উচ্চারো নো কণ্হো ইসি অঙ্গিরসি" দীঘনিকায়ের এই কণ্হ ঋগ্বেদের ঋষি হইতেও পারেন। তবে তিনি আমাদের কৃষ্ণ কি না, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। ঘটজাতকে কৃষ্ণের যে কাহিনী আছে, তাহা যে বিকৃত আকারে আমাদের কৃষ্ণেরই কাহিনী, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জৈন গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়, এই গল্পগুলি সাধারণের খুব প্রিয় ছিল। ইহাদের প্রাচীন গোত্রীপতিদের মধ্যে বাসুদেব ও বলদেবের নাম আছে। কৃষ্ণ বাসুদেবদের মধ্যে কৃষ্ণ নবম ছিলেন [হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, পৃঃ ১২৪, অন্তগদ দশাঙ্গ, পৃঃ ১৩-১৫, ৬৭।৮২] আর এই কৃষ্ণের দ্বারাবতী বা দ্বারকার সহিত সম্বন্ধও নিষ্প্রিপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কল্পে তিনি বাদশ তীর্থঙ্কর হইবেন এবং তাঁহার বংশের দেবকী, রোহিণী, বলদেব ও জবকুমার পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থাপন্ন হইবেন। দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বাহিরেও কৃষ্ণকথা অতি প্রিয় ছিল।

এই গোত্রের কথাই জাতকের ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়া কৃষ্ণকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কার্ষ্ণায়ণ গোত্র ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়াছে। তার পর ছান্দোগ্য উপনিষদের দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ এই নাম। ইনি আঙ্গিরস যে ঘোর, তাঁর শিষ্য। যদি কৃষ্ণও আঙ্গিরস হন, আর এইরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়,তাহা হইলে বলিয়া লইতে পারা যায় যে, কৃষ্ণ যে ঋষি ছিলেন, তৎসম্বন্ধীয় প্রবাদ বা কিংবদন্তী ঋগ্বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে কার্ষ্ণায়ণ নামে গোত্রও জনশ্রুতিমূলক ছিল। কৃষ্ণসমূহকে লইয়া কার্ষ্ণায়ণ—এই সমস্ত কৃষ্ণের মধ্যে যিনি আদিমা কৃষ্ণ, তিনিই কৃষ্ণ গোত্রের স্থাপয়িতা বা প্রবর্ত্তক। যখন বাসুদেব পরমপুরুষ পদবাচ্য হইয়া উঠিলেন, তখন হইতেই এই কিংবদন্তী ঋষি কৃষ্ণের সহিত বাসুদেবের অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছে। কৃষ্ণ ও বাসুদেব যখন অভিন্ন হইয়া গেল, তখন শূর ও বাসুদেবের ভিন্নত্ব দিয়া বৃষ্ণিবংশে তাঁহারও স্থান হইয়া গেল। জাতকের কৃষ্ণগোত্র দ্বারাই কৃষ্ণ নামের কারণ কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কার্ষ্ণায়ণ গোত্র যে কেবল বসিষ্ঠশ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ গোত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা নয়, মৎস্যপুরাণে ২০০ অধ্যায়ে ইহা পারাশর পর্য্যায়েও ধৃত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি কার্ষ্ণায়ণ গোত্র ব্রাহ্মণ গোত্রই হইল, তাহা হইল ক্ষত্রিয়ে বর্ত্তাইল কি করিয়া? আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রের (১২।১৫) মতে ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞ কারণ এইরূপ গোত্র ক্ষত্রিয় গ্রহণ করিতে পারে।

স্তর ভাণ্ডারকার আরও একটী নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ক্ষত্রিয়ের গোত্র এবং শুদ্ধ পূর্ব্বপুরুষদিগের গোত্রে তাঁহাদিগের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘটজাতক (৪৫৪ সাংক্য জাতক) ও মহাউম্মগ্গজাতক খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বের রচনা, ঐতিহাসিকগণ তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ঘটজাতকে একটী উপাখ্যান আছে। উপাখ্যানটীতে পাওয়া যায় যে, কংসের একজন ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম দেবগুপ্তা। সম্ভবতঃ কেন, নিশ্চয়ই দেবকীর নামের এই দুর্ব্বিধা ঘটিয়া থাকিবে। ইঁহার স্বামীর নাম ছিল উপসাগর। বসুদেব কিরূপে উপসাগরে পরিণত হইলেন, তাহা বুঝা গেল না। যাহাই হউক, ইঁহাদের দুই পুত্রের নাম বাসুদেব ও বলদেব। এই দুই পুত্রকে অন্ধকবেণু ও তদীয় পত্নী নন্দগোপার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নন্দগোপা দেবগর্ভ্ভার সখী ছিলেন। নন্দ-গোপা নিশ্চয়ই নন্দগোষিণী যশোদা। অন্ধকবেণু দুইটী শব্দের সংযোগে নিষ্পন্ন—অন্ধক ও বৃষ্ণি—বৃষ্ণি অপভ্রংশ বেনু। এ দুইটী শব্দ দুইটী পুরুষ জাতিকে বুঝায়। বলিতে পারি না, নন্দ কেমন করিয়া এই নাম পাইলেন। যাহা হউক, এই জাতকের কাব্যাংশে বাসুদেবের আরও দুইটী নাম আছে—কণ্হ ও কেশব। ইক্ষ্বাকু জাতক ভাষ্যকারও খুব পুরাতনের ব্যক্তি। তিনি বলেন—প্রথম কবিতায়

বাসুদেব তাঁহার গোত্রনামে অভিহিত হইয়াছেন। কারণ, বাসুকে বংশগত গোত্রগত ছিলেন। সুতরাং এ হিসাবে বাসুদেবই কৃষ্ণের প্রকৃত নাম—তাঁহার গোত্রনাম কার্ষ্ণায়ণ গোত্রের বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। মহাউদ্যুগ্ন জাতকের ভাষ্যেও এই কথার পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বাসুদেব কণ্হের পত্নীর নাম জম্বাবতী বলিয়াছেন। সুতরাং বাসুদেব কণ্হ কণ্হায়ন গোত্রীয়। বাসুদেবস্য তনুস্য অর্থে তিনি বাসুদেবই প্রকৃত নাম বলিয়া কণ্হকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি পাণিনির উল্লিখিত কার্ষ্ণায়ণ গোত্রের ঋত্বিক্ বা পুরোহিতের গোত্রই হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের এইরূপ ঋষি পূর্ব্বপুরুষগণ হয় মানব, না হয় ঐল বা পৌরবংস হইবেন। ইঁহাদিগের নাম এক ক্ষত্রিয় বংশ হইতে অন্য ক্ষত্রিয় বংশের পার্থক্য সূচিত করিয়া দেয় না, তবে ঋত্বিক্দিগের গোত্র ও পূর্ব্বপুরুষগণের নামের দ্বারা এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। যদি কৃষ্ণকে গোত্র নাম বলিয়া গ্রহণ করিতে হই, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, বাসুদেব কার্ষ্ণায়ণ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদিও এটা মহাভারত ও পাণিনির গোত্র। কৃষ্ণ জাতকোক্ত কৃষ্ণ নামের এই প্রমাণগুলি অধিধানযোগ্য বলিয়া সেইগুলির উল্লেখ করিলাম। এই কৃষ্ণ নামে বরাবর পরিচিত হইয়া আসিয়া প্রাচীন কৃষ্ণ বিদ্যমানতা ও অন্যান্যতার তাঁহাতে আরোপ হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে দেবকী পুত্র হওয়াতেও বিশেষতা সহায়তা করিয়াছে। কৃষ্ণের নামের কারণ যাহাই হউক, পরযুগে বাসুদেবই কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির পর আমরা রামায়ণে কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। রামায়ণের সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন নাই। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ বাল্মীকি কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিতেছেন। বাল্মীকি যখন রাম না হইতে রামায়ণ লিখিতে পারিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ না হইতেও কৃষ্ণনাম যে তিনি করিতে পারিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ১১৯ অধ্যায়ে বেদবিদ্ ব্রহ্মা কাকুৎস্থ রামকে বলিতেছেন—

লোকানাং ত্বম্ পরো ধর্ম্মো বিশ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ।
শার্ঙ্গধন্বা জগৎকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গধৃগ্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ॥

লোকসমূহের তুমি পরধর্ম্ম। চতুর্ভুজ বিশ্বক্সেন; তুমিই শার্ঙ্গধন্বা, জগৎকেশ, পুরুষ, পুরুষোত্তম, অজিত, খড়্গধৃক্, বিষ্ণু—বৃহদ্বল কৃষ্ণ। রামায়ণের বিনি ভাষ্যিকার, তিনি কৃষ্ণ শব্দে সর্ব্বত্র "কৃষ্ণস্তর্ণ" বুঝিয়াছেন। নিঘণ্টুকার বলেন, ইহা ভবিষ্যবাণী। ভগবান্ কৃষ্ণই জানেন ইহা কি? রামায়ণ আবার বলিতেছেন—

"সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বধার্থং রাবণস্য ত্বং প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্॥

সীতাদেবী লক্ষ্মী, তুমি বিষ্ণু, তুমিই প্রজাপতি, দেব কৃষ্ণ। রাবণের বধের জন্য তুমি মানুষী তনুতে প্রবিষ্ট হইয়াছ।

রামায়ণে সর্ব্বত্র রামকে বিষ্ণুর সহিত এক, তাঁহা হইতে অভিন্ন করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে মহাভারতেও কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। বিষ্ণু ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণবগ্রন্থেও কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এক বলা হইয়াছে। দুই এক স্থলে কৃষ্ণকে বিষ্ণু হইতে সামান্য ভাবতঃ পৃথক্ করা হইয়াছে। যদিও বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণে কৃষ্ণ দুই একবার বিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন, তথাপি তিনি সাধারণতঃ বিষ্ণুর সম্পূর্ণ অবতার ও পরব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ভাগবত পুরাণ বলিতেছেন—

সংভাবনার্থায় ধর্ম্মস্য সম্ভবায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবান্ অংশেন জগদীশ্বরঃ॥

মহাভারত বলেন—

যস্য নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥

এইরূপ বিষ্ণুপুরাণও তাঁহাকে দুই এক স্থলে অংশাবতার বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। ভাগবতের শ্লোকে 'অংশেন' তৃতীয়ান্ত পাঠ পাইয়া টীকাকার অংশের সহিত অর্থাৎ অন্যান্য অংশাবতারের সহিত এরূপ অর্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, মহাভারতের কৃষ্ণ কিন্তু বড়ই জটিল। মহাভারতের নানা স্থানে কৃষ্ণ নানাভাবে চিত্রিত হইয়াছেন। ভগবদ্গীতার দার্শনিক অংশে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার স্বরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য স্থানে কোথাও বা তাঁহার ভগবত্তাকে ন্যূনীকৃত করা হইয়াছে, কোথাও বা ভগবত্তা সন্দিগ্ধ বা একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে কৃষ্ণকে যোদ্ধা প্রভৃতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ভগবত্তা যেন তাঁহাতে আদৌ আরোপিত হয় নাই। এই জন্যই Wilson, Lassen, Schroeder, প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সর্ব্বত্র মানুষের ভূমিকাই অভিনয় করিয়াছেন—কোথাও দেবভাবের পরিচয় দেন নাই। তাঁহারা বলেন, বন্ধুর সাহায্যে বা শত্রুবিনাশে—তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় কোথাও নাই।

মহাভারতের বহু স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ মহাদেবকে পূজার্চ্চনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে বিবিধ বর লাভ করিতেছেন। মহাদেবের নিকট হইতে বহু অস্ত্র প্রাপ্ত হইতেছেন।

অনেক স্থলেই কৃষ্ণ ও ঋষি নারায়ণ এক বলা হইয়াছে। কাহারও কাহারও অনুমান, বেদের ঋষি কৃষ্ণের ঋষিত্বের স্মৃতি—মহাভারত যুগের [illegible] হয় নাই। কারণ, মহাভারতের কৃষ্ণ ঋষি [illegible] হংসরূপেও পূজিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের এই স্মৃতি হইতেই মহাভারতের এই কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাকে ঋষি নারায়ণ বলিলেও কোথাও তিনি মহাভারতে সাধারণ মানুষরূপে অঙ্কিত হন নাই। যখন তিনি ঋষি নারায়ণ, তখন তিনি যুগের পর যুগ ধরিয়া জীবিত থাকিয়া অতিমানবতার পরিচয় দিয়াছেন। যখন তিনি পাণ্ডবের সখা ছিলেন, তখন তিনি ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিশুপাল, দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শল্য কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নাই। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য মহাভারত কোনরূপে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বে বাসুদেব-কৃষ্ণের কথা আছে, কিন্তু গোপাল কৃষ্ণের কথা কিছুই নাই। কেবল এই মাত্র লিখিত আছে যে, কংসনিসূদনের জন্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাম্বপুরে তাঁহার অন্য বাল্যলীলার কথা কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হরিবংশ (শ্লোক ৫৮৭৮—৫৮৭৮), বায়ুপুরাণ (৯৮ অঃ—১০০১২ শ্লোক), ও ভাগবত পুরাণে (২।৭) লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ গোকুলে যে সমস্ত অসুর আসিয়াছিল, তাহাদের বধের জন্য এবং কংস বধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে (৪১ অঃ) শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতাপের কথা বলিতে বলিতে পূতনাদি বধের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম যখন কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন (৩৮ অঃ), তখন একবারও পূতনাদি বধের কথা বলেন নাই।

পূর্ব্বে আমরা স্যর ভাণ্ডারকারের দুইটী নূতন আবিষ্কারের পরিচয় দিয়াছি। তিনি 'গোবিন্দ' নামের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সেইগুলির সার নিষ্কর্ষ করিয়া দিতেছি।

ভগবদ্গীতায় ও মহাভারতের অন্যান্য অংশে "গোবিন্দ" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এটী খুব প্রাচীন নাম। পাণিনির ৩।১।১৩৮ সূত্রের বার্ত্তিক দ্বারা ইহা নিষ্পাদিত হয়। যদি কৃষ্ণের গোকুল-

দিগের সহিত সম্পর্ক থাকার জন্য তাঁহার গোবিন্দ নাম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার গোবিন্দ নামের ব্যুৎপত্তিগত সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ বরাহ আকারে জল আন্দোলন করিয়া জলে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ হইয়াছে (অঃ ২১।১২)। আবার শান্তি-পর্ব্বে দেখা যায় (৩৪২ অঃ ৭০)—বাসুদেব বলিতেছেন—দেবগণ আমাকে গোবিন্দ বলে, যেহেতু আমি পূর্ব্বে নষ্ট পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং গুহাবাসী ছিলাম। এই ব্যাপারও গোবিন্দ নামের কারণ হইতে পারে। কিন্তু সম্ভবতঃ "গোবিন্দ" যাহা ঋগ্বেদে গোসমূহের উদ্ধারকর্ত্তা-রূপে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, পরে বাসুদেব-কৃষ্ণ দেবাদিদেব বলিয়া পূজিত হইলে তিনি 'গোবিন্দ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হ'ন। কেশিনিসূদন ইন্দ্রের অপর একটী নাম ছিল—ইহাও পরে বাসুদেব-কৃষ্ণের উপর আসিয়া পড়ে।

কবি ভাস চাণক্যের প্রায় সমকালবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল, শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইঁহার রচিত নাটকে শ্রীকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তাহাও গোপাল-কৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, গোপাল কৃষ্ণ খুঃ পূঃ পঞ্চম শতা-ব্দীতেও পূজিত হইতেন। ইহার পর পতঞ্জলির মহা-ভাষ্যে বাসুদেব কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। পাণি-নির ৪।৩।৯৮ সূত্রের কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন, আখ্যানাৎ কৃতদাচষ্টে কৃদ্গ্রকৃতিপ্রত্যাপত্তিঃ প্রকৃতিবচ্চ কারকম্।" ইহারই মহাভাষ্য করিয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"ভবেদিহ বর্ত্তমানকালতা মৃতা ভাবদ্ভক্তিঃ প্রশ্নিহো মাংশিষ্যত্যাং সূর্য্যোদ্গমনং সংভাবয়তে সূর্য্যোদ্গমতীতি। তত্রতক্ত হি তস্যাদিত্য উদেতি। ইহ তু কথম্ বর্ত্তমানকালতা কংসং ঘাতয়তি বলিং বন্ধয়তীতি চিন্তেচ কাংসে চিরবদ্ধে চ বলৌ। অত্রাপি যুক্তা কথম্। যে তাবদস্য পৌত্তিকা নাবৈতে প্রত্যক্ষঃ কংসং ঘাতয়ন্তি প্রত্যক্ষ চ বলিং বন্ধয়ন্তীতি। চিরেষু কথম্। চিরেষু অপুদগূর্ণা নিপতিতাশ্চ প্রহারা দৃশ্যন্তে কংসস্য চ কৃষ্ণস্য চ। প্রস্থিকেষু কথং যজ্ঞ শব্দশ্রবণমাত্রং লক্ষ্যতে। জ্ঞেপি হি তেষাম্ উৎপত্তিপ্রভৃত্যবিনাশাদ্দৃষ্টার্থা-চক্ষণাঃ সন্তো বুদ্ধিবিষয়ান্ প্রকাশয়ন্তি। আগন্ত সন্তঃ। ব্যামিশ্রা দৃশ্যন্তে। কেচিৎ কংসভক্তা ভবন্তি কেচিদ্ বাসুদেবভক্তাঃ। বর্ণানাঞ্চ যথপি পুষ্যন্তি। কেচিৎকালসুখা ভবন্তি কেচিৎ রক্তদৃথাঃ। ত্রৈকাল্যং যথপি লোকে লক্ষ্যতে। গচ্ছ হনাতে কংসঃ। গচ্ছ ঘাতিয়াতে কংসঃ। কিং গতেন হতঃ কংস ইতি।

মহাভাষ্যের এই উক্তি হইতে চারিটী বিষয় প্রমাণিত হইতেছে।

১। কংসের মৃত্যুর কথা এবং বলির বন্ধতার কথা পতঞ্জলির সময়ে জনসাধারণ সকলেই জানিত। ইঁহাদের কাহিনী পতঞ্জলির সময়ে প্রচলিত ছিল।

২। এই আখ্যায়িকার কৃষ্ণ বা বাসুদেবকে কংসহত্যাকারী বলিয়া উক্ত আছে।

৩। পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে যেমন অভিনয় হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সমস্ত আখ্যায়িকা লইয়া নাটকাভিনয় হইত।

৪। কৃষ্ণের হস্তে কংসের হত্যা পতঞ্জলির সময়ে বহুপ্রাচীন ঘটনা বলিয়া বিদিত ছিল।

৩।২।১১১ সূত্রের মহাভাষ্যে একটী প্রত্যুদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে—"যখন কংসং কিল বাসুদেবঃ" পুর্ব্বসূত্রের অনুবৃত্তি হইতে বুঝা যায় যে, এই ঘটনা পতঞ্জলির সময়ে সাধারণে জ্ঞানিত, ইহা অতি প্রাচীন। বক্তার সময়ে কখনও এ ঘটনা ঘটে নাই।

২।৩।৩৬ সূত্রের ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতুল কংসের সহিত কৃষ্ণের সদ্ভাব ছিল না। "অনার্য্যাতুলে কৃষ্ণঃ।"

২।২।২৩ সূত্রভাষ্যে বলিতেছে, সঙ্কর্ষণের সাহায্যে কৃষ্ণের বল বৃদ্ধি পাইতেছে থাকুক।—"সঙ্কর্ষণদ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণায় বর্দ্ধতাম্।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সঙ্কর্ষণ তাঁহার নিত্য সহচর ছিল।

অক্রুর যে কৃষ্ণ আখ্যায়িকায় একজন বিশিষ্ট নায়ক ছিলেন, তাহাও—(৪।৩।৬৪) অক্রুরবর্গ্য, অক্রুরবর্গিনঃ, বাসুদেববর্গ্য, বাসুদেববর্গিনঃ—হইতে বেশ বোঝা যায়।

৪।৩।৯৮ সূত্রভাষ্যে পতঞ্জলি দেখাইতেছেন যে, বাসুদেব যে শুধু ক্ষত্রিয় ছিলেন, তা নয়; তিনি দেবতারূপে পূজিত হইতেন।" সুধর্ম্মা বৌদ্ধ-দিগের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে কৃষ্ণের কথা আছে। সেই কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ তথা বাসুদেব কৃষ্ণ। এই গ্রন্থখানি যে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বের গ্রন্থ, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ললিতবিস্তরের ১১ অঃ কৃষ্ণের কথা আছে। গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় ১ম শতকের গ্রন্থ। ইহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। *

* এটী একটী সংগ্রহ প্রবন্ধ। কয়েকটী স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ইহা লিখিত। এ সম্বন্ধে আমি বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি, স্থানাভাবে সেগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইল না। ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—লেখক।

সার্থক চিত্র

(গাথা)

(শ্রীযামিনী রঞ্জন সেন গুপ্ত, কাব্যতীর্থ)

পাথরে কাটিয়ে গড়িছে মূর্ত্তি, মোহিত চিত্রকর,
নিপুণ শিল্পী বলিছে সবাই, সুখ্যাতি ঘরে ঘর।
মনে ভাবে যুবা, যেখানে যা আছে শোভন দৃশ্য যত,
দেখিয়ে গড়িবে যেমনটী যথা অর্থ ফলিবে কত।
ছাড়িয়ে এ বারাণসী গয়া, দিল্লী আগ্রাপুরি,
উৎকলে চলে সাগর দেখিতে জগন্নাথের পুরী।
ভূতল স্বর্গ কাশ্মীরে ছুটে, দেখিতে তথায় শোভা,
তাহার দৃশ্য গড়িয়া তুলিবে মানবের মনোলোভা।
পঞ্চদিন ঘরে, কাশ্মীরে যুবা, সেদিন ধনীর ঘরে,
হতেছে বিবাহ, খুব ধুমধামে, উৎসব উঠে ভরে।
বিবাহ সভায় এককোণে বসি, মোহিত আঁকিছে ছবি,
বরের কনের, পাথরে গড়িয়া প্রচুর লভি।
ঘরে ফিরি যুবা, পাথর কাটিয়ে প্রথমে গড়িল বর,
বাঙ্গলা মুলুকে চাহিল বেচিতে, তেমন উঠেনা দর।
"যেথায় আমার বুঝিবে কদর" ভাবিয়া ভাবিয়া চিতে
কাশ্মীরে পুনঃ ছুটে চলে যুবা, ছবির মূল্য নিতে।
এদিকে তথায় গেছে কতদিন সেই বরবধূ সাথে,
মধুর স্বপনে নিতি নব ছাঁদে, খেলিছে দিবস রাতে।

সে মধু মিলনে, বিধাতার শাপ উঠিল মূর্ত্তি ধরে,
নীচ হ'ল মাথা বরের পিতার, অকুলীনা বধূ ঘরে।
পুত্রে ডাকিয়া কহিল জনক, বধূ চিরদিন তরে,
আমার পুত্রীরে পাবেনা পশিতে, পাঠাব বাপের ঘরে।
বিধাতার দিনে, দুজনার কত অশ্রুর বিনিময়,
শিশির সিক্তা, কোমল নলিনী মরমে মরিয়া রয়।
জনকের ঘরে বিরহিণী মেয়ে, শয্যা লইল শেষে
ব্যর্থ জেবন, ক্ষয় রোগে তার মৃত্যু ধরিল কেশে।
একদিন বালা প্রভাতে উঠিয়া শিয়রে দেখিল স্বামী,
কহিল কাঁদিয়া এসেছ নাথ প্রভু ভেবেছি দিবসু যামী!
বৃন্তস্থ যুবতী বাক্‌হীন পত্র এ যে পাষাণের গড়া,
দেবতা তাহার দেবরূপ ধরি আজিকে দিয়েছে ধরা;
পাষাণে পূজিছে একমনে, বালা, ফুল চন্দন করে,
দেখিতে দেখিতে নবীন স্বাস্থ্যে, ক্ষীণ দেহ উঠে ভরে।
রটি গেল কথা কাশ্মীর দেশে, পতি তার ছুটি আসে,
সার্থক পূজা ভক্তি দাঁড়াল, আপন দেবতা পাশে।
প্রচুর অর্থ দিতে চাহে ধনী, মোহিত চাহে না আর,
শিল্প সাধনা, হয়েছে সফল, পূর্ণ হৃদয় তার।

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীঅমৃতলাল মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌)

বিধবা-বিবাহ বিষয়ক সামাজিক নাটক "শাস্তি কি শাস্তি"র পাগলের মুখে কবিবর গিরিশচন্দ্র যে ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'শ্যামাদাস বাবু, বিবেচনা করুন, বিধবা সম্বন্ধে ঋষিদের যেরূপ ব্যবস্থা তা—শাস্তি কি শাস্তি?" এ প্রশ্নের উত্তর সহজ সরল ভাবে তিনি দেন নাই। পুরাতনপন্থী গিরিশ-চন্দ্র বিধবা-বিবাহের একটী কুফল দেখাইয়া এতবড় একটা সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে চান দেখিয়া, মনে নির্ব্বেদ আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধবাদের সংযমশীল হওয়া উচিত—বিলাসব্যসন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলে, তাহাদের পক্ষে যে মঙ্গলজনক এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না! ইহার জন্য শাস্ত্রের অনুশাসন-বাক্য উদ্ধার করিতে হইবে না—শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এ সকল কথার উল্লেখ করার আবশ্যকতা নাই। আলোচ্য বিষয় বাল-বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত কি না? ইহা শাস্তি কি শাস্তি? ব্রহ্মচর্য্যরত বিধবার আদর্শ যে সর্ব্বোচ্চ তাহা যুক্তি আর দ্বারা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না; কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে

য, বাল-বিধবার রমণীজন-সুলভ অনুভূতি আছে; পারিপার্শ্বিক আত্মীয়গণকে ভোগসুখে রত দেখিয়া হৃদয়ে তাহার যে চাঞ্চল্য উঠিতে পারে না, একথা ও ত জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। অবশ্য সংযম ও শিক্ষার দ্বারা জীবনকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু কোন্ যুক্তির বলে, কোন্ অনুশাসনের সমীচীনতায় বলিতে পারা যায় যে, যদি বাল-বিধবা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, তবে তাহার বিবাহ দেওয়া অনুচিত? আবার ইহাও ত দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গালী জাতিটা দিন দিন যেরূপ ধ্বংসের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে জাতিটার চিহ্ন, ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অবশ্য আমি হিন্দুর কথাই বলিতেছি। এ অবস্থায় কি জাতীয় কর্ত্তব্য নয় যাহাতে এত বড় জাতিটা বাঁচিয়া থাকে—জন্মের প্রসার যাহাতে বৃদ্ধি পায়। ইচ্ছা করিয়া বাল-বিধবার উৎপাদিকা শক্তি হরণ করিবার প্রয়াসী হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। অবশ্য আমার বক্তব্য এই যে, যে বাল-বিধবা সংযমী থাকিয়া সংসারে চলিতে চান, তাঁহার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়—যিনি পতি দেবতার ধ্যানে রত থাকিয়া দেবীর ন্যায় সংসারে থাকিতে চান তিনি আমাদের নমস্যা। আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ও সংসারটাকে এইরূপ বিধবারা এখনও বাস্তুকীর মত মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে বিধবার হৃদয়ে চাঞ্চল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিধবার বিবাহ না দিবার ফলে অনেক স্থলে যে ভ্রূণ-হত্যা হয়, তাহার বিষয় অনেকেই অল্প বিস্তর জানেন। সমাজ-জীবনের এই সকল ক্ষতের চিকিৎসা হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়? অবশ্য একথা আমি বলি না যে, বিধবা হইলেই তাহার চরিত্র নষ্ট হইবে, আর সধবা থাকিলে তাহার পরপুরুষানুরক্তি হইতে পারে না। তবে বাল-বিধবার চরিত্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; আর প্রাপ্তযৌবন সধবারও পরপুরুষানুরক্তির সম্ভবনা অল্প। ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রবল রিপু আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই মনোনিয়ন্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত হইয়া নরনারী কুপথে গমন করিয়া থাকে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা-লাভ করিলে যদি ইন্দ্রিয় দমন করা যাইত, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের ভিতর সকলেই জিতেন্দ্রিয় চরিত্রবান্ দেখিতে পাইতাম; কিন্তু তাহাদের ভিতরও চরিত্র-স্খলনের দৃষ্টান্ত ত বিরল নয়। থাক্ সে কথা। বিধবা-বিবাহের ফলও যে সর্ব্বত্র অশান্তিপূর্ণ তাহাও ত বলিতে পারা যায় না। অবশ্য ফল দেখিয়া কার্য্যের বিচার করা সমীচীন নয়। তথাপি কথাটা তুলিলাম এইজন্য যে গিরিশচন্দ্র একটী চরিত্র চিত্রণ করিয়া—একটী বিধবা-বিবাহের কুফল দেখাইয়া, ও অপর একটী বিধবার চরিত্র স্খলনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিতে চান—আমাদের ঋষিদের ব্যবস্থা শান্তিময়? হিন্দুর ঋষি অনেক—তাহাদের মত ও বিভিন্ন। তাঁহাদের কোন্ মতটা যে গ্রহণীয়, আর কোন্‌টা বর্জ্জনীয় তাহাও কে বলিয়া দিবেন। রঘুনন্দনের সকল ব্যবস্থা সর্ব্বত্র সমান ভাবে গৃহীত হয় না। তবে মানুষ কোন্ পথে চলিবে। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত সামাজিক বিধিব্যবস্থাও যে পরিবর্ত্তিত হইয়া উচিত এ কথাও কে অস্বীকার করিবে? আর বাল-বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তাহা পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন। এ প্রথা আচার ও সমাজ-সম্মত এখনও হয় নাই তাহা স্বীকার্য্য, কিন্তু যে কয়েকটী বিবাহ হইয়াছে তাহা হইতে যে কুফল ফলিয়াছে তাহাও ত বলিতে পারা যায় না। ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতর বিধবা-বিবাহের সুফল আমরা অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুখ বা শান্তি মানসিক অবস্থা। নানা কারণে মানসিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটে। সেই কারণগুলি অহিত হইয়া চিন্তা না করিলে—ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা না করিলে

শুধু কার্য্যের ফল দেখিয়া তাহা সুখকর,' শান্তিপ্রদ বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। আলোচ্য নাটকের বিষময় ফলের কারণ বিধবা-বিবাহ নয়—পাত্র-নির্ব্বাচন।

নাটকখানির বর্ণিতব্য বিষয় প্রসন্নকুমার জনৈক ধনাঢ্য ভদ্রলোক; জ্যেষ্ঠা কন্যা ভুবনমোহিনীকে অল্প বয়সে বিধবা হইতে দেখিয়া ও তাহার স্বামীর যত্ন প্রকাশ চন্দ্রের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি দেখিয়া কনিষ্ঠা কন্যা প্রমদা যখন বিবাহের রাত্রিতে বিধবা হইল, তখন কন্যার বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হইলেন ও বিধবা পুত্রবধূ নির্ম্মলাকে মনোগত অভিপ্রায় জানাইলেন। কথাটা শুনিয়া নির্ম্মলা তাঁহাকে একার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন,—'বাবা, তোমার নির্ম্মল হৃদয়ে কেন এ কালো মেঘ উদয় হয়েছে? বিধবার কি সংসারে কাজ নাই, ব্রহ্মচারিণীর কি প্রয়োজন নাই?—এ কর্ম্মক্ষেত্রে বিধবার মত কার মহৎ কার্য্য করবার সুযোগ হয়? কে স্বার্থশূন্য হ'য়ে পরের ছেলে মানুষ করতে পারে? বিধবা অপেক্ষা কে ব্রতধর্ম্ম পরায়ণা? কে নিলিপ্ত সংসারী? কার স্বার্থশূন্য সেবা সংসারে আদর্শ? কেন পাপকথা তোমার পবিত্র জিহ্বায় উচ্চারণ ক'র্ব?' উত্তরে প্রসন্নবাবু বলিলেন, 'কেন, কি পাপ? বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত—নীতিসঙ্গত। তবে নিষ্ঠুর লোকাচার? যা হবার হবে! লোকনিন্দা গ্রাহ্য ক'র্বো না।'

নির্ম্মলা। বাবা, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হ'তে পারে, নীতিসঙ্গত হ'তে পারে, কিন্তু বিধবা বিবাহ অন্যের বোঝবার নয়, বিধবাই বুঝুক। যদি শাস্ত্রসঙ্গত হয়,—নীতিসঙ্গত হয়, সে বিধবা আপনি বুঝে, ইচ্ছা হয় বিবাহ করুক,—অন্যে তার দরদী হ'য়ে বিবাহ দিলে পাপগ্রস্ত হ'বে। বাবা, আমার বাপ মা যদি দরদী হ'য়ে আমার বিবাহ দিতেন, তা হ'লে কি আমি সুখী হতুম?'

প্রসন্ন। তুমি যোগিনী—তুমি ব্রহ্মচারিণী, তোমার দেখে সংসার চলে না।

দেবী স্বরূপিণী নির্ম্মলার বক্তৃতার প্রথমাংশ—বিধবা আপনি বুঝে বিবাহ করিতে হয় করুক কথাটায় কতকটা সত্য আছে, কিন্তু একথাটাও ভাবিয়া দেখিবার নয় কি যে বাল-বিধবার বোধশক্তি তখন কতটা উন্মেষিত হয়? অপ্রাপ্তবয়স্কা অপরিণত বুদ্ধি বিধবার ভাল মন্দের বিচার ভার যাহাদের উপর নির্ভর করে, তাহাদের উপর এ ভারটা দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত নয়? পিতামাতা কন্যার অবস্থা যেরূপ বুঝিবেন সেইরূপ কার্য্য করেন ও করিবেন। সর্ব্বত্রই যে বিধবার বিবাহ দিতে হইবে একথা যুক্তিসঙ্গত নয়—আমরাও তাহা বলি না। নির্ম্মলার মত সাধ্বীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব তাহার পিতামাতা করিবেনই বা কেন? তাহাদের অপেক্ষা বেশী কে তাহাকে জানিবার, তাহার চরিত্র বুঝিবার সুযোগ ও সুবিধা কে আর অধিক পাইয়াছে? কিন্তু যে পিতৃ চক্ষুর সম্মুখে একটী বিধবা কন্যাকে কুপথে চালিত হইতে দেখিলেন, তাঁহার পক্ষে অবশ্য বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাবটা কি এত অযৌক্তিক বা দূষণীয়। আমরা ত কিছুতেই ইহা মনে করি না। তারপর ভাববশে নির্ম্মলা বলিল,—'বাবা তোমায় মিনতি করি—বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হ'লে ব্রহ্মচারিণী থাক্‌বে না, হিন্দু-সমাজের এ গঠন থাকবে না, আর এক গঠন হ'বে,—হিন্দু সংসারে অন্য অবস্থা হ'বে। বাবা, যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, সে দেশেও যে বিধবা, চির বৈধব্যব্রত গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত সতী বলে গণ্য। বাবা, বিধবা-বিবাহ শুনলে আমার হৃৎকম্প হয়। মনে হয় বুঝি হিন্দু-সমাজের সতীত্ব লোপ হ'বে। বাবা, আপনার কন্যাকে মমতাবশে হিন্দু রমণীর উচ্চ সতীত্ব গৌরব হ'তে বঞ্চিত ক'রো না।' কথাটার ভিতর যে কিছু সত্য আছে তাহা আমরা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না—বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হ'লে সমাজে

ব্রহ্মচারিণী থাকিবে না। এ কি একটা কথার মত কথা। সমাজে পরপুরুষগমনা রমণী যে নাই তাহা বলিতে পারি না—স্বেচ্ছায় নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া রূপজীবিনীও অনেক আছে, তাই বলিয়া কি ব্রহ্মচারিণী নাই। সকল বালবিধবাই যে বিবাহ করিবে এমন কথাও নাই। তবে ব্রহ্মচারিণী থাকিবে না কেন? উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করা সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়? ব্রহ্মচারিণীর সংখ্যা হ্রাস পাইবে বলিয়া আমরা ধারণা করিতে পারি না। যাঁহারা ব্রহ্মচারিণী হইয়া জীবন যাপন করিতে চান, কেহই তাঁহাদিগকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন না। হিন্দু সমাজের গঠন থাকিবে না একথাটাও ঠিক আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যুগ-ধর্ম্মানুসারে কালে কালে সমাজের গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইবে। হিন্দু সমাজে বিভিন্ন মতের সমন্বয় যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন আর আর কোন সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর লোকদিগের আচার-ব্যবহারকে গ্রহণ করিয়া উদারতা দেখাইতে, হিন্দু-সমাজ ভিন্ন কোন্ সমাজ আর পারিয়াছে? বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া সমাজ যখন ভাঙ্গিয়া চুরমার হয় নাই—হিন্দুর সমাজ যখন এতদিন ধরিয়া বর্ত্তমান আছে, তখন কি বাল-বিধবার বিবাহ হইলেই সমাজটা চূর্ণ হইয়া যাইবে? কথাটা কল্পনায় ও আমরা ধারণা করিতে পারি না।

একাদশীর দিন সদ্য-বিধবা প্রমদাকে তাহার মাতা এক ফোঁটা জল দিলেন না দেখিয়া, প্রসন্ন বাবু ব্যথিত হইয়াছিলেন। তাই নির্ম্মলার কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—'তুমি তোমার শাশুড়ীর মত নিষ্ঠুর! চক্ষের উপর দুধের মেয়ের অবস্থা দেখলে! যদি টাকুরা লেগে মরে তোমাদের ধর্ম্ম, এক ফোঁটা জল দিতে নিষেধ, এই তোমার শাশুড়ীর মাতৃ-স্নেহ! বেশ তোমাদের ধর্ম্ম তোমরা নিয়ে থাক, এ জন্মে মরা - আমি রোজ রোজ দেখতে পার্‌বো না।'

তারপর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রসন্ন বাবু চরিত্রহীন যুবক ঘেঁটীর সহিত কন্যা প্রমদার বিবাহ দিলেন। ইচ্ছা ছিল জামাতাকে বিলাত হইতে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করিবেন।

তাঁহার ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। বিলাত ফের্ত্তা ঘেঁটীর হস্তে প্রমদা নির্য্যাতিত হইল। সভ্যতার দোহাই দিয়া পত্নীকে মদ খাইতে ও পরপুরুষের কাছে সে বসিতে বলিল। এ সকল কার্য্যে অনভ্যস্তা প্রমদা কিছুতেই রাজী হইত না; সর্ব্বদাই তাহাকে 'জঙ্গলি' বলিয়া সে বিদ্রূপ করিত। আনুষঙ্গিক অত্যাচার তাহার উপর চলিতে লাগিল। ঘেঁটীর বিলাসের ইন্ধন জোগাইবার জন্য প্রমদার গহনা গুলি বিক্রয় করিতে হইল—পিতৃগৃহ হইতে আনীত অর্থ সমুদায়ই তাহাকে দিতে হইল; কিন্তু যে একবার বিলাস-স্রোতে গা ভাসান দেয় অভাব-অভিযোগের দিকে, তখন তাহার আর দৃষ্টি পড়ে না। শেষে দুর্ব্বৃত্ত ঘেঁটী পত্নীর নিকট প্রস্তাব করিল, হয় পিতার নিকট হইতে অর্থ লইয়া আইস, না হয় বন্ধু বাঁহার সহিত নৃত্য করিয়া, শরীর বিক্রয় করিয়া অর্থ লইয়া আইস! অর্থ—তাহার চাই। যে কোন উপায়ে অর্থ আনিতে হইবে। শেষের প্রস্তাব শুনিয়া প্রমদা শিহরিয়া উঠিল। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ধর্ম্মপত্নীর কর্ত্তব্য তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, 'কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'; অগত্যা অর্থের জন্য পিতৃগৃহে তাহাকে যাইতে হইল, দুর্ব্বিনীত জামাতাকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার পিতা অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলেন না। রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিতে আসিতে দেখিয়া ঘেঁটী তাহাকে বাগান বাড়ীতে যাইতে বলিল। প্রমদা যখন সে কার্য্যে কর্ণপাত করিল না, তখন বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ঘেঁটী তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। সহ্যের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতী তহইয়া

যাওয়ার নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, গঙ্গা দেবীর শীতল জলে জীবন সমর্পণ করিবার জন্য প্রমদা কৃতসঙ্কল্প হইয়া চলিতে লাগিল। পথে বিপদের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হইয়াছিল এবং দয়ার্দ্র-হৃদয়া হরমণির কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়া তাঁহারই আশ্রমে নীত হয়। তাহারই নিকট হইতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া নূতন জীবন প্রমদা পাইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল ভগবানের সংসারে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। হরমণি ও পাগল-প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের কার্য্যে সে মনঃপ্রাণ দিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। অশান্ত জীবনে শান্তির আলোক দেখিতে পাইল।

এদিকে নানারূপ মানসিক উৎকণ্ঠায় ও সামাজিক পীড়নে ও ঘেঁটীর ও ভুবনমোহিনীর ব্যবহারে নির্ম্মল চিত্ত ভাবপ্রবণ প্রসন্ন কুমারের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল।

একদিন পাগল যখন প্রসন্ন বাবুকে দরদ দেখাইয়া তাহার বৈষয়িক শ্যামদাস বাবুকে বলিয়াছিল, 'আপনি প্রসন্ন বাবুকে বাড়ী নিয়ে যান' তখন তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? উত্তরে পাগল বলিয়াছিল, 'মশায়, সংসারে এসে শুধু দুঃখ তো সকলেই হয়।' উত্তরে আবার তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—'এতো হয়? ছেলে মেয়ে জামাই মরে,—এক মেয়ে কলঙ্কিনী, এক মেয়ে ভিখারীর ঘরে ভিখারিণী—ফৌজদারী আদালতে সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়ায়—জুদিজ হ'য়ে স্ত্রীর মৃত্যু,—রাস্তায় হাততালি দিয়ে ছেলেরা গায়ে ধূলা দেয়,—যারা পদলেহন ক'রেছে তারা পশু অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করে,—সহানুভূতির ছলে ক্ষত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত করে,—তাপিতের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে আপনাদের ধার্ম্মিক বলে পরিচয় দেয়,—হাতে হাতকড়ি,—বিমল পুত্রবধূকে বর্ব্বরে টেনে আনে,—খুনে অপবাদ দেয়,—এক জীবনে কি এত হয়?' উত্তরে পাগল তাহাকে বলিয়াছিল—'চেষ্টা কর্‌লে অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়। আমার হয়েছে, হরমণির হয়েছে, আপনার ও হবে। ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করুন। তিনি শান্তিদাতা অবশ্যই শান্তি দিবেন। জ্ঞানগর্ভ কথা গুলি কিন্তু প্রসন্ন বাবুর হৃদয়ে আঘাত করিল না, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা যাও যাও।' তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহার বৈষয়িককে পাগল বলিলেন,—'মহাশয় ওর ভাব বুঝতে পাচ্ছি না, আপনি সতর্ক থাকবেন।' পঞ্চম অঙ্কের শেষ গর্ভাঙ্কের বিষাদিত অতীব ভয়ঙ্কর। জামাতা বেণীমাধবের উদ্যান বাটীর কক্ষে অনুতপ্ত ভুবনমোহিনীকে হরমণি যখন বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল, সর্ব্ব দুঃখের কারণ প্রকাশকে সাজা দিবার—তাহাকে জেল খাটাইবার সঙ্কল্প মনের মধ্যে রাখা কোন মতেই উচিত নয়, কারণ সাজা দেবার কর্ত্তা ভগবান, মানুষ নয়। তারপর হরমণি বলিল,—'পরের অনিষ্ট করা নয় মা—আপনার অনিষ্ট করা। ভগবানের এমন নিয়ম নয় মা,—যে পরের হিংসা করা। যে মন থেকে পরহিংসা ছাড়ে,—জগতে তার শত্রু থাকে না, হিংস্রক জন্তুও তার হিংসা করে না, ক্রূর সর্প তাকে দংশন করে না! তুমি মন থেকে হিংসা দ্বেষ ছেড়ে দিয়ে ভগবানের মঙ্গলময় রাজ্যে কায়মনোবাক্যে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করো, তাতে মা, আপনার মঙ্গল হ'বে, ভগবানের কৃপায় মহাপাপ নষ্ট হ'য়ে দেহ মন নির্ম্মল হ'বে, তাঁর নির্ম্মল চরণ দর্শন পাবে। গান শোনো মা,—

গীত।

প্রাণময় প্রাননাথ আমার।
ব্যথা কারো দিলে প্রাণে বাজে ব্যথা তাঁর॥
ব্যথা পেলে প্রাণে, প্রাণে ব'সে প্রাননাথ জানে
চাওরে ব্যথিত তাঁর বদন পানে;
প্রেম বিনা কি নিবে আলা,
আলিয়ে আলা জুড়ায় কার?
নিরমল হৃদয়কমল, ঢালো তে তার গরল,

কোমল কমল শুকিয়ে যাবে,
তায় পূজা হবে না আর॥'

গীত শেষে হরমণি চলিয়া গেল। প্রকাশের প্রতি বিদ্বেষভাব বিচ্যুতেই কিন্তু ভুবনমোহিনী মন হইতে দূর করিতে পারিতেছিল না। স্বামীর কৃত্রিম বন্ধু হইয়া সেই তাহাকে বিপথে আনিয়াছে। অদৃষ্টবশে যখন গর্ভের সঞ্চার হয়, তখন সে তাহাকে কত অনুনয় বিনয় করিয়াছে; বিবাহ করিলে কলঙ্ক থেকে সে মুক্ত হইতে পারে—হীরেন যৌবন ও ধনমদে সর্ব্বস্ব যাহার পদে অযাচিত ভাবে বিলাইয়া দিয়া সে নিঃস্ব হইয়াছে, সেই প্রকাশচন্দ্র তাহাকে বিবাহ করিয়া কি সমাজের নিকট তাহার উন্নত মস্তক, আবার উন্নত করাইতে পারিত না! তাহা হইলে কি তাহাকে সমাজের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হইত—না তাহার আপনার গর্ভের সন্তানকে পরের কাছে মানুষ করিতে দিতে হইত। এইরূপ মানসিক অবস্থায় যখন প্রকাশকে তুষানলে পোড়াইবার ইচ্ছা তাহার হইতেছিল, সেই সময় গঙ্গাজলের ঘটী হস্তে প্রসন্নকুমার প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া ভুবনমোহিনীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সে বলিল, 'বাবা, বাবা তোমায় দেখে আমার ভয় হচ্ছে!' প্রসন্ন। ভয় তো হবেই,—তোমার যম যে আমি।

ভুবন। বাবা—বাবা,—আমায় মেরো না!

প্রসন্ন। কলঙ্কিনী, এখনো তোর বাঁচবার সাধ! এখনো বেঁচে থেকে পৃথিবী কলঙ্কিত কর্‌বি! এখনো বেঁচে থাক্‌তে চাস্? তোর মনে অনুতাপ হয় না? মনে ক'রে দেখ, তোর আচরণ দেখে গিয়েই প্রমদার বিয়ে দিয়েছি! তোর আচরণেই প্রমদা চণ্ডালের তাড়না স'য়েছে, চণ্ডালের চাবুক খেয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে, নিরাশ্রয় হয়ে রাস্তায় পড়েছিল, তোর আচারেই তোর মাতৃহত্যা হয়েছে তোর আচারেই তোর বাপের মাথায় কলঙ্কের বোঝা, কলঙ্ক কালিতে সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে গেছে, নীচ লোকে উপহাস করে, ছেলেরা গায়ে ধূলো দেয়, হাততালি দে নেচে নেচে ছড়া কাটায়। তোর আচারেই আজ হাতকড়ি প'রেছি; তোর আচারেই আমার পবিত্র কুলবধূকে চণ্ডালে স্পর্শ করেছে, পিশাচিনীতে টেনে এনেছে!—না এ পৃথিবীতে তোর ও থাকা উচিত নয়, আমারও থাকা উচিত নয়।

ভুবনমোহিনী মার্জ্জনা চাহিলে প্রসন্নকুমার বলিলেন, 'মৃত্যুই তোর মার্জ্জনা।' উত্তরে ভুবন বলিল,—'বাবা—বাবা, যদি মেরে ফেল্‌বে, পায়ের ধূলা দাও, একবার ভুবন বলে ডাকো, মরবার সময় জেনে যাই যে তুমি আমায় মার্জ্জনা করেছ', তারপর প্রসন্নকুমার স্বহস্তে ভুবনমোহিনীকে পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত করিয়া বলিল,—'গঙ্গাজল মুখে নে যদি বেঁচে থাকিস্—শোন্,—আমি তোরে মাপ ক'রেছি। শুনে যা—ভুবন বলে ডাকৃচি শোন,—ভুবন—ভুবন—আমার ভুবন, মা আমার! না শুন্‌তে পেলি নি! চল্, তোর সঙ্গে যাই! তুই ছেলে মানুষ,—একলা যেতে পার্‌বি নি!' এই বলিয়া নিজ বুকে যেমনি ছুরিকাঘাত করিতে যাইবেন, অমনি প্রকাশচন্দ্র আসিয়া ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া তাহার বুকে ছুরিকাঘাত করিতে অনুনয় করিল। কিন্তু তাহার সে অনুরোধ রক্ষিত হইল না। প্রসন্নকুমার তাহাকে বলিলেন, 'না তুমি জীবিত থাকো, তোমার কার্য্যের ফল দেখো। মৃত্যুতে শাস্তি হয়, কক্ষকে শাস্তি দিবার জন্য হত্যা ক'রেছি। আত্মহত্যা ক'রবার চেষ্টা ক'রেছিলুম, তুমি ছোরা কেড়ে নিয়েছ, কিন্তু আর ছোরার প্রয়োজন নাই, আমি এই পাপদেহ থেকে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পার্‌বো।' তারপর অনুতাপানলে জর্জ্জরিত প্রকাশচন্দ্র আপনার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে বলিয়াছিল, 'ভুবন, যদি তুমি জীবিত থাকো, শোনো,—আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেছিলুম;

আমি স্বার্থের জন্য তোমায় কুপথগামী ক'রেছি। বাবা পাগল, তুমি আমায় সতর্ক করেছিলে, আমি মনের দম্ভে বুঝি নাই; ভেবেছিলুম আমার মনের বল আছে, কুপথগামী হবো না, ধর্ম্ম বিশ্বাস ভঙ্গ ক'র্‌বো না। আমার ভ্রম, অবস্থাই বলবান, মানুষের বল নাই। আজ মৃত্যুতেও আমার অনুতাপানল নির্ব্বাণ হচ্ছে না। পাগল তুমি সাধু আমার মাথায় পা দাও।' পাগল তাহাকে দয়াময় জগদীশ্বরকে ডাকিতে বলিলে, 'দয়াময়' কথাটী উচ্চারণ করিবামাত্রই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। প্রকাশের শেষ কথা কয়টীর ভিতর যে সত্য রহিয়াছে, তাহার প্রতি অবহিত হইতে সকলকেই আমরা অনুরোধ করি। আপনার উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করা কোন মতেই উচিত নয়। মানব যে কতকটা অবস্থার দাস তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই। প্রকাশের মৃত্যুর পূর্ব্বেই প্রসন্নকুমারের মৃত্যু হয়। এতগুলি মৃত্যু চক্ষুর সম্মুখে একসঙ্গে ঘটিতে, দেখিতে পারা যায় না। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য গ্রীক ট্র্যাজেডির মতই হইয়াছে।

হরমণি ও পাগলের জীবন জীব-সেবায় উৎসর্গীকৃত। পাগলই তাহার স্বামী। হরমণি কিন্তু তাহা জানিত না। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাহার উপর জমীদারের ছেলের নজর পড়িল। রাধুনি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু বিপদ তাহাকে ছাড়িল না। জমিদার পুত্রের শ্বশুর বাটীতে একদিন পাচিকা হরমণিকে দেখিতে পাইয়া দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কথায় বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। হরমণি না জানিয়াই জমিদার পুত্রের শ্বশুর বাটীতে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিল। ঘটনাটী কিন্তু সকলে দেখিতে পাইয়া রাধুনিকে তাড়াইয়া দিল। তখন স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের পথ ঘুচিয়া গেল! সকলেই তাহার দোষ দিল, কারণ সে যে অবলা। তখন ভগবানের কার্য্যে জীবসেবায় আতুরের ও দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য সে মনঃপ্রাণ নিয়োজিত করিল। দীন বলিয়া সে দীনের দুঃখ বুঝিত—যেখানে দীন দরিদ্র অনাথকে দেখিতে পাইত—সমাজ যাহাকে দূর করিয়া দিত, তাহাকেই সে কোল দিত—সাহায্য করিত। সহানুভূতির পবিত্র বারি সেচনে তাপিতের দুঃখ দূর করিত। মানুষ যাহাতে সোজা পথে চলে তাহার জন্য হরমণির হৃদয় সর্ব্বদাই ব্যগ্র ছিল। ব্যথা না বুঝিলে, মমতা জন্মিতে পারে না, তাই সে ব্যথিতের ব্যথার কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিত এবং তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিত। ভুবনমোহিনীর মন যখন প্রথম পাপের দিকে অগ্রসর হইতে উপক্রম করিল, তখন হরমণির মুখে আমরা শুনিতে পাই,—'বিলাস ত বিধবার নয়, অবিবাহিতা যুবতীর ও নয়। শত্রুর মত বিলাসকে ত্যাগ কর্‌তে হয়। পোড়া বিলাসই হৃদয় ডেকে আনে মা। তাই মা সদাই সতর্ক থাকি—(আশ্রমের) মেয়েগুলোকে কাজকর্ম্মে জোড়া রাখি। রোগীর শুশ্রূষা, অতিথি সেবা—এই সব শেখাই। আমার স্বামীর আশ্রয় নাই, বিলাস বর্জ্জিত হ'য়ে অনাথ সেবাই তার আশ্রয়। অন্যত্র তাহাকে বলিতে শুনি,—'তোমার এই সোনার বয়েস, এই রূপ, তোমার তো একা থাকা ভাল দেখায় না। একুলা থেকো না মা, কাঙ্গালের এই কথাটী নিয়ো, জেনো মা, পোড়া কলির দৃষ্টি বিধবার উপরেই বেশী, দেবতার মতন সেজে কলির চেলারা বিধবার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে চারিদিকে ফেরে! এই মানুষই দেবতা আর এই মানুষই মা কলির চেলা।' এক সময়ে অত্যাচার জর্জ্জরিতা প্রমদাকে হরমণি উপদেশ দিয়া বলিয়াছিল,—'কেন মা মর্‌বে? আমি ভেবেছিলুম ম'র্‌বো, তারপর বুঝ্‌লাম মরে কি হ'বে ম'র্‌বো কেন? যতদিন বাঁচ্‌বো আমাদের মত অনাথার সেবা কর্‌বো।' তারপর ভুবনমোহিনী যখন আফিং এর গোলাটী খাইবার উপক্রম করিতেছিল তখন তাহাকে বলিতে শুনি,—'এ কি! কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ব'সেছ? আত্মহত্যা ক'র্‌বে? কেন কার জন্যে? পাপ ক'রে থাক, পাপকার্য্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা দুই মহাপাতক ক'রো না! যা করেছ, ভগবান কৃপাসিন্ধু,—তার কাছে মাপ চাও! মানুষ দুর্ব্বল, তিনি জানেন, তিনি মাপ কর্‌বেন। তুমি আজীবন তাঁর কাজ ক'রো। সন্তান হয় ক্ষতি কি? আমি নিয়ে লালন পালন ক'র্‌বো। তুমি সৎ কার্য্য ক'রে কুকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত ক'রো। এখনো দেহ আছে, অধিক কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে। আপনার অবস্থার জন্য অভাগিনীর অবস্থা বুঝ্‌বে। তাদের তুমি আশ্রয় হ'বে, তুমি ভয় করোনা, ভগবানের কৃপায় তোমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হবে। আমি মা, তোমায় মিথ্যা কথা বল্‌ছিনে। যে নিরাশ্রয় ভাবে তিনি আশ্রয় দেন; যে তাপিত, তার তিনি তাপ হরণ করেন।' এত বড় আশার কথা যিনি আমাদিগকে শোনাইতে পারেন তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

হরমণির প্রতিষ্ঠিত অনাথ-আশ্রম সুচারুভাবে চালাইবার জন্য পাগল অর্থ সাহায্য করিতেন। নানারূপ বিপদজাল হইতে মুক্ত হইয়া ব্যবসা করিয়া পাগল কলিকাতায় একজন বিখ্যাত ধনী হইয়াদিলেন; কিন্তু তিনি দ নবেশে পাগলের মত থাকিতেই ভাল বাসিতেন, কারণ ঐ বেশে দীনের দুঃখের কথা সর্ব্বদাই তাহার মনে পড়িত, এবং তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইত। পাগলের চরিত্র পূর্ব্বেই কতকটা আলোচিত হইয়াছে। প্রকাশকে সৎপথে আনিবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাণী তাহার প্রাণস্পর্শী হয় নাই; শেষে কিন্তু প্রকাশ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিল। তাঁহাকে প্রসন্নকুমারকেও উপদেশ দিতে শুনি,—'এ সংসারে কাজ করিবার কথা—কাজ করো। কাপুরুষে পরের আশা ভুলে আপনার আশা নিয়ে বিব্রত হয়।' বাস্তবিকই পরের ভরসায় মর দিনে যত শান্তি পাওয়া যায় তত শান্তি আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। স্বার্থপরতার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার ইহা অমোঘ অস্ত্র।

শান্ত সমাহিত চিত্ত হরমণির হৃদয়ের চাঞ্চল্য কেবল মাত্র একদিন দেখা গিয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কের ষষ্ঠগর্ভাঙ্কে তাহার স্বগতোক্তি হইতে জানিতে পারা যায়,—'একে দেখে আমার মনে নানা ভাবের উদয় হয় কেন? কে—এ? এ কি কোন ছদ্মবেশী দেবতা!' তাহাকে নিম্নলিখিত গান গাহিতে শুনিয়া পাগলের দিকে যে তাঁহার একটা টান আছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

গীত।

'ধরি ধরি যেন মনে হয়ে যেন, ধরিতে তাহারে নারি
দেখা দিয়ে যায় আপনি লুকায়, আঁখি ভরে আসে বারি॥
বাসনা কত মানসে ভাসে, দিবানিশি ফিরি তাহারই পাশে,
অবশে যদি—আবেশে—পদে বিকাইতে চাহি তারি॥
তারি পানে প্রাণ টলিল, ধ্যান জ্ঞানে—তারে আপন বলিয়া জানে,
ফিরিতে সে নারে আপন পানরে, কেঁদে বলে আমারি॥'

অবশ্য এ টান ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় নয়—সহজ জ্ঞানের ফল। উচ্চ আদর্শের টান—আপন করিবার চেষ্টার—আত্ম সমর্পণের ইঙ্গিত নামান্তর। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে পাগল ও হরমণি উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথনটী হইয়াছিল—তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া উভয়ের চরিত্র আর একটু আলোচনা করিব।

হর। পাগল দাঁড়াও, কি ব'ল্‌বে বলেছিলে বল?

পাগল। আর কি ব'লবো—মাঝে মাঝে মরি আর জন্মাই, তা তো শুনেছ।

হর। তুমি প্রথম কি করে মলে।

পাগল। সে হাঁসপাতালে।

হর। বলো—বলো—হাঁসপাতালে কেন গিয়েছিলে?

পাগল। একগলা জলে দাঁড়িয়েছিলুম,—সাঁতার দিতে গিয়ে ডুবে গেলুম।

হর। একগলা জলে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

পাগল। দাঁড়াবো না; যে ক'রলুম যে।

হর। যে ক'রলে কি?

পাগল। কি আর, যে ক'রলুম।

হর। একগলা, জল কি?

পাগল। আজকাল যে দিন পড়েছে, যে ক'রলেই একগলা জলে দাঁড়াতে হয়।

হর। তোমার স্ত্রী আছে?

পাগল। সে বিধবা হয়েছে।

হরমণির জীবনের ঘটনার সহিত ঐক্য দেখিতে পাইয়া সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল—'সে কি? বলো, বলো—'

পাগল। আমি একলা জলে দাঁড়িয়েছিলুম—ভেবেছিলুম মাঝখানে গিয়ে ডুব দিয়ে তার জন্য মাণিক তুলবো। মাণিক তুললুম, তাকে দেবার জন্য আনছিলুম,—এমন সময়ে দেখি হাঁসপাতালে মরেছি; মরে পাগল হ'য়ে জন্মলুম।

পূর্ব্ব হইতে কোন্ অজ্ঞাত শক্তির বশে হরমণি পাগলের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহার স্বামীর অদৃষ্টের সহিত পাগলের অদৃষ্টের সমতা দেখিয়া তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'বলো—বলো—তুমি কে?'

ভাব-বিহ্বলার নিকট পাগল আর আত্মগোপন করিতে পারিল না, উত্তরে বলিল,—'হরমণি আর বলায় ত ফল নাই,—এখন আর অন্যপথ ত নাই—তবে আর কেন জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ?'

ভাবের আধিক্য বশে হরমণি তাহার হারাণ-মণিটী প্রাপ্ত হইয়া কেবলমাত্র 'প্রভু ইষ্টদেবতা' বলিয়াই মূর্চ্ছা গেল। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে পাগল তাহাকে বুঝাইয়া বলিল,—'হরমণি, হরমণি—কেন আত্মহারা হ'চ্ছ? আমরা যে পথে চলেছি, যদি ঠিক যেতে পারি, স্বর্গের উপরে যেথায় স্বর্গপুর মহাপুরুষগণের স্থান, সেথায় তাঁদের পদসেবা ক'র্বার জন্য ভগবান আমাদের নিযুক্ত ক'র্বেন। স্থির হও, যেথায় কাজ শেষ করো।' সংসারের জীবের পক্ষে ইহা কম ত্যাগ স্বীকার নয়—সম্মুখে সতী সাধ্বী পত্নী—অপর পক্ষে স্ত্রীর নিকট আদর্শ স্বামী উপস্থিত; কিন্তু মিলনের আশা—দৈহিক সম্ভোগলালসা বিসর্জ্জন দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। সম্মুখে স্বচ্ছ সলিলা প্রেম-তরঙ্গিণী প্রবাহিতা; কিন্তু উভয়ে তাহার নির্ম্মল সলিল আকণ্ঠ পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিবে না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু পাগল, হরমণির নিকট যে বিরাট্ আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহার আকর্ষণী শক্তিতে এবং পারত্রিক মঙ্গলের জন্য দৈহিক ও ইহকালের সুখ সে অনায়াসে ত্যাগ করিল। পতি দেবতার নিকট সে চাহিল, —'পায়ের ধূলো দাও, আমি পবিত্র হই।'

পাগল। তুমি পবিত্রা,—তোমায় পবিত্রা জেনেই গঙ্গার ঘাট থেকে তোমায় এনেছিলুম। তোমার অপকলঙ্ক শরতের মেঘের মত ভেসে গিয়েছে, তোমার নির্ম্মল জ্যোতিতে আমার হৃদয় উজ্জ্বল! যাও কাজ করো,—কর্ম্মভূমে অবকাশ তো নাই, যে কথাবার্ত্তা ক'বো।'

বাস্তবিকই ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি। কর্ম্মীরা এখানে আপনার স্বার্থকে—প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি বৃত্তিনিচয়কে যত সহজে বলি দিতে পারেন, অন্য দেশের লোকেরা তত সহজে পারেন না; কারণ এ দেশের ঐ মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শত শত কর্ম্মী জগতের সেবায় প্রাণ নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। সহজ দুর্ব্বলা রমণীর হৃদয়ে যদি অধিকতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাই আর অধিক সময় ব্যয় না করিয়া কথাটা বলিয়াই পাগল সেখান হইতে চলিয়া গেল। মনস্তত্ত্ববিশারদ গিরিশচন্দ্র যে বাস্তব চিত্র (realistic) এস্থলে অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা বড়ই উপভোগ্য।

হরমণি ও পাগল জগতের উপকারের জন্য তাঁহাদের প্রাণ-নিয়োজিত করিয়াছিল। জগতের পাপী তাপীর দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্যগ্র। মানব মনে বিবেক যেরূপ সৎপথে থাকিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দেয়, তাঁহারাও ঠিক সেইরূপ ভ্রান্ত মানবকে সত্যের পথে, ধ্রুবের পথে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র। ইংরাজীতে যাহাকে (Ministering angel,) বলে ইঁহারা ঠিক সেই শ্রেণীর লোক। ব্যথিতের দুঃখে কাতর হইয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ইঁহারা সকলকেই আশ্রয় দিয়া থাকেন। সেবা-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ইঁহারা বদ্ধপরিকর। পাগল কর্ম্ম করিবার জন্য পাগল সাজিয়াছিল। তিনি একজন বড় সওদাগর। সামান্য শাক সব্জী বিক্রয় করিয়া আপনার বুদ্ধিবলে ও সততায় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

কবিবর গিরিশচন্দ্র পাশ্চাত্য জগতের Foundling home, Nursing home বা Maternity home প্রভৃতি যে সকল অনুষ্ঠান আছে তাহাদের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিতও এ নাটকে করিয়াছেন। সুখের বিষয় প্রায় গোরার নবধীপ ধামে 'মাতৃমন্দির' নামে এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। আশা করি বাঙ্গালার জেলায় জেলায় এইরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হউক। ভ্রান্ত রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জাতকের কোন দোষ ত নাই। তাহাদের শিক্ষার প্রতি অবহিত হওয়া সকলের কর্ত্তব্য। সমাজে সুষ্ঠুভাবে যাহাতে তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা উচিত।

কুলপথগামী রমণী দিগের প্রতি ও সমাজের যে একটা দায়িত্ব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহাদের সম্বন্ধে যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি।

কবিবর বিলেত ফের্ত্তাদের মন্দ দিকটাই আলোচ্য নাটকে দেখাইয়াছেন। ইহাঁদিগকে সমাজের ঘৃণিত জীব করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার কথায় বলি,—

'আধ বিলাতী আধ দিশী ছাঁ
যো আঁসলা নাচন কোঁদন,
ভাবি তাই ন্যাজ কেন নেই,
এইটে তো ভুল বিধাতার॥'

ইন্দ্রিয় দাস মিঃ বাসুর অন্যান্য চরিত্রের আলোচনা না করিয়া, কেবলমাত্র জ্ঞানদাস বাবুর উপদেশ যাহা তাহার জীবনকে অন্যপথে চালিত করিয়াছিল তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শুধু মুখের কথায় মিঃ বাসুর জীবনের পরিবর্ত্তন বোধ হয় সাধিক হইত না, যদি না তাহার দেনাও জ্ঞানদাস বাবু অযাচিতভাবে পরিশোধ করিবার উপায় করিয়া দিতেন। কথাটী এই:—'মিঃ বাসু তোমার টাকা নাও। তুমি এক-জন মাতাল লোকের ছেলে,—একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে? এই অসৎ কার্য্যে যে সব টাকা খরচ কচ্ছ,—এতে সহস্র সহস্র লোকের জীবন রক্ষা করতে পারতে। কিন্তু তোমার অপরাধ কি দেখো —দেশের দুর্দ্দশা—বড় মানুষের ছেলের এ সব প্রবৃত্তি হ'লে অনাথা বিধবা খেতে পায়—দরিদ্র বালক স্কুলে প'ড়তে পায়,—দেশে বাণিজ্য বিস্তারে অনেক বেকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়। কিন্তু কি বিড়ম্বনা, এ সৎপ্রবৃত্তি বিরল। সৎপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে তোমার মত অনেকেরই পশুবৃত্তি প্রবল হয়।'

এইবার আমরা অন্যান্য চরিত্রের সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব। শুভঙ্কর মূর্খ গ্রহাচার্য্য। মানুষকে ঠকাইয়া জীবিকার্জ্জন করে, কিন্তু তাহার ভগ্নী চিত্তেশ্বরীর চরিত্র জঘন্য। চিত্তেশ্বরী প্রফুল্লের 'জগদম্বিরি' নূতন সংস্করণ মাত্র।

প্রসন্নকুমারের বিধবা পুত্রবধূ নির্ম্মলা হিন্দু সমাজের আদর্শ বিধবা-ব্রহ্মচারিণী। বাঙ্গালী সংসারকে ইহারাই ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বাল-বিধবা বুঝিয়াছিল স্বামী তাহার ইষ্ট দেবতা। তিনি শরীরী হইয়া উপস্থিত থাকুন্ আর নাই থাকুন্ তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁর প্রত্যক্ষ সেবা ও মনে মনে সেবা এই দুই সেবার ভিতর পার্থক্য কিছু নাই। বিলাস-বঞ্চিতা পুত্রবধূকে দেখিয়া যখন তাহার শ্বশুরের প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তখন নির্ম্মলা তাহাকে বলিয়াছিল,—'কেন বাবা তুমি আকুল হচ্ছে? আমি বাড়ীর বড় বউ,—আমার সংসার, আমি এখন সংসার ক'র্‌বো, আমি ঘরকন্না বজায় ক'র্‌বো, দেওরকে দেখ্‌বো, জাইঝুড়ো ননদকে দেখ্‌বো, তোমাদের দেখ্‌বো, এখন আমি তোমাদের বেটা বউ একত্রে। চাকর লোকজনকে দেখ্‌বো, এই কাজ আমার ইষ্টদেবতা আমায় দিয়ে গেছেন। আমায় তিনি পরশ ক'র্‌তে লুকিয়ে আছেন—দেখা দিচ্ছেন না, দেখ্‌ছেন আমি তাঁর মনের মতন কাজ ক'র্‌তে পারি কি না। যে দিন আমার কাজ ফুরোবে, সেদিন আমি ক্লান্ত হ'বো,—সেই দিন তিনি আমায় আদর করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।' এই বিরাট আদর্শ হিন্দু ভারতের নিজস্ব।

হিন্দু বিধবার এই আদর্শ যে কোন কারণেই হউক অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে এবং সমাজে যে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন না, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সকলের প্রতীকার-কল্পে বলিতে পারা যায় যে, বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ইহা যখন শাস্ত্র ও নীতি সঙ্গত তখন কেবলমাত্র বহুদিন হইতে এ আচার যে কোন কারণে বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া এখনও যে বন্ধ থাকিবে তাহারও কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। অনুভূতির দিক হইতেও দেখিতে গেলে বাল-বিধবার প্রতি যে কঠোর ব্যবহার করা হয় তাহা প্রসন্ন বাবুর কথায় বলিতে গেলে 'বালিকা হত্যা' নয় ত কি?

বাল-বিধবার বিবাহ প্রচলিত হউক আর নাই হউক তাহা লইয়া অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। বহু প্রাচীন আচার ব্যবহার বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে, আবার অনেক নূতন আচার প্রচলিত হইয়াছে। এ আচারও যখন ন্যায্য যুক্তিসঙ্গত তখন সমাজে চলিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ফলশ্রুতি স্বরূপে গিরিশচন্দ্র আমাদিগকে কবি-কঙ্কণের কথার পুনরুক্তি করিয়া যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহার দিকে অবহিত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য—

"অবলা জনের জাতি
রক্ষা পায় অনেক যতনে।"

নারীর অধিকার লইয়া আজকাল বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে—তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার পান তাহাতে ক্ষতি নাই; বরং ঐরূপ পাইতে দেখিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব। আর যাহারা ঐরাবতের ন্যায় তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়ার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছেন, তাহাদের অবস্থা ভাবিয়া আমরা চিন্তিত। কিন্তু আমাদের যে তাঁহাদের উপর একটা কর্ত্তব্য আছে সেটাও ত ভুলিলে চলিবে না—আমাদের ও সে কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইলে প্রত্যবায় আছে। 'অবলা জনের জাতি (ধর্ম্ম) রক্ষা পায় যে অনেক যতনে' এটা বড় সত্য কথা। যদি প্রসন্নবাবু বা তাহার পত্নী সদ্য বিধবা কন্যা ভুবনমোহিনীর প্রতি ভাল করিয়া দৃষ্টি রাখিতেন—বিলাস-স্রোতে গা ভাসান দিতে যদি না দিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাহার চরিত্রের পতন হইত না। অবশ্য 'হয়ত:' শব্দ ইচ্ছা করিয়াই প্রয়োগ করিলাম, কারণ মানবের চরিত্রের পতন করে, কি ভাবে হয় তাহাও বলিতে পারা যায় না। মানব চরিত্র এক সরল খাতে প্রবাহিত হয় না। দুর্ব্বলা রমণীর যে কেবলমাত্র পদস্খলন হয় তাহা নয়—দেবতা ও দেবোপম চরিত্রের পুরুষের পতন ও হইয়াছে ও হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। রমণীর ধর্ম্মরক্ষার ভার তাহার অভিভাবকদিগের যেমন দৃষ্টি রাখা উচিত, পুরুষের চরিত্রও যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার জন্যও পুরুষের মাতা-বা মাতৃস্থানীয়া রমণীগণের, ও পত্নীর ও ভগ্নীর চেষ্টা থাকা একান্ত আবশ্যক। উভয়ের দোষ গুণের সমালোচনা অন্যের করা উচিত। এক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের সহায়ক হইলে ফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য রমণীর ধর্ম্ম বা পুরুষের চরিত্রের বিশুদ্ধিতা রক্ষা তাহাদের নিজের উপর অনেকটা নির্ভর করে; কিন্তু মানব অবস্থার দাস তাহাও ত ভুলিলে চলিবে না। এই অবস্থার সঙ্গে প্রতিকূলতা করিতে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। এই অবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। উপদেশ ও যে অনেক স্থলে কার্য্যকর হয়, তাহার ও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য উপদেষ্টার আসন যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহাদের চরিত্রবল থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত শুধু কথার উপদেশ অপেক্ষা কার্য্যে—দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া দিতে পারিলে বেশী ফল লাভ করিতে পারা যায়।

(ক্রমশঃ)

কলঙ্ক

(শ্রীগিরিজাকুমার বসু)

আমি তোমার কলঙ্ক সই, আমায় রেখে অঙ্কে চেপে
দিও তোমার হাসির আলো ছড়িয়ে বঁধু ভুবন ব্যেপে;
আমার তরে হচ্চে তোমার শুনতে যাদের নিন্দাবাণী
বোলো তাদের তোমার বুকেই জড়িয়ে আছে তোমার গ্লানি
বোলো তোমার ডাগর চোখের কালো তারা আমিই বঁধু,
তোমার ফৌল্লপটলেরি আমিই সখি নিবিড় মধু,
তোমার হৃদিমুক্তামাঝে আমিই বুলাই নীলের তুলি
সোনার থালার কোলে তোমার চিরায়তের লৌহ-কুলি।
ওগো তুমি জানিয়ে দিও, জানিও দিও সুবায় প্রিয়ে,
গোধূলিরে সাজাই আমি সন্ধ্যাতারার টিপ্‌টি দিয়ে
বসুশ্রীবার শোভা আমি, টেকা খোঁপা এলো চুলের;
রাধার গায়ের নীলাম্বরী—শ্যামের রেখা সাগর-কূলের।

প্রজাপতির দৌত্য

(বড় গল্প)

[শ্রীঅজয়কুমার সেন]

(১)

অতি প্রত্যূষে বাসা হইতে বাহির হইয়া দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত চরণে ও অবসন্ন-চিত্তে রমেণ যখন বাসায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া বৃদ্ধ ভৎর্সনার সুরে বলিলেন, "এতটা বেলা পর্য্যন্ত বন্ধুদের বাসায় বাসায় ঘুরে না বেড়িয়ে সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে নিলে ভাল হয় না ?"

মার কথার উত্তরে কোন জবাব মাত্র না দিয়া সে বলিল, "মা, তপেন আজ সকালে এসেছিল ?"

বিস্মিত হইয়া তিনি বলিলেন, "কই তাকে ত আজ দু'দিন ধরে দেখ্‌তে পাই নি। তুই সব বন্ধুর বাসা বেড়িয়ে এলি অথচ তার বাসায় একবারও যেতে পার্‌লি না! আচ্ছা, রমেণ, তুই দিনকে দিন কি রকমের হোয়ে যাচ্ছিস্ বল্‌ত ?"

তাঁহার এই কথাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া, মনে মনে সে ভাবিতে লাগিল ; তাইত তপেন কেন আজ দু'দিন হোল আস্‌ছে না। সে কি তবে আমাদের উপর রাগ কোরেই আস্‌ছে না, না, অন্য কোন কারণ আছে !

তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, তাহার মা বলিলেন, "বিকাল নাগাদ তার ওখানে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে আসিস্, আর বলে আসিস্ সে যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে। দু'দিন হোল তার কোন সংবাদ না পেয়ে মনটা বড়ই খারাপ হোয়ে আছে।" এই বলিয়া কিয়ৎদূর গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আর শুয়ে থাকিস্‌নে বাবা, ওঠ্, উঠে নেয়ে খেয়ে নে — আর কত বেলা কোর্‌বি বল্‌ত ?"

"না মা, এই উঠ্‌ছি" বলিয়া সে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল।

ঘরের বাহির হইবামাত্র চাকর আসিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠি দেখিয়া তাহার মাতা ব্যগ্র-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি রে ?"

"আমার চিঠি।"

"কোথা থেকে এল ? অনেকদিন হোল শেখরের কোন খবর পাই নি!" বলিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে সংবাদের আশায় রমেণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমেণের চিঠি পড়া শেষ হইয়া গেলে, পুনরায় তিনি বলিলেন, "কে লিখ্‌ছে, বল্‌লি না ?"

রমেণ বলিল, "বর্দ্ধমান থেকে বৌদিদি আমাদের যেতে লিখেছেন ; সেখানে একটা প্রকাণ্ড স্বদেশী মেলা বস্‌বে তাই দেখ্‌তে।" কথা শুনে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বলিলেন,—

"তবে তারা সব ভাল আছে—কেমন রে ? তা বেশ ত, তুই আর তপেন না হয় গিয়ে দেখে আয় না ?"

"তাই যাব" বলিয়া সে স্নানের জন্য নীচে নামিয়া গেল।

সমস্ত দিনটা তপেনের প্রতীক্ষায় কাটাইয়া দিয়াও যখন তাহার আসিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না ; তখন সে তাহার খোঁজে মেসে গিয়া উপস্থিত হইল। নীচে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, উপরে উঠিয়া দেখিল, তাহার ঘরের দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত। সে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া

দেখিল, তপেন সামনের বারান্দায় বসিয়া একমনে গুণ গুণ করিয়া কি যেন একটা গান গাহিতেছে। সে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথের সেই চির-প্রসিদ্ধ মধুর গানটি শুনিতে পাইল। গানটি একবার গাওয়া হইয়া গেল, তাহাতে তৃপ্তি হইল না দেখিয়া, পুনরায় সে অত্যন্ত তন্ময়ের সহিত আবার সেই গানটিই ধরিল,—

"আমার নিতি সুখ ফিরে এস,
আমার চিরদুঃখ ফিরে এস,
আমার সব সুখদুঃখ-মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস।"

গানটি যখন ক্রমশঃ করুণ, করুণতর, করুণতম হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন রমেন আর আত্ম-গোপন করিতে না পারিয়া তড়িৎ গতিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ব্যগ্র-কণ্ঠে বলিল, "ভাই কার প্রতীক্ষায় তুমি তোমার তৃষিত তাপিত-হৃদয় লইয়া বসিয়া আছ। কে তোমার সেইজন—যার জন্য তোমার এত ব্যাকুলতা ?" কথাটা বলিয়া অসম্ভব রকমে তাহাকে চকিত করিয়া তুলিল।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে অশনিপাত হইলে লোকে যেমন সহসা চকল ও স্তব্ধ হইয়া উঠে, তেমনি রমেণের কথাতে তপেন ও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। সে তখনি ঈষৎ জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "কতক্ষণ হোল এসেছ হে—এতক্ষণ ডাকনি কেন ?"

ব্যঙ্গ মিশ্রিত সুরে রমেণ বলিল, "তুমি এতক্ষণ কি তোমাতে ছিলে যে তোমায় ডাক্‌ব ?"

"কেন, আমি কি সমাধিগ্রস্ত হোয়ে ছিলাম নাকি হে ?" বলিয়া জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"আমি মাকে গিয়া তোমার কথা বোলে দেব।" এই বলিয়া সে ঘরখানিকে উচ্চ হাসির রোলে ধ্বনিত করিয়া তুলিল।

"যা, যা, আর বাজে বকিস্ না—আমার শরীরটা ভাল ছিল না, তাই…"

"শরীর ভাল না থাকার লক্ষণ বুঝি এই ?"

"না, না, এমনি মনের আবেগে গাইছিলাম—এতে কি কোন দোষ আছে ?"

"না, দোষ আবার কি—তবে এই দু'দিন আমাদের বাসায় যাওনি কেন ? এও কি শরীর ভাল না থাকার কারণ না কি ?"

"বাস্তবিকই আমার শরীর খারাপ ছিল।" বলিয়া সে রমেণের দিকে চাহিল।

"এর বিচার আর আমি কি কোর্‌ব—মার কাছে গেলেই সব ঠিক হবে।" বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া উঠাইয়া লইয়া, দুজনে ভ্রমণে বাহির হইল।

তারপর তাহারা দুই বন্ধুতে সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া বাসায় ফিরিল। রমেণের স্নেহময়ী মাতা তপেনকে অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "বাবা তপেন, এই ক'দিনের মধ্যে তোমাকে এক বারও দেখ্‌তে পাই নি, তোমার শরীর ভাল আছে ত ?"

এই কথাটার কি উত্তর দিবে তপেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, নীরব হইয়া রহিল। তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, রমেণ মৃদু হাসিয়া বলিল, "যার এমন সুস্থ সবল শরীর, তার আবার অসুখ হবে—অসুখ সাধ্য কি যে তপেনের কাছে এগোয় মা ?"

রমেণের কথা শুনিয়া তাহার মা গা-টা ছম্ ছম্ করে উঠ্‌লো ; একটু জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "যা বাছা, ওকে আর বিরক্ত কোরিস্ না। কি এমন ওর শরীর তুই দেখ্‌ছিস্ যে যখন—তখন সময়—অসময় অমন কোরে বলিস্ ?"

মৃদু হাসিয়া রমেণ বলিল, "তপনের এই শরীর যদি মা কিছুই না হয় ; তবে আমাদের এই শরীর নেই বোল্‌লেই চলে ?"

"বাবা তপেন, তোমাদের জন্য আমি চা তৈয়ারী কোরে রেখে দিয়েছি—যাই নিয়ে আসি!" বলিয়া তিনি চা আনিবার জন্য রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কি স্নেহময়ী ও মহিমময়ী এই রমেশের মা! তপেন অনেকদিন বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছে—ইনি মানবী না দেবী!

দুইজনের হাতে গরম গরম দুই কাপ্ চা দিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা তপেন, আজ বৌ-মা চিঠি লিখেছেন তোমাদের সেখানে যেতে।"

তপেন রমেশের মাকে মা বলিয়া ডাকিত। সে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল, "কি জন্য মা?"

"সেখানে কি একটা মেলা বোস্‌বে তাই দেখ্‌বার জন্য।"

"তা বেশ ত, চল না হে রমেশ—একদিন যাওয়া যাক্।" এই বলিয়া সে তাঁহার দিকে চাহিল।

রমেশ কহিল, "আমার কি, আমি সব সময়েই যেতে প্রস্তুত।"

"আমি ও কোন অপ্রস্তুত।"

এমন সময় রমেশের মাতা বলিলেন, "তা হোলে কালই যা না কেন রমেশ সকালের ট্রেণে।" এই বলিয়া তিনি খাবার আনিবার জন্য গৃহের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

রমেশ বলিল, "তবে কালই যাওয়া ঠিক্ কেমন?"

"নিশ্চয়ই" বলিয়া সে সদ্য আনীত খাবারের থালায় মন দিল।

(২)

নির্দ্দিষ্ট দিনে দুই বন্ধুতে ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল, ষ্টেশনে অসম্ভব জনতা। এই দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে রমেশ বলিল, "এই ভীড়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।"

রমেশের কথা শুনিয়া তপেন উচ্চকণ্ঠে বলিল, "অসম্ভবকে সম্ভব কোরে নিতে হবে?" এই বলিয়া সে বিপুল জনসঙ্ঘের দিকে নির্নিমেষের জন্য দেখিয়া লইল।

তপেনের অদম্য উৎসাহ দেখিয়া রমেশ কিঞ্চিৎ সাহস পাইল বটে, কিন্তু মনে-প্রাণে সে তাহাকে নির্ভর করিতে পারিল না। তাহার কথার কোন নড়চড় হবে না বুঝিয়া, রমেশ বলিল, "তপেন, তুমি গিয়ে তবে টিকিট কোরে নিয়ে এস ত ভাই আমার ধারণা ও সব হবে না।"

সেও তখনই মনিবন্ধে ঘড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আর ত দেরী করা চলে না—টিকিটটা কোরেই আনি।" এই বলিয়া জনতার মধ্যে সে ঢুকিয়া গেল।

রমেশ আর কি করিবে, সে একটি সুটকেশের উপর বসিয়া যাত্রীদিগের আকুলতা দেখিতে লাগিল। যখন সে উহাতে তন্ময় হইয়া আছে, এমন সময় হঠাৎ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে তপেন আসিয়া বলিল "রমেশ, ওঠ, আর দেরী করা চলে না। আজ স্থান পাওয়া বড়ই কষ্টকর রে।" এই বলিয়া সে তীরবেগে জিনিষপত্র সব কাঁধের উপর ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।

ষ্টেশনের প্লাটফরম মথিত করিয়া তাহারা দুই বন্ধুতে কোন রকমে একটি গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নিজেদের অত্যাবশ্যকীয় জিনিষগুলি লইয়া বাকি সব গুছাইতে গুছাইতে তপেন গম্ভীর স্বরে বলিল "আজকের এই দিনে কি রকমে যে কার্য্যোদ্ধার ক'রতে হয়, তা' দেখলি ত?"

উত্তরে রমেশ বলিল, "একথা ঠিক যে তুমি না থাকলে আজ আমাদের যাওয়াই হোত না।" এ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

পুনরায় তপেন বলিল, "তোমার মত পলকা শরীর নিয়ে কোন কঠিন কাজ করা চলে না। শরীরকে কত তোয়াজে রাখ্‌তে হয়, তার তুমি কি জান্‌বে বল?" এই বলিয়া সে সর্ব্বোৎফুল্লনয়নে তাহার দিকে চাহিল।

যথা সময়ে গাড়ী যাত্রী সম্ভার লইয়া ছাড়িয়া দিল।

গাড়ী আসিয়া যখন একটি ছোট ষ্টেশনে

লাগিল, তখন জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরীর হাতে সযত্নে ধরিয়া বলিলেন, "সযূ, এদিকে আয়—এই গাড়ীতে যাওয়া আছে।" এই বলিয়া যে গাড়ীটা সাম্‌নে পাইলেন, তাহার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইলেন।

আরোহীকে আসিতে দেখিয়া, গাড়ীর একজন আরোহী তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এ গাড়ীতে স্থান নেই মশায়, অন্য গাড়ীতে যান?"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধটি হতাশ হইয়া পড়িলেন। কোন উপায় নাই দেখিয়া তখন করুণ-কণ্ঠে বলিলেন, "একটু স্থান দিন মশায়—আর ত সময় নাই যে অন্য গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ব?"

"না মশায়, এখন ও গাড়ী ছাড়তে বিলম্ব আছে; অন্য গাড়ীতে দেখুন।" এই বলিয়া সেই আরোহীটি যেটুকু বসিবার স্থান খালি ছিল, সেই স্থানে নিজের দেহভার এলাইয়া দিল।

যখন এই প্রকারের কথা বার্ত্তা চলিতেছিল, হঠাৎ তখন তপেনের দৃষ্টি সেইদিকে পড়িল। সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজার নিকটে আসিয়া বৃদ্ধকে বলিল "ওঁকে নিয়ে আপনি ওই গাড়ীতে উঠুন। এখানে অনেক জায়গা আছে।"

একটি অপরিচিত যুবকের মুখে স্নেহের আহ্বান শুনিয়া, বৃদ্ধটি স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে তপেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বাবা, আমাদের মত কি স্থান হবে? উনি যে বোল্‌ছিলেন, এ গাড়ীতে স্থান নেই—তবে কি কোরে স্থান হবে বাবা?"

স্থান নাই শুনিয়া তপেন সেই আরোহিটির প্রতি অবজ্ঞা ভরে চাহিয়া তাহাকে বলিল, "মহাশয়! আপনি উঠুন ত; তারপর জায়গা কাছে কি নেই, তা' আমি বুঝ্‌ব'খন।" তারপর রমেনকে ডাক দিয়া সে বলিল, "শীঘ্র নীচে গিয়ে জিনিষগুলি তুলে দাও—গাড়ী ছাড়্‌তে আর বেশী দেরী নেই?" এই বলিয়া রমেশকে জোর করিয়াই গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল।

সযূকে ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া, তপেন অগত্যা নিজেই নীচে নামিয়া গিয়া সেই অপরিচিত কিশোরীর এবং বৃদ্ধের হাত ধরিয়া অতি যত্নের সহিত গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিল। এত লোকের সাম্‌নে এক অপরিচিত লোক আসিয়া সযূর হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়াতে, তাহার গা লজ্জায় কাঁটা দিয়া উঠিল। সে তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল—কি লজ্জার কথা!

গাড়ীর একপাশে সযূকে অধোবদনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার দাদামহাশয় আনন্দোৎফুল্ল অন্তঃকরণে বলিলেন, "দিদি এখন লজ্জা কর্‌বার সময় নয়। ওঁরা যদি আর এই বিপদে রক্ষা না কোর্‌তেন, তা' হোলে সারাদিনটা কি কষ্টেই আমাদের যেত বল দেখি?" এই বলিয়া তিনি সেই অপরিচিত যুবকদ্বয়ের কার্য্যের ক্ষিপ্রতা দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

যখন একে একে সমস্ত জিনিষগুলি গাড়ীতে তোলা শেষ হইয়া গেল, তপেন গাড়ীতে উঠিয়া তাহাদিগকে একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন—ওদিকে গিয়ে বসুন না?" এই বলিয়া সে একবার নিমেষের মধ্যে সেই কুন্দেন্দুযবনা ব্রীড়াবনতা সুখী সযূর দিকে চাহিয়া লইল।

তপেনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধটি সযূকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সযূ, চল না—ঐদিকেই যাই।" বলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দাদামহাশয়ের কথায় সযূ নম্র কণ্ঠে বলিল, "ওদিকে যাবার দরকার কি দাদামহাশয়,—আমরা ত এখানে বেশ আছি; মিছামিছি ওঁদের কষ্ট দেওয়া কেন?"

সযূর কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "উনি যখন বোল্‌ছেন, তখন আর যেতে বাধা কি? সযূ,—চল।" এই বলিয়া তিনি একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সরযূকে নড়িতে চড়িতে না দেখিয়া, তপেন আগ্রহের সহিত কহিল, "আপনি ঐখানে গিয়ে বোস্‌বেন চলুন—দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ থাক্‌বেন বলুন ত? আর দেরী কোর্‌বেন না চলুন।"

পরনারীর সহিত অবাধে কথা কহিতে দেখিয়া, গাড়ীর মধ্যে অজ্ঞাত যাত্রীরা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল, এই দেখিয়া তপেন তাহাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

(৩)

যে জায়গাটায় বসিয়াছিল। সেইখানে বসিয়া পড়িয়া সরযূর দাদামহাশয় তপেনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা এখন বোস্‌বেন কোথায় বলুন ত। আমরা দুইজনে ত আপনাদের সব যায়গা দখল কোরে বসেছি?" এই বলিয়া তিনি যেন একটু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

অনুযোগের সুরে তপেন তখন বলিল, "আপনি আমাদের ঠাকুরদাদার বয়সী আপনি যদি ঐ রকম কোর্‌বেন, তবে আমরা আর এ গাড়ীতে থাক্‌ব না, নেমে অন্য গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ব।"

তপেনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধটি একগাল হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দাদা, তবে আমি আর কিছু বোল্‌ব না, এই চুপ্ কোর্‌লাম।"

সরযূ তখন দাদামহাশয়ের নিকটে সরিয়া গিয়া তাঁহার কানে কানে মৃদু স্বরে বলিল, "ওঁদের বলুন না কেন এই খানেই বোস্‌তে, যায়গা ত অনেক আছে। অনর্থক ওঁরা আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন?" এই কয়েকটি কথা দাদামহাশয়কে বলিয়া ফেলিয়া তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

তখন তিনি তপেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ সরযূর ইচ্ছা যে তোমরা দুইজনেই বোস্—জায়গায় ত অকুলান হবে না; এই ত সরযূর পাশে কত যায়গা রয়েছে। বিদি এদিকে একটু সরে আয়।"

"আমরা ত এতক্ষণ বোসে বোসেই আস্‌ছি।" এই বলিয়া নীরব হইয়া পুনরায় তপেন বলিল, "আপনারা দেখ্‌ছি আমাদের না বসিয়ে ছাড়্‌বেন না। ওহে রমেন, এস একটু না হয় বসা যাক্।" তপেন নিজে গিয়া সরযূর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

তপেন সরযূর পার্শ্বে বসিয়া তাহার চুলের বিচিত্র সুরভি, কাপড়ের উস্‌খুস্ শব্দ, অলঙ্কারের মৃদু নিক্কণ প্রভৃতি অনুভব করিতে লাগিল তাহার বোধ হইতে লাগিল সে যেন তার প্রাণের মৃদু মধুর স্পন্দন ও শুনিতে পাইতেছে। কিছুক্ষণ এই রূপে কাটিয়া গেলে, সে বৃদ্ধের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা মহাশয় আপনারা কোথায় যাবেন?"

বৃদ্ধ এই যুবকের পরকে আপনার করিবার ক্ষমতা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমরা যাব দাদা বর্দ্ধমানে।"

সবিস্ময়ে তপেন বলিল, "আমারা ত যাচ্ছি বর্দ্ধমানে—বর্দ্ধমানের কোন স্থানে আপনারা যাবেন?"

বৃদ্ধটি নিজের গন্তব্যস্থান বলিলে, "তপেন রমেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে রমেন, দাদার বাসার কি খুব নিকটে?"

তপনের কথার উত্তর দিয়া, রমেন বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া কহিল, "অনাথবাবুর বাসায়—তিনি আপনার কে হন?"

"অনাথ আমার ভাইপো হয় বাবা!"

"অনাথবাবুর বাসা আমাদের বাসার খুবই নিকটে যা'হোক বাসায় গেলেই সব জান্‌তে পার্‌ব। এই বলিয়া সে মৃদু হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

পুনরায় তপেন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বর্দ্ধমানে বেড়াতে যাচ্ছেন?"

"না বাবা, এ বয়সে বেড়াবার সখ আর নেই—

সে সব সাধ কোন্‌দিন ঘুচে গিয়েছে।" এই বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কাপড়ের প্রান্ত দিয়া চক্ষুকে মুছিয়া লইলেন।

বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া তপেনের মন সহসা উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, না জানি কত অক্ষন্তদ বেদনা রাশি এই বৃদ্ধের জরাজীর্ণ বুকের পাঁজরের মধ্যে লুকাইয়া আছে। সে তাঁহাকে আর কিছু প্রশ্ন না করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

সকলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধটি বলিতে লাগিলেন; যখন আমার একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ অকালে আমাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেল—তখন সরযূর বয়স তিন বৎসর। এই পিতৃ-মাতৃহীন বালিকাকে লইয়া যখন ভাঙ্গা হাটে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আর সংসারে মন বসিল না। ভাবিয়াছিলাম—সরযূকে আর বিবাহ না দিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল আমার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহাকে রাখিব। কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। সরযূ দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পরিশেষে নিজের ভ্রম এবং প্রকৃতির লীলা বুঝিতে পারিয়া আমি আর কাল বিলম্ব করিলাম না। চারিদিকে পাত্রের জন্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম অবশেষে বৌমার পত্র পাইয়া বর্দ্ধমানে যাইতেছি।

এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার বুকফাটা কথাগুলি গাড়ীর ভিতর রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। রমেন ও তপেন নির্ব্বাকের মত কেবল শুনিল।

(৪)

বর্দ্ধমান আসিতে আর বেশী দেরী নাই দেখিয়া, রমেন মৌনতা ভাঙিয়া বলিল, "তপেন এইবার নাম্‌তে হবে; গোছগাছ করা যাক্।"

রমেনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, এবারে কি বর্দ্ধমান?"

"এটার পরেই বর্দ্ধমান ষ্টেশন—এখনও দেরী আছে—তাড়াতাড়ি করবার কোন্ দরকার নেই। ষ্টেশন এলে আমরাই……" বলিয়াই রমেন থামিয়া গেল।

রমেনের কথা শুনিবামাত্র, সরযূ নিজেদের জিনিষপত্র ঠিকঠাক করিবার জন্য উঠিয়া পড়িল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া তপেন সবিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "এখনও দেরী আছে—আপনি অত ভাব্‌ছেন কেন? আমরা থাকতে কি আপনার জিনিষ সব পড়ে থাক্‌বে?" বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"না দাদা, এটা কি একটা কথার কথা হোল" এই বলিয়া বৃদ্ধটি প্রাণ খুলিয়া একবার হাসিয়া লইয়া, তারপর তপেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা, এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে রইলুম অথচ তোমাদের কোন পরিচয় পর্য্যন্ত নেওয়া হোল না। কি লজ্জার কথা! বুড়ো মানুষ কিনা "সব সময় সব কথা মনে থাকে না।"

রমেন হাসিয়া কহিল, "আমার এই বন্ধুটির নাম শ্রীতপেন্দ্রকুমার বসু এম, এ। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বলরত্ন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে যেমন আরো বলিতে যাইবে, এমন সময় তপেন উঠিয়া গিয়া তাহাকে একটু মৃদু ধাক্কা দিয়া বলিল, "আর তোমায় বেশী বাজে বোকতে হবে না—ঢের হোয়েছে, একটু থাম।"

তপেনের এই পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধটি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বাবা, ধন্য তোমার গর্ভধারিনী, মা কথাটা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া তপেন কহিল, "উনি ত আমার মুখেও আপনার কাছে সাত কাহন বোল্‌লেন, কিন্তু আমার বন্ধুটীও বড় ফেল্‌না যান না, ইংরাজি-সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।"

দুই বন্ধুর সবিশেষ পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধটি আনন্দে

অধীর হইয়া গদ্‌গদ-স্বরে বলিলেন, "দাদা, আশীর্ব্বাদ কোরছি, তোমরা চিরজীবী হও। এই রকমের শিক্ষিত না হোলে কি এমন সুন্দর স্বভাব হয়!"

কথায় কথায় কখন যে গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেশনের প্লাটফরমের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়াছে, সে খেয়াল তাহাদের একেবারেই ছিল না। সরযূকে উস্‌খুস্ করিতে দেখিয়া তপেন সবিস্ময়ে কহিল, "এটা কোন ষ্টেশন রমেণ?"

বাহিরে তাকাইয়াই রমেণ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এযে বর্দ্ধমানই বটে। তপেন শীঘ্রির শীঘ্রির ওঠ—সব গোছা—সব গোছা।"

বৃদ্ধটি বিষম লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "দেখ দাদা, বুড়োর পাল্লায় পোড়ে এখন তোমাদের কি অবস্থা!" এই বলিয়া হোঃ হোঃ করিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

তপেন উত্তরে বলিল, "গাড়ী এখানে অনেকক্ষণ থামে, সেজন্য আপনার কোন ভাবনা নেই।"

গাড়ী আসিয়া প্লাটফরমে লাগিলেই, তপেন রমেণকে বলিল, "তুমি সব জিনিষ পত্র নামাবার বন্দোবস্ত কর—আমি এঁদের এক এক কোরে নামাই।

"না দাদা, তোমরা আর কত সাহায্য কোরবে, আমিই ধীরে সুস্থে সব নামিয়ে নিচ্ছি।" বলিয়া বৃদ্ধটি চুপ করিলে, সরযূ নিজেদের জিনিষ তুলিবার মাত্র, তপেন তাহার হাত হইতে পুঁটুলিটা ছিনাইয়া লইয়া, একপাশে তাহা রাখিয়া দিয়া বলিল, "আপনারা এখন নামুন—দেখ্‌ছেন ত কি রকমের ভীড়!"

দাদাশ্বশুরকে অন্যের সাহায্যে নামিতে দেখিয়া, সরযূ নিজে কি করিয়া নামিবে, এই ভাবিয়া সে চিন্তিতা হইয়া পড়িল। যখন আর অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া যেমন নিজেই গাড়ী হইতে নামিতে যাইবে; এমন সময় তাহার দাদা মহাশয় তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলে; তপেন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল আপনি আর যাবেন না—আমিই ওঁকে নামিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তপেন অগ্রসর হইয়া সরযূর মৃণালনিন্দিত বাহুলতাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কোন কষ্ট হয়নি ত?"

সরযূর উত্তর শুনিবার জন্য তাহার তৃষিত কর্ণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র একটী 'না' শব্দ শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারিল না।

সে যে সরযূর নিকট হইতে এইটুকু কথার প্রত্যাশী হইয়াছিল, তাহা নহে। সে মনে মনে কল্পনা করিয়াছিল, সরযূ প্রাণের ভাষায় হৃদয়ের ধন্যবাদ তাহাকে জ্ঞাপন করিবে, কিন্তু তাহার সে আশা মিটিল না।

একে একে সমস্ত জিনিষ পত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া ব্যগ্র-কণ্ঠে রমেণ বলিল, "একটু ভীড় কমুক তপেন, তারপর যাওয়া যাবে।"

ক্রমে ক্রমে লোকের ভীড় কমিয়া গেলে, চারিটি কুলীর মাথায় জিনিষগুলি চাপাইয়া দিয়া, তাহারা সকলে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাশেই গাড়ীর আস্তাবল হইতে দুইটি গাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়া, তপেন বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "আপনি এখন গাড়ীতে উঠুন।"

বৃদ্ধ গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে, সরযূ মন্থর-গতিতে অগ্রসর হইয়া একবার তপেনের দিকে প্রশান্ত-দৃষ্টিতে চাহিয়া, গাড়ীতে গিয়া কোন রকমে উঠিয়া বসিল।

তপেন গাড়ীর নিকটে অগ্রসর হইয়া বিদায় চাহিলে বৃদ্ধ মুখ বাড়াইয়া সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে আমাদের বাসায় আস্‌ছ দাদা?"

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সরযূর দিকে চাহিয়া তপেন কহিল, "যে দিন আপনি যেতে বোল্‌বেন, সেই দিনই আমরা যাব।"

এই কথা শুনিয়া হঠাৎ সরযূ যেমন মাথা তুলি ত

যাইবে, ঠিক সেই সময়ে তপেনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ও প্রশান্ত দৃষ্টি তাহার উপর ন্যস্ত দেখিয়া, সরযূ বড়ই লজ্জিতা হইয়া পড়িল।

তাহাকে তদবস্থা দেখিয়া তপেন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "কই, আপনি ত কিছু বোল্‌লেন না?"

কথাটা শুনিয়া সরযূর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে ভড়ের মত আড়ষ্ট হইয়া গাড়ীর মধ্যে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

(আগামী মাসে সমাপ্য)

কৈফিয়ৎ

(Emerson)

(শ্রীকালিদাস রায় বি, এ)

(১)

ভেংগে না আমায় নেহাৎ চাষাড়ে বুনো,
বনে বনে আমি কেবলি বেড়াই বলি',
হেসোনা হেসোনা সভ্য বাগাড়ে কুনো,
মিছে ফিরি নাক জঙ্গলে অলি গলি।
ডাকেন আমায় বনের দেবতা রাণী
তোষাদেরি লাগি বনের বারতা আনি।

(২)

দিও নাক গালি বলিয়া অকেজো কুঁড়ে
হৃদ নদী তীরে কেবলি বেড়াই বলি'
প্রতি মেঘখানি চলে' যায় যাহা উড়ে
আঁখি সীমা হতে তুথাই যায় না চলি;
আমার খাতায় একটি করিয়া তারা
আঁখর লিখিয়া দিগন্তে হয় হারা।

(৩)

বকা না আমায় পরিশ্রমীর দল,
অলস কুসুমে এত ভালবাসি বলি'
তোমরা বলিছ এতে কি হইবে ফল?
কিসের লাগিয়া এত ফুল এত কলি?
জান না ইহারা পুত প্রেম দিয়ে গড়া
প্রতি পাঁপড়িটি ভাবচিন্তায় ভরা।

(৪)

হেন ফুল নাই যাহার মর্ম্ম কোষে
গূঢ় রহস্য কিছু না বিরাজ করে।
হেন পাতা নাই যে না পুট তলে পোষে
ধাতার বারতা মনের শ্রুতির তরে।
হেন পাখী নাই যে না নিকুঞ্জে বসে'
গোপন একটি ইতিহাস নাহি ঘোষে।

(৫)

ফসল ফলিলে ভারে ভারে মুহে বও
বলদের পিঠে তোমরা ভূমির স্বামী,
একটি ফসল তোমরা কাটিয়া লও,
আর একটি যে সংগ্রহ করি আমি।
একটি গীতিতে পুঞ্জিত করে' লই,
সোনার ফসল শুভ্রতি উঠে অই।

বংশের কলঙ্ক

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু)

বিংশতি পরিচ্ছেদ

অনিলার সিদ্ধান্ত

সরোজ যাহা ভয় করিতেছিল তাহাই ঘটিল। বাবাজী একদিন কালীশঙ্কর বাবুর কাণে অরুণের কলঙ্কের কথা তুলিল এবং ভয় দেখাইল যে তিনি যদি তাঁহার কোনও একটা বাড়ীতে তাঁহার "পৌত্র" ও "পৌত্রের জননীকে" থাকিতে দেন ও মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তবেই মঙ্গল, নচেৎ ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়াইবে।

কালীশঙ্কর বাবু হতভম্ব হইলেন। প্রথমে ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাবাজীর উত্তরোত্তর চড়া কথা শুনিয়া প্রকৃতই ভীত হইলেন। বাবাজীকে বিদায় করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু মন অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া রহিল।

কালীশঙ্কর বাবু সরোজকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, সরোজ বয়সে বালক হইলেও অনেক পরিণত বয়স্ক লোক অপেক্ষা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। সরোজকে তিনি বাবাজীর কথা বলিলেন এবং কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করিলেন। সরোজ মহা মুস্কিলে পড়িল। সে তাঁহাকে বুঝাইল বটে যে, বাবাজী বেটা ছোটলোক পাজী, ওর কথা সব মিথ্যা, অরুণ কখনও অমন কাজ করিতে পারে না, ইত্যাদি, তথাপি বাবাজীর কথা মিথ্যা ইহা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারিল না। সরোজ বুঝাইল, বাবাজীকে আপাততঃ কিছু টাকা দিয়া হাতে রাখাই উচিত, তাহার পর অরুণ ফিরিয়া আসিলে বোঝাপাড়া করা যাইবে; তবে আপাততঃ এ বিষয়ে লেখালিখি করিয়া অরুণকে ব্যস্ত করিবার আবশ্যক নাই; ব্যস্ত করিলে সে যে কাজটা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছে, সেটা নষ্ট হইয়া যাইবে; রমেশেরও এই মত।

রমেশের নাম শুনিবামাত্র কালীশঙ্কর বাবু চমকাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কার মত ?"

সরোজ বলিল, "রমেশের। কেন, রমেশ ত' ভাল কথাই বলেছে।"

কালীশঙ্কর বাবু বলিলেন, "না, তা বলছি না, তা বলছি না, তবে রমেশ বলেছে, তাই কেমন সন্দেহ হয়। যাক্, তোমার কথামতই এখন কাজ করি, তার পর অরুণ এলে যা হয় করা যাবে। বুঝছি এতে পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, তবে উপায় নাই।"

সরোজের মনটা ঐ কথা শুনিয়া অবধি কেমন একটু সন্দেহাকুল হইয়া রহিল। রমেশের কথা ও বাড়ীর জেঠামণি এমন ভাবে বলিলেন কেন? ব্যাপার কি? একখানা চিঠি লইয়া সে অনবরত নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, আর এই কথা মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। একবার অস্ফুট স্বরে বলিল, "যাই দেখি, অনিলাকে একবার দেখাই, যদি সে কিছু বুঝতে পারে।"

অনিলা বাগানে একটা কুঞ্জের ভিতর প্রস্তর-বেদীতে বসিয়া পড়িতেছে, অমর প্রমুখাৎ এই সংবাদ অবগত হইয়া সরোজ দ্রুতপাদবিক্ষেপে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল অনিলা তন্ময় হইয়া একখানা পত্রপাঠ করিতেছে। সরোজের পায়ের সাড়া পাইয়া অনিলা চিঠিখানা লুকাইয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সরোজ বলিল, "এই যে অনিলা, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম। দেখ দেখি, এই পত্রখানার মর্ম্ম বুঝতে পার কি না।" এই কথা বলিয়া সরোজ ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল।

পত্রখানি হাতে লইয়াই অনিলার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সেখানি অরুণ লিখিয়াছে। পত্রখানি এই :—

ভাই সরোজ,

এত বড় একটা সুখবর বন্ধুকে দিলে কি কিছু ক্ষতি হ'ত? অপরের কাছে এ সুখের খবর আগে পেতে হ'ল, এই দুঃখ। যাক্, সুখী হও ভাই, ভগবান যে অমূল্য দান তোমায় দিচ্ছেন, তপস্যা করে লোকে তা পায় না। বন্ধুর আন্তরিক সমানুভূতি জেনো। বেশী লেখবার সময় হ'ল না।

ইতি তোমার হতভাগ্য
অরুণ।

অনিলা চিঠিখানি দুই তিন বার পাঠ করিল, বিস্ময়ে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষণপরে সে মৃদুস্বরে বলিল, "এখানা আমার কাছে দুদিন রাখবে সরোজদা? পরে ভাল ক'রে পড়ে জবাব দেবো।"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "ওখানি তোমাকে একবারেই দিলুম। যার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না, তা রেখে ফল কি।" এইবার সরোজ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "আজ তোমার সঙ্গে আমার খোলাখুলি কিছু কথা আছে বলেই ঐ চিঠির ছুতো করে এসেছি। আশা করি আমার কথাটা মন দিয়ে শুনবে।"

অনিলা ভয়চকিতনেত্রে সরোজের দিকে জিজ্ঞাসু হইয়া তাকাইয়া রহিল। সরোজ ধীরে ধীরে বলিল, "অনিলা, তোমাকে আমি এর আগে ম্যাপ আর ফটোর সঙ্গে অরুণের চিঠি কৌশল ক'রে দিয়েছিলুম কেন জান?"

অনিলা ঘাড় হেঁট করিয়া পায়ের আঙ্গুলে মাটী খুঁটিতে লাগিল। সরোজ বলিয়া যাইতে লাগিল, "দিয়েছিলুম, আমি তোমার মন জানতে পেরেছিলুম ব'লে।"

সরোজ আবার বলিতে লাগিল, "অনিলা, তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি সুশিক্ষিতা, নিজের ভাল মন্দ বোঝবার তোমার যথেষ্ট ক্ষমতা হয়েছে বলেই মনে করি। সুতরাং নিতান্ত শিক্ষানবীশ তরলমতি বালিকার মত লজ্জা করে নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পথে কাঁটা দিয়ো না, এই আমার অনুরোধ।

অনিলা অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি বলছ সরোজদা, কিছুই ত' বুঝতে পারছি না।"

সরোজ বলিল, "একে একে সব বোঝাচ্ছি। প্রথমেই বলে রাখছি, তোমার পক্ষে বড় কঠিন সমস্যার সময় এসেছে। এ সময়ে বালিকা সুলভ লজ্জা করলে সব দিকে মাটি হবে। দেখ, অরুণ আর তোমার পরস্পরের প্রতি মনের ভাব কি, তা আমি জেনেছি।"

অনিলা একবারে মাটীতে মুখ লুকাইল। সরোজ আবার বলিতে লাগিল, "কিন্তু তোমাদের দুজনেরই ঘোর বিপদ উপস্থিত। কি জানি কে অরুণের নামে গোপনে নিন্দাবাদ ক'রে কাকাবাবুর মন ভাঙ্গিয়েছে। তাই কাকাবাবু অরুণের উপর রাগ ক'রে তোমাদের দুজনের সর্ব্বনাশ করতে প্রস্তুত হয়েছেন, তিনি তোমাকে রমেশের হাতে দেবেন ব'লে স্থির করেছেন।"

অনিলা চমকাইয়া উঠিল, তাহার মুখে চোখে একটা দারুণ ঘৃণা ও অবজ্ঞার উগ্র ফুটিয়া উঠিল। সরোজ সন্তুষ্ট হইল, বলিল, "আমি তাঁকে নিরস্ত করবার জন্য ঢের চেষ্টা করেছি, কিন্তু সব বিফল হয়েছে। তিনি এবিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তাই বলছিলুম, এসময়ে একটু দৃঢ় হ'তে হবে। আহা, সে এসময়ে কোথায় অজানা অচেনা বিদেশে জঙ্গলে প'ড়ে রয়েছে, সান্ত্বনা দেবার তাকে কেউ নেই, সে জানছে তার আশা ভরসা সব নির্ম্মূল হয়েছে, এসময়ে যদি লজ্জা ছাড়তে না পার, তাকে একটা আশা দিতে না পার, তা হ'লে তোমাদের দুটী জীবনই চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে। বল তাকে লিখে দিই?"

অনিলা কোন কথা কহিল না, কেবল বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সরোজের হাতে দিল। সরোজ বিস্মিত হইয়া পড়িতে লাগিল—

সিবাংসা মিল, সাড়িয়া, আসাম।

স্নেহের ভগিনী অনিলা,

বোধ হয় এই পত্র পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবে; কিন্তু সত্যই বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তোমায় আমার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ বা আলাপ না থাকিলেও আমি তোমায় সারা দিন রাত চোখের সামনে দেখিতেছি। ভাই, জন্ম-জন্মান্তরে আমরা নিশ্চিতই সহোদরা ভগিনী ছিলাম, না হইলে তোমার দিকে এত মন টানে কেন? বোন্, তোমার বর্ত্তব্য সেবায় অশেষার আমায় দিয়া যে কি সুখী করিয়াছ, তাহা বর্ণিতে পারি না। তুমি যাঁর জপতপ, ধ্যান জ্ঞান, যাঁহার প্রাণের চেয়েও অধিক, সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠের সেবার কতক ভাগ তুমিই আমায় দিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

কিন্তু ভাই, তুমি সাহায্য না করিলে আমার সেবা ত' সম্পূর্ণ ফলাভ করিতেছে না। গভীর কথার আভাসে বুঝিয়াছি, তুমি তাঁহাকে ভাল-বাস; কিন্তু তিনি ত' তাহা কিছুই জানেন না। সর্ব্বদা বুঝিতে পারি তিনি কাহার অভাব অনুভব করেন, আর সেই অভাবে দারুণ যাতনা হৃদয়ে পোষণ করেন। কাজ করিতে করিতে অন্যমনস্ক হন, ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তের মত একদিকে চলিয়া যান। কখনও মাছ ধরিতে কখনও বা শিকারে গিয়া মনকে সংযত করিতে চেষ্টা পান। ভগিনীর স্নেহ দিয়া আমি সেই অভাব পুরাইব কিরূপে?

সম্প্রতি আর এক দুর্ভাবনার কারণ হইয়াছে। তোমাদের ওখানে রমেশ না কে আছে, সে তাঁকে একখানা চিঠি লিখিয়াছে। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, সে লিখিয়াছে যে সরোজের সহিত তোমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। এটা কি সত্য? এই খবর পাইয়া তিনি একবারে খেপার মত হইয়াছেন। আগে মাঝে মাঝে শিকারে যাইতেন, এখন মোটেই ঘরে থাকিতে চান না, প্রত্যহ শিকারে যান। শুনিতে পাই, এখন একবারে জীবনে মমতাহীন হইয়া জঙ্গলের মধ্যে বেড়ান।

আর কিছু বলি না। যদি যথার্থ ভালবাস, তাহা হইলে যেমন করিয়া হউক তাঁহাকে জানাও যে ঐ বিবাহের কথা মিথ্যা, তুমি তাঁহার যে 'নিলা আছ তাহাই আছ। কতদিন শুনিয়াছি, তাঁহাকে ঘুমের ঘোরে 'নিলা বলিয়া ডাকিতে। তুমি কি তাঁহার সেই 'নিলা থাকিবে না?

ভগিনী, তুমি কত ভাগ্যবতী, তাহা বোধ হয় বুঝিতেছ না। ভগবানের অপার দয়ায় যে অমূল্য হৃদয়ের সর্ব্বস্ব দান গ্রহণে অধিকারিণী হইয়াছ, তাহার তুলনায় জগতের সকল সম্পদই তুচ্ছ। সেই দান কি তুমি হেলায় হারাইবে? আশীর্ব্বাদ করি, এমন দুর্ভাগ্য যেমন তোমার না হয়।

ইতি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী
স্নেহের ভগিনী মৈথিলী।

[এজেন্ট পুরুষোত্তম কোঠারের কন্যা]

পত্র শেষ করিয়া সরোজ ক্ষণেক স্তম্ভিত ও নীরব রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি একটু একটু সন্দেহ করেছিলুম। কিন্তু রমেশটা এত নীচ তাত জানতুম না।"

অনিলা "আমি অনেক দিন থেকেই জানি।"

সরোজ বলিল, "তা হ'লে এই বিবাহের বিষয়ে রমেশের কারসাজি নিশ্চয়ই আছে। বল অনিলা, রমেশের সঙ্গে বিবাহে মত দেবে না।"

অনিলার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। সে সরোজের মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল, "তোমার বোন কখনও দ্বিচারিণী হবে না, সরোজদা।" অনিলা ধীর পাদবিক্ষেপে ঘরে চলিয়া গেল, সরোজ মহামহিমান্বিতা নারী মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ

মৈথিলীর শেষ হাসি

অরুণ বিনায়ককে কাজে দেখিতে পাইল না। আজ কয় দিন হইতেই সে বিনায়কের অন্তরের একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় বিনায়ক তাহাকে দেখিলে আর তেমন হাসিয়া সম্ভাষণ করে না। তাই বিনায়কের সহিত একটা বোঝা পাড়া করিয়া তাহাকে শান্ত করিতে অরুণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

আফিস ঘরে অরুণ বিনায়ককে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসাবাদে জানিল, বিনায়ক কাজ করিতে করিতে উঠিয়া বাসায় গিয়াছে। অরুণ ব্যস্ত হইয়া, বলিল, "কি হয়েছে তথায় গিয়া বিনায়ক অসুখ করেছে?"

বিনায়ক তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইল। অরুণ তথাপি তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সস্নেহে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া দেখিতে গেল; বিনায়ক সবলে তাহার হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। অরুণ বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইল না, সে বরং হাসিতে হাসিতে চাদরখানা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বিনায়কের হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল, "নাও, নাও, খুব অসুখ করেছে, চল দেখি একটু কাজ করিগে বা মাছ ধরিগে! কুড়েমি করেই শরীরটা খেলে।"

বিনায়ক রাগে ফুলিতেছিল। সে বলিল, যাও আর দরদ দেখাতে হবে না।"

অরুণ স্তম্ভিত হইল। সে ব্যথিত হইয়া বলিল, "বিনায়ক, ভাই, তুমি কি ভুল বিশ্বাস করেছ বুঝতে পারছি না। আমারে খুলে বল, আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমার ভাই, যদি আমার দ্বারা তোমার দুঃখ দূর হয়, আমি তা প্রাণ দিয়ে করবো।"

অরুণ আগ্রহভরে বিনায়কের হাত দুটা দুই হাতে ধরিয়া ফেলিল।

বিনায়কের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেও সাগ্রহে বলিল, "করবে? সত্যি বলছ করবে? তুমি সত্যি ছাড়া মিথ্যা কখনও বল না তা জানি। তাই জিজ্ঞাসা করছি, যা বলছ, তাই করবে?"

"নিশ্চয়ই করব।"

"তা হলে এখান থেকে কাজ ছেড়ে চলে যাও, আবার আমাদের ঘরে শান্তি আসতে দাও, আমার মৈথিলীকে আমায় ফিরিয়ে দাও।"

অরুণ উত্তেজিতস্বরে বলিল, "বিনায়ক, বিনায়ক পাগলের মত কি বলছ? মৈথিলী? মৈথিলী যে আমার ছোট বোন, আমি যে তার দাদা, আমি যে তাকে সহোদরার মত ভালবাসি। তুমি কি এই জন্যে আমার উপর রাগ করেছ? ছিঃ ছিঃ!"

"না, না, এখান থেকে তোমায় চলে যেতে হবে, না হলে মৈথিলী শান্তি পাবে না, আমি শান্তি পাব না।"

অরুণ এইবার যথার্থই উত্তেজিত হইল। সে রুক্ষস্বরে বলিল, "দেখ, আমি যাব না, অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর করবো না। আমায় যা ইচ্ছে তাই বল, আমি সহ্য করে নেব, কিন্তু মিথ্যে সেই পাগলী বালিকার নামে যা তা বলছ কেন? সে আমায় মার পেটের ভায়ের মত ভালবাসে, যত্ন করে তুমি কেবল সন্দেহের নেশায় উন্মত্ত হয়ে যা নয় তাই বলছ।"

"হুঁ, এই দেখ, তার কথা বলতেই গায়ে লেগেছে। তুই ভণ্ড, মিথ্যুক, তোর একটা কথা সত্যি না। তুই মৈথিলীকে কেড়ে নিবি ভেবেছিস্? এ প্রাণ থাকতে না, তার আগে তোকে খুন করে যাব।" বিনায়ক একটা প্রকাণ্ড লৌহ—যষ্টি তুলিয়া লইয়া অরুণকে মারিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখ মুখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটী কোমল বাহুলতা অরুণের বক্ষবেষ্টন করিয়া সুদৃঢ় বর্ম্মের মত অরুণকে বিপদ হইতে আচ্ছাদন করিয়া রহিল; দুটী কৃষ্ণতার নয়ন ভীতিব্যঞ্জক কাতর দৃষ্টিতে অরুণের মুখপানে তাকাইল এবং পরমুহূর্ত্তেই সেই দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়া বিনায়কের উপর নিপতিত হইল, সেই দৃষ্টিতে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও ক্রোধের চিহ্ন স্পষ্টই প্রকটিত হইয়া উঠিল।

অরুণ ও বিনায়কের বিস্ময় অপসারিত হইতে না হইতে মৈথিলী কঠোরস্বরে বিনায়ককে বলিল, "যাও, এখনই কাজে যাও, না হলে বাবাকে বলে তোমায় জবাব দেওয়াব।" যাও, এখনও দাঁড়িয়ে রইলে যে?" মৈথিলী তখন অরুণকে ছাড়িয়া একটু তফাতে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তখনও তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। বিনায়ক ক্রোধে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ ও মৈথিলী নীরব হইয়া রহিল। শেষে অরুণ মৈথিলীর একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "মৈথিলী, ভাবছ কি? পাগলটার কথা শোন কেন? তাকে ভূতে ধরেছে। চল—"

মৈথিলী তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "আমার একটী অনুরোধ রাখবে? এখান থেকে এখনই চলে যাও। আমার মাথা খাও, এখানে আর একদিনও থেকো না, 'রুণ দা। কাজ বড়, না প্রাণ বড়? বল, যাবে বল?"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "প্রাণের ভয়ে পালাতে হবে? এ প্রাণের মায়া আমি বড় রাখি না—"

মৈথিলী শুষ্ক মুখে বলিল—"তুমি না রাখতে পার, কিন্তু তোমার প্রতীক্ষায় যত আশা ক'রে একজন বলকাতায় রয়েছে। অন্ততঃ তোমার নিলার মুখ চেয়েও ত' তোমার সাবধান হওয়া উচিত।"

যদি সেই মুহূর্ত্তে অরুণের মাথায় আকাশটা ভাঙ্গিয়া পড়িত, বোধ হয় তাহাতেও অরুণ এত চমকিত হইত না। নিলা! তাহার নিলা! নিলার কথা মৈথিলী জানিল কি প্রকারে? গঙ্গা ত' তাহার অন্তরের কথা জানে না, গঙ্গার নিকট জানা ত' সম্ভব নহে। তবে কি হইল! বিস্ময়ে অরুণ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "মৈথিলী, বোনটী আমার, সে সব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। কোথা হ'তে কি করে তুমি এ সব জানলে জানি না। তবে যখন জেনেছ, তখন বলছি শোন, এ জঙ্গল ছেড়ে আর দেশে ফিরে যাব না।"

মৈথিলী উত্তেজিত স্বরে বলিল, "যাবে না? আমিও বলছি শোন, তুমি নিশ্চয় ফিরে যাবে, আবার সুখের মুখ দেখবে। এ যদি, মিথ্যে হয়, তা হলে জানবে ধর্ম্ম মিথ্যে জগৎ মিথ্যে, দিন রাত মিথ্যে।"

অরুণ মৈথিলীর উত্তেজনার ভাব দেখিয়া উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিল, বলিল, "কেমন ক'রে এ আখাস দিচ্ছ জানি নি, কিন্তু তোমার কথা শুনে আবার যেন মনে আশার আলো দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

মৈথিলী এতক্ষণে ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "যা বলছি, তা কখন মিথ্যে হবে না। আমার মনের মধ্যে কে যেন এসে বলে দিচ্ছে, তুমি যা শুনেছ তা ভুল, তোমার নিলা তোমারই সুখ চেয়ে আছে, এটা তুমি স্থির জেনো।"

মৈথিলী আর দাঁড়াইল না, ধীর পাদবিক্ষেপে অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। অরুণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর অরুণ একদিন মাছ ধরিতে বসিয়াছিল। একটা কলরবে সে চমকিত হইয়া ছিপ ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সে দেখিল, লুবাং পাশি চেমনা গালঙ্গকে গলা টিপিয়া তাড়াইয়া লইয়া আসিতেছে এবং দাতেঙ মিরি একটা বেতের ছড়ি দিয়া চেমনাকে সপাসপ মারিতে মারিতে অগ্রসর হইতেছে। অরুণের নিষেধে তাহার

চেমনাকে উৎপীড়ন করিতে বিরত হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, আজ চেমনা মোরের বাসায় বসিয়া কোঠারের মেয়েকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবার পরামর্শ আঁটিতেছিল, মোরে তাহাকে "আবু"র ঘর হইতে পিস্তল ও বন্দুক চুরি করিয়া আনিতে বলিতেছিল, লুবাং পাশি মোরের ঘরের বেড়ার পাশে লুকাইয়া সব কথা শুনিয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যে চেমনা তাহার গালঙ্গ দলবল লইয়া রাত্রে কোঠারের বাড়ী চড়াও হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। লুবাং সেইজন্য চেমনার সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই, অনুক্ষণ তাহার উপর নজর রাখিয়াছিল এবং দাতেঙ মিরিকে "আবু"র দেহ রক্ষার জন্য এখানে পাঠাইয়া দিয়াছিল। "আবু" যখন মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সময়ে চেমনা লুকাইয়া তাঁহার বাসায় বন্দুক চুরি করিতে গিয়াছিল। তাই তাহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে।

অরুণ মুহূর্ত্ত মাত্র চেমনার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিল এবং চেমনাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে বলিল, "আজ এই মুহূর্ত্তে নদী পার হ'য়ে দেশে চলে যাও। এখানে আজ সন্ধ্যের পরে তোমায় যদি দেখ্‌তে পাই, তা হ'লে শেয়াল কুকুরের মত গুলি ক'রে মারব, জেনে রেখো।"

ঠিক সেই সময়ে মোরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। ক্রোধে জ্ঞান হারা হইয়া বন্য মহিষের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "আমার চাকরকে তাড়াবার তুমি কে? ও যাবে না, ও কারখানার চাকর নয়।"

অরুণ বলিল, "কারখানার সম্পর্কে চোর বদমায়েস লোক রাখবার কোন লেখাপড়া নেই।"

মোরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমি যত দিন থাকব, আমার চাকরকে তাড়ায় কে?

অরুণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আর তোমাকেই যদি আজ তাড়িয়ে দিই?"

মোরে রাগে ফুলিয়া বলিয়া উঠিল, "হুঁস্ লম্বা-চৌড়া শুকুম দেখ! যেন স্বয়ং মনিব এলেন আর কি!"

"মনিব ত' বটেই; মনিবও যিনি, মনিবের ছেলেও তিনি" এই কথা কয়টী হঠাৎ কোমল কামিনী কণ্ঠে উচ্চারিত হইল। সকলে চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল মৈথিলী একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"মনিবের ছেলে? কে সে?"—মোরে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

মৈথিলী দুই একপদ অগ্রসর হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এই যে তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখতে পাচ্ছ না?—"

অরুণ প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল।" এই বার বলিল, "আঃ মৈথিলী, কি যে যাতা বল! থাম।"

মৈথিলী তাহার কথার জবাব না দিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমরা শোন। যাঁকে তোমরা প্রভুর নিযুক্ত তদারক কর্ম্মচারী ব'লে জান, তিনি প্রভুর একমাত্র সন্তান, এই কারখানার ভাবী মালিক, প্রভুর সমুদয় বিষয় আশয়ের মালিক, তিনি কেবল কর্ম্মচারী সেজে লুকিয়ে এসে কাজ দেখছেন। সুতরাং মোরে! জেনে রাখ এঁর এক গাছি কেশ স্পর্শ করলে তোমাদের মঙ্গল হবে না।"

"এ্যাঁ মনিব? মনিব? সাহেব যে শিগ্‌গির আসছে —" এই কথা বলিতে বলিতে মোরে হঠাৎ দ্রুত পদে কারখানার দিকে চলিয়া গেল। অরুণের ইঙ্গিতে আবরণাক্ত স্থান ত্যাগ করিল।

অরুণ ডাকিল, "মৈথিলী?"

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের পানে তাকাইয়া মৈথিলী বলিল, "কি বল্‌ছ, রুণ দা।"

অরুণ কপট ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিল, আমায় ভয় করে কথা কইছ না, আমি মনিব?"

"সত্যিই ত' রুণদা, তুমি মনিব।"

"আচ্ছা সত্যি বল ত, কোথায় এসব খবর পেলে? নিলার কথা আমার কথা জানলে কি ক'রে? গঙ্গা আমার কথা বল্‌তে পারে, নিলার কথা ত' জানে না।"

"তা যেমন করেই জানি না, কথাটা সত্য ত'? তবে বল ত' তোমার এখানে আর থাকা কি উচিত? কোন্ দিন কি বিপদ ঘটে—"

অরুণ সস্নেহে মৈথিলীর হাত দুখানি ধরিয়া বলিল, "কেন বল দেখি আমায় দিন দিন এই মায়ার বন্ধনে ফেলছ? আমি শনিগ্রস্ত, আমার দেখ্‌লে দেশের বিপদ চার দিক থেকে ছুটে আসে। মৈথিলি, আমার কাছ থেকে তোমরা সব পালিয়ে যাও।"

মৈথিলীর সর্ব্ব অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অরুণ অন্য বিষয়ে অন্যমনস্ক না হইলে নিজের হাতের ভিতরে মৈথিলীর হাতের কাঁপুনি স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিত। তাহার আয়ত চক্ষুদুটী একটা অনির্ব্বচনীয় স্নেহরসে ভরিয়া আসিল; সে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার বিপদ! সে যা হোক তুমি এখান থেকে চলে যাও, তোমার কিসের দুঃখ কিসের অভাব?"

অরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার দুঃখ, আমার অভাব? মৈথিলি, কেবল পরের ভাবনাই ভাবছ, নিজের কথা ত' কিছুই বল না। পরের অভাব দুঃখ দেখ্‌লেই তোমার ঐ কোমল প্রাণটী কেঁদে উঠে; কই, নিজের বিপদের কথা ত কিছুই ভাব না।"

বিষাদ মাখা কাতর স্বরে মৈথিলী বলিল, "আমি? কি? আমি কিছুই না, আমার মত একটা তুচ্ছ প্রাণের মূল্য? কিন্তু তুমি,—তোমার নিলা,—আমি তোমাদের কথাই ভাবি, তোমাদের বিপদ আপদ ঘুচে যাক, তোমাদের মিলন হ'ক, আমার তাই সুখ, তাই শান্তি—"

অরুণ অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে মৈথিলীর মুখপানে তাকাইয়া বলিল, "না, না, মৈথিলী, তুমিও সুখী হ'বে। বিনায়কের আজ ভুল হয়েছে, আবার সব যেমন ছিল তেমনই হবে, আমি নিশ্চয় বলে রাখ্‌ছি আবার তোমরা সুখী হবে।"

হঠাৎ মৈথিলীর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া দারুণ অভিমানাহত স্বরে বলিল, "তোমার ও কথা বল্‌বার কোন অধিকার নেই—" মৈথিলীর বাক্‌রুদ্ধ হইল, অভিমানে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

অরুণ একবারে হতভম্ব হইয়া গেল, কি করিতে গিয়া কি হইল! সে মৈথিলীর অভিমানের কারণ খুঁজিয়া পাইল না বটে, কিন্তু, মৈথিলীর অনুযোগে সে আপনাকে নিতান্ত কঠোর কর্ক্কশ, ও বর্ব্বর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। সে আবার জোর করিয়া মৈথিলীর হাত দুটী ধরিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল, "মৈথিলী বোন্‌টী আমার, বল ত' ভায়ের মনে কষ্ট দিচ্ছ? কেন তোমার মুখে আর সে হাসি দেখ্‌তে পাই নে। তোমার কি দুঃখ মৈথিলী?"

মৈথিলীর চোখে তখন যে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল, তাহা চিরকালের জন্য অরুণের হৃদয়ে একটা ছাপ রাখিয়া গেল। একবার মাত্র সেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মৈথিলী চক্ষু অবনত করিয়া লইল।

হঠাৎ মৈথিলী চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "চুপ! ওকি?" অরুণ এইবার যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল; হাসিয়া বলিল, কি আবার, ও বোধ হয় একটা শেয়াল চ'লে গেল। সন্ধ্যাও হয়ে এল, চল ঘরে যাই। এখনই আঁধার—"

কথা শেষ করিতে হইল না, মৈথিলী একবার অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝোপের দিকে তাকাইয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া অরুণের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; সেই চীৎকারে বিশ্বব্যোম ছাইয়া গেল। মৈথিলী যেমন বাহুলতা প্রসারিত করিয়া অরুণকে ঘোর বিপদ হইতে পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি সন্নিহিত ঝোপের অন্তরাল হইতে

চাবুকের আওয়াজের মত একটা শব্দ হইল, মৈথিলীও অমনই "মাগো" বলিয়া অরুণের দেহের উপর এলাইয়া পড়িল। অরুণ সভয়ে দেখিল, এক তীরের ফলক মৈথিলীর অংশের উপরে বিদ্ধ হইয়াছে, সেই স্থান হইতে অবিরল রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে।

অরুণ সযত্নে মৈথিলীর দেহ অঙ্কে ধারণ করিয়া জানু পাতিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল, উন্মাদের মত সে একবার মৈথিলীর মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট মুখের পানে তাকাইল, মুহূর্ত্তপরে উদার অনন্ত শূন্যাকাশের দিকে চাহিল, তাহার পর ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "মৈথিলি, মৈথিলি, কি কর্‌লি বোন, আমার জন্য প্রাণ দিলি?"

যেন অরুণের ডাকে মহাপ্রস্থানের পথ হইতেও মৈথিলীর পুণ্য পবিত্র আত্মা আবার এই জ্বালা যন্ত্রণাময় মরজগতে ফিরিয়া আসিল। ধীরে, অতি ধীরে, সেই পদ্মপলাশ নয়ন দুটী উন্মীলিত হইল, সেই যাতনা-ক্লিষ্ট পাণ্ডুর বদনে দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইল। সেই বিবর্ণ অধর প্রান্তে এমন হাসি ফুটিয়া উঠিল, যে হাসি অরুণ ইহজন্মে কখনও দেখে নাই। ধীরে—অতি ধীরে—মৈথিলী মৃণাল-কোমল বাহু দুটী তুলিয়া অরুণের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া বলিল, —"প্রাণাধিক, তোমার জন্য প্রাণ দোবো, এটা কি একটা বড় কথা হ'ল?"—অতি মৃদুস্বরে যেন গোপনে আপনার মনে মৈথিলী এই কথা কয়টী উচ্চারণ করিল; করিয়াই হাঁপাইতে লাগিল। অরুণ কথা শুনিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহার মনের অন্ধকার কাটিয়া গেল, সে দিব্য চক্ষে সমস্তই দেখিতে পাইল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "মৈথিলি, মৈথিলি, স্বর্গের দেবী! চল তোমায় ঘরে নিয়ে যাই, তোমায় ত আমাদের ছেড়ে যেতে দেবো না। গঙ্গা! গঙ্গা! এই যে গঙ্গা এসেছিস, ওরে ডাক্তারকে ডাক; না না, চল তোর দিদিকে নিয়ে বাসায় যাই।"

মৈথিলী হাত নাড়িয়া বারণ করিল। আবার মৈথিলী চক্ষু উন্মীলন করিয়া অরুণের মুখের দিকে চাহিল। ওঃ! সেই দৃষ্টিতে কি অগাধ অপরিমেয় অফুরন্ত ভালবাসা ফুটিয়া উঠিল। মৈথিলী অতি ধীরে বলিল, "এ সময়ে আমায় কোথাও নাড়াচাড়া কোরো না। আমায় এমনই ক'রে তোমার পায়ে মাথা রেখে সুখে মর্‌তে দাও। জীবনে পাই নি, মরণেও কি পাব না?" মৈথিলী হাঁপাইতে লাগিল।

অরুণ কাঁদিয়া উঠিল। তাহার বলিষ্ঠ দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মৈথিলী আবার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিল, "ছিঃ, কেঁদো না। এ সময়ে কেঁদে আমায় আর কাঁদিও না।"

অরুণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মৈথিলী, তুমি বেঁচে ওঠ। তা না হ'লে আমি জন্মে কখনও সুখ শান্তি পাব না।"

মৈথিলী আবার সেই অপার্থিব হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি বেঁচে থাকলে কখনই সুখী হতুম না। তার চেয়ে তোমার বুকের উপর এমনই করে সুখে মর্‌ছি, এই ত ভাল। আর বেশীক্ষণ না, সময় হয়ে আসছে, আমায় এমনই করে তোমার বাহুবন্ধনে থেকে মর্‌তে দাও।"

অরুণের গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, তাহার বলিষ্ঠ দেহ বাতাসে মুকুলের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। মৈথিলী আবার বলিল, "ছিঃ, আবার কাঁদছ? এই মরণের ধারে পৌঁছে দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তুমি তাকে নিয়ে সুখী হ'বে। আমার জন্য দুঃখ কেন? আমি বেঁচে থাকলে সুখ পেতুম না, তাই মর্‌তে চেয়েছিলুম, ভগবানের কাছে মরণ কামনা করেছিলুম। ভগবান প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। কেবল দুঃখ এই, দুদিন প্রাণভরে তোমার সেবা কর্‌তে পারলুম না।

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ যেমন নিবিবার পূর্ব্বে একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনই মহাপ্রয়া-

নোমুখ মৈথিলীর মুখে চোখে একবার শেষ হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে অতিক্ষীণ স্বরে বলিল, "এজন্মে তোমায় পেলুম না। প্রাণাধিক, আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্মান্তরে তোমায় পাই। কই বাবা কই, মা কই? তাঁরা সব এসেছেন? সকলকেই প্রণাম করছি। এ কি! চারিদিক আঁধার হ'য়ে আসছে কেন? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, এই যে তোমার মুখ, এই যে তোমার চোখ। এস, আরও সরে এস, আমার মাথায় তোমার পায়ের ধুলো দাও—

. .

সুবর্ণপ্রতিমা ঢলিয়া পড়িল। অশ্রুরুদ্ধদৃষ্টি অরুণের দেহ ক্রন্দনের বেগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গগনের গগনভেদী ক্রন্দনে আকাশ মেদিনী ছাইয়া গেল। বৃদ্ধ কোঠারে দপ্তরী যখন সস্নেহে অরুণের নাম ধরিয়া ডাকিল, তখন অরুণের চেতনা হইল।

[ক্রমশঃ।

কবে

(শ্রীলীলা দেবী)

কবে আমার কাজের বোঝা
নামিয়ে দেবো তোমার পায়ে?
কবে আমি চ'লবো সোজা
এড়িয়ে বাঁকা পথের ছায়ে!
গলে গাঁথা মোর মালা খানি,
শেষ হ'বে কোন কুসুম আনি',
ক'বে আমার মিলবে ছুটী
মুক্ত হবো সকল দায়ে।
গানের মালা হয়না যে শৈষ,
তোমার গলায় কুলায় না বেশ
যতই গাঁথি ফুরায় কুসুম
রয় যে সুতা অনেক প'ড়ে।
কোন বসন্তের অশেষ ফুলে
মালার গাঁথা সুতার মূলে—
—মিলিয়ে দিয়ে মালা তোমার
পরিয়ে দেবো গলার পরে;
কবে আমার সময় হ'বে,
ও মুখ চেয়ে রইতে ভবে
কাজের শেষে কখন ল'বে
আমার এ কায় তোমার কাছে!

দানপত্র

(গল্প)

(১)

(শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল)

বৈশাখের অপরাহ্ণ; সূর্য্যদেবের আর সে রুদ্রমূর্ত্তি নাই। প্রশান্ত আকাশের কোণে ছিন্ন মেঘ পুঞ্জীভূত হইবার আয়োজনে ঈষৎ চঞ্চল। বাতাস মৃদু মৃদু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভবানীপুরের এক গৃহ-প্রাঙ্গণে তরুণ অধ্যাপক অরুণকুমার কি একখানি পুস্তক পড়িতে পড়িতে পাইচারী করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার সপ্তমবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুশীল কোথা হইতে সেখানে ছুটিয়া

আসিয়া বলিয়া উঠিল, "কাকাবাবু, পেয়ারাটা পেড়ে দাও না?"

পুস্তকাত অরুণকুমার বই হইতে মুখ তুলিয়া গাছের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পেয়ারাটা পেকেছে ত। দাঁড়া দিচ্ছি পেড়ে।"

সুশীলের জননী হেমলতা বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন, রকে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিলেন, "ঠাকুরপো তোমার এখনও ছেলেমানুষী গেল না। সুশীল বল্‌লে আর তুমি অমনই গাছে গিয়ে উঠেছ। তোমার একজন ছাত্র যদি দেখে ত কি বল্‌বে।"

অরুণকুমার পেয়ারাটি হাতে করিয়া গাছ হইতে নামিয়া সুশীলকে দিয়া কহিলেন, "দেখ্‌লেই বা, তারা তাদের গুরুকে বেশ চেনে, কতদিন তাদের সঙ্গে করে বাগানে বেড়াতে গিয়ে তাদের গাছ থেকে কত কি পেড়ে দিয়েছি।"

হেমলতা বলিলেন, "চিরকালটা এমনই করেই কাটাবে ঠাকুরপো!"

অরুণকুমার যথাসম্ভব গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কি কর্‌ব বৌদিদি, তোমরা ত আর বিয়ে থাওয়া দেবে না।"

হেমলতা তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। সে হাসির অর্থ হেমলতা বুঝিলেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গ থামিতে দিলেন না। বিবাহের কথা উত্থাপন করিবার এই ত সুযোগ। প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "তোমার দাদা ত তোমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। তুমি পাছে বেঁকে বস, এই তাঁর ভয়, তা হ'লে আমি তাঁকে এখনই বলে আসি।"

অরুণকুমার হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ক্ষেপেছ না কি বৌদিদি। তোমার সঙ্গে দেখ্‌চি তামসা কওাই ঝকমারি হ'য়েছে।"

হেমলতা বলিলেন, "আমি তোমার ও কথায় ভুলচি না। ওঁকে গিয়ে এখনই বল্‌চি।"

অরুণকুমার দুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "রক্ষে কর বৌদিদি।"

হেমলতা বলিলেন, "বা রে, তুমি কি আইবুড়ো কার্ত্তিক হ'য়ে থাক্‌বে না কি, না তা কিছুতেই হবে না।"

অরুণকুমার মিনতিভরা দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেশ আছি বৌদিদি, সখ করে কেন একটা বোঝা বইতে যাব।"

হেমলতা বলিলেন, "সংসারে থাক্‌তে গেলে এ রকম বোঝা যে বইতেই হয় ঠাকুরপো, না হ'লে সংসার যে অচল হ'য়ে যাবে। এখন ত তোমার আর আপত্তি করবার কিছু নেই। নিজের রোজগারের টাকায় এই বাড়ী কিনেছ—ব্যাঙ্কেও কিছু টাকা জমেছে; এখন যিনি তোমার সঙ্গিনী হবেন, তাঁকে ত আর খাওয়া পরার কষ্ট পেতে হবে না।"

অরুণকুমার বলিলেন, "এ কথা তোমার না হয় মেনেই নিলাম, তাই বলে কোথাকার এক পরের মেয়ে এনে খামকা হাঙ্গামা বাধাবে বৌদিদি!"

হেমলতা হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো তুমি ত কম লোক নও। তোমার পেটে পেটে এত। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকেই কথা শোনান হ'ল, আমিও পরের মেয়ে—আমি তোমাদের বাড়ী এসে হাঙ্গামা বাধিয়েচি এই ত কথা। কিন্তু আমিও তোমায় সহজে ছাড়চি না, কি হাঙ্গামা বাধিয়েছি তা আমায় বল্‌তে হ'বে।"

অরুণকুমার ছেলেমানুষের মত স্নেহসিক্ত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যে আমার বৌদিদি! তুমি কেন পরের মেয়ে হ'তে যাবে।"

হেমলতার দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। শিশুর মত সরল এই ঠাকুরপোটি যে তাঁহাকে কত খানি ভক্তি শ্রদ্ধা করে তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন, "লক্ষ্মী ভাই আর অমত কর না। তোমার দাদার

ভারি ইচ্ছে তোমার বিয়ে দেন। আর আমিই বা একলা কতদিন সংসার ঘাড়ে করে থাকব। আমায় বুঝি একটু জিরুতে দেবে না।

অরুণকুমার বলিলেন, "নতুন লোক বাড়ীতে আসলে তোমার কাজ যে আরও চতুর্গুণ বেড়ে যাবে বৌদিদি। বা যেটুকু সময় পাচ্ছ তখন যে একেবারেই জিরুতে পাবে না। তোমার সাহায্য করবার লোকের অভাব কি তুমি যা হুকুম করবে আমি তাই করবো। আমি তরকারি কুটতে জানি, রাঁধতে জানি। এই দেখ আমি তোমার তরকারি কুটে দিচ্ছি।"

হেমলতা বলিলেন, "তুমি যে এ সব কাজ পার তা আমি খুব জানি। কিন্তু ও কথায় আমায় ভোলাতে পারবে না।" একটু থামিয়া বলিলেন, "আমার আদেশ তোমায় বিয়ে করতে হবে।"

অরুণকুমার বৌদিদির পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিলেন, "তোমার আদেশ যখন তখন ত আর অমান্য করতে পারি না।"

হেমলতাও তাহা জানিতেন, তাই আশ্চর্য্য হইলেন না। তাঁহার কোমল বুকখানি অপূর্ব্ব মিষ্টতায় ভরিয়া উঠিল। তিনি প্রাণ ভরিয়া দেবরকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর অরুণকুমার বলিলেন, "কিন্তু বৌদিদি তোমার এ আদেশ, সনতের এম, এ পাশ করা—"

তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া হেমলতা বলিলেন, "তার এখন চার বছর দেরী, তখন ত তুমি বুড়ো হ'য়ে যাবে ঠাকুরপো, তোমায় মেয়ে দেবে কে শুনি?"

অরুণকুমার হাসিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালাদেশে আবার মেয়ে পাওয়ার ভাবনা। যদি সত্তর বছরের বুড়োর বিয়ে হ'তে পারে আর আমার বিয়ে হবে না বৌদিদি।"

হেমলতা বলিলেন, "তা যা বলেচ ঠাকুরপো, আমাদের এই অভাগা দেশের মেয়েদের এমনই অবস্থাই হ'য়েছে। পয়সার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতেই পারে না—কাজেই—"

তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অরুণকুমার বলিলেন, "অভাবও বটে, স্বভাবও বটে। আমরা যদি মেয়েদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম তা হ'লে শত অভাবের মধ্যেও কখনও আমরা ষোল সতর বছরের একটা মেয়েকে সত্তর বছরের বুড়োর হাতে দিতাম না। মেয়েদের যে আমরা গলগ্রহ বলে মনে করি।"

(২)

অরুণের বিবাহ হইয়া গেল। নববধূ লইয়া গৃহে ফিরিবার পর হেমলতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বউ পছন্দ হ'ল?"

অরুণ হাসিয়া বলিলেন, "পছন্দ হবে না কেন, প্রথমেই সর্ব্বদোষ হরে গোরা, তারপর টিকোলো নাক, আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগল, জোড়া ভুরু, পাতলা ঠোঁট। এতেও অপছন্দ হবে বৌদিদি!"

নববধূ কাঞ্চনমালা সত্যই পরমা সুন্দরী। অরুণকুমার তাহার রূপের যে বর্ণনা করিলেন, তাহা যৎসামান্য অতিরঞ্জিত হইলেও, তাহাকে মিথ্যা বলা চলে না।

হেমলতাও সারা মুখ চোখ হাসিতে ভরিয়া বলিলেন, "তা আমার কাছে রূপের বর্ণনা করা মিথ্যে—যে শুনলে খুসীতে ভরে উঠ্‌বে তার কাছেতে আরও বেশী ক'রে বর্ণনা কর। এখন শ্বশুর বাড়ী কেমন দেখ্‌লে বল?"

অরুণকুমার বলিলেন, "বেশ দেখলাম। আমাদের চেয়ে ঢের বড় বাড়ী, অনেকগুলো ঘর এবং অনেকগুলো হাঁড়ি।"

হেমলতা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "অনেকগুলো হাঁড়ি কি রকম!"

অরুণকুমার হাসিয়া বলিলেন, "তা বুঝি জান না বৌদিদি। আমার শ্বশুররা পাঁচ ভাই, তাঁদের পাঁচটি আলাদা হাঁড়ি, এক রান্নাঘরে পাঁচ শাশুড়ী পাঁচটা উনুনে রাঁধেন।"

হেমলতা বলিলেন, "ওমা সে কি গো! এমন ধারা! এর মধ্যে এত খবর পেলে কোত্থেকে ঠাকুরপো?"

অরুণকুমার বলিলেন, "গোয়েন্দাগিরি শিখ্‌তে হ'য়েছে বৌদিদি। তুমি বুঝি জান না, গুরুগিরি করতে গেলে মাঝে মাঝে গোয়েন্দাগিরি শেখবার দরকার হয়।"

হেমলতা হাসিয়া বলিলেন, "তা জানা ছিল না ঠাকুরপো,—তবে তুমি যে একজন পাকা গোয়েন্দা তা বেশ বুঝতে পারচি।"

অরুণ কহিলেন, "এখনও ঠিক পারনি, গোয়েন্দাদের চোখ কান কি রকম সতর্ক তাত তুমি জান না বৌদিদি, আজ সকালে বাসি বিয়ের আগেই পাঁচ হাঁড়ির পাঁচ শব্দ আমার কানে গেছে, কোন্ শাশুড়ী-ঠাকরুণের তা বলতে পারি নি, তবে যে কোন এক শাশুড়ী-ঠাকরুণের যে সতেজ চাপা কণ্ঠস্বর তা আমি নিঃসংশয়ে বল্‌তে পারি—তিনি দুঃখ এবং রাগ করে বলছিলেন, আজ সকালেই হাঁড়ি ঠেল্‌তে হবে জান্‌লে কাল কে খেটে মরতে যেতো। বৌদিদি—" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

তাঁহার এই সংসারানভিজ্ঞ দেবরটির কোথায় ব্যথা এবং কোথায় আশঙ্কা তাহা বুঝিয়া হেমলতা দুঃখও পাইলেন খুসীও হইলেন।

(৩)

ফুলশয্যার রাত্রে কাঞ্চন স্বামীকে প্রশ্ন করিল, "তুমি কত মাইনে পাও।"

অরুণকুমার আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "তিনশ টাকা!"

কাঞ্চন কহিল, "এই যে শুন্‌লাম পাঁচশ টাকা রোজগার কর।"

অরুণ কহিলেন, "রোজগার করি বটে, তবে শুধু কলেজে গুরুগিরি করে নয়।"

কাঞ্চনমালা কহিল, "অত টাকা কি কর?"

অরুণকুমারের ভারি হাসি পাইল। ইহা যে ছেলেমানুষের সরল কৌতূহলজনিত প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই নহে তাহাই তিনি মনে করিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "বৌদিদিকে দি। তিনি কি করেন, তিনিই জানেন।"

কাঞ্চনমালা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তোমার বৌদিদি টাকাগুলা নিয়ে কি করেন, তাঁর কোন খোঁজ কর না?"

অরুণের মুখের হাসি হঠাৎ মিলিয়া গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া তিনি বলিলেন, "খোঁজ আর কি করব, বৌদিদি যা ভাল বোঝেন তাই করেন।"

কাঞ্চনমালা মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল, তাহার অধ্যাপক রোজগেরে স্বামীটি প্রকাণ্ড নির্ব্বোধ। তাই দুঃখিত হইয়া প্রকাশ্যে কহিল, "তা এ রকম করলে ত চল্‌বে না।"

অরুণকুমার স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। প্রথম পরিচয়ের দিনই একি কথা! এই অল্পবয়স্ক কিশোরী এরূপ প্রশ্ন করিবার সাহস ও অধিকার কোথা হইতে কেমন করিয়া পাইল? নিশ্চয়ই তাহাকে কেহ শিখাইয়া দিয়াছে। ব্যথিত অন্তরে তিনি উত্তর করিলেন, "এতদিন যখন চলেচে তখন পরেও চল্‌বে।"

কাঞ্চন ও সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর কাঞ্চন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ীখানা তোমার না?"

অরুণ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "জানি না, বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা কর।"

কাঞ্চনের মনও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এ সব সংবাদ আবার জা'র নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে কক্ষের বাহির হইয়া আসিয়া অরুণ দেখিলেন, হেমলতা উঠান পরিষ্কার করাইতেছেন। দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কাল সারারাত বুঝি দুটী চোখের পাতা এক হয়নি ঠাকুরপো?"

অরুণ জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "অমন রূপের খনি সামনে রেখে কি চোখ বোজা যায় বৌদিদি।"

হেমলতা বলিলেন, "তা যা বলেচ ঠাকুরপো, যেন লক্ষ্মীর প্রতিমা, সত্যিই ও মুখের পানে চেয়ে আর চোখ ফিরাতে ইচ্ছে হয় না।"

অরুণকুমার সহজভাবে পরিহাস করিয়া বলিলেন, "তবু ত তুমি মেয়েমানুষ।"

হেমলতা পরিহাসে যোগ দিয়া বলিলেন, "তাতে আমারই চোখ টিকরে যায়, তোমার ত কথাই নেই; আচ্ছা ঠাকুরপো কাল সারারাত কি শুধু ঐ মুখের পানে চেয়ে রইলে, না কথাবার্ত্তা কিছু হ'ল?"

অরুণকুমার কহিলেন, "চুপ করে চেয়ে থাক্‌বার জো কি বৌদিদি,—আমার ত ইচ্ছে ছিল নিঃশব্দে চেয়ে থাকি, তা থাকতে দেবে কে?"

হেমলতা আগ্রহভরে বলিলেন, "সারারাত ধরে কি কথা হ'ল ঠাকুরপো?"

অরুণ কহিলেন, "সে অনেক কথা বৌদিদি, কত যোজগার করি, টাকা কাকে দি, তার কাছে থেকে পাই পয়সার হিসাব নেওয়া হয় কিনা, এ বাড়ীখানা আমার কি না—আরও কত বল্‌ব?"

দেবরের কণ্ঠস্বরে হেমলতা বুঝিলেন যে ঐ সব প্রশ্নে তাঁহার সদাশিব দেবর অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। অরুণ হাসি তামাসার মধ্যে তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধিময়ী স্নেহপরায়ণা হেমলতার কাছে তাহা ধরা পড়িয়া গেল। অরুণের নিকট নিজের মনোভাব গোপন করিয়া তিনি বলিলেন, "সে ত আমার মত ন'বছরের মেয়েটী আসে নিয়ে কোন কিছু খোঁজ নেবে না। বড় হ'য়েছে, তার বুদ্ধিশুদ্ধি হ'য়েছে, কার হাতে পড়ল, সে কি দরের লোক তার খোঁজ নেবে না? নিজের জিনিষ যাচাই করে নেবে না ঠাকুরপো? নিশ্চয়ই নেবে, তাই ত আমি চাই।"

অরুণকুমার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "না চেয়ে এখন আর উপায় কি বৌদিদি? তখনই বলেছিলাম না পরের মেয়ে এনে হাঙ্গামা বাঁধিয়ো না, তা ত শুনলে না। শ্যামলাকে পারলেই ভাল আমার কি।"

হেমলতার মনের কোণে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা ছায়া ফেলিয়া গেল।

(৪)

মাস তিনেক পরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া অরুণকুমার দেখিলেন, তাঁহার আর দুই ভায়রা-ভাই আসিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার অন্য দুই শ্বশুরের জামাতাও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আহারের সময় অরুণকুমার জিদ্ ধরিয়া বলিলেন, তিনজনে একত্রে খাইবেন। কাজেই বাধ্য হইয়া একস্থানে তিনজনের আহার্য্য সাজাইয়া দেওয়া হইল। পাতের দিকে চাহিয়াই অরুণের কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। খাবারের থালার সম্মুখে হেঁট হইয়া বসিয়া রহিলেন; কিন্তু খাদ্যদ্রব্যে হাত দিলেন না। সকলে আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলে তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, "আমার অসুখ করেছে আমি কিছু খাব না। আপনারা বসে রইলেন কেন? খান। খাওয়া শেষ না হওয়া অবধি আমি উঠ্‌ব না।"

আহার শেষ হইয়া গেলে, তিনি বলিলেন, "আমার শরীরটা ভারি খারাপ বোধ হচ্ছে আমি বাড়ী চল্‌লাম।" শাশুড়ীর শ্বশুর শাশুড়ীর অনুরোধ এড়াইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া একেবারে রান্নাঘরের

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বৌদিদি, কিদে পেয়েছে, শীগ্‌গির ভাত দাও।"

হেমলতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ, ঠাকুরপো, শ্বশুরবাড়ী যাওনি?"

অরুণকুমার ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "গিয়েছিলাম বৌদিদি, এখন কি খেতে দেবে দাও।"

হেমলতা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে দেবরের জন্য ভাত বাড়িয়া দিলেন। আহার শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার যে সেখানে খাওয়া ও থাকার নেমন্তন্ন ছিল ঠাকুরপো, তুমি যে বড় চলে এলে?"

অরুণ কুমার কহিলেন, "অদৃষ্টে নেই কি করব বৌদিদি!"

হেমলতা অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "কি রকম?"

অরুণ কুমার ভারি গলায় কহিলেন, "বৌদিদি খাওয়াটাই কি সংসারে সব চেয়ে বড় জিনিষ।"

হেমলতা ব্যাগ্রভাবে কলিলেন, "কি হয়েছে ঠাকুরপো?"

অরুণ কহিলেন, "আমার আর দুই শ্বশুরের জামাইদেরও আজ নিমন্ত্রণ হ'য়েছিল—একসঙ্গে খেতে বস্‌লাম তিনজনের পাতে তিন রকম খাবার তা কি খাওয়া যায়। তুমিই বল না বৌ-দিদি?"

তাঁহার উদার প্রশান্ত-হৃদয় দেবর যে অন্তরে কতখানি আঘাত পাইয়া মুখের খাবার ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন তাহা হেমলতা পরিপূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। এ প্রসঙ্গকে আর তিনি অগ্রসর হইতে দিলেন না। তিনি কি বলিবেন সংসারে এ ত নিত্য নৈমিত্তিক অতি সাধারণ ঘটনা! যখন মায়ের পেটের এক ভাই মোটর হাঁকাইয়া রাজভোগ খাইয়া বিলাসের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া থাকে। ঠিক তাহারই চোখের সম্মুখে, অন্ত এক

ভাই বা ভগিনী কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে লইয়া অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধাহারে অর্দ্ধ—উলঙ্গ হইয়া দুঃখ দৈন্যের মধ্যে পিষিয়া মরে, তখন অবস্থার তারতম্য অনুসারে জামাতাদের পৃথক আহার্য্যের ব্যবস্থা এ ত কিছুই নহে! এ সংসারে কয়জনেরই বা এদিকে চোখ পড়ে!

(৫)

মাস ছয়েক পরে নূতন বধূ কাঞ্চনমালা স্থায়িভাবে স্বামীর ঘর করিতে আসিল।

হেমলতা তরকারি কুটিতেছিলেন, কাঞ্চনমালা তাঁহার পাশে বসিয়াছিল। অরুণ একজোড়া চুড়ি হাতে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'দেখ দিকি বৌদিদি কি রকম চুড়ি, তোমার পছন্দ হয়?"

হেমলতা হাত মুছিয়া চুড়ি কয়গাছি লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কহিলেন, "চমৎকার চুড়ি ত। তারি সুন্দর প্যাটার্ণ সুন্দর হাতে মানাবে ভাল?" এই বলিয়া দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন, তারপর কহিলেন, "কবে গড়াতে দিলে তা ত আমাকে একবার বললে না ঠাকুরপো?"

অরুণ কুমার যেন অত্যন্তআশ্চর্য্য হইয়াছেন এমনই ভাব দেখাইয়া কহিলেন, "বৌ রে, সব কথাই তোমায় বল্‌তে হবে বৌদিদি এমন পায় কথা ত কোন শাস্ত্রে লেখেনি?

কাঞ্চনমালা একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া হাসিভরা দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া লইল।

নববধূর এই চকিত দৃষ্টিপাত হেমলতার চক্ষু এড়াইল না। অন্তরের নিভৃত প্রদেশে তিনি যে আঘাত পাইলেন তাহা প্রাণপণে গোপন করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তা ঠিক কথা ঠাকুরপো, এখন তোমার যে বল্‌বার লোক হ'য়েছে।"

কিন্তু অরুণকুমারের কাছে হেমলতার গোপন

ব্যথা ধরা পড়িয়া গেল। বৌদিদি যে কি জন্ত তাঁহাকে ভুল বুঝিলেন, এই কথা মনে করিয়া তিনিও দুঃখ পাইলেন। ইহারই মধ্যে কি তিনি বৌদিদির নিকট হইতে এতখানি দূরে চলিয়া গিয়াছেন, অভিমান করিয়া অরুণ কহিলেন, "বৌদিদি, এর টাকা কোথায় পেলাম, কত বরচ পড়ল কিছুই ত জিজ্ঞাসা করলে না?"

নিজের দুর্ব্বলতা ও চাঞ্চল্যের জন্ত লজ্জিতা হইয়া হেমলতা কহিলেন, "জিজ্ঞেস করবার সময় দিলে কৈ ঠাকুরপো! তুমিই ত আগেভাগে কথা বলে ফেল্‌লে। এত কম লাগেনি। চারশ সাড়ে চারশ টাকা ত হবেই।"

অরুণকুমার কহিলেন, "প্রায় সাড়ে চারশ টাকা লেগেছে। পরীক্ষক হ'য়ে যে টাকাটা পাই না, এবার আর তোমায় তা দিই নি বৌদিদি! তাই দিয়ে এ চুড়ি গড়িয়ে এনেছি। জানি বকুনি খেতে হ'বে।"

হেমলতা বেদনার স্বর গোপন করিতে না পারিয়া কহিলেন, "তুমি সখ করে একজোড়া চুড়ি গড়িয়ে এনেছ, তার জন্তে তোমার দু'টো কথা বল্‌ব, এমন কথা তুমি মনে স্থান দিলে ঠাকুরপো!"

অরুণকুমার হাসিয়া কহিলেন, "তা দিয়েছি বই কি বৌদিদি। তুমি বকবে না, তিন সত্য কর?"

হেমলতা জোর দিয়া কহিলেন, "বকব না, বকব না, বকব না।"

অরুণ দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তিন সত্য করেছ, আর কিন্তু বকবার উপায় নেই।" তার পর বৌদিদির একেবারে নিকটে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "দাও আমার চুড়ি।"

হেমলতা তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চুড়ি কয়গাছি তাঁহার হাতে দিলেন।

অরুণকুমার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "দেখি একবার তোমার হাতখানা।" এই বলিয়া জোর করিয়া বৌদিদির হাতে চুড়ি কয়গাছি পরাইয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কেমন জব্দ, তিন সত্য করিয়ে নিয়েচি।"

হেমলতা আর চোখের জল রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তর অপূর্ব্ব আনন্দ ও আত্মগ্লানিতে ভরিয়া উঠিল।

(৬)

কাঞ্চনমালা তাহার এক বৎসরের ছেলেটীর কান্না থামাইতে না পারিয়া নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেছিল। হেমলতা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "ছি এমন করে ছেলেকে মারে?"

কাঞ্চন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নিজের ছেলেকে শাসন করবার অধিকারও যে আমার নেই? তা জানতাম না, ঘাট হ'য়েছে দিদি?"

হেমলতা ছেলে কোলে করিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ রকম কথা যে শুনিতে হইবে তাহা যে তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বহুদিন পরে আজ তাঁহার বোবের কথা কয়টি তাঁহার কানের মধ্যে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, —'কোথাকার এক পরের মেয়ে এনে হাঙ্গামা বাঁধাবে বৌদিদি।'

অরুণকুমার তখন গৃহে ছিলেন না। ফিরিয়া আসিলে সনৎ তাঁহাকে এই ঘটনার কথা বিবৃত করিয়া বলিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অরুণ কহিলেন, "তোমার মেজবৌদিদি ত কিছু অন্যায় বলে নি। ঠিকই ব'য়েছে।" সনৎ ক্ষুণ্নমনে চলিয়া গেল।

দিন কতক পরে কাঞ্চন হেমলতাকে কহিল, "ওকে ত' জানই দিদি, ও কি কিছু ঠিক আছে। চাইলে অমনই পঁচিশটা টাকা বের করে দিলে। টাকা কি খোলার কুঁচি যে এমনই করে ছড়িয়ে দিতে হয়। স্বামীর জামা কাপড়ের ত কোন অভাব দেখিনা, তবুও এ পঁচিশ টাকার জামা

কেনা কেন? পরের টাকা বলে কি এতটুকু দরদ থাকতে নেই।"

হেমলতার সারাদেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি চোখে অন্ধকার দেখিলেন। মনে হইল যেন তাঁহার পায়ের নীচে হইতে পৃথিবী ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে।

সনৎ ঝড়ের মত সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "চাবি ফেলে দাও বৌদিদি।"

অরুণকুমার যে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। এইবার তিনি সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "তা দিতে হবে বৈকি। চিরকাল কি পরের হাত তোলা হ'য়ে থাকবে না কি? শুধু চাবি ফেলে দিলে হবে না, চুড়ি ক'গাছিও খুলে দাও বৌদিদি।"

কাঞ্চনমালা চাবি কুড়াইতে কুড়াইতে কহিল, "আমি কি চুড়ি চেয়েচি নাকি।"

অরুণকুমার কহিলেন, "চেয়েচ এত বড় মিথ্যে কথাটা কি ক'রে বলি, কিন্তু আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে।"

কাঞ্চনমালা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।" এই বলিয়া চাবি আঁচলে বাঁধিয়া চলিয়া গেল।

সনৎ রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "তুমি এমনই স্বৈণ হ'য়েচ মেজদাদা।"

অরুণকুমার শান্তভাবে কহিলেন, "হাঁ হ'য়েচি, তাতে এমন কোন অপরাধ করা হয় নি।" হেমলতা ততক্ষণ চুড়ি কয়গাছি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অরুণকুমার কোন কথা না বলিয়া চুড়ি কয়গাছি লইয়া পত্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "এই নাও, পর, না, না তোমার কোন কথা শুনব না। পরতেই হবে, তোমার ও হাতে খুব চমৎকার মানাবে।"

কাঞ্চনমালার স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। সে মুখে কোন ক্রোধ বা বিরক্তির এতটুকু চিহ্ন নাই।

কাঞ্চন খুসী হইয়া চুড়ি পরিতে পরিতে প্রেম-বিহ্বল চক্ষে স্বামীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "যাও তুমি ভারি একগুঁয়ে, দিদি কি মনে করবেন বল ত?"

অরুণ কহিলেন, "কে কি মনে করবে ভাবতে গেলে কি সংসার চলে।" খানিক পরে রান্নাঘরে গিয়া কহিলেন, "বৌদিদি আজ খেতে দেবে না?"

আহারে আজ বসিয়া কহিলেন, "চেয়ে দেখ বৌদিদি চুড়ি কেমন মানিয়েছে, তোমার হাতে ও মানাবে কেন?"

হেমলতার আর আর হাসি কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি বা উৎসাহ ছিল না। গম্ভীরমুখে তিনি কহিলেন, "তখনই ত তোমায় বলেছিলাম ঠাকুরপো যার হাতে মানাবে তাকে দাও। তুমি ত আমার কথা শুনলে না। তা হ'লে—"

তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অরুণ বলিয়া উঠিলেন, "তোমার ইচ্ছেটা কি বৌদিদি আজ আমায় খেতে দেবে না।"

হেমলতা তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "আর একটু মাছের ঝোল দি ঠাকুরপো।"

অরুণকুমার হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আর একটু কি বৌদিদি! মাছের ঝোল যে এখনও মোটেই দাও নি, শুধু খানিকটা ভাল দিয়েছ যে?"

হেমলতা লজ্জিত হইয়া মাছের ঝোল আনিতে গেলেন।

পরদিন কিসের ছুটী ছিল। সংসার-নীতিবিশারদ মাখনলাল জামাতা অরুণকুমারকে ডাকিয়া এই খলকপটতা পূর্ণ সংসার সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। মাখনলাল কহিলেন, "বাড়ী খানার দলিলপত্র তোমার নামে হ'য়েছে সে কথা ঠিক, কিন্তু তোমরা যখন এক অন্নে আছ তখন

তোমার ভাইরাও যে সমান ভাগ পাবে। আইনই যে এই রকম।"

অরুণ কুমার ধীরভাবে কহিলেন, "আইন আমার জানা ছিল না। এখন আমার কি করতে হবে বলুন?"

মাখনলাল উৎসাহ ভরে কহিলেন, "দলিলখানা আমার মেয়ের নামে করে রাখ, তা হ'লে বোধ হয় কোন গোল থাকবে না।"

অরুণকুমার এংগ্রেকারের উপদেশ লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। কহিলেন "কিসে একবারে গোল মিটে যায়, তাই বলুন, সেই ব্যবস্থাই আমি করব।"

মাখনলাল বিশেষ খুসী হইয়া কহিলেন, "তোমার ভাইদের দিয়ে যদি লিখিয়ে নিতে পার যে এ বাড়ী তোমার হোদ্দোরের টাকায় হ'য়েছে তাদের কোন দাবিদেওয়া নেই, তা হ'লে আর কোন গোল থাকে না! কিন্তু তারা কি তা লিখে দেবে?"

অরুণ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই লিখে দেবে। আর আমার ভাইরা সে রকমেরই নয়!"

মাখনলাল হাসিয়া কহিলেন, "এইবার বুঝতে পারবে।"

অরুণকুমার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মাখনলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "কোন দিন সংসার করিনি কাজেই আমি কি পথে চলতে জানি না। আমার আর কি ব্যবস্থা করতে হ'বে বলে দিন, কেননা—যা করতে হবে একেবারেই ক'রে ফেলতে চাই।"

মাখন মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। একটু পরে কহিলেন, "পরামর্শ দেওয়া আমার কাজ নয়, তবে কইতে হয়, আমার মেয়ে বড় হয়েছে এইবার—"

অরুণকুমার অস্থির হইয়া কহিলেন, "বেশ ত, আমি কাল থেকে স্বাধীন ভাবে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেব। আমিও অশান্তির হাত থেকে রক্ষে পাই।

মাখনলাল যে কথাটা এতক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই, সুযোগ বুঝিয়া তাহা বিশদ করিয়া কহিলেন, "দেখ বাবাজী, আমি জানি তোমার দাদা বৌদিদিকে তুমি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা কর, তাঁরাও তোমায় অত্যন্ত স্নেহ দেখান, এই অবস্থায় ভিন্ন বাড়ীতে পৃথক ভাবে থাকাই বাঞ্ছনীয়। তা হলে সকলে সদ্ভাবে থাকতে পারবে।"

অরুণ কুমার কহিলেন, "আপনাদের বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থাই ক'রে দেব।"

এত সহজে যে কার্য্যোদ্ধার হইবে, এ কথা কাঞ্চনের পিতা ভাবিতে পারেন নাই। তাই জামাতার সুবুদ্ধির জন্য মনে মনে ভগবানের উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম করিয়া নিজের কন্যা ও তাঁহার গর্ভধারিনীকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী কল্পনা করিয়া গদ্‌গদ হইয়া উঠিলেন। জামাইয়ের আহারের বিশেষরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি ভিতরে যাইলেন, এমন সময় অরুণকে উঠিতে দেখিয়া মহা ব্যস্ত ভাবে কহিলেন, "এ কি বাবা, এখনই উঠ্‌চ যে। না খেয়ে কি যাওয়া হয়।"

অরুণ কুমার ধীরভাবে কহিলেন, আজ আমার মাপ করতে হবে। এর বিহিত না করে আমি জল স্পর্শ করব না।"

এই ত চাই! উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত সাধারণ লোকের এইখানেই ত তফাৎ। তাঁহারা যেটাকে কর্ত্তব্য বলিয়া একবার মনে করিবে, তাহা পালন করিবেই। জামাতার অন্তরে এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগাইয়া দিবার ত্রুটিতে যে তাঁহার কন্যার এবং তাঁহার নিজের এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার বুক গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি মুখে বার কয়েক জামাতাকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন বটে কিন্তু জামাতা সে অনুরোধ এড়াইয়া চলিয়া গেলে, তিনি মনে মনে খুসী হইলেন।

দেবরের শুষ্কমুখের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া হেমলতা কহিলেন, "এত বেলা অবধি কোথায় ছিলে ঠাকুর পো, তিনটে যে বেজে গেছে খাওয়া হয় নি?"

অরুণকুমার কহিলেন, "একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলাম, সে কাজ শেষনা করা পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে আর কিছু খার না বৌদিদি।"

হেমলতা নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এরূপ কথা বলিবার অর্থ কি! অধুনা কাঞ্চনমালার চালচলন ও কথা বলিবার ভঙ্গী এবং অরুণকুমারের গতকল্যকার ব্যবহারের স্মরণ করিয়া শঙ্কিত হইয়া হেমলতা বুঝিলেন তাঁহার সন্দেহ এইবারে কঠিন সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইহার সূচনা ত কয়দিন হইতেই দেখা দিয়াছে। এখন রূপ ধরিতে যা বিলম্ব! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, তাঁহার দেবর অভুক্ত রহিয়াছেন। আজ তাঁহার একি হইল। দেবরকে অভুক্ত জানিয়াও এতক্ষণ তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। অন্তরের মধ্যে ছট ফট করিতে করিতে তিনি ডাকিলেন, "ঠাকুর পো।"

অরুণকুমার স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কি বৌ দিদি?"

হেমলতা কহিলেন, "বাবে চল।"

অরুণকুমার দুই হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "আজ আমায় আর খেতে বল না বৌদিদি।

হেমলতা চোখের জল মুছিয়া কহিলেন, "বেশ খেয়ো না। উপোস করেই থাক, কিন্তু এটা জেন ঠাকুরপো, উপোস করে থাকতে যে তুমিই কেবল পার, তা নয় আমিও পারি। বোধ করি তাই তোমার ইচ্ছে।" এই বলিয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

অরুণকুমার অনমণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া রান্না ঘরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "সত্যিই আমায় খেতে দেবে না বৌদিদি?"

হেমলতা উজ্জ্বল মুখে কহিলেন, "ভাত বেড়ে যে কখন থেকে বসে আছি ঠাকুর পো।"

(৮)

সন্ধ্যার সময় অরুণকুমার দাদা ও সনৎকে দিয়া বাড়ী সম্বন্ধে দুইখানি পৃথক ছাড়পত্র লিখাইয়া লইলেন।"

দাদা নিঃশব্দে লিখিয়া দিলেন, কিন্তু সনৎ লিখিয়া দিয়া কহিলেন "দাদাকে শেষকালে এমনই করে পথে বসালে মেজ-দাদা।"

অরুণ কুমার কহিলেন, "নিজের বিষয় সম্পত্তি বুঝে নিতে গেলে কে পথে বসল না বসল, তার ত খবর নেওয়া চ'লে না ভাই।"

সনৎ আর কিছু না বলিয়া মুখভারে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

হেমলতা অরুণের পুত্রটিকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া আদর করিতেছিলেন। কাঞ্চনমালা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্লেষ করিয়া কহিল, "আর ও মায়ার অভিনয় কেন দিদি, ওতে আর আটকে পারবে না।"

হেমলতা কাঞ্চনের পুত্রটিকে জোর করিয়া বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া অন্তরের গভীর আঘাতের বেদনা সামলাইতে লাগিলেন।

অরুণকুমারের সে কথা কাণে গেল। বজ্রাহতের ন্যায় তিনি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্ত পরে টলিতে টলিতে বৌদিদির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমি পাশের বাড়ী ঠিক করে এসেছি কালই সেখানে উঠে যেতে হবে—এ বাড়ীতে আর স্থান হবে না।"

হেমলতা স্থির হইয়া কহিলেন, "সেই ভাল ঠাকুরপো, কাল সকালেই সেখানে উঠে যাব, আমিও তোমায় সেই কথা বলতে যাচ্ছিলাম। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখে থাক।"

কাঞ্চন ক্রূর হাসি হাসিয়া চাপা গলায় কহিল, "এ আশীর্ব্বাদ না, অভিশাপ দিদি?"

উন্মাদের ন্যায় অরুণকুমার পত্নীর দিকে ছুটিয়া

গেলেন,—সংসা দুই পা পিছাইয়া গিয়া দরজা ধরিয়া কোন রকমে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এমন সময় 'মা কাঞ্চন' বলিয়া অরুণকুমারের শ্বশুর সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অরুণ তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিলেন, "এই যে আপনি এসেছেন। ভালই হ'য়েছে। আলাদা বাড়ী আমি ঠিক করেচি, দানপত্রও লেখা হ'য়ে গেছে। আপনার সাম্নে সকলকে ডাকিয়ে এনে এখনই সব গোল চুকিয়ে দেব। এই নিন দাদা আর আমার ছোট ভাইয়ের সই-করা দলিল। পড়ে দেখুন তারা লিখে দিয়েছে এ বাড়ীতে তাদের কোন দাবী দাওয়া নেই।"

মাখনলাল কাগজ দুইখানির উপর চোখ বুলাইতে বুলাইতে প্রসন্নমুখে কহিলেন, "তা বাবাজি—"

যাহা বলিবার জন্য মাখনলাল ভূমিকা ফাঁদিতেছিলেন, তাহা বুঝিতে অরুণকুমারের বিলম্ব হইল না, তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "যা করতে হবে, তা সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলাই ভাল। আমি আর দেরী করতে পারি না। দানপত্রখানা এখনই নিয়ে আসচি।"

হেমলতা অরুণের পুত্রটীকে তেমনই ভাবে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া পাষাণ মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাঞ্চনমালার সেই অতি কঠোর নির্ম্মম বিদ্রূপ—"এ আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ দিদি?" শেলের মত তাঁহার বুকে বাজিয়াছিল। সে কঠিন আঘাত সামলাইবার মত শক্তি তাঁহার ছিল না। যে দেবরকে তিনি শিশু-কাল হইতে পুত্রাধিক স্নেহে লালনপালন করিয়া আসিয়াছেন, যে দেবর তাঁহাকে অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জননীর ন্যায় পূজা করিয়া-ছেন, সেই দেবরকে তিনি অভিশাপ দিবেন! হা ভগবান্ এ কথাও তাঁহাকে শুনিতে হইল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইল না কেন! এই ব্যথার মধ্যেও তাঁহার মনে পড়িল এখনই তাঁহাকে স্বামী-পুত্রের হাত ধরিয়া এ গৃহত্যাগ করিতে হইবে। তিনি মনে মনে অন্তর্য্যামীকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—'ঠাকুর এ মঙ্গল বিধান, এ মঙ্গল বিধান,' না হইলে তাঁহাকে হয়ত আরও কি নিদারুণ কথা শুনিতে হইবে।

অরুণকুমার দানপত্রখানি হাতে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দাদা ও সনৎ-কেও তিনি সঙ্গে করিয়া আনিলেন।

দানপত্রখানি শ্বশুরের হাতে দিয়া অরুণ কহিলেন, "পড়ে দেখুন, আপনিও সাক্ষী রইলেন।"

কাঞ্চনের পিতা কিছু আশ্চর্য্য হইয়া দান-পত্রখানির দুই এক ছত্র পড়িতেই তাঁহার মুখ সহসা কালি হইয়া গেল।

অরুণকুমার তাঁহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এ বাড়ী বৌদিদির, আপনার মেয়ের জন্য আলাদা বাড়ী ভাড়া করে রেখেচি, আপনি এখনই তাকে সেখানে নিয়ে যান। আমি তার সমস্ত খরচপত্র দেব, আর একদণ্ড এ বাড়ীতে তার স্থান হবে না।"

কাঞ্চনমালা দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া অরুণ বলিয়া উঠিলেন, "ও চুড়ি পরতে তোমার হাত ফেটে গেল না। খোল, শীগ্‌গির বৌদিদির চুড়ি খোল।"

সনৎ তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "মেজদাদা মেজদাদা কি করচ?"

অরুণকুমার নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া হেমলতার পায়ের উপর পড়িয়া অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বৌদিদি তোমার বাড়ীতে আমায় স্থান দিও।"

ভাগের পূজা

(১৩)

[লেখিকা—শ্রীমতী স্নেহলতা চৌধুরাণী]

(পূর্ব্ব পূজারীগণ :—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া (২) শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার, (৩) শ্রীমতী সরসীবালা বসু, (৪) শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম্-এ, (৫) শ্রীমতী চারুবালা বসু, (৬) শ্রীযুক্ত অজয়কুমার সেন, (৭) শ্রীমতী লীলাদেবী, (৮) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (৯) শ্রীমতী অন্নদাবতী দেবী (১০) শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায়। (১১) শ্রীমতী বিরিঞ্চিবালা দেবী, (১২) রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

কমলের কথা

শুনিছি, টেলিগ্রাফ সময়ে সময়ে খুব দ্রুত পৌঁছে যায়, আবার কখনো-কখনো বিষম দেরীও হয়। কয়েকটি ঘটনা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিছি, চিঠি আর টেলিগ্রাফ প্রায় একই সঙ্গে এসেছে, যদিও তার জন্যে দশগুণ দাম বেশী ধরে দেওয়া হয়েছিল। তবে সাধারণতঃ এরকম হয় না, দুপয়সার চিঠি আর দেড়টাকার টেলিগ্রামের পার্থক্য অনেক, আকাশ অরপাতাল—মতখানি। কিন্তু সমস্ত দিনটা কেটে গেল, তবুও প্রসাদ-টা এলো না, এতে আমার "তারের" ওপরই অবিশ্বাস হচ্ছিল। অঘটন ঘেটা, অসম্ভব যেটা, সেটা হয় ত বা আমারই দিকেই ঘটে গেল। মনে করতেও আমার গা যেন আগুন তাতে জ্বালা করে উঠ্‌ছিল। আমি কোথায় সারাদিন লোকটাকে বাড়ী ঢোকবার মুখেই ভয়ানক আশ্চর্য্যান্বিত করে দেবার কল্পনা করে কাণ দুটোকে সদর দরজার কড়ার ওপর খাড়া করে রেখেছি, আর সে কি-না আস্‌বে না? এর চেয়ে আপশোষ আর কিসে হতে পারে?

টেলিগ্রামে বেশী কথা লিখনি, খালি লিখেছি, চলে এস, বড় দরকার, মা উৎকণ্ঠিতা।

মনে মনে সমস্ত ক্ষণ ঐ কথাকটা আলোচনা করিছি, আর তার পরে প্রসাদের অবস্থাটা যে কি রকমের হবে তা'ও মনে মনে কতকটা কল্পনা করে ফেলেছি। আমার বিশ্বাস 'তার' পেয়ে সে ভারি চম্‌কে যাবে, তার পর আকাশ-পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্ত ইাতড়ে কিছুই বুঝতে না পেরে মুখটি চুণ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়বে। পথের চিন্তা যে তার কি হবে সে ত জানাই আছে, তারপর একখানা ট্যাক্সি ধরে হাওয়া ভরে উড়ে এসে শুকমুখ দরজায় দাঁড়াবে, আমার একটি সাধ আছে, নিজের হাতে দরজাটি খুলে দিয়ে একবার প্রসাদের সে-সময়কার মুখখানি দেখব, আর একবার প্রসাদ, মানতী এসেছে'—শোনবার পর তার মুখখানি কেমন হয়—সেইই নিশ্চিন্ত হব।

সত্যি নিশ্চিন্ত হব! মা'র মুখ দেখে বুঝতে পেরিছি, গরমাবৌকে পাওয়া নাইতে তাঁকে যত উদ্বিগ্ন না দেখ্‌ছি, এখন যেন তাঁকে অনেক বেশী উদ্বিগ্ন দেখ্‌ছি। আমার এই মা-টির স্বভাব এত দৃঢ়, এত গম্ভীর যে যখনই স্নেহই মানুষ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াক, তাঁর মনের কথাটি ধরতে পারবে না। অথচ সে মন যে কত উচ্চ, কত মহান্, কত পবিত্র—তা'ও জেনেছি। সেই অনেকদিন আগে, যেদিন অত্যাচার-পীড়িতা, পরদুঃখকাতরা এই নারী মূর্ত্তিকে কল্পিতাধারে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে অনিমিষে চাইতে দেখেছিলুম, সেদিন, সে মুহূর্ত্তে পশুর জ্বরেয়ও মানুষ মন্ত্র উচ্চারিত হয়ে উঠেছিল। সাধারণের মধ্যে

অসাধারণ, বৈশিষ্ট্য দেখে আমার অন্তরের কু-প্রবৃত্তি গুলো সাপুড়ের বাঁশীর শব্দে মুগ্ধ সাপের মতই মাথা গুঁজে পড়ে গিয়েছিল। তাঁর মুখের কমনীয়তার সঙ্গে এমন একটা কঠোরতা মিশে তাঁর শ্রীকে অপূর্ব্ব করে তুলতো, তাঁর আয়ত নয়নের বিস্তৃত দৃষ্টির মধ্য দিয়ে এমন এক উজ্জ্বল আভা বিকশিত হতবে, একবার যে দেখেবে, তাকে কিছুক্ষণের জন্যও মনের সেই পাষাটায় বসে বসে আঁকতে হোত। আমাকেও হয়েছিল। আমিও একে-ছিলুম, আর আপনার মনে বলেছিলুম, এমনট আর দেখি-নি।

সাপ ক্ষণেকের জন্য—যতক্ষণ বাঁশী বাজে, ততক্ষণের জন্য মুগ্ধ থাকতে পারে, মুগ্ধ থাকা তার স্বভাব নয় বেশীক্ষণ, বাঁশী থাম্‌লে তার সুপ্ত হিংস্র-বৃত্তি আবার জেগে ওঠে! কতক্ষণ পরে, ঠিক জানিনা, আমারও সুপ্তি ভেঙ্গে গিয়েছিলো। আমাকে যে কেউ মোহ-মুগ্ধ করতে পেরেছে—এ কথা মনে হতে নিজকেই আমার ঘৃণা হতে লাগল। বাঁশী থেমে গিয়েছিল, মন্ত্র যা, তা, যেখানকার সেইখানে পড়েছিল। বাড়ী আস্‌তেই, সঙ্গীদের মধ্যে আস্‌তেই আবার সেই পশু বৃত্তিগুলা মাথা তুলে বিজয়-গর্ব্বে চিরপরিচিত পথে রার হবার জন্যে পা বাড়িয়ে বস্‌লো। অনেকদিন দ্বন্দ্ব চলেছিল, আমার সঙ্গে আর সেই "মা'র" মূর্ত্তিখানার সঙ্গে। নিজের পরাজয় মেনে নিতে আমি প্রস্তুত ছিলুম কিন্তু যারা আসল কারণ বোঝবার কোন চেষ্টা না করেই করুণার বশে পরাজয়ের বিচার করবে, তাদের মুখ ভেবেই আমি পরাজয় স্বীকার করতে পারিনি। সবার চাইতে বেশী ভয় আমার ছিল, খুড়ো ম'শায়কে! খুড়োমহাশয়ের বাপ মা কোন কালে কোন দেশে কেউ ছিলেন কি-না জানিনে, খুড়ো মশায় সত্যি কথা বল্‌তে বাপের কেয়ার যে একবিন্দু করতেন না তিনি কম করে দশহাজার বার স্বীকার করেন। আর তাঁর গর্ভ-ধারিণী মা'র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, যাঁকে চোখে দেখিনি, তা'কে মানিওনে। উদাহরণ স্বরূপ খুড়ো বলেন, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মান্‌তে তাঁর খুব ইচ্ছে নেই, তবে পাহারালার পূজো দিতে প্রায়ই পাঁচসিকা সাতসিকা ব্যয় তিনি স্বেচ্ছায় করে' থাকেন। বুড়ো হয়েছেন ত, দেব দেবীর কথা উঠুক, শুন্‌বেন —বামুণগুলোর পয়সা গাঁড়া মারবার ফিকির। প্রসাদের মা'কে 'মা' শুনে বল্‌তেন, খুড়ো কোকিল কাকের বাসায় যখন মানুষ হয়, তখন মানুষই হয়, তার গলা বার করে না। মা বল, তা'তে ক্ষতি নেই, জেনো মা লোকের একটই হয়। সে মা যদি একবার মরে—খতং!

আর অমল! অমল বল্লে, ঠিক তার উল্টো। বল্লে—মা ঐ নদী আমার মা! ঐ সবুজ রঙের ধানের ক্ষেত—আমার মা! ঐ অশ্বত্থ চর্ম্মসার গাভী—মা, যে মাটির পরে দাঁড়িয়ে আছি সে'ও আমার মা! সন্ন্যাসীর মত সর্ব্বত্যাগী সাধুর মত সুনির্ম্মল বেশ, দিব্য কান্তিতে একদিন আমার ঘরে ঢুকে মা'য়ের পরিচয় জানিয়ে দিলে! বল্লে—ঐ মা, কমল, ঐ মা! ভাইরে তোর আমার, লক্ষজনের মা—ঐ!

অমল যেদিন আমার চোখের সম্মুখে মায়ের ছবিটা ফুটিয়ে তুলেছিলে, আমার স্মরণ আছে; আমার সেদিনের অবস্থাটা কতক পরিমাণে কম্পাস ভাঙ্গা সমুদ্র পোতের মতই দিগ্বিদিক হারিয়ে টাল মাটাল করছিল। কাছে কূল আছে হয়ত, দেখা যাচ্ছে না, লাগতেও পারছি নে, আবার অকূলে ভাসতেও পারছি নে। ঠিক এমনই ধারা মন নিয়ে আমি প্রসাদের মা'র অনুরোধ অনুশাসন ঠেলে কল কলকাতায় গেছলুম, আবার দুরাভিসন্ধির মত বোঝা মাথায় করে দেশে ফিরে আস্‌তে যাব, উদাসী অমল, যাদুকর অমল আমাকে ডাক দিলে!

জন্ম জন্মান্তরের আলস্য আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল, কোথা গেল, তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছিলুম,

অমল তার যাদুদণ্ড বুলিয়ে আমাকে নতুন করে গড়েছিল। তারপর—কতদিন কত রাত্রি নিজের জীবনের অতীত দিনগুলো আলোচনা করেছি ততই বুঝতে পেরেছি, অমল যদি আমার এ নূতন পথের চালক হয়, তবে সে পথের পথ প্রদর্শক একজন আছেন। সে জন আমার সেই মা! তিনি প্রসাদের গর্ভধারিনী জননী হলেও আমাকে গর্ভের সন্তান হলেই যিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথম আমার পশু হৃদয়টাকে মনুষ্যত্বের আঘাত দিয়ে চেতনা জাগাতে চেয়েছিলেন; প্রথম যিনি আমাকে মনুষ্য জাতির মায়ের সন্ধান বলে দিয়ে ছিলেন! প্রথম যিনি মা'য়ের চরণে আত্ম বলিদান দিতে আমার মত পাষণ্ডেরও অধিকার আছে বুঝিয়েছিলেন।

প্রসাদের মুখে গয়লা বৌ'র হারানোর খবর পেয়েই আমি কলকাতায় ছুটে আসি নি, আমার কলকাতায় আসবার সে একটা কারণ হতে পারে, তবে প্রধান নয়। প্রধান কারণ, আমি মা'কে দেখতে এসেছিলুম। আমার শরিবর্ত্তণে মা'র কি পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখবার সাধ যে কত প্রবল হ'য়ে ছিল আমার অন্তরে অন্তরে তা শুধু জানে এই অন্তরটাই!

মা'র পরিবর্ত্তন হয় নি। মা ত নয়, মা যেন আমার হিমালয় শৃঙ্গ। কত ঝঞ্ঝা, কত বৃষ্টি, কত ভূকম্প, কত প্রলয়, হয়ে গেছে, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন নেই—অটল, অটল, অপরিবর্ত্তনীয়।

যে অনাবিল স্নেহ ধারা সেই প্রথম দিনেই আমার পরে এসে পড়েছিল, আজও দেখলুম, তাই আছে। এটা দেখে আমি সুস্থই হয়েছিলুম। হাজার হোক্, চিরদিনের পশু ত দেবত্ব কি আর তার আয়ত্ব হয়? অভিমানে বুক ফুলে উঠ্‌লো, আজকের কমল যে, তাঁর প্রাসাদের চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়, আজ দেশের সুসন্তানদের সংস্পর্শে তারও মালামাটি ধুয়ে খাটি সোনা বেরিয়ে পড়েছে, তা জেনেও যিনি তার প্রাপ্য ন্যায্য পাওনা না দেন, তাঁর জন্মরহস্যের উচ্চতার প্রতি শ্রদ্ধা কারই বা থাকে যে আমার থাকবে। আমি ত ঠিক করে ফেলেছিলুম এমন ঠাকুরদের উত্তর আমি দিয়ে যাব। আর সে উত্তর যাতে বেশ করে তাঁর মর্ম্মে ঘা দেয়, তাও করে যাব। আমি এদের বাড়ীতে জল গ্রহণও করব না। আমার কর্ত্তব্য ছিল সাক্ষাৎ করা, করেছি, তার বেশী আর নয়।

অবোধ, মূর্খ দাম্ভিক যে—সে আর কত ভাল ভাবতে পারে! কূপমণ্ডুক ত সূর্য্যের কিরণ যে কি, তার কণাটুকু যে কতখানি সে তা বুঝবে কেমন করে! সে না বুঝুক, সূর্য্য ত অসুরের নন, পাপী তাপী সকলের ওপরই যে তাঁর সমান করুণা, তা থেকে বঞ্চিত সে হলো না, কাজেই তাকে না চেনার অপরাধ তারই সূর্য্যদেবের নয়। এটা আমি বুঝলুম মা'র মুখের একটী কথায়!

গয়লা বৌ মূর্চ্ছা ভঙ্গে মা'র কোলে মাথা রেখে যখন সেই খেসার ঘরের অভিজ্ঞতা বলছিল, চারি বলে একটি মেয়ে কেমন কল কৌশল খাটিয়ে তার ভাইকে দিয়ে' প্রকৃতির' বড় বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল, বড় বাবু তাকে দেখে, চারির ভায়ের মুখে তার কথা শুনেই মা বলে ডেকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে নিজের মেয়ে পরিচয় দিলেন, তারপর ক'দিন তাঁর আজ্ঞায় বাড়ীর সবাই তাকে কত যত্ন রেখেছিলেন, কিন্তু কাউকে তিনি কোন প্রশ্ন করতে দেন্ নি, নিজেও করেন নি, কেবল একদিন বলে-ছিলেন মা মালতী, আমার কাগজে একটী বিজ্ঞাপন দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ত্রিশ চল্লিশ হাজার লোকের হাতে আমার কাগজ যায়, তাদের মধ্যে তোমার কোন আত্মীয় যদি দেখ্‌তে পান, তিনি নিশ্চয় এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন, আর যদিই তাঁদের দৃষ্টি না পড়ে কি কোনো কারণে তাঁরা তোমাকে না নিতে আসেন, এই ত তোমার ঘর রয়েছে মা, এই ঘর এই সব আপনার লোক, এদের নিয়েও কি তুমি থাকতে পারবে না!

কদিন কেটে গেল, কেউ এল না দেখে, তিনি একদিন খাবার সময় মালতীকে ডেকে বল্লেন—তুমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে রাঁধতে জান না বল্লে তোমার অসম্মান করা হবে, মা, আমার ইচ্ছে একদিন তুমি রেঁধে আমাদের খাইয়ে দাও!

গয়না বৌ হুলতে লাগ্‌ল, বড় বাবু বল্লেন, ভেবো না মা, আমার জাত যাবে। সে ভাবনা নেই। আমরা ব্রাহ্ম, জাত আমাদের কোথাও যায় না, ভাঙে না, ঠিক থাকে।—কিছুতে ছাড়লেন না, সেদিন দুপুরবেলা যা জানতুম রেঁধেছি, পবিতোষ হয়ে খেয়ে কত আশীর্ব্বাদ করলেন, আমরাও খেতে বসেছি, এমন সময় হাসিমুখে এসে বল্লেন—মা-মালতী, প্রকৃতির বিজ্ঞাপনে কার হয়েছে, তোমার আমীর এসেছেন, নাম বল্লেন—কমল!

গয়না বৌ-কে নতানমে নীরব হতে দেখে মা বল্লেন—বল মা, লজ্জা কি! তার পর?

পিসিমা আমার ভয় হয়েছিল···

বল মা বল!

তারপর—তোমার নাম করলেম! তোমার বাড়ী শুনে···

সে থাম্‌ল। বাকীটা আমারা বুঝতে পারলুম। মা বল্লেন—মালতী কমলকে দেখে তোমার ভয় হয়েছিল, হবারই কথা, তুমি ত জান্‌তে না—কমল সে কমল নেই! স্বর্কমল হয়ে গেছে। কমল প্রসাদ' আমার দুই ছেলে। এদের রেখে যেতে পারলে আমার কোন দুঃখ থাকবে না।

হাতে অবোধ সুরু! তোর অভিমানের ত এই পদার্থ! মা'র ঘরেই একটা পশমের ছবি টাঙ্গানো দেখেছিলুম লেখা ছিল—

কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনো নয়!

তাও কি কখনো মিথ্যা হয়?

মা বোধ করি দশবার গাড়ীর খবর নিয়েছেন! আমারই মনে ভাবনার অন্তছিল না, 'তার' পেয়েও প্রসাদ কেন আস্‌ছে না, মা'র ভাবনা যে কত কী তা আর আমি নে, না, বুঝিনে!

রাত হয়ে গেল। অন্ধকারে ছাতে শুয়ে রাজ্যের কারণ খুঁজে বেড়াতে লাগলুম, কোন্‌টা প্রসাদের আগমনের বিঘ্ন হতে পারে! কারণ ত কল্পনায় এক লক্ষেরও অধিক বার করলুম কিন্তু কোনটাই মনঃপুত হল না। 'মা উৎকণ্ঠিত'—এ খবরের চেয়ে প্রবাসের কাছে বেশী মূল্যবান খবর যে কিছু থাকতেও পারে না, সেটা খুব ভাল জানতুম বলেই দুর্ভাবনা হ'তে লাগল। লোকের মনের খবর আমি জানি নে, আমার নিজের কথা বল্‌তে পারি, প্রসাদের সম্বন্ধে দুর্ভাবনা আমার মনে স্থায়ী হতে চাইল না! লোকে বলে বটে আপনাদের লোকের জন্যে অল্পেই দুশ্চিন্তার উদয় হয় কিন্তু আমার তা হয় নি।

খুব মনের জোর নিয়েই তাই রাত্রে বিছানা নেবার আগে মা'কে বল্‌তে পেরেছিলুম, আমার মনে হচ্ছে, টেলিগ্রাফ পৌঁছোয় নি মা!

মা—তা হ'বে—বলে চলে গেলেন।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, কি আমি চাই? উত্তর হল, গয়না বৌ-কে সুখী করতেই আমি চাই। প্রশ্ন—তা কেমন করে হবে? উত্তর—প্রসাদকে সে ভাল বেসেছে, সেটা ত আর বাকোই অজানা নেই, তার সঙ্গে বিয়ে হলেই সুখী হবে।

অসবর্ণ বিবাহ আইনতঃ অসঙ্গত নয়। তবে সমাজতঃ অন্যায় হতে পারে। কিন্তু সে সমাজ, প্রাণহীন জড়ের সমাজ! সে সমাজে আন্তরিকত নেই, অনুভূতি নেই, কেবল আগেকার সমাজের ভেতরটা কৃমী-ভুক্ত কদবেলের মত অন্তঃসার শূন্য খোলায় ঠেকেছে। মানুষ যে, যার প্রাণ আছে, তার কাছে এ সমাজের দাম খুব বেশী নয়, সে অনায়াসেই এমন সমাজের গণ্ডীর বাহিরে আসতে পারে, এসে বেঁচে যায়ও।

আমি নিজে মানি নে। তবে আমার না-মানার কারণ এ নয় যে শুদ্ধ লোকাচার পূর্ণ সমাজকে আমি অশ্রদ্ধার চোখে দেখি বলে! তা মোটেই

নয়! আমার না-মানার একমাত্র কারণ, আমি গ্রাহ্য করি-নে। ক্লিসের সমাজ ও? কেন সমাজ! কি কাজ করেছে? কার কতটুকু উপকারে লাগে?

প্রসাদ মানে, তবে তার মানার মধ্যেও খানিকটা বৈচিত্র আছে। সমাজে থাকব বলে সে মানে না, এই খোলাটার ভেতর শাঁস পুরে আবার তাকে একদিন পূর্ণ করবে এই আশায় সমাজকে সে মানে আর রক্ষা করে চল্‌তে চায়। কিন্তু তা করলে তার চল্‌বে না। আমি তা'কে দিয়ে নতুন সমাজ গড়াব। আমার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ সহায় হবে, গয়না বৌ,—মালতী!

অসবর্ণ বিবাহ করে প্রসাদ এক ঘরে হয়, আমি গিয়ে তাকে ছ'ঘরে করব। আর এ গর্ব্ব আজও কমলচন্দ্র করতে পারে যে সমাজে সে, আর প্রসাদ থাকবে, সে সমাজ একঘরে নয়, শতঘরে, সহস্রঘরে হয়ে পড়তে দেরী হবে না।

প্রসাদের কথা।

অমলের হাতে টেলিগ্রাম খানা দিয়ে বলুম, 'ভাই কিছু বুঝতে পারছ?

অমল অনেকক্ষণ লাল কাগজখানায় চোখ রেখে চুপ করে বসে রইল, তারপর গম্ভীরভাবে বলে উঠ্‌ল —তোমার যাওয়া উচিত, প্রসাদ!

উচিত ত, কিন্তু যাই কি করে বল! এখানে-ও ত কাজ কম নেই।

অমল বল্লে-তা আর কি করা যাবে বল! একটা বিশেষ কিছু না ঘট্‌লে আর কমল জরুরী তার করত না, এটা বুঝছ ত?

মনে-মনে সেটা যে না বুঝছিলুম তা নয় কিন্তু কাজ ও ছিল সেদিন আমাদের অনেক। সে দিন আমরা দেশের সমস্ত চাষীকে মাঠে এমাযেৎ হতে বলে এসেছি। তাদের নিয়ে আমাদের একটা মস্ত কাযের খড়া করতে হবে। আমরা দেশ থেকে পাটের চাষ উঠিয়ে দিয়ে ধান, তুলো এ সবের চাষ তাদের দিয়ে করাতে চাই। প্রথমে তাদের কিছুতেই রাজী করা যায় নি। ঘরে ঘরে গিয়ে দেখেছি, প্রত্যেক-কে আলাদা বুঝিয়েছি, অনুনয়, বিনয়, কিছুতেই কিছু হয় নি। তারা তাদের পিতৃ পিতামহদের ওপা খুব শ্রদ্ধাবান তাঁরা যে কাজ করে গেছেন, তারা তা'ত করবেই, তার কম বেশী একচুল করবে না, করলে তাঁদের তাঁদের অশ্রদ্ধা করা হবে এই তাদের মত। তার ওপর স্বার্থের সম্ভাবনা যেখানে অধিক, সে পথ ছাড়ানো ও ত সহজ নয়। তাই যখন তাদের আলাদা আলাদা মত করাতে কিছুতেই পারা গেল না, তখন আমরা তাদের সকলকে বড় ভুঁইয়ের মাঠে জমা হতে বলে এসেছিলুম যেখানে আমরা তাদের বুঝিয়ে দিতে চাই, পাটে আর তুলায় প্রভেদ কি আর কতখানি।

পাটের বীজ বোনবার সময় এসে পড়েছে, আজকাল মধ্যেই সবাই জীজ বুনে ফেল্‌বে, এখন একদিন এখান'থেকে চলে গেলে ফল যে কি দাঁড়াবে তা খুব ভাল করে জানি বলেই কমলের জরুরী তার পেয়েও ছুটতে পাচ্ছি নে। আমার মা উৎকণ্ঠিত জেনে ও পায়ের শক্তি হারিয়ে বসে আছি। আমি আমি জানি, মা আমার না-যাবার কারণ জান্‌লে কখনই আমার উপর বিরক্ত বা ক্ষুণ্ণ হবেন না কিন্তু সেটা জানবার উপায়ই বা কি? তার' করে দেব? 'তার' অবশ্যই এখনই পৌঁছে যাবে, মা'র ভাবনা ও আর থাকবে না, কিন্তু—কিন্তু—তা'তেও আমার মনের ব্যাকুলতা বিদূরিত হবে কি?

কমলের তারের দরকার, তার কোন উল্লেখ না থাকলেও ও আমি বুঝতে পারছিলুম, অভাগিনী মালতীকে পাওয়া যায় নি, তারই জন্যে মা উদ্‌গ্রীব, সেই জন্যই আমার আহ্বান! কমল পারে নি নি তাকে খুঁজে বার করতে, পারা অসম্ভব ছিল কিন্তু আপন স্বার্থ বিজড়িত ছিল বলেই অন্তরণ

কল্পনা করে আমি অন্তরে সুখের আস্বাদই অনুভব করছিলুম। কমল অনেক খবর রাখে, অর্থবান, লোকবলও তার যথেষ্ট, তার চেষ্টায় সত্যিই মালতীকে হয়ত আমরা ফিরে পাব, এই-আশালতাটিকে আমি অন্তরের বারি সিঞ্চনে জাগিয়ে রেখেছিলুম, কমলের তার পেয়েই আমার সে আশালতা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গেলো!

তাকে ফিরে না পাওয়ার যে দুঃখ—নতুন করে আবার জেগে উঠ্‌লো! এই বলে মনকে প্রবোধ দিলুম, আমার কোন হাত নেই।

কিন্তু এ প্রবোধ ত মন মান্‌তে চায় না। সে যে বায়ুতাড়িত তরণীটির মতই ধেয়ে যেতে চায়, সেইখানে সেই অজানা অচেনা স্থানে যেখানে অভাগিনী মালতী আপন-হারা বিভোর হয়ে পড়ে আছে। দুটি নয়নে তার শত ধারা বইছে!

অমল এ-সব জান্‌ত না, আমি তাকে না বলে পারলুম না। ব'লে যেন বুক খালি হয়ে গেল।

অমল বল্লে—আমি এদের হাতে পায়ে ধরে একটি দিনের সময় চেয়ে নেব, তুমি একদিন ঘুরে এস।

আমি বল্লুম, ভাই অত বড় সহরে কোথায় সে আছে, একদিনেকি তাকে খুঁজে পাব!

অমল বল্লে—পাবে, পাবে, নিশ্চয় পাবে! আমি বল্‌ছি—পাবে।

আমাদের মধ্যে অমল ছিল, সত্যবাদী ঋষি! তাকে আমরা ভালবাসতুম, শ্রদ্ধা করতুম, ভক্তিও করতুম। তাই তার কথা শুনে সত্যিই আমার মনে হল, হয়ত পাব! কিন্তু আর একদিনের অক্লান্ত শ্রম যে বিফল হয়ে গেল, তাও তখনি জানি না, সে কথাও বল্লুম।

শুনে অমল বল্লে—সেদিন তুমি তাকে খুঁজে-ছিলে বটে প্রবাস, কিন্তু এমন করে হৃদয় দিয়ে খোঁজনি!

খুঁজি নি?

না। সেদিন তুমি মালতীকে খুঁজতে বেরিয়েছিলে, তোমার মালতীকে খুঁজতে যাও নি, গেলে পেতে!

অমল…

শোন! হৃদয়কে বঞ্চনা কর না, এই মালতীকে তোমার চাই। আমার মতে তুমি এখনই কলকাতা চলে যাও! গিয়ে মালতীকে খুঁজে বের কর। তারপর…

অমল এক মিনিট থেমে বল্লে—প্রসাদ, দেশের কায করতে হৃদয় চাই, সে হৃদয় যদি অন্য কোথাও বাধা পড়ে থাকে, তা হলে দেশের কায় করবে কেমন করে ভাই! দোহাই প্রসাদ! হৃদয়কে উপবাসী রেখে দেশের কায করতে নেমে মিথ্যা পণ্ডশ্রম কর না। আমার কথা শোন প্রসাদ, আজই চলে যাও!

আমার মাথার ভেতর তখন কি-যে হচ্ছিল, আমিই জানি নে! কোন কথাই স্থির ভাবে ধারণা কর্‌তে পার্‌ছিলুম না, বল্লুম—ভেবে দেখি অমল!

অমল বল্লে—ভাবতে সময় লাগে, সময় চিরদিন বিশ্বাস-ঘাতক!

কিন্তু মা'র মত ত জানি নে মা!

তার দরকার নেই! মা যে প্রসাদ! সন্তানের মা কি সন্তানের মতের বিরোধী হতে পারেন!

বল্লুম—তাহ'লে কাল সকালেই যাব।

অমল ঘাড় নেড়ে চলে গেল, রাত তখন ১২টা।০

---

* শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ আগামী মাসের পূজার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিষয়বুদ্ধি।

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

ঈশোপনিষদে আছে, "সমস্তই ঈশ্বরময়, ইহা অগ্রাহ্য হইয়া বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ কর।" বাস্তবিক এই বিষয়বুদ্ধি ত্যাগের মূল কারণ, বাহিরের মোহ কাটানো আমাদের যত কাটিবে, ততই ভিতরের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। আত্মশক্তিতে আমরা নির্ম্মল আত্মানন্দ সম্ভোগ করিতে পারি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর, তপস্যাই ব্রহ্ম।" আবার কৌষীতকী উপনিষদে আছে, "আমাকে জান, আমি ইহাই মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর মনে করি যে সে আমাকে জানিবে।" মানুষের মধ্যে এই যে ভগবানকে জানিবার ইচ্ছার অধ্যবসায়, ইহাই যদি তপস্যা হয়, বা ব্রহ্মলাভের চেষ্টা হয় এবং সমস্তই যদি ঈশ্বর সৃষ্ট বলিয়া ধারণা করিবার মনন শক্তি লাভের জন্য আমরা ব্যাকুল হই, তবে বিষয়বুদ্ধি সত্য সত্যই কতক্ষণ আমাদের বিশুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে!

বিষয়ের সঙ্গ হইতে কামের অর্থাৎ কামনার জন্ম। কাম হইতে ক্রোধ, লোভ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধি নাস, বুদ্ধিনাস হইতে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। গীতার এই মহতী বাণীর প্রচারের মূল বিষয়ও কামনার সমালোচনা। মন ও বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের কর্ত্তাও কর্ম্ম। এই মনই যখন আত্ম বিষয়ে কামী, তখনকার বিষয়বুদ্ধি আমাদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। এই মনই যখন বহি বিষয়ে কামী, তখনই সঙ্গ হইতে কাম আমাদের ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। তখন সমস্তই যে ঈশ্বরময়, এ ধারণা আর আমাদের থাকে না। তপস্যা যে ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে জানাই যে উন্নতি বা মুক্তির কারণ, সে কথাও আর মনের মধ্যে স্থায়ী হয়না। আমাদের বিষয়বুদ্ধি আমাদের পাইয়া বসে। বিষয়বুদ্ধি বলিতে তখন আমাদের বহির্বিষয়ের বিকারই বুঝি ইহাই বিষয় ভোগের স্পৃহাকে জাগরিত করে।

মনোদর্পণে বুদ্ধির বিশেষ বিকাশ যখন যাহার প্রবল, আমরা তখন তাহার বিষয়বুদ্ধির বড় প্রশংসা করি। বিষয় যদি সমাজের, ব্যক্তির বা পরিবারের বুদ্ধির, অবস্থার ও স্বার্থের অনুকূল হয়, তবে বিষয়বুদ্ধি বড় পাক বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু পাক কথাটা আপেক্ষিক শব্দ। এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা অনুকূল, অন্যের পক্ষে তাহা প্রতিকূল। সুতরাং যে সমাজে বা পরিবারে যত সংখ্যক ব্যক্তির প্রতিকূল অবস্থা হয়, সে সমাজে বা পরিবারে বিষয়বুদ্ধির বিরোধ তত পাকিয়া ওঠে। ফল পাকিলে গাছ যেমন পড়িয়া যায়না, ফলই ঝরিয়া পড়ে, ঝড়ো পাকিলে কি হয়, তাহা সকলেই জানেন। সে ঝড়ুতি পড়্‌তির ফলে সমাজারণ্যের বড় বড় গাছ গুলিও সমূলে কর্ম্মফলের সমস্ত বোঝা বহিয়া অকালে মরিয়া যায়।

কিন্তু এই ফল মিহামিহি ঝরিয়া না পড়িলে বিষয় বুদ্ধির বড় প্রশংসা হয়। সংসারের ঝড়ে যে ঝড়িয়া যায়, তাঁর বিষয় বুদ্ধি পাকা কি কাঁচা, প্রসিদ্ধ লোকের হইলে তার জন্য জীবনী লেখা হয়, বংশের, সমাজের, বা জাতির হইলে তার জন্য ইতিহাস লেখা হয়। এই চেষ্টাও বহুদিন হইতে চলিয়াছে, কিন্তু বিষয় বুদ্ধির সঠিক সংজ্ঞা আজও কেহ দিতে পারেন নাই।

অথচ এই বিষয় বুদ্ধি না হইলে বিচার বুদ্ধি নাকি মোটেই থাকে না। পাক বুদ্ধির লোক কর্ম্মবীর না হইলে পৃথিবীর উচ্ছন্ন যায়, সমাজ অধঃপতিত হয়, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়। হাকিমের বিষয়বুদ্ধির ও ব্যবহারজীবীর বিষয়বুদ্ধির বিচারের সাধারণ নাম মীমাংসা। সমগ্র মীমাংসা শাস্ত্রের মূলে এই বিষয়বুদ্ধি। সমগ্র জাতির উত্থান পতনের মূলে এই বিষয়বুদ্ধি।

এই বিষয়বুদ্ধির শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। সমাজরূপ বিশ্ব বিদ্যালয়ে এই শিক্ষার শেষ পরীক্ষা গৃহীত হয়। সকল দেশেরই ইহা সাধারণ কথা। অথচ কি সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয়ে, কি সমাজের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কোথায় ও বিষয়বুদ্ধির পাকা কথা শুনিলে উপনিষদ ও গীতার পক্ষে বিরোধ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না, এমন কথাও অনেকে বলেন।

ফরাসী পণ্ডিত রুষো বলিয়াছেন, "সমাজের সংসর্গেই আমাদের অবনতি ও অধঃপতন আরম্ভ হয়, আসলে আমরা আদবেই লোক খারাপ নয়।" বিষয়বুদ্ধির বিশ্ববিদ্যালয়ে রুষোর স্থান একদিন না একদিন নির্দ্দিষ্ট হইবেই। টলষ্টয় বলিয়াছেন, "মানুষ স্বার্থপর হয়, হীন হয় সমাজের ও ব্যক্তির অত্যাচারে।" বিজ্ঞান পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বংশা-নুক্রম দুইই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পেনহ্যার্ট মিস অষ্টেও পুরুষকারকে পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া এই বিজ্ঞানের মতেই সায় দিয়াছেন। নানামতে বিষয়বুদ্ধি জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। মানুষ যেখানে বিষয়বুদ্ধিতে হারিয়া একান্ত নিরাশ হইয়াছে, সেখানে অদৃষ্টকে মানিয়া দুঃখের দিন ক'টা গণিয়া গিয়াছে। যেখানে বিষয়বুদ্ধিতে জিতিয়াছে, বা জিতিবার আশাও পোষণ করিয়াছে, সেখানে পুরুষকার আশার আশায় দিন কাটাইয়া, সাফল্যের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, বিষয়বুদ্ধির যথেষ্ট তারিফ করিয়াছে।

হেগেল, স্পেন্সারের। উপনিষদ মন ও বিষয় লইয়া ঘাঁটিয়া আমাদের উপনিষদের সঙ্গে আমাদের বিষয়বুদ্ধিকে আরও তোলপাড় করিয়া দিয়াছেন। হেমার্সন বলিয়াছেন, "বিষয়বুদ্ধির বাহাদুরী জ্ঞানে নয় কৌশলে।" আসল কথা, বিষয় ও বুদ্ধির যুগল মিলনে ব্যক্তির প্রশংসা কৌশলেও বটে, জ্ঞানেও বটে।

কৌশলে জ্ঞানী হওয়া যায় না এমন কথা নয়। অন্ততঃ জ্ঞানী হইতে না পারিলেও বিজ্ঞানের কৃপায় নাম যশঃ লাভ সম্ভব হইতে পারে। জ্ঞান ও কর্ম্মের সঙ্গে মিলিয়া জ্ঞানী ও কর্ম্মী কৌশলী হইতে না পারিলে রাজনীতির কুহক বিস্তার প্রভাব অনেকটা কমিয়া যাইত। আবার মজা এই যে, যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া সাধু বলিয়া, কর্ম্মী বলিয়া, ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া যাঁহাদের শুধু প্রসিদ্ধি আছে, একটা জাতির ধর্ম্ম, সমাজ, যাঁহাদের কর্ম্ম ও জ্ঞানের পরিণতি; তাঁরা ছিলেন সাদা সরল— কৌশল তাদের থাকিলে সঙ্কেতিপি বিধ থাইতেন না, যিশুখ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইতেন না। উপনিষদের ঈশ্বরময় জ্ঞান তাঁদের বিষয় বুদ্ধিকে বারম্বার পরাস্ত করাইয়া ত্যাগধর্ম্মে তাঁহাদের দীক্ষিত করাইয়াছেন। তাই নিত্যের ভবিষ্য দুঃখ, নৈত্যের মধ্য দিয়াই তাঁরা মহত্বকে পাইয়াছিলেন। তপস্যা যে ব্রহ্ম, দুঃখ বরণ যে ব্রহ্মলাভের তপস্যাও ত্যাগের ভিত্তি বিষয়বুদ্ধি তাহা স্বীকার করে কই! যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা ত্যাগী বুদ্ধ। বিষয়বুদ্ধিও যেমন তাঁদের নাই, সম্ভোগের ইচ্ছাও তেমন তাঁদের নাই। কামিনী ও কাঞ্চনের সঙ্গে গলাগলি করিলে বিষয়-বুদ্ধি বাড়ে, আর দলাদলি করিলে ত্যাগের মন্ত্রেই দীক্ষিত হইতে হয়। কিন্তু প্রবৃত্তি পর নিবৃত্তি। বিষয়বুদ্ধি হিসাব নিকাশের মীমাংসার পর হইল কামিনী কাঞ্চনে বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের যদি বিষয়ে অনুরাগই রহিল, তবে বিষয়ী বলিলে রাগ করিয়া বাসনার রাগ রাগিনীর সুরই বারম্বার শুনিতে হয়।

বিষয় বুদ্ধি আসতে সন্তোষের কথা। এই সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বের মূলে যেমন বিষয় বুদ্ধি, বিষয় বুদ্ধির মূলেও তেমন সন্তোষ। জাতি ত্যাগ ধর্ম্মে দীক্ষিত নয়, সমাজ ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষিত নয়। যদি কামিনী ও কাঞ্চনের বিষয় বুদ্ধি মানুষের মনে না থাকিত, মানুষ জাতি ও সমাজ গড়িত না। বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ সাধন সাপেক্ষ, ভোগেও অভিজ্ঞতার অবস্থা। কিন্তু আজন্ম ত্যাগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত মানুষের

অবস্থার মীমাংসা করিতে যাইয়া পূর্ব্ব জন্ম, বংশানু-ক্রম প্রভৃতি স্বীকৃত হইয়াছে। শুকদেব গোস্বামীর ইতিহাস লইয়া বিষয় বুদ্ধির হিসাব চলিবে না। বলিয়া ভোগীরা ত্যাগীকে তিরস্কার করে, ত্যাগীরা ভোগীদের সন্মজ্ঞানের জন্য তাদের দর্শকের গুণে বিতরণ করে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই উপায়ে সকল দেশে, সকল বেশে, সকল সমাজে বিষয় বুদ্ধির পাকা হিসাব যখনই যেমন হউক না কেন, আবার কাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু সমাজ বা জাতিরও মজা এই যে, শেষ পর্য্যন্ত সমাজের বা জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা বিষয় বুদ্ধির বাহিরেই মানুষকে শান্তির অব্যাহত অবস্থার কথা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। সকল দেশের উপনি-ষদ জয় যুক্ত। সকল দেশের ত্যাগী, জ্ঞানী-কর্ম্মীই আত্মজয়ী, বিশ্বজয়ী।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ

(গল্প)

(শ্রীহেমন্তকুমার সরকার)

ছেলেটির মুখখানি ছিল কচুলি আমের মত— গোঁফ জোড়াটি এমন ক'রে ছাঁটা যেন দেখে মনে হয় নাকের নীচে দুটো চামচিকে ঝুলছে—চোখে ফাঁদি নএর মত গোল গোল দুটো চশমা—চুল এমন ভাবে ছাঁটা, আর তার পা'টে যেমন—তাতে দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন মাথাটা একটা ভাদুরে তাল।

ফাগুনে হাওয়া কলকাতার রাস্তার ধুলো উড়িয়ে তার গায়ে এসে স্পর্শ ক'রে কি একটা অলস শিহরণ জাগাচ্ছিল, খাঁচার মধ্যে থেকে পাশের বাড়ীর কোকিলের কণ্ঠমতান কি একটা মদির মূর্চ্ছনায় প্রাণকে কাতর করছিল—রমণীমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুটস্বরে রাস্তায় চলতে চলতে বললে—হায়, রূপ-যৌবন আমার বৃথায়ই গেল।

যেতে যেতে একটা গলির মোড়ে এসে দূরাগত বীণাঝঙ্কিনিবৎ অপ্সরার কলকণ্ঠের গীতিধ্বনিবৎ একটা সুরের স্রোত ভেসে এসে তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে গিয়ে পশ্‌লো। মন প্রাণ দস্তর মত সঙ্গে সঙ্গে আকুল হয়ে উঠ্‌লো। একটি দো-তলা বাড়ীর জানালার পাশে পিয়ানো বাজিয়ে গলা ছেড়ে এক বিরহ-বিধুরা কিশোরী গান গাইছিল। জানালার পর্দ্দাখানা বাতাসের ধাক্কায় এক একবার স'রে যায়—কিন্তু এমন সরে না যাতে গায়িকার রূপ চোখে পড়ে।

"তরী তোমার সাগর নীরে
আমি ফিরি তীরে তীরে
ঠাঁই হ'ল না তোমার সোনার নায় গো।"

এই দুটি লাইন গেয়েই গান শেষ হ'য়ে গেল। রমণীমোহন মনে মনে ঠাওরালেন—ঐ মেয়েটা নিশ্চয়ই তাকে ভালবাসে। সে যে ছেদোর ধারে সকালে বিকেলে দাঁড়িয়ে থাকে—কলেজ যাওয়ার সময় গাড়ী থেকে ঐ মেয়েটা তাকে নিশ্চয়ই দেখে ভালবেসেছে। তাই আজ ফাগুনের বাসন্তী সন্ধ্যায় তাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে অনুযোগ ক'রে এই দুটো লাইন গেয়েছে।

১১৭ নম্বর চণ্ডীদাস ঠাকুরের লেন—এই ঠিকানাটা দেখে নিয়ে রমণী সেদিনকার মত বাড়ী ফিরলো। গিয়ে মনে ভাবল মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিয়ে একখানা চিঠি লিখি—কিন্তু তার বাপ মা যদি খুলে দেখে এই ভয়ে লিখলো না। মতলব ঠাওরাল সেই মাসিকখানায় একটা কাল্পনিক চিঠি ছাপিয়ে দেওয়া যাক। ওরা যে রকম fashionable তাতে ঐ পত্রিকা নিশ্চয়ই তাদের বাড়ী যায় চিঠিখানি এই :—

৪৯ নম্বর নবনলিনী লেন,
কলিকাতা

প্রিয়তমাসু,

জীবন-সমুদ্রে একা-একা ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় চলেছিলাম জানি না—আজ কিন্তু তোমার প্রেমের ডাকে আমায় আবার ফিরতে হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি জগতে অন্ততঃ একটি প্রাণীও আমায় কত ভালবাসে। তুমি যে গান গেয়ে জানিয়েছ আমার সোণার নায় তোমার ঠাঁই হয় নি—তাই কত ব্যথা পেয়েছ। আমি তোমায় খুঁজে পাই নি—তাই সাগর-নীরে আমি তরীখানি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—তুমি সে তরীতে ঠাঁই চাও জেনে আজ আমার দিনের পর দিন তরী বাওয়া সার্থক হয়েছে। তোমার মতামত আরও স্পষ্ট ক'রে জানতে পারলে এক তরীতে দুইজনের ভাষার বন্দোবস্ত শীগ্‌গির করতে পারবো। ইতি—

তোমার মিলনাকাঙ্ক্ষী
সুবিমল রায়।

মাসিক পত্রিকার একটা গল্পের ভিতর এই চিঠিখানা পড়ে লতিকার বুক আশা-আশঙ্কায় দুরু দুরু করতে লাগলো। সুবিমলকে সে এত ভালবাসে, কিন্তু সে কোনও দিনই লতিকার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই দেয় নাই! বিদ্যা বুদ্ধি রূপে গুণে যে প্রথম দর্শনেই তার হৃদয়ের দেবতা হ'য়ে বসেছিল, এত ভাগ্য কি হতভাগিনী লতিকার হবে যে তাকে এমনি ক'রে হঠাৎ ডেকে কোলে নেবে। লতিকা ঐ মাসিকপত্রেই একটা বেনামী পত্র লিখে তার ভিতর সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা দিল,—

১১৭ নম্বর চণ্ডীদাস ঠাকুরের গলি
কলিকাতা

প্রিয়তম,

তুমি যে এ অভাগিনীর প্রতি কোনও দিন মুখ তুলে চাইবে এ স্বপ্নেও ভাবিনি। তোমার চরণে আমার জীবন পুষ্পকে উপহার দেবার সম্ভাবনায় আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে এ ক্ষুদ্র পত্রে তা' কি জানাবো। তুমি বিলেত ফেরত নও বলে বাপ মা কিছুতেই তোমার সম্বন্ধে রাজী হবেন না। এই মাসের ১৫ই তারিখে হাওড়া ষ্টেশনে পাঞ্জাব মেলের একখানা সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ গাড়ীতে আমি মধুপুর রওনা হবো। তুমি বর্দ্ধমানে এসে ঐ গাড়ীখানা খুঁজে নিয়ে উঠবে। আমি একাই থাকবো—বাতি বন্ধ করা থাকবে। তারপর দুজনে যেখানে ইচ্ছা রওনা দেওয়া যাবে। ইতি

তোমারই
কমলিনী

১৫ই তারিখে বর্দ্ধমানে যথানির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে রমণীমোহন গিয়ে উপস্থিত। লতিকা আস্তে আস্তে তাকে কাছে টেনে নিয়ে কত স্নেহে কত কথা বলতে লাগলো—রমণী তো অবাক, এ মেয়েটা পাগল নাকি—এ আবার কার কথা বলে? সে বুদ্ধিমানের মত চুপ ক'রে গেল—কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত বিপদ সম্ভাবনায় তার হৃৎকম্প হ'তে লাগ্‌লো। রাত অনেক হ'য়ে এল—শোওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রে লতিকা বিছানা পাততে আলো জ্বালতে গেল। রমণী ভাব্‌লো চলন্ত গাড়ী থেকে ঝাঁপ দিই—এ আবার কি বিপদ! আলো জেলে লতিকার মুখ চুণ হ'য়ে গেল। সুবিমল মনে ক'রে সে এ কা'কে জোটালো?

অজ্ঞাত পরিচয়ের সেই প্রথম সূত্রপাত হতেই সেই অপরিচিতের সঙ্গেই তার জীবনের গ্রন্থি বন্ধন বিধাতার ইচ্ছা ব'লে লতিকে গ্রহণ করতে হ'লো।

সুবিমল রমণীরই বন্ধু ছিল—পরে সকল কথা জেনে সুবিমলের আর হাসি ধরে না—কিন্তু লতিকাকে মাঝখান থেকে পেয়ে রমণী খুবই সুখী হয়েছিল এবং তাকে সুখী করতেও পেরেছিল।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and
Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

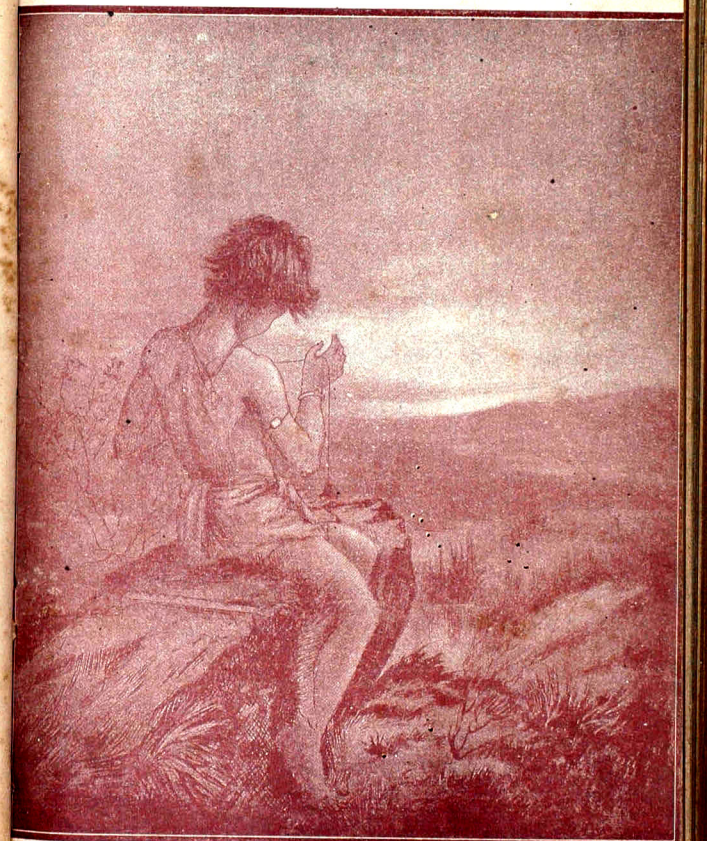

...ার প্রেস—নিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অবসরে।

(প্রভাতীর সৌজন্যে)

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

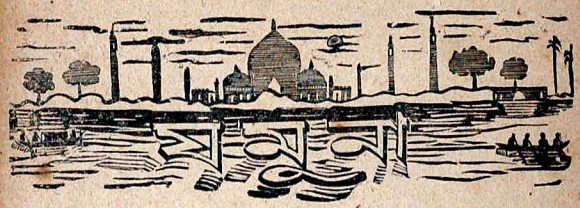

১৩শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩০ { ৩য় সংখ্যা

শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনের

সভাপতির অভিভাষণ

(অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

সমবেত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী বন্ধুগণ!

আজ আমাদের বড় শুভ দিন। বাঙ্‌লার বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের লীলাভূমি শান্তিপুরে বঙ্গবাসীর পুজোপচার লইয়া তাঁহার ভক্ত সুধীমণ্ডলী সমবেত। এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভের অধিকার পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তারপর বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগকারিগণ আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে এই সম্মানিত ও গৌরবান্বিত পদে বরণ করিয়া আপনাদের উদারতা ও মহানুভবতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা আমার নাই। এইরূপ সাহিত্য-সম্মিলনে নেতৃত্ব করিবার মত শক্তি আমার নাই জানিয়াও কেন যে আপনাদের সাদর আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়াছি—কৈফিয়তে এই মাত্র বলিব—বৈষ্ণবতীর্থবাসীদের অসন্তোষ উৎপাদনের সামর্থ্য বা সাহস বৈষ্ণবদাসানুদাসের নাই।

আজ আমরা যেখানে সম্মিলিত হইয়াছি, তাহা অতি প্রাচীন স্থান। কত প্রাচীন, তা বলিতে পারি না। এক সময়ে যে স্থানটী জনময় ছিল, তার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আবার এক সময়ে যে ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। এমনও সময় ছিল, যখন

শান্তিপুর একটী সামান্য পল্লীগ্রাম আবার এখন [illegible] হইয়াছে। [illegible] যায় নাই। [illegible] পারা গিয়াছে। তাহাতে শান্তিপুর নামের একটা সূত্র টানিয়া বাহির করিতে পারা যায়।

নেপালের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশের বেশ একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। যখন নেপালের নাম প্রথমে শোনা যায়, তখন সে দেশ নেওয়ারদের হাতে ছিল। মহারাজ অশোক নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করাইয়াছিলেন। সে সময় ভারতীয় প্রভাব শক্তিশালী ছিল। ত্রিহুত ও বাঙ্গলার সহিত নেপালের সংবাদের আদান প্রদান অনায়াসসাধ্য ছিল। সুতরাং তখনকার পক্ষে বাঙ্গলাদেশের অনেক ভাব ঐ দেশে সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নয়। নেপালে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের এক শিলালিপিতে সাতটী শৈব, ছয়টী বৌদ্ধ এবং চারিটী বৈষ্ণবতীর্থের তালিকা পাওয়া যায়। ইহার পর বহুকাল নেপাল আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। একাদশ শতকে নাথসম্প্রদায় বরিশাল চন্দ্রদ্বীপ হইতে নেপালে গিয়া নিজেদের ধর্ম্মপ্রচার করে। হিন্দু বৌদ্ধ সকল নেপালীই ইঁহাদের ভক্তি করিত। সম্ভবতঃ ইঁহার শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান শান্তিপুর যেখানে, সেইখানে ও তাহার চারিদিকে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম প্রচণ্ডদেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রচণ্ডদেব সম্বন্ধে নেপালে প্রচলিত পুরাণ কথার সংবাদ প্রথম প্রচার করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা এই—"অনেক সময় মনে হয়, নেপাল আগে বোধ হয় বাঙ্গালীরই উপনিবেশ ছিল। ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেক পুরাণ কথা আছে। একটা কথা এই যে, বাঙ্গালায় শান্তপুর নামে এক নগর ছিল। তার তিন দিকে গড় ছিল, একদিকে মাত্র রাস্তা ছিল। সেখানে প্রচণ্ডদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া শিক্ষার্থী হইলে তাঁহার নাম হয় শঙ্করাচার্য্য। তিনি নেপালে গিয়া স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে প্রকাশ করেন। এখন স্বয়ম্ভুক্ষেত্র নেপালী, তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থস্থান।"

অনেকে এই প্রাচীন সংবাদটী না জানিয়া শান্তিপুর নামের কারণ নানারূপে কল্পনা করিয়াছেন। কেহ বলেন, শান্তিপুরের দুই ক্রোশ উত্তরে বাবলায় শান্ত নামে এক বেদাচার্য্য থাকিতেন; তাঁর নামেই শান্তিপুর। এ শান্তি মুনি শ্রীঅদ্বৈতের পিতার চেয়েও ছোট। কাজেই এঁর নামে নাম হওয়া অসম্ভব।

মুহম্মদ-বিন্-বক্তিয়ার শান্তিপুর ও বরদার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। দ্বাদশ শতকে বঙ্গশাসনকর্ত্তা রাজা গণেশের সময়ে শান্তিপুর নামের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনও নাম ছিল শান্তিপুর। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জীবিতকালে শান্তিপুর সহর এক কাজির অধীনে ছিল। কাজি গৌড়ের তখনকার শাহ্‌র নামে এই সহর শাসন করিত। শোনা যায়, যুগল শাসকেরা এক সময়ে শান্তিপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মৌলভী আবদুল ওয়ালি সুতরাগড়, সারাগড় ও তোপখানার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। অকবর শাহ শান্তিপুরের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী সুতরাগড় নিবাসী এক যুদ্ধকারকে এই নগর খেলাত দেন। তারপর শান্তিপুর নদীয়াধিপতিগণের হস্তগত হয়।

নদীয়াধিপতি রুদ্ররায়ের সময়েও শান্তিপুর জগদ্বিখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই শান্তিপুর হইতে দেড়লক্ষ পাউণ্ডের সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রতি বৎসর বিলাতে রপ্তানি হইত।

পূর্ব্বে শান্তিপুর তন্ত্রপ্রধান দেশ ছিল। তন্ত্রের নামে সুরাপান ও ব্যভিচার যথেষ্ট হইত। মহাপ্রভুর সময় হইতে শান্তিপুর পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এক সময়ে এখানে খুব সংস্কৃত চর্চ্চাও হইত। চতুষ্পাঠী টোলও যথেষ্ট ছিল।

শান্তিপুরে অনেক পুরাণ জিনিষ আছে। এখানকার তোপখানা, পাড়ার প্রাচীন মসজিদ, ঔরঙ্গজেবের সময় ১১১৫ হিজরীতে ইয়রমুহম্মদ কর্ত্তৃক স্থাপিত। রাজা রামকৃষ্ণের মাতার গোকুলচাঁদের মন্দির ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। আমি শান্তিপুরের ইতিহাস আওড়াইতে আসি নাই। এখানে আসিয়াছি, আপনাদের সাহচর্য্যে অনেক জিনিস শুনিতে ও শিখিতে! শান্তিপুর অনেকদিন হইতে শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। বহুকাল হইতে শান্তিপুর ও নবদ্বীপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও আধুনিক যুগে সাহিত্যানুশীলনে শান্তিপুরের গৌরব বড় কম নয়। এখান হইতে মাসিক ও সাপ্তাহিক বাহির হইয়াছে। কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, সাহিত্যে এদেশের কৃতিত্বও যথেষ্ট। যে দেশের পণ্ডিত গোস্বামী ভট্টাচার্য্য অতি দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থ ষট্‌সন্দর্ভের টীকা প্রণয়ন করিতে পারেন, সে দেশের গর্ব্ব করিবার নাই কি? তবে ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। বঙ্গসাহিত্যের সেবক জগোপাল গোস্বামী, বিহারীলাল গোস্বামী, লালমোহন বিদ্যানিধি প্রভৃতির নাম সর্ব্বজনবিদিত। বেনোয়ারিলাল গোস্বামী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মোজাম্মল হক এই সব সাহিত্যিক শান্তিপুরের অলঙ্কার। কত নাম করিব—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় ও কবি মোজাম্মল হক সাহেব বহু সাহিত্যিকের নামের তালিকা দিয়াছেন। সাহিত্যসেবায় শান্তিপুরের কৃতিত্ব বুঝাইতে হইলে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। কাজেই সে দিকে আজি আর কিছু বলিতে চেষ্টা করিব না।

আজ শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মিলন। এ সম্মিলন সাহিত্যকেই উপলক্ষ্য করিয়া। এ সম্মিলনে কিছু বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সাহিত্যের কথাই বলিতে হয়। সাহিত্য বলিলে আমরা কি বুঝিব? সাহিত্য শব্দটী আমরা প্রথম পাই কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রে। এ সাহিত্যের অর্থ কি, তাহা ঠিক বোঝা যায় না। বিশ্বনাথ একজন প্রাচীন টীকাকার। ইনি সাহিত্যের বেশ মনোজ্ঞ একটী অর্থ করিয়াছেন। হিতের সহিত, মঙ্গলের সহিত যাহা বর্ত্তমান, তাহাই সহিত। সহিতের যাহা ভাব, তাহাই সাহিত্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাহাতে সমাজের কল্যাণ হয়, তাহাই সাহিত্য। এই সাহিত্য জাতির উন্নতির মানদণ্ড। কোন্ জাতি কোন্ বিষয়ে কিরূপ উন্নতি করিয়াছে, সেই জাতির জাতীয় সাহিত্য হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে। সাহিত্য ব্যক্তির ও জাতির জীবনীশক্তি। উন্নত জাতিমাত্রেরই লিখিত সাহিত্য আছে। জাতি সুপ্রাচীন কাল হইতে কতপ্রকারের কত প্রচেষ্টার ফলে, কত প্রকার ঘাত প্রতিঘাতে সভ্য মানু, কৃতী ও গৌরবান্বিত সামাজিক পরিণতিতে আরূঢ় হইয়াছে, লিখিত সাহিত্য ছাড়াও তাহার প্রমাণ সমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সমাজের উচ্চ নীচ, ইতর ভদ্র, ধনী দরিদ্র ইহাদের সকল রকম কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও জ্ঞানপ্রচেষ্টার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সাহিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। সে সাহিত্য গ্রন্থগত হয় নাই, কিন্তু ব্যক্তিগত ও সমাজগত হইয়া আছে। প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মানুষের সমাজ লক্ষ্য করিলে, পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ভাষায়, ভাবে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে এই প্রচ্ছন্ন সাহিত্যের এত কলা কৌশল ধরা পড়ে, এত ধ্রুব ও অবাস্তর সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হয় যে, শুধু তাহার বিশদ আলোচনা করিলেই নবীন সাহিত্যের অনেকাংশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া পড়ে। মানুষের পাণ্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি, প্রতিভা ও মস্তিষ্ক এই সাহিত্যকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গড়িতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। অসভ্য জাতির লিখিত সাহিত্য খুব কমই আছে; অনেক জাতির প্রচ্ছন্ন বা মৌখিক সাহিত্যই বর্ত্তমান।

লিখিত সাহিত্য জাতির উন্নতির ইতিহাসের একাধিক ধারা আরও সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। এই হিসাবে বৈদিক সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য, আর্য্য অনার্য্য সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য, ভারতে ভারতবহির্ভূত জাতির সাহিত্য প্রভৃতি আলোচনা করিবার বিষয়। বিশ্ব-সাহিত্যও এই হিসাবে আলোচনার বিষয়।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের বিকাশের ধারার কতকাল পরে প্রাকৃত সাহিত্যেরই একাংশভূত বাঙ্‌লা সাহিত্যের সৃষ্টি হইল, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আরও আলোচনা করিতে হইবে। বাঙ্‌লা সাহিত্যের পরিপুষ্টির সহিত বৈষ্ণব সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পর বাঙ্‌লা সাহিত্য আজ কতটুকু পরিপুষ্ট হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। বাঙালী যে নবজাগ্রত উন্নতিপ্রয়াসী জাতি, বাঙ্‌লা সাহিত্যের গতি, স্থিতি ও পরিণতি লক্ষ্য করিলে তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। নবজাতি ও নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার সময় ধীরে ধীরে যে সভ্যতার ইতিহাস রচিত হয়, সেই সভ্যতার ইতিহাস সাহিত্যের অংশ মাত্র। স্বজাতি ও স্বদেশকে মনে ও চরিত্রে, রাষ্ট্রে ও সমাজে শ্রেষ্ঠ করিয়া তোলাও সাহিত্যের কার্য্য। আবার জাতির কর্ম্মশক্তির পরিচয়ের নামও সাহিত্য। এথমোক্ত সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য, শেষোক্ত সাহিত্য সভ্যতার ধারার ইতিহাস মাত্র। সাহিত্যে সৌন্দর্য্যকলা প্রকৃতির রহস্যময় সৃষ্টি, ইহা ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করা যায় না। সাহিত্যে এই কলার আবির্ভাব চিরন্তন, কিন্তু ইহার আদর্শ সকল সময় সমান নহে। এখনকার সাহিত্য-কলা-কৌশলের কুশল শিল্পীরা সেকালের কলাকৌশলকে কখনও প্রশংসা করেন, কখনও বা নিন্দা করেন। ইহার অর্থ কলার শাশ্বত মূর্ত্তির আলোচনা-মূলক এই নিন্দা বা প্রশংসা নহে, ইহা আদর্শমূলক আলোচনার পরিণতিমাত্র। সাহিত্যে এখন ব্যক্তিত্বের প্রভাব রসবস্তুকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে, এমনও কেহ কেহ মনে করেন; কিন্তু সাহিত্যে মতের প্রভাব, ব্যক্তিত্বের সমালোচনার প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলেই রসবস্তুকে উপেক্ষা করিয়া, অবজ্ঞা করিয়া সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহাও নিশ্চিত। সাহিত্য রসসাধনার বস্তু, সাহিত্যিক এই তপস্যায় সিদ্ধ তপস্বী; সিদ্ধ তপস্বী ছাড়া সাহিত্যের তপস্যায় সফলকাম হওয়া ধার না। এই হিসাবে সাহিত্যিকের দায়িত্ব যে কত বেশী, তাহা বলিয়া বুঝান সহজ নয়। সাহিত্যের দায়িত্ব কি, তাহা সাহিত্যিককে বুঝিতে হইবে। যা তা লিখিয়া সাহিত্য-সেবায় ফাঁকি দিয়া জাতিকে পঙ্গু অবর্ণ্য করিয়া তুলিলে প্রত্যবায় আছে।

মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক, সাময়িক পত্রাদিতে দেশের শিক্ষিত লোকের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিবে, কর্ম্মস্পৃহা বাড়িবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। মাসিক পত্রের গল্প ও কবিতা, উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রাণ হইয়া উঠিয়াছে, ভালই হইয়াছে। যে দিক্ দিয়া দেশের প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, সেই দিক দিয়াই দেশকে জাগাইয়া তোলা সাহিত্যিকের ধর্ম্ম। কিন্তু না জানিয়া যদি দেশ তন্দ্রাভিভূত—নিদ্রিত—ভোগোন্মত্ত বা ভাবোন্মত্ত হইয়া পড়ে, তাহা তো সাহিত্যের লক্ষণ নহে!

আজকাল উপন্যাসে নাটকে রাশি রাশি আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইতেছে। সাহিত্যের সাধনা করিতে হইবে, এই অজুহাতে তাঁহারা সিদ্ধি লাভের জন্য নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। সাধনা করিতে হইলেই যে, সাহিত্যকে আবর্জ্জনাময় করিতে হইবে, এ কথা কে বলিবে? সাহিত্যের দায়িত্ব সাহিত্যিকের দায়িত্ব হওয়া উচিত। যাহা লিখিব, তাহাই জনিব, তাহাই জনসাধারণের মধ্যে

প্রচার করিব, ইহা ত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির কথা নয়। প্রকাশক বা পুস্তকবিক্রেতারও দায়িত্ব আছে। কিন্তু ব্যবসায়ের দায়িত্ব স্বীকার অনর্থক অর্থ সকল সময় বুঝিতে দেয় না। প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতার লজ্জই সাহিত্যের আবর্জ্জনা বাড়ে, ঝুটো সাহিত্যের প্রচার বেশী হয়। কারণ, ঝুটো সাহিত্যিক তখন ছায়ের ফাঁকিতে অভ্যস্ত হয়, অর্থাভাবে ব্যবসায়ে অর্থলাভ প্রত্যাশায় সাহিত্যের দায়িত্বের বোঝা আর লইতে প্রস্তুত হয় না। প্রকাশকের বোঝা উচিত, খাঁটি সাহিত্যিকে বাছিয়া লওয়া, খাঁটি সাহিত্যিকের উচিত, প্রকাশককে সৎ পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু ইহা কথার কথা মাত্র। ফলে ইহাতে বেশী কাজ হয় না বলিয়াই গ্রন্থকার-সমিতি, গ্রন্থ-বিবেচনা সমিতি নানাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সাহিত্যে নিষ্ঠার অভাবে জাতির অধঃপতন হয়, সাহিত্যে গতানুগতিক পন্থায় জাতির শক্তি ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। অনুকরণে স্বাবলম্বনস্পৃহা কমিয়া যায়। সাহিত্য অনুকরণে নহে—সাহিত্য করণ। ইহা জাতির শক্তি সামর্থ্যের সৃষ্টির পরিচয়।

সাহিত্যে নীতি, সাহিত্যে বাস্তবতা, সাহিত্যে সমাজ রক্ষণ, ধর্ম্মরক্ষণ, এই সকল কথা নূতন নহে। সাহিত্যে যাহাকে impulse বলে, তাহা বাস্তব নয়, আদর্শও নয়, নীতি তো নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু প্রকৃতির ইহা যে ব্যভিচারী ধর্ম্ম, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই impulse কথটা ছোট, কিন্তু প্রভাব বড় বেশী। কোন সাহিত্যে কোন যুগে কোন দেশে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই, তাহা অনুসন্ধান করিলেও মিলিবে না। এই যে কলার জন্য তর্ক, বাস্তবতার জন্য তর্ক, ইহার মধ্যে যেটুকু impulse সেটুকু সত্যই মেকি, বাকীটুকু খাঁটি। সাহিত্যে নীতি ধর্ম্মের দোহাই দিয়াও তাহার স্থান দিতেই হইবে।

এখন বিজ্ঞানের যুগ—ঝুটো সাহিত্যের প্রকাশক ও গ্রন্থকার, ছাপাখানা ও দপ্তরীর পয়সা হইতে পারে বটে কিন্তু পয়সা দেওয়ার মালিক যাহারা, তাহাদের পকেট ইহাতে খালিই হইবে। এইজন্য এখন এই বিজ্ঞানযুগে বিজ্ঞানের সমাদর প্রয়োজন বিশ্বসাহিত্যের বৈজ্ঞানিক বিভাগও অনন্ত। কিন্তু যে যে বিভাগের আলোচনায় জাতি সঞ্জীবিত হইবে, দেশের দুর্ভাগ্য দূর হইবে, সেই সেই বিভাগের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। শিল্প সাহিত্য, কৃষি-সাহিত্য, বাণিজ্য-সাহিত্যের পরিপুষ্টি বাঙ্গালাভাষায় বেশী হয় নাই। অথচ শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি এখন নিরন্নের দেশ, এখানে বিশ্বের সকল জাতির অন্ন আছে, নাই শুধু বাঙ্গালীর।

শিক্ষায় সাহিত্যের পরিপুষ্টি হয়। কিন্তু যে শিক্ষায় চাকুরি করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে, অন্যত্র অন্য কোন পথ দেখিবার মত বুদ্ধি হয় না, শক্তি থাকে না, সে শিক্ষায় কিরূপ সাহিত্যের ইতিহাস ভবিষ্যতে লিখিত হইতে পারে, তাহাও আলোচনার বিষয়। জাতির অস্তিত্ব নষ্ট হইলে জাতীয় সাহিত্যও পুরুষাপেক্ষী হয়, তখন জাতীয় সাহিত্যের স্বরূপ থাকে না, অন্য সাহিত্যের অংশ-মাত্র হইয়া পড়ে। পরে অন্য সাহিত্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, বহুদিন পরে তার আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য করাও সুকঠিন হইয়া পড়ে।

সাহিত্যে অনুবাদেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু অনুবাদককে নিজস্ব জাতীয় প্রকৃতির অনুসরণ করিতে হইবে, অনুকরণকেও করণ করিয়া লইতে হইবে। জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে তাহাকে শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের কেন্দ্রে দাঁড়াইতে হইবে। অন্নের সংস্থান হইলে অন্নময় কোষের প্রসন্নতা সাধন শক্ত হইবে না। তখন সাহিত্যও জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

দূরদর্শী স্বর্গগত মনীষী আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যে দিন চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, নানাবিধ ব্যাধি-

কবলিত, ধ্বংসোন্মুখ এই জাতির রক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন—সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিগুলি আলোচিত হওয়া আবশ্যক, সে দিন তিনি বাঙলা সাহিত্যের এক নূতন পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। সে দিন তিনি এই কথা বলিয়া যে অনেকের নিকট উপহাসাস্পদ হন নাই, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়; কিন্তু তিনি যে কত বড় একটা সত্য আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা চিন্তার সাহায্যে আমরা বেশ বুঝিতে পারি। জাতির অন্তিত্ব ব্যক্তির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। যাঁহাদের মন সুস্থ ও সবল, তাঁহারাই নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিবলে সাহিত্যকে রসদান করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন। দেহের স্বাস্থ্যের দিকে তিনি অবহিত হইতে বলিয়া যে প্রভূত উপকার করিয়াছেন, তাহা জাতি কখনও বিস্মৃত হইবে না। সাহিত্যের গতির একটা নূতন পথ-প্রদর্শকরূপে তিনি বাঙালীর নিকট চিরকাল বরেণ্য থাকিবেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই দীন লেখক মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সে আজ নয় দশ বৎসরের কথা। তারপর যে দিন রায়বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় স্বর্গীয় অনন্তসেবী সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্রের 'সাহিত্য'-পত্রে 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন প্রাণে বড় আনন্দ হইল। আমি অনেক সময় ভাবিয়া থাকি, 'আপাত-মনোরম প্রতীচ্যের মোহমুগ্ধ করুণ সবুজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই কি বাঙলা-সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবে? সুখের বিষয়, সিংহ মহাশয় স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই দুঃসাহসের পরিচয় দেখিয়া অনেক সবুজহৃদয় সম্মাহত হইয়াছেন সত্য। কথাসাহিত্যের তিনি যে একজন বোদ্ধা নন, এ কথা বলিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার অনবদ্য সুন্দর উপন্যাস 'ক্রীতদাসী'র লেখক তিনি কি না, এ সম্বন্ধেও কেহ কেহ সন্দিহান। তারপর আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুসাহিত্যিক কিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার নব-প্রকাশিত 'আর্ট ও সাহিত্যে' আর্টের প্রকৃত অভিব্যঞ্জনা কিরূপ, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

আর্ট বলিয়া নূতন কিছু নাই। যে ভাব বা চিত্র সুন্দর ও শোভন, যাহা মানবের কল্যাণপ্রদ এবং যাহা জাতীয় স্বাস্থ্যি রক্ষার পরিপোষক, তাহাই আর্টের গণ্ডীর ভিতর চিরকাল থাকিবে।

এখন আমি সঙ্কোচের সঙ্গে যে কথাটী আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই, তাহা আর কিছু নয়—শিক্ষা ও সাহিত্যে যাহাতে জাতির মধ্যে বিস্তারলাভ হয়, তাহার চেষ্টা ও উপায় নির্দ্ধারণ করা সকল সাহিত্যিকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। কথাটা একটু খুলিয়া বলা দরকার। আমি আপনাদের নিকট পাটোয়ারি বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া এ কথা বলিতেছি না। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবেরা আমার সম্বন্ধে এ বিষয়ে সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, ব্যবসায় বুদ্ধি যাহাকে বলে, তাহা আমার আদৌ নাই। বাঙলার শত শত যুবক দিবারাত্র 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া সুধু অন্নবস্ত্রের উপায় করিবার জন্য শত কাজে ও অকাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত করিতেছে; অন্য চিন্তা করিবার সুযোগ সুবিধা বা অবসর তাহাদের নাই। নিজের ও পরিবার-বর্গের চিত্তবিনোদন করিবার সামর্থ্য যাহাদের নাই, তাহারা অপরের চিত্তবিনোদন করিবার জন্য সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করিবে কি করিয়া? বিশেষতঃ বাঙালী সমাজের মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ যাঁহারা আবহমান কাল সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ রহিয়াছেন, তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমাজে নূতন ভাবের প্রেরণা মনীষাবলে তাঁহারাই দিয়া

আসিয়াছেন—অনেক স্থলে তাহা না দিলেও তাঁহারা যে ভাবপ্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার নাই। দুর্ব্বল মেরুদণ্ড লইয়া শরীর-ধারণ যেরূপ অসম্ভব, দুর্ব্বল মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লইয়া সমাজ-জীবন বহন করাও সেইরূপ অসম্ভব। এ দেশের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারাই আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে আমার এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। সমাজকে সুস্থ ও সবল দেখিতে চাহিলে মধ্যবিত্ত গৃহীর আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করিতে হইবে। স্বাবলম্বী মধ্যবিত্ত গৃহীই ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সহায়তা করিয়া, সামাজিক ধনভাণ্ডার চিরকালই পূর্ণ করিয়া আসিয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন যুগেও বৈশ্যদিগকে কর্ম্মপ্রেরণা দিয়াছেন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। আর কোম্পানীর আমলেও মধ্যবিত্ত গৃহীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি-লাভ করিয়া সমাজের জীবনীশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু জানি না, কোন্ দেবরোষে বাঙালার জাতির ভিতর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া কেবল চাকুরী বৃত্তিমাত্র সম্বল হইয়াছে। ডাক্তারি বা ওকালতি ব্যবসায় ক্ষেত্র বিশেষে ধনাগম হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাতে জাতীয় ধনাগমের পথ সুলভ হয় না; এক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ অপর ব্যক্তির নিকট যাতায়াত করিয়া থাকে মাত্র। ব্যবসা-বাণিজ্যে অপর দেশের অর্থ স্বদেশে আনিতে পারা যায়। অর্থ থাকিলেই যে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়, এ কথা অনেকেও বলিতে পারি না। জগতের সকল কার্য্যই শিক্ষাসাপেক্ষ। ব্যবসা বাণিজ্যও অপরাপর বৃত্তির ন্যায় শিক্ষা-সাপেক্ষ, এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। স্বদেশী যুগে এই শিক্ষার অভাবে অনেক মূলধন যে অযথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের শিক্ষা-মন্দিরে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে এখনও উহার স্থান হয় নাই। ইহার জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই। Technical education, দিবার খরচও খুব বেশী। অর্থাভাব বলিয়াই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে Technical education শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে এখনও স্থান পায় নাই। অর্থের স্বচ্ছলতা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারেরা যে এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে উচ্চ শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হইবে, এরূপ মনে করা ভুল। যিনি এ শিক্ষা প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হইবেন তিনি সমাজের কল্যাণ করিবেন। ২৩ বৎসর শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া একটা কথা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি। উচ্চশিক্ষিত যুবকদিগের অর্থাগমের পথ সরল না হওয়ায় কত চিন্তাশীল ভাবুক প্রাণ অকালে নীরস হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সম্মাহত হইয়াছি। উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া প্রাণের কথাপ্রসিয়া ছাত্রের যখন আমার নিকট উপদেশ চায়—পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলে, তখন বাস্তবিকই প্রাণে অত্যন্ত যাতনা অনুভব করি। কিসের গুরু আমরা?—ছাত্রের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্যই যে আমরা দায়ী, তাহা তো নয়। ভবিষ্যতে সমাজে যাহাতে তাহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, পরবশ না হইয়া, স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে, অন্ততঃ আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য অন্তর গলগ্রহ যাহাতে না হইয়া, সমাজকে ভারগ্রস্ত না করে, সে দিকে আমাদের অবহিত হওয়া উচিত নয় কি? দেশে যে সুবাতাস বহিতেছে, তাহা স্বদেশপ্রেমিক মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থে স্থাপিত পটিটেক্‌নিক্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠান হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ Captain Petavel ব্যবহারিক কার্য্যকলাপ শিখিয়া, যাহাতে বাঙালীর অর্থাগমের

পথ সুগম হয়, তাহার চেষ্টা করিয়া আমাদের বন্ধুবান্ধব হইয়াছেন। আমরা জানি, অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যাহারা উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার সুবিধা ও সুযোগ পায় নাই, অথবা যাহাদের বুদ্ধি সেরূপ প্রখর নয়, তাহারা এই বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বাঙলাদেশটা নূতনের বিরোধী—পুরাতন-প্রীতি বাঙলার অস্থিমজ্জাগত। আমাদের দেশের পুরাতন উক্তি—"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্। নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্॥"—ইহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য আমি জাতীয় অর্থাগমের কথা বলি নাই। যুগে যুগে অনুষ্ঠানের ধারাপরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহার উপায় সন্ধান করিতেই হইবে। অর্থাগমের জন্য নূতন নূতন পন্থতি অনুসৃত হউক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। বাঙলার ছাত্রদিগকে সুস্থ ও সবল দেখিতে চাই; কারণ, প্রাচীনকাল হইতে জগৎ এই সত্যে উপনীত হইয়াছে যে, সবল দেহই সুস্থ মনের আবাসস্থল। শরীরের স্বাস্থ্যের উপর যখন মনের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, তখন দেহ সুস্থ রাখিতে হইবে। দেহকে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে অন্নসংস্থানের প্রয়োজন। এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই আমার মনে হয়, অর্থাগমের উপায় চিন্তা করিয়া, সাহিত্যিকেদের প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপায়গুলি শোভন-সুন্দর করিয়া বিবৃত করা উচিত। এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। বাঙালীর পুরাতন-প্রীতিপরায়ণ মনটা যাহাতে এইরূপ নূতন পথে চলিতে পারে, তাহার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। নূতনের মাদকতায় বাঙালীর মন মজিবে না। নূতনকে পুরাতনের ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে হইবে, নতুবা কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। তারপর বীজ বপন করিতে হইবে। অবশ্য এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, প্রত্যেক গল্প বা উপন্যাসের চরিত্র ধনাগমের চেষ্টা করিবে। যে কোন একটী চরিত্র এরূপভাবে অঙ্কিত হওয়া উচিত, যাহাতে "মৃঢ় জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাম্"—চিত্র না থাকে, যাহাতে সমাজ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় রাখিবার জন্য যে অর্থাগমের আবশ্যক, তাহার প্রতি লোকের আগ্রহ থাকে, এবং অর্থাগমের সহিত যাহাতে অর্থের সদ্ব্যবহার হয় তাহার চিত্রও পাশাপাশি দেখান হয়। দেশকাল বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয়, আধুনিক যুগসাহিত্যের গতি এই ধারায় প্রবাহিত হওয়া উচিত। অবশ্য এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করিবার ইহা একটী উপায় মাত্র। আর উপায়কে একমাত্র গন্তব্য পথ বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না। সভ্যজগতে যাহারা ধনাগমকেই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিয়া, অর্থের প্রতি আত্যন্তিকপ্রীতি দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের নৈতিক অবনতি দেখিয়া আমাদের শিক্ষা করাও উচিত।

চরিত্রের অনুভূতির স্ফুরণ ও চিত্রণই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষ ও মনীষীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মনীষিগণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যত শীঘ্র ধরিয়া ফেলিতে পারেন, সাধারণ লোকে তাহা তত শীঘ্র পারে না। মানব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহারা মনীষাবলে ধরিয়া ফেলিয়া, সহমর্ম্মিতার অনিন্দ্য-সুন্দর তুলিকায় নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত করিয়া থাকেন। আর ঐরূপ সুন্দর চিত্র আর্টের সাহায্যে এরূপ ভাবে প্রকাশ করেন, যাহাতে পাঠকের মনে ধারণা হইয়া যায় যে, জীবনের এই সত্য তো আমি ধরিতে পারি নাই। আর্ট তাহাই যাহা অন্যের মনে সমভাবের ও সমানুভূতির উদ্রেক করিতে পারে। লেখক ও পাঠকের ভাবের সমতা আর্টের সাহায্যেই হইয়া

থাকে। অধিকন্তু কলাবিদের তুলিকায় রঞ্জিত চিত্র এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়, যাহা হইতে মানবচরিত্র সম্বন্ধে আমরা নূতন অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়া থাকি। রঙ্গমঞ্চ হইতে আমরা কেবল অনুভূতি লইয়া যেমন ফিরিয়া আসি না—নাটকের ফলশ্রুতিও গ্রহণ করি, সেইরূপ উপন্যাসের চরিত্র পাঠ করিয়া আমরা শুধু অনুভূতি পাই না, মানব-চরিত্র সম্বন্ধে নূতন তথ্য ও জ্ঞান লাভ করি।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে, চরিত্র বিশ্লেষণ ও চরিত্রের স্ফুরণই যখন সাহিত্যের উদ্দেশ্য, তখন আর্টের স্থান কোথায়? অথবা আর্টের অবশ্যকর্ত্তব্যই বা কি? সংক্ষেপে কথাটার এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে—মানব সৌন্দর্য্যের উপাসক। সুন্দরের ধারণা কতকটা ইন্দ্রিয়ের উপর ও কতকটা সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সত্য, কিন্তু অল্পপরিসরের ভিতর চরিত্র বিশ্লেষণ বা চরিত্র স্ফুরণ সুন্দরভাবে করা সহজ নয়। আদর্শ, জীবনকে সর্ব্বথা যে পরিচালিত করে না, তাহা তো আমরা দেখিতে পাই। এইজন্য আর্টের আবশ্যকতা। কলাবিদ্ বা আর্টিষ্ট্ আমাদের সম্মুখে চরিত্রের সেই অংশটুকু ধরিয়া থাকেন বা সেই অংশটুকু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন যাহা পাঠকদিগের মনের উপর কার্য্য করে—অনুভূতির উদ্রেক করিয়া দিতে সমর্থ হয়। তাই প্রত্যেক পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলিয়াছেন—"All art is selecion"। সে দিন নবপ্রকাশিত "Authorship" পুস্তকের ভূমিকায় ঠিক এই কথাটাই পড়িলাম—"The patience of a reader or an audience is limited, and therefore a plain straightforward story exactly as it happened in real life, is quite impossible. The true artist can by instinct and training know which characteristics and which incidents and which words to select to bring about the greatest emotional appeal."

চরিত্রের অনুভূতির বা ঘটনার ফিরিস্তি-সম্বলিত নাটক বা উপন্যাস প্রকৃত সাহিত্য-পদবাচ্য নয়। রসই সাহিত্যের প্রাণ। রস সৃষ্টি করিতে না পারিলে সাহিত্যে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। "Authorship" এর লেখক সত্যই বলিয়াছেন:—

"A dull, unemotional book or play, without interesting characters doing interesting things, is a failure both artistically and financially."

বাস্তবিকই চরিত্রের অভিনবত্ব ও ঘটনার নূতনত্ব মানব-মনকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। আর ইহা করিতে না পারিলেও রসসৃষ্টি হয় না। রস না থাকিলে আনন্দও পাওয়া যায় না। কলাবিদের কৌশলের উপর এই রসসৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সমগ্র জীবনকে যে লেখক আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন, তিনি আর্টিষ্ট নহেন, তিনি নকলনবীশ, পটুয়া বা photographer। আর্টিষ্ট তিনিই, যিনি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ঘটনা বা অনুভূতির অল্প পরিসরের ভিতর ফুটাইয়া তুলিতে পারেন।

তাই বলিতেছিলাম, আধুনিক যুগসাহিত্যে এরূপ চরিত্র অঙ্কিত হওয়া উচিত, যাহাতে ধনাগমস্পৃহাকে আমরা সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন না দিই—আর ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের সদ্ব্যবহারের চিত্রও যাহাতে ফুটিয়া ওঠে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অবশ্য অঙ্গাঙ্গি চরিত্র ও অনুভূতির চিত্রের সহিত দুএকটী পূর্ব্বোক্ত রূপের চরিত্র যে মিশ খাইবে না, তাহা বলিয়া তো আমাদের মনে হয় না। আমি আপনাদের ন্যায় সুধী সাহিত্যিকদের নিকট কথাটা উত্থাপন করিলাম মাত্র। বিষয়টীর আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রাণের আবেগে এত কথা বলিলাম। আপনাদের বুদ্ধিবলে এরূপ চরিত্র অঙ্কিত হইতে পারে, যদ্দ্বারা সৎসাহিত্যের শোভাও

বর্দ্ধিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও জাতির ভিতর প্রাণের স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যাইবে। এরূপ আশা করা কি যায় না।

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য যে প্রবাহে চলিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কথা-সাহিত্যই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই কথা-সাহিত্য যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, R alism (বস্তুতন্ত্র) কথা-সাহিত্যের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এখন যিনিই গল্প, উপন্যাস বা নাটক লিখিবেন, তিনি যদি Realism এর মধ্যে আপনাকে জাঁকাইয়া বসিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার লেখার যেন কোন মূল্যই থাকে না। Ibsenism, Shawism এই শ্রেণীর লেখকদের যেন অস্থি মজ্জা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বস্তুতন্ত্র কি, ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে তাহা কিরূপ আলোচিত হইয়া থাকে, আমরা তাহা জানি না। বিদেশের মোহে আমরা এত মুগ্ধ হইয়া যাই যে, ভারতের বা বাঙ্গলার সমাজ যে বিলাতের সমাজ নয়, তাহা একেবারে ভুলিয়া যাই। যে আকাশ বাতাসের মধ্যে বিলাতের সাহিত্যিক তাহার ভাবসমষ্টিকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে তাহাদের অনুকূল, কি প্রতিকূল, তাহা একবারও আমরা ভাবিয়া দেখি না। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা দরকার। তাই বিলাতের বস্তুতন্ত্রবাদী উপন্যাস সম্বন্ধে দু চার কথা বলিব।

মানুষ যখন সংসারে অত্যাচার ও উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হয়, তখন মানুষ মনোমধ্যে এক কল্পিত রাজ্য সৃষ্টি করিয়া, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করে। এই ভাবে কল্পনা ও প্রবৃত্তিমূলক অনেক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় মানুষ বাহিরের জগৎকে মনের মত সুন্দর দেখিতে না পাইয়া, এক কল্পিত স্বর্গরাজ্য মনেতেই গঠন করিয়া ফেলে। এইরূপ সৌন্দর্য্যের সাধকের চেষ্টায়ও অনেক কল্পনামূলক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী এইরূপ উপন্যাসে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। সৌন্দর্য্য ও যাহা কিছু সত্য, সবই জগতে আছে। জগতে যাহা নাই, তাহা সত্যও নহে, এবং তাহার কোন যথার্থ অস্তিত্বও নাই। জগতে যাহা আছে, তাহাতেই আমাদিগকে পরিতৃপ্ত হইতে হইবে। যাহা কল্পিত, তাহাই বিসদৃশ; যাহা যথার্থ ও বস্তুগত, তাহাতেই প্রকৃত চরিতার্থতা হয়, তাহারই সাধনায় মানব-সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল হয়।

বস্তুতঃ আমাদের যত কিছু ভাব, তাহা আমরা স্বভাব বা প্রকৃতি হইতেই পাই। আমাদের মনের সংস্কার প্রাকৃত জগৎ-জাত হইলেও তাহা ভ্রমাত্মক হইতে পারে, সুতরাং তাহা হইতে যে সাহিত্য গঠিত হয় তাহাতে সমাজের মঙ্গল সাধন না করিয়া তাহা অমঙ্গলের নিদান হইতে পারে। সেই কারণে অনেকের মত, আমাদের সাহিত্য ও উপন্যাসে বাস্তব জগৎ ও জীবনের যথার্থ চিত্র প্রতিফলিত হওয়া উচিত। Sir Walter Scott এর উপন্যাস সময়-বিশেষের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে; জর্ম্মন জাতির নাটকও সেই ভাবে রচিত। Dickens ও এই ভাব প্রণোদিত হইয়া, সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরের মানব-চরিত্র চিত্রাঙ্কণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী জাতি এই ভাব প্রণোদিত হইয়া তাঁহাদিগের সাহিত্যে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিফলিত করিতে আরম্ভ করেন।

জড়বাদী Balzac এর অভিমত এই যে, উপন্যাস ইতিহাসেরই আকার বিশেষ হওয়া উচিত। উপন্যাসকে প্রকারান্তরে ইতিহাস বা ইতিহাসেরই সহযোগীরূপে হইতে হইবে।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর মতে এই বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া আর অন্য কোনও জগৎ নাই, সুতরাং অন্য কোনও অপ্রাকৃত জগতের কল্পনার সহিত আমাদের প্রকৃত জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা জীবন-যুদ্ধে

পরাভূত হইয়া যে, কোন এক অপ্রাকৃত জগতের কল্পনা করি, তাহা আমাদের দুর্ব্বলতা। আমরা পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি। বুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক আমরা যখন স্বকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হই, তখনই আমরা প্রকৃত সুখের আস্বাদন করিতে পারি। জগতে দুঃখ, পরাভব ও অশান্তি আছে বলিয়া কাতর হইলে চলিবে না; পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও যন্ত্র সহকারে ঐ সকল হইতে অব্যাহতি লাভ করাই মনুষ্যত্ব, এবং মনুষ্যত্বই প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা। de Foe Robinson Crusoeতে এই ভাবটী বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই ভাবের উপন্যাসকে realistic উপন্যাস বলে।

Realistic উপন্যাসে conventionalism, idealism বা sentimentalism প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয় না। যাহা সত্য, যাহা হইবার, যাহা সাধ্য তাহা লইয়াই realistic উপন্যাসের কারবার।

আমরা বিশ্বাস করি এই বাস্তব জগতের মূলে এক জ্ঞানময়, চৈতন্যময় পুরুষ আছেন। এই জগতের কার্য্যকারণপরম্পরা তাঁহারই ইচ্ছার অধীন। কিন্তু এই জগৎকে তিনি অখণ্ডনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। সকল স্বাতন্ত্র্যবাদীর বিশেষ লক্ষ্য সেই ইচ্ছাময় ও চৈতন্যময় পুরুষ নহেন। বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদীর বিশেষ লক্ষ্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যের বস্তু-সম্পর্কিত অখণ্ডনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি Foeর ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য আছে, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বর অখণ্ডনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম করেন না। তাঁহার উপন্যাসের নায়ক Crusoe বিপদের সময় স্বকীয় যত্ন পরিশ্রম, বুদ্ধি ও অধ্যবসায় অবলম্বন, পূর্ব্বক সকল প্রকার অসুবিধাকে সুবিধায় পরিণত করেন, কিন্তু বিপন্মুক্ত হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। অপ্রাকৃতভাবে ঈশ্বর কখনও Crusoeকে বিপন্মুক্ত করেন নাই। মানব-জীবনের প্রকৃত ইতিহাস আলোচনা করিলে কুত্রাপি কোন মানবের জন্য তাঁহাকে অখণ্ডনীয় নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখা যায় না; যদি কেহ মানবেতিহাসের পশ্চাতে প্রেম ও করুণাময় ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে সৌভাগ্যবান হন, তিনি তাঁহাকে অসীম রহস্যের মাঝে রহস্যময়রূপে উপলব্ধি করেন।

Realistic ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে যাঁহারা চরমপন্থী, তাঁহাদিগের উপন্যাসে অনেক সময়ে একটা দোষ আসিয়া পড়ে। তাঁহারা বস্তু ও জীবনের মাত্র একটা দিক্ দেখেন, অপর একটা দিক্ যে আছে, তাহার প্রতি তাঁহারা উদাসীন। মানুষ আংশিক ভাবে জগৎটিকে দেখিয়া থাকে, জগতের সকল দিক্ দেখিবার মানুষের ক্ষমতা নাই। যদি মানব-জীবনের ঠিক ফটোটী লওয়া যায়, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লেখা যায়, তবে সেই উপন্যাসে মানুষের বড় একটা বিশেষ লাভ হয় না। যিনি ঠিক ফটোটী লইয়াই সন্তুষ্ট, তিনি প্রকৃত চিত্রকর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। প্রকৃত চিত্রকর তিনি যাঁহার তুলিকায় সমগ্রের চিত্র প্রতিফলিত হয়। অংশের পরস্পর সম্বন্ধে জগতের সৌন্দর্য্য সংরক্ষিত; সুতরাং চরমপন্থী realistic ঔপন্যাসিকের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহারা তাঁহাদিগের উপন্যাসে, জীবনের যথাযথ চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া কৃতকার্য্য হইবার প্রয়াস পান এবং তাঁহাদের মতে যাঁহারা জীবনের আংশিক সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিতে পারেন তাঁহারাই চিত্রকর—তাঁহারা বিশেষজ্ঞের মতে জীবনের একটা দিক্ পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে দেখাইয়া থাকেন।

Thackeray বলিয়াছিলেন, আমার কয়েকটীতে মস্তিষ্ক বলিয়া কিছুই নাই। আমার দুইটী চক্ষু আছে, তাহা দিয়া আমি যাহা দেখি, তাহারই আমি যথাযথ বর্ণনা করি।" Thackeray এই কথা Balzacএর মুখে আরও শোভা পাইত।

Balzac, Thackeryরই সমসাময়িক। তিনি

সভ্যজগতে উপন্যাসের সম্বন্ধে এক নূতন ধারণার অবতারণা করেন। উপন্যাস তাঁহার কাছে 'human document'

বাস্তব জগৎ ও জীবনের সহিত বাস্তব জগৎ ও জীবনের যথাযথ প্রতিকৃতির অনেক বিভিন্নতা আছে। বাস্তব জগতে যে প্রাণটা আছে, তাহার যথাযথ প্রতিকৃতিতে সে প্রাণটা থাকে না। প্রতিকৃতিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে লেখক বা চিত্রকরকে আপনার প্রাণ দিয়া তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতে হয়। লেখক বা চিত্রকরের অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে সে, বিষয়ে তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া পড়ে। Coleridge এর কথায় বলিতে পারা যায়, যাঁহারা সমধর্মবিশেষের রীতি নীতি ও ভাবের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহাদিগের লোকানুরঞ্জনক্ষমতা শীঘ্রই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। Dickens ও এই কারণেই বেশী দিন লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই। চিত্র যদি বাহিরের বস্তুর যথাযথ অনুলিপি হয়, তাহা হইলে সে চিত্রের প্রতি মানুষের অনুরাগ বেশী দিন থাকিতে পারে না।

সাহিত্যে ভাববাদের (idealism) প্রতিক্রিয়ায় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের (realism) আবির্ভাব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাববাদের আতিশয্যের প্রতিবাদস্বরূপ Jane Austen তাঁহার হাস্যোদ্দীপক জীবনচিত্র উপন্যাসে প্রতিফলিত করিতে আরম্ভ করেন, এবং ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে ফরাসী প্রভাব ওতপ্রোত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে অনেক সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক পুরাদস্তর স্বভাববাদী হইয়া পড়েন। স্পেনদেশে Pereda পথপ্রদর্শক হন, এবং Juan Valera, Emilia, Pardo Bazan এবং Valdes সেই পথ অনুসরণ করেন; ইতালিতে Fogazzaro, Mathilde Serao প্রভৃতি Scandinavian Bjornsen এবং Strindburg এই নবভাবের ভাবুক হইয়া ইয়ুরোপী সাহিত্যে যুগান্তর-প্রবর্তিত করেন।

তবে রুষের ব্যাপার কিছু স্বতন্ত্র। ১৭৯৯ খৃঃ অঃ প্রথম রুষ উপন্যাস বাহির হয়। ইহার কিছুকাল পরে রুষে Gogol এর আবির্ভাব হয়। ইনি প্রতীচ্য জগতের উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ফরাসী প্রভাব ইউরোপীয় সাহিত্যে এক প্রকার যুগান্তর প্রবর্তিত করিয়াছিল, কিন্তু human document এর Goncourtsএর পূর্ব্বেই Gogolএর দ্বারা প্রবর্তিত হয়। Turgenieff, Dostoyevski এবং Tolstoi তাঁহাদের স্বদেশে ও স্বদেশের বাহিরে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা দেশের নিম্ন স্তরের লোকের জীবনের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার জন্য ও তাহাদের ভিতর আত্মসম্মান-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পূর্ব্বে আর কেহ কখন করেন নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহাদের উপন্যাসের প্রভাবের আরও একটা গভীরতর কারণ এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের পুস্তকে দুঃখপীড়িত মানবসমাজের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও রুষ হইতে ইয়ুরোপে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মান দেশ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। Idealism জার্ম্মানজাতির মজ্জাগত। Max Kretzer জার্ম্মানীর একজন প্রধান realist, কিন্তু Supernaturalism তাঁহাকে ছাড়ে নাই। Hauptmann জার্ম্মানীর একজন স্বভাববাদী বা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগতের অভ্যন্তরে গভীর আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না।

Gustave Flaubertএর Madame Bovary হইতেই ফরাসীসাহিত্যে বাস্তবতার সূত্রপাত হয়। Flaubert ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ সাহিত্য-সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন। ১৮৫৬ খৃঃ অঃ তাঁহার Madame Bovary প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ অতি চমৎকার এবং ইহার অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর চরিত্র বাস্তব জীবন হইতে গৃহীত। স্বভাববাদী Emile Zola একজন অদ্বিতীয় শব্দচিত্রকর। তিনি Flaubertএর Madame Bovary উপন্যাসের প্রভাবের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু Zola স্বভাববাদী হইলেও রোমান্সের প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল।

Zolaর পরে M. M. Edmond ও Jules de Goncourt স্বভাববাদ অবলম্বন করেন। তাঁহার পর Alphonse Daudetএর আবির্ভাব হয়। ইনি Zola ও Goncourts উভয়েরই প্রভাবে পড়িয়াছিলেন।

Monpassant, Flaubertএর ছাত্র। ইনিও একজন স্বভাববাদী। ইঁহার কাছে বাস্তব জগৎ ও কল্পনা একই। ইঁহার রচনায় নৈতিক বিশ্লেষণ নাই। চোখে যাহা দেখিতেন, তাহাই তিনি লিখিতেন।

দেশভেদে ও জাতিভেদে রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও ভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীনে, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও ভাব বিভিন্ন হইয়া থাকে। জগতের সব জিনিসই আকার বদলায়, আকার বদলায় না কেবল সত্য। সত্য সকল অবস্থায় একরূপই থাকে। জগতের সবই পরিবর্ত্তনশীল—আমাদের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিও পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীল মানবপ্রকৃতির মূলে এমন একটা কিছু আছে যাহার কখন কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তাহারই সহিত সত্যের সম্বন্ধ। আমরা দেখিতে পাই, সত্য সকল দেশে সকল জাতিতে এক। সাহিত্য সেই সত্যকে তাহার প্রচ্ছন্ন অবস্থা হইতে ফুটাইয়া বাহির করে। সাহিত্যের কাজ সত্যকে প্রকাশ করা। যে সাহিত্য তাহা না করে, তাহা প্রকৃত সাহিত্য নহে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দেশাচার এবং রুচিও বিভিন্ন। দেশাচার ও রুচিকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিলে, সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সাহিত্য লোকশিক্ষার উপায়স্বরূপ, সুতরাং যে জাতির সাহিত্যে প্রাণ না থাকে, সে জাতির সাহিত্যে জাতির উন্নতি হইতে পারে না। অনেক সময়ে আমরা দেখি, উপন্যাস ও নাটক, জনসাধারণের রুচির অনুবর্ত্তন করে। ব্যবসা হিসাবে সেই উপন্যাস ও নাটক ভাল হইলেও আসল কাজে ভাল হইতে পারে না। উপন্যাস ও নাটক সাহিত্যের অঙ্গ সুতরাং বর্ত্তমান রুচির অনুবর্ত্তন করিয়া কেবল লোকরঞ্জন করাই উপন্যাস ও নাটকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। লোকশিক্ষার ভার যাহার উপর, তাহার সকল সময়ে লোকরুচির অনুবর্ত্তন করিলে চলিবে না। মানুষের মনের মতন কথা না বলিলে, মানুষ সন্তুষ্ট হইবে না; সুতরাং সকল সময়ে সাধারণের মনের মতন কথা বলিতে হইবে, এই ভাব পোষণ করিয়া যদি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যায়, তাহা হইলে সাহিত্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাক, অবনতিই হইয়া থাকে। প্রকৃত কবি, চিত্রকর ও ঔপন্যাসিক যে দৃষ্টিতে জগৎকে দেখেন, সাধারণ লোক সে দৃষ্টিতে দেখিতে পায় না। সাধারণ লোক প্রবৃত্তির প্রভাবের বশবর্ত্তী। দেশাচারও আমাদের রুচিকে বিসদৃশ করে। যে যে দেশাচারে অভ্যস্ত, সে তাহার বিপরীত আচরণ পছন্দ করে না। কিন্তু সাহিত্যিকের একটা দায়িত্ব আছে। সাহিত্যিক খাঁটি সত্যটী তাঁহার লেখায় প্রতিফলিত করিবেন—যাহা সকল দেশে সকল জাতিতে এক। যাহা মানবপ্রকৃতির সত্য ও স্বাভাবিক সৃষ্টি, তাহাই প্রকৃত আদরণীয়।

এই জগৎ পরমাত্মারই প্রকাশ। সুতরাং এই জগতের প্রত্যেক অংশই সেই পরম রসময় পরমাত্মারই অংশ। সাধু এবং শিল্পী এই জগৎকে দুই বিভিন্নভাবে দেখিয়া থাকেন। সাধুর চক্ষে জগতের একটা দিক্ পবিত্র, আর একটা দিক্ অপবিত্র। তিনি স্বভাবতঃ জগতের পবিত্র দিকটারই পক্ষপাতী, কিন্তু শিল্পী উভয় দিকেই পক্ষপাতী। সুন্দরের উপাসক শিল্পীর চক্ষে পবিত্র অপবিত্র কিছুই নাই—পাপ ও পুণ্যের চিত্র সমভাবেই তিনি অঙ্কিত করিয়া থাকেন। পাপের চিত্র শিল্পী কিন্তু এমন ভাবে অঙ্কিত করেন, যাহাতে দর্শকের মনে ঐ চিত্রের প্রতি ঘৃণা জন্মে—মনে বিতৃষ্ণা আসে। শিল্পীর নিকট যাহা স্বাভাবিক, তাহাই সুন্দর। সেই প্রকৃত শিল্পী, যাহার সৌন্দর্য জ্ঞান আছে। স্বভাবের সকল অংশই তাৎপর্য্যপূর্ণ। সৌন্দর্য্যের সহিত তাৎপর্য্যের নিত্য সম্বন্ধ। সাধারণ লোক যাহাকে সুন্দর বলে, শিল্পীর কাছে তাহা সুন্দর হইতে পারে, না হইতেও পারে। সুতরাং সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সৌন্দর্য্য মানুষের সৃষ্টি নহে। জগতের অন্তরালে যে পুরুষোত্তম বিরাজ করিতেছেন, সৌন্দর্য্যের ভাব তাহারই হৃদয়-নিঃসৃত। মানুষ যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে, তাহা ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত ভাব-সৌন্দর্য্য। উহা মানুষের কল্পিত বস্তু নহে।

তাহাই সৌন্দর্য্য, যাহা মানবাত্মার আনন্দবিধান করে, যাহা হইতে আত্মা আনন্দলাভ করিতে পারে না। তাহাকে সুন্দর বলিতে পারা যায় না। এই কারণে কলাবিদের কাছে সৌন্দর্য্য কল্পনার বিষয় নহে, তাহার বস্তুগত সত্তা আছে। যাঁহারা মনে করেন, বুদ্ধির সাহায্যে সৌন্দর্য্য কল্পনা করা যাইতে পারে, তাঁহাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। এসময়ের আনন্দময়ের স্বরূপ বুঝিতে না পারিলে সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে সৌন্দর্য্যের বাহিরের উপাদান সকলের উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অন্তরের অনুভূতির সাহায্য ব্যতীত সৌন্দর্য্যের উপাদান বুঝিবার উপায় নাই। তাই হিন্দুরা বুঝিয়াছিলেন রং সো বৈ সঃ। •

• শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে পঠিত।

ভাস্কর।

(শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক)

হাওটী তোমার কঠিন কঠোর পাষাণ ভাঙ্গে গড়ে
মনটী মধুর দিবস নিশি রসের ভিয়েন করে।
ভক্ত তুমি নির্জ্জনেতে চুপ্‌টী করে ছিলে,
সুন্দরেরি গতায়তি ধরিয়ে তুমি দিলে।
মূক পাষাণের মুখে তুমি ফুটিয়ে তোলো ভাষা
পাষাণ করে যাওয়ে রেখে তোমার ভালবাসা।
কোথায় কবে গোপন চরণ ফেলেছিলেন হরি,
তোমার প্রেমে গল্‌লো পাষাণ রাখলে হৃদে ধরি।
ঙ্ক্ষুরন্ত পীযূষ ঢালে তোমার পাষাণ বীণা
বুঝ্‌তে নারি নীরব কি সে অতি মুখর কি না?
মন্ত্রে তোমার মুগ্ধ সারা বিশ্ব চরাচর
যেমন রাখো তেমনি থাকে ধন্য যাদুকর।
সজীব করো পাষাণ তুমি চক্ষে অনল,
পাষাণীর হায় ভক্ত পূজক ধন্য তব বল।

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, বি এল্)

বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার অকৃত্রিম বন্ধু প্রসিদ্ধ ব্যবহার জীবী বিচারক সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের উৎসাহে গিরিশচন্দ্র 'বলিদান' নাটক রচনা করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের—তথা বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের বরপণ-প্রথার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা কবিবর তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে সুন্দর তুলিকায় চিত্রিত করিয়া আমাদের নয়ন সমক্ষে ধরিয়াছেন। কন্যার বিবাহ যে কন্যা-বলিদানের নামান্তর, তাহা তিনি এমন সুন্দরভাবে করুণ-রস-সম্পৃক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নাটকখানি পাঠ করিয়া বা নাটকের অভিনয় দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না। পণ প্রথা লইয়া বাঙ্গালীর সমাজ-তাত্ত্বিকেরা বহুদিন ধরিয়া চিন্তা করিয়াছেন; সমাজের ফেরদণ্ড স্বরূপ মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে রক্ষা করিবার চেষ্টাও অনেক উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কবিবরও কয়েকটী পন্থা যাহা কায়স্থ সমাজের পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন; কিন্তু মানুষ স্বার্থপর; স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। যতদিন না আমরা আবার আমাদের ঋষি প্রচলিত প্রাচীন ব্রাহ্ম-বিবাহের প্রকৃত আদর্শ বুঝি—যতদিন না আমরা শুল্ক বিক্রয়ের দোষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পুত্রকন্যা বিক্রয় করিয়া পরস্বাপহরণ করিতে বিরত হইব—এক কথায় বলিতে গেলে যতদিন না আমরা প্রকৃত মানুষ হইব,—পরের অর্থের প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া না থাকিব, ততদিন আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না। মূল কথাটা গিরিশচন্দ্র সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন; কিন্তু নাটকখানি 'ফরমাসী' হওয়ায় রংটা একটু বেশী রকম গাঢ় হইয়াছে চরিত্রের ভিতর অস্বাভাবিকতাও বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য হয়। গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মভেদী বলিদানের চিত্র দেখিয়াও বাঙ্গালার সমাজ হইতে এই কুপ্রথা এখনও দূর হইল না। জানি না কবে, কি ভাবে এই প্রথা বাঙ্গলা দেশ হইতে দূর হইবে?

করুণাময় বসু তিনটী কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থ ভদ্রলোক, সামান্য চাকুরী করিয়া কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ঐ তিনটি কন্যা ভিন্ন সংসারে তাহার পত্নী সরস্বতী ও পুত্র নলিন। করুণাময়ের মুখ দিয়া গিরিশচন্দ্র প্রথমেই একটা বড় সত্য কথা বলাইয়াছেন। কথাটা এই, 'হায়, হায়, যদি বঙ্গজ প্রভৃতি কায়স্থের সঙ্গে বিবাহপ্রথা চলন হয়, তা হ'লে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু সমাজ তা কি দেবেন? ধর্ম্মভীরু সমাজ বলেন, জাত যাবে, কথা উত্থাপন হ'লে নাক সেটকান,' বাস্তবিক চারি শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইলে বিবাহের পরিসর বা গণ্ডী যে, একটু বিস্তৃত হইবে, এ কথার যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ কেহই করিতে পারিবেন না। প্রথানতঃ স্থানের দূরত্বই চারি শ্রেণীর কায়স্থকে দূরে রাখিয়াছে। ঐতিহাসিক একথা সাক্ষ্য দিতেছে। স্থান ও কালের ব্যবধানে, গমনাগমনের অসুবিধা প্রভৃতি কারণের দরুণ যে, আত্মীয় দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন তাহাকে আবার আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করা কি যুক্তিসঙ্গত নয়? অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, 'বলিদান' ১৩১১ সালে রচিত হইয়াছে। ১৮।১৯ বৎসরের পূর্ব্বে চারি শ্রেণীর সম্মিলনের কল্পনা অনেকেই করিতে পারেন

নাই। বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীর ভিতর তখন মাত্র দুই এক স্থলে এরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে এরূপ সম্বন্ধে সংস্থাপিত হয় নাই, তাহা নয় কিন্তু সমাজে অপ্রচলিত থাকায় রক্ষণশীল কায়স্থ-সমাজ সহজে ইহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিল। দক্ষিণ রাঢ়ী সমাজ বহুদিন হইতে অন্য সমাজের লোককে অঙ্গীভাবে গ্রহণ করিয়া Process of absorption দ্বারা দক্ষিণ রাঢ়ী করিয়া লইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অনেকেই জানেন। কুলীনগ্রাহ্য আলোচনা করিলে একথার যাথার্থ্য সকলেই স্বীকার করিবেন। অবশ্য আমি একথা বলি না দক্ষিণ রাঢ়ী সমাজ অন্য সমাজ অপেক্ষা অধিকতর উদার, কিন্তু কুলজী গ্রন্থ আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিখিলাম। এই পণপ্রথা দূর করিবার জন্য দে সময়ে সভাসমিতিও অনেক হইয়াছিল, এখনও মাঝে মাঝে দু একটা সভাসমিতিতে ঐ বিষময় প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা যে একান্ত আবশ্যক তাহাও শুনিতে পাই। অনেক উন্নতমনাশীল যুবককে পণপ্রথার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিতেও শুনিয়াছি; আবার তাহাদিগকে কার্য্যকালে অর্থশোষণ ব্যাপারে তাহাদের অভিভাবকদের সহায়তা করিতেও দেখিয়াছি হিন্দুর 'জাতকুল' বজায় রাখিবার জন্য, মেয়ের বিবাহে স্বয়ং কমাইবার জন্য যাহারা তারস্বরে সভামণ্ডপে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়া হাততালি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাদের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উঠিলে তাহারা বলিয়া উঠিলেন, "আমার ছেলের এখন বে দেবার সময় নয়," কিন্তু তাহারই, গিরিশচন্দ্রের কথায় বলি, গোপনে 'ঘটক পাঠিয়ে খুঁজছেন, কে দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়বে।'

করুণাময়ের প্রথম কন্যার সহিত মোহিতমোহন মিত্রের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। যাহা দিবার কথা ছিল বিবাহে করুণাময় সকলেই দিয়াছিলেন, অধিকন্তু গোপনে তাহার পত্নী একছড়া বহু মূল্যের হার দিয়াছিলেন। কিন্তু বৈবাহিকা মাতঙ্গিনীর মন পাইলেন না, তাহার দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা দালাল রমানাথ সভার মাঝে তাহাকে জোচ্চর বলিতে তাঁহাকে কুণ্ঠিত হইল না। বিবাহ-সভা হইতে বর তুলিয়া লইয়া যায় দেখিয়া পাঁচজন ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় করুণাময়কে কিঞ্চিৎ অর্থও দিতে হইল। 'মেছোটার খোটার ঘর হ'বে' ভাবিয়া করুণাময় ঘুষ দিতে রাজী হইলেন। এইখানে গিরিশচন্দ্র পত্নীর 'বেনের পাওনা মনে ধন্‌লে হয়' প্রশ্নের উত্তরে করুণাময়ের মুখে বলাইয়াছেন, —'কি জানি যেখানে মেয়ে কর্ত্তা, সেখানে যে দেওয়া ভাল হয় নাই।' মেয়ে কর্ত্তা আজকাল যে কোথায় নয়, তাহা ত খুঁজিয়া পাই না। বাঙ্গলার পুরুষেরা আজকাল মেয়েদের উপর সংসার-ভার চাপাইয়া দিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন না করিলেও, নির্ব্বিকার-চিত্তে অর্থোপার্জ্জন করিয়া অবসর সময়টুকুতে সামান্য আরাম পাইবার যে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা যিনি চক্ষুষ্মান্ তিনিই দেখিতে পাইবেন; আর রমণীরাও যে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ জন্য লালায়িত তাহাও সত্য। 'মেয়ে কর্ত্তা' হইলেই যে সংসারটা চলিবে না কেন তাহা ভাবিবার বিষয়। বোধ হয় এই 'কর্ত্তা'-গিরিটা রমণীদিগের এখনও কায়েমী হয় নাই বলিয়া গিরিশচন্দ্র ঐ কথার অবতারণা করিয়াছেন; কিংবা করুণাময়ের মন সহজ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ঐ কথা বলিয়াদিয়াছিল। বেচারা ভবিষ্যতের যবনিকা যেন তুলিয়া দেখিয়া কথা কয়টা বলিয়া ফেলিয়াছিল। শ্বশুর বাটীতে পদার্পণ না করিতে করিতেই কিরণময়ীর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হইল, তাহার চিত্র গিরিশচন্দ্র সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ঘরের বার, তের বৎসরের কি উদ্ভিন্ন বয়স্কা কন্যার বোধশক্তি যে হয় না, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না করিতেই মোহিতের

মাতা পাল্কী খুলে বউয়ের মুখ দেখে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লেন। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কোথাকার হা ঘরের ঘুটে কুড়ুনীর বাঁদিনীর মেয়েকে' তিনি ঘরে তুলিলেন। মৃত স্বামীর নামে 'কর্ত্তা কোথা গেলে গো—একবার এসে দেখ গো' হোমার মোহিতকে ডোম ডোক্‌সে বিদেয় করেছে, বলিয়া চীৎকার করিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে পিতামাতার নিকট হইতে সদ্য আনীতা কন্যা তাহার শ্বাশুড়ীকে কখনই ভাল বাসিতে পারে না। এই কারণে কত গৃহস্থের ঘরে যে অশান্তি আসিয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। অবশ্য আমি কেবলমাত্র শ্বাশুড়ীর দোষে যে বাঙ্গালীর সংসার ছারখার হইয়া যায়, তাহা বলিতেছি না, বধূও যে শ্বাশুড়ীর প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে অযথা মন্দ ব্যবহার করে, তাহাও সত্য; পরকে আপন করিতে হইলে কন্যার মত বধূকে না দেখিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না—সহানুভূতি না দেখাইলে প্রাণ পাওয়া যায় না একথাটা ভুলিলে ত চলিবে না। এদিকে তাঁহার গুণধর পুত্রও, গিরিশ-চন্দ্রের স্থির কথায় বলি,—'বাপান্তি দিব্যি গেলেছে, মায়ের মুখ দেখ্‌বে নি!' অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া করুণাময় বড় দুঃখে বলিয়া উঠিয়াছিল, "ওঃ, অবলা বালিকার নিঃশ্বাসে বাঙ্গলাদেশ জ্বলে যায় না—দিগ্‌দাহ হয়না—মেয়ের বাপ বিষ খেয়ে মরে না—মেয়েকে নুন দিয়ে মারে না?" বাঙ্গলাদেশে যে তাহারা থাকিতেছে, তাহার একটা কারণ যে বালিকার দাবদাহ নিঃশ্বাস তাহা খুব সত্য। যতদিন বাঙ্গলাদেশ হইতে এই দুরপনেয় কলঙ্ক না ঘুচিবে—ততদিন রমণীর চোখের জল পড়া না বন্ধ হইবে—ততদিন বাঙ্গালীর শুভ নাই! গৃহস্থের ঘরে কন্যা আপদ বাঙ্গালী রূপে এখন গৃহীত হইতেছে। এরূপ হইবার কারণ আর কিছুই নয়—বিবাহের সময় অর্থ দিয়া কন্যা বিক্রয়! অর্থের বিনিময়েও সৎপাত্রে পাওয়ার দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থশালী লোকেরই নিকট প্রায়ই এই অনুযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। কন্যার জন্মের সহিত অমর কবি দেবেন্দ্রনাথের 'দুহিতা মঙ্গল' আবার যখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গীত হইবে, তখনই বাঙ্গালার সুদিন আসিবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র শেষে যে দুইটী পথ নির্দ্দেশ করিয়া ছেন, তাহা ত কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ঐরূপ করা কাপুরুষতার কার্য্য—তাহারের উপর রাগ করে ভূয়ে ভাত খাওয়া' মত কার্য্য করা একই রকম। বিষ খাইয়া মরিবার আবশ্যকতা কি? জীবন-গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, আমাদের দেশে আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া গণ্য। এ পন্থা প্রকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। অন্যত্র তিনি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয়। পাগ্‌লি জোবির নিকট, তাহার উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া ও তাহার মুখে "মায়ের ব্যথা মাই জানে, ভাসিয়ে নিয়ে সোনার চাঁদে" শুনিয়া করুণাময় পত্নীকে বলিয়াছিলেন—'গিন্নি, বালিকার প্রতি এমন অত্যাচার হয়, যদি অন্য কোন জাত শোনে, বিশ্বাস করবে না। কিন্তু প্রত্যেক ঘরে ঘরে বালিকারা এরূপ যন্ত্রণা পায়। মেয়ে আইবুড়ো রাখ্‌তে দোষ কি? জাত যাবে, কুরিরা হবে? হলেই বা! আহা, অনাহারে যম-যন্ত্রণা কত নির্দ্দোষী বালিকা সহ্য করে।' মেয়েকে আইবুড়ো রাখিবার দোষ কিছুই নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কন্যাকে সৎ শিক্ষা দিতে হইবে, কার্য্যাবিতে সময় যাহাতে অতিবাহিত হয়, মন্দ চিন্তার দিকে মন যাইবার যাহাতে তাহারা অবসর না পায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কুরিরা হইবে কেন? আর যদি শিক্ষা পাইয়াও কুরিরা হয় ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় জাতি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয়—তাহা হইলে কি করিতেই বা পারা যায়। সধবা

স্ত্রীলোকও কখন কখনও যে জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয় তাহার দৃষ্টান্তও যে, নাই, একথাও ত বলিতে পারা যায় না। তবে আমাদিগের বিশ্বাস প্রকৃত শিক্ষা পাইলে চরিত্রহানি হইবার সম্ভাবনা অল্প। সমাজে কুলীনদিগের ভিতর অন্য কারণেও বহু কন্যা অনূঢ়া ছিল। তাহারা সকলেই যে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারে নাই, একথা এই জাতিটার অতি বড় শত্রুতেও বলিতে পারে না। তাই বলিতেছি, আত্মহত্যা করিবারও আবশ্যকতা নাই, বালিকাকে ভ্রূণ খাইয়াও মারিতে হইবে না। চেষ্টা করিয়া সৎপাত্রে তাহাদিগকে পাত্রস্থ করা উচিত। বাঙ্গলার ভরসাস্থল উচ্চশিক্ষিত যুবকদিগকে এ বিষয়ে একটু অবহিত হইতে বলি—তাহারা চেষ্টা না করিলে এ সমস্যার সমাধান কোনদিনই হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য একথা তাহাদিগকে আমরা কোন দিন বলিব না যে, তাহাদের পিতামাতা বা অভিভাবকদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কার্য্য করিতে। তাহারা তাহাদের গুরুজনদিগকে পণ-প্রথার দোষ দেখাইয়া বিনীত ভাবে বলিলে বোধ হয় কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারা যায়। তাহারা কালে তাহাদের গুরুজনদের উপদেষ্টা হইয়া দাঁড়াইতে পারেন।' গিরিশচন্দ্র চতুর্থ অঙ্কের ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্কে ধনী ঘনশ্যাম ঘোষ ও তাহার পুত্র কিশোরের কথোপকথনে দেখাইয়াছেন, কি উপায়ে অভিভাবকদিগকে উদ্ধত্য প্রকাশ না করিয়া সত্যের পথে আনয়ন করিতে পারা যায়। কিশোর উচ্চশিক্ষিত যুবক, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার। দেশের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য সে বন্ধপরিকর—সে বান্ধব-সমিতির সভ্য। সমিতির উদ্দেশ্য আর্ত্তের সেবা, 'বেকার familyর রোজকারী ব্যবস্থা করা', লোকের উপকার করা—অন্নাভাবে যে ব্যক্তি কাতর তাহাকে অন্নদান করা, রোগীকে ঔষধ দান করা, অনাথ বালকদিগকে শিক্ষা দান করা।' কিশোর সংকল্প করিয়াছিল যে সে বিবাহ করিবে না। তাহারা ধারণা করিল, 'বিবাহ করে সংসারী হলে পাঁচজনের উপকার করা যায় না।' কিন্তু সে ভ্রম তার দূর হইয়াছিল বালিকার উপর অত্যাচার দেখিয়া—গঞ্জনা ও অত্যাচারের ফলে বাঙ্গলার বালিকা-বধূদিগকে আফিং খেয়ে মরিতে দেখিয়া তাহার মতটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার কথার বলি 'এখন আমি দেখ্‌ছি, আমাদের সমিতির সকলেরই duty বিবাহ করা। আর কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির কন্যার হয় উপযুক্ত পাত্র কোন রকমে জোটান, নয় আমাদের ভিতর যার বিবাহ হয় নাই, তার সেই কন্যা বিবাহ করা উচিত কুরূপা হোক, খুরূপা হোক।' প্রাণের পরিচয় আমার কিশোরের বেশ পাইলাম। অবশ্য ধ্বংসোন্মুখ জাতিটাকে রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করা আমাদের যে উচিত তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু বিবাহ না করাও যে অনেকের পক্ষে মঙ্গলদায়ক সেকথাটাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সুস্থ সবল দেহ না হইলে বিবাহ করা কাহারও উচিত নয়। তার পর এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে অন্নবস্ত্রের সংস্থান না করিয়া যাহাদিগকে জগতের প্রথম আলোক দেখাইবার জন্য আমরা দায়ী, তাহাদের অন্নবস্ত্র ও শিক্ষার ভার যাহাতে আমরা লইতে পারি তাহার চেষ্টা অগ্রে করা উচিত। আবার সমাজের নরনারী যদি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহারা নৈতিক জীবনে যে অবিমিশ্র-কালিমার পরিচয় না দিবে—সহজ সংস্কারের বশে যৌন-সম্মিলনের ফলে অসুসমূক সন্তান উৎপাদন করিবে, অথবা ভ্রূণহত্যা করিবে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারা যায় না। যাক্ সে কথা। সমাজ-সংস্কারকেরা সে বিষয় অবহিত হউন। যে কথা আমরা বলিতেছিলাম—অর্থ লোভে পঞ্চাশ হাজার টাকার মোহে কিশোরের পিতা তাহার

পুত্রের সহিত ধনী হীরালাল বসুর কন্যার বিবাহ দিতে একরূপ স্থির করিয়াছিলেন। কথাটা কিশোরের কাণে পৌঁছিবা মাত্র সে বাপের সম্মুখেই মাকে বলিল,—'আমি হীরালাল বসুকে জানি নি, আমি করুণা বসুর মেয়ে বে কর্‌বো।'

ঘনশ্যাম। তুই করুণার মেয়ে বে কর্‌বি কি রে? নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, পরীর মতন মেয়ে আমি সম্বন্ধ করেছি সব ঠিক ঠাক—আমি পাকা দেখে আস্‌বো, তুই কি বল্‌ছিস?

কিশোর। বাবা, আমাদের যে বংশ—আমাদের যে বংশ গৌরব—আমি যে বংশের সন্তান—আমি সেই বংশমর্য্যাদা-মত কথা কয়েছি,—আপনি অমত কর্‌বেন না।

ঘনশ্যাম। অ্যাঁ!

কিশোর। বাবা, আপনি জগৎপূজ্য মকরন্দ-ঘোষের সন্তান। আপনার এক পুত্র, সেই পুত্র আপনি বিক্রি কর্‌বেন? আমাদের বংশে কবে হীন কাজ হ'য়েছে বলুন যে—আমাকে হীন প্রকৃতি ল'য়ে টাকা নিয়ে বে কর্‌তে বল্‌ছেন? এই জন্যই কি যত্ন করে আমাকে মানুষ করেছেন? এই জন্যেই কি আমাকে আদর্শ পুত্র বলে পরিচয় দেন? আমাকে কি এই হীন কার্য্য কর্‌তে বলেন? আমার বিবাহ দিয়ে কুলধর্ম্ম কর্‌বেন। কুলকর্ম্ম ক'রে কুল-লক্ষ্মী আনে, আপনি পুত্রকে বেচ্‌বেন? আপনি দেশের কুসংস্কার বশতঃ এ কথা ব'লেছেন।

শিক্ষিত পুত্রের কি ভাবে পিতাকে কথা বলিতে হয় দেখুন। বাপের দোষের জন্য বাপের বুদ্ধি দায়ী নয়, দেশের কুসংস্কারের ফলে বুদ্ধিটা সোজা পথে চলে নাই। তারপর তাহার জননী যখন লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে আনিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না, তখন অত্যাচার-পীড়িত ভগ্নী ভাবিনীর দশা তাহাকে মনে করাইয়া দিয়া কিশোর বলিল,—'ভাবিনীর দশা দেখে তোমার মনে হচ্ছে না যে, তোমার বউ তুমি হাতে দুগাছি চুড়ী দে নিয়ে এসে রাজরাণী করে রাখ্‌বে? তোমার ভাবিনীর কষ্ট মনে করে, অন্য মেয়ের মার মনঃকষ্ট মনে করো! একজনেরও যাতে সেই দারুণ কষ্ট নিবারণ কর্‌তে পারো, সেই জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, তোমার পুণ্যে একজনও মেয়ের বে দায় না মনে ক'রে; ছেলের বেতে যেমন আনন্দ, যেমন উৎসব—মেয়ের বেতে তেম্‌নি আনন্দ, তেম্‌নি উৎসব করুণ।.....পুণ্য কার্য্যে তোমার পেটের সন্তানকে বাধা দিও না। বাবা যদি অমত করেন, তুমি বাবাকে বোঝাও।'

কথাগুলি ঘনশ্যাম বাবুর প্রাণ স্পর্শ করিল, তথাপি সাংসারিক লোকের মত তিনি পুত্রকে বলিলেন:—'ভাবিনীর বিয়েতে কতগুলি দিয়েছে জানো?—সেগুলি তুল্‌বে না?

উত্তরে কিশোর বলিল,—'বাবা, কি কথা বল্‌ছেন? ভাবিনীর শ্বশুররা পীড়ন করেছে ব'লে আপনি আর একজনকে পীড়ন কর্‌বেন? এই দোষে সমাজ উৎসন্ন যাচ্ছে, বড়র দেনদার হচ্ছে, গৃহস্থ ফকির হচ্ছে, বালিকা হত্যা হচ্ছে, কন্যার জন্ম ঘোর অপয়স বলে গণ্য হচ্ছে। বাবা, আপনি আদর্শ দেখিয়ে লোককে শিক্ষা দেন যে, পুত্রের বিবাহ, আত্মীয় সন্তান বিক্রয় নয়! পুত্রের পুত্র, বংশের স্তম্ভ, পিণ্ড অধিকারী। সেই পুত্রের মাতা তার মাতামহের সর্ব্বনাশের হেতু হ'বে?—এ কি সাধারণ পরিতাপের বিষয়! এই কুপ্রথাতে ধর্ম্মকর্ম্ম আচার, ব্যবহার, সকলই নষ্ট হচ্ছে। আপনি স্বার্থ ত্যাগ করে সমাজকে শিক্ষা দিন;—পবিত্র বিবাহ-রীতি পুনঃ সংস্থাপন করুন। জননী রাজলক্ষ্মীও কথাটার সত্যতা বেশ বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু নারী সুলভ দুর্ব্বলতার বশেও কতকটা কাকন-কোলিন্যের অভিমানে বলিলেন,—'হাঁরে, বেই আসবে—যেন সরকারটা! কি বল্‌ছিস?'

কিশোর। মা, আমাদের বংশে কুলীনের কন্যা এনেই কুলধর্ম্ম হয়েছে,—সদ্বংশের কন্যা এনেই কুল-

কর্ম্ম হয়েছে—কুলীন স্থাপনই বংশের প্রথা। যদি করুণাবাবু কন্যাদায়ে দরিদ্র হ'য়ে থাকেন, তাঁকেই তাঁরে পুনঃ স্থাপন করুন। আপনি জানেন, আপনার পুত্র তাঁর কাছে কত ঋণী? তাঁর উপদেশেই আমি পড়া শুনায় মন দিই, নইলে এতদিনে একটা ভূত হইতাম!

এই যুক্তি তরঙ্গের বিরুদ্ধে উচ্চশিক্ষিত পিতা আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। উপযুক্ত পুত্রের পিতা বলিয়া তিনি মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিলেন। তারপর প্রাণের আবেগে বলিলেন,—'বাবা কিশোর, আমি তোমার বাপ নই, তুমি আমার শিক্ষাদাতাবাপ, তুমি যা ভাল বোঝো করো, যা ব্যয় করতে বলো করবো,—তোমার কথার আমি কুলপ্রথা রক্ষা করবো।'

শিক্ষিত পুত্রের যেরূপ আচরণ শোভন, সেইরূপ আচরণই কিশোরের দেখিয়া আমরা প্রাণে যৎপরোনাস্তি আনন্দ পাই। এরূপ ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত কিশোর যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় অথবা সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া পিতামাতার অমতে বিবাহ করিত তাহা হইলে গৃহের শান্তি যে নষ্ট হইত, তাহা আর কাহাকেই বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

বিবাহিত-জীবনে কোনদিনই কিরণময়ী স্বামীর ভালবাসা পায় নাই। মদ ও বেশ্যাসক্ত স্বামী, পত্নীর প্রতি কোনদিনই ভাল ব্যবহার করে নাই। মাতার অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিবাদও সে কখনও করে নাই—করিয়াছে কেবলমাত্র পত্নীর নিকট হইতে অর্থশোষণ। পুত-চরিত্রা কিরণময়ী স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে নিভৃতে পূজা করিয়াছে—সকল অত্যাচার দেবতার দান বলিয়া মাথায় পাতিয়া লইয়াছে। শ্বশুর গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া স্বামীর পুণ্যে অহর্নিশি সমস্যাতিপাত করিয়াছে। কিরণময়ীর চরিত্র পরে আমরা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। করুণাময়, দ্বিতীয় কন্যা হিরণ্ময়ীর একটী দোজবরে পাত্রের সহিত বিবাহ দিলেন। বিবাহের একবৎসরের পর মুকুন্দলাল মারা গেলেন। হিরণ্ময়ীর সপত্নীপুত্রদ্বয় তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিল। পিতার বাটীতে আসিয়া পিতার নিকট সমবেদনার সে পাইল না। সদ্য বিধবা হিরণ্ময়ী অন্তরের জ্বালা শীতল করিবার জন্য খিড়্‌কির পুকুরে ডুবিয়া মরিল। দ্বিতীয় কন্যার মৃত্যুর পর হইতেই করুণাময়ে মস্তিষ্কের বিকৃতি আরম্ভ হইল। কন্যার শোচনীয় মৃত্যুতে যখন করুণাময় অস্থির এবং লাস যখন পাওয়া গেল তখন কিশোরকে করুণাময় বলিয়াছিল,—'বাবা কিছু ভয় করো না, স্থির হ'য়ে বই কি। বাছা জলে ডুবেছে কেন জান? ঘৃণায় ডুবেছে। পতিতানা দুটি অন্নের জন্য আমার কাছে এসেছিল, আমি ছাই খেতে বলেছি! আমিই দেখে শুনে যে দিয়েছিলুম, আমিই ভরাজীর্ণ রোগীর হাতে দিয়েছিলুম, বিধবা হ'বে জেনে দিয়েছিলুম, বিধবা হয়ে বাড়ী এলো, ছাই দিতে গেলুম,—সন্তানকে ছাই দিতে গেলুম! সন্তান হত্যা করলুম!' আত্মগ্লানিতে করুণাময়ের হৃদয় তখন পূর্ণ। দেনাদারে লাঞ্ছিত, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শিক্ষিত জামাতা করিয়া প্রথমা কন্যার নির্দ্দয় অত্যাচারে জর্জ্জরিত—দ্বিতীয় কন্যার বৈধব্য ও শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া মানুষ যে বিকৃতমস্তিষ্ক হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

এদিকে আবার ছোট মেয়ে জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহযোগ্যা বয়স হইতেছে, দেখিয়া করুণাময় চিন্তিত। কন্যার মাতার নিকট ভাবিনী তাহার দাদা কিশোরের সহিত জ্যোতির বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া উপস্থিত। এই অপ্রত্যাশিত সম্বন্ধের কথা শুনিয়া বিস্মিত সরস্বতী আপন মনকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিতেছিলেন না যে কথাটা সত্য। কথাটা স্বপ্ন বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। ওদিকে ধনী রূপচাঁদ মিত্রের 'স্যুজপৃষ্ঠ কুব্জদেহ' অসচ্চরিত্র পুত্র দুলালচাঁদ করুণাময়ের কন্যাদিগের রূপ দেখিয়া

মুগ্ধ হইয়া লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য দুই দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তৃতীয় কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্য তাহার বাবাকে জোর করিয়া ধরিয়া বসিল। একমাত্র গুণধর পুত্র অনুযোগ যেরূপে হউক একটা লেখাপড়া করিয়া করুণাময়ের নিকট হইতে বিবাহের চুক্তি সম্পাদন করিয়া লওয়া। চুক্তিটা যাহাতে পাকাপাকি হয় তার জন্য সে উকীলকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল। সুধু টাকার লোভ দেখাইয়া ও প্রথম জামাতার জেল রদ্দ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেও কেবলমাত্র কথা দিয়াছেন বলিয়া করুণাময় যখন দ্বিতীয় কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিতে স্বীকার করেন নাই, তখন সে বুঝিয়াছিল লোকটা খাঁটী-কথার মানুষ। তারপর সে তাহার বাপকে বলিয়াছিল,—'বাবা, বাড়ী-ঘর-দোর তো ফিরিয়ে দেবেই, নগদ ছাড়তে করণকক্তি করো না। ওর বাপকে খুসী রাখলে ও আমায় একটু ভালবাসবে। খুসী না হইলে এই বাঁদর ছানার পানে ফিরেও চাবে না।' পরের অঙ্কে করুণাময় যখন বিকৃত অবস্থায় তখন তিনি চুক্তিপত্রে সহি করেন; এবং রূপচাঁদ বাবু ও তাহার উকীল তাহাকে ৫০০০৲ টাকা দেন। এই ঘটনার পরে করুণাময় বাড়ীতে আসিলে পত্নী সরস্বতী কিশোরের সহিত জ্যোতির বিবাহের কথা তাহাকে জানাইলেন। আরও বলিলেন কালই হরণকীয়েরা গায়ে হলুদ দিতে চান। এখন তুমি ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে ঠিক করিয়া এস বলিয়া অনুযোগ করিলেন। উত্তরে করুণাময় বলিলেন,—'আর ঠিক কি? বেশ তো—বেশ তো! তাড়াতাড়ি বে—তাড়াতাড়ি বে! ও দুটীরও তাড়াতাড়ি বে' হয়েছে, নাইয়েই উৎসর্গ ক'রে বলিদান দিয়েছি! একটা বলি চাই—একটা বলি চাই।' একটা বলি চাই—একটা বলি চাই—কথাই তাহার মুখ হইতে কয়েকবার বাহির হইতে লাগিল। ইহাই ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক আবার বিকৃত হইল। বহুবার ঐ কথাই তাহার মুখ হইতে শুনা যাইতে লাগিল। বিবাহ রাত্রিতে উকীলের সহিত রূপচাঁদ করুণাময়ের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বজন সমক্ষে বলিলেন,—'তুমি না বড় সজ্জন লোক, তোমার না বড় কথার ঠিক? মেজ মেয়ের বে'র সময় শুনেছি—বড় হাতনেড়ে বলেছিলে যে, দুলালের সঙ্গে বে' দেবে না! টাকা চাওনা বলেছিলে, 'কথা দিয়েছি, এতে সর্ব্বনাশ হয়—সপরিবারে মরি তাও স্বীকার!' এখন ত দিব্যি কথার ঠিক রেখ্‌ছি! তুমি বাপন্তা মেয়ের আর একজনের সঙ্গে বে' দিচ্ছ? তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই—শাস্ত্রজ্ঞান নাই? তোমার মেয়ে অন্য পাত্রে পড়লে দ্বিচারিণী হবে—জানো? মুখ থেকে কথা খসাও?' কিশোরের পিতা ঘনশ্যামবাবু এ কথার উত্তর দিলেন। কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় করুণাময় ঘনশ্যামবাবুকে বাড়ীর ভিতর যাইতে বলিয়া বলিলেন, আমি উহাদের হ'তে মিটাইতেছি আপনাকে ভাবিতে হইবে না। এখন দুলালচাঁদ সেখানে আসিয়া বলিল, 'এসেছি, বে' করতে আসি নি, আমার আক্কেল হয়েছে বাবা! কিশোরবাবু আমি খুব খুসি, তুমি বে করো। বাবা! আমি ভালবেসেছি, তোমায় ত বলেছি, করুণাময়বাবুর মেয়ে দেখে অবধি আমি একরকম হ'য়ে গেছি! দেখ্‌ছো ত, বাড়ী থেকে বেরুই নি, ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি নি, বাগানে যাই নি। বাবা কিশোরবাবুর সঙ্গে আমোদ করে বে' দিয়ে ঘরে ফিরে চলো।' উত্তরে রূপচাঁদ তাহাকে বেল্লিকপনা করিতে বারণ করিয়া করুণাময়কে 'আইন আছে' বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। দুলালচন্দ্র তাহাকে তখন বলিল,—'আর আইন কি কর্‌বে বাবা? আমি ত বে করতে নারাজ, তোমার আইন ত চল্‌বে না। বাবা, কিশোরবাবুকে দেখ, আর তোমার দুষমণ

বেহায়া ছেলে দেখ। করুণাময়বাবুর মেয়ে যে দেখ্‌ছি, তা হ'লে বাবা পেড়াপেড়ি করতে না, তা হ'লে সে পদ্মিনী মেয়েকে তোমার এই গুবরে পোকা ছেলের সঙ্গে বে' দিতে চাইতে না।' তারপর সে তার বাবাকে বলিল, 'বাবা, আমোদ করে বে দেখে যাও। না দেখ্‌তে পার বাড়ী যাও, আমি কিশোরবাবুর সঙ্গে জোটপাট দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাই।' রূপচাঁদবাবু যখন দেখিলেন—টাকাগুলি মারা যায়, তখন তিনি ঘনশ্যামবাবুকে বলিলেন, 'বাড়ী থালাস করে দিয়েছি, সাত হাজার টাকার দেনা দিয়েছি, পাঁচ হাজার টাকার নগদ নোট সই ক'রে দিয়েছি।' উত্তরে ঘনশ্যামবাবু বলিলেন, 'সর্ব্বশুদ্ধ কত দিয়াছেন সুদশুদ্ধ হিসাব করিয়া বলুন, আমি দিতেছি।' অথচ ভদ্রলোককে এত টাকা দায়ী হইতেছে দেখিয়া দুলাল বলিয়া উঠিল,—'বা, একবার চক্ষুলজ্জাও ছাড়ো! অনেকের গলায় পা দিয়েছ, তোমার কুঁজো বেটার ভোগ হবে না বাবা! এ সব দাবি-দাওয়া ছেড়ে দাও।' তারপর কিশোর বাবুকে সে সানুনয়ে বলিল, কিশোরবাবু, আমার একটি মিনতি, এটা তোমায় রাখ্‌তেই হ'বে। এই চেন ছড়াটি, এই দুটী এয়ারিং, এই দুটী ব্রেসলেট তুমি স্বহস্তে তোমার স্ত্রীকে পরিয়ে দিয়ে একবার দাঁড়াবে, আমি একবার তোমাদের দুজনকে দেখ্‌বো।' কিশোরবাবু, তোমার স্ত্রীকে ভালবেসে আমি দুনিয়া আর একচক্ষে দেখ্‌ছি। আমার মনে মলা নাই—জ্যোতি আমার মার পেটের বোন! কিশোরবাবু, আমার কথা রাখ্‌বে তো?

দুলাল চাঁদের বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া ও তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ শ্রবণ করিয়া কিশোর বাবু বুঝিলেন—সে প্রকৃতই অনুতপ্ত। লালসার চক্ষে যে তাহার ভাবীপত্নীকে দেখিয়া আসিয়াছে, সে এখন তাহাকে মা'র পেটের বোন বলিয়া অভিহিত করিতে পারিয়াছে, তখন প্রকৃত প্রেমের অনলে লালসা তাহার ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া উত্তরে কিশোরবাবু বলিলেন,—'হাঁ ভাই! তুমি এমন মহৎ আত্মা,—আমি জান্‌তেম না'। প্রাণের আবেগে তখন দুলাল বলিয়া ফেলিল, 'পাগ্‌লি—পাগ্‌লি, দেখে যা, তোর পড়া ভুলি নি! আর জ্বালা নেই, আমার প্রাণ জল হয়ে গিয়েছে।' ঘৃণিত চরিত্র যুবক দুলালচাঁদ জোরির নিকট হইতে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিল তাহার ফলে সে নূতন জীবন পাইয়াছে—সে বুঝিয়াছে, 'প্রাণ পেলে প্রাণ জুড়ায়—দেহ পেলে নয়! 'বরদী দরদ চায়, প্রাণ দিয়ে প্রাণ চায়, তার কাছে মাটির দেহের কদর নাই।' সে আরও লিখিয়াছিল প্রেমের জ্বালার একমাত্র ঔষধ—'আপনাকে ভাসিয়া দেওয়া, পরের সুখে সুখী হওয়া'। তাই সে এমন আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল।

নাটকের শেষ গর্ভাঙ্কের বিষাদময় চিত্র দেখিলে বা পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করিতে পারা যায় না। স্থান গোচলঘর। করুণাময় এখন কিরূপ অবস্থায় ন'ন। তিনি সত্য ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মস্তাস্তিক ব্যথিত। তাহার হীনতার সাক্ষ্য পাঁচ হাজার টাকার নোট তখনও তাহার হাতে। দেওলিকে তিনি ছুড়িয়া ফেলিয়া ভাবিলেন, 'এই যে এখনো গোপাল-চিহ্ন রয়েছে। জাহ্নবী-তীরের ন্যায় পবিত্র স্থান। এই নির্জ্জন স্থানই মানসম্ভ্রমহীন জীবন বিসর্জ্জন দিবার উপযুক্ত স্থান। তার পর গলায় রজ্জু বন্ধন করিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত করুণাময়ের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া ঘনশ্যামবাবুর সহিত একবাক্যে সকলেই বলিবেন,—'আমাদের সমাজের কন্যার পিতার এই পরিণাম! ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা। কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা! প্রতি গৃহে দরিদ্রতা! সকলের চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজমান!—তথাপি আমরা পুত্রের শুভ

বিবাহে কন্যার পিতাকে পীড়ন করতে পরাঙ্মুখ হই না। পবিত্র উদ্বাহ, আমাদের সমাজের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি—জগতে এক নূতন রহস্য! বাঙ্গলার কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান॥ গিরিশবাবু আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে এই বলিদানের চিত্র উজ্জ্বল ভাবে আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন—সে জ্বলন্ত বিদারক চিত্র ব্যথিত করে নাই এমন প্রাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিদানের চিত্রের ভিতর রক্তটা যে গাঢ় হইয়াছে তাহা স্বীকার করি, জাতিটার মঙ্গলের জন্য বিবাহকে প্রকৃত হিন্দুর বিবাহরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি একটু বেশী করিয়া রঙ্ ফলাইয়াছেন—কিন্তু এই সামাজিক সমস্যার সমাধান জন্য আমরা কি করিয়াছি। এই বিষময় পণ প্রথার প্রতিকার কল্পে আমরা কি করিয়াছি। যেহেতুতার অকালমৃত্যুতে ও আত্মহত্যায়ও আমরা শিক্ষালাভ করি নাই। ভাবপ্রবণতার দোহাই দিয়া অনেকে মেয়েদের লেখা পড়া দিচ্ছেন। কথাটার ভিতর যে কিছুমাত্র সত্য নাই, তাহাও অস্বীকার করি না। তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে—মৃমূর্ষু জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে এই প্রথাটার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে—কাঞ্চন-কৌলিন্যের দিন কি দূর হইবে না।

পাশ্চাত্য-জগতে বিবাহ-সংস্কার লইয়া ঘোরতর আলোচনা হইতেছে। অনেক মনীষীই এখন এক-বাক্যে স্বীকার করেন নারীত্ব ও মাতৃত্বের বিকাশই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাভাবে যদি রমণীর বিবাহ না হয়, তাহা হইলে নরনারী প্রকৃত হইবে কোথা হইতে? সমস্ত লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া নর-নারীর যৌন-সম্মিলন হইবেই হইবে। অবাধ প্রেমের রঙ্গ বহিলে দেশে জনহত্যা হইবে। জাত পুত্রদের সামাজিক অবস্থা শোচনীয় হইবে—আইন আদালতে পিতৃধনের তাহারা অধিকারী হইবে না, কাকে কাহার ঔরসজাত তাহা লইয়া ঘোরতর বিবাদ চলিতে থাকিবে। আর অত্যাচার পীড়িত, মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বল রমণীর নিকট হইতে সুস্থ সবল দেহ ও মন বিশিষ্ট সন্তান পাওয়া একরূপ অসম্ভব। আবার অভাবের তাড়নায়ও প্রকৃত শিক্ষাদানের সুযোগ ও সুবিধা না থাকায় জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ হয় না। তাই দেশের ধনাগম যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তাহার চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। গিরিশচন্দ্র স্ত্রীলোকদের দ্বারায় অর্থাগম যে হইতে পারে তাহার একটু আভাষও দিয়াছেন। জ্যোতীর্ম্ময়ীর মুখে আমরা শুনি,—'কেন দিদি তুমি কাঁদ্‌ছো? আমি সংসার চালাবো। আমি মোজা বুন্‌তে শিখেছি। মেম সাহেব জাপান হ'তে কল কিনে দিয়েছেন, তিন আনা ক'রে মোজার জোড়া, আমি দিনে রেতে আট জোড়া করে মোজা বুন্‌তে পারি। দিদি, তোমার ভয় কি? মেম তোমায় কাজ শেখাবেন। তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? আমরা দু বোনে মেহনৎ করে সংসার চালাতে পারবো না?' বাস্তবিকই গৃহ-শিল্পের প্রচলন হইলে ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার সুবিধা থাকিলে, অনাথা বিধবা স্ত্রীলোকেরা ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা অনেকটা স্বচ্ছল অবস্থা হইতে পারিবেন।

পণ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু একটা কথা এখানে ভাবিবার আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়, 'কাল' ও কুরূপা মেয়ের বিবাহ কি করিয়া হইবে? পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরা এখন রূপের পূজারী। গ্রাম প্রধান বাঙ্গালা দেশে রূপলাবণ্যবতী কয়টী বিবাহযোগ্যা কন্যা পাওয়া যায়। অনেক 'কাল' মেয়ের টাকা দিয়া বিবাহ হইয়াছে সত্য। টাকার লোভে অনেক পাত্র বা পাত্রের পিতা বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছেন, পরে শ্বশুরের অর্থ হস্তগত করিয়া শ্বশুর কন্যার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে—প্রবৃত্তির তাড়নায় পুনরায় বিবাহ করিতে অথবা কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বেশ্যালয়ে সে সকল পাত্রকে আশ্রয়

গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। দু এক স্থানে শ্বশুরদত্ত অর্থে বিলাত গিয়া উচ্চ শিক্ষিত হইয়া বিলাতী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া বিবাহিত ধর্ম্ম পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন—তাহাও দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। কিন্তু একথা কি ঠিক নয় রূপ ক' দিন মন ভুলাইয়া রাখিতে পারে। বয়স গুণে রূপে জোয়ার ভাটা খেলে। রূপ চোখের নেশা মিটাইতে পারে—প্রাণের তৃষা মিটাইতে পারে না। তাহা পারে গুণে। গুণের বশে পর আপন হয়। এই গুণ যাহাতে বাঙ্গালীর মেয়েদের ভিতর প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। সেবাধর্ম্ম শিখিতে যাহাতে অল্প বয়স হইতে মেয়েরা সুবিধা পায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে আমরা কন্যার পিতামাতা ও অভিভাবকদিগকে অনুরোধ করি। আমাদের আদর্শ—'রন্ধনে ছোপদী, সেবায় গান্ধারী'। গৃহলক্ষ্মীদের রন্ধন কাজ কাটা এখন বাঙ্গলা দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। উৎকলবাসী ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ স্থলে গৃহিণীদের ঐ কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতেছেন। আঁতুরে পরিতৃপ্তি অনেকে গৃহে পান না বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকেন এবং মাঝে মাঝে হোটেলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনেকেই মুখটা বদলাইয়া আসেন। মেয়েদের পাকপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। অর্থশালী লোকদের গৃহিণীদেরও স্বামী পুত্র কন্যার চিত্ত-বিনোদনের জন্য মধ্যে মধ্যে রন্ধন করা আবশ্যক। তাই বলিতেছিলাম কন্যাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার কথা আমি বিশেষ ভাবে বলিলাম না ভাবিয়া, কেহ যেন মনে না করেন আমি উহার পক্ষপাতী নহি। শিক্ষিত যুবকেরা শিক্ষিত কন্যাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য যে ব্যস্ত হইবেন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্ভ্রান্ত বংশের বালিকারা অধিকাংশ স্থলেই সাধারণ শিক্ষা পাইতেছেন; তথাপি বলিয়া রাখা ভাল, সাধারণ শিক্ষার বহুল প্রচলন সর্ব্বজাতির কন্যার ভিতর হওয়া বাঞ্ছনীয়। চাকচিক্যশালী নির্গুণ কুসুম অপেক্ষা সুগন্ধযুক্ত কুসুমের কে পক্ষপাতী নয়?

(ক্রমশঃ)

গুপ্ত দান

(শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্)

নহ তুমি অচেতন শিলাময় স্তূপ,
লীলাময় দেবতার তুমিও স্ব-রূপ।
বাহিরে নীরস তব পাষাণের দেহ,
অন্তরে অজস্র ধারে বহে মাতৃ-স্নেহ;
সরসিয়া বনভূমি বহে যত নদী
কেহ না থাকিত—তুমি না থাকিতে যদি।
নিত্য পরিপূর্ণ বন মিষ্ট ফল ফুলে,
তব স্নেহ-উপহার আছে তার মূলে।
আপনি গোপন থাকি' দৈন্য-আবরণে
অন্যেরে ধন্য কর নানা অভিনবে।
হে পর্ব্বত, সর্ব্বত্যাগী ওহে মহাযোগী!
আপনারে রাখ নিত্য পরার্থে নিয়োগি
দানে রিক্ত, স্নেহে সিক্ত অন্তর তোমার;
হে দেব চরণে দীন করে নমস্কার।

মুখের মত

(চিত্র)

(শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা)

(১)

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা হইবে। অক্ষয় খাতা-পত্র গুছাইয়া দোকান বন্ধ করিবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় রাঘব সেখানে আসিয়া বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "শীগ্‌গির পঁচিশটা টাকা দেত?"

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "এবার পঁচিশ টাকায় উঠ্‌বে বুঝি।"

রাঘব কপালের ঘাম মুছিয়া কহিল, "আর বলিস্ কেন ভাই, মাগী যেন রাঘব বোয়াল। কিছুতেই ওর হাঁ বোজে না। এমন ধাড়ী বজ্জাত মাগী ত কোথাও দেখিনি।"

অক্ষয় কহিল, "ও তোকে খেলাচ্ছে, এটা বুঝতে পারিস্ নি।"

রাঘব কহিল, "তা আর বুঝি না, হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি।"

অক্ষয় কহিল, "তা যদি বুঝতিস্ তা হ'লে আর ঐ মালতী মাগীর দোর মাড়াতিস্ নি। টাকা ফেলবি, যেখানে খুসী যাবি।"

রাঘব কহিল, "মনেত তাই করি, কিন্তু শেষ অবধি পেরে উঠি কই। রোজ ভাই টাকা টাকা ক'রে সে যে কাণ্ডটা করে, তাতে একবারে পিত্তি জ্বলে যায়, ইচ্ছে হয় আচ্ছা করে দু'ঘা কসিয়ে চলে আসি, এই দেখ্‌না প্রায় এক বছর ধরে ওর কাছে যাচ্ছি—কত টাকা দিয়েছি তা তুই জানিস্—আজ টাকা আন্‌তে ভুলে গেছি—কাল নিয়ে আস্‌ব, তা মাগীর কিছুতেই বিশ্বাস হ'ল না।

অক্ষয় কহিল, "তুই ওকে ছেড়ে দে। তা হ'লে দেখ্‌বি ওর তেজ ভাঙ্‌বে।"

রাঘব কহিল, "তুই জানিস নি, ওর তেজ সহজে ভাঙবে না। সে ভাই টাকা ক'টা। তুই ত দেখেছিস্, টাকা হাতে পেলে সে একেবারে অন্য মানুষ! তখন দু'ঘা লাথি মারলেও সে একটা কথা বল্‌বে না।"

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "একেবারে পাকা ঘুন ব্যবসাদার।" এই বলিয়া বাক্স হইতে পঁচিশটী টাকা বাহির করিয়া রাঘবকে প্রদান করিল।

রাঘব টাকা কয়টি মণিব্যাগে রাখিয়া কহিল, "মাগীর সব চেয়ে বড় গুণ যে সে নিমকহারাম নয়। আমার কাছ থেকে টাকা নেবার পর যদি কেউ তাকে ডবলও দিতে চায়, তা হ'লেও সে কিছুতেই নিমক হারামি করবে না।"

অক্ষয় কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসিল।

(২)

মাস ছয়েক পরে পাঁচ ছয় দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে, উত্তর বঙ্গ ডুবিল। কত জননী সন্তানকে বুকের মধ্যে আগুলিয়া রাখিয়া আকণ্ঠ জল পান করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল। গরু বাছুর ঘর, বাড়ী, ছেলে, বুড়ো কত যে মরিল, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে! যাহারা কোন রকমে বাঁচিয়া গেল, তাহারা তিলে তিলে দগ্ধ হইয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের চারিদিকে পরম আত্মীয়গণের পচা শব ভাসিতে লাগিল। মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, এক কণা আহার্য্য নাই।

কোথাও যে ছুটিয়া পলাইবে সে উপায়ও নাই, বেঙ্গের বাঁধ কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিবে সে অধিকারও তাহাদের নাই। মার, মার, মার!! সরকার বাহাদুর যে সব পাঁচ হাজারী, ছহাজারী দেশীয় কর্ম্মচারীদের উপর বন্যা-পীড়িতদের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা জলমগ্ন স্থলের পাঁচ সাত ক্রোশ দূর হইতে দূরবীক্ষণের সাহায্যে আর্ত্ত পীড়িত নরনারীদের ক্ষীণ মূর্ত্তিগুলির কল্পনা চিত্র লইয়া শৈলাবাসে ফিরিয়া গিয়া "বাই জোভ" বলিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়া কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন—সংশ্র সংশ্র ক্ষুধাতুরগণের মধ্যে এক মুষ্টি তণ্ডুল বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অতি বড় কর্ত্তব্যের শেষ করিয়া ফেলিলেন, আবার কেহ বা বড় গলা করিয়া বলিতে লাগিলেন, গবর্ণমেণ্ট ত আর ধয়রাৎখানা নহে! দুঃস্থ আর্ত্ত-পীড়িত নর-নারীদের বাঁচিবার কোন অধিকার নাই। তাহারা কেন বাঁচিতে চাহে! ভগবান তাহাদের মরিবার কত রকম সুযোগ করিয়া দিতেছেন, আর তাহারা কি না ভগবানকে অগ্রাহ্য করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে! হায় রে দুর্ভাগা দেশ—হায় রে দুর্ভাগা নরনারী! কিন্তু তাহাদের অপেক্ষাও হতভাগ্য শান্তিযোগ্য তাহারা, যাহারা আবার তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে!

কিন্তু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর হতভাগ্যদের আন্তরিক চেষ্টা যত্নে বারালার নর-নারীর প্রাণ আর্ত্ত পীড়িতের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল। কলিকাতার রাজপথে দলে দলে মানুষ ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল! ওগো গৃহবাসী, তোমরা এক মুষ্টি চাল চাল দাও, ছেঁড়া ন্যাকড়া দাও, তোমাদের উত্তর বঙ্গের ভ্রাতা ভগিনীরা অনাহারে উলঙ্গ! তাহারা এ অবস্থায় তোমাদের করুণার মুখাপেক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—ওগো দাও, যে যাহা পার দাও। তার পর কলিকাতার লোক অবাক হইয়া আর এক নূতন দৃশ্য দেখিল। যে শ্রেণীর রমণীরা এতদিন বৃহৎ সমাজের বাহিরে থাকিয়া রূপ যৌবনের বেসাতী করিত, হঠাৎ তাহারা দলে দলে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। "ওগো ভিক্ষা দাও গো, ভিক্ষা দাও গো" গাহিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিল।

(৩)

নীতিবাগিশ হরচন্দ্রের দ্বিতল বাটীর বারান্দায় সেদিন চায়ের মজলিস বসিয়াছিল। হরচন্দ্র একখানি আরাম কেদারায় বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি একখানি জটিল দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। অদূরে চায়ের টেবিলে, তাঁহার দুই কন্যা, রাঘব ও অক্ষয়কে লইয়া চায়ের অপেক্ষায় বসিয়া হাসি গল্পে স্থানটী মাতাইয়া তুলিতেছিল। হরচন্দ্র এক একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া আবার গ্রন্থে দৃষ্টি সন্নিবেশিত করিতেছিলেন।

এমন সময় পতিতা রমণীর দল গান গায়িতে গায়িতে হরচন্দ্রের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরচন্দ্র কেদারা ছাড়িয়া তড়িৎবেগে লাফাইয়া উঠিলেন। কন্যাদের দিকে চাহিয়া ত্রস্তভাবে কহিলেন, "শীঘ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ কর। দুর্নীতি, দুর্নীতি! দেশের দারুণ সর্ব্বনাশ! ওগো ওহো! ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ভদ্র-গৃহস্থের দ্বারে পতিতা রমণী! উহাদের উগ্র বিষাক্ত নিশ্বাসে যে সমস্ত গৃহ কলুষিত হইয়া গেল! পুলিশ, পুলিশ, পুলিশকে দিয়া এ কলুষ নিবারণ করিতে হইবে। না হইলে পরিণতবয়স্ক যুবকদের মনপ্রাণ যে হরণ করিয়া লইবে। হায় রে যুবকবৃন্দ! তোমাদের জন্য যে আমার প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে! ভিক্ষা পাত্র হাতে পতিতার দারুণ ছলনা, দয়াময় রক্ষা কর।"

রাঘব ও অক্ষয়কে সঙ্গে করিয়া দুই যুবতী কন্যা পার্শ্বের কক্ষে গিয়া আত্মগোপন করিয়া পতিতার কলুষিত দৃষ্টি হইতে নিস্তার লাভ করিল।

হরচন্দ্রও অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিঃশ্বাস রোধ করিয়া চক্ষু বুজিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর তাঁহার বাটীর সম্মুখে রাজপথে দাঁড়াইয়া বামাকণ্ঠে খোল করতালের সহিত গীত হইতে লাগিল।

"বন্যাপীড়িত, ভাগ্যতাড়িত
কত না বঙ্গবাসী
উপায় বিহীন, কাঁদে নিশিদিন
আকুল পাথারে ভাসি।
অঙ্গে নাহি বাস
গেছে গৃহবাস
নিবাস বৃক্ষ তলে গো!"

"অন্ন বিনা হায় ছিন্ন ভিন্ন তারা
প্রিয়জন হারা কেঁদে কেঁদে সারা
কি দশা তাদের বুঝ গো!"

* * * *

"যার সাধ্য যাহা কর দীনে দান,
এ দানে দীন পাবে পরিত্রাণ,
তোমাদেরই নামে করি জয় গান
দ্বারে দ্বারে আজ ফিরি গো!
ভিখারীর তরে ভিখারী এসেছে
হে—দাতা করুণা কর গো!"

গায়িতে গায়িতে যখন সেই পতিতা রমণীর দল ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, তখন হরচন্দ্র আবার আরাম কেদারায় আসিয়া অবসন্নদেহ রক্ষা করিলেন। তাঁহার যুবতী কন্যাদ্বয় ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অক্ষয় ও রাঘবের সহিত চায়ের টেবিলে জমকাইয়া বসিল।

হরচন্দ্র ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ও হো হো দেশের কি দুর্দ্দিন!" সঙ্গে সঙ্গে কেকে কামড় দিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক মারিয়া গলা ভিজাইয়া লইলেন।

রাঘব ও অক্ষয় যুবতীদ্বয়ের সহিত মুহুর্মুহু দৃষ্টি বিনিময় করিতে করিতে কয়েক পেয়ালা চা ও অনেকগুলি কেক ও মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। তখনও দূর হইতে সেই গীতধ্বনি তাহাদের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল।

"ভিখারীর তরে ভিখারী এসেছে
হে, দাতা করুণা কর গো।"

এক কন্যা উঠিয়া পিতার পাশে দাঁড়াইয়া মিহি সুরে কহিল, "আর এক পেয়ালা আর দু'টো সন্দেশ দিই বাবা!"

হরচন্দ্র হতাশভাবে কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দাও মা দাও, গলা একেবারে শুকিয়ে উঠেচে। ও হো হো দেশের কি দুর্দ্দিন!"

খানিক পরে কাদম্বাম্ফিক হাসিয়া অক্ষয় ও রাঘব উভয়ে উঠিয়া পড়িল।

(৪)

পথে বাহির হইয়া রাঘব কহিল, "মালতীর গলা পেলাম বলে মনে হ'ল। সেও কি এ দলে বেরিয়েছে নাকি।"

অক্ষয় কহিল, "বেরুতে পারে—ভারি মজা পেয়েচে, পয়সাকে পয়সা লাভ, তার ওপর নিজেদের রূপ-যৌবনের বিজ্ঞাপন। আজ গিয়ে দেখ্‌বি ওদের ঘরে লোক ধরবে না।"

রাত্রে যথাসময়ে মালতীর গৃহে উপস্থিত হইয়া রাঘব দেখিল, মালতী মড়ার মত শয্যার উপর পড়িয়া আছে। তাহার পদশব্দে সে একবার ফিরিয়াও দেখিল না। রাঘব খাটের উপর বসিয়া মালতীর দেহখানি ধরিয়া সজোরে নাড়া দিতেই মালতী অতিকষ্টে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আমায় আজ মাফ করতে হবে ভাই। সেই কখন বেরিয়েছি পর চলা অভ্যাস নেই, তার ওপর পাঁচ ছ ঘণ্টা ধরে, চেঁচান—শরীরটা যেন আর বইচে না।"

কালও মালতী জবরদস্তী করিয়া তাহার নিকট হইতে আরও দুই টাকা বেশী আদায় করিয়া লইয়াছে—রাঘব সে কথা ভোলে নাই। বেশী টাকা যখন সে দিয়াছে তখন সে মালতীকে কিছুতেই অব্যাহতি দিবে না। সে সুদ শুদ্ধ আদায়

করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কহিল, "ও কথা শুন্‌চি না। ওঠ, হারমোনিয়াম নিয়ে বস। ঢঙ্ করতে গিয়েছিলে কেন?"

মালতী কিছু না বলিয়া মুখ ফিরিয়া শুইল।

এমন সময় মোক্ষদা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আজ আর আমি রাঁধতে পার্‌চি না—সমস্ত দেহটা যেন ভেঙ্গে পড়্‌চে। আজ আমায় দু'টী খেতে দিও দিদি।"

মালতী কহিল, "কুমীকে ডেকে বলে দে, তোরও চাল যেন ঐ সঙ্গে নেয়।"

রাঘব বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "আজ যে একেবারে কল্পতরু হ'য়ে পড়েচ দেখ্‌চি।"

মালতী কোন উত্তর দিল না।

মোক্ষদা কহিল, "জগ দিদি, আজ হরিমতীদের দলের সবাইকে জজ বাবু বাড়ীর ভেতর নিয়ে বসিয়ে অনেক খাবার খাইয়েছে।"

রাঘব হাসিয়া কহিল, "তোমাদের দেখ্‌চি আজ পোয়াবারো। কন্সিটা এটেচ ভাল। ক'দিন চালাবে? হঠাৎ এমন পরের দুঃখে তোমাদেরও প্রাণ কেঁদে ওঠে! কত ঢঙ্‌ই জান।"

তাহার উত্তরে মালতী শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। রাঘব কিছু অন্যায় বলে নি। সে নিজের অন্তরের মধ্যে বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিল—তাহারা রূপযৌবন বিক্রয় করিয়া অন্নের সংস্থান করে বলিয়া কি তাহাদের প্রাণে মায়া দয়ারও স্থান নাই। গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অনশনক্লিষ্ট নরনারী, শিশুদের দুঃখে কি সত্যই তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে না? উত্তর পাইল, তা যদি না কাঁদিত, তাহা হইলে তাহা কি করিয়া নিজের ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া, দেহকে অহেতু কষ্ট দিয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। মালতী অন্তরের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব আরাম অনুভব করিল।

রাঘব তাহাকে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া অতিষ্ঠ হইয়া বলিয়া উঠিল, "নাও ঢের চঙ্ দেখান হ'য়েছে, এখন ওঠ।"

মালতী অন্যদিকে তেমনই ভাবে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "তোমরা আমাদের চেয়েও অধম।"

রাঘব কহিল, "তা ত আজ বল্‌বেই। হাতে টাকা পেয়েচ কি না।"

মালতী জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "কি টাকা দেখাচ্ছিস্ তুই—মাগ্‌না দিস্। আমরা শরীর বেচতে বসেচি, আমরা টাকার জন্যে ভাবি না; ফিরে নিয়ে যা তোর টাকা।" এই বলিয়া আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া মোক্ষদার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, "ঐ বাক্সে টাকা আছে, দে ত বের করে মুখী—টাকা দেখাতে এসেচে।"

রাঘবও ছাড়িবার পাত্র নহে, কহিল, "হ্যাঁরে হাঁ, আজ ত টাকা ফেলে দিবিই। আজ কন্সি রাজি করে অনেক টাকা রোজগার করেচিস কি না।"

"কি বল্‌লি মুখপোড়া" বলিয়া মালতী দেহের কষ্ট ভুলিয়া তীরের মত সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

রাঘব কহিল, "আজ ভিক্ষের নাম করে কত টাকা সরালি তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

মালতী উচ্ছৃঙ্খল কেশে ও বিস্রস্ত বসনে খাট হইতে মাটিতে নামিয়া পড়িয়া ঘরের কোণ হইতে ঝাঁটা গাছটি তুলিয়া লইয়া রাঘবের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "এই তোর কথার উত্তর, ভাল চাস্ ত এখনও বের বল্‌চি—না হ'লে এই ঝ্যাংরা মেরে ঐ মুখখানা থেঁতলে দেব, পাজি, ইতর!"

দেবতার স্বপ্ন

(গাথা)

(শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত, কাব্যতীর্থ)

পুরোহিত আসি, কহিল রাজারে, এবার দারুণ শীতে,
ঠাকুর আমারে দিয়েছে স্বপন, দোষাই হইবে দিতে।
ঈষদ্ হাসিয়া কহে মহারাজ, দিতে হবে কি উপায়?
পূজা বিধি বিনা মানবের দান, দেবতা লবে কি পায়!
পূজারি কহিছে, "শুন মহারাজ ষোড়শোপচারে তার
পূজা পদ্ধতি, ষোড়শ শয্যা, ষোড়শ শীতারি আর—
ষোড়শ কলসী, ষোলখানা থাল, ষোহর ষোড়শ খান,
দক্ষিণা তরে, আর কাজ নেই, বাড়ায়ে পূজার মান।"
"সব ঠিক হবে"—কহে মহারাজ, পূজারি চলিল ঘরে,
শীতের কাপড়ে ভাণ্ডার গৃহ, রাজার উঠিল ভরে,
পূজার দিবসে দেখে পুরোহিত, দুখীজন শত শত
শীতে কাঁপে তনু, রাজবাটী চলে সলিল প্রবাহ মত।
বিস্মিত আঁখি, ঋত্বিক্ দেখে, মহারাজ নিজ করে,
শীতের কাপড় ডাকি দীনজনে সানন্দে দেয় ধরে।
আকাশ ভরিয়া উঠিছে আশীষ, "জয় জয় মহারাজ,
দুরন্ত শীতে, দারুণ যাতনা, যু চাইলে তুমি আজ।"
পূজারি চাহিয়া কহে মহারাজ, "আজ পুরোহিত আমি,
পূজা উপহার লইতে আপনি, দেবতা এসেছে নামি;
নিখিল ভুবনে আমার ঠাকুর, ভরপুর হ'য়ে আছে,
ধনীর দুয়ারে, আশীষ লইয়া, দীনবেশে ধন যাচে,
দুখীর নয়নে তাঁহার অশ্রু, ধনী মুখে তাঁর হাসি,
সাধুর পুণ্য, তাঁহার আলোক, দয়া তাঁর সুধারাশি।
যে স্বপন তোমা দিয়েছে ঠাকুর, সে স্বপন মিছে নহ,
দীনের দৈন্যে ব্যথা বাজে বুকে, সে যে মোর দয়াময়।
চুল চন্দনে, তোমার পূজায় দেবতা আছেন জাগি,
যাও পুরোহিত, পূজ নিয়া তাঁরে, আশীষ লইব-মাগি।"

বংশের কলঙ্ক

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু)

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ

কালীশঙ্করের সর্ব্বনাশ

"হাঁরে হারাধন, আমার মা লক্ষ্মী না কি এসেছেন? কই কোথায় তিনি?" কালীশঙ্কর বাবু গাড়ী হইতে নামিয়াই এই কথা খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সেদিন তাঁহার বাড়ীতে কয়েকজন লোক খাইবে, তাই তিনি সুব্যবস্থার উদ্দেশে প্রাতেই অনিলাবালাকে আনিতে বালিগঞ্জে মোটর পাঠাইয়াছিলেন।

হারাধন অত্যন্ত ভৃত্যের সহিত গাড়ী হইতে বাজার নামাইতে নামাইতে বলিল, "আজ্ঞে দিদিমণি ত' অনেকক্ষণ এসেছেন। নিচের কাজ সেরে তিনি বোধ হয় এতক্ষণ উপরটা পরিষ্কার করাতে গেছেন।"

কালীশঙ্কর বাবু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘরের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ঝাড়াঝুড়া হইয়াছে, সব যেন ঝকঝক তকতক করিতেছে, ফুলের সজ্জা এমন চমৎকার হইয়াছে যে দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যায়। কাহার মঙ্গল হস্ত স্পর্শে ঘরটীতে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে কালীশঙ্করের বাকি থাকিল না। পরমানন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি অনিলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অনিলা আসিয়া বলিল, "জেঠামণি, ডাকছিলে কেন?"

"ডাকছিলুম, আমার মাকে দেখবো ব'লে। হাঁ মা, সব যোগাড় পেয়েছ, না কিছু আনতে বাকি আছে? এদিকে কতদূর কি হোলো? আহা সাহেব যদি এখানে থাকত, তা হলে আমার মায়ের হাতের দুই একখানা তরকারি খেতে পেত। সাহেব আমাদের দেশী তরকারি খেতে বড় ভালবাসে। হাঁ, দেখ মা, মাছের কচুরি সিঙ্গাড়াটা তুমি নিজের হাতে করতে পার যদি বড় ভাল হয়, ও বামুনরা যতই বরুক তোমার মত হবে না।"

"হাঁ জেঠামণি, সাহেব শিলং গেছেন কেন?"

"ঐ যে আমাদের আসামের নতুন কারবার গুলোর সম্বন্ধে ভালরকম সব বন্দোবস্ত করতে। সাহেব ওখানকার কাজ সেরে শিবাংস মিলে যাবে। পরশু সাহেবের ওখানে পৌঁছাবার কথা। সাহেব পৌঁছে অরুণকে ছেড়ে দেবে। হাঁ ভাল কথা, ঐ টেবিলের টানার ভিতরে একখানা চিঠি আছে নিয়ে এসো ত' মা।"

অনিলা চিঠিখানি আনিয়া দিল। কালীশঙ্কর বাবু বলিলেন, "থাক, ওখানা পড়তে ইচ্ছে কর পড়, ওতে আসামের আবরদের কত আশ্চর্য্য কথা আছে। ওখানা অরুণ লিখেছে——"

এই সময়ে একটী দাসী আসিয়া বলিল, "বড়বাবু, দুজন মেয়েলোক দেখা করতে চায়, তারা নিচে পিসীমার কাছে বসে আছে—"

কালীশঙ্কর বাবু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোক? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কিছু চায় যদি, বাইরে সরকার মশাইদের বলগে না দেবে'খন।"

"না বড়বাবু, তারা কিছু চায় না; তারা বলছে, তোমার সঙ্গে দেখা করবার দরকার, তাদের কি সদরে যেতে বোলবো?"

"না, তাদের এইখানে পাঠিয়ে দাও।"

কিছুক্ষণ পরে দাসী দুইটী স্ত্রীলোককে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। উহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা ঈষৎ অবগুণ্ঠনে কপাল ঢাকিয়া দ্বার সান্নিধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, অপরা একবারে দীর্ঘাবগুণ্ঠনে দ্বারের বাহিরে ঈষৎ অধোমুখভাবে দাঁড়াইল, উহার বুকের উপর একটী অতি কোমল শিশু ছিল।

কালীশঙ্কর বাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি চাও বাপু তোমরা?"

বয়োজ্যেষ্ঠা অবগুণ্ঠনটী ঈষৎ টানিয়া যেন কত জড়সড় হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বাবা, তুমি আমাদের বকুল বাগানের রাজা বাবা, গরীব দুঃখী তোমার কাছে এসে কখনও শুধু হাতে ফিরে যায় না। আমার মাথার যত চুল বাবা তত—"

"থাক, কি করতে হবে বল। আমার দ্বারা তোমাদের যদি কিছু উপকার হয়, উচিত হলে নিশ্চয়ই করব।"

রমণী বলিল, "আমরা তোমার কাছে বিচার চাই বাবা।"

"বিচার? কিসের বিচার?"

জ্যেষ্ঠা নবীনার ক্রোড় হইতে শিশুটীকে তুলিয়া লইয়া হাতের উপর নাচাইতে নাচাইতে বলিতে লাগিল, "এই ছেলে, এই সোনার চাঁদ ছেলে, সোনার মাণিকটীকে নিয়েই বাবা যত গণ্ডগোলে পড়েছি।"

"তা' আমি তার কি করব?"

"তুমিই ত' বাবা করবে, নইলে কে করবে? দেখ দেখি এর মুখপানে তাকিয়ে, তোমার আপনার জন কি না?"

"আমার আপনার জন? কি পাগলের মত বলছ?"

স্ত্রীলোকটী বাবাজীর মুড়ি-অলা। সে বলিয়া যাইতে লাগিল রাজার নাতি হয়েও বাছার কপালে বিধাতা পুরুষ দুঃখু লিখেছেন, তাই না আমার কুঁড়েয় থেকে বাছা মানুষ হচ্ছে। আমায় জান ত' বাবু, আমি এই গলির মুড়ি-ওলী, খোকার বাপ ঐখানেই খোকার মাকে রেখে আসামে গিয়েছে। এখানে থাকতে রোজ্ম বাবাজীর ঠেঙ্গে ঘোর-পোষ দিত, তার পরে আসাম যেতে ঐ যে মেছের বাবু রমেশ না কি, তেনার হাতে দিয়ে খরচ দিত গো। কেন, বাবাজী সব ত' বলে গেছে বাবু। তা, আজ কদিন ধরে ঐ রমেশ মুখপোড়া বড় আলাতন করছে বাবু। বলে কি, ঐ বামা ছেড়ে উঠে না গেলে চাল কেটে উঠিয়ে দেবে। বলে, এ পাড়ায় থাকতে দেবে না। বাবু, কি অপরাধ করেছি, বাবু বল ত' ?"

সাদাসিধা ভাল মানুষ কালীশঙ্কর বাবুর গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিল। তিনি কি বলিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। কিন্তু অনিলা সে ধাতুতে গঠিত নহে, মুড়ি-ওলীর কথা শুনিয়া ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে ব্যঙ্গের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশ বাবুর সঙ্গে তোমাদের চটাচটি হ'ল কবে থেকে গা?" বলিয়াই অনিলা লজ্জায় মুখ রাঙ্গা করিয়া জেঠামণির চেয়ারের পিছনে লুকাইল।

মুড়ি-ওলী প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে পাকা খেলোয়াড় লোক, সহজে অপ্রতিভ বা অপ্রস্তুত হইবার নহে। সেও মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "তুমি কে গা বাছা, তোমার সঙ্গে—"

এইবার কালীশঙ্কর বাবু কথা কহিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "উনি কে? উনি আমার মা লক্ষ্মী, উনি যা বলবেন, যে ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, আমি তাতেই সম্মত হব।"

মুড়ি-অলী অমনই নরম হইয়া বলিল, "হাঁ মা, তুমিই বল ত' মা, এই গরীব বেচারা ছেলের হাত ধরে কোথায় যাই! এই অনাথ শিশু কি অপরাধ

করেছে মা বল দেখি? ওর কি পাপে শাস্তি হয় বল দেখি?" মুড়ি-অলী অতঃপর অবগুণ্ঠনবতী যুবতীকে কি যেন ইসারা করিল।

যুবতী গিরিবালা সে বয়সে কাঁচা হইলেও খেলোয়াড় নিতান্ত কম নহে। তবুও অনিলার সম্মুখে কথা কহিতে তাহার কেমন বাধবাধ ঠেকিতে লাগিল। গিরিবালা বলি বলি করিয়াও একবার অনিলার মুখের দিকে চাহিয়া নীরব রহিল। অনিলা তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মন তাহাকে বলিয়া দিল, মুড়ি-অলী যাহা বলিতেছে তাহার সবৈব মিথ্যা। কালীশঙ্কর বাবু কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া, জিজ্ঞাসিলেন, "সব ত' শুনলে মা। এখন তোমার উপরেই ভার দিচ্ছি, যা কর্ত্তব্য তাই বল।"

অনিলা এবার লজ্জায় মুখ লুকাইল না, সে মৃদুস্বরে কালীশঙ্করের কাণে কাণে কি বলিল। কালীশঙ্করের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি মুড়ি-অলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, আজ আমার বাড়ীতে একটা কাজ আছে, আমি তাতে ব্যস্ত আছি, আজ এ সকল কথার বিচার হতে পারে না। এর পর একদিন অবসর মত সব শুনে যা কর্ত্তব্য স্থির করব। এখন তোমরা যেতে পার।"

মুড়ি-অলী অনিলার দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বেশ বাবু, আজ আমরা যাই কোথা, খাই কি? ওদিকে যে মেছ বাড়ীর রমেশ বাবু লাঠি নিয়ে বসে আছে।"

অনিলা আবার কালীশঙ্কর বাবুকে চুপি চুপি কি বলিল। কালীশঙ্কর বাবু বলিলেন, "আমার মা বলছেন, রমেশবাবু আপাততঃ তোমাদের যাতে কিছু না বলে, তার ব্যবস্থা করা হবে। আর তোমাদের খরচ না থাকে আপাততঃ ভিক্ষার মত তোমাদের কিছু দেওয়া হবে, যেমন অন্যান্য ভিখারীকে দেওয়া হয়। তোমরা এখন যাও।"

মুড়ি-অলী উত্তেজিতস্বরে বলিল, "এই বিচার হ'ল? তোমার ছেলে আসাম থেকে রমেশবাবুকে যে চিঠি লিখেছে সেই চিঠিই প'ড়ে দেখনা। মেছ বাড়ীর বাবুদের জিজ্ঞাসা কর না, এ পাড়ার যারে তারে জিজ্ঞাসা কর না, যে ডাক্তার চিকিচ্ছে করেছিল তাকে জিজ্ঞাসা কর না, কে না জানে? আর বিচারের বা দরকার কি বাবু? আমি প্রমাণ, বাবাজীই প্রমাণ; আমাদের কাছেই ত' চুড়িকে এনে রাখলে গো। বলে বিচার! হাঁঃ!"

কালীশঙ্কর বাবুকে জবাব দিতে হইল না, অনিলা ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে উহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আসাম থেকে রমেশবাবুর নামে যে চিঠি এসেছে তার লেখা তোমরা জানলে কি ক'রে, রমেশবাবু কি তাঁর চিঠি তোমাদের দেখিয়ে বেড়ান? তোমাদের সব মিথ্যা।"

গিরিবালা পূর্ব্ব হইতেই অনিলার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ সে রমেশের মুখে অনিলার কথা শুনিয়াছিল এবং তাহার বিষয়ে সকল কথা জানিত; কেবল জানিত না, অনিলার প্রতি রমেশের লোভের কথা। আজ সে রমেশের নিকটই শুনিয়া আসিয়াছিল যে অনিলা এইখানে আসিবে। কৌশলে অনিলাকে অরুণের পাপের কথা শুনাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে রমেশই তাহাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছিল। এখন অনিলার মুখে কঠোর জেরা শুনিয়া গিরিবালা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। অধিকন্তু অনিলার অসামান্য রূপ, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং ভবিষ্যৎ সুখ-সৌভাগ্যের কথা মনে পড়িবামাত্র তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে হিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া ভীষণ দৃষ্টিতে যেন অনিলাকে দগ্ধ করিয়া বলিল, "রমেশবাবুর চিঠি পড়ি না পড়ি তাতে তোমার কি? গরীব দুঃখী আমরা এসেছি, এই ছেলেটার জন্য দরবার করতে, তাও তোমার সইল না? দুধের বাছার দুঃখু শুনেও তোমাদের দয়া হয় না, উল্টে তামাসা করছ, জেরা করছ?"

এই সময়ে রামদয় বাবু সরোজনাথ ও অমিয় কুমারকে লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার হাতে একখানা পত্র। "কি হে কালি, ঘরের কোণে মায়ে পোয়ে বসে গল্প জুড়লেই সব কাজ হবে, কেমন? এদিকে যে নিমুন্তন্নে বাবুরা —" সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে রামদয় বাবু এই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কক্ষের দ্বারসান্নিধ্যে স্ত্রীলোক দুটিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "এরা কারা? কি চায়?"

সকলে ঘরের ভিতরে আসিলেন। মুড়ি-অলীও তখন গিরিবালার মত দাঁড় হইয়া উঠিয়াছিল। সে শিশুটীকে আবার দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এই যে বাবুরা সব এসেছো। তোমরাই বিচার কর ত', কি অপরাধে এই দুধের বাছা শাস্তি পাবে, এই ভদ্দর লোকের মেয়ে কষ্ট পাবে, রাজা বাবুর ছেলে ভুলিয়ে ভালিয়ে এরে কুলের বার করলে, এখন খোর পোষের ভয়ে চাল কেটে বাসা থেকে উঠিয়ে দিতে চায়। তোমরাই বিচার কর পাঁচ জন।"

রামদয় বাবুর মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এসব কি, কালি?"

কালীশঙ্কর বাবুও গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, "যা দেখছ, যা শুনছ তাই, এর বেশী আমিও ত' কিছু জানি নি।"

রামদয় বাবু বলিলেন, "তার মানে তোমার অরুণের কীর্ত্তি ত'? ও ত' শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে, নতুন কোন কথা আছে?"

কালীশঙ্কর বাবু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সরোজ অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপনারা অনুগ্রহ ক'রে একটু চুপ করুন, স্ত্রীলোকটার কথার জবাব আমিই দিচ্ছি। এমন ধারা ব্যাপার যে ঘটবে, তা আমি অনেকদিন থেকেই মনে করে আসছি। হাঁ গা বাছা, তুমি বলছ তুমি বিচার চাও, বেশ আমি ওঁদের হ'য়ে বিচার ক'রে দিচ্ছি। কি তোমার নালিশ, তা বুঝেছি। তোমরা নালিশ করছ একজনের নামে, সুতরাং তোমরা এক পক্ষ আর সেই একজন আর এক পক্ষ। বিচারের সময় দুই পক্ষই উপস্থিত থাকা চাই। তোমরা এক পক্ষ উপস্থিত আছ, কিন্তু অন্য পক্ষ উপস্থিত নাই; সুতরাং তার অনুপস্থিতিতে কি ক'রে বিচার হতে পারে?"

কালীশঙ্কর বাবুর মুখে বিস্ময় ও সন্তোষের চিহ্ন প্রকটিত হইল, সরোজ যে এমন সুন্দর রূপে এই জটিল কথার মীমাংসা করিবে, তাহা তিনি আশা করেন নাই। অনিলারও চোখে মুখে নীরব কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। রমণীয় কিন্তু দারুণ বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইল। মুড়ি-অলী চীৎকার করিয়া বলিল, "সে থাকলো না থাকলো তাতে কি এসে গেল? প্রমাণ ত' সব রয়েছে, তা ত' আর উড়িয়ে দিতে পারবে না। খোর পোষের ভয়ে বুঝি এখন ঐ সব ছুতো তুলছো?"

গিরিবালা রাগে আগুন হইয়া মুড়ি-অলীর হাত খানা টানিয়া বলিল, "আয় মা, চলে যাই। যার ছেলে তার বাড়ীতে বসে এত অপমান! আচ্ছা, আদালত আছে সেইখানে বিচার হবে।"

সরোজ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "বেশ তাই কোরো।"

মুড়ি-অলির মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, সে দেখিল যে অভিনয়টা ওজন ছাপাইয়া গিয়াছে, তাই সে তাড়াতাড়ি বলিল, "না বাবু, ওর কথা শোনেন কেন? ছেলে মানুষ, রাগের মাথায় কি বলতে কি বলেছে। আদালত করবে, না ওর মাথা করবে। তুমি ও যেমন বাবু, গরীব দুঃখী আমরা, তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই ব্যবস্থা করে দাও। যাতে তোমাদের রমেশ বাবু আমাদের চাল কেটে উঠিয়ে না দেয়, আর এই অনাথারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়, তার ব্যবস্থা করে দাও, এর বেশী আমরা এখন কিছু চাই নি। রমেশ বাবুকে আসাম

থেকে টাকা পাঠাচ্ছে, সে টাকাও বেরে না, আবার বলে কি বাসা ছেড়ে যাও, না হ'লে জব্দ করবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। অনাথা মেয়ে মানুষের সঙ্গে এমনই ধারা করা কি ভাল হচ্ছে, না এই খোকার বাপ এখানে থাকলে কেউ এমনই করে ভয় দেখাতে পার ত তোমরাই বল না বাবু।"

কালীশঙ্করের মনটা এইবার একটু নরম হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা যাও এখন তোমরা, যাও এরপর তোমাদের কথা বিচার করব। এখন যাতে তোমাদের উপর কোনও জোর জবরদস্তি না হয় বা তোমাদের বিশেষ অভাব না হয়, তার ব্যবস্থা করা যাবে। তারপর আসামে চিঠি লিখে সব জেনে শুনে যা উচিত তাই করব। এখন যাও।"

মুড়ি-ঝাল ও গিরিবালা চলিয়া গেল, ঘরের ভিতর কিছুক্ষণ দারুণ নীরবতা বিরাজ করিল। পরে রামসদয় বাবু গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমেশের কথা ওরা কি বলছিল?"

কালীশঙ্কর বাবু বলিলেন, "যা বলছিল, তা ও' শুনেছ। ওরা বলছে, রমেশ ওদের অরুণের পাঠান খোরাক পোষাকের টাকা দিচ্ছে না, উল্টে ওদের বাসা থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে।"

সরোজ হঠাৎ বলিল, "কেন, তুমার কি মাথা ব্যথা এতে?

রামসদয় বলিলেন, "মাথাব্যথা কেন? ঠিকই সে করেছে। জেনে শুনে ত' সে পাপের প্রশ্রয় দিতে পারে না।

কালীশঙ্করবাবু ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, "তা হ'লে তুমি অরুণের দোষ মেনে নিচ্ছ?"

রামসদয় বাবু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "না মেনে করি কি? দোষেই যদি হবে, তা হ'লে মাসে মাসে খোরপোষের টাকা পাঠাবে কেন?

কালীশঙ্কর বাবু ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "স অমন কতদিকে কত টাকা দিয়ে থাকে তার খবর রাখ না, কেবল তার ছল ধরেই বেড়াচ্ছ।"

রামসদয়বাবুও ধৈর্য্যহারা হইলেন। তিনিও সমান ওজনে বলিলেন, "তুমি ও অন্ধ ব'লে অন্যরা জেগে ঘুমুচ্ছ ব'লে জগৎ শুদ্ধ, তাই, তা ত' নয়। তোমার ছেলের গুণ ঢের, তাই বাল্যের প্রতিশ্রুতি ভুলে আমার মেয়েকে তার হাতে দোবো না ব'লে স্থির করেছি।"

কালীশঙ্কর বিস্মিতও স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "হুঁহু, কি বলছও সব রাগের বশে? এখানে ছেলে-পুলেরা রয়েছে ভুলে গেছে কি?"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "না ভুলে যাই নি। ভালই হয়েছে, ওদের সাক্ষাতে কথাটা উঠেছে, ওটার শেষ মীমাংসা হয়ে যাক। তোমরাই বল, নিলা এখন আর ছেলে মানুষটী নয়, সব বুঝতে শিখেছে। বেশ, তা হলে সব কথা খুলাখুলিই বলা ভাল। দেখ মা, ছেলে বেলায় তোমার বা অরুণের জন্মাবার আগে আমাদের দুজনের মধ্যে আমাদের ছেলে মেয়ে হ'লে তাদের বিয়ে দেবার কথা হয়েছিল। উনি সেই দাবী দিয়ে এখন তোমার ঘরের বউ করে নিতে চান। কিন্তু আমি ওঁর ছেলের হাতে তোমায় দিতে চাই নি। কেন, তা দুটি স্ত্রীলোকের কথাতেই বোধ হয় বুঝতে পেরেছ। আমি সরোজকেই তোমার উপযুক্ত পাত্র ব'লে মনস্থ করেছিলুম। কিন্তু সরোজ তোমায় সহোদরার মত দেখে ব'লে আপত্তি করাতে মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারি নি। এখন স্থির করেছি, রমেশের হাতেই দোবো। রমেশও মন্দ ছেলে নয়। বড়ই মন্দ হ'ক, তা বলে কালির ছেলের চেয়ে মন্দ হ'তে পারে না।"

সরোজ আর পারিল না, বাধা দিয়া বলিল, "আপনি কি বলছেন?

এই সময়ে জুক রাম সদয় বাবুর হস্তে হইতে এক খানা পত্র মেঝের উপর পাড়য়া গেল। নিলা সেখানা কুড়াইয়া লইয়া তাঁহার হাতে দিল। রামসদয়ের দৃষ্টি পত্রের উপর পড়িবামাত্র তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "যাঃ, দেখেছ, রাজে তর্ক করতে করতে চিঠির কথা ভুলেই গেছি। দেখ ত' কালি, এখানা বাইরে এসে পড়েছিল, বোধ হয় পিওন দশটার ডেলিভারিতে দিয়ে গেছে, শিলংয়ের ছাপ রয়েছে।"

"শিলংয়ের ছাপ? কৈ দেখি। তা হ'লে সাহেব লিখেছে—" কালীশঙ্কর বাবু এই কথা বলিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিঠি পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখের ভাব অন্য আকার ধারণ করিল, দারুণ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের চিহ্ন মুখে প্রকটিত হইয়া উঠিল।

সরোজ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কি, কি হয়েছে? অমন করছেন কেন? অরুণ ভাল আছে ত'? কোন মন্দ সংবাদ আছে না কি?"

কালীশঙ্করবাবু পত্রখানি সরোজের হাতে দিয়া দুইহাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া কেবলমাত্র বলিলেন, "পড়"

সরোজ প্রকাশ্যে পড়িতে লাগিল :—

শিলং

হিলসাইড হোটেল।

প্রিয় কালীশঙ্কর,

অত্যন্ত মন্দ সংবাদ পাইয়া আমি এই মুহূর্ত্তেই সিবাসে মিলে যাত্রা করিতেছি। সেখানে পৌঁছিয়াই তোমায় অরুণের কুশল সংবাদ দিব।

ঘটনাটা এই যে সিবাং নদীর অপর পারের আসাম আবগেরা চঞ্চল হইয়া পুঠ পাঠ আরম্ভ করিয়াছে, সাডিয়ার পোলিটিকাল অফিসার শিলং বেড অফিসে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন সিবাসে মিলের উপর গালজেরা চড়াও হইয়াছিল, তাই তিনি সেখানে বর্ডার মিলিটারী পুলিশ পাঠাইয়াছেন সেখানে কি হইয়াছে না হইয়াছে, তাহার সংবাদ তিনি এখনও পান নাই। আমি এখনই শিলং হইতে সেখানে যাত্রা করিতেছি। কালী, কোনও ভয় করিও না। আমার বিশ্বাস, অরুণ সুস্থ শরীরেই আছে। সে নিজে ভাল, ভগবান তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। তবে পৃথিবীতে আকস্মিক দুর্ঘটনা নিতাই ঘটতেছে। তাহার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য। কেবল এই টুকু দেখিতে হইবে, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছি কি না।

সিবাং আবো গ্রামে পৌঁছিয়াই তোমায় খবর দিব, কোনও চিন্তা করিও না। বড় ব্যস্ত। ইতি

তোমার বশম্বদ

আর্থার কেনেডি।

পত্র শুনিয়া সকলেই নীরব। রামসদয়বাবুর মুখে গভীর চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি যেন আপনাকেই সকল বিপদের মূল বলিয়া অনুমান করিলেন, তাই নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ম্লানমুখে অগ্রসর হইয়া কালীশঙ্করবাবুর হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, "কালী, ভাই, কেন এত কাতর হচ্ছ। মানুষ মারা রাক্ষুস আবেরেরা সৈনিকের উপর চড়াও হয়েছে, এতেই না ভয়? কিন্তু তা বলে মন্দটাই বা আমরা আগে থাকতে ধরে নেবো কেন? আমার বিশ্বাস, অরুণ নিশ্চয়ই ভাল আছে। তার আর যা দোষ থাক, সে যে সাহসী, শক্তিমান আর আত্মরক্ষায় সমর্থ, তাতে আর সন্দেহ নেই। চিঠি দুদিন আগে লিখেছে, তা হলে এতক্ষণ নিশ্চয়ই সাহেব সিবাং মিলে পৌঁছেচে। বোধ হয় আজই সেখান থেকে খবর পাঠাবে।"

রামসদয়বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই "বাবু, তার এসেছে একখানা,"—দালান হইতে একজন খানসামা এই কথা বলিল। সরোজ, "তার? কৈ, কি তার, দেখি—বলিয়া এক লম্ফে দ্বার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া তার হাতে লইল।

রামসদয় বাবু অতিকষ্টে বলিতে সমর্থ হইলেন, "কি তার, পড় দেখি।"

সরোজ পড়িতে পারিল না, সে রামসদয়বাবুকে তারখানি দিয়া বলিল, "আপনি পড়ুন।" সে এক খানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

রামসদয়বাবু পড়িতে লাগিলেন :—

সিবাং স মিল।

কালি, মন দৃঢ় কর, বড় মন্দ সংবাদ। তোমার পুত্র বীরের মত পরের জন্য জীবন বলি দিয়াছে! জানি, পিতার পক্ষ এ সংবাদ কি ভয়ঙ্কর, কেন না, আমার পুত্র না থাকিলেও আমি অরুণকে পুত্রের মত ভাল বাসিতাম। কিন্তু ভগবানের ব্যবস্থার উপর আমাদের কোনও হাত নাই। যে পুরুষ-সিংহ দুর্বল অসহায় স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া বিপদের মুখে সকলের আগে ঝাপাইয়া পড়ে এবং হাসিতে হাসিতে জীবন আহুতি দেয়, আমাদের দেশে তাহাকে আদর্শ মানুষ জ্ঞানে সকলে পূজা করে। তোমার ভাগ্যে সেইরূপ আদর্শ পুরুষ পুত্ররূপে পাইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার অধিক কিছু বলিতে পারি না। আমি কোঠারে পরিবারকে এবং গঙ্গাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।

তোমার ব্যথায় ব্যথী আর্থার কেনেডি

সামান্য সূচীপতনের শব্দ হয় কক্ষে এমনই নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। কালী শঙ্কর নিশ্চল নিষ্কম্প পুত্তলের মত চেয়ারে বসিয়া পলকহীন দৃষ্টিতে গবাক্ষের বাহিরে চাহিয়াছিলেন। সরোজের মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। রামসদয় বাবু রুদ্ধকণ্ঠে পত্র পাঠ করিতেছিলেন, পাঠকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল।

অনিলা এতক্ষণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া তার শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে সে কালীশঙ্করের হোঁচটা হাতখানা প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিয়া ছিল। তাহার চোখে জল ছিল না, কিন্তু সারা হৃদয় ব্যাপিয়া কান্নার প্রলয়সমুদ্র বহিতেছিল। তাহার এক একবার মনে হইতেছিল বুঝি তাহার হৃদয় ভেদিয়া একটী ভীষণ চীৎকারে গগন মেদিনী ছাইয়া যায়। তাই সে মনের উপরে প্রাণপণ শক্তি নিয়োজিত করিয়া বুক ভরা কান্না চাপিয়া রাখিল। একবার তাহার মনে হইল, সব স্বপ্ন! সে ভাবিল, তার অসে নাই, সাহেব কিছু লেখে নাই, সে কেবল মনে মনে ঐ ভয়ের কথা ভাবিয়া মিথ্যা কষ্ট পাইতেছে। আবার পরমুহূর্তেই তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল, সে দেখিল, না সবই ত' সত্য! এই যে তাহার পিতার হস্তে সেই সর্বনেশে তার, এই যে সরোজ দাদার চোখের জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, সে বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, এই যে তাহার জেঠামণি কাঠের মত শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার চোখেও ত' তাহার মত এক ফোঁটা জল নাই। তবে কি সব সত্য?

অনিলা ক্ষণকাল অচৈতন্যের মত চারিদিকে ফেল ফেল চাহিয়া রহিল, মুহূর্ত পরেই তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। সে শুনিল তাহার পিতা কালীশঙ্কর বাবুর পিঠের উপর হাত রাখিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিতেছেন, "কালি, ভাই, চল বাইরে যাই।"

অনিলার ক্ষুদ্র হৃদয়ে তখন কোথা হইতে অদ্ভুত বল আসিল। সে হস্ত সঙ্কেতে সকলকে ঘরের বাহিরে যাইতে বলিল। রামসদয় জানিতেন, তাঁহার বালিকা কন্যার ন্যায় জগতে আর কেহ কালী শঙ্করকে শোকে শান্ত করিতে পারিবে না, তাই তিনি সেই নির্দ্দেশ মত সরোজ ও আময়কে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তখন অনিলা মৃণাল বাহুলতায় কালীশঙ্করের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাঁহার পাকা চুলের উপর কোমল কপোল রক্ষা করিয়া মধুর কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

কালীশঙ্করের মোহ দূর হইল, তিনি সেই ডাকে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার অরুণকুমার ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে পিতৃসম্বোধন করিতেছে। তাঁহার বক্ষের পঞ্জর—তাঁহার হৃদয়ানন্দ পুত্র কি সত্য সত্যই ফিরিয়া আসিল? মুহূর্তমাত্র দৃষ্টি উন্মীত করিয়া কালীশঙ্কর পার্শ্বে অনিলাবালাকে দেখিতে পাইলেন। অমনই তাঁহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল, আর তখনই কালীশঙ্কর দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িলেন, তাঁহার হৃদয়ের জমাট কান্নার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। যে শোকে কান্না নাই, সে শোক বয়সের দোষর, অন্যথা উন্মাদের পূর্বলক্ষণ। তাই যখন কালীশঙ্করের দেহ থাকিয়া থাকিয়া কান্নার বেগে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, তখন অনিলা দারুণ শোকেও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইল। ক্রমশঃ

অসীম

(শ্রীমতী লতিকা দাসী)

অসীমের মাঝে লভিয়া জনম
অসীমে মিশিতে চলেছি ছুটি,
যাহা কিছু হেরি সব মিছে ভ্রম,
এ' সুখ-স্বপন যাবে গো টুটি'।
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ছুটিছে তটিনী
পড়িতে অসীম সাগর-কোলে;
দিন গণ হায় সবে চলে যায়
অসীম কালেতে মিশিবে ব'লে।

উপরে নেহারি অসীম আকাশ
অসীম জলধি নিম্নে রয়,
সকল অসীম হইতে উর্দ্ধে,
হে অসীম তুমি করুণাময়,
করুণার তব নাই আদি শেষ
মহিমা তোমার অন্তহীন,
পূর্ণানন্দ সত্য ও জ্ঞান—
হে অসীম তব আজ্ঞাধীন।

সুখ ও শান্তি

(রূপক)

(শ্রীযতীশচন্দ্র কাব্যনিধি, বি, এ)

আমার দুইটি সন্তান—সুখ ও শান্তি। তন্মধ্যে আকারগত লক্ষণে বোধ হয় চিনিতে পারিবেন, সুখ আমার পুত্র আর কন্যার নাম শান্তি। সুখ বয়সে বড়, বলিষ্ঠ ও উদ্ধতস্বভাব। আর শান্তি বয়সে ছোট, সুকুমারা ও নম্রপ্রকৃতি। সুখের অনেক সঙ্গী। সে সর্ব্বদা সঙ্গীদের নিয়ে আমোদপ্রমোদে ব্যস্ত। আর শান্তি সে কখনও বেশী লোকের সঙ্গে মিশে না। নীরবে ধীরভাবে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যায়। কিন্তু এত অমিল সত্ত্বেও ভাই বোনে বেশ ভাব। সুখ সদাসর্ব্বদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকিলেও ভগ্নী শান্তির নিকটে সর্ব্বদাই নম্র। শান্তির কেমন একটা আশ্চর্য্য গুণ আছে, ভ্রাতা যতই ক্রোধো-

দীপ্ত হ'য়ে আসুক না কেন, এক নিমিষে তাহাকে জল করিয়া দিতে পারে। সাধারণ মানুষের ন্যায় আমিও আমার ছোট মেয়ে শান্তিকে একটু বেশী ভালবাসি আর তার গুণ পনায় আমি মুগ্ধ।

আমার শান্তির উপর মায়া বড় বেশী। আমার তেমন কিছুই ধনসম্পদ নাই। তাই শান্তি দরিদ্রেরই দুহিতা। বয়স তাহার অপরিণত। গরীবের মেয়ে ব'লে যে সে নিরভরণা, কিন্তু তাতে তার একটুকু দুঃখ নাই। সদাই প্রফুল্লমুখী সদাই হাস্যমুখী। আমি শান্তিকে নিয়েই একপ্রকার বেঁচে আছি। ভাব্‌ছি বয়স যখন তার পরিণত হ'বে তখন ত তা'কে পরের ঘরে দিতে হবে—তাকে ছেড়ে থাকতে হ'বে—তখন আমার কি দশা হ'বে। এইটা সময় সময় বেশই ভাবি। আর চোখের জলে বুক ভাসাই। শান্তিকে পাত্রস্থ কর্ব্ব কি? বন্ধুবান্ধবগণ কি বলেন? যদিও আমি তার গুণমুগ্ধ, কিন্তু দরিদ্রের নিরলঙ্কারা দুহিতা ব'লে কেহ তা'কে গ্রহণ কর্ব্বে কি? শিক্ষাভিমানী উপার্জ্জনশীল যুবকগণ গরীবের মেয়ের গুণপনার দিকে লক্ষ্য কর্ব্বেন কি?

যাই হো'ক শান্তি ক্রমে বড় হইতে লাগিল। তার গুণপনা দিন্ দিন বাড়িতে লাগিল। রূপ লাবণ্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বিবাহের বয়স টানিয়া আনিল। আমি বড়ই বিব্রত হইলাম। বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল, একদিকে শান্তিকে পাত্রস্থ করিবার অনিচ্ছা, আদর যত্নে লালিত পালিত করিয়া তা'কে সর্ব্বদা কাছে রাখিবার ইচ্ছা, আর অন্যদিকে বিবাহের বয়স অতিক্রম করিলে লোকে কি বলিবে? ভাবনা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। একদিন কথায় কথায় বিবাহের কথা পাড়িলাম। উদ্দেশ্য, শান্তির মনের ভাবটা জানিয়া লই। শান্তি বলিল, "বাবা, আমার জন্য ভেবো না। যাঁর কাজ তিনিই কর্ব্বেন। আপনি অনর্থক ভাবিয়া শরীর নষ্ট কর্ব্বেন না। তিনি মঙ্গলময়, তাঁর উপরে নির্ভর করুন।"

কথাটা বেশ মনে লাগ্‌লো। সেই দিন হ'তে আমার ভাবনা অনেকটা কমাইলাম। আবার পূর্ব্বের ন্যায় আশা ও সাহসে বুক বাঁধিলাম। দুই তিন বৎসর চলিয়া গেল। শেষে এক মাতৃপিতৃহীন যুবক শান্তির পাণিগ্রহণেচ্ছু হইল। যুবকটি বেশ সুন্দর, ধীর ও উপার্জ্জনশীল। মনে করিলাম, ঈশ্বর এই সম্বন্ধ সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। আর জামাইটিকে নিজের ঘরে রাখিয়া দিলেই মেয়েকে দূরে পাঠাইবার ভাবনা থাকিবে না। জামাইয়ের সঙ্গে মিশ্‌তে মিশ্‌তে সুখ ও ভাল হ'য়ে উঠবে। বলিতে ভুলিয়াছি, জামাই সুখের চেয়ে ২।৩ বৎসরের বড়। নাম প্রজ্ঞান, আমি এই বিবাহেরই আয়োজন করিলাম।

যাই হউক, বিবাহ হইয়া গেল। এবারে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। জ্ঞানের সংসর্গে উদ্ধত সুখের মতিও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সে ক্রমে ভাল হইয়া উঠিল। সে সংসারে শান্তিধারা ছড়াইতে লাগিল। কিছুদিন পরে শান্তি এক সুরূপা কন্যা প্রসব করিল। নাম রাখা হইল—মুক্তি। মায়ের ক্রোড়ে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিতা হইয়া ও ক্রমে সে সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। সুখ, শান্তি, জ্ঞান ও মুক্তির অপূর্ব্ব মিলনে সংসার মরু নন্দন কানন হইয়া উঠিল। ভাবিতাম, প্রণয়-তরু যে নন্দন-কাননের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা বড়ই অদ্ভুত ও মনোরম। পাঠকবর্গ, মনে রাখিবেন—আমার নাম্‌ই 'প্রণয়'।

রহস্য উন্মোচন

(গল্প)

(শ্রীলীলা দেবী।)

(১)

মাঘ মাসের প্রথম শীত। ঘন কুয়াশায় চারিদিক আবৃত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রৌদ্রের আশা সুদূরাহত! মাঝে মাঝে পশ্‌লা পশ্‌লা বৃষ্টিতে পথ সিক্ত ও পিচ্ছিল। পত্র শূন্য বৃক্ষরাজী জীর্ণ শীর্ণ দেহ লইয়া শীতের বন্‌কনে বাতাস হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দীন ভাবে চাহিয়াছিল।

সুদূর পল্লীতে একখানি ক্ষুদ্র কুটীরের বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া একটী যুবতী রমণী, একবার নির্দ্দয় আকাশের প্রতি চাহিয়া দেখিল এবং বুঝিতে পারিল যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এখন পরিষ্কার হইবে না। রমণীর দেহ সুগঠিত হইলেও অতিশয় ক্ষীণ এবং মুখ পাণ্ডুর! এই দারুণ শীতের উপযুক্ত গরম বস্ত্র তাহার অঙ্গে ছিল না। একটী সাদা গাউন—যদিও পরিষ্কার শুভ্র তাহার পরিধানে শোভা পাইতেছিল। রমণী একটী ক্ষুদ্র শিশুকে অতি সাবধানে মোটা গরম বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া কোলের ভিতর রাখিয়া বারম্বার দেখিতেছিল তাহার ঠাণ্ডা লাগিতেছে কি না! শিশুটীও অত্যন্ত ক্ষীণ, তাহার শুভ্র মুখখানি ও নীলাভ ক্ষুদ্র দুটী মাত্র কাপড়ের ভিতর হইতে দেখা যাইতেছিল। শিশুর ঐ চক্ষু দুটী ঠিক্ তাহার মাতার মত দেখিতে—সেইরূপ একটা অকথিত ভাষা ও ভাব-ব্যঞ্জক! রমণী আপন মনে বলিতেছিল "হাঁরে আমার বাছা! যদি মনকে শক্ত করে, তোকে একলা ফেলে কাজ করতে যেতে পারতাম, তাহ'লে খুঁজে পেতে একটা কাজ পেলেও পেতে পারতাম!

এখন আর উপায় নেই, এখন যে দুজনকেই উপবাসে দিন কাটাতে হবে! আর যদি শান্তি আর বিশ্রামের জন্যে এই ক্ষুদ্র মোড়কটীতে যা আছে তাই দুজনে খেয়ে ফেলি তাহলে কি মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের শান্তি দেবেন? না তা দেবেন না বোধ হয়! আমার বাবা আমার স্নেহময় পিতা—তিনি যদি আজ বেঁচে থাক্‌তেন! তিনিও যে চলে গেলেন! বাবা আমায় দেখা বলে সম্বোধন করতেন, তিনি যদি আর আমার এ কষ্ট দেখতেন তাহলে নিশ্চয় তাঁর কাছে স্বর্গে যাবার অনুমতি দিতেন! ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন্!"

রমণী এক মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইল—কারণ শীতের একটা দম্‌কা বাতাসে তাহার জ্ঞানচিত্তে বেদনা লাগিয়াছিল।

সন্তানের প্রতি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আবার সে বলিতে লাগিল—তোকে হত্যা করতে যে এ প্রাণ ফেটে যায়—তোর জন্যেই যে এ কাজ কিছুতেই ক'রতে পারছি না, না হলে অনেক আগেই এ যন্ত্রণা থেকে আমি নিষ্কৃতি পেতুম! তা যদি পারতুম তা হ'লে তিনি যখন আমায় ব'ল্লেন যে আমাদের বিবাহ—মিথ্যা বিবাহ হ'য়েছে, তখনি আমি এ প্রাণ তাঁর পদতলে ত্যাগ করতুম—কিন্তু তুই যে তখন আমার পেটে—তাই সে কাজ পারিনি—সন্তানের চাঁদমুখ দেখবার লোভে—তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে অদম্য মাতৃস্নেহের অযাচিত প্রেরণায় সে কাজ পারিনি! যাঁদের জীবন সুখের জন্য তাঁরা কেন অকালে মারা যান? আর আমাদের মত অভাগিনীরাই বা কেন বেঁচে থাকে? ঈশ্বরের এ কি রকম বিচার? আর এই বা কি

রকম নিয়ম যে আমায় এমন অবস্থায় ফেলেছে সে সুখে জীবন কাটাচ্ছে, সকলের সম্মান শ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে সমাজের সহানুভূতি ভোগ করছে, আর আমি—আমি নির্দ্দোষী হ'য়ে আজ সমাজ থেকে তাড়িত—লাঞ্ছিত—লজ্জায় মাথা তুলতে সাহস হয় না—পেটের ক্ষিধা মিটাবার জন্যে একটী পয়সা নেই—অনাহারে ম'রতে ব'সেছি—সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটারও মৃত্যু—কি —না—আমি পতিতা!—হায় আমি যে কোন পাপই করিনি গো! হে ঈশ্বর এই কি তোমার অনুগ্রহ—এই কি তোমার ন্যায় বিচার? আবার সে কনকনে বাতাসে কাঁপিয়া উঠিল এবং শিশুর ক্লান্ত ক্লিষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল—যাই হ'ক্ আত্মহত্যা ক'রতে পারবনা। যেমন ক'রেই হ'ক তোকে বাঁচাতে হবে! যাই দেখি, যদি কেহ আমাদের আগুনের কাছে একটু ব'সতে দেয়।

যখন গির্জায় কোন শুভ কার্য্য জ্ঞাপক ঘণ্টা-ধ্বনি হইতেছিল তখন রমণী সহরে পৌঁছিল। রমণী ভাবিল আজ সে একবার গির্জায় যাইয়া পাদ্রী সাহেবের সহিত দেখা করিবে, তিনি যদি দয়া করেন তা হ'লে আজ সে ছেলের নামকরণটা করাইয়া লইবে। ছেলের পিতার নামে যদিও তার দাবী নাই— তা নাই থাকুক্—সে তার নিজের মায়ের নামেই ছেলের নাম রাখিবে—সে নামটী যেমন পবিত্র—এই শিশুও যে তেমনি শুদ্ধ ও নির্দ্দোষী! আমিও একদিন এইরূপ নির্ম্মল ছিলাম ঈশ্বর তাহা জানেন! রমণী ধীরে ধীরে গির্জায় উপস্থিত হইল—কিন্তু একি! গির্জায় এত সমারোহ এত উৎসব কিসের? যুবক যুবতীর দল সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া গাড়ী হইতে নামিতেছে, এত গাড়ীর ভিড়ই বা কেন? একখানি সজ্জিত গাড়ী হইতে একটী সুন্দরী তরুণী অবতরণ করিল, তাহার বস্ত্র সুন্দর লেস্ নির্ম্মিত এবং তাহার কেশে নেবু ফুলের গুচ্ছ। আর তার পার্শ্বে কে?

"হে ঈশ্বর এও আমায় দেখতে হ'ল!" জেসী ম্যালকম্ শিশু বুকে করিয়াই অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। যার পায়ের উপর জেসীর দেহ লুটাইয়া পড়িল সেই লোকটীই বিয়ের বর আর্থার রাম্‌সে! আর্থার রাম্‌সে তখন হতভম্ব হইয়া জেসীর সজ্ঞা-হীন মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—আর তাহার মুখের উপর একটা মৃত্যুর ভীষণ ভাব ফুটিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ভাবী নববধূর হাতে রাখা হাত খানিও কাঁপিয়া উঠিল। নববধূ ভাবিল "আমার স্বামীর অন্তঃকরণ এত কোমল তাই তিনি একটুতেই এত ব্যথা পেয়েছেন!"

গির্জায় যাইয়া শুভ পরিণয় কার্য্যের সময়েও আর্থার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল—যেন তাহাদের বিবাহের সময় একটী অশরীরী আত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল—সেই অশরীরী আত্মার পাণ্ডু মুখ, বিস্ফারিত নয়ন, ও সোণালী কেশের গুচ্ছ, তখনও সে দেখিতে পাইল! যখন তাহারা গির্জ্জা হইতে গৃহে ফিরিল তখন নববধূ স্বামীকে বলিল "আর্থার, আমাদের বিবাহের দিনে দুইটা মন্দ চিহ্ন দেখা গেল—প্রথমতঃ অত রৌদ্র হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ সেই ভয়ানক দুঃখিনী দীনা রমণী—তার জীবনের বোধ হয় দুঃখময় ইতিহাস আছে, তার মুখ ক্রমাগত আমার মনে প'ড়ছে, তার দুঃখ জানতে ইচ্ছে করে!" পত্নী যে জেসীর জীবনের বিষয় অজ্ঞাত আছে ইহা সুস্পষ্ট জানিতে পারিয়া আর্থার রাম্‌সে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল, এবং আদরে সোহাগে কথায় হাসিতে ভুলাইয়া সে সেদিনের দুঃখময় ঘটনা স্ত্রীকে মনে আনিতে অবসর দিল না। কিন্তু তার স্ত্রীও ভুলিবার পাত্র নহে, আবার পর দিন সে বসিল, "আহা! সেই কচি ছেলেটীর কথা মনে হ'লে প্রাণটা কেঁদে ওঠে! আহা বেচারা কি দুঃখী! তুমি যখন বেড়িয়ে

ফিরবে সেই সময় যদি তাদের একটু দেখে এসো—তুমি ত ডাক্তার অনায়াসেই রুগ্ন ছেলেটীর চিকিৎসা ক'রতে পারো।" ডাক্তার রাম্‌সে এ কথার উত্তর না দিয়া যাহাতে সে কথা স্ত্রীর মন হইতে দূর করিতে পারেন, এই চেষ্টায় অন্য প্রসঙ্গের আলোচনায় যোগ দিলেন?

এই বিবাহের এক বৎসর পরে—একদিন বেলা রাত্রে ডাক্তার রাম্‌সের ডাক আসিল। ডাক্তার প্রথমে অত রাত্রে যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোমলমনা, পরদুঃখ কাতরা পত্নী তাঁহাকে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ী করিল। দৈব দুর্ব্বিপাকে ঠিক সেই রাত্রেই তাঁহার স্ত্রী নেলীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল।

ডাক্তার রাম্‌সেকে অবশেষে এমন সুন্দর আরাম পূর্ণ গরম কক্ষ ছাড়িয়া এই মাঘ মাসের রাত্রে বরফ জমা বাতাসের মধ্যে যাইতে রাজী হইতে হইল। তিনি নেলীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কিন্তু তোমায় ছেড়ে এখন কি আমার যাওয়া উচিৎ? যদি তোমার বেশী অসুখ হয় তখন এত রাত্রে একলা তুমি কি ক'রবে?" দয়ার্দ্রহৃদয়া নেলীনিজের প্রসব বেদনার কথা তুচ্ছ করিয়া অকাতরে বলিল—"ওঃ! তাতে কিছু হবেনা! তুমি দরিদ্রের উপকার ক'রছ জানলে আমার বেদনার মধ্যেও আনন্দ হবে।" ডাক্তার রাম্‌সে পত্নীকে চুম্বন করিয়া বলিলেন "নেলী! তুমি স্বর্গের দেবী!"

ডাক্তার রাম্‌সে একটী অর্দ্ধ ভগ্ন কুটীরে পৌঁছিয়া ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে উপর হইতে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর একসঙ্গে শুনিতে পাইলেন। একটী রমণী বাতি দেখাইয়া তাঁহাকে ঘরে লইয়া যাইতে যাইতে বলিল "ডাক্তার! তুমি এত দেরীতে এলে! বেচারা শিশুর যে এখন শেষ অবস্থা, আর তো উপায় নেই!" ডাক্তার ঘরে যাইয়া দেখিলেন একটি বিশীর্ণা রমণী নতমুখে বসিয়া আছে, তাহার ক্রোড়ে একটী শিশু বোধ হইল মৃত! তাঁহাকে দেখিয়া রমণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—তিনি শিশুর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে! তিনি তখন বলিলেন "আমাকে একটু আগে খবর দিলেই হ'ত—এখন তো আর উপায় নেই—বড়ই দুঃখের বিষয়!" এই কথায় সেই ক্ষীণ রমণীর কণ্ঠ হইতে আবার একটা আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিল, সে দুঃখে ও রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ধূম্রমুখে বলিয়া উঠিল "তুমি এসেছ—কে তোমায় খবর দিলে? যা হ'ক ঠিক্ হ'য়েছে, ঈশ্বরই তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজের ছেলের মৃত্যু দেখ্‌তে! ঐ দেখ তোমারই ছেলে অনাহারে উপবাসে ম'রেছে—শুনতে পাচ্ছ?—না খেতে পেয়ে উপবাসে ম'রেছে—উপবাসে! যেন সারাজীবন এই কথা তোমার কাণে বাজে—তুমি যখন সুখাদ্য উপাদেয় খাবার খাবে, আর কোমল শয্যায় শয়ন ক'রবে তখন এই কথা ভেবো। তোমায় নরক যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হবেই—কারণ যতক্ষণ ঈশ্বর আছেন ততক্ষণ পাপের শাস্তি আছেই!" বলিয়া শোকোন্মত্তা জননী মৃত ছেলেকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল "তুই তোর অবিশ্বাসী পিতাকে একটীবারও দেখতে পেলিনে! পিতার স্নেহ জানতে পারলিনে! কিন্তু মায়ের স্নেহ যে তোকে তা বুঝতে দেয়নি, কেমন ক'রে সেই মাকে ছেড়ে তুই চ'লে গেলি—আমার যে আর তুই ছাড়া কেউ নেই—আজ যে আমার সব গেল।" আর্থার রাম্‌সে প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিলেন, রমণীর বাক্য স্রোত তাঁহার বাক্‌রোধ করিয়া দিয়াছিল, যখন তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন তখন কতকগুলি টাকা ও নোট রমণীর কাছে রাখিয়া বলিলেন "শিশুর অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া সম্পন্ন কর।" তাহার পর আর সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এই রমণী পাগল হ'য়েছে—পাগল—পাগল—ওর কথা তোমরা শুনো না" বলিতে বলিতে তিনি কাপুরুষের

জায় ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার অন্তরে নিজের পাপকার্য্য স্মরণ করিয়া তুমুল ঝড় উঠিয়াছে—তাঁহাকে যে লোকে কত গালি দিতেছে ও গাড়ীর কাছে কত লোক জমিয়াছে তাহা তাঁহার কাণে ও চোখে পড়িয়াও পড়িল না। তাঁহার চোখের সুমুখে তখন কেবলই সেই মৃত শিশুর মুখছবি ভাসিয়া উঠিতেছিল। আবার মনে হইল যদি নেলী জানিতে পারে, না নেলী জানিতে পারিবে না—এ দুশ্চিন্তা কিসের জন্য? বাড়ী পৌঁছিবামাত্র একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল "প্রভুপত্নী বড়ই অসুস্থ! আমি এই মাত্র আপনাকে ডাকিতে যাইতেছিলাম।" ডাক্তার রামসে স্ত্রীর কাছে যাইয়া দেখিলেন তাহার অবস্থা বড়ই খারাপ, আরও কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসক আসিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না—সদ্যজাত শিশুর দিকে চাহিয়া নেলী বলিল "প্রিয়তম! এই শিশু আমাদের বড় আদরের ও বড় আনন্দের জিনিষ! এই তোমায় সান্ত্বনা দেবে।" মৃত্যুর পূর্ব্বে উপর দিকে একবার মাত্র চাহিয়া একটা কি দেখিয়া নেলী ভয়ানক ভয় পাইল এবং সেই ভয়ের চিহ্ন মুখে থাকিতে থাকিতেই নেলীর মৃত্যু হইল।

যখন তাহাকে সমাধিস্থ করা হইল তখন সকলেই দেখিল তাহার অত সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করিয়া মুখের উপর সেই আশঙ্কার চিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে।

কিছুদিন পরে একদিন ডাক্তার রামসের হঠাৎ মনে হইল যে শিশু অনাহারে মরিয়াছে সেই কি নেলীকে মৃত্যুর সময় দেখা দিয়াছিল—সে কি তাহার জীবনের সব গোপন কথা নেলীকে বলিয়াছিল? তাই কি নেলীর মুখে অমন ভয়ের চিহ্ন শেষ অবধি মুছিতে পারা গেল না? ডাক্তার রামসের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল! তাইতো—নেলী এতদিনে তাঁহার গোপনীয় কথা সবই জানিতে পারিয়াছে—তার তো গোপন করিবার উপায় নাই—যেখানে সে গিয়াছে সেখানে পাপ গোপন করা যায় না! এখন নেলীর সর্ব্বদর্শী চক্ষু তাঁহার গোপন পাপের রহস্য ভেদ করিয়া বহুদূর দুরান্তে চলিয়া গিয়াছে। আর সেই রক্তাক্ত উন্মোচনে আবরণ শূন্য নগ্ন পাপটা তাঁরই চক্ষের সম্মুখে, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে দিনরাত বিভীষিকা আঁকিয়া তাণ্ডব-নৃত্য করিতে করিতে বিকট অট্টহাস্যে তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার যোগাড় না করিয়া রেহাই দিবে না বুঝি!*

* ইংরাজি হইতে অনূদিত।

পথের পথিক

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি, এ]

জানি না এ দূর জীবন পথের কোথা আরম্ভ কোথায় শেষ,
চলি অবিরাম এপথ বাহিয়া এ চলার নাই বিরাম লেশ।
চারিদিকে মাঠ করে ধূ ধূ ধূ ধূ—তারি পারে হেরি শ্যামল রেখা,
সেথা হতে কেন তরুণ রবির হিরণ কিরণ দিতেছে দেখা।
যুগ যুগ ধরি কি বিপুল টানে সে আলোর খোঁজে চলেছি ছুটি,
পথের ক্লান্তি সবলে দলিয়া—শত মায়া-বাঁধ হেলায় টুটি।
এ পথে চলিতে কত অচেনায় ঘটিছে মধুর সুপরিচয়,
কত অজানায় হল জানাজানি হৃদয়ে হৃদয়ে কি বিনিময়।

ভ্রূকুটি হানিয়া কেহ গেল চলি, কারো সাথে হল ক্ষণিক দেখা,
কেহ গেল চলি মৃদুল হাসিয়া পরাণেতে আঁকি স্মৃতির রেখা।
বন্ধু বলিয়া পথের পথিকে কেহ নিল টানি আদর করে,
সুশীতল মধু পরশ দানিয়া সকল বেদনা নিমেষে হরে।
কত বিরহীর ব্যথিত নিশাস্ আলোড়িয়া হিয়া পড়িল লুটে,
কত আঁখি জল করে টলমল আজিও এ মোর মরম পুটে।
লয়ে সব স্মৃতি চলিয়াছি নিতি কে জানে কাহার অমোঘ টানে,
জানি না এ চলা কবে হবে শেষ—দাঁড়াব যে কোথা কেই বা জানে!

শীলভদ্র

[শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী বি, এ]

প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চয়ঙ্ চির মহিমামণ্ডিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মহাপুরুষের চরণ-তলে বসিয়া সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র, বেদ ও ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, যিনি বাঙ্গালীর গৌরব-স্থান ছিলেন এবং সম-সাময়িক ভারতের পণ্ডিত সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুধী ও বরেণ্য বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার নাম আজ বিস্মৃতির তিমির গর্ভে লুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন মানসে য়ুয়ন্ চয়ঙ্ মগধের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাসী ছিলেন। সে সময়ে নালন্দাই ভারতের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সপ্তমস্থবির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এই বাংলা দেশেরই একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম ছিল শীলভদ্র। ইনি সমতটের জনৈক অধীশ্বরের পুত্র। আবাল্য তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগ বশে তিনি সমগ্র ভারত পর্য্যটন করেন এবং ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে নালন্দা বিহারে উপনীত হন। এ সময়ে বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল নালন্দার সপ্তম স্থবির পদে নিযুক্ত ছিলেন। শীলভদ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অত্যল্প কাল মধ্যে গুরুর সঞ্চিত বিদ্যার অধিকারী হইলেন।

তৎকালে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধরাজের নিকট ধর্ম্মপালের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রস্তাব করেন। সঙ্ঘের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে মহামতি ধর্ম্মপাল রাজার আহ্বানে সম্মত হইলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে শীলভদ্র এই বিপুল দায়িত্ব স্বয়ং বহণ করিবার জন্য গুরুর নিকট সানুনয় আদেশ প্রার্থনা করিলেন।

গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া শীলভদ্র যখন তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার মানসে সভা মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন, পণ্ডিত তখন সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই বালক আমার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে?" কিন্তু এ দর্প তাঁহার অপসারিত হইল। তর্কের প্রারম্ভেই তিনি বুঝিলেন এ যুবক সামান্য নহে। শীলভদ্রের অশান্ত যুক্তি খণ্ডন ও কূট প্রশ্নের সম্যক উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া তিনি বাক্ যুদ্ধে বিরত হইলেন এবং মণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শীলভদ্রের অসীম পাণ্ডিত্য ও সুনিপুণ তর্ক

কুশলতার পরিচয় পাইয়া মগধরাজ তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ একটি নগর প্রদান করিলেন। সর্ব্বত্যাগী শীলভদ্র বলিলেন "আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, অর্থ আমার নিষ্প্রয়োজন।" রাজা উত্তর করিলেন, "বুদ্ধ মহিমা বর্দ্ধনি হইল তিথোহিত হইয়াছে। যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তাহা হইলে সদ্ধর্ম্ম রক্ষা হইবে না। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার এই দান গ্রহণ করুন।"

সংসার বিরাগী শীলভদ্র নগরটি রাজ প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার রাজস্ব হইতে একটি সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিলেন।

কি ধর্ম্ম, কি বিদ্যা, কি জ্ঞান, সর্ব্ব প্রকারেই শীল ভদ্র বৌদ্ধ কোবিদ মণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক পুস্তক প্রনয়ণ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পুস্তক সহজ, সরল ভাষায় লিখিত ও অসীম পাণ্ডিত্য পূর্ণ।

যুয়ন চাঙ শীলভদ্রকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাহার গুণানুরাগী ছিলেন।

কনোজ ঈশ্বর মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ শীলভদ্রকে বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

যুয়ন-চয়ং, শীলভদ্রের স্নেহলাভে নিজেকে সবিশেষে অনুগৃহীত জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারি প্রসাদে যে ধর্ম্ম ও শিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছেন ইহা সর্ব্বদা স্বীকার করিতেন। তিনি তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

কাশ্মীরের প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলী যে সকল জটিল বিষয়ের সমাধানে অসমর্থ হইয়াছিলেন, শীল ভদ্র সে সকল বিনা আয়াসেই মীমাংসা করিয়াছিলেন। মহারানী বৌদ্ধ হইলে তিনি যাবতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেই কিন্তু তাহার বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। স্বয়ং পাণিনি অধ্যয়ন করিয়া প্রিয়শিষ্য যুয়ন চঙকে তৎকালে প্রাপ্ত সপ্তম টীকার সহিত উহা অধীত করাইয়া ছিলেন। পাণিনি ব্যতীত যুয়ন চয়ংকে তিনি বেদ শিক্ষা দান করেন।

ঔদার্য্য তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিমাণই ছিল। সুয়নচয়ঙের বিপুল পাণ্ডিত্য ও শিক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ কোবিদগণ যখন তাঁহাকে এদেশে চির প্রবাসী হইতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন, শীলভদ্র তখন বলিয়াছিলেন, "বিশাল চীন সাম্রাজ্যে যুয়ন চয়ঙের বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করা উচিত। যুয়নচয়ঙ চীন দেশে গমন করিলে তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি সাধিত হইবে; কিন্তু এদেশে অবস্থান করিলে কোনই লাভ হইবে না। অতএব আপনারা উহার গমনের অন্তরায় হইবেন না।"

আবার যখন কুমার রাজ ভাস্কর বর্ম্মা যুয়নচয়ঙকে কামরূপে পদার্পণের জন্য পুনঃপুনঃ অনুনয় করেন তখন সুয়ন-চয়ঙ অসম্মত হওয়াতে শীলভদ্র বলিয়াছিলেন, "কামরূপে অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্ম্ম মহিমা প্রচারিত হয় নাই। উহার সবিশেষ প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যুয়ন-চয়ঙের কামরূপ গমন আবশ্যক। শীলভদ্র যে কিরূপ দূরদর্শী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন তাহাও এই বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয়।

অশোক শাসন্ত পণ্ডিতাগ্রগণ্য শীলভদ্রের সহিত নালন্দা বিশ্ব বিদ্যালয়ের নাম বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট। নালান্দার কথা বলিতে গেলেই শীলভদ্রের কথা মনে আসে। আজ নালন্দার মনোরম সৌধরাজি বিশাল স্তূপে পরিণত হইয়াছে সত্য কিন্তু অতীতের শ্মশানে যে গরিমময় পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তাহা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে নালন্দায় যে বৈপুল্য ও বৈভব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা শীলভদ্রের অধ্যক্ষতার সময়ে অটুট ও অম্লান ছিল। •

• Contributions of Bengal—Shastri.

ভাগের পূজা

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি. এ.]

(পূর্ব্ব পূজারীগণ :—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া (২) শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার ; (৩) শ্রীমতী সরলীবালা বসু (৪) শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ , (৫) শ্রীমতী চারুবালা বসু , (৬) শ্রীযুক্ত অজয়কুমার সেন , (৭) শ্রীমতী লীলা দেবী , (৮) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (৯) শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী (১০) শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায় (১১) শ্রীমতী গিরিবালা দেবী , (১২) রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, (১৩) শ্রীমতী স্নেহলীলা চৌধুরাণী।

অমলের কথা

আলোর ঝলক্ যখন পৃথিবীর বুকে লুটাইয়া পড়ে তখন চতুর্দ্দিকে একটা জাগরণের কোলাহল সৃষ্টি করে। তেমনি দেশে কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে এমনি একটা আলোর ঝলক্ আসিয়া দেশময় চেতনার উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তোলে।

এমনি একটা স্রোত আসিয়া যখন হৃদয়-দুয়ারে আঘাত করিল, অমনি আমার রুদ্ধ অর্গল মুক্ত হইয়া গেল। সে আকুল প্রবাহে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া বিলাইয়া দিলাম। মনে হইল, যে শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম তাহাকে এতদিনে লাভ করিয়াছি। আমি প্রাণ ঢালিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইলাম।

প্রথমে খুবই উৎসাহের সহিত কর্ম্ম-স্রোতে বহিয়া যাইতে লাগিলাম। একটা প্রেরণা আসিয়া আমার হৃদয়-তন্ত্রীর সবগুলি তারকে অব্যক্ত মধুর সুরে সাজাঁর করিয়া তুলিল। কিন্তু কলিকাতায় বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে আমি সুর হারাইয়া ফেলিলাম। আমার গোপন বীণার সবগুলি তার একসঙ্গে 'ধর্ম্মঘট' করিয়া সংসা নীরব হইয়া পড়িল। তাহারা আমাকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল—যেখানে প্রত্যেকেরই নেতা সাজিবার স্পৃহা আছে কিন্তু নীতিজ্ঞান নাই; ব্যক্তিত্বের সৌধ গড়িবার প্রচেষ্টা আছে কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রীতি দেখাইবার আগ্রহ নাই; বিরাট ধর্ম্ম-মন্দির তুলিয়া সকলকে চমকিত করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ সমভাবে সকলকে বুকে টানিয়া লইবার মত ঔদার্য্য নাই—সেখানে আমরা মিলনের সুর ঢালিতে পারিব না। আমি আশাহত হইয়া বসিয়া পড়িলাম।

সেই দুর্দ্দিনে যখন বিভ্রান্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলাম তখন হঠাৎ একদিন কমলের সঙ্গে পথে দেখা হইয়া গেল। কমল আমার সমপাঠী। তাহার সহিত আমার আচার-ব্যবহারের, রীতি-নীতির অনেক প্রভেদ, তবু ওকে আমি চিরদিনই কেন জানি না বড়ই ভালবাসি। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের সঙ্গে জীবনে কোন কাজেই মিল হয় না অথচ আজীবন প্রাণে প্রাণে বেশ মিল থাকিয়া যায়। কেন এমন হয় জানি না। কবিরা বলিয়া থাকেন—এটা নাকি নাড়ীর টান। তা যাই হউক—কমলের সঙ্গে আমার ভাবটা ছিল এমনি একটা রৌদ্র মেঘের লুকোচুরির মত আব্ছায়া রকমের। প্রাণের কাছে অনেক প্রশ্ন করিয়াও এর কোন কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পাই নাই।

কমলের সঙ্গে অনেক দিন পরে আবার নূতন করিয়া মিশিতে আরম্ভ করিয়াছি। দেখিলাম এ সময়ের মধ্যে উহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উদ্দাম লালসার প্রবাহে সে অবাধে নিজেকে ভাসিয়া দিয়াছে, তবু প্রাণটা একেবারে অতল গহ্বরে হারাইয়া যায় নাই। এই পঙ্ক-স্রোতের ভিতর হইতে হৃদয়ের উজ্জ্বল কমলটী বিকাশলাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। কমলের হৃদয়-কমল একদিন

অপূর্ব্ব শ্রীতে বিকশিত হইবেই—কোন প্রতিকূল স্রোতই তাহাকে রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। আমি ঠিক করিলাম যদি কমলের প্রতি আমার প্রকৃতই দরদ্ থাকে তাহা হইলে উহাকে অধঃপতন হইতে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। প্রলোভনের বাহুঘর এই কলিকাতার লেলিহান্ গ্রাস, আর তরুণ মস্তিষ্ক চর্ব্বণকারী, কুমন্ত্রণা বিশারদ 'খুড়ো'টার কবল হইতে কমলকে রক্ষা করিতে হইবেই। আমি কমলের সহিত নিবিড়ভাবে মিশিতে লাগিলাম। নিজের মনটাও তখন কলিকাতা হইতে পালাইবার পথ খুঁজিতেছিল। আমি কমলকে লইয়া তাহাদের পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলাম। দিন কয়েক পরে খুড়াও আসিয়া দেখা দিল। কি আপদ! যে রাহুর ভয়ে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম সে রাহু আবার আসিয়া জুটিয়াছে। মহা ভাবনায় পড়িলাম।

খুড়োটি যে সে পাত্র নন। তিনি শুধু কমলের মাথাটি ভক্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, আমার এই নীরস মাথাটির উপরও তার বেশ লোলুপ দৃষ্টি আছে। সেদিনের কথাতেই এর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমাকে বলিতেছিল—"বাবাজী, পাড়াগাঁ বলে একে ঘেন্না করো না। এখানে এমন অনেক মাল আছে যা দেখলে মাথা ঘুলিয়ে যাবে—পাঁচবার ডিগ্‌বাজী খেয়ে পড়বে। মাল ত না যেন আমের মোরব্বা—কেবল খাই-খাই ভাব। ভাগিস্ এরা কলকাতায় যায় নি। এরা এখানে আছে বলেই ত তোমাদের মত এমন সৌখীনবাবুদের একটু আদর যত্ন দেখাতে পারি।" তার পর বার কয়েক বুক চাপড়াইয়া গৌরবের সহিত বলিল—"খুড়ো বলে ভেবো না যে একেবারেই পছন্দ বোধ নেই। কমল আমার পাকা জহুরী—সে জিনিষ চেনে। খুড়োর নামেই বাবাজী অজ্ঞান। এই বলিয়া খুড়ো আনন্দে হাসিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার খোঃ-খোঃ করিয়া কাশিতেও বাধা করিল না। খুড়ার কথা শুনিয়া ক্রোধে আমার সমস্ত দেহ উষ্ণ হইয়া উঠিল। কিছুতেই রসনাকে সংযত করিতে পারিলাম না। জোর গলায় বলিলাম—"সাবধান খুড়ো! ফের যদি তোমার মুখে এ সব কথা শুনি, জিভ্ টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌ব। কোন কমলই বাঁচাতে পারবে না।" আমার গৌর-গোবিন্দ চেহারা দেখিয়া সেই যে খুড়া পলাইল আজ পর্য্যন্ত আর তাহার দেখাটি নাই। ভগবান্ করুন ও পাপমুখ যেন আমাদের আর দেখিতে না হয়।

কোনদিন সাক্ষাৎ ভাবে পল্লীর সাথে পরিচয় ছিল না। পল্লীর কত মধুর চিত্র কল্পনা করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম কিন্তু দেখিলাম দূর হইতেই জিনিষটাকে ভাল দেখায়। কল্পনার ছবির সহিত বাস্তব চিত্র অনেক সময়েই বড় বৈষম্য ঘটায়। কত আশা করিয়া পল্লীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই নিরাশ হইয়া পড়িতেছি। হয় ত পূর্ব্বে এ পল্লী মধুর উৎস ছিল কিন্তু আজ সে মূর্ত্ত শ্মশান। তাহার অন্তর মথিয়া সুললিত সঙ্গীত আসে না—যাহা আসে তাহা বেদনার হাহাকার আর নৈরাশ্যের ক্রন্দন। ভাবিয়াছিলাম এ শ্মশানে আবার মাধুর্য্যের প্রাণাদ গড়িবার চেষ্টা করিব। কিন্তু সে আকাশ-কুসুম আমার নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। এখানে আর যাই থাকুক্ মানুষ নাই। যাহারা আছে তাহারা প্রায়ই মানুষের প্রেত-মূর্ত্তি। এ শ্মশানের অধিপতি নির্জ্জীব নিশ্চল সমাজরূপী একটা পাষাণ মূর্ত্তি। তাহার গলায় হু' গাছি সুতা, কপালে প্রকাণ্ড উল্কি, (লোকে বলে ওটা নাকি কৌলীন্যের জয় টীকা), মাথায় আঁটা দিয়া লাগানো একটি টিকি। প্রেত মূর্ত্তিগুলি নির্ব্বিবাদে যুগ যুগ ধরিয়া ইহার পূজা করিয়া আসিতেছে। এ পূজায় তাহাদের ক্লান্তি নাই—ইহা ছাড়া যে আরও অনেক করণীয় কাজ আছে তাহা তাহারা স্বীকার করিতে চায় না। সমাজের দোহাই দিয়া অসামাজিক কাজ করিতে এদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই। পর নিন্দায় ইহাদের পরম আনন্দ। দৈনিক এক হাজার বার মালা টপ্‌কাইবার সঙ্গে সঙ্গে নিদেন্ দুই হাজার বার পর নিন্দা না করিলে সে দিনটাই ব্যর্থ যায়।

এখানে আসিয়াই একটি লোকের সঙ্গে বড়ই ভাব হইয়াছে। সে প্রসাদ। কমলের মুখে প্রসাদের মা'র অনেক কথা শুনিয়াছি এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম করিয়াছি। প্রসাদের সবল দেহ ও জ্যোতির্ম্ময় চোখ দুটি দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম এ একটি মানুষের মত মানুষ। নিবিড় ভাবে পরিচিত হওয়ার পরে দেখিলাম এর দেহটা যেমন সবল—মনটা তেমন সবল নয়। এক কোণায় একটা গলদ রহিয়া গিয়াছে। মালতী তাহাকে ঘুনিবেগে ঘুরাইতেছে। প্রসাদ মালতীকে লাভ করিতে চায়। মালতীর রূপের জ্যোতিতে বুঝি প্রসাদের চোখ দুটি ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে। প্রসাদের মুখে অনেকবার মালতীর রূপের কথা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার গুণের পরিচয় ত তেমন কিছু পাই নাই। এই রূপই প্রসাদকে পাগল করিয়াছে—প্রসাদ মরিয়াছে। মানুষ কত বড় ভণ্ড,—সে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতে—আত্মাকে প্রবঞ্চনা করিতে একটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রসাদ প্রেমিক সাজিতে চায় কিন্তু এ যে প্রেম নয়, রূপের তৃষ্ণা; এ কথা সে কিছুতেই স্বীকার করিবে না। প্রেমিক হইতে হইলে যে আত্মদানের শক্তি—যে সংযম দরকার তাহা এই সংসারে কয়জনের আছে? এখানে প্রেমের অর্থ—লালসার উদ্দাম প্রবাহ—যৌবনের নির্ম্মম অভিশাপ।

মালতীর কথা

প্রসাদবাবুকে আসিতে 'তার' করা হইয়াছে। উৎকণ্ঠায় বারবার ভাবি এই বুঝি তিনি আসিলেন। আমাকে দেখিয়া কি ভাবিবেন—কি জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সব নানা চিন্তা আসিয়া মনটাকে অস্থির করিতে লাগিল। বাড়ীতে আসিয়া প্রথমে প্রসাদবাবুকে না দেখিয়া বড়ই দমিয়া গিয়াছিলাম। তাকে দেখিবার জন্য আমি যতটা আকুল, আমাকে দেখিবার জন্য কি তিনিও তেমনি আকুল? আমার ছবিটা পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন। যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। তবু কেন জানি না অভিমানে আমার বুকটা দুলিয়া উঠিতেছিল। কেনই বা ছবি আঁকা, আর কেনই বা এই শাস্তি? আমার উপর বুঝি একটা বিতৃষ্ণা আসিয়াছে। হবেও বা তাই। তিনি ত জানেন না আমি কি চক্ষে তাঁকে দেখিয়াছি। ভগবান্ বলিয়া যদি কেহ থাকেন তবে তিনিই আমার কাছে জাগ্রত ভগবান্। একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা মাঝে মাঝে মনের কোণে উঁকি দিতেছে। না না তা কিছুতেই হইতে দিব না। আমি তাঁকে স্পর্শ করিব না। আমার দেবতার গায়ে কলঙ্কের ছায়া দিয়া তাঁকে কখনই মলিন হইতে দিব না। আমার দেবতার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিব না। আমার নারী হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে দমন করিব—আমি সংযত হইব।

সাত-পাঁচ কত ভাবিতেছি এমন সময় বাহিরের দরজায় ঘা পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে ডাক আসিল—'মা, আমি এসেছি। দরজা খোল।' এ'ত প্রসাদ বাবুরই কণ্ঠস্বর। অজানা পুলকে আমার হৃদয়টা ভরিয়া গেল। পিসীমা আসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিলেন। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম প্রসাদ বাবুই বটে।

দুপুর বেলায় সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে আমি আমার ঘরে বসিয়া পান সাজিতেছিলাম, এমন সময় ধীরে ধীরে প্রসাদবাবু ঘরে ঢুকিলেন। আমি ভাল করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিলাম না। একটা তড়িৎ প্রবাহ আমার সমস্ত দেহ-মনে কি ভীষণ কম্প তুলিয়া দিল। মনে হইতেছিল তিনি যদি এখন চলিয়া যান তাহা

হইলেই বাঁচি। কেহ যদি দেখিয়া ফেলেন, কি উপায় হইবে?

তিনি ডাকিলেন—"মালতি!" আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল—সাড়া দিতে পারিলাম না। তিনি আবার বলিলেন—"মালতি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।" আমি বহু কষ্টে সঙ্কোচভয় দূর করিয়া উত্তর দিলাম—"বলুন।" তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"তুমি কেন এ বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলে সব বুঝেছি। আমি অনেক ভেবে দেখেছি তোমাকে না পেলে আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হবে। বল মালতী বল, তুমি আমার হবে।" আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কিছুক্ষণ মনের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম চলিল। আকুল ভাবে ভগবানকে স্মরণ করিলাম ভগবান্ আমাকে বজ্র বহন করিবার শক্তি দাও, আমার দেবতাকে দুর্ব্বলতার হাত হইতে রক্ষা কর। আমি জয়ী হইলাম। এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম—"না না, তা হবে না—কক্ষণো হবে না।" এই বলিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পাশের ঘরে আসিলাম। মনে হইল, এক মুহূর্ত্তে আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে সমস্ত আলোক যেন নিভিয়া গিয়াছে—সেই অন্ধকারের ভিতরে পৃথিবীটা আমাকে লইয়া শোঁ-শোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। মাটিতে লুটাইয়া পড়িলাম।

প্রসাদের মা'র কথা

প্রসাদ আসিয়াছে। মালতীকে খুঁজিয়া পাওয়াতে সে খুবই সুখী হইয়াছে। কমল বলিতেছিল—"প্রসাদ দা'র সঙ্গে মালতীর বিয়ে হ'লে কেমন হয়।" আমি কমলকে ভর্ৎসনার সুরে বলিলাম—"ছিঃ কমল, এসব বল্‌তে নেই।" কমলের মনে হঠাৎ কেন এ কথাটা জাগিল! প্রসাদ কি কমলকে কিছু বলিয়াছে? কমলকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। ভয়, কি অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া বসি। প্রসাদ কি জানে না সে আমার কত গৌরবের ধন। আমি চাই প্রসাদ একটা মানুষের মত মানুষ হইয়া তাহার মায়ের মুখ উজ্জ্বল করুক।

সন্তানকে স্নেহে রিক্ত করিয়াই কি জননী-হৃদয় নিশ্চিন্ত থাকিবে? না তাহা নয়। দরকার হইলে তাহাকে কঠোর হইয়া সন্তানকে দুর্ব্বলতার হাত হইতেও রক্ষা করিতে হইবে।

প্রসাদকে সকল কথা খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিব। না-না চিন্তা করিয়া একদিন প্রসাদকে একা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রসাদ, এ সব কি শুনি?" প্রসাদ আমার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, আমার ভুল,—আমার অপরাধ,—আমার দুর্ব্বলতাকে এবারের জন্যে ক্ষমা কর।" পুত্রের দরদ্ কোথায় মাতৃহৃদয় তাহা মুহূর্ত্তে ধরিয়া ফেলিল। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। কোন কথা বলিবার মত শক্তি তখন ছিল না। হৃদয়ের সমস্ত বাঁধ চূর্ণ করিয়া অশ্রুর প্লাবন বহিয়া গেল। প্রসাদকে বুকে টানিয়া লইয়া মাতা-পুত্রে কতক্ষণ কাঁদিয়াছি জানি না, হঠাৎ চাহিয়া দেখি জানালার রেলিঙ ধরিয়া মালতী কাঁপিতেছে। ছুটিয়া গিয়া মালতীকে জড়াইয়া ধরিলাম। সে আমার বুকে মুর্চ্ছিত হইয়া লুটাইয়া পড়িল। • (ক্রমশঃ)

• আগামীমাসে শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী পূজার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গান

[ঝিঁঝিট—পোস্তা]

(রায় সাহেব শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত)

মান অপমান দুটো সমান,
কবে আমার হবে শিব!
জীবন মরণ, তোমার চরণ,
সঁপে হ'ব মুক্ত-ধীর॥
ভেদাভেদ সব দূরে যাবে, অভাব বোধ আর না রহিবে
সুখ দুঃখ সমান হবে, শত্রুমিত্রে সমান প্রীত্॥
সদানন্দে মনের সুখে, ব্যোম্ ভোলানাথ ব'লব মুখে,
পাপপুণ্য সব যাবে চুকে সন্দদ্দ হবে ঠিক্॥
টল্‌বো না আর কামের বাণে, মত্ত রব রামেরধ্যানে,
নাচ্‌ব সুখে হরিনামে, এই করো হে সদাশিব॥

প্রজাপতির দৌত্য

(বড় গল্প)

[শ্রীঅজয়কুমার সেন]

(৫)

তপেনকে এক দৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, রমেন বিদ্রূপস্বরে কহিল, "এতক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ীর মধ্যে সয়ূর পাশে বসে এসে তাতেও কি তোমার প্রাণের ক্ষুধা মিটল না।" এই বলিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া একটি মৃদু রকমের টান দিল।

রমেনের কথায় তপেন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "রমেন, কি চমৎকার ঐ দাদামশায়ের স্বভাবটি—কি প্রাণ-খোলা আপন-ভোলা মানুষটি; শ্রদ্ধায় মাথাটা আপনি নত হোয়ে পড়ে। এই বলিয়া সে বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে তাহার দিকে চাহিল।

এই কথা শুনিয়া রমেন কহিল, "সে কথা বাস্তবিকই ঠিক, এমন সাদাসিধা মানুষ এ যুগে খুবই কম মেলে কিন্তু ভাই একটা কথা বোল্‌তে বাধ্য হচ্ছি—সয়ূ তোমার মনে একটা মস্ত রেখা টেনে গেল।"

রমেনের এই কথায় তপেন মৃদু হাসিয়া কহিল, "রমেন, তুমিও দেখ্‌ছি পাগল হোলে। এ পাষাণ হৃদয়ে দাগপড়্‌বেনা ভাই, তোমার কথাটায় কিছুমাত্র সত্য নাই।" এই বলিয়া সে সেই স্থানটকে হাসির উচ্চরোলে মুখর করিয়া তুলিল।

রমেন আরো একটু কৌতুক করিয়া কহিল, "তা, তুমি যাই বল না কেন, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে সয়ূ তোমাকে একটু বিচলিত করিয়া দিয়াছে—"

তপেন কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়াই কহিল, "রমেন, একজন কবি কি বলে গিয়েছেন, "A Woman's love however erring must always be a holy and beautiful thing, for in its essence it is the desire not for her own but

for another's joy, এ কথার উপর তুমি কি বোলতে চাও—বল ত? এই কথা বলিয়া সে বিজয়ী বীরের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

তপেনের এই নূতন শুনিয়া, রমেশ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। তখন সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই অল্পক্ষণের মধ্যেই এত ভাবান্তর—এত গভীর প্রেম!

তাহাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া তপেন তখন মৃদু হাসিয়া কহিল, "কই হে আর যে কোন কথাই বোলছ না?"

"আর কি বোলব ভাই। তোমার নজীর শুনেই ত আমার চক্ষুস্থির! তুমি যে এতদূর এমন প্রেমের সাচ্চা জহুরী হোয়েছ—তা'ত আগে জান্‌তাম না। এক নিমিষে নারীর নিস্তব্ধ অন্তঃকরণের গোপন কথাটী যখন আয়ত্ত কোরতে শিখ নিয়েছ, তখন তোমার সঙ্গে কার তুলনা। আচ্ছা তপেন, তুই কি গোপনে গোপনে হঠযোগ সাধনা আরম্ভ কোরে দিয়েছিস নাকি?"

তপেন কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন চিত্তে কহিল, "আর জ্বালাসনে—এখন ভালয় ভালয় বাসায় চল।"

কৌতুক করিয়া রমেন কহিল, "এখন এত অধীর হোলে চোল্‌বে কেন—তোমার জন্যই ত এত দেরী; আর একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরযূর কথা ভাব, তা হোলে অতি শীঘ্রই বাসায় পৌঁছান যাবে।"

"যা, যা, আর বেশী বকিস্ না—এখন চল দেখি।" এই বলিয়া সে রমেশকে টানিয়া লইয়া গাড়ীর মধ্যে বসাইয়া দিল।

কিছুকাল গাড়ীর মধ্যে চুপচাপ করিয়া কাটিয়া গেলে, রমেশ গম্ভীরস্বরে কহিল, "তপেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, সরযূকে কি তুই সত্যই ভাল বেসেছিস।"

রমেশের কথা শুনিয়া তপেনের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল তারপর রুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "রমেশ, সরযূকে সত্যই আমি স্নেহের চক্ষে দেখেছি। তাহার সেই সলজ্জ ভাব, সরম বিজড়িত চাহনি, দেহের অনুপম লাবণ্য ও মধুর স্বভাব আমার চক্ষে অতি সুন্দর লেগেছে। সত্যই আমি তাহাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি।" এই বলিয়া সে রমেশের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল।

তপেনের বক্তব্য শেষ হইলে রমেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "সত্য সরযূর সম্বন্ধে যে সব গুণের কথা তুমি বল্‌লে; তা অনেকাংশেই সত্য। আমি কোনদিন ভাই তাহাকে কঠোর সমালোচকের চক্ষুতে দেখি নাই।"

"কেন, আমি কি তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকারের অত্যুক্তি করেছি, তাহার কি ঐ সব গুণ নাই?"

"তা'ত আমি বল্‌ছি না, কিন্তু....."

"কিন্তু কি?"

"এখন আর কোন কথা বল্‌ব না,—বাসায় চল তারপর সব বল্‌ব, এই বলিয়া রমেশ চুপ করিল।"

রমেশকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, তপেন আর কোন কথা না বলিয়া রাস্তার জনতার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাড়ীর দরজার সামনে গাড়ী আসিয়া থামিবামাত্র, তাহারা দুইবন্ধুতে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। গাড়োয়ানের প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া, রমেশ দ্রুত গতিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিল, "বৌদি—ও বৌদি।"

রমেশের বৌদিদি ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, বাহিরের ডাক শুনিতে পান নাই, হঠাৎ অসময়ে "বৌদিদি" ডাক কাণে যাওয়াতে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বৌদি" বলিয়া ডাক দিল কে?

এই বলিয়া তিনি যেমন ঘর হইতে বাহির হইবেন, অমনি রমেশ ঠাকুরপোকে সামনে দেখিয়া, অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "কি রকম

ঠাকুরপো, চিঠি পত্র না দিয়েই হঠাৎ যে আসা হ'ল?" একটু কি চিঠি লেখবারও ফুরসৎ পাও নি। চিঠি গেলে টেশনে গাড়ী রাখবার ব্যবস্থা করা হত।"

বৌদিদির কথা শুনিয়া রমেশ কহিল, "চিঠি আর কি লিখবো বৌদি। আমরা পুরুষ মানুষ, যখন আমাদের খেয়াল হবে—তখনই আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমরা ত আর তোমাদের মতন সচল লাগেজ নই যে যাবার পূর্ব্বে যান-বাহনের দরকার হবে?"

"হাঁগো হাঁা, আর বেশী বোকতে হবে না। আমি যদি আসবার জন্য চিঠি না লিখতাম, তা হোলে তোমরা যে আস্‌তে, সে আমার বিলক্ষণ জানা আছে।" এই বলিয়া মৃদু হাসিয়া পুনরায় কহিলেন, "তুমি কি একলা এলে—ন আর কেউ সঙ্গে এসেছে ঠাকুরপো?"

"না—বৌদি একলা কেন—তপনকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।"

"কই তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না? আচ্ছা মানুষ তুমি ত। ঠাকুর পো তাকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে এস্‌তে কি মনে করবে বল ত?"

রমেশ ত্বরিত গতিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, তপেন নিশ্চিন্তচিত্তে বাগানের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

তাহাকে অঙ্গভঙ্গ ভাবে বেড়াইতে দেখিয়া রমেশ সরযূর কথা বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিল। ঘাড় ফিরাইয়া তপেন বলিল, "নাও, নাও, আর অত লাজ বোকতে হবে না। তুমি কি সব সময়েই ছেলে মানুষি কোরব—বৌদিদি শুনলে কি মনে কোরবেন? বল ত?

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি এই চুপ কোরলেম। বৌদিদি তোমাকে ডাকছেন—বাড়ীর মধ্যে ত আর সরযূ নেই যে ভিতরে আস্‌তে বাধা? "এই কথা বলিয়া সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া লইল।

তপেন তখন ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "রমেশ তোমার কি কোন কাণ্ডাকাণ্ড নেই—যখন তখনই পরের মেয়েদের নাম করে ঠাট্টা কর্‌তে হ'বে।" তপেনকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়া রমেশ কৌতুকভরে কহিল, "সরযূ ত পরের মেয়ে নয়, সে যে আমাদের আপনার জন—প্রতিবেশী।"

"তিনি তোমাদের প্রতিবেশী হোতে পারেন—তাতে আমার কি? পরের মেয়ে আমার কাছে সব সময়েই পরের মেয়ে?"

তপেনকে বাগে পাইয়া রমেশ কহিল, "যদি তাই-ই হয়, তবে তুমি সরযূর ভাবে মসগুল হয়ে র'য়েছ কেন—তিনি ত পরের মেয়ে? ওহে তপেন —Love is ever blind."

সে সময় হঠাৎ সেখানে রমেশের বৌদিদি আসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা রমেশ ঠাকুরপো, তুমি যে তপেন ঠাকুরপোকে ডাক্‌তে আস্‌লে—তা এই আস্‌লে আর সেই আস্‌লে। তোমাদের কথা কি আর ফুরোবে না—গাড়ীতে আস্‌তে আস্‌তে কত লোকের সঙ্গে কত কথা বোল্‌লে—তবুও কথা কি ফুরোয় নি। বাড়ীর মধ্যে এসে হাত মুখ ধোও—জলটা খাও তারপর যত পার কথা বলো।"

বৌদিদির কথা শুনিয়া তাহারা দুইজনেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। তপেন মনে মনে ভাবিতে লাগিল—বৌদিদি যদি আমাদের সব কথা শুনিয়া থাকেন? কি লজ্জার কথা!

বৌদিদির আদেশ মত তাহারা বাড়ীর মধ্যে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া, গরম গরম দুই কাপ্ চা ও জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বসিলে, তাহাদের বৌদিদি আসিয়া তপেনকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যা'হোক ঠাকুরপো, এদিকে একবারও কি পা মাড়াতে নেই, চোখের আড়াল হোলে কি সবই ভুলে যেতে হয়?"

রমেশ তাহার বৌদিদির কথায় হাসিয়া মিষ্টি-মধুর বচনে কহিল, "বলুন ত বৌদি—আর একবার বলুন; চোখ একটু ছলছল।"

রমেশকে বাধা দিয়া তপেন কহিল, "রমেশ, তুই একটু থাম—বৌদিদির বিষের জ্বালা আগে সহ্য করি—তারপর তোর।"

এইরূপে কিছুকাল গল্প-গুজবে কাটিয়া গেলে, তপেন বৌদির নিকট বিদায় লইয়া বলিল "আমি একটু বিশ্রামের জন্য চল্লাম। যাবার সময় ডাক দিস্—বুঝলি?"

এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইল, রমেশের বৌদিদি ব্যস্ত-সমস্তভাবে কহিলেন, "অনেক দিন পরে দেখা হোল—একটু খবর-টবর বলবে না, বিশ্রামের জন্য চল্লুম। বেশ ত ঠাকুরপো; তুমি ত আগে এরকম ছিলে না—যদি কষ্ট হয় তবে যাও।"

রমেশ এই কথার উপর জোর দিয়া কহিল, "বৌদি, তপেনের আর সেদিন নেই—পূর্ব্বে যা দেখেছিলে! এখন শরীর খারাপের অজুহাত কোরে আমাদের বাসায় ত আসেই না—ঘরে বসে বসে নিভৃতে তার মানস সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করে বুঝলেন?"

"হ্যাঁ ঠাকুরপো, তোমার মানসসুন্দরীটী কে জানতে পারি না। সে কি আমাদের পাড়ার সেই ব্রাহ্মদের মেয়েটি না কি? এ আবার কোন দেশী নাম!" কথাটা বলিয়া ফেলিয়া তিনি রমেশের দিকে বিস্ময়-স্তব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

"বৌদিদি,আপনি তাঁকে চিনতে পারবেন না।" এই বলিয়া রমেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তপেন এতক্ষণ পর্য্যন্ত গম্ভীরভাবে রমেশের কথা শুনিতেছিল—আর যখন গাম্ভীর্য্য চাপিয়া রাখিতে পারিল না, তখন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রমেশের পৃষ্ঠে সজোরে একটা কিল বসাইয়া বলিল, "এটা তোমার বিরাট প্রতিভার বিরাট কৌতুক।"

বৌদিদির দিকে মুখ ফিরাইয়া তপেন কহিল, "বৌদি, রমেশের কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

"বিশ্বাস না কর্‌বারই বা কি কারণ আছে ঠাকুরপো? এখন তোমাদের মনের মধ্যে কত রকমের রঙীন ছবি ভাস্‌ছে—মন ত তোমাদের নেহাৎ এখন কাঁচা নয়?" এই বলিয়া তিনি মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

তপেন বৌদিদির মুখ হইতে এই প্রকারের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল "তবে আপনিও দেখ্‌ছি রমেশের দিকে ঢলে পড়লেন।"

"কি করি—স্বভাবের ধর্ম্মই এই।" বসিয়া তিনি তাহাদের বসিতে বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

তপেনও বাগানে একটু বেড়াতে চল্‌লাম বলিয়া রমেশের কাছ থেকে চলিয়া গেল।

রাত্রের আহার শেষ হইয়া গেলে, নানা কথায় রাত্রি অধিক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, তপেন তথা হইতে উঠিয়া নিজের স্থানে আসিয়া শুইয়া পড়িল। সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে সে অচিরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

রমেশকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহার বৌদিদি বিস্ময়সূচক কণ্ঠে কহিলেন, "হ্যাঁ ঠাকুরপো, তপেন ঠাকুরপোর মানসসুন্দরী কি বাস্তবিক কোন মেয়ে।"

রমেশ একগাল হাসিয়া কহিল, "ওটা একটা কাল্পনিক নাম বৌদিদি, মানসসুন্দরী আবার কোন মেয়ে মানুষের নাম হয় না কি?"

"তবে যে তুমি মানসসুন্দরী বলে ওকে খেপাচ্ছিলে?"

"ও একটা কথার কথা।"

কিছুক্ষণ একথা সে কথা হইবার পর, রমেশের বৌদিদি কহিলেন, "তুমি যে তপেন ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ, বড় ভাল কাজ করেছ ঠাকুরপো।"

উৎসুক নেত্রে বৌদিদির দিকে চাহিয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বৌদিদি—কি হয়েছে?"

সে দিন দুপুর বেলায় আমাদের প্রতিবেশী অনাথ ডাক্তারের স্ত্রী আমাদের বাসায় বেড়াতে এসে একথা সেকথার পর বল্লেন, "দিদি, আমার খুড়শ্বশুরের এক মেয়ে আছে তার যদি একটা ভাল সম্বন্ধ যোগাড় করে দিতে পার, তা' হোলে বড়ই ভাল হয়। উনি ত কত খোঁজাখুঁজি কর্‌লেন, কোন যায়গায় সুবিধা কোরে উঠতে পার্‌ছেন না। যদিও বা কোন স্থানে সুবিধা হয়, তারা এমন সব চেয়ে বসে, যা দিতে আমরা কিছুতেই পারি না।"

অনাথ বাবুর নাম শুনিয়া "রমেশ উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "বৌদিদি ঠিকই হয়েছে—ডাক্তার বাবুর বোনের নাম বুঝি সরযূ?"

মুখ হইতে সরযূ নাম শুনিয়া সবিস্ময়ে তিনি কহিলেন, "তুমি কি ক'রে তার নাম জান্‌লে ঠাকুরপো—তারা বুঝি আত্মীয় হয়?"

মৃদু হাসিয়া রমেশ কহিল, "এক সঙ্গে, এক গাড়ীতে যে আমরা এলাম বৌদিদি।"

"তা হোলে তাদের সঙ্গে গাড়ীর মধ্যে বুঝি খুব আলাপ সালাপ হয়েছে—সেইজন্য তার নাম জান্‌তে পেরেছ।"

"শুধু আলাপ হয় নি বৌদিদি—এমন কি তার মনের পরিচয় পর্য্যন্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তুমি আমাদের ভাব কি?" এই বলিয়া রমেশ বেশ একটু হাসিয়া উঠিল।

"এখানে না দিতে না দিতেই তার মনের পরিচয় পর্য্যন্ত নেওয়া হোয়ে গেছে; বেশ ভাল, এখন তোমাদের মধ্যে একজন না হয় অগ্রসর হোয়ে পরিচয়টা কোরে নাও না কেন ঠাকুরপো?"

"সে ও হয় ত হোয়ে যেতে পারে—সেজন্য আর ভাবনা কি—তুমি যাদের এমন বৌদিদি রয়েছ।"

"অত কথা আমি শুন্‌তে চাই না;—এখন গাড়ীর মধ্যে তার মনের পরিচয় কি রকম পেলে তাই বল্।" এই বলিয়া তিনি উত্তরের আশায় রমেশের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমেশ সবিস্তারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিল। সব কথা শুনিয়া তাহার বৌদিদি কহিলেন "তপেন ঠাকুরপো তা হোলে সরযূর প্রতি আকৃষ্ট হোয়ে পড়েছে কেমন?"

"শুধু আকৃষ্ট হয়েছে—একথা বল্‌লে ঠিক বলা হবে না, তার মনের গোপন পরিচয়টা পর্য্যন্ত সব জেনে নিয়েছে, সে যে কত বড় জহুরী তাত আমরা আগে জানতাম না—"

"ও বাবা, তোমাদের পেটে পেটে বুঝি এইসব খেলে। শুধু শুধু তপেন ঠাকুরপোর দোষ দিলে চল্‌বে কেন, তুমিও যে এর মধ্যে নেই, এ কথাই বা কি কোরে বিশ্বাস করি?"

"না বৌদিদি, সত্য বল্‌ছি আমি ওসবের ভিতর নেই।" কথাটা বলিয়া সে কিন্তু অসম্ভব রকমের গম্ভীর হইয়া উঠিল।

"যার জন্য এত বড় জহুরী, সে যে কিসে কম তাত বুঝতে পারছি নি।" এই বলিয়া ফিক্ করিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

কিছুকাল নীরব থাকিয়া রমেশ তাহার বৌদিদিকে বলিল, "সব ত বল্লুম এখন কি করা কর্ত্তব্য।"

"কার সঙ্গে—তোমার সঙ্গে না তপেন ঠাকুরপোর সঙ্গে?"

"আমার সঙ্গে সরযূর—অসম্ভব, সে যে আমাদের বোন বৌদিদি?" বলিয়া দুই হাত সরিয়া গেল।

"সরে গেলে কেন চল্‌বে ঠাকুরপো, একদিন না একদিন ও কাজ ত করতেই হবে, এখনি না হয় কোরে ফেল। একটু নীরব থাকিয়া তারপর তিনি বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরপো, সরযূকে দেখে তপেন ঠাকুরপো কি কিছু বোল্‌ছিল?"

রমেশ সাহঙ্কারে বলিতে লাগিল,—"সরযূরা যখন ষ্টেশন থেকে চলে গেল, তপেন একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। তা থেকেই আমি বুঝ্‌লাম তপেন সরযূকে ভালবেসে ফেলেছে।"

রমেশের কথাটা শুনে তাহার বৌদিদি হাসি চাপিয়া বলিলেন, "এতটা পর্য্যন্ত হোয়ে গিয়েছে তবে আর কি কিছু সত্যি বলছি ভাই ঠাকুরপো, তোমার কথাই আজ থেকে পুতুল।"

"কি রকম?"

"আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার সঙ্গে সরযুর বিবাহ দিই; তা যদি তপেন ঠাকুরপোর সঙ্গেই হয়; তা হলে ত খুবই ভাল হয়। কুলে, শীলে, বিদ্যায়, রূপে ও গুণে তপেন ঠাকুরপো সরযুর উপযুক্ত। আর উনি ত আমাদের আপনারই জন।" এই বলিয়া তিনি আরও কিছু বলিতে যাইবেন, এমন সময় রমেশ কথার মাঝখানে বলিয়া ফেলিলেন, "সেইজন্য বুঝি আপনি আমাদের এখানে আসতে লিখিয়াছিলেন, তাই না বৌদিদি?"

"কতকটা তাইই বই কি?"

হঠাৎ শিথর নাথ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আর কতক্ষণ ওকে জ্বালাতন করিবে—রাত যে অনেক হয়ে গিয়েছে।"

এই বলিয়া শেখর নাথ ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই বৌদিদি বলিলেন, "আরো দুই একদিন তপেনের হৃদয়ের ভাবটা দেখা দরকার; তারপর অনাথ বাবুর স্ত্রীকে না হয় বলা যাবে'খন।"

"সেই ভাল বৌদিদি—একটু মজা করা যাক্ তপেনকে নিয়ে।" এই বলিয়া রমেশ উঠিয়া পড়িল।

(৮)

দেখিতে দেখিতে আরও দুই, চারি দিন কাটিয়া গেল। বর্দ্ধমানের মধ্যে যে সকল দ্রষ্টব্য স্থান ছিল তাহাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

একদিন রমেশের বৌদিদি রমেশকে ধরিয়া বসিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমরা দেখলেই কি সকলের দেখা শেষ হোয়ে গেল বুঝি—আর আমরা বেচারীরা যে ঘরের মধ্যে আটক রয়েছি—আমাদের কি একদিনও ওসব দেখবার সাধ হয় না? তোমরা পুরুষ মানুষ হিংসুকে জাত—নিজেরা ভালমন্দ দেখবে—আমাদের বেলায় হচ্ছে—হ'বে।"

বৌদিদির কথার উত্তরে সে কহিল, "বেশ ত বৌদিদি, চলুন না একদিন সকলে মিলে মেলা দেখে আসি।"

তারপর অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, কাল বিকাল বেলায় পাড়ার সকলকে লইয়া মেলা দেখিতে যাওয়া হইবে।

পাড়ার মধ্যে এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়াতে, পাড়ার মেয়েরা সব দলে দলে রমেশের বৌদিদির নিকটে আসিয়া মেলা দেখিতে যাইবে বলিয়া ধরিয়া বসিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে এক এক করিয়া মেয়ের দল আসিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের কাথাবার্ত্তার বাড়ীটি মুখর হইয়া উঠিল। রমেশ তাহার বৌদিদিকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই পল্টন নিয়ে আমাকে যেতে হলে ত আমি গেছি?"

রমেশের বৌদিদি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি যদি একলা না পার ঠাকুরপো—তবে তোমার বন্ধুটিকে সহকারী কর না কেন?"

"না, বৌদিদি, তার ধ্যান ভঙ্গ করা ঠিক নয়।"

"কেন, তিনি কি এখনও সরযুর ধ্যানে মগ্ন নাকি?"

"বোধ হয় সেই রকম।" বলিয়া রমেশ তপেনকে খুঁজিতে আসিয়া দেখিল, তপেন বিছানার বিপুল দেহভার এলাইয়া দিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া শুইয়া আছে। তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া, রমেশ রহস্য করিয়া কহিল, "ওহে তপেন, একবার চোখ মেল।"

তদবস্থ থাকিয়াই সে জবাব দিল, "কি খবর তাই বল—তারপর দেখা যাবে'খন।"

"জামা, জুতা পরে নাও দেখি একবার—তার পর সব বলছি।" এই বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে বিছানা হইতে উঠাইয়া দিল।

"কোথা যেতে হ'বে আগে বল নচেৎ 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'।"

অগত্যা রমেশকে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইল। বৌদিদির নাম শুনিয়া তপেন আর কোন প্রকার দ্বিরুক্তি না করিয়া কাপড় ছাড়িতে গেল।

পাড়ার মেয়েরা বিচিত্র বসন ভূষণে যখন একে একে আসিতে লাগিল, তখন হঠাৎ তাহাদের মধ্যে সরযুর মতন কাহাকে দেখিতে পাইয়া, তপেনের দেহের শিরা-উপশিরাগুলির উপর দিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই কি সেই পূর্ব্বপরিচিতা সরযূ—না অন্য কেহ।

তখন তাহার মনে পড়িল সেই বৃদ্ধ দাদামশায়ের কথা। তিনি না বলিয়াছিলেন—তাঁহার এক ভাইপো এখানকার ডাক্তার। তবে তিনি নিশ্চই এই পাড়ার অতি নিকটেই থাকেন—তা' হ'বেও বা।

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলে, রমেশ তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিল, "চল না হে—সবাই যে প্রস্তুত।"

রমেশের কথায় তপেন একবার সেই বৃহৎ রমণী বাহিনীর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এ যে একটা প্রকাণ্ড রেজিমেণ্ট।"

রমেন মৃদু "হুঁ" বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

(৯)

তাহারা মেলায় পৌঁছিয়া দেখিল, ভিতরে ও বাহিরে অসংখ্য জনতা; ভিতরে ঢোকে কাহার সাধ্য। এতগুলিকে লইয়া একেবারে ভিতরে প্রবেশ করা অসম্ভব ভাবিয়া তপনের সহিত পরামর্শ করিয়া রমেশ স্থির করিল যে এক এক করিয়া প্রবেশ করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কে যে এই দুরূহ কাজে অগ্রসর হইবে তাহা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।

যখন রমেন ও তপেনের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল, সেই সময় রমেশের বৌদিদি আসিয়া কহিলেন, "এত দেরী কোরছ কেন ঠাকুরপো। ওদিকে ফিরতে যে রাত হোয়ে যাবে?"

বৌদিদির কথা শুনিয়া রমেন কহিল, "আমি বলি এই ভীড়ের মধ্যে এক এক কোরে ঢোকাই ঠিক, এক সঙ্গে যেতে বড়ই কষ্টকর হ'বে।"

রমেনের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া তাহার বৌদিদি কহিলেন, "এ কথা মন্দ নয়, ঠাকুরপো, তবে না হয় তাই হোক।" বলিয়া তিনি তপেনের দিকে তাকাইলেন।

বৌদিদির মতলব বুঝিতে পারিয়া তপেন কহিল, "যা নিয়ে আমি দের ঝগড়া, বৌদিদি, আপনি এসে সব তা ফাঁসিয়ে দিলেন।"

"কি রকম রমেন ঠাকুরপো—তোমাদের আবার কি মতলব ছিল?" বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

রমেন বৌদিদিকে সঙ্কেত করিয়া কহিল, "তপেন বেশ হৃষ্টপুষ্ট, তাই ওকে বোলছিলাম তুমিই পরস্পরের ভারটা নাও—ও কিন্তু বৌদিদি, নিতে নারাজী। এখন যদি তুমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু কোরতে পার।"

তপেন ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "তোমাকে ত কেউ plead' কোরতে বলেনি,—বৌদিদি যাকে বোলবেন সেই যাবে;—সে তুমিই হও আর আমিই হই না কেন।"

রমেন হাসিয়া কহিল, "দেখ্‌লে বৌদিদি, তপেনের কিন্তু সম্পূর্ণ ইচ্ছা—তবে—" বলিয়া সে মধ্যপথে থামিয়া গেল।

"তবে আবার কি—বৌদিদি is the best judge।" বলিয়া সে বিজয়গর্ব্বে বৌদিদির দিকে তাকাইয়া রহিল—ফলাফলের জন্য।

দলের মধ্য হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, "দিদি, তুমি যদি ওদের তর্কের বিচারই কোরবে, তবে আমরা দেখ্‌ব কি?"

এই কথা শুনিয়া রমেনের বৌদিদি তপেনকে

উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "তপেন ঠাকুরপো, তুমিই না হয় আজকের ভারটা নাও।"

"কেন বৌদিদি, রমেন বুঝি কেবল কাঁপর-দালালি কোর্‌বে!" বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

তাহার কথা শুনিবামাত্র রমেন কহিল, আজ ভাই তুমি ভারটা নাও—অন্যদিন আমি—এই তিন সত্যি কোর্‌ছি।"

তাহাদের মধ্যে আপোষে যখন সব নিষ্পত্তি হইয়া গেল, তখন তপেন এক একজনের হাত ধরিয়া সেই বিপুল জনস্রোতের মধ্য দিয়া অতি নিপুণ ভাবে চলিতে লাগিল।

যখন সেই ট্রেণে দৃষ্টা তরুণীর মত জনৈক তরুণীর সময় আসিল, তখন তপেন যেন কেমন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে মনে মনে রমেনের উপর বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই রমেন ও বৌদিদির এই কারসাজি—নইলে এরূপ করার তাৎপর্য্য কি?

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া, রমেনের বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "দেখ ঠাকুরপো, পরের মেয়েকে সাবধানে নিয়ে যেও—ওর সমস্ত ভার তোমার উপরেই রইল।" এই বলিয়া তপনের অলক্ষিতে অঞ্চলের শেষ প্রান্তে মুখ ঢাকিয়া লইয়া হাসির বেগ সুসংযত করিয়া লইলেন।

কথাটা শুনিয়া তরুণীর মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল।

বৌদিদির মুখ হইতে ঐ হুকুমের কথা বাহির হওয়াতে তপেনের সন্দেহ দূর হইয়া গেল। তাহার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই রূপসী তরুণীই তা'হলে সরযূ।"

সে একবার মনে করিল, লজ্জার মাথা খাইয়া তরুণীর আত্মপরিচয়টা লয়। পরক্ষণেই ভাবিল—ইহা অভদ্রোচিত ব্যবহার, যদি ইনি বৌদিদিকে বলিয়া দেন; তবে মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে সে পথ চলিতেছিল। তাহার সঙ্গে যে একজন আসিতেছে, সে খেয়াল তার আদৌ ছিল না। সহসা একবার জন-প্রবাহের তরঙ্গে তাহার সঙ্গী একবার কোথায় ভাসিয়া গেল; সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, সেই পশ্চাৎবর্ত্তিনী তরুণী নাই। তাহার সমস্ত চিন্তারাশি এক নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

সে পাগলের মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল—একদল লোক দাঁড়াইয়া কি যেন বসাবলি করিতেছে। একসঙ্গে এত লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহের উদয় হইল। সে তাড়াতাড়ি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল—সেই তরুণী ভয়ে বেতসলতার ন্যায় কাঁপিতেছে।

তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় পাইয়া তপেন একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্যগ্র-কণ্ঠে কহিল, "আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে, আমার মন বড়ই চঞ্চল হোয়ে ছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি আপনাকে শীঘ্রই মিলাইয়া দিলেন।"

অত্যন্ত ভীত ও কম্পিত-কণ্ঠে সেই তরুণী কহিল, "এই ভীড়ের মধ্যে আপনাকে না পেয়ে আমার বড়ই ভয় হোয়েছিল। কি ভাগ্যিস্—আপনাকে পেলুম।" এই বলিয়া সে মাথা নত করিয়া লইল।

"এখন আর লজ্জা কোর্‌লে চল্‌বে না, শীঘ্র আমার হাত ধরুন; নইলে আবার হারিয়ে যাবেন।" এই বলিয়া তপেন তাহার ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

তরুণীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তপেন নিজেই অগ্রসর হইয়া সেই বেপথুমানা তরুণীর মৃণাল-নিন্দিত বাহুলতাটী ধরিয়া কহিল, "চলুন—এইবার।"

তপেনের হাতে হাত লাগিবামাত্রই তরুণীর দেহের মধ্যে পুলক সঞ্চার হইল।

দু'জনেরই মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chintamudi Lane, and Published by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

শ্রীযুক্ত

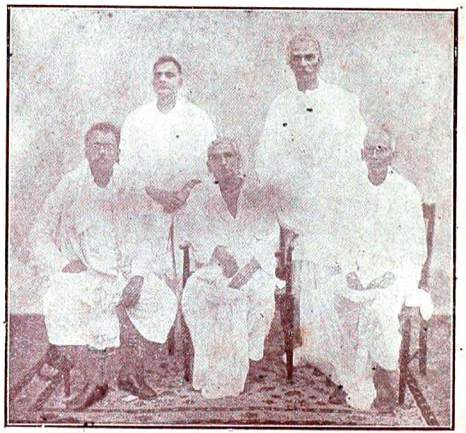

বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনের শাখা-সভাপতিগণ উপবিষ্ট—বাম হইতে দক্ষিণে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ (ইতিহাস) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ (দর্শন) শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (সাহিত্য)

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

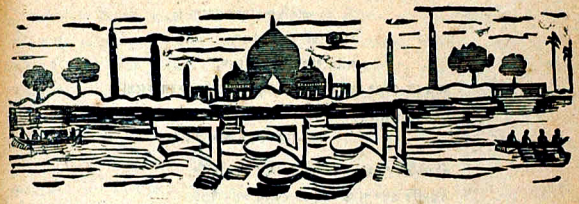

১৩শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৩০ { ৪র্থ সংখ্যা

স্বপন-পাখীর সুর

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

স্বপন-পাখী, স্বপন-পাখী, চাঁদের আলোয় নয়ন খোলো,
না-শোনা কোন্ সুরের শীষে তন্দ্রা-সায়র চল্‌কে তোলো,
আজ্‌কে তুমি ঘুমকে ভোলো।
নীলের কোলে ছায়াপথে
চালিয়েছি মোর মনোরথে,
আশপাশে তার ফুট্‌চে কত তারার কুসুম থোলো থোলো,
স্বপন-পুরের দরজা কোথায়, বোলো তুমি আমায় বোলো—
চাঁদের আলোয় নয়ন খোলো!

ধরার পথে পথিক হয়ে চরণ তো আর চল্‌চেনাকো,
চারদিকে হায় ছুট্‌চে আঁধি, আশার পিদিম জ্বল্‌চেনাকো—
মনের ওমোট্ গল্‌চেনাকো।
কেবল ধুলো কেবল ধোঁয়া,
সুখ নেই ভাই সিকি পোয়া!

মরুর তাপে তরু লতার শ্যামের ফসল ফলচেনাকো—
কোথায় যাব—বন্ধু রে আর ? কেউ তো খুলে বলচেনাকো,
আর যে চলে চলচেনাকো।

বক্ষে ছিল গানের ভাষা, চক্ষে ছিল ভোরের আলো,
ওষ্ঠে ছিল হাসির বাসা, প্রেম প্রীতিতে মন ভুলালো—
এসেছিনু বাস্‌তে ভালো।
বারংবারই তরুণ ফাগুন,
জ্বালিয়েছিল চিত্তে আগুন,
আজ্‌কে সে-সব অতীত্ কথা ;—আজ্‌কে দেখি কেবল কালো—
কেবল হা-হা, কেবল ফাঁকা, কেবল আমার সব ফুরালো।
—নিবে গেছে অরুণ আলো।

জীবন্ত-এক-'মমি'র মতন চুপ্‌টি ক'রে ব'সে আছি,
বল্পনারি রূপকথাতে আজ্‌কে কেবল আমি বাঁচি—
স্মৃতির মাঝে সুখকে যাচি!
মনে-মনেই বুন্‌চি স্বপন,
নতুন শশী, নতুন তপন—
ধরায় থেকেও নইকো ধরার, আকাশ আমার কাছাকাছি,
বুকের ওপর দুল্‌চে শুধু ঝরা-সুরের মাল্যগাছি—
তাকেই নিয়ে বেঁচে আছি।

ঝরা-সুরের শিথিল মালা কেউ নিলেনা হাতে ক'রে,
আমার হিয়ার রুদ্ধ খাদে সুরগুলি যে আছে ভ'রে—
নেই অতিথি ঘরের দোরে।
স্বপন-পাখী, স্বপন-পাখী!
তাই তো স্বামিত্যাগায় ডাকি,
আলোক-পুরের পুলক-সুরের মোহন লহর পড়ুক ঝ'রে,
সেই সুরেতে সুর মিলিয়ে গাঁথ্‌ব মালা রঙিন ভোরে—
টাট্‌কা সুরে নতুন ক'রে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার শাখা প্রশাখা

(শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এ, সি 'লণ্ডন')

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ভারতবর্ষে হইলেও এক্ষণে এই ধর্ম্মের প্রসার এস্থলে আর তত বিস্তৃত নয়—এই ধর্ম্ম ভারত হইতে একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীর সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল আমাদের দেশে এই ধর্ম্মলইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে চৈত্যবিহারেরও স্থাপনা দেখা যাইতেছে! এযাবৎ আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক সকল কেবল পালি ভাষায় লিখিত বলিয়া অনেকেরই ধারণা ছিল ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্মপুস্তক হইতে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেকটা জানিতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থাদি সংখ্যায় অনেক। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আপন ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত যে কত দেশ বিদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাহার বহুল নিদর্শন আছে এবং তাঁহাদের ঐচেষ্টার ফলস্বরূপ যাহারা নূতনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহারা সংখ্যায় কত ছিলেন তাহা নিশ্চিত জানিবার কোনরূপ উপায় না থাকিলেও তাঁহাদের উত্তর-পুরুষদিগের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের পুস্তকাদি প্রধানতঃ পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কিন্তু যখন ঐ ধর্ম্ম নানা-শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়, তখন প্রত্যেক শ্রেণীরই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতাবৎকাল পালিভাষা যে সম্মান লইতেছিল, এক্ষণে তাহা আর সম্ভবপর নহে ; কারণ, অল্পকাল পূর্ব্বে তুর্ফানস্থানে যে সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম্ম-পুস্তকাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি মৌলিক। লঙ্কা, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধেরা পালিভাষাকে পবিত্র ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ঐ সকল দেশবাসীদের ধর্ম্মপুস্তকাদি প্রায়ই ঐ ভাষায় লিখিত ; কিন্তু তিব্বত, চীন ও জাপানের বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে আস্থাবান্। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল বৌদ্ধধর্ম্ম-পুস্তকাদি পৃথিবী হইতে একরূপ লোপ পাইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না ; কিন্তু সুখের বিষয়, চীন ও তিব্বত ভাষায় অনূদিত ঐ সকল গ্রন্থাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এই সকল ধর্ম্মপুস্তক হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত —'হীনযান' ও 'মহাযান'। হীনযানবাদীদের মতে বুদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারা অল্পসংখ্যক মনুষ্য 'অর্হৎ' হইতে পারেন এবং কালে সম্পূর্ণরূপে 'নির্ব্বাণত্ব' লাভ করিতে পারেন। কিন্তু মহাযানবাদীরা বলিয়া থাকেন, জগতের সকল মানবই বুদ্ধজ্ঞানের দ্বারা দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই জন্য প্রথম শ্রেণীকে 'হীনযান' বা ক্ষুদ্রযান বলা হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে 'মহাযান' বা বিশালযান বলা হয়। মহাযানবাদীরা বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন জ্ঞানের দ্বারা চেষ্টা করিলে বোধিসত্ত্ব হইয়া পুনর্জ্জন্ম লইতে পারেন ; এবং যে কোনও ব্যক্তি আপন আপন জ্ঞান, দয়া দাক্ষিণ্যাদির দ্বারা এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের প্রতি ভক্তির দ্বারা নির্ব্বাণ পাইতে পারেন।

পালি ধর্ম্মপুস্তকাদিতে বুদ্ধদেবকে একজন

মহাপুরুষ বলিয়াই দেখান হইয়াছে। তিনি আপন জ্ঞানের দ্বারা অনেকানেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং 'নির্ব্বাণ'ও প্রাপ্ত হ'য়াছিলেন। কিন্তু হীনযানবাদীদিগের মধ্যে আর এক শ্রেণী আছেন, যাঁহারা 'লোকোত্তরবাদী' বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ইঁহারা বলেন যে, বুদ্ধদেব মহাপুরুষ ছিলেন না, তিনি একজন অবতার বা লোকোত্তর ছিলেন। কেবলমাত্র মনুষ্যদিগকে নির্ব্বাণ দিবার জন্য কয়েক বৎসর মাত্র এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। মহাযানবাদীরা আবার বলেন যে, বুদ্ধদেব বা বোধিসত্ত্বেরা সকলেই দেবতা, তাঁহাদের আপন আপন নির্ব্বাণ কেবল মাত্র একটা লীলা মাত্র। হীনযানবাদীরা বলেন যে, শাক্য মুনি জন্মিবার পূর্ব্বেও যুগে যুগে সহস্র সহস্র বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাযানবাদীরা বলেন যে, সহস্র সহস্র কেন, কোটি কোটি বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়া তিরোহিত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত মহাযানবাদীরা কোটি কোটি বোধিসত্ত্বকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন। এই বোধিসত্ত্বেরা কেবল মাত্র মানবদুঃখ মোচনার্থে আপন আপন নির্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতেছেন। ইঁহাদিগের ভিতর কিন্তু হিন্দুদিগের দেব-দেবী, যথা,—শিব, তারা প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে, এবং উঁহাদিগেরও পূজাদি হয়। এই যে মিশ্রিত ভাব, ইহা কেবল ঐ মহাযানবাদীরাই বিশ্বাস করে। অবশ্য হীনযানবাদীদিগের মধ্যেও অল্পবিস্তর হিন্দুপ্রভাব যে ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু মহাযানবাদীদিগের মধ্যেই উহার প্রভাব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।

অতি প্রাচীন কালে বৌদ্ধেরা 'অহং' বা আপন অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত না। জ্ঞানের দ্বারা এই ভ্রান্ত 'অহং' জ্ঞানকে মন হইতে বিতাড়িত করিতে না পারিলে নির্ব্বাণলাভের অধিকারী হওয়া যায় না বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা ছিল। মহাযানবাদীদের মতে 'অহং' বা আমি বলিয়া কিছুই নাই—সর্ব্বং শূন্যম্। ইঁহাদিগকেই 'শূন্যবাদী' বলা হইত। কিন্তু ইঁহারা আবার বিজ্ঞানবাদে বিশ্বাস করিত। হীনযানবাদীদিগের মধ্যে আর এক শ্রেণী 'মূল সর্ব্বাস্তিবাদী' নামে অভিহিত। ইঁহারা সংখ্যায় অধিক ছিলেন এবং ইঁহাদিগের লিখিত সংস্কৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদি সকল শ্রেণীর গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লিখিত হয়। ইঁহারা প্রত্যক্ষবাদী বা Pcsitivist ছিলেন এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দ্রব্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে 'সর্ব্বাস্তিবাদী', 'ধর্ম্মগুপ্ত', 'মহীশাসক' এবং 'কাশ্যপীয়' নামে চারিটি শাখা ছিল। লোকোত্তরবাদীদিগের মধ্যে প্রাচীন শাখা 'মহাসঙ্ঘিক' নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির দিনে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠিত হয়। যোগাচার ও তান্ত্রিকসম্প্রদায় ইঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল।

হীনযান, মহাযান এবং সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি প্রায়ই শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; কিন্তু মহাসঙ্ঘিকদিগের গ্রন্থাদির ভাষা প্রায় অশুদ্ধ সংস্কৃত। স্থবিরসম্প্রদায় বা থেরবাদীদিগের গ্রন্থাদির ভাষা পৈশাচী প্রাকৃত, এবং মহা-সম্মতীয় সম্প্রদায়েরা অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহার করিত। এই পৈশাচীপ্রাকৃত ভাষাটা কি, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক। Grierson সাহেবের মতে পৈশাচী প্রাকৃত ভাষাটা বোধ হয়, তক্ষশীলা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের কথিত ভাষা ছিল; ইহার সহিত পালির সাদৃশ্য অধিক। Bhandarkar মহোদয়ের মতে পালি ভাষাটা হইতেছে মগধী ভাষার লিখিত ভাষা মাত্র। তুর্কীস্থান হইতে যে সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশগুলিই পালি ধর্ম্মগ্রন্থাদিরই অনুরূপ। অনেক সময় একই গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন নামে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকগুলি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, যাহা পালি গ্রন্থাদি

হইতে কোনও মতেই আধুনিক নহে। হয় ত ইহা এমনও হইতে পারে যে, সংস্কৃত এবং পালি বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি অপর কোনও ভাষায় লিখিত আদি গ্রন্থ হইতে ভাষান্তরিত মাত্র।

কাশ্মীর এবং তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ হইতেই 'মূল সর্ব্বাস্তিবাদ' মত প্রচার হইতে থাকে(Sylvain Levi, Journ, As. 1914)। 'লোকোত্তরবাদ' মত হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যে তৎকালে যে ১৬টি দেশ ছিল—যাহাকে 'মধ্যদেশ' বলা হইত, সেই সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। ইহা সংস্কৃত "হীনযান" গ্রন্থ হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। উপরিউক্ত স্থবিরবাদী বা থেরবাদীদিগেরই ধর্ম্মগ্রন্থগুলি আধুনিক পালি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ সকল। স্থবিরেরা স্বয়ং বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারা ঐ 'ত্রিপিটকের' মধ্যেই আপনাদের সকল ধর্ম্মনীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অল্প পরিসরের ভিতর ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পালি গ্রন্থগুলি কিছু নীরস হইয়া পড়িয়াছে। এগুলিতে সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি আছে। সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি কিন্তু তদ্রূপ নহে। চীন পণ্ডিত ইৎসিং বলেন যে, মূল সর্ব্বাস্তিবাদীর সহিত স্থবিরবাদ, মহাসঙ্ঘিক ও সম্মতীয় শাখার সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক, কিন্তু সকল শ্রেণীরই ধর্ম্মপুস্তক বিভিন্ন, এবং বিভিন্ন ভাষায় লিখিত। পালি ধর্ম্মপুস্তকগুলি বহুকালাবধি লঙ্কা-দ্বীপের মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ, ঐ স্থানে মহীশাসকদল উহার মহা শত্রু ছিল। তাহারা পালি ভাষার গ্রন্থাদির প্রচার অধিক পরিমাণে করিতে দেয় নাই এবং অনেক বিঘ্ন দান করিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপুস্তকগুলি প্রায় বিনাবিঘ্নে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম পথ দিয়া তুর্কীস্থান, চীন, তিব্বত ও জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয় এবং হিন্দুদিগের দ্বারাও শ্রাম, Indo China, এবং ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে প্রচারিত হয়।

জগতের সকল ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের পার্থক্য এইখানে যে, বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদের ভগবানে বিশ্বাস করিতে বারণ করিতেন। তিনি বলিতেন, ঈশ্বরান্বেষণে বৃথা চেষ্টা, এরূপ চেষ্টায় আত্মহত্যা কিছুমাত্র নাই। মানব আত্মার কর্ম্মফল হইতেই মুক্তি আবশ্যক এবং তাহা প্রাপ্তি ব্যতীত অপর কোনও প্রকার ক্রিয়ারই প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই যে জীবদেহের বন্ধনরূপ ক্লেশ হইতে মুক্তি কিরূপে সম্ভবপর; তাঁহার মতে পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তি প্রাপ্তিই প্রকৃত মুক্তি এবং ইহা মানুষের সুসাধ্য। দর্শনশাস্ত্র অনুসারে দেখিতে গেলে, তাঁহার মতে মানব আত্মার ঐশ্বরিকতা কিছুই নাই—কারণ, 'অহং' বলিয়া কিছু নাই। কোনও বস্তুতে যেমন আগুন লাগিলে সেই অগ্নিশিখা নাচিতে নাচিতে অপরাপর স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, তাঁহার মতে এই জগৎও তদ্রূপ বাসনা বা রিপুরূপ বহ্নিতে প্রজ্বলিত। সেইজন্য কর্ম্মফলরূপ অগ্নিশিখা একরূপ মনুষ্যের আত্মাকে ত্যাগ করিয়া অপররূপ মনুষ্যের আত্মা গ্রহণ করিয়া পুনর্জ্জন্মরূপে তাহাকে পৃথিবীতে আবির্ভূত করে। অগ্নিশিখার ইন্ধন যেমন তাহার অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক, তেমনি অহমিকারও ইন্ধন আবশ্যক। ইন্ধন ব্যতীত যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেইরূপ মানববৃত্তি বা জ্ঞানের দ্বারা যখন কোনও ইন্ধনই বাসনারূপ বা রিপুরূপ অগ্নিশিখাকে জোগাইবে না, তখনই তাহারা মৃত্যুর এবং পুনর্জ্জন্মের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। ইহাই মানব আত্মারূপ বা প্রাণরূপ অগ্নিশিখার "নির্ব্বাণ"।

বুদ্ধদেবই সর্ব্বপ্রথমে সকল ধর্ম্মের ভিত্তি ভগবানে বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন,—কিন্তু দুর্ব্বলহৃদয় মানব তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিল না, তাই আজ তাঁহারই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৌদ্ধেরা তাঁহাকেই স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞানে পূজা করিতেছে। তিনি চাহিয়া-

ছিলেন যে, মানব জাতি চিরপ্রচলিত ভগবৎপ্রার্থনা ও দেব দেবীদিগের স্তোত্রাদি পাঠ হইতে বিরত হয়; কিন্তু আজ তাঁহারই গরিমাময় কত শত স্তোত্রাদি বিরচিত হইয়া তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। ভগবানের আসনে তাঁহাকে বসাইয়া শত সহস্র নরনারী পূজার অর্ঘ্য দিতে ছ।

এই জন্য হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নাস্তিক-ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন, অথচ ঐ বুদ্ধদেবই আবার হিন্দুদিগের দশ অবতারের অন্যতম অবতার। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থাদিতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও তাহাদি সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র এক পুরাণে তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে। বাল্মিকী তাঁহার রামায়ণে বুদ্ধদেবকে চোর আখ্যা দিয়াছেন। হর্ষচরিতেও বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধদের উৎপরোনাস্তি কুৎসা আছে। প্রাচীন কাশ্মীর-কবি ক্ষেমেন্দ্রই বুদ্ধদেবকে প্রথম অবতার বলিয়াছেন এবং আমাদের বাঙ্গলার কবি জয়দেবও তাঁহার পানানুসরণ করিয়াছেন, অথচ এত বড় অবতারের ধর্ম্মপুস্তকাদি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের বিশাল ধর্ম্মসাহিত্যে কেন যে উল্লেখ নাই, তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাচীন হিন্দুদিগের অনুদারতাই কি ইহার একমাত্র কারণ?*

* আমাদের বিশ্বাস, প্রাচীনকালে ঈশ্বরবিশ্বাসী হিন্দুরা নাস্তিক বৌদ্ধদিগকে ঘৃণাভরে দেখিতেন না; কিন্তু চরিত্র ও নৈতিক বলে বলীয়ান বুদ্ধদেব জ্ঞানের বর্ত্তিকা লইয়া বিজ্ঞান রাজ্যের সন্ধান দিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরকালে হিন্দু-ভারত তাঁহার নিকট সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়াছিল। হিন্দুগণের উদারতাই তাঁহাকে দশাবতারের মধ্যেও অন্যতম অবতার করিয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে এ ঘটনা হাজার বছর পূর্ব্বের নয়।

রুমাল

(শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ)

সেবার আকাশ, মেঘ লেশ হীন ধূ ধূ করে সব মাঠ,
শুকলা ধরণী, মরুসম হ'ল, ধরিয়ে বালুর ঠাট।
গরিব নিতাই, মুনিবের জমি চষিছে যত্ন করে'
দূর নদী হ'তে, নিয়ে আসে জল দিবারাত ভার ভরে'।
দেখিতে দেখিতে তার চষা জমি, শস্যে উঠিল ভরি।
মুনিব সেবার, পেল বহু টাকা, ধানের ব্যবসা করি।
মনে বড় খুসী, নিতাইরে তুমি, দিলেন রুমালখানি
জনম-দিনের, সোহাগ-নিশানা, জনক দিয়েছে আনি,
মুনিবের কাছে, পেয়ে উপহার, নিতাই ফিরিল ঘরে,
খোকাটি তাহার, পেয়ে সে রুমাল, মুখে হাসি নাহি ধরে;
কভু বুকে রাখে, কভু গায়ে দেয়, কভু শিরে-তাজ-পরা
ছিন্ন মাদুরে, নিদ্রিত চোখে, রুমাল-স্বপ্নভরা।
ফেতে যায় পিতা, রুমালে জড়ায়ে খোকাটিই লয়ে সাথে।

দুপুরে রুমাল, জলে, ভিজাইয়া, দেয় বাঁধি তার মাথে,
শীতের কাপড়, না পায়িল দিতে, নিতাই খোকারে তার,
রুমালে জড়ায়, কাটাইবে শীত, নাহি যে উপায় আর
নূতন অরেয়, ভীষণ নৃত্য, উঠিয়াছে ঘরে ঘরে।
নিতায়ের গৃহে পশিয়া সে জ্বর, খোকারে আগলি ধরে।
জ্বরে অচেতন, জননী মাঝে, কোথা সে রুমাল খুঁজে।
হাতে তুলে দিলে, ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তবু তাহা নাহি বুঝে।
থামিল খোকার, হাসি ও কান্না, আব্দার ছুটাছুটি,
দীনের ঘরের মাণিক রতন, ডাকাতে লইল লুটি।
মৃত তনুখানি ধৌত করিয়ে, নিতার অশ্রু ঝরে
রুমালে জড়ায়ে, পুত্রের শব, রাখিল সমাধি-পরে
রুদ্ধ কণ্ঠে, কহিল নিতাই, "রাতদিন ধুক্ ধুক্
আশঙ্কা শত, থেমে গেল মোর, শান্ত হইল বুক,
শুভ জনমের, প্রিয় উপহার, মুনিব দিলেন মোরে
মরণের মহামঙ্গল দিনে আজ তাহা দিনু তোরে।
ওরে নির্ম্মল, সোনার পুতলি, ওরে জীবনের আলো
দিবসের রোদ, রাতের জ্যোছনা, সকলি করিলি কালো।
নন্দনে কোন্ নব পারিজাত, শুকিয়ে পড়েছে স্বর্গে'
তাই কি দেবতা চয়ন করিল, আপন পূজার তরে!
নাশিতে দৈন্য, করিতে ধন্য, যে কোলে লইল টানি
সে যে মহাধনী দেবাস্ তাঁহারে, দীনের রুমালখানি।"

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল,)

এক্ষণে অপরাপর চরিত্রের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দু একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল বলিয়া মনে করি। রূপচাঁদ মিত্রের চরিত্রহীন আহ্লাদে পুত্র দুলালচাঁদের বেল্লিকপানা দেখিয়া বাস্তবিকই ঘৃণা হয়। নাটকের শেষ অংশ ভিন্ন যেখানেই দুলালচাঁদকে দেখিতে পাই, সেই খানেই গিরিশ-চন্দ্রের অক্ষমতার পরিচয় পাই। এই চরিত্র প্রহসনের মত গম্ভীর নাটকের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। হাস্যরসের সৃষ্টি করিতেও গিরিশচন্দ্র কৃত-কার্য্য হন নাই। এই অবান্তর চরিত্র সৃষ্টিতে নাট-

ক্ষের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় নাই। কায়স্থের ঘরের ছেলে পিতার সম্মুখে এরূপ জঘন্য কথাবার্ত্তা কহিতে যে পারে, সে ধারণাও আমরা করিতে পারি না। তারপর জোবী আর একটী অবান্তর চরিত্র। আলোচ্য নাটকের চরিত্র স্ফুরণে জোবীর চরিত্র কিছুমাত্র সহায়তা করে না। গানগুলি জোবীর মুখে দিয়া গিরিশচন্দ্র গীত-শ্রবণ-প্রবণ বাঙ্গালীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবার সহায়তা করিয়াছেন মাত্র। নাটক-খানিতে আদৌ গান না থাকিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না। অবশ্য নাটকের কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না সত্য, রঙ্গমঞ্চের অধিকারীর বোধ হয় ক্ষতি হইত। শুনিয়াছি গ্রন্থকার না কি বলিয়াদেন, তাহা হইলে শ্রোতার দলের অভাব হইত। জোবীর সর্ব্বত্র গতাগতি ছিল। যখন যেখানে আবশ্যক সেই খানেই জোবীকে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই এক স্থলে কলাকুশলী গিরিশচন্দ্র জোবীকে স্বাভাবিকভাবে লইয়া আসিয়াছেন সত্য, অপর স্থলে অস্বাভাবিক উপায়ে তাহাকে উপস্থিত করাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে করুণাময় ও সরস্বতীতে যখন কিশোরীর ফুলশয্যার তত্ত্ব লইয়া কথোপকথন করিতেছেন তখন, সেখানে জোবী প্রবেশ করিয়া ভবিষ্যতের একটা ছবি তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া গেল,—'মেয়ের যে দিয়েছিস্? কই কাঁদ্‌ছিস নি,—কাঁদ্‌ছিস নি? কাঁদ্‌বি-কাঁদ্‌বি?' তারপর প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মোহিতমোহনের অন্তঃপুরে বধূ কিরণের সহিত তাহাকে কথোপকথন করিতে শুনি—মার নিকট পলায়ন করিতে উপদেশ দিতে ও শুনি—শুধু তাহাই নয়—তাহাকে গান গায়িতে শুনি—

'খা লো কনে আফিং কিনে,
বাগিয়ে না হয় রাখ দড়ীর
কলিতে অমর ক'নের শাশুড়ী। ইত্যাদি'

বিবাহিত বধূর নিকট এরূপভাবে বিরলে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবপরই নয়, তাহার উপর গান গাওয়া। কিরণের শাশুড়ী আসিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেও সে আর একটী গান না গাহিয়া চলিয়া গেল না—গানটী এই :—

'মাথা খুটে পা টিপে তার মন পাবি নাকি,
ঝি, রাঁধুনি রাখ্‌বে না কি শোন গতরখাগী,
জন্মেছিস তুই সবার বালাই,
সরে পড় হতচ্ছাড়ি॥'

জোবীর চরিত্র সুধু অস্বাভাবিক হয় নাই, সে যে পাগল একথাটা কবিবর বলিয়া না দিলে সহজে ধরিতে পারা যায় না। বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদেরা এ চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া একটু যে গোল-যোগে পড়িবেন, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি তাহা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীদের লক্ষণার সহিত মিলাইয়া জোবীকে পাগলী বলিবার উপায় নাই। দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে রাস্তায় ইন্‌স্পেক্টার ও জোবির কথোপকথনটা ভাল হয় নাই। জোবী ইন্‌স্পেক্টার বাবুর বাড়ীতে যখন যায়, তখন কিরণের স্বামী মোহিতকে ছাড়িয়া দিবার কথাটা কলিকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় না বলাইয়া অন্যত্র বলাইলেই ভাল হইত। দৃষ্টান্ত আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না। পরঃপ্রকাতরা জোবীর চরিত্র অত্যন্ত মধুর। প্রকৃত হিন্দু রমণীর ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত স্বামী রমানাথকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য সে যাহা করিয়াছিল বাস্তবিকই তাহা প্রশংসা-যোগ্য। রমানাথ যখন তাহাকে চুরী করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিল, তখন ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়া-ছিল। তৎপরে যখন বান্ধব-সমিতির সভ্যেরা জোবীর ঘর ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন জোবি সেখানে আসিয়া বলে 'ভেঙ্গো না,—আমার ঘর। আমার সর্ব্বস্ব ওখানে আছে।' তৎপরে যখন সমিতির সভ্যেরা তাহার ঘর হইতে রমানাথকে ধরিয়া বাহিরে আনিল, তখন জোবি কিশোরের ভিতর যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত

করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কাতরভাবে জোবি অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল,—'বাবু বাবু ওকে মেরো না—ওকে মেরো না! আগে আমায় বধ ক'রো, তারপর ওকে মেরো!'

কিশোর। জোবি, এ কি? তুমি চোর লুকিয়ে রাখ? চোরের সঙ্গে কুৎসিত আলাপ কর?

জোবি। চোর কে? কুৎসিত আলাপ কি? চোর নয় আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব! চোর হোক, ডাকাত হোক, পিশাচ হোক, রাক্ষস হোক,—নারীর জীবন সর্ব্বস্ব, নারীর স্বামবন্ধু, নারীর প্রাণেশ্বর, নারীর ইষ্টদেবতা! বাবু, আমি কুচরিত্রা নই!

কিশোর। এ তোমার কে?

জোবি। আমার স্বামী! যার জন্য আমি উন্মাদিনী, যার জন্য আমি পাগলিনী, যার জন্য আমি ভিখারিণী, যার চরণ সেবা করতে আমি ব্যাকুলা, যার মূর্ত্তি আমার হৃদয় আসনে, যাঁর মূর্ত্তি দিবানিশি ধ্যান করি, যার দর্শনআশায় পথেপথে ঘুরি, যার দেখা পেলে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী—আমার সেই পরমনিধি! মেরো না—পীড়ন করো না, সতীর প্রাণ বধ করো না!

কিশোর। তুমি কে?

জোবি। আমার বাপ এখনও জীবিত। আমাদের দুইজনকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো তিনি এর পায়ে অর্পণ করেছেন কি না? আমার শাশুড়ী ত্যাগ করেছেন। বাপ ত্যাগ করেছেন। আমি অন্নের জন্যে দোরে দোরে কাক, বক কুক্কুরের ন্যায় ফিরি, তাতে আমি তিলমাত্র দুঃখিত নই। আমার স্বামীকে দেখতে পাই, এই আনন্দেই আমি দিবা-নিশি উন্মত্ত! এই আনন্দে আমি স্বর্গ সুখ ভোগ করি! আমি ভিক্ষা করে যেথায় যা কিছু পাই, এই পাদপদ্মে অর্পণ করি। উনি আমায় চেনেন না, উনি আমায় স্পর্শ করেন না, উনি আমায় ঘৃণা করেন, কিন্তু তাতে সতীর কি এলো গেলো? সতী তার হৃদয়েশ্বরকে পূজা ক'রতে পায়, এই তার যথেষ্ট! সতীর এ হ'তে আর কামনা কি? তুমি দয়াময়, কীটপতঙ্গকেও দয়া করো, আমার প্রতি নির্দ্দয় হয়ো না; আমায় পতিভিক্ষা দাও, প্রাণ ভিক্ষা দাও।

কিশোর। রমানাথ—রমানাথ! তোমার কি বল্‌বো, তুমি অভাগা,—তুমি এ রত্ন পায়ে ঠেলে রেখেছ? তুমি এস, তোমার ভয় নাই। মা ভয় করো না আমি তোমার মুখ চেয়ে তোমার স্বামীকে মার্জ্জনা কর্‌লুম। আমি ওরে স্থিত কর্‌বার চেষ্টা পাবো। হায় হায়, অভাগা দেশের এই পবিত্র পতিপত্নী মিলন! ঘরে ঘরে এই দুর্লভ নারী রত্নের পীড়ন! এসো রমানাথ! মা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি তুমি দেবী।

বাস্তবিকই সতী জোবির চিত্র মনোরম, কিন্তু এই চিত্র আলোচ্য নাটকে গিরিশচন্দ্র কিরণময়ীর চিত্রেও ঠিকই এক ভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেও আপনাকে বঞ্চিত করিয়া দুর্ব্বৃত্ত স্বামী মোহিত-মোহনের অন্নবলের ব্যবস্থা করিয়াছে। সেও আদর্শ রমণীর ন্যায় অক্লেশে স্বামীর শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম সতীত্বের চিত্রের দিক হইতেও দেখিতে গেলে বলিতে হয় এ চিত্রের পুনরাবৃত্তির কোনই প্রয়োজন ছিল না।

আলোচ্য নাটকে যেখানে আমরা জোবির সাক্ষাৎ পাই, সেখানেই তাহাকে দেখিতে পাই সে একটা উদ্দেশ্য লইয়া উপস্থিত; শিক্ষা দিবার জন্য সে ব্যগ্র। নরনারীর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করাই তাহার কার্য্য, দুলালচাঁদের চরিত্র পরিবর্ত্তনে সহায়তা করি-বার পর তাহার মুখে আমরা শুনি :—'আর কি কাজ আছে? না! ঘোরা ফুরিয়েছে, ভিক্ষা ফুরিয়েছে, চোখের জলও শুকিয়েছে! আর জোবি কারও জন্যে ফিরবে না।' তারপর সে নিম্নলিখিত গীত গায়িল :—

'কোথা হে মধুসূদন,
ফুরালো আর কাজ কি আছে।
একলা নারী রইতে নারি,
থাকবো গিয়ে তোমার কাছে॥
থাকেনা দিন, দিন গিয়াছে,
মনে গাঁথা সব রয়েছে,
চরম দিন আজ উদয় হয়েছে—
আলো করে আগে চল, পাগলিনী যাবে পাছে।'

জোবির কাজ ফুরাইল সত্য, কিন্তু কিশোরের রমানাথকে স্থিতি করিবার কথাটা ত রহিল না। আর একস্থলে গিরিশচন্দ্র (তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) বেলঘোরের পথে তাড়ি খাইয়া নীচ জাতিরা স্ত্রীগণের প্রবেশ করাইয়া 'তাড়ি পিয়ে হয়া বদন ভারি' গানটী যে গাওয়াইয়াছেন তাহা আদৌ সঙ্গত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। "আঁচোরা কেইসে সাম্‌হারি" জানাইবার জন্য এই গানের অবতারণা ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্যই ত দেখিতে পাই না। ইহাতেও নাটকের গাম্ভীর্য্যের বিশেষ হানি হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কিশোরের চরিত্র পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, তাহার ন্যায় পরদুঃখকাতর প্রাণ, উচ্চশিক্ষিত যুবক দিগের আদর্শ হওয়া উচিত। ইহারই উক্ত আবর্শে ভগ্নীপতি রামলাল আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার কথাতেই চলি,—'আমি মনে কর্‌তুম, মার কথা শুনে, তোমাদের সঙ্গে অ ভাব ক'রে, বুঝি মাতৃভক্তি দেখাচ্ছি। আমি বুঝতে পারিনি যে, অধর্ম্ম কচ্ছি। তুমি মাপ কর্‌লে?' ভাবিনী ও রামলালের মিলন-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সেবা-সমিতির সে একজন প্রধান পাণ্ডা হইয়া উঠিল। তাহার আদর্শ চরিত্র দেখিয়া বেশ্যাসক্ত অর্থগৃধ্নু মোহিতমোহন আবার চরিত্রবান হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল! তাহার মাতার দূর সম্পর্কীয় ভাই দুর্দ্ধর্ষ রমানাথ, তাহাকে আপনার পত্নীকে বাহির করিয়া 'নূতন মেয়ে মানুষ' সাজাইয়া ভুলাল-চাঁদের বাগান বাটীতে লইয়া বিলক্ষণ অর্থ প্রাপ্তির মোহন ছবি তাহার সম্মুখে ধরিয়াছিল। মতলবটা উভয়ের কথোপকথন হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় :—

রমা। তুমি বার ক'রে নিয়ে এসো, আমি বাগানে নিয়ে যাবো। তুমি পুলিশে জানাবে যে জোর ক'রে তোমার মাগ নিয়ে গেছে, ব্যাটা টাকা ছাড়তে পথ পাবে না। তোমার শ্বশুর ব্যাটার গালে চুণকালী পড়বে, বউ বেরিয়েছে শুনে তোমাদের একঘরে কর্‌বে, তোমার ছোট ভায়েরও সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে।

মোহিত। রেমো মামা—রেমো মামা, বেশ মতলব বার করেছ। দশ হাজার টাকার ঘাড় ভাঙ্গতে হ'বে,।

রমা। দশ হাজার! পঞ্চাশ হাজার নিয়ে তবে ছাড়্‌বো, কিন্তু বাবা, তুমি শেষে না পেছোও।

মোহিতের কিন্তু সন্দেহ হইতেছিল, সে বেটী তার সঙ্গে আস্‌বে কি? তার চাল নাই চুলো নাই, যে মোসাহেবী করে তার সঙ্গে সে আস্‌বে কেন। তাই সে কথাটা জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে রমানাথ বলিল,—'তুমি সে জন্য ভেবো না, তুমি যমের বাড়ী নিয়ে যেতে চাও, যমের বাড়ী যাবে।'

মোহিত। তুমি কি করে জান্‌লে?

রমা। আচ্ছা, তোমার মেজো শালীর বের দিন বেটী মুচ্ছো হ'য়ে পড়ে না? বেটী এক বছর ভোগে, জোবি পাগ্‌লী ব'লে এক বেটী আছে, ব্যামোর সময় তার কাছে যেতো। আমি তার ঠেঙ্গে শুনেছি, সে তোমার এক বার দেখ্‌বার জন্য মরে।

মোহিত। সত্যি নাকি, সত্যি?

তারপর কি ভাবে কার্য্য হইবে তাহাও স্থির হইল। রমানাথ বলিল—'রাত্রে দুজনে বেরিয়ে পড়্‌বো। আমি ভুলো ব্যাটাকে ঠিক করে, পাল্কী নিয়ে একটু তফাতে থাক্‌বো। আমি পাল্কীতে

তাকে নিয়ে বাগানে উঠ্‌বো, আর তুমি এদিকে থানায় খবর দেবে; বস্, দাঁও মেরে দেব।' মতলব আটিয়া—রমানাথ চলিয়া গেলে দুষ্টবুদ্ধি মোহিত বলিল,—'রেমো ব্যাটাকে জব্দ কর্‌বো, পুলিশেও ব্যাটাকে ধরিয়ে দেব। শ্বশুর ব্যাটার মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্‌বো, 'কেমন বাবা, মেয়ে ঘরে আট্‌কে রাখো! 'টাকাটা একবার হাতে লাগ্‌লে হয়। পরামর্শ মত মোহিতমোহন পত্নী কিরণময়ীকে গোপনে রাত্রে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। জোবির হাতে পত্র দিয়া পাঠাইল। জোবি রাত্রে দেখা করিতে রাজি হইল। দিনের বেলায় দেখা করিতে পরামর্শ দিল। কিরণ বুঝাইল অপমানিত স্বামী দিনের বেলায় কি করিয়া দেখা করিতে পারেন। জোবি তখন তাহার সঙ্গে থাকিতে চাহিল, তাহাতেও কিরণ রাজী হইল না, কারণ পত্রে লিখিত ছিল 'সঙ্গে যেন কেহ না থাকে।' তাই জোবির উত্তরে কিরণ বলিল,—'সে কি হয়? তিনি মানা করেছেন। তাঁর মানা না শুন্‌লে তিনি রাগ কর্‌বেন, অভিমান ক'রে চ'লে যাবেন। আমার প্রাণ যে কি ক'রে তা তুমি জান না। মনে হচ্ছে, সূর্য্য কেন অস্ত যাচ্ছে না, কেন রাত্রি হচ্ছে না? কতক্ষণে তাঁর দেখা পাবো। জোবি, তুমি আমায় দেখা কর্‌তে মানা কচ্ছ। তুমি ভিখারিণী হ'য়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে ঘুরে বেড়াও, ভিক্ষা করে এনে স্বামীকে দাও, স্বামীর সঙ্গে কথা ক'য়ে স্বর্গ হাতে পাও; তুমি তোমার, মন দিয়ে আমার মন বুঝ্‌তে না? মানা ক'রো না আমি ত মানা শুন্‌বো না। তোমার মত যদি পথে পথে বেড়াতে হয়, যদি ভিক্ষা ক'রে স্বামীর সেবা কর্‌তে হয়, যদি স্বামী ফিরে চান, তা হ'লে আমি রাজরাণী। তুমি আমার জন্য ভাব্‌ছো! কি ভাব্‌ছো? তুমি ভেবো না, যাও। আমার স্বামীকে বলগে, আমি আশাপথ চেয়ে খিড়্‌কী দোরের বাহিরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। এই মাত্র মিনতি তাঁরে জানিয়ো, যেন আমি নিরাশা না হই, যেন তিনি আসেন দেখা দেন। ব'লো, আমি তাঁর দাসী জীবনে মরণে দাসী। তিনি আমার সর্ব্বস্ব, ইষ্টদেবতা, তিনি পায়ে না ঠেলেন।'

সমুদ্রাভিমুখে গমন-নিরত নদীর বেগকে যেমন ধারণ করা দুষ্কর, তেমনি প্রণয়াস্পদ পতি দেবতার নিকট মিলনাকাঙ্ক্ষায় চালিত রমণীকে ও কেহ বাধা দিতে পারে না।

উত্তরে জোবি বলিয়াছিল,—'আপ্‌ ভাই, যদি তুই আমার মত হ'তে পারিস্, যদি সকল ত্যাগ ক'র্‌তে পারিস্, যদি ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ভাসিয়ে দিতে পারিস্, যদি রাস্তায় রাস্তায় ঘুর্‌তে পারিস্, তা হ'লে রাত্রে লুকিয়ে দেখা করিস্। কিন্তু যদি ঘরে থাক্‌তে চাস্, লোকের ঘৃণায় যদি ভয় থাকে, যদি কলঙ্ক মাথায় নিতে কাতর হোস্, তা হ'লে রাত্রে দেখা করিস্ নে। লুকান কাজ ভাল নয়, আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই, অনেক রকম দেখ্‌তে পাই; আমি দেখেছি লুকান কাজ একটাও ভাল নয়; দেখিস্, যদি আমার মত হ'তে তোর ভয় না থাকে তবে দেখা করিস্।

গীত।

কলঙ্ক যার মাথায় মণি, কোমল প্রাণে সকল সয়,
লুকান-প্রেম তারই সাজে
ভয় থাকে যার তার তো নয়॥
অযতনে যতন ক'রে,
রাখ্‌তে পারে হৃদয় ধ'রে,
ভাবের ঘোরে সদাই ঘোরে,
আপন ভাবে মগন রয়।
প্রেমে যে হয় দেওয়ানা,
তার তো কিছু নাইকো মানা,
ভেসে গেছে যার বাসনা,
সমান ভাবে বয় সময়॥

কবিবর জোবির মুখে যে সার সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, তাহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত—

'লুকানো কাজ ভাল নয়।' ঘৃণা-লজ্জা-ভয় বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে, কলঙ্ককে মাথার মণি না করিতে পারিলে লোকরঞ্জনায় উপহাসাস্পদ হইবার ভয় না রাখিলে, আপনা-ভোলা না হইলে, প্রণয়াস্পদের সহিত মিলিত হইবার উপায় নাই। ওগত প্রাণ না হইলে,—সেই ধ্যান জ্ঞান না হইলে, গোপন কাজ করিবার দুঃসাহসও কাহার হইতে পারে না।

কিরণময়ীর প্রাণ যখন মিলনের আশায়—পতিদেবতার চরণ দর্শন মানসে—ব্যগ্র হইয়াছিল, তখন জোরির নিষেধ বাক্য তাহার মনে স্থানই পাইল না। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, দীপশিখা যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, মোহিতের পত্রখানিও কিরণময়ীকে সেইরূপ করিয়াছিল। মোহিতের কথামত কিরণ গোপনে তাহার সহিত দেখা করিয়া, বাড়ীতে যে আকস্মিক বিপদ হইয়াছে তাহার কথা জানাইল। জানাইল তার ভগ্নীপতি মারা গিয়াছে, মা অচ্ছাড় খেয়ে সমস্ত দিন পড়ে আছেন, মুখে একটু জল পর্য্যন্ত দেন নি। এ অবস্থায় সকাতরে অনুরোধ করিল। আজ না গিয়া কাল যাই বার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিল, কিন্তু এই ন্যায় সঙ্গত অনুরোধ তাহার মনে কোনরূপ চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারিল না। সে ত প্রেমের জন্য তাহাকে লইয়া যাইতেছে না—আজ লইয়া যাইতে না পারিলে তাহার যে সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাই সে রাগের সহিত বলিল,—'আজ যাবে ত চল—নইলে তুমি সাফ্ বাড়ী চ'লে যাও, আমিও ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাই।' কিরণময়ী কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। একদিকে বাড়ীতে বিপদ, অন্যদিকে পতিদেবতার বিরাগ ভাজন। একদিকে গর্ভধারিণী মাতার সুশ্রূষা, অন্যদিকে স্বামীর সেবা করিবার অধিকার পাইবার আশা। এই দুয়ের মধ্যে সে স্বামীর সেবাকেই বরণ করিয়া লইল, তাহার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইল; এবং বলিল,—'তুমি রাগ ক'রো না—রাগ ক'রো না। তুমি যেথায় নিয়ে যাবে, আমি সেইখানেই যাব।'

মোহিত। যেথায় নিয়ে যাবো কি? তোফা বাগান-বাড়ী, তোমার বাবার চোদ্দপুরুষ এমন বাগান দেখে নাই। আর ওড়োয়া গয়নায় তোমায় মুড়ে রাখ্‌বো।

কিরণ। তুমি গাছ তলায় নিয়ে গেলে, আমি গাছতলায় থাক্‌বো। আমি পিতলের গয়না খুলে জড়োয়া গয়না পরতে চাই না;—আমি তোমায় চাই, তোমার সেবা কর্‌বো—এই আমার জীবনে ধ্যান জ্ঞান। তুমি পায়ে জায়গা দিলে আমি রাজরাণী হ'তে চাই না।'

বারবণিতার হাবভাব লালসা দেখিতে অভ্যস্ত মোহিত প্রেমের সন্ধান পাইবে কোথা হইতে? পত্নী কিরণময়ীর অনাস্বাদিত পূর্ণ প্রেমের মহিমা সে বুঝিতে পারিল না; তাহার মনে হইতেছিল কতক্ষণে সে দুলালের বাগানবাড়ীতে তাহাকে লইয়া যাইতে পারিবে। কিরণ প্রথমে পাল্কীতে একাকী চড়িতে রাজী হইতেছিল না, তাহাকে একখানি গাড়ী করিতে অনুরোধ করিল, মোহিত রমানাথ মামাকে সঙ্গে যাইতে বলিয়া চলিয়া গেল। কিরণ যখন তাহার সহিত যাইতে কিছুতেই রাজী হইল না, বসদুপ্তা সিংহিনীর ন্যায় যখন সে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল,—'না, আমি কখনো উঠ্‌বো না, আমার স্বামীর সঙ্গে নইলে আমি কখনো যাবো না,—আমি বাড়ী চল্লেম।' তখন অগত্যা মোহিতকে পুনরায় ঘটনাস্থলে আসিতে হইল। ক্রোধান্ধ মোহিত তাহাকে বলিল,—'তবে রে বেটী! আমি তোমার পাল্কীর সঙ্গে দৌড়ুই, আর আমাদের মতলব মাটী হোক্। উঠ্‌বি ত ওঠ্ রেমো মামার সঙ্গে চ'লে যা।'

কিরণ তেজোদৃপ্ত স্বরে বলিল—'তুমি না সঙ্গে গেলে যাবো না'।

প্রেমময়ী রমণীর কোমলতা ও দৃঢ়তার যুগপৎ সম্মিলন দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়—এমন উজ্জ্বল-মধুর চিত্র উপভোগের সা ত্রী। বারবণিতার প্রেমাদর্শ অর্থলোভী বিশ্বা মোহিত এ দৃশ্য উপভোগ করিতে পারিল না। রাগে মাথায় সে সকল কথাই বলিয়া ফেলিল। তখন উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইল :—

কিরণ। তুমি না সঙ্গে গেলে আমি যাবো না।

মোহিত। বটে—ছাকামো! ভাল চাস্ত চুপি চুপি পাল্কীতে ওঠ, নইলে তোর মুখ দেখ্‌বো না।

কিরণ। না না, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি সঙ্গে এসো।

মোহিত। ওঃ, রস দেখ না! তোমার সঙ্গে গিয়ে কপোত-কপোতীর মত মুখে মুখ দিয়ে থাক্‌বো, তাই তোমায় বার ক'রে এনেছি নয়? নাও পাল্কীতে ওঠো।

কিরণ। না—না—তুমি না গেলে যাবো না।

মোহিত। ওঃ, অত ইয়ারকিতে আর কাজ নেই প্রাণ। মনে করেছ বুঝি, ঘর-ঘরকন্না কর্‌বে, আমার গিন্নি হ'বে? তা মনের কোণও ঠাঁই দিয়ো না।

কথাটা কিরণের কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না—ভাল করিয়া কথাটার অর্থও বোধ হয় সে বুঝিতে পারিতেছিল না। তাই সে বলিল,—'বলো-বলো, কি বল্‌ছিলে বলো। আমায় নিয়ে ঘর কর্‌বে না ত, তবে আমায় কেন নিয়ে এলে?'

মোহিত। কেন নিয়ে এলুম—শুন্‌বে?

রমানাথ তখন জনান্তিকে তাহাকে বলিল, 'আরে চুপ—চুপ করো।'

মোহিত। চুপ করো কি, কিসের ভয়? একটা মেয়েমানুষকে ভয় করতে হবে। Damn it! তবে শোনো, টাকার দরকার। দুলো ব্যাটার কাছ থেকে টাকা আদায় কর্‌তে হ'বে। তুমি বেশ্যা—নূতন বেরিয়ে এসেছ, এই বলে দুলাল বাবুকে রেমো মামা আর কালী ঘটক বুঝিয়েছে। এদিকে এরা তোমায় বাগানে তুল্‌বে, আমি খানায় খবর দেব যে, আমার মাগ জোর ক'রে বাগানে নিয়ে তুলেছে। তা হ'লেই টাকা ছাড়তে পথ পাবে না। বুঝ্‌লে! সাত চাল চেলে তবে বোড়ে টিপেছি।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইলে পথিক যেমন স্তব্ধ হইয়া পড়ে, কিরণময়ীও ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়িল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রেমবলে বলীয়ান্ রমণী সে ভাব দূর করিয়া বলিল,—'কি, কি বল্লে? বল—মিথ্যাকথা বলেছ! যদি সত্য হয়, তবু বল—মিথ্যাকথা বলেছ! আমার স্বদেশের—ইষ্টদেবতা পদার্থাতে ভেঙ্গে দিয়ো না। বলো—মিথ্যাকথা বলেছ—তোমার প্রতি আমার ঘৃণা না হয়, যেন তোমার ধ্যানে ছিলুম, সেই ধ্যানে যেন থাকতে পারি; বলো—বলো—মিথ্যাকথা বলেছ!' এ প্রেমচিত্র ভারতের নিজস্ব। এ আদর্শ চিত্র কামের বা ভোগের চিত্র নয়—এ চিত্র সাধনানিরত—পূজার্চ্চনারত উপাসকের। উপাস্যের প্রতি প্রাণভরা আত্মনিবেদনের চিত্র। এই আদর্শ অনুপ্রাণিত হইলে জগতে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ মধুর হইতে মধুরতর হইবে। ভোগবিলাসী মোহিত এ ধ্যানের সার্থকতা বুঝিল না—উপাসকের প্রাণের সাড়া পাইল না। হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি তাহার ছিন্ন না হইয়া যাইলে পত্নীর স্বরূপ-পদে তাহারা আপনি বাজিয়া উঠিত। নরকের কীট মোহিত জঘন্য রসিকতা করিয়া বলিল,—'বাহবা—বাহবা! বেড়ে লেক্‌চার ঝাড়্‌চো বিধুমুখী।' তারপর তাহার কুকর্ম্মের সঙ্গীদের পরামর্শ মত যখন হীরে আসিয়া কিরণের মুখে কাপড় বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হইতে গেল তখন, কিরণময়ী তাহাকে শাসাইয়া বলিলেন,—'খবরদার, আমার অঙ্গস্পর্শ করো না।' সকলে মিলিয়া যখন কিরণ-

ময়ীর মুখে কাপড় বন্ধন করিল, তখন কিরণময়ী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বলপূর্ব্বক মুখ হইতে বস্ত্র উন্মোচন করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—রক্ষা করো—রক্ষা করো!'

সে কাতর প্রার্থনা ভগবানের চরণে গিয়া পৌঁছাইল, তৎক্ষণাৎ বন্ধুগণের সহিত কিশোর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া সকলকে বাঁধিয়া ফেলিল। মোহিত তখন বলিল, 'কি কিশোরবাবু, আমার স্ত্রী আমি নিয়ে যাচ্ছি, তোমার তা'তে কি?'

কিশোর ব্যাপারখানা জানিতে চাহিলে কিরণময়ী তাহাকে বলিয়া উঠিল,—'কিশোরবাবু, কিশোরবাবু, আমায় রক্ষা করুন। আমার স্বামী ঘর বর্ব্বর ব'লে আমায় বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছেন। এঁরা জোর করে আমার দুলালবাবুর বাগানে নিয়ে যাচ্ছেন।

মোহিত। কি, মিথ্যাকথা।

কিশোর। কি মিথ্যাকথা—মোহিতবাবু?

মোহিত। আমি আমার স্ত্রী বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

কিশোর। বুঝেছি, বেলবোরের দিকে! মোহিত বাবু, আপনাকে যে জানোয়ার বল্লে, জানোয়ারকে গালাগাল দেওয়া হয়। আপনার স্ত্রীকে অপরকে দেবার জন্যে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছেন। অপরকে দেবার জন্যে জোর ক'রে পাল্কীতে তুলছেন? একথা লোককে বল্‌তে গেলে লোকের কাছে মিথ্যাবাদী হ'তে হয়। কারুর ঘরে জন্মগ্রহণ করে আপনার এই আচার! অভিধানে আপনার বিশেষণ নাই!

মোহিত। কি, কি হয়েছে? আমার পরিবার নিয়ে যাচ্ছি। আমি তোমাদের নামে নালিশ কর্‌বো।

কিশোর। নালিশ দেখাতুম, যদি তুমি এই সাধ্বীর স্বামী না হ'তে! এই নরাধম বেটাদেরও আমি বুঝে নিতুম। কি বল্‌বো, তোমায় দণ্ডদিলে তোমার সাধ্বী স্ত্রী ব্যথা পাবে।

কিরণের উদ্ধার সাধন করিয়া কিশোর তাহাকে তাহার বাপের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

এইবার আমরা মোহিতের চরিত্রের পরিবর্ত্তনের কাহিনীটুকু আলোচনা করিব। একদিন হঠাৎ সে সমিতির গৃহে আসিয়া অযাচিতভাবে কিশোর বাবুর নিকট অতীত জীবনের কাহিনী বিবৃত করিল। আপনার দোষ সকল কিছুমাত্র গোপন না করিয়া যখন অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়া যাইতেছিল, তখন তাহার মনে নির্ব্বেদ আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া কিশোর বাবু তাহাকে বলিলেন, 'থাক্ ওসব কথা ছেড়ে দিন।' তিনি ছাড়িয়া দিতে বলিলে সে ছাড়িতে পারিল না। অনুতাপানলে তাহার হৃদয় জর্জ্জরিত। প্রাণের সকল কথা খুলিয়া না বলিলে তাহার তৃপ্তি হইতেছে না, তাই সে উত্তরে বলিল,—'না না, সংক্ষেপে বল্‌ছি শুনুন। মহিয়ার গয়না চুরি করি; জেল হয়। খাটা অভ্যাস ছিল না; জেলে সাংঘাতিক ব্যায়রামে পড়ি। জেলের ডাক্তার বাবু—তাঁরই মুখে পরিচয় পাই, তিনি আপনার একজন বন্ধু—আমায় অনেক বোঝাতেন। আমার স্ত্রীর খাতিরে আমায় প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা কর্‌তেন। আমার স্ত্রীর গুণের কথাও অনেক শুন্‌তেম। ভাব্‌ছেন, তাতে আমার মন নরম হয়েছে?—না। জেল থেকে বেরিয়েই প্রথম ভাবলেম যে কোন রকমে স্ত্রীর সঙ্গে আবার আলাপ ক'রে যদি বাগিয়ে কিছু আদায় কর্‌তে পারি।'

কিশোর। জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ী গেলেন না?

মোহিত। বাড়ী কোথায়? আমার অংশ রূপচাঁদ বাবুর গর্ভে, আর অর্দ্ধেক অংশ মার দেনায় বিক্রী হ'য়ে গেছে। এর আগেই মা আমায় বাড়ী যেতে দিতেন না। মা'র চুরী করেই চোর-বিদ্যা শিক্ষা হলো কি না?

কিশোর। তার পর—তার পর?

মোহিত। স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌লেম, পাগ্‌লী জোরি দেখা করিয়ে দিলে। দেখ্‌লেম, চুরীর সামগ্রী কিছু নাই। তবে—স্ত্রী নিজে উপবাস গিয়ে আমায় অন্ন দিতো, তাই আহার কর্‌তেম, আর পাঁচ রকম ধান্দায় ফিরতেম। আজ মাস দুই হলো, আমার স্ত্রী আমার জন্যে ভাত এনে দিলে, কিন্তু আপনি মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে গেল। তোরির ঠেঙ্গে শুন্‌লুম, সে অনাহারে থেকে আমায় খাওয়ায়। এত দিনে স্ত্রীকে ভাল ক'রে দেখি নি; যে দিন মূর্চ্ছা যায়, সেদিন দেখ্‌লুম। সে আমায় রোজ আপনার কাছে আস্‌তে বল্‌তো, আমি ত ভ্রৈণ নই যে, স্ত্রীর উপদেশ নেব! কিন্তু কি জানেন, সেইদিন থেকে মনটা যেন আর এক রকম হয়েছে; আর স্ত্রীর মুখের ভাত খেতে যেতেম না। দক্ষিণেশ্বরে সদাব্রতে খেতেম। রোজ দিত না, হাত পেতে ভিক্ষে কর্‌তে পার্‌তেম না, দু'এক দিন উপবাসও যেত। পঞ্চবটীতে প'ড়ে থাক্‌তেম; প'ড়ে কত কি মনে হ'তো। মনে হ'লো, আপনার কাছে যাই, তাই এসেছি।

কিশোর। ভাল করেছেন, শোধরান, আপনার কাজকর্ম্ম ক'রে দেব। আপনি স্নান টান ক'রে খাবেন আসুন।

মোহিত। কিশোর বাবু, কাজকর্ম্ম এখনই দেন, আমার উপযুক্ত কাজ দেন। আমি সমিতি ঝাঁট দেব, আপনাদের পায়ের ধুলো গায়ে লেগে যদি আমার মতি ফেরে! এখনো আমার নিজেকে নিজের বিশ্বাস নাই। আমি দেখ্‌বো আমার অভিমান গিয়াছে কিনা, পরিশ্রমের অন্ন খেতে পারি কি না, সত্য শোধ্‌তে পার্‌বো কি না।

এরূপভাবে আত্ম নিবেদন করা বড় সহজ কথা নয়। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া তাহার হৃদয়ের মলা মাটি দূর হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অভিমানের হাত হইতে সে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে কি না, তাহা ঠিক সে জানে না—তাই তাহার মুখে আমরা শুনিতে পাই 'আমার নিজেকে নিজে বিশ্বাস নাই।' আপনার উপর বিশ্বাস থাকা যে কতদূর পরিমাণে ভাল তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাস থাকিলে অহংকারের গণ্ডীর ভিতর মানুষকে আবদ্ধ করিয়া রাখে একথাও সত্য।

আলোচ্য নাটকে চরিত্র কয়টীর পরিবর্ত্তন কবিবর সুন্দরভাবে কলাকুশলীর ন্যায় করিয়াছেন। পতি-পত্নীর ভিতর বিরোধ ঘুচিয়া মিলন দেখিতে সকলেই ব্যগ্র।

কিরণময়ীর চরিত্র পূর্ব্বেই একরূপ আলোচিত হইয়াছে। মোহিতের কথা শুনিয়া বুঝা যায় কিরণময়ী দেবী। যে শত প্রকৃতি মোহিত আপনার বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীকে অর্থের লোভে অন্যের বাগানে তুলিয়া দিয়া তাহার মাথায় চিরকালের জন্য কলঙ্কের পসরা তুলিয়া দিতে পারে, সেই নির্য্যাতিতা লাঞ্ছিতা, রমণী আপনার মুখের গ্রাস ত্যাগ করিয়া কিসের আনন্দে স্বেচ্ছায় দিতে পারিয়াছিল—তিলে তিলে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যুর মুখে সানন্দে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। প্রেমের বলে প্রেমময়ী লজ্জা-মান-ভয় বিসর্জ্জন দিয়া গোপনে পতি দেবতার প্রাণরক্ষার জন্য অন্ন নিবেদন করিয়া আসিত। আত্মাভিমান থাকিলে মানুষ এরূপ কাজ করিতে পারে না! আপনার সত্তা থাকিলে এরূপ কাজ করিতে পারা অসম্ভব। একবার প্রহারিতা হইয়াও পুনরায় মানুষ কি সেই কাজ করিতে অগ্রসর হয়? প্রথমবার স্বামীর সহিত মিলনের আশায়, ঘরকন্না করিবার আশায় করুণাময়ী ছুটিয়াছিল, আর এবার ছুটিয়াছিল দেবতার প্রাণ রক্ষা-ভক্তের অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য।

ধন্য বঙ্গ রমণী! এ উচ্চ আদর্শ হইতে তোমাদিগকে যেন কখনও অন্যপথে চলিতে না দেখি তুমি ত পতির কেবলমাত্র ধর্ম্মসঙ্গী নও—তুমি শুধু ভোগের সামগ্রী ত নও; তুমি সচিব—সখায়—সম্পদ। এইরূপে বঙ্গরমণী তোমাদের ভ্রান্ত স্বামীদিগকে সুপথে আনিয়া জীবন মধুময় কর। পাশ্চাত্য জগতকে বরণীয় আদর্শ দেখাইয়া ধন্য হও। জগতের নারী-সমস্যা সমাধানের সহায়ক হও।

(ক্রমশঃ)

সন্ধ্যায়

(শ্রীঅনাথবন্ধু ঘোষাল)

অনন্ত আঁধার মাঝ দাঁড়াইয়া আমি আজ
সন্ধ্যা-কিনারায়,
নিস্তব্ধ গম্ভীর স্থির সময়ের সিন্ধুনীর
ধীরে বহে যায়
ধীরে ধীরে নেমে আসে আঁধার পুরবাকাশে,
নিশার অঞ্চল,
নিস্তব্ধ তারকাবৃন্দ কোন্ দূরাগত ছন্দ
গাহি'ছে বিহ্বল!
কোন্ ম্লান বেদনায় হৃদি মোর ভ'রে যায়
কুহেলি আঁধারে!
ভাবিয়া না পাই তায়, কি যেন হারায়ে হায়
খুঁজিতেছি তারে।
নীরব নিস্পন্দ ব্যোম নিস্পন্দ তারকা সোম,
শব্দ কোন নাই,
অণু, পরমাণু আর জগত বিশালকার
প্রশান্ত সবাই;
সকলি শান্তিতে ভরা, শান্তি ধ্যানময়ী ধরা,
রাজে চারি পাশে
শান্তির প্রশান্ত মুখ বিশ্বপ্রাণে কিবা সুখ
হেরি' তারে ভাসে।
কোথা' সেই সৌম্য শান্তি বিমল ত্রিদিব কান্তি
অন্তরে আমার!
তরুণ নিশায় আজ আমার মানস মাঝ
কোথা' হাসি তার!
আবৃত কুহেলি ছায়া অস্পষ্ট স্মৃতির কায়া
ধীরে ভেসে যায়,
যবনিকা অন্তরালে কত হাসি কান্না ঢ'লে
কে গণিবে তায়,
আজ এই অন্ধকারে ছিন্ন যত পুষ্পহারে
গাঁথিয়া গাঁথিয়া
মিলন বিয়োগময় নাটকের অভিনয়
তুলিছে গড়িয়া।
কোথায় চলেছি হায় লক্ষ্যহারা উদ্ভ্রান্ত প্রায়
গগনেতে ভেসে,
কোন্ সেই আকর্ষণে এইরূপ সন্ধিক্ষণে
ডুবিব তামসে,
যে মহা আঁধার পার অমৃতের পারাবার
উছলে সদাই,
স্থির সৌদামিনী বিভা জাগায় বিমল দিবা
শোক তাপ নাই।
কে গো তুমি বর কান্তি —মূর্ত্তিমতী মহাশান্তি
বসি' নীলিমায়
একই মধুর তানে বাঁধিয়াছ বিশ্বপ্রাণে
নীরব ভাষায়?
সেই সুমধুর ছন্দে ম্লান কান্তি মকরন্দে
ফুটাও বিমল—
যুক্ত-করে এই আজ দাঁড়'য়ে আঁধার মাঝ
যাচি গো কেবল,
দিওনা দিওনা ফেলে ঘৃণা ভরে অবহেলে
এ মোর প্রার্থনা,
মনের মন্দির শীর্ষে জাগাও অতুল হরে
অনন্ত কেতন।

মা

(চিত্র)

[শ্রীউর্ম্মিলা দেবী]

সন্ধ্যাদেবী তাহার কালো ওড়নায় সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর তাপিত বক্ষের উপর নামিয়া আসিতেছিল, সঙ্গে মর্ম্মস্পর্শী বায়ু।

সমস্ত দিন অসহ্য গরমে পৃথিবী মূর্চ্ছাতুরের ন্যায় পড়িয়াছিল। মৃদু সমীরণের স্নিগ্ধ মধুর পরশে শিংরিয়া উঠিয়া পৃথিবী সেই অসীম নীল আকাশের দিকে চাহিল ককে জলপূর্ণ কলসী লইয়া একটী রমণী ধীরে ধীরে একটী পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার হাত ধরিয়া নিস্তব্ধ গ্রাম্যপথে গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন, কলসী হইতে 'ছলাৎ ছলাৎ' করিয়া জল রমণীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার সিক্ত অঙ্গকে আরও সিক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

বাটী আসিয়া রমণী রন্ধন-গৃহের দাওয়ায় কলসী নামাইয়া বালিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন "সাবি, আমার কাপড় খানা এনে দে ত মা।"

সাবিত্রী তাহার ছোট কালো বেণীটী নাচাইতে নাচাইতে ছুটিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই একখানি শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া মাতার হস্তে দিল।

মনোরমা সিক্ত বস্ত্রখানি ছাড়িয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন "সাবি, তুমি ঘরে গিয়ে পড়া করগে, শেষে উনি পড়া নেবেন।"

(২)

শিবপদ দত্ত গ্রামের স্কুলে ৪০ টাকা মাহিনায় মাষ্টারী করেন। বাটীতে তাঁহার স্ত্রী মনোরমা ও কন্যা সাবিত্রী ব্যতীত অন্য কেহই ছিল না। সুতরাং এই অল্প বেতনে এই ক্ষুদ্র পরিবারটীর দিন বেশ আনন্দেই কাটিয়া যাইত।

সাবিত্রী পিতা মাতার একমাত্র সন্তান; সুতরাং সাধারণ পুত্র অপেক্ষা বেশী আদর সে পাইত। গ্রাম সম্পর্কীয়া দিদিমা, খুড়িমা, জেঠীমা, ইত্যাদি অনেক হিতাকাঙ্খিনীর দল আসিয়া মনোরমাকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে, এমন করিয়া কন্যার ইহকাল পরকাল নষ্ট করা অনুচিত, এমন আদর দেওয়া কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে, এবং ভবিষ্যতে যেন আর কখনও দেওয়া না হয়। কিন্তু সকলই বৃথা; এই সৃষ্টিছাড়া নারী কোন কথাই কাণে তুলিতেন না। বেগতিক দেখিয়া হিতাকাঙ্ক্ষিনীর দল সরিয়া পড়িতেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নিবিড় ভাবে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে কুলবধূগণের শঙ্খ-নিনাদে সমস্ত পল্লীখানি মুখরিত হইয়া উঠিয়া-উঠিল। মনোরমা তুলসী তলায় প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; একবার অন্ধকারের মধ্যে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া ধীরপদবিক্ষেপে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শিবপদ তখন গবাক্ষপথে তিমিরাচ্ছন্ন পল্লীপথের দিকে অনিমেষদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিলেন।

স্বামীর স্কন্ধে হাত দিয়া মনোরমা কহিলেন "এত তন্ময় হয়ে কি ভাবছো?"

শিবপদ হাসিয়া "তোমার কথা" বলিয়া স্ত্রীকে বাহু বেষ্টনে বাঁধিয়া ফেলিলেন। মনোরমা নিজেকে স্বামীর বাহু হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া পড়িলেন। অবিলম্বেই সাবিত্রীর পড়া মুখস্থর দ্রুত কণ্ঠস্বর মনোরমাকে বুঝাইয়া দিল তাঁহার কথার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বাহান্ন বৎসর বয়সে

এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিবপদ যখন গ্রামে ফিরিলেন, তখন অনেকেই তাঁহাকে অন্যস্থানে চাকুরির সন্ধান করিতে বলিয়াছিল; কিন্তু শিবপদ শ্যামল শস্যভরা স্নেহময়ী পল্লী জননীকে ছাড়িয়া যাইতে একেবারেই নারাজ। সুতরাং তিনি নিজ গ্রামেই সামান্য স্কুল মাষ্টারীতে এই দীর্ঘ ছয় বৎসর বেশ আনন্দেই কাটাইতেছেন।

নত হইয়া স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিয়া শিবপদ কহিলেন, "কাপড় কাচতে আজ এত দেরী হল' যে।" মৃদু হাসিয়া মনোরমা কহিলেন "তাই বুঝি এত রেগে রয়েছ।"

শিবপদ হাসিয়া কহিলেন "আর তার শাস্তিও ঠিক দিয়েছি, শাস্তি স্বরূপ —"

বাধা দিয়া কৃত্রিম রাগতস্বরে মনোরমা কহিলেন "আঃ; তবে যাও এমন ধারা করত আমি চল্লাম।"

মনোরমা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই শিবপদ নিজ বাহু দ্বারা স্ত্রীকে বেষ্টন করিয়া কহিলেন "যাও দিকি কেমন যাবে।" মনোরমা অগত্যা হাসিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন।

(৩)

কুটনা হইতে মুখ তুলিয়া মনোরমা কন্যার উদ্দেশে কহিলেন "কাঁদছ কেন মা, কাজ কর্ত্তে দাও, কাজ সারা হলে আমি তোমায় অনেক খেলনা দেব"। সাবিত্রী কিন্তু খেলনার উল্লেখে ত কিছু মাত্র আনন্দিত হইল না, সে পূর্ব্ববৎ ক্রন্দন মিশ্রিত স্বরে কহিল "না, আমি খেলনা চাই না।" মনোরমা কি চাই জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে কোল অধিকার করিয়া বসিল। "অঃ ওঠ" বলিয়া মনোরমা কন্যাকে কোল হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য হাত ধরিতেই চমকিয়া উঠিলেন, উদ্বিগ্ন মুখে বলিয়া উঠিলেন "একি জ্বর হয়েছে নাকি?" এবং ললাটে হস্ত দিয়া তাপ অনুভব করিয়া বুঝিলেন তাঁহার আশঙ্কা মিথ্যা হয় নাই।

কুটনা ফেলিয়া স্বামীর উদ্দেশে সাবিত্রীকে কোলে লইয়া দ্রুত পদে মনোরমা কক্ষে প্রবেশ করি লেন, শিবপদ তখন জানালার সম্মুখে বসিয়া এক খানি বই পড়িতেছিলেন। সে দিন রবিবার, সুতরাং স্কুলেরও তাড়া নাই,নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, এখনও মনোরমার রন্ধন সমাপ্ত হয় নাই, এবং ছুটির দিন মনোরমার বারটার পূর্ব্বে কখনও রন্ধন কার্য্য সমাপ্ত হয় না; সুতরাং খাইবারও তাড়া নাই। শিবপদ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পুস্তকখানি পাঠ করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে মনোরমার সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং শিবপদ জানিতেন যে কোন জিনিষই হারাক না কেন মনোরমা বিবাদ হইয়া গেলে পর তাঁহারই কক্ষে সেটার অনুসন্ধান করিতে আসিতেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শিবপদ মনোরমার কাছে হার মানিয়া তাঁহার মান ভঞ্জন করিতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে জিনিষ হারাইতে থাকিত, সুতরাং মনোরমার পরিশ্রমের তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া মনোরমা শিবপদকে বলিলেন "ওগো শুনছ"—সহসা পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া শিবপদ কহিলেন, "এ্যা কি ভাগ্যি আমার যে আজ আমার মানিনী রাইয়ের মান ভাঙতে হলনা, আপনি ভেঙেছে।"

মনোরমা স্বামীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন "শুনছো সাবির যে জ্বর হয়েছে।" "দেখি" বলিয়া মনোরমার কোল হইতে সাবিত্রীকে লইয়া তিনি তাপ অনুভব করিলেন। পুস্তক খানি মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন "দেখি ডাক্তার যদি পাই"। কন্যাকে কোলে লইয়া মনোরমা বিষন্ন মুখে সেই খানে বসিয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় একটার সময় শিবপদ ডাক্তার সঙ্গে লইয়া বাটী ফিরিলেন সূর্য্যের প্রখর তাপে তাঁহার সমস্ত মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল।

মনোরমা তখনও তেমনি ভাবে বসিয়া ছিলেন,

ডাক্তার সঙ্গে শিবপদকে বাটী ফিরিতে দেখিয়া কন্যাকে চেয়ারের উপর উপবেশন করাইয়া দ্রুতপদে পার্শ্বের কক্ষে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ভাল করিয়া পরীক্ষার পর ডাক্তার বলিয়া গেলেন, যে আশঙ্কা শিবপদ ও মনোরমা করিয়া ছিলেন, সম্প্রতি যে ভীষণ বসন্ত গ্রামকে আক্রমণ করিয়াছে, সেই বসন্তই সাবিত্রীকেও আক্রমণ করিয়াছে, ঔষধের বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

(৪)

অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করিতে করিতে ক্ষীণ কণ্ঠে সাবিত্রী ডাকিল—"মা।" কন্যার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মনোরমা অস্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, "কি মা? বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে?"—"বাবা কই?"—"এই ত আমি রইচি মা।" রুদ্ধ স্বরে এই কয়টী কথা বলিয়া শিবপদ কন্যার ছোট নরম হস্তখানি নিজ হস্তের মধ্যে তুলিয়া লইলেন। তখন রাত্রি বারটা, সমস্ত পল্লী একেবারে নীরব, নিঝুম, কোথাও একটু শব্দ নাই, শুধু ক্ষণে ক্ষণে কুকুরগুলির তীব্র চীৎকার নৈশ আকাশ ভেদ করিয়া নিস্তব্ধ পল্লীকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

বাহিরে জমাট বাঁধা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর দূত যেন সাবিত্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

সাবিত্রী সমস্ত রাত্রি মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে নিজেই হার মানিল।

প্রভাতের তরুণ আলোক যখন বিশ্বের গায়ে গড়াইয়া পড়িতেছিল, সেই সময় পিতামাতার একমাত্র আনন্দের ধন সাবিত্রী চিরদিন তরে চক্ষু মুদিল। সাবিত্রীর মুখের উপর হইতে যন্ত্রণার ভীষণ চিহ্ন লুপ্ত হইয়া মৃত্যুর শান্তিময় ছায়া পড়িয়াছে। উন্মাদিনীর ন্যায় মনোরমা সাবিত্রীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। শিবপদ যন্ত্রণায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলেন।

(৫)

কাতর কণ্ঠে শিবপদ ডাকিলেন "মনোরমা"! মনোরমা ভীষণ হাসিতে শ্মশান ঘাট মুখরিত করিয়া তুলিয়া কহিলেন "দেখ সাবি কেমন খেলা করছে, ঐ যে, ঐ যে, আমায় ডাকছে। আমায় ছেড়ে দাও, তুমি কে?" পুনর্ব্বার ভীষণ হাসিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। ব্যথাতুর শিবপদ দুইহাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সাবিত্রী—ক্ষুদ্র পরিবারের একমাত্র আনন্দের বস্তু সাবিত্রী—সেও নাই, চির আনন্দময়ী প্রেমময়ী পত্নী মনোরমা—সেও আর উন্মাদিনী। অসহ্য যন্ত্রণায় শিবপদ দৃঢ় হস্তে চোখ টিপিয়া ধরিলেন—তিনি যে আর দেখিতে পারেন না!

শুনা যায়, ঈশ্বর যা করেন সমস্তই মঙ্গলের জন্য। পিতা সর্ব্বদাই সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাই ইহাতেও প্রচ্ছন্ন ভাবে বুঝি বৈধ পিতার মঙ্গল রহিয়াছে, ক্ষুদ্র মানব বুদ্ধি সেই প্রচ্ছন্ন গুঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তাই বুঝি আমাদের অশান্ত ক্রন্দনের কোন শেষ নাই।

রুদ্রভীষণ রূপ

(গান)

(শ্রীনারায়নচন্দ্র ঘোষ এম, এ)

এস' রুদ্র ভীষণ রূপ
এস' মর্ম্মে চরণ মাঝে,
রক্ত ঝলকে দমকে দমকে
মত্ত মদির কাজে!
বন্ধন ভাঙি হুঙ্কার তুলি,
শতদিকে সদা হাহাকার ধূলি
দীন হিয়ার স্পন্দন ভিতে
বিভীষণ ভীম সাজে!
থাকিবে না আলো কেবল আঁধার,
পথ ভুলে যাওয়া অসীম আঁধার,
জাগিবে যে চিতে ক্ষুধিত কামনা,
হু হু নাদ যেন বাজে!

বংশের কলঙ্ক

(শ্রীসতেন্দ্রকুমার বসু বি, এ)

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ

অরুণের আত্মদান

মৈথিলীর শোক কোঠারে দম্পতিকে যত বাজিয়াছিল, বোধ হয় অরুণকুমারকে তাহা অপেক্ষা কম বাজে নাই। অরুণ এদিকে দেহের শক্তিতে যেমন বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিল, তেমনই তাহার মনটা কুসুমের অপেক্ষা কোমল ছিল। স্নেহ, দয়া, মায়া ইত্যাদি অন্তরের কোমল বৃত্তিনিচয়ের যেমন তাহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, বোধ হয় কুসুম কোমলা স্নেহ প্রবণা রমণী হৃদয়েও সেরূপ হয় কি না সন্দেহ।

কিন্তু যখন সিবাং নদীর তটে সেই সুবর্ণ-প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল—যখন তাহার দয়াময়ী স্নেহময়ী ভগিনী মৈথিলীর পুণ্য পবিত্র দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইল—যখন শ্মশান চুল্লীর গাঢ় কৃষ্ণ ধূমরাশি কুণ্ডলী করিয়া গগনমার্গে উত্থিত হইল, তখন অরুণ বিহ্বল নেত্রে সেই চিতা-ধূমের দিকে চাহিতে চাহিতে এক নূতন ভাবে তন্ময় হইয়া গেল। তাহার স্বভাবতঃ শান্ত সংযত স্নেহপ্রবণ হৃদয় দারুণ ক্রোধ ও প্রতিহিংসানলে জ্বলিয়া উঠিল। এই নিষ্পাপ সরলা বালিকা কি অপরাধ করিয়াছিল? কি পাপে এই কোমল প্রসূনটী অকালে ঝরিয়া পড়িল? যে নির্ম্মম নৃশংষাতক দস্যু চোরের মত, কাপুরুষের মত, লুকাইয়া বিষাক্তবাণে এই সোণার পুতলীকে হত্যা করিয়াছে তাহার ত' এখনও শাস্তি বিধান হয় নাই। তবে সে নির্জ্জীব ক্লীবের মত এখনও বসিয়া রহিয়াছে কেন?

এই সঙ্কল্প মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র অরুণ অন্তরের ব্যথা গোপন করিয়া গুপ্তঘাতুকের অনুসন্ধানে সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি নিয়োজিত করিল।

সে প্রথমেই গদার কাছে সংবাদ পাইল যে, বিনায়ক ঘটনার দিন সারা অপরাহ্ণ বাসায় ছিল না। আরও একটা কথা এই যে, মৈথিলীর হত্যার দিন হইতে বিনায়ক অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। সুতরাং বিনায়ক যে এই হত্যার মূলে ছিল, তাহা সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। আর অরুণের প্রতি বিনায়কের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ও হিংসা সঞ্জাত হওয়া আশ্চর্য্য নহে, কেননা সে অরুণকে তাহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিত। তাই অরুণকে হত্যা করিতে গিয়া সে মৈথিলীর মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। অরুণের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে জগন্নাথ মোরে নিশ্চয়ই বিনায়ককে গুপ্তভাবে সাহায্য করিয়াছে। বিনায়ক যে মোরের দলে যোগ দিয়াছে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তদুপরি বিনায়কের সঙ্গে অরুণের একটা কোট ও পিস্তল অন্তর্হিত হইয়াছে।

মনের মধ্যে এই সকল তোলাপাড়া করিয়া অরুণ পরদিন অতর্কিতভাবে মোরের আড্ডা আক্রমণ করিবার ও বদমায়েসদিগকে গ্রেফতার করিবার সঙ্কল্প করিল। সে লুবাংপাশি ও মিরি ভ্রাতাদ্বয়কে ডাকিয়া এই বিষয়ে গোপনে পরামর্শ করিল, অবশ্য গঙ্গা বা কোঠারেকে কিছু বলিল না, কেবল জানাইল যে সে শিকারে যাইতেছে। সে কুলিদের মধ্যে শাকরেদ করিয়া রক্ষি সৈন্যের মত রাখিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বাছা বাছা ছয়জনকে দলে লইল।

অতি গোপনে লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে জঙ্গলে যাওয়া অরুণের উদ্দেশ্য ছিল। তাই সে লুবাংপাশির অধীনে তাহার দলবল পাঠাইয়া দিল। কথা রহিল তাহারা জঙ্গলের হাঁটা পথে যাইবে ও মোরের আড্ডার চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিবে। অরুণ মিরি ভ্রাতাদ্বয়কে লইয়া শিকারের ভাণে কোন্দাং যাইবে এবং মোরের আড্ডায় সকলে মিলিত হইবে।

অরুণ নৌকা হইতে নামিয়া জঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর হইল। বৃদ্ধ মিরি কোন্দা লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, দাতেম মিরি প্রচ্ছন্নভাবে অরুণের পশ্চাদনুসরণ করিল। মোরের আড্ডার নিকটস্থ হইয়া অরুণ ইসারায় দাতেম মিরিকে ডাকিল এবং গোপনে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলিল। দাতেম এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইল এবং একটা ঝোপের সন্নিহিত হইয়া মাটীর উপর শুইয়া পড়িল। তাহার পর সে কই মৎস্যের মত কাদে হাঁটিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ঝোপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল। কিছুক্ষণ অরুণ তাহাকে দেখিতে পাইল না।

অরুণ চক্ষু পলটিতেই দেখিল জঙ্গলের অপর দিক হইতে ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়া অতি সন্তর্পণে একটা লোক তাহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সে লোকটাও দাতেম মিরির মত কখনও কাদে হাঁটিয়া কখনও হাঁমা গুড়ি দিয়া, আবার কখনও বা দৌড়িয়া সতর্ক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অরুণের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, তাই সে দূর হইতেই তাহাকে চিনিল, সে লুবাংপাশি। তাহার ভাব দেখিয়া অরুণের সন্দেহ হইল, কোন লোক পাশির পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। অমনই অরুণ একটা গাছের আড়ালে লুকাইল।

লুবাংপাশি নদীর তীরের উদ্দেশে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছিল, বোধ হয় সে কাহারও নিকট তাড়া খাইয়া যেখানে অরুণো নৌকা চরাইয়া বাঁধা হয় সেই স্থানে অরুণের আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে যাইতেছিল। পাশি অরুণের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, অরুণ নীরবে রহিল। ক্ষণপরেই অরুণ দেখিল বৃহৎ ভোজালি হাতে লইয়া জগন্নাথ মোরে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তাহার সঙ্গে তাহার দলের আর একটা লোক রহিয়াছে, সেও সশস্ত্র।

ইচ্ছা করিলে অরুণ উদ্দণ্ডেই তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিতে পারিত। কিন্তু অতর্কিত শত্রুকে আঘাত করা অরুণ কাপুরুষোচিত বলিয়া মনে করিত, তাই সে কিছু না বলিয়া ঘটনার স্রোত

দেখিবার নিমিত্ত গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিল। ক্রমে সকলেই নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু সেখানে অরুণের নৌকা ছিল না, সেই নদীতট মোরের আড্ডারই সংলগ্ন স্থান। লুবাং পাশি নদীতটে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিল আর রক্ষার উপায় নাই, তখন নিজের সুদীর্ঘ ভোজালি বাগাইয়া ধরিয়া শত্রুদ্বয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল। মোরে জঙ্গলের দিকে তাহার পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং তাহার লোকটাকে নদীতট দিয়া অগ্রসর হইয়া পাশিকে বেড় দিতে ইঙ্গিত করিল।

হঠাৎ এক অভাবনীয় আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে মোরের লোকটা হাটু গাড়িয়া মাটিতে থাবা পাতিয়া বসিয়া ঠিক বাঘের মত লাফ মারিবার চেষ্টা করিতেছিল, লুবাং পাশিও ভোজালি বাগাইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চুপ করিয়া গাছের ডাল হইতে একটী ফল পড়িল, অমনই নিমিষের মধ্যে ভয়ঙ্কর হিস হিস শব্দ হইল। অরুণ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল! অরুণ সভয়ে দেখিল ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষ পত্রের মধ্যে দিয়া দুইটী ক্ষুদ্র চক্ষু জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, আর ভীষণ লক লক্ জিহ্বা থাকিয়া থাকিয়া সম্প্রসারিত হইতেছে! অতি ক্ষুদ্র সাংঘাতিক অরুণেরও প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া লোকটাকে সাবধান করিবার ইচ্ছা হইলেও তাহার কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া গেল, হাতে বন্দুক এবং পকেটে পিস্তল থাকিতে থাকিতেও তাহার হস্ত যেন মন্ত্রৌষধিস্তম্ভবীর্য্য হইয়া গেল। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে অরুণ দেখিল, প্রকাণ্ড অজগর সর্প ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে গাছের ডাল হইতে সর সর করিয়া ঝুলিয়া পড়িল এবং সেই নতজানু জঙ্গলী লোকটাকে অষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিল। তখন সেই লোকটা যে ভয়ঙ্করী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, এবং তখন তাহার চোখে মুখে যে ভয়ঙ্কর ভীতিচিহ্ন প্রকটিত হইল, তাহা অরুণ ইহজন্মে বিস্মৃত হয় নাই। কালান্তক যমের মত সেই পাহাড়ী মহাল স পযতই পাকে পাকে সেই হতভাগা জঙ্গলী লোককে বন্ধন করে, ততই তুলিয়া তুলিয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে, এবং যতই সেই লোকটা ভয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করিতে থাকে, ততই সেই অজগর তাহার মুখের সম্মুখে মাথা তুলিয়া ছুরিকে থাকে ও দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া তাহার মুখ স্পর্শ করিতে থাকে।

লুবাং পাশি সেই লোমহর্ষণকর দৃশ্য দেখিয়া উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া জঙ্গলের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিল, মোরের হাত হইতে ভোজালি খসিয়া পড়িল, অতি বড় দুর্দ্ধর্ষ মোরেও ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। অরুণও প্রথমটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল, তাহার পর সে যখন দেখিল সাপে মানুষে অদ্ভুত লড়াই হইতেছে, তখন তাহার চৈতন্য হইল, সে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হইল।

জঙ্গলীর নাগপাশ ক্রমে যত আঁটিয়া বসিতেছিল, ততই সে যন্ত্রণায় পাগলের মত হইয়া ভোজালির ঘায়ে সাপটাকে জখম করিবার চেষ্টা করিতেছিল; তাহার পাদদ্বয় ও শরীরের কতকাংশ নাগপাশে বদ্ধ হইলেও হাত দুইটি বন্ধন মুক্ত ছিল। ভয়ে তাহার লক্ষ্য বার বার ভ্রষ্ট হইতেছিল, সর্পও ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বুকে ও মুখে ছোবল মারিয়া কামড়াইয়া ধরিতেছিল এবং মাঝে মাঝে এক এক ছোবল মাংস তুলিয়া লইতেছিল। সে অতি ভয়ঙ্কর বিভৎস দৃশ্য!

অরুণ আর সেই দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "হাতের ভোজালি ফেলে দিয়ে চুপ ক'রে থাক, সাপটা একবার মাথা স্থির করে দাঁড়ালেই ওকে মেরে ফেলছি।"

কিন্তু চোরা ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবে কেন?

উত্তর-স্বরূপ সেই জঙ্গলীটা তাহার অবোধ্য মাতৃভাষায় কতকগুলা রাগের কথা উচ্চারণ করিয়া ভোজালি খানা অরুণকে ছুড়িয়া মারিল। পরমুহূর্ত্তেই অরুণ সবিস্ময়ে দেখিল, জঙ্গলীটাকে সাপটা বার বার ছোবলাইতেছে, জঙ্গলীটাও সাপটাকে নখে ও দাঁতে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিবার চেষ্টা করিতেছে, লোকটার মুখ দিয়া যথার্থই ফেনপুঞ্জ নির্গত হইতেছে। সাপ ও মানুষ এত নড়িতেছে যে, সাপটাকে লক্ষ্য করিবার সুবিধা হইতেছে না, তাই অরুণ বন্দুক তুলিয়াও গুলি ছুড়িতে পারিতেছে না, ছুড়িলে তাহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া লোকটা নিহত হয়। অথচ সেই দৃশ্যও তাহার চোখে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাহাকে সেই ভ্রূণ বিদারক দৃশ্য দেখিতে হইল না। সাপে-মানুষে লড়াই হইতে হইতে সাপ ও মানুষ ক্রমে ক্রমে হটিয়া একবারে নদীতটে উপস্থিত হইয়াছিল। জঙ্গলীটা একবারে নদীর ইচ্ছপাড়ে পা দিবামাত্র তাহার পায়ের ভরে কতকটা মাটী খসিয়া পড়িল এবং অরুণ চীৎকার করিয়া সাবধান করিতে না করিতেই সাপ ও মানুষ সশব্দে নদীর উচ্চ পাড় হইতে নদীগর্ভে পড়িয়া গেল।

অরুণের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এমন ভয়াবহ মৃত্যু সে জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। সে লক্ষ দিয়া নদীতটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মানুষ বা সর্পের চিহ্নমাত্র নেই, কেবল তটের সন্নিহিত স্থানিকটা নদীবারি ঘোলা হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই স্থানটায় তখন নদীজল আলোড়িত হইতেছে। ওঃ কি ভয়াবহ পরিণাম।

এতক্ষণ অরুণের অন্যদিকে লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু এইবার সে যখন জঙ্গলের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন আর মোরেকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু আজ মোরেকে সদলবলে ধরিতেই হইবে, আজ তাহার দল ভাঙ্গিতেই হইবে। অরুণ দ্রুতপদে ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া মোরের আড্ডার অভিমুখে চলিল। জঙ্গল ছাড়াইয়া ফাঁকা স্থানে উপস্থিত হইয়া সে একটা গাছের আড়াল হইতে দেখিতে পাইল, গুদামের ঘাটে তিন চারিখানা কোন্দা বাঁধা রহিয়াছে এবং উহার মধ্যে একখানায় মোরে ও বিনায়ক বসিয়া আছে, মোরের লোকজন কাঠের বাক্স ও অন্যান্য দ্রব্য বোঝাই করিতেছে; মোরে অঙ্গুলি সঙ্কেতে বিনায়ককে অরুণের অবস্থান-স্থানের দিকে দেখাইয়া দিতেছে। অরুণ লক্ষ্য দিয়া নদী অভিমুখে অগ্রসর হইবামাত্র মোরে সদলবলে, কোন্দায় চাপিয়া কোন্দা ভাসাইয়া দিল। অরুণ পকেট হইতে বংশীধ্বনি করিবামাত্র অরুণের লোকনারায়ণ হইতে বহির হইয়া আসিল; কিন্তু নদীর স্রোতে কোন্দাগুলি অদ্ভুত ভাসিয়া গিয়াছে। অরুণ বন্দুক উঠাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, জগন্নাথ মোরে! এখনই ঘাটে নৌকা লাগাও, না হইলে তোমাদের সকলকে গুলি করিয়া মারিব।"

উত্তরস্বরূপ মোরে পিশাচের মত অট্টহাসি হাসিয়া তাহাকে ঘুষি ও লাথি দেখাইতে লাগিল এবং নৌকা আরও তফাতে লইয়া গেল।

মোরের দল অদৃশ্য হইলে অরুণ বিষণ্ণমনে গুদামে প্রবেশ করিল। সেখানে অরুণের কিছুই নাই, মোরে সমস্তই সরাইয়াছে, বোধ হয় দামী জিনিষ যাহা ছিল, তাহাও সব সইয়া গিয়াছে। লুবাং পাশিই বুদ্ধির দোষে আর উদ্দেশ্য বিফল করিয়াছে, অরুণের এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইল, বোধ হয় সেই ভয়ে সে দেখা দিতেছে না। অরুণ অনুচরগণের মধ্যে সকলকেই পাইল, কেবল তাহার কোনও সন্ধান পাইল না। অরুণ মোরের আড্ডায় আগুন ধরাইয়া দিয়া নিজের কোন্দায় ফিরিয়া আসিল।

বাসায় ফিরিয়া অরুণের মনটা আরও অধিক অসহ্য হইল। একটা কাজে লাগিয়া থাকাতে এতক্ষণ মৈথিলীর শোক ও অনিগার চিন্তা হইতে সে কতকটা অব্যাহতি পাইয়াছিল; কিন্তু সন্ধ্যার

পর ঘরে নির্জ্জনে সেই দুইটাই দ্বিগুণ তেজে তাহার মনকে আলা দিতে লাগিল।

গঙ্গা আসিয়া দাঁড়াইতেই অরুণ জিজ্ঞাসা করিল —লুবাং পাশি এসেছে?"

গঙ্গা বলিল, "না দাদাবাবু, সবাই এসেছে, কেবল সেই আসে নি।" বলিয়া গঙ্গা রসুই করিতে চলিয়া গেল। অরুণের একটা দুর্ভাবনা হইল। লুবাং গেল কোথায়? নিশ্চয় তার বিপদ আপদ হয়েছে, সে নিশ্চয় মোহের হাতে ধরা পড়েছে।

সেদিন অরুণ বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিল, সেই জন্য আহারাদির পর শয়ন করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ সে ঘুমাইয়াছিল সে জানে না, কিন্তু প্রায় শেষরাত্রে যখন পুরা দমে উষোদয় হইতেছে, তখন একটা অদ্ভুত মোরগের ডাকে তাহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। এইরূপ তিনবার ডাক শুনিবার পর অরুণ শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। ডাকটা ঠিক তাহার শিয়রের জানালার বাহিরেই হইতেছিল। হঠাৎ অরুণের মনে হইল ঐ ডাকটা অস্বাভাবিক, সে অনেকবার আবরণগকে ঐরূপ কোরগ ডাকিয়া পরস্পর সঙ্কেত করিতে শুনিয়াছে।

তখনই অরুণ ক্ষিপ্রগতিতে শয্যাত্যাগ করিয়া শিয়র হইতে পিস্তল লইয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। জানালা খুলিবামাত্র অরুণ সবিস্ময়ে দেখিল, প্রখর প্রভাতালোকে দাঁড়াইয়া একবীর্য মনুষ্যমূর্ত্তি! অরুণের রোমাঞ্চ হইল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "কে তুমি? যেই হও, এখনি জবাব না দিলে গুলি করিব।"

তখন সেই মূর্ত্তি ভূতলে জানু পাতিয়া বসিয়া যোড়হস্তে সকাতরে বলিল, "আবু, আমায় চিনতে পাচ্ছ না? আমি লুবাং পাশি। শিগ্‌গির দোর খোল, বড় ভয়ানক সংবাদ নিয়ে এসেছি।"

অরুণ দ্বার খুলিয়া দিল, লুবাং পাশি ঘরে প্রবেশ করিয়াই ভীত উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল,"আবু শিগ্‌গির পালাও, এখনই সিঃাং আগো হেড় চলে যাও, ভয়ানক বিপদ।"

অরুণ কথামাত্রও বিচলিত না হইয়া বলিল, "পালিয়ে যাব? কেন? কি বিপদ? তোর ত' কোন বিপদ হয়-নি?"

লুবাং বলিল, "সব বলতে গেলে অনেক সময় যাবে, তার মধ্যে তারা এসে পড়বে। এতক্ষণে হয় তারা নদী পার হচ্ছে।"

"তারা? কারা?"

"সে অনেক কথা। মোরের পরামর্শে চেমনা গালঙ তাদের গ্রাম থেকে আরও লগ্গা নিয়ে আসছে। তারা দলে পঁচশ জনের কম হবে না। মোরে, বিনায়ক আর চেমনা তাদের খুব পকাই খাইয়েছে, খুব লুটের লোভ দেখিয়েছে, তারাই তাদের চালিয়ে নিয়ে আসছে। তোমায় প্রাণে মারাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য, পালাও আবু, এখনই পালাও, নইলে তোমার পায়ে মাথা কুটে মরব।"

অরুণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি পালাব, আর যারা রইল, তাদের উপায়? এই সব ছেলে মেয়ে, এই সব স্ত্রীলোক—"

"আবু, তাদের দেখতে গেলে আর সময় থাকবে না। আমি লুকিয়ে ওদের সঙ্গ নিয়েছিলুম, গালঙ্গদের গ্রামে গিয়েছিলুম, তাদের সব পরামর্শ শুনে এসেছি। তারা কেবল তোমায় মারতে চায় আর লুঠতরাজ করতে চায়।"

"তা বুঝলুম, কিন্তু পচাই খেয়ে গালঙ্গ আবার লুঠ তরাজের সময় কারুর প্রাণ রাখবে কি? সে যা করতে হয় আমি করবো, তুমি যাও, কারখানার সকলকে জাগাও, সকলকে সেখানে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলগে। আমি—"

"আবু, ঐ শোন, গালঙ্গদের ঢাকঢোল বাজছে, বোধ হয় একদল নদী পেরিয়েছে। এখনও সব পেরোয় নি, এখনও পালাও আবু—"

অরুণ দৃঢ়স্বরে বলিল, "লুবাং, তোকে যা বললুম

তাই কর, আমি এখান থেকে এক পাও নড়বো না।"

লুবাং চলিয়া গেলে অরুণ গঙ্গাকে তুলিল এবং কোঠারে দম্পতী ও অন্যান্য পরিবারকে কারখানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিল। গঙ্গা বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু অরুণের ধমকে সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সকলকে ডাকিতে ছুটিল। অরুণ ক্ষিপ্রহস্তে নিজের মূল্যবান কিছু কিছু দ্রব্য এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কারখানায় উপস্থিত হইল। তখন সেখানে বিস্তর লোক জমায়েৎ হইয়াছে। অরুণ কারখানার মধ্যস্থ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য ঘরে স্ত্রীলোক বৃদ্ধ ও বালক বালিকাগণকে পুরিয়া চারিদিকে প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দিল এবং প্রত্যেক প্রবেশ পথে সশস্ত্র পাহারা রাখিয়া দিল। এতদ্ব্যতীত সে তাহার শাকবেদগণের মধ্য হইতে কয়েকজন বাছা বাছা লোককে প্রাচীরের স্থানে স্থানে লুকাইয়া থাকিতে আদেশ করিল। সে আদেশ দিয়া রাখিল, শত্রু প্রাচীরের অত্যন্ত সন্নিহিত হইবার পূর্ব্বে কেহ যেন একটীও অস্ত্র নিক্ষেপ করে, শত্রু তাহাদিগের উপর অজস্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেও নহে; পরন্তু সে নিজে যখন পিস্তল বা হুলুকের আওয়াজ করিবে, তখন সকলে এক সঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে। সে সকলের নিকটে হাসি হাসি মুখে সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। ইহার বহুপূর্ব্বেই সে দুইজন লোককে অশ্বপৃষ্ঠে সাড়িয়ার উদ্দেশে পাঠাইয়াছিল; তাহাদের নিকট সে সাড়িয়ার পোলিটিকাল অফিসার ও মিলিটারী পুলীশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে চিঠি দিয়াছিল।

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। তখন পূর্ব্বদিক রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। সেই ক্ষীণ আলোকে কারখানার রক্ষকরা সবিস্ময়ে দেখিল ভীষণ আওয়াজে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া চিত্র বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইয়া পিশাচের ন্যায় নৃত্য ও চীৎকার করিতে করিতে আবরের দল কারখানার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে তাহারা অরুণের বাসা লুঠ করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, তাহা হইতে ধূমরাশি আকাশ মার্গে উত্থিত হইয়াছে। এ সকল কার্য্য সমাধার পর রাক্ষসেরা কারখানার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে।

অরুণের আদেশমত রক্ষকেরা নিশ্চেষ্ট রহিল। এই দারুণ নীরবতা যে ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ তাহা মূর্খ আবরেরা বুঝিতে পারিল না। তাহারা দলপতি মোরের নিষেধ সত্ত্বেও লুঠের লোভে উন্মত্তের মত কারখানার প্রাচীরের উপর চড়াও হইল। বাঘ শোঁ শোঁতের আস্বাদ পাইলে যেমন হয় কয়েকখানা গৃহলুঠ ও দাহ করিয়া তাহাদের তখন ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। তাহারা প্রাচীরের মধ্যে অসংখ্য তীর বর্ষণ করিল, পরে খুঁকরি ভোরালি ও কুঠার দ্বারা আঘাত করিয়া প্রাচীর ভেদ করিবার চেষ্টা করিল।

অকস্মাৎ গগন মেদিনী কাঁপিয়া দুদ্দুম করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবরগণের উপরে একসঙ্গে সহস্র অস্ত্রবৃষ্টি হইয়া গেল। কারও বুকে কারও পৃষ্ঠে কারও চক্ষে বাণ বিঁধিল, ভীষণ বজ্রমের খোঁচায় কাহারও ভবলীলা সাঙ্গ হইল। প্রথম বাধা পাইয়া অবশিষ্ট আবরেরা ভীষণ চীৎকার করিয়া নদীতটাভিমুখে পলায়ন করিল। তখন তাহাদের দলপতিরা তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া নানারূপে আবার উৎসাহিত করিয়া ফিরাইয়া আনিল। এবারও সেইরূপ সুযোগ মত পিস্তলের আওয়াজ হইল, অমনই আবরেরাও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। এইরূপ বার বার পাঁচ সাত বার হইবার পরে যখন আবরদের মধ্যে অনেক যোদ্ধা হতাহত হইল, তখন তাহারা আর বহুক্ষণ ফিরিয়া আসিল না। তাহারা অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া খুনখারাপি ও লুঠতরাজ করিবে, এইরূপ কথা ছিল। তাহাদের শত্রু যে এমন সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া

তাহাদের জন্য আয়োজনাদি লইয়া অপেক্ষা করিবে, ইহা জানিলে তাহারা কখনও এই কার্য্যে অগ্রসর হইত না।

কিন্তু রক্ষকদিগের মধ্যেও অনেক লোক ক্ষয় হইয়াছিল। অরুণ চিন্তিত হইল। তাহার লোকবল সামান্য। এইভাবে সংঘর্ষ চলিলে, সে কতক্ষণ কারখানা রক্ষা করিতে পারিবে? আবরেরা আপাততঃ নদীতটে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এইবার তাহারা নিশ্চিতই দলে পুষ্ট হইয়া আসিবে। তাহাদের সকল যোদ্ধা নদী পার হইতে পারে নাই বলিয়া তাহারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে মাত্র। সাড়িয়া হইতে সাহায্য যথাসময়ে আসে কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ তাহার অধীন কয়েকজন রক্ষীর মধ্যে ভয় ও চিন্তাচাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এ অবস্থায় এতগুলি স্ত্রীলোক ও বালকবালিকার রক্ষার ভার গ্রহণ করা কি যুক্তিযুক্ত? তাহা হইতে ইহাদিগকে কতক রক্ষীর সাহায্যে সাড়িয়ায় রওনা করিয়া দিলে হয় না?

যেমন চিন্তা, তেমনই কার্য্য। অরুণ মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিল না, নিমেষের মধ্যে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিল। তখন দুই এক অঙ্গে আহত হইয়াছিল। যখন সে সেই রক্তাক্ত শরীরে কোঠারে দম্পতীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সাড়িয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল, তখন তাহারা কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অরুণ কোনও ওজর আপত্তি শুনিল না, সকলকে পাঠাইয়া দিল।

যাত্রাকালে অরুণ চুপি চুপি গঙ্গার হাতে একখানি বই দিয়া বলিল, "গঙ্গা, এইখানা তোর দিদিমণিকে দিস, এরানা তারই বই, তুই জানিস ত'?"

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গা ও কোঠারে দম্পতী বিদায় লইল। কোঠারের বর্ষিয়সী পত্নী অরুণের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিল, "বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুস্থ শরীরে নিরাপদে ঘরে ফিরে এস। আমি যদি এতদিন যথার্থ কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করে থাকি, তা হলে নিশ্চয় জেনো, আমার এ আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না। বাবা, তোমার মত ছেলে যিনি গর্ভে ধরেছিলেন, তিনিও স্বর্গ হ'তে তোমায় রক্ষা করছেন, তোমার কোনও ভয় নাই।"

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। এ দিকে অরুণ দেখিল, পঙ্গপালের মত অগণিত আবর যোদ্ধা তীর ধনু ও অসি চর্ম্মে রঞ্জিত হইয়া রণবাদ্যের সহিত তালে তালে লম্ফ দিয়া নাচিতে নাচিতে কারখানার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের সমস্বরে ভীষণ জয়োল্লাধ্বনিতে জলস্থল প্রকম্পিত হইতেছে, তাহাদের বিরাট মূর্ত্তি ও তাতারিক বিভৎস্য সাজসজ্জা সূর্য্যকরে স্পষ্টই দৃষ্ট হইয়া দর্শকের মনে ভয় ও ঘৃণার সঞ্চার করিতেছে। রক্তপিপাসু নর-রাক্ষস আবর একবার রক্তের আস্বাদ পাইয়া বনের বাঘ অপেক্ষাও ভীষণ ও হিংস্র হইয়াছে, এবার তাহারা সহজে ফিরিয়া যাইবে না। অরুণ বুঝিল, খুব সম্ভবতঃ এই তাহার শেষ দিন। মরণ ত' হইবেই, মানুষ হইয়া মরণের হাত কে এড়াইতে পারে? কিন্তু তবুও মরণের পূর্ব্বে অতি বড় দুর্জ্জয় সাহসীরও বুকটা একবার কাঁপিয়া থাকে,—ভয়ে না হউক, অন্ততঃ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা শেষ একবার দপ্ করিয়া মনের মাঝে জ্বলিয়া উঠে। কত কথা মনে পড়িল, ফুলযৌবনে এ সংসারের মায়ার ডোর কাটিয়া যাওয়া কি সহজ কথা? বড় খেদ—দেখা হইল না; স্নেহময় পিতা, অভিন্ন হৃদয় বাল্যসুহৃৎ সরোজ—আর—সেই—যাহার মূর্ত্তি অনুক্ষণ সে হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে—আজ তাহারা কোথায়? আর মুহূর্ত্তপরেই এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধূলিকণায় মিশাইয়া যাইবে—আর ত' দেখা হইল না!

অরুণের দিবাস্বপ্ন নিমিষেই মিলাইয়া গেল, চারিদিক হইতে বর্ষার বারিধারার মত তীব্রদৃষ্টি হইতে লাগিল, অসংখ্য সড়কি, বল্লম ও কুঠারের অবিশ্রান্ত আঘাতে কাঠের শক্ত বেড়াও কাঁপিয়া কাঁপিয়া হেলিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে যুদ্ধ চলিল; কিন্তু আর বুঝি শত্রুকে বাধা দেওয়া যায় না; কাঠের বেড়া একস্থানে হেলিয়া পড়িল। তখন অরুণ নিজের লোকজনকে শুনাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আর রক্ষা নাই, যাঁর ইচ্ছা সে এখনও এই স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাউক।" অরুণ এই কথা বলিয়া যেখানে বেড়া জখম হইয়াছিল, লম্ফ দিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার বন্দুকের অগ্নিবর্ষণে সেই স্থান মুহূর্ত্ত মধ্যে জনশূন্য হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও দুই তিন স্থানে বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল; অমনই বিজয়োল্লাসোন্মত্ত আবর যোদ্ধৃগণ ভীষণ চীৎকার করিয়া কারখানার ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠনরাজ আরম্ভ করিল; কিন্তু জগন্নাথ মোরে বিশ ত্রিশজন অনুচর সঙ্গে অরুণের প্রতি ধাবমান হইতে, তাহার দলে অরুণ বিনায়ককেও দেখিতে পাইল, তাহার অঙ্গে অরুণেরই পিস্তল। অরুণ মাত্র পাঁচজন অনুচরকে লইয়া কয়াতকল-ঘরটাকে পশ্চাৎ করিয়া মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে সে মোরেকে লক্ষ্য করিয়া লইল। মোরে যেমন দলবল সঙ্গে তাহাকে আক্রমণ করিতে লম্ফপ্রদান করিয়া অগ্রসর হইবে, অমনই দুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। অরুণের অব্যর্থ সন্ধানে মোরে দূর হইতেই আহত হইয়া একবার আকাশে দুই হাত তুলিয়া লাফাইয়া তুলার বস্তার মত ভূতলে পড়িয়া গেল, মোরের ইহলীলা সাঙ্গ হইল। তখন বিনায়ক তাহার স্থান পূর্ণ করিয়া আবরগণকে লইয়া তাহার বিপক্ষে ধাবমান হইল। অরুণ ইচ্ছা করিলে তদ্দণ্ডেই বিনায়ককে মোরের পথে পাঠাইতে পারিত; কিন্তু একবার বন্দুক উঠাইয়াই লক্ষ্য নামাইয়া লইল। বোধ হয় তখন মৈথিলীর মুখ মনে পড়িয়াছিল, তাই বিনায়ককে মারিতে গিয়াও তাহার হাত কাঁপিল। বিনায়ক পরের পরামর্শে মন্ত্রচালিতবৎ কাজ করিয়াছে, তাহার মাথার ঠিক ছিল না; সুতরাং তাহাকে মারা হইবে না। অরুণ যখন এই কথা ভাবিতেছে, তখন শত্রুরা তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অরুণ তখন পিস্তল উঠাইয়া যাহাকে সম্মুখে দেখিল তাহাকে গুলি করিতে লাগিল; এত কাছে অব্যর্থ-সন্ধান দেখিয়া ধাবমান আবরেরা থমকিয়া দাঁড়াইল; একবার সম্মুখভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া বিপরীত দিকে দৌড়িল; বিনায়ক তাহাদিগকে নানা উৎসাহ বাক্যেও সম্মুখে ফিরাইতে পারিল না। তখন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় বিনায়ক একাকীই পিস্তল উঠাইয়া অরুণের প্রতি ধাবমান হইল, কিন্তু দুই এক পদ অগ্রসর হইতামাত্র কোথা হইতে একটা তীর আসিয়া তাহার চক্ষে বিদ্ধ হইল, বিনায়ক সশব্দে ভূতলশায়ী হইল। অরুণ তাহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু নানা ক্ষত মুখ হইতে অবিরল রক্তস্রাবে সে দুর্ব্বল ও কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মাথাটা কেমন ঘুরিয়া গেল। পরন্তু সম্মুখে পরবিক্ষেপ করিবামাত্র সে একটা মৃতদেহে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সেই সময়ে বিজয়োল্লাসোন্মত্ত আর একদল আবরসেনা কারখানা লুঠ করিয়া বাদ্য ও নৃত্যের সহিত প্রাঙ্গণে ছুটিয়া আসিতেছিল; তাহারা সেই স্থানটায় পতিত হতাহতকে দলিত মথিত করিয়া চলিয়া গেল।

এই শোচনীয় ঘটনার তিন ঘণ্টা পরে একদল সুসজ্জিত অশ্বারোহী মিলিটারী পুলিশ সেই স্থানে উপস্থিত হইল; তাহাদের দলপতি একজন ইংরেজ সেনানী, তিনি একটী বৃদ্ধ দেশীয় লোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন, তিনি পুরুষোত্তম কোঠারে।

ইংরেজ সেনানী মহাশয় অতি ভদ্রলোক। তিনি চারিদিকে হতাহতের মধ্যে জীবিতগণকে অনুসন্ধান করিবার আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং কোঠারের সহিত তাহাদের মধ্যে অরুণের সন্ধান করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ অনুসন্ধানেও কোন ফল হইল না। ক্রমে কোঠারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে একজন পুলীশ-সেনা চীৎকার করিয়া বলিল, সে একটী বন্দুক পাইয়াছে, বন্দুকটা নিশ্চিতই কাংখানার। কোঠারে উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া বন্দুকটী হাতে লইলেন এবং বন্দুক অরুণের বলিয়া চিনিয়াই সকলের সঙ্গে সেই স্থানটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে একস্থানে অরুণের একটী সোণার পেন্সিল পাওয়া গেল; বোধ হয় সেটা হতাহতের দেহের আড়ালে লুকাইয়া ছিল, কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

কিছুক্ষণ পরেই একটী সিপাহী কতকগুলি মৃতদেহ সরাইতে সরাইতে একটী জিনিষ দেখিয়া বিস্ময়-ধ্বনি করিয়া উঠিল। সকলে সভয়ে দেখিল, সেই মৃতদেহ মস্তকহীন! এইরূপ মস্তকহীন দেহ যে আর ছিল না এমন নহে, কেন না আবহেরা মৃত হলে মাথা কাটিয়া লইয়া যায়, ইহাই তাহাদের প্রথা। তবে এই দেহে অন্যান্য দেহের ন্যায় সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল না। কোঠারে তাহার পরিহিত কোট দেখিয়াই হায় হায় করিয়া উঠিলেন,—সেটা যে অরুণের কোট! তাহার আকার প্রকারও অরুণের মত! কোঠারের আর সন্দেহ রহিল না, তিনি বুঝিলেন অরুণ তাঁহাদেরই রক্ষার্থ নিজের জীবন বলি দিয়াছে। কোঠারে বালকের মত ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

(ক্রমশঃ)

ক্ষণিকে অসীম

(শ্রীলীলা দেবী)

(শুধু) তেমনি ক'রে নয়নপরে
আধেক্ চেয়ে,
তেমনি ক'রে—বিরাগ ভরে
একটু গেয়ে—
পাশ দিয়ে মোর যাও গো চ'লে,
নিঠুর হে মোর হৃদয় দ'লে,
মন্দ মধুর হিলোল তুলে
জীবন বেয়ে—
তেমনি ক'রে নয়ন পরে
আধেক্ চেয়ে।

(শুধু) তেমনি ক'রে নিমেষ তরে
পথের মাঝে,
মুখের পানে নীরব গানে
চকিত লাজে—
চাইবে তুমি জাগিয়ে তৃষা,
দূলের বাসে মাতিয়ে নিশা,
ডালিম-রাঙা দুই কপোলে
নিশান ছেয়ে—
তেমনি ক'রে নিমেষ তরে
আধেক্ চেয়ে।

(শুধু) তেমনি ক'রে পাগল ঝড়ে
ঝিলিক্ মেরে,
পলক লাগি দরশ মাগি
পাইনা যে রে—
সেই যে পাওয়ার একটী নিমিখ,
অসীম সে যে নয় সে ক্ষণিক,
নিখিল-জোড়া কামনা তায়
মিটবে পেয়ে—
তেমনি ক'রে নয়ন পরে
আধেক্ চেয়ে।

ভাগের পূজা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী-সরস্বতী।]

(পূর্ব্ব পূজারীগণ :—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া (২) শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার; (৩) শ্রীমতী সরসীবালা বসু (৪) শ্রীযুক্ত বিধুপতি চৌধুরী এম-এ, (৫) শ্রীমতী চারুবালা বসু, (৬) শ্রীযুক্ত অজয়কুমার সেন, (৭) শ্রীমতী লীলা দেবী, (৮) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (৯) শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, (১০) শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায় (১১) শ্রীমতী গিরিবালা দেবী, (১২) রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, (১৩) শ্রীমতী স্নেহশীলা চৌধুরাণী, (১৪) শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি. এ,।

কমলের কথা

দেশে ফিরে এসেছি। মা-ও চ'লে এসেছেন! বাঁচা গেছে! কলকাতা যার ভাল লাগে, লাগুক, আমার আর ভাল লাগে না।

সংসারটা যে কি রকম তা আজ ও বুঝে উঠতে পারছি নে। আমি একে যত চিনতে যাই এ ততই দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে। সংসার কি সত্যই এমনি, না শুধু আমার কাছেই এমনি?

ভাবি—ভগবান কি না দিয়েছেন আমাকে, সবই দিয়েছেন, নিজে ইচ্ছে করে যদি আমি তা নষ্ট করে ফেলি তার দায়ী তো তিনি নন্! তিনি শুধু দেখে যাবেন, আমার কাজের ফল ঠিক কর্‌বেন, দায়ী হবেন না।

অমল এখানে এসে বেশ ছিল, আমি ও তার সঙ্গে মিলে বেশ দিনগুলো কাটিয়ে দিতুম। বলতে কি—এই সময়টাতেই আমি মনে যথার্থ শান্তি পেয়েছিলুম, আর কখনও এমন শান্তি পাই নি। আমার হাত খুড়োমশাই হঠাৎ একদিন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছলেন, তাঁর সাড়া সে সময়টায় পাই নি। পরে শুনেছিলুম তিনি নাকি দুশ্চরিত্র অমলকে ও নষ্ট করবার ফন্দিতে ছিলেন, তার কোমল মাথাটী চর্ব্বন করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু অমলের তাড়া পেয়ে একদম গা ঢাকা দিয়েছিলেন। অমল এক একবার আমার গা চাপড়িয়ে হাসতে হাসতে বলত রাহুমুক্ত চাঁদের আলোর মত তোমার আলো ছড়িয়ে পড়ুক ভাই, দেশটা শান্ত হোক।

এ দিকে ভাইয়ের মত অমল, ও দিকে দেবী-রূপিণী মা, এরা দুজনে আমার শুষ্ক হৃদয় নদীতে তুফান উঠিয়েছিলেন। প্রতিদিন একবার করে মাকে আমার দেখে আসা চাই-ই। যদি কোন দিন না যেতে পারি, আমার মনে হয় সেদিনটা আমার সম্পূর্ণ মিছে হয়ে যেত।

প্রসাদ আমার কাছে অনেক কথা গোপন করে যেত, যেন সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারত'না। আমি তার মনের মধ্যে থেকে তার ভ্রান্ত ধারণাটা কিছুতেই দূর করতে পারি নি। দেখলুম, মানুষের মনে একবার অবিশ্বাস জন্মে গেলে কিছুতেই আর তা দূর করা যায় না। মালতীকে আমিই যে নিয়ে গেছলুম এ কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক না জানলেও প্রসাদ আমায় বিশ্বাস করে নি। মুখে সে ভদ্রতা দেখালেও তবে তার মনের কোনখানে যে এই অবিশ্বাসটা জেগে ছিল তা আমি বেশ বুঝতে পারলুম। দেশের জমিদার রূপে দেশের সেবার জন্যেই সে আমায় পাশে ডেকে নিয়েছিল, অমল কেমন ভাইয়ের মত পরিপূর্ণ স্নেহ দিয়ে আমায় বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল, সে তেমন করে নিতে পারে নি।

না নিক্, তাতে আমার একটুও ক্ষতি নেই। আমি তাই পেয়েছি মা পেয়েছি, আমার বুক ভরে গেছে, তার মেহ ভালবাসা আমি চাই নে। আমি সত্যকে চিনেছি, আমি সত্য পথের পথিক হব, আর কিছু দরকার নেই, আর কিছু আমি চাই নে।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা। সারাদিন অবকাশ পাই নি, অন্য গ্রামে গেছলুম অমলের সঙ্গে, প্রসাদ যায় নি, তার এ দিকে কাজ ছিল। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরেই অমলকে বললুম একটু বস ভাই, আমি স্নান করে আসছি।"

সে আপত্তি করবার আগেই আমি বেরিয়ে পড়লুম।

আপন মনে চলছিলুম বেশ, সন্ধ্যার তরল আঁধার তখন গ্রামের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে, দূর দেবালয়ে আরতির শঙ্খ ঘন্টা বেজে উঠেছে, উজ্জ্বল আকাশটী আস্তে আস্তে মলিন হয়ে আসছিল তাই দেখতে দেখতে আমি চলেছিলুম। বাগানটার কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালুম, এ বাগানটা প্রসাদদেরই। দেখলুম গাছের নিচে অন্ধকারের মধ্যে কে বসে। আমার পাশেই ছিল সে, একটু ভাল করে দেখতেই চিনতে পারলুম সে মালতী।

চাপা কান্নার শব্দ আমার কাণে ভেসে আসছিল, আমি তাই দাঁড়ালুম। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলুম কেন সে কাঁদছে? তবে কি মা কিছু বলেছেন?

মা কিছু বলবেন এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। সেই স্নেহময়ী দয়াময়ী মা, যাঁর মুখে একটী তিক্ত কথা কেউ কখনো শোনে নি, যাঁর রাগ করা একেবারেই কল্পনাতীত তিনি কিছু বলবেন? তবে—বোধ হয় প্রসাদ,—না, সে ও কিছু বলবে না। আমি প্রসাদকে চিনি সে কিছু বলতে পারে না, মায়েরই ছেলে ত সে।

ভাবলুম তাকে জিজ্ঞাসা করি কি হয়েছে, কিন্তু প্রথমটায় কিছুতেই কথা বলতে পারি নে, কে যেন গলা চেপে ধরলে। একি আমিই সেই—যে একদিন—

না থাক সে কথা, জোর করে এগিয়ে গিয়ে ডাকলুম "মালতী—"

সে চমকে উঠ্‌ল। আমায় সামনে দেখে উঠে দাঁড়াল, তার কোল হতে সাদা মত কি একখানা পড়ে গেল, সে দিকে সে চাইলে না, কিন্তু আমি চাইলুম।

আমি বল্‌লুম এখানে এই সন্ধ্যাবেলা একলা কাঁদছ কেন মালতী? কেউ তোমায় কিছু বলেছেন কি?

আমার কণ্ঠস্বরে করুণা ঝরে উঠেছিল কি কঠোরতা ঝর পড়েছিল তা সেই ই জানে। সে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝতে পারলুম তার বুকের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে—উত্তর দেবে কি না। খানিক পরে উত্তর দিলে—না, কেউ কিছু বলে নি।

কথাটা শেষ করে সে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলে গেল, আর একবার ফিরে ও চাইলে না।

আশ্চর্য্য হয়ে আমি তার পানে চেয়ে রইলুম। কি আশ্চর্য্য স্বভাবের এই মেয়েটী! আমি তাকে এ পর্য্যন্ত, চিনতে পারলুম না সে কি! আমায় সে ভারি অবহেলার চোখে দেখে, আমি যে একটা মানুষ তা সে কোন কালেই মানতে চায় নি, আজও মানলে না! এমন গর্ব্বিত ভাবে সে চলে গেল যে সেই গর্ব্বিত পা দু'খানার প্রতি ক্ষেপনের দাগটা যেন আমার বুকের মধ্যে গেঁথে গেল।

আত্ম সম্বরণ করে ফেললুম। ছিঃ, আবার মোহ, আমায় সব বিসর্জ্জন দিতে হবে, আমায় এ সব চিন্তা ভুলতে হবে যে। সে আমায় না মানুক, তাতে আমার কি? তার চোখে আমায় যে মানাতেই হবে এমন কোনও কথা হতে পারে না।

বুকের মধ্য হতে কে অধীর চিৎকার করে বলে উঠল—বৃথা আশ্বাস, একবার এখানটায় হাত

দিয়ে দেখ, তারপর কথা বলো। তুচ্ছ একটা নারী—সে কিনা তোমার মত একটা পুরুষকে এমন করে ঘৃণা করে চলে যায়?"

মা—রক্ষা কর, রক্ষা কর তোমার ছেলেকে, আমার চারদিকে বাঁধ দিয়ে রেখেছ, তুফান উঠছে, বাঁধ ভেঙ্গে গেলে আবার বান ডাকবে যে মা। ধর্ম্মরূপিণী, এসো মা শক্তিদায়িনী, দাঁড়াও, যেমন করে মহিষাসুরকে দলিত পেষিত করেছিলে, আমার বুকের এই দুর্দ্দান্ত রিপুটাকে তেমনি দলন কর মা।

বুকে জোর পেলুম। চলে যাচ্ছিলুম, চোখ পড়ল সাদা সেই বস্তুটার পরে। ভাল্‌লুম নেব না, স্পর্শ করব না; কিন্তু পারলুম সেটাকে আবার তুলে নিতে হল।

একখানা রুমাল, বুঝলুম এখানা প্রসাদের সেই বন্ধুদের রুমাল খানি; যেখানা সেদিন অমল নিজের হাতে সুত কেটে তাঁতে বুনে তার পর নিজের হাতে সেলাই করে প্রসাদকে উপহার দিয়েছিল।

এক মুহূর্ত্তে চোখের সম্মুখ হতে কালো পর্দ্দাটা খসে পড়ে গেল, সত্য আবিষ্কার হয়ে গেল। বুকে কিন্তু বড় আঘাত পেলুম তাই জড়ের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম।

সম্ভব—সম্ভব, জগতে সবই সম্ভব। মালতী প্রসাদকে ভালবাসতে পারে এ ও যেমন সম্ভব, আবার প্রসাদও যে মালতীকে ভালবাসতে পারে সে ও তেমনি সম্ভব। জগতে অসম্ভব কি আছে? কিন্তু তবু মন বললে এমন ধরণের সম্ভবতা সে আশা করে নি।

আগুন নিয়ে খেলা—হাত পুড়বে, অঙ্গ পুড়বে। প্রসাদ আগুন নিয়ে খেলতে বসেছে, তার সোণার ঘরে আগুন জ্বলে উঠেছে—এখন উপায়?

রুমালখানা পকেটজাত করলুম।

সেই দিন যে কি করে মার কাছে বলে ফেললুম প্রসাদদার সঙ্গে মালতীর বিয়ে দিলে কেমন হয় সে কথা বলতে পারি নে। চেয়ে দেখলুম মার জ্যোতিঃমণ্ডিত মুখখানা নিমেষে মলিন শবের মত হয়ে গেল, অনিমেষে তিনি আমার পানে চেয়ে রইলেন, তারপর বলে উঠলেন—ছিঃ কমল, ও কথা বলতে নেই।

সে কথা আমার বুকের মধ্যে গিয়ে এঁকে গেল। লজ্জায় আমি মাথা তুলতে পারলুম না, আস্তে আস্তে বিদায় নিয়ে বাড়ী এলুম।

তাই কি হতে পারে? এ ও কখনও সম্ভব হয়? মালতীর সঙ্গে প্রসাদের বিয়ে—সমাজ কখনই সহ্য করবে না। সমাজকে না মানলুম—মা কখনই সহ্য করতে পারবেন না। মার যে ঐ একটী মাত্র ছেলে আর মালতী, সে কত জায়গায় না পরিচিতা হয়ে গেছে।

রাত্রে ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম ভাঙ্গল সকাল বেলায়—প্রসাদের ধাক্কায়।

আঃ—কি ঘুমই ঘুমাচ্ছে অমল, একঘণ্টা ধরে ডেকে ডেকে আমার গলা ভেঙ্গে গেল। ওঠো, মুখ হাত ধুয়ে নাও, এখনি তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে!

আমি ধড়ফড় করে উঠে পড়লুম, তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে বললুম কোথায় যেতে হবে।

প্রসাদ বলিল—জমি জমা গুলো দেখতে অমল ঘুম ভাঙ্গতেই চলে গেছে, বেলা গাছে তোমায় নিয়ে যেতে। একটু জল খেয়ে নাও, ফিরতে দেরি হবে।"

প্রসাদের সঙ্গে বেরুলুম।

দুজনে পাশাপাশি চলছিলুম, প্রসাদ ধীর স্বরে বললে, তুমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে কমল মালতীর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে কেমন হয়? হঠাৎ তোমার এ কথা জিজ্ঞাসা করার মানেটা কি?"

সাহস করে চেয়ে দেখলুম তার মুখখানা বেশ শান্ত। তখন সব কথা খুলে বললুম, আর ও

বললুম, আমায় মাপ কোরো ভাই, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি কথাটা কতদূর অন্যায়।

প্রসাদ প্রসন্ন মুখে বললে, তোমার দোষ কি ভাই? তুমি ভাল কথাই বলেছিলে। মা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

বলতে বলতে সে থেমে গেল। আমি বললুম —তুমি কি বললে?

গম্ভীর স্বরে প্রসাদ বললে—একি হবার মত ভাই? বিয়ে কথাটা কি যেমন তেমন মুখের মত একটা কথা? জীবনের সঙ্গিনীরূপে যাকে স্কন্ধে গ্রহণ করতে হবে শুধু তার দিক আমার দিক দেখলেই চলবে না, দেখতে হবে যাকে আমার মাকে, নিতে হবে আগে তাঁরই মত। আমার বুক ভেঙ্গে গেলেও আমাকে মার আদেশ পালন করতে হবে। মা যদি বলেন কে তোর কাছে বড়, তোর জননী জন্মভূমি, না মালতী না আমি, আমায় অবশ্যই বলতে হবে সকলের আগে মা তুমি, তারপর আর সব। আমার মায়ের ছায়া জন্মভূমিতে, আর সেই নারীরই অংশরূপা সব। ভাই, আমার মা কি যেমন তেমন মা? আমার মা যে পূর্ণা মা, তিনি তো অসম্পূর্ণা নন যে তাঁর কথা ঠেলতে পারব। মালতীকে আমি ভালবাসি তা বলে তাকে গ্রহণ করতে পারব না। তাকে আজীবন এমনি ভালবাসার পত্নীরূপে কিন্তু আজ গ্রহণ করে বরণ করে আমার মায়ের চরে জলধারা বহাতে পারব না।

দেখলুম প্রসাদের চোখ ছল ছল করছে।

মালতীর কথা

আমার দেবতা—ওগো, তুমি আমারই একমাত্র দেবতা। আমি তোমায় ভক্তি করি, ভালবাসি, তোমার গায়ে একটী আঘাত লাগলে আমার বুকে গিয়ে তা বাজে। ওগো, আমি তো আশা করি নি তোমার আমার এত কাছে আসা, কেন তুমি এলে, কেন তুমি জানালে তুমি আমায় ভালবাস?

সে দিনকার সেই কথাটাই থেকে থেকে আমার কানে যেন বেজে উঠত—'বল মালতী বল, তুমি আমার হবে?

ছি, কিন্তু মনে ভাবতে বুকের ভেতর ভারি গোপনে একটা পুলকের শিহরণ বয়ে যেত, আমাকে তা অভিষিক্ত করে দিয়ে যেত। আমি জোর করে চাপতে চাইতুম—ছি-ছি, এ কি কথা, একে মনে আনা ও পাপ।

মা ছেলের কথাও আমি শুনেছিলুম। বুকের ভেতর আগুন জ্বলে উঠল! হায়, এমন করে নিজেকে নিঃস্ব দুর্ব্বল করে ফেললে তুমি, শুধু আমার জন্যে, ওগো, শুধু এই হেয়, ঘৃণ্য নারীর জন্যে।

কিন্তু তুমি দিতে এলে ও আমি নেব না। কেন নেব? যার হৃদয় আছে সে কখনও অন্যের জিনিষ এমন করে নিতে পারে না। নিঃস্ব হ'য়ে আসা সহজ কিন্তু নিঃস্ব করাটাই না কঠিন।

পিসীমার মুখখানা গম্ভীর দেখলুম, কেন, তা আমি অনুভবেই কতকটা বুঝলুম। এই পাপিয়সী নারীর জন্যে তাঁকে কত না সইতে হচ্ছে। ছেলের প্রতি নিষ্ঠুরা মায় হতে পারে না, ছেলে যদি সহস্র অকাজ করে মা তাকে আবার বুকের মধ্যে টেনে ধরবেনই। পিসীমা ও তো সেই মা।

কমলবাবু আর বড় একটা আসতেন না। সে দিন তাঁর চোখের সামনে ধরা পড়ে গিয়ে আমি যেন কেমন হয়ে গেছলুম, কি যে বলব তা কিছুই ঠিক করতে পারিনি। প্রসাদ বাবুর রুমাল খানা আমার কাছে ছিল, তাড়াতাড়িতে সে দিন কোথা যে হারিয়ে ফেলেছি তার কিছু ঠিক নেই।

পিসীমা প্রসাদ বাবুর বিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চারিদিকে একটা কুৎসা বেরিয়েছিল যাতে সবদ্ধ জোটাই দায় হয়ে উঠল।

সে দিন আমি ঘাটে গেছলুম জল আনতে; শ্রাবণের সে দিন নিকষ কালো মেঘ সেজে এসেছে

আষাঢ়ের বিকেল, বেলা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। পুকুরের জলে কালো মেঘের ছায়া এসে পড়ে আরও কালো দেখাচ্ছিল, তার ধারে ধারে বাবলা গাছে হলদে রঙের ফুল গুলো ফুটে উঠে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল, মুগ্ধনেত্রে চেয়ে দেখছিলুম, এমন সময় পেছনে কোমল স্বরে কে বলে উঠল "জল নিতে এসেছ বুঝি গয়লা বউ?"

তাকিয়ে দেখলুম প্রসাদবাবুদের পুরুত ঠাকুরের সেই মেয়েটী। এর মধ্যে কখন যে তার সেই ছোট শরীরটী যৌবনের তুলিস্পর্শে রঙিন হয়ে ভরে উঠছে তা আমি দেখি নি। অনেকদিন তাকে দেখি নি, বোধ হয় বছর দুই তিন হবে, তার বয়েস তখন ছিল বছর এগার বার, এখন বছর চৌদ্দ হবে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে সে একটু হাসলে, বললে"—আমায় ভুলে গ্যাছ নাকি বউ?"

আমি সামলে নিয়ে বললুম—না ভাই, ভুলব কেন? এতদিন বুঝি মামার বাড়ী ছিলে?"

মেয়েটি চোখ দু'টো আমার চোখের 'পরে স্থাপন করে বললে "হ্যাঁ, মামার বাড়ীতেই ছিলুম। কি করব, এখানে অত্যাচারে চোটে থাকতে পারলুম না যে। যে তোমাদের এখানে লোক সব—"

চকিতে আমার মনে ভেসে উঠল সে সব দেখেছিল, আমার ঘরে যে দিন অত্যাচার হয় সে দিন সে এসেছিল। আমি তাকিয়ে দেখলুম তার মুখখানা ভারি মলিন। জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার মা কোথা?"

তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। শুনলুম তার মা নেই, তিনি অনেকদিন আগে মারা গ্যাছেন মামা মাসী অনর্থক এ ভার সইতে রাজি হননি কারণ শরীর বিয়ের ভার তা হলে তাঁদের ঘাড়ে পড়ে। সংসারে এমনিই তো প্রায় হচ্ছে। দুবেলা ভাত দেওয়া যেতে পারে, পরনের ছেঁড়া কাপড়খানাও দান করা চলতে পারে, কিন্তু বিয়ে দেওয়াটা, তাতে অনেক খরচ পড়ে যায়, কাজেই বিয়ের আগে আত্মীয়রা ভার নিতে চান না। মামারা পরশু তাকে এনে তার কাকার কাছে দিয়ে গ্যাছেন, কারণ জাতটা তাঁদেরই; কলঙ্ক হলে তাঁদের কুলেই হবে, মামার কি, বিশেষ তাঁর বোনই যখন নেই।

মনটা ভারি কোমল হয়ে এ'ল! আগা অভাগিনী মেয়েটার সংসারের সঙ্গে এই বয়সেই বেশী রকম চেনা শোনা হয়ে গ্যাছে। জিজ্ঞাসা করলুম "কাকা কাকিমা ভালবাসেন?

শশী একটু হাসলে মাত্র, তার সেই হাসিতেই আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেলুম।

জল নিয়ে বাড়ী এলুম, মনের মধ্যে মেয়েটীর সুন্দর মলিন মুখখানা, তার দুঃখের কথা গুলো জাগছিল। আমি নিজে দুঃখ পেয়েছি বলেই তার দুঃখ এত সহজে আমার বুকে আঘাত করতে লাগল। যে ব্যথা পেয়েছে, সে ব্যতীত ব্যথিতের ব্যথা আর কেউ বুঝতে পারবে না। ধনী কি অভাবের জ্বালা বুঝতে পারে, দরিদ্রের ব্যথা অনুভব করতে পারে?

আমার নিজের কষ্ট ভুলে গিয়ে ভাবতে লাগলুম, এ মেয়েটীকে কি করে সুখী করা যায়? এমন কি কেউ নাই যে তাকে বিয়ে করে?

হঠাৎ মনে জেগে উঠল, প্রসাদবাবুর কথা।

এ হতে পারে না কি? প্রসাদবাবু বিয়ে করবেন না বলেছেন; এই তুচ্ছ ঘৃণ্য নারীকে ভালবাসেন বলে আর কোন নারীকে ভালবাসতে পারবেন না। তিনি এমনই ভাবে দেশের কাজই করে যাবেন, কিন্তু এও কি একটা দেশের কাজ নয়? এই যে কুমারীটি, একে এই দারুণ কষ্ট হতে উদ্ধার করা এও ত দেশের শ্রেষ্ঠ কাজ। এবং কাকা হয় তো কোনও চরিত্রভ্রষ্ট উড়ুচুটে, লোকের হাতে একে সমর্পণ করবেন, এবং জীবনটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে, সুখ শান্তি জন্মের তরেই হারাবে।

অমূল্য নরজন্ম গ্রহণ করে সে শুধু ব্যর্থ হয়েই থাকবে। আর তার মাতৃত্ব, এইটাই যে বিষম কথা। দেশের সেবায় চাই সুস্থ সংজ্ঞানেহী সন্তান। তার সন্তান হবে চিররুগ্ন, তার দ্বারা দেশের কোনও উপকার হবে না, সে একটা গলগ্রহ হয়ে দেশের থাকবে। এমনি করেই না আমাদের দেশে রুগ্ন দেহ দুর্বল প্রকৃতি লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মাতৃত্বের বিকাশ হতে পারছে না, দেশ অধঃপাতে যাচ্ছে।

প্রসাদবাবুর কথা শুনেছিলুম, পিসীমার সঙ্গে তিনি সেদিন এই কথাই বলছিলেন। সন্তানের স্বাস্থ্য, তার ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতি কাল মায়ের পরেই নির্ভর করে। সন্তান সে হবে, সে যথার্থ সন্তান হতে পারবে বাপ মায়ের জন্যে। কুচরিত্র বাপেরও অনেকগুলি সন্তান হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের স্বাস্থ্য —সে কথা বলে আর কাজ কি? আমাদের দেশে তার তো অপ্রতুল নেই।

বলব—এ কথা আমিই পিসীমাকে বলব। তাঁকে ও একবার বলব কি? বলবা মাত্র তাঁর মুখখানা কি রকম হয়ে যাবে—তিনি হয়তো, ভাববেন, যাকে আমি এত ভালবাসি, তারই মুখে এই কথা?

বুকের অতি গভীর এক জায়গায় ব্যথা বেজে উঠল, তাঁর মুখখানা কল্পনায় এনে ক্ষণিক বিভোর হ'য়ে বসে রইলুম।

না, তবু বলব। এতে তাঁর ভাল, দেশের ভাল, দশের ভাল, আর এই মেয়েটার ভাল। আমার ও এতে ভাল।—

এতে ভাল? কিসে ভাল নয়? আমার দেবতা তিনি, দেবতাকে ভক্ত উপরেই রাখতে চায়। ভক্ত আশা করে না দেবতা তার কাছে আসুক। দেবতাকে দিতে হবে ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা। আমি ওদিকে যাব, আমার দেবতাকে আমি নিঃশেষে কেবল ঢেলে দিয়ে যাব, তাঁকে সকল আপদ বিপদ হ'তে রক্ষা করবার জন্যে তাঁর কাছে পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে থাকবো। আমি আমার দেবতাকে নষ্ট করতে পারব না, নিজের হাতে তাঁকে কাদা মাখাতে পারব না। • ক্রমশঃ

ভবিতব্য।

(গল্প)

(শ্রীআশুতোষ সান্যাল)

ছেলেবেলায় খুব ভাল ছেলে থাকলেও, পাড়ার ও পড়ার সঙ্গীরা কিন্তু আমায় বেশীদিন ভাল থাকতে দিল না। খণ্ডিত বঙ্গদেশ যোড়া লাগাতে যখন সমস্ত বাঙ্গালার ছেলেরা উঠে পড়ে লাগল, তখন আমাদের পাড়ার ছেলেরাও, বহুকালের এক পরিত্যক্ত জমির চারদিক বিঘরে দেশোদ্ধারের 'মুখ বন্ধ' করে ফেল্‌ল—একটা লাঠিখেলার ও কুস্তির আড্ডা করে।

সেবার কেবল মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছি। পাশের খবর বেরুবার আগেই বিদ্যার ভিটায় প্রণাম করে, আখড়ার মাটি গায়ে মেখে দেশোদ্ধারে দৃঢ়-সঙ্কল্প হলাম।

বাবা ছিলেন খাঁটি রাজভক্ত—সরকারী বেতন-ভোগী মুন্‌সেফ। তাঁর পুত্র হয়ে, স্বদেশীতার উন্মত্ততা বিষদৃশ্য হলেও এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষীর দল ও বাবার পোঁছরারা আমাকে ভবিষ্যত হাকিমি

• ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল, আগামী মাসের পূজার ভার লইয়াছেন।

পদের যথেষ্ট প্রলোভন দেখালেও—আমি কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হলাম না।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অতগুলি ধাপ উত্তীর্ণ হয়ে, অনিশ্চিত হাকিমি পদের আশায় পাদমূলে পৌঁছান অপেক্ষা লাঠি খেলা এবং কুস্তি করে দেশোদ্ধার যখন অতিনিশ্চিত, তখন 'ছাড়িয়া সুখের গ্রাস যে অবোধ জন', এই হিতোপদেশ আমি কেন, আমার মতন অনেক সুবোধ ছেলেই প্রশস্ত পথা বলে বেছে নেবে। কাজেই—বাবাকে নিষেধ করবার অবকাশ না দিয়েই, তাঁর শাসন-গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। মা সরস্বতীও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে দ্বিগুণ তেজে দেশোদ্ধারে মেতে উঠলাম। লাঠিখেলা, গান গাওয়া, কাজে অকাজে ভলেন্টিয়ারি করে বেড়ান এমন ভাবে বেড়ে উঠ্‌ল, যে সময় মত আহারের সময় হয়ে উঠ্‌ত না। ছেলে ছেলে যাওয়ার ভয়ে না হলেও—অতিরিক্ত স্বদেশীতার যে একটা অসুখ বিসুখ হতে পারে এই ভাবনায় মা চিন্তিত হয়ে একদিন পিতার কাছে অনুযোগ করলেন। পাশের ঘর থেকে স্পষ্টই শুনতে পেলাম বাবা বল্‌লেন, "বাধা দিয়ে কোন ফল নেই—বরং উল্‌টো বিপত্তি হয়ে দাঁড়াবে। জোঁকের মুখে নুন পড়লে, আপনিই কাবু হয়ে পড়বে, ভাববার কোন কারণ নেই।" বাবার কথায় সাহসটা খুব বেড়ে গেল, কারণ বেশ বোঝা গেল যে তিনি পুত্রকে শাসন করতে নারাজ। তবে জোঁকের মুখে নুন পড়ার কথাটা শুনে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলাম।

বেশ নির্ব্বিবাদে কিছুদিন কেটে গেল। এই সময় হঠাৎ একদিন আমাদের সমিতির সুমুখের রাস্তায় গোলমাল শুনে, আমরা কয়েকজন রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম—একজন বৃদ্ধ নিরুপায় হয়ে গলির ভেতর একটা নোংরা নর্দ্দমায় 'পাঁচ আইনের' নিয়ম ভঙ্গ করায়, পাহারাওয়ালা তাঁকে থানায় নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করছে। বৃদ্ধ কাকুতি মিনতি করছে, কিন্তু সরকারের শান্তিরক্ষক কিছুতেই নিমক-হারামী করতে রাজী নন। ব্যাপার দেখে অগ্রণীর হয়ে পাহারাওয়ালাকে বললাম, "কেন বাপু বুড় মানুষকে নিয়ে টানাটানি করছ, কিছু নিমকের মূল্য ধরে দিচ্ছি—ছেড়ে দাও"—কিন্তু চোরা না না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। প্রভু—একেবারে সপ্তমে সুর চড়িয়ে বললেন, "এ বুঢ়া স্বদেশী হ্যায় — ইস্‌কো নেই ছোড়নে সাক্‌তা, তোম লোক বাত্তি বাত্ বোলনেসে—তোমলোক্‌কো ভি থানামে লে যায়েগা।" হাকিমের ছেলে হয়ে একটা সাতটাকা বেতনের চৌকীদারের লম্বা চওড়া কথা শুনে, মাথার পোকাগুলো কিল্‌বিল্ করে উঠ্‌ল। সজোরে কনেষ্টবল মহাবীরকে ধাক্কা দিয়ে বৃদ্ধকে তার কবল থেকে মুক্ত করলাম। ধাক্কা খেয়ে প্রহরী প্রবর মহাতেজে রণ ঘোষণা করলেন। দেখতে দেখতে লোক, গাড়ী, ঘোড়া, পুলিশ রাস্তার দুধারে জমে একটা "স্বদেশী মেসার" সৃষ্ট করে ফেলল। অবস্থা বুঝিতে পেরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম গোলমালে বৃদ্ধ সরে পড়েছেন—আর আমরা কজন পুলিশের হাতে জবর দস্ত অবস্থায় বাঁধা পড়েছি।

বুক ফুলিয়ে থানায় গেলাম। কিন্তু উপরি উপরি সতের দিন হাজতের নানাবিধ শাসন সংস্কার দেখে এবং কিছু কিছু উপভোগ করে, দুশ্চিন্তায়, অনাহারে, অনিদ্রায়—আধখানা হয়ে পড়লাম।

পিতা নির্ব্বিকার! পুত্রের এই বিপদে বিচলিত দূরের কথা, নিশ্চিন্ত মনে বিনপাত করছিলেন। সমিতির বেতাদের দু'তিনজন এসে মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়ে যেতেন—দেশের জন্য জেল খাটবে তার চিন্তা কি? কিন্তু জেল হবার পূর্ব্বেই যেরূপ নিদর্শন দেখা যাচ্ছিল, তাতে দেশের প্রতি ভক্তির মাত্রাটা যেন বিভীষিকায় ক্রমেই অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিল।

যাই হোক সতের দিন পরে, সরকার বাহাদুরের আদালতে দাসখত লিখে দিয়ে যে যাত্রা নিষ্কৃতি

পেলাম। আদালত থেকে বেরিয়ে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখন চারিদিকে 'বন্দেমাতরম্,' ধ্বনি এবং ফুলের মালার বহর দেখে হাজতের হেফাজতের কথা ভুলে গেলাম, উৎসাহে বুক আবার স্ফীত হয়ে উঠল। কিন্তু সে উৎসাহ বেশী দিন রইল না। চারিদিকে তখন ঘন ঘন ফাঁসি এবং দ্বীপান্তরের বাঁশী বেজে উঠে নির্জ্জীব বাঙ্গালার শত বৎসরের পরাধীনতার তুষার শীতল রক্তপ্রবাহ, দুদিনের জলে ওঠা আগুন নিভিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে বাঙ্গালার স্বদেশীত্ব-নাটকের যবনিকা পড়ে গেল।

(দুই)

কথায় বলে 'হুজুরে চীন আর হুজুগে বাঙ্গালী'। দেশোদ্ধারের হুজুগ যখন দাবার চালে চাপা পড়ে গেল, তখন ঘরে বসে জাবর কাটা বড় একঘেয়ে হয়ে পড়ল। নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে, নির্ব্বিকার চিত্তে পিতার অন্নধ্বংশ করা ধাতে সইল না। বসে থাকার চেয়ে ব্যাগার খাটা ভাল। তাই চাকরীর চেষ্টায় কিছুদিন উমেদারী করে বেড়ালাম। কলকাতায় কিছু সুবিধা না করতে পেরে অবশেষে বিদেশে যাওয়াই স্থির করলাম। কিন্তু যাই কোথায়! বাড়ীর বাইরে কখনও পিতা, মাতা, ছেড়ে পা দিই নি, হঠাৎ একলা বিদেশে চাকরী করতে যাওয়াও চিন্তার কথা। পিতার এক বন্ধু তাঁর কোনও আত্মীয়ের নিকট হইতে পশ্চিমের রেল অফিসের এক বড় বাবুর ওপর সুপারিশ পত্রও সংগ্রহ করে দিলেন। মা কিন্তু কিছুতেই রাজি হলেন না, পুত্রকে একা বিদেশে ছেড়ে দিতে। তবে তাঁর অসম্মতি পিতার মতামতের কাছে টিকল না—পশ্চিমে যাওয়াই স্থির হইল।

পাঁজি পুঁথি দেখে, শুভদিনে মায়ের দেওয়া তেত্রিশ কোটি ঠাকুর দেবতার প্রসাদী ফুল বিল্বপত্রের বর্ম্ম এঁটে পিতা, মাতার, চরণ ধুলি মাথায় নিয়ে একদিন পশ্চিম রওনা হলাম। রাত্রিকালে ট্রেণ গন্তব্যস্থানে এসে পৌছল, অতরাত্রে নির্ব্বান্ধব স্থানে কোথায় যাব স্থির করতে না পেরে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু ষ্টেশনেই কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে বড় বাবুর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর আফিসে গেলাম। মস্তবড় রেলের কারখানার আফিস গেটের সুমুখে পৌছে একজন দ্বার-রক্ষককে বড় বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে মৃদু হাস্যে আমাকে বলল "কেয়া বাবুজী—নক্‌রী করনে আয়া? হাম লোক্‌কো বকসিস্ ত' কুছ মিল্‌না চাহিয়ে—" নেহাৎ বোকা ছিলাম না, সেপাইজীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে বড় বাবুর সন্ধান পেলাম বটে, কিন্তু—একেবারেই দর্শন মিলল না। চিঠিখানা পাঠিয়ে আধঘণ্টা তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করার পর—তাঁর তলব এল।

তত্ত্ববিদেরা বলেন, মানুষের আকৃতি দেখে তার প্রকৃতি বোঝা যায়। তাই আমার চাকুরি জীবনের প্রথম ও শেষ কাণ্ডারী বড়বাবুর একটু বর্ণনা করছি। তত্ত্ববিদ্‌গণের কথা যদি সত্য হয়, তবে তা হতে তাঁর প্রকৃতি বুঝতে কারুর বেশী কষ্ট হবে না।

মানুষটি—খর্ব্বাকৃতি, রেল কোম্পানীর উদারতায় দেহের অনুপাতে মাংসের ভাগ বেশী হওয়ায় এক অপরূপ রূপের সৃষ্টি করেছে। ছোট চক্ষু—গোলাকার, কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ শ্যেন দৃষ্টি। বর্ণ নব ঘনশ্যাম, তাতে শেতলা মায়ের অনুগ্রহে মুখে অসংখ্য তিলকা চিহ্ন। কাল চাপকানের মধ্যে মানুষটিকে চিনে বের করা একটু প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন। এই—ত' গেল আকৃতি। তার ওপর—কণ্ঠস্বর একেবারে কোমলবর্জ্জিত রাসভ নিন্দিত—গান্ধার—তাল সদাই রুদ্র। অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ মানুষটিকে পৃথিবীর আশ্চর্য্য বস্তুর তালিকাভুক্ত করলে আশ্চর্য্যতত্ত্ববিদ্‌দিগের একটী নূতন আবিষ্কার!

এ হেন বড় বাবুর সম্মুখে অর্দ্ধঘণ্টা দাঁড়িয়ে, কুল কুলীর পরিচয় দিয়ে—ধার্য্য হল মাসিক—নগদ পঁচিশ

টাকা বেতন। যাই হোক তখন বেতনের দিকে তাকাতে গেলে চলে না, তাহাই শিরধার্য্য করে নিলাম।

আফিসের একটী মেস্ ছিল। বড় বাবুর আদেশে সেখানে স্থান পেলাম। তরকারির মধ্যে যেমন ছ্যাঁচড়া। এই মেস্‌টিও তেমনি সর্ব্বজাত ও সর্ব্বমতের একটি ছ্যাঁচড়া—বাড়িটিতে ছয় সাতখানি ঘর, প্রত্যেক ঘরে দুই, তিন বা ততোধিক লোকের স্থান। সকালে উঠে আটটার ভেতর যে যার কাজে বেরিয়ে যান, দুপুরে ঘণ্টাবানেকের জন্য খাবার ছুটি পান, নাকে মুখে দুটো গুঁজে আবার চলে যান। বাসার সঙ্গে দিনের বেলার সম্বন্ধ এইটুকু। রাত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। ঠান্‌দির গল্পের ঘুমন্ত পুরীর দেশের মত দিনের বেলায় সব মুষ্—রাত্রে সজীব। গান বাজনা থিয়েটার, যাত্রা নেশা ভাং, আমোদ আহ্লাদ, হাসি কান্না, পরনিন্দা পরচর্চ্চা মায় সাংসারিক সুখ দুঃখের হিসাব নিকাশ যা কিছু সব রাত্রে। আর এই সমস্তর সম্মিলন স্থানের প্রধান কেন্দ্র ছিল আমাদের মেস্।

আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এসে, প্রথম দিন নূতন জায়গায় অপরিচিত লোকের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে না পেরে, বিছানায় শুয়ে এক খানা সংবাদ পত্র পড়ছিলাম। নানা চিন্তা এসে ধীরে ধীরে মাথার ভেতর ভীড় করে তুলেছিল। পাশের ঘরে তখন পুরাদমে মজলিস চলেছে, বিদেশে আত্মবিস্মৃতির মহোষধ পান করে অনেকেই ভরপুর। গান, বাজনা হাসি তামাসার ভেতর থেকে হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠে কে বলল "হাঁহে নবীন, ও নূতন ছোক্‌রাটি কে হে? আফিসে ভর্ত্তি হল নাকি?"

নবীনবাবু—একটু ব্যঙ্গস্বরে বললেন "চন্দরদার জায়গায় হল। বড়বাবুর মেজো টম্‌কো কেউ হবে, পঁচিশ বছরের পুরাতন লোক চন্দর হালদারকে ভাইকে না দিয়ে, হঠাৎ অত সৌভাগ্য যার তার হয় কি?" নবীন বাবুর কথায় একটা মিলিত ব্যঙ্গ হাস্য আমাকে একটু সঙ্কুচিত করে তুলল। বুঝলাম, আমার চাকরীতে বাবুরা সন্তুষ্ট নয়।

তিন

বাবুরা তেমন সুনজরে না দেখলেও প্রথম প্রথম বড়বাবু খুবই আদর আপ্যায়িত দেখাতেন। মাস খানেক পরে আফিসের ছুটী পর একদিন বড়বাবু ডেকে বললেন "হাঁহে—ছোকরা, তুমি এন্‌ট্রান্স পাশ করেছ?"

আজ্ঞে হাঁ—

"বেশ—তা এক কম্ম করতে হচ্ছে।"

মনে করলাম, হয়ত দয়াপরবশ হয়ে আমাকে কোনও ভাল কাজে বেবার মনস্থ করেছেন, কৃতজ্ঞ স্বরে বললাম "বলুন।"

"হাঁ দেখ—তোমার গিয়ে—আমার ছেলে-মেয়েটাকে সন্ধ্যার সময় ঘণ্টা খানেক করে পড়িয়ে আসবে বুঝলে! তাতে—তোমার গিয়ে—তাদের ভাল হয়—আর তোমারও মেরিট বুঝতে পারলে সাহেবকে বলে কয়ে চাই কি একটা ভাল প্রোমোশনও করে দিতে পারব। আজ থেকেই তোমার গিয়ে তাহলে যেয়ো—বুঝলে!

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, আমার ওপর কেন এত নেক নজর। কেরাণীগিরী যখন চাকরী তখন বড় বাবুর বেগার না দিয়ে উপায় নেই। কাজেই সেইদিন সন্ধ্যা হ'তে তাঁর ছেলে মেয়ে পড়াবার অনাহারী মাষ্টারী নিলাম।

দিন দুই বড়বাবুর ছেলেদের পড়িয়েই আবার চঞ্চুস্থির। ছেলে ত' নয়—দুষ্ট ধুরন্ধর—গাধা কা বেটা। তারা যে বড় বাবুর ছেলে এবং আমি যে তাদের বাপের তাঁবেদার এ জ্ঞানটা তাদের বেশ ছিল। মেয়েটি বছর পাঁচেকের-সড়ার চেয়ে বিহরির চেরা চেহারাই সে শ্রেয়ঃবিবেচনা করত, কাজেই তার সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই। বিশেষতঃ ছেলে দুটিকে নিয়েই

আমি এমন বিব্রত হয়ে পড়লাম, যে অন্যদিকে নজর করবার আমার অবসর ছিল না।

দিন পাঁচেক কোন প্রকারে তাদের সংস্রবে থেকে বুঝতে পারলাম যে—এদের সংসর্গে আর কিছু দিন থাকলে আমার নিজের যা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাও ভুলে যেতে হবে। তার ওপর ছেলে দু'টির লঘুগুরুজ্ঞান দেখে একদিন অন্তমনস্কে ধমকানি দেওয়ায় নেপথ্যে গুরুগর্জ্জন ধ্বনি শুনে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। বড়বাবুকে বলতে বাধ্য হলাম—আমার দ্বারা তাঁর পুত্রদের শিক্ষকতা অসম্ভব। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখানে বড়বাবু আদৌ সন্তুষ্ট হলেন না। আমার প্রতি অতিশয় চটিত হয়ে, আমাকে এবং আমার এনট্রান্স পাশ করানর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে নানাবিধ গণ্ডমূর্খের বিশেষণ প্রয়োগে আপ্যায়িত করলেন এবং পরিশেষে এ কথা বলতেও ছাড়লেন না যে—তাঁর আফিসে আমার অন্ন আর বেশী দিন নাই—।

এই ঘটনার পর মাস দু'তিনের ভেতর বড়বাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক দাঁড়াল—আধা ও কাঁচকলা। এমন দিন যেতনা যেদিন তাঁর সঙ্গে হাতাহাতি হবার উপক্রম না হত। আমিও নাচোড়বান্দা—চাকরী ছাড়ব না।

নানা অছিলাতেও যখন আমার সঙ্গে তিনি পেরে উঠলেন না এবং দেখলেন আমি দেখতে ভিজে বেরালটি হলেও—বেশ খটখটে শুকনা, তখন বড়বাবু সাহেবের শরণ নিলেন।

এই সাহেবটি ছিল বড়বাবুর হাতে কলের পুতুল। কারণ বড়বাবুই গাধা পিটিয়ে তাকে মানুষ করেছিলেন। সাহেবের কাছে আমার নামে তিনি অভিযোগ করলেন—আমি চরিত্রহীন, দুর্দ্দান্ত মাতাল। আমাকে আফিসে রাখলে আফিসের অন্যান্য বাবুরাও বিগড়াইয়া যাবে। এবং আমি যে মাতাল তা প্রমাণ করতে তাঁর বেশী বিলম্ব হল না—বড়বাবুর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী অনেকেই এ বিষয়ে তাঁর কথায় সায় দিল, যার—আমাদের মেসে যিনি পেশাদার মাতাল নামে খ্যাত—সেই—বেণীবাবুও। চরিত্র হীনতার কথায় বড়বাবু আমার সুমুখেই "ম্লানবদনে বললেন" আমি যখন তাঁর পুত্র কন্যার গৃহশিক্ষক ছিলাম তখন তাঁর বাড়ীর ভেতরের দিকে কুদৃষ্টি করায়—তিনি আমাকে বিতাড়িত করেছেন এবং অন্যান্য আরও নানা কথা—অনেকের মুখে শোনা যায়—।"

তাঁর এই হীন অভিযোগে রাগে, ঘৃণায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হল। সাহেবের সমুখেই তাঁকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিলাম। এই ঔদ্ধত্যের জন্য সাহেব আমাকে একমাসের নোটিশ দিলেন। চাকরী যায় যাক—আমি একটুও দুঃখিত হইনি। এত বড় শয়তানের তাঁবেদারী করা অপেক্ষা মুটেগিরী করে খাওয়াও সহস্র গুণে শ্রেয়। মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি এই অমানুষিক অবিচার অত্যাচার ক'রে যে শক্তির অপব্যবহার করে, তাকে একটু শিক্ষা দিয়ে বেচারী কেরাণীকুলের আশীর্ব্বাদ লাভ করার প্রলোভনটা কিছুতেই আমি সম্বরণ করতে পারলাম না।

মানুষের সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা হচ্ছে এই—যে সে তার নিজের চরিত্রটা একটুও বিচার না করে, অপরের চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে যায়। বাইরে সাধুতার ভাণ করলেও এবং পরকে চরিত্রহীন বললেও, বড়বাবু নিজে ছিলেন একটি ব্যভিচারের প্রতিমূর্ত্তি। বয়সের চাপে, বার্দ্ধক্যের দৌর্ব্বল্যতা গোপন করতে 'জনপথের' আশ্রয় নিতে সাহস না করলেও, অহিফেনাদি বিবিধ সুলপথের তিনি ছিলেন পুরাদস্তর একজন পথিক। কোন কোন দেবতার যেমন 'বার' হয়, তেমনি এই বড়বাবু অপদেবতাটিরও বার দিন ছিল—শনিবার। আফিসের দেনা পাওনা চুকিয়েও, এই মহাপ্রভুর পাওনাটা দিতে সেই শুভদিনের জন্য আমাকে আরও দু'তিন দিন অপেক্ষা করতে হল।

শনিবার রাত্রে। একে বর্ষাকাল তার ওপর সমস্ত দিনের বৃষ্টিধারা সারা পৃথিবীকে একেবারে গাস্তাবুড়ী করে তুলেছিল। রাত দশটা বেজে গেছে, তখনও ফিস্ ফিস্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ওয়াটার প্রুফটা মুড়ি দিয়ে বড়বাবুর মালঞ্চের সুমুখে এসে দেখলাম সদর দরজা বন্ধ। ঘণ্টাখানেক একটা গাছের তলায় অপেক্ষা করার পর প্রভু দর্শন দিলেন।

আমি আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিলাম। মাথার টুপিটা মুখ পর্য্যন্ত চাপা দিয়ে, মাতালের মত টলতে টলতে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই—প্রভু বিড় বিড় করে বকতে বকতে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। আমিও বড় রকমের একটা হোঁচট্ খেয়ে একেবারে তাঁর ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। অহিফেনের ভয়াট নেশা, হঠাৎ মাতালের বিপত্তিতে চোটে যাওয়ায়, একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে, তাঁর সেই রাসভনিন্দিত স্বরে অভদ্র ভাষায় গালি দিতে লাগলেন। আমি গালাগালির কিরে কর্ণপাত না করে পুনরায় অগ্রসর হতেই প্রভু আমায় এক ধাক্কা মারতেই—দ্বিগুণ বলে তাঁকে পুনরায় আক্রমণ করলাম। নেশার ঘোরে নিজের গুরুভার সামলাতে না পেরে তিনি রাস্তার ওপর আত্ম-সমর্পণ করে চেঁচাতে লাগলেন। গোলমাল শুনে দূরের বাড়ীগুলার দরজা খোলার শব্দ শুনে—আমি আর দেরী করতে পারলাম না। যা কতক উত্তম মধ্যম দিয়ে রাস্তার ধারে নর্দ্দমায় পিপে গড়ানর মত গড়িয়ে দিয়ে চম্পট দিলাম।

সেই রাত্রেই প্রভু এবং প্রভুর স্থানকে দণ্ডবৎ করে নৌকায় রওনা হলাম। পরে শুনেছিলাম, প্রভুর সে দিনের ধাক্কা সামলাতে—প্রায় মাসাধিক কাল লেগেছিল এবং তিনি আমাকে বিশেষ সন্দেহ করলেও, সে কথা নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করেন নি।

চার

পশ্চিম থেকে ফিরে আসার পর দশ বছর কেটে গিয়েছে। সংসারের অবস্থা যা চিরদিন হয়ে আসছে—আমারও সেইরূপ। বাবা পেন্সন নিয়ে দেশে চাষবাস করছেন, আমাকে আর চাকুরী দেবীর দুয়ারে যেতে হয় নি, এক খুল্লতাতের সঙ্গে থেকে দেয়ারের দালালী শিখ্‌ছিলাম। আমাকে কলকাতাতেই থাকতে হত, তবে সুবিধামত অবসর হলে মাসে মাসে বাড়ী যেতাম। এর মধ্যে অন্য এমন কোনও—উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

এই সময় প্রকাশ্যে মায়ের এবং নেপথ্যে বাবার ইচ্ছা হল একটি পুত্রবধূ ঘরে আনেন। আমি জ্যেষ্ঠপুত্র—সে কারণ, নাবাই মেটাতে হলে আমাকেই উপলক্ষ্য হতে হয়। সত্য কথা বলতে গেলে—বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী আমি ছিলাম না। তবে পিতা, মাতার অভিলাষ অপূর্ণ রাখাটাও খুব সমীচীন বিবেচনা করলাম না। কাজেই—তাঁদের প্রস্তাবে আমাকে সম্মত হতে হল।

পাত্রী নির্ব্বাচনের ঘটা পড়ে গেল। আত্মীয় স্বজন মনোমত পাত্রীর সন্ধানে উঠে পড়ে লাগলেন। দু'চারবার আমাকেও যাচাই করতে কন্যার পক্ষ হতে দু'চার জন এলেন। মেয়ে দেখা সম্বন্ধে দু'একবার আমারও মতামত জিজ্ঞাসা করা হল, তবে আধুনিক যুগের ছেলে হলেও, স্ত্রী-নির্ব্বাচনের ভারটা পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজনের ওপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত ছিলাম। অবশ্য এর মধ্যে একটু কথা ছিল,—বাবা ছিলেন পণপ্রথার বিরোধী,—সে কারণ আমার ভরসা-ছিল—তিনি বিনা কড়িতে একটা কুৎসিত পুত্রবধূ কখনই ঘরে আনবেন না।

কয়েকমাস অনুসন্ধানের পর, প্রজাপতি সদয় হলেন। শুনলাম, আমাদেরই গ্রামের কিছুদূরে মেয়ের মাতুলালয়। সেইখান হতেই বিবাহ হবে, কারণ মেয়ের পিতা পশ্চিমে চাকরী করেন। সে কারণ তাঁর ও আমাদের সুবিধার জন্য তিনি এখানে এসেই মেয়ের বিবাহ দিয়ে যাবেন।

খুব ধুমধামের সহিত পাকা দেখা প্রভৃতি সমাধা হল। বিবাহের দিন বরবেশে সজ্জিত হয়ে

বন্ধু, বান্ধব আত্মীয় স্বজন নিয়ে বিবাহ বাড়ী উপস্থিত হলাম। মেয়ের মাতুলই—কন্যাকর্ত্তা। শ্বশুর মহাশয় সময় মত ছুটি না পাওয়ায় পূর্ব্বে আসতে পারেন নাই। বিবাহের দিন দ্বিপ্রহরে আসবার কথা ছিল, কিন্তু শিয়ালদহ ট্রেণ ফেল হওয়ায়, পরের গাড়ীতে অর্থাৎ রাত দশটার পর এসে পৌছিবেন বলিয়া টেলিগ্রাম করেছেন। যাই হোক, তার জন্য আমাদের কোনও অসুবিধা হয় নাই। যথা-রিতি নিয়মানুসারে বিবাহ হয়ে গেল। বরযাত্রীরা আহার করে বিশ্রাম করতে গেলেন। আমি সারা-রাত্র জাগরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে বাসরে প্রবেশ করলাম।

বাসর ঘরের আসর যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন বাইরে গোলমাল ও কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম শ্বশুর মশাই এসে পৌছেচেন। তিনি বলছেন রাখাল—ওর কোথায় হে! আচ্ছা ভুগিয়েছে এই ই, বি, রেল কোম্পানী। একটি কি দুটি মিনিটের জন্য ট্রেন মিস্ করলাম।" রাখাল আমার মামা শ্বশুর মশাই—উত্তরে বললেন "তা যাক্—ভালয় ভালয় কাজ মিটে গেছে। এখন হাত পা ধোও—"

"জামাই বাবাজীকে একবার"—হবে এখন, হাত পা ধুয়ে বেহাই মশায়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর। জামাই এখন বাঁসর ঘরে গিয়েছে, মেয়েরা কি আর এখন ছাড়বে। খাসা জামাই হয়েছে—কিছু চিন্তা করতে হবে না।"

"তা বেশ—ওরে কে আছিস্ বাবা একটু তামাক দে—"

তাদের কথায় বুঝলাম শ্বশুর মশাই জামাই দেখায় নিরস্ত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ তখন আমারও বিশেষ ছিল না—কারণ আমি তখন আরও ভাল সঙ্গী পেয়েছিলাম।

(পাঁচ)

সমর ক্লান্ত সৈনিকের মত পরদিন অতি প্রত্যু-ষ্কে, নানা অছিলা করে বাসর সঙ্গিনীদের হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়ে, বাইরে বন্ধু বান্ধবের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। অন্দর মহল পার হয়ে বাইরের বারান্দায় পা দিয়ে সবে মাত্র সিগারেটটাতে আগুণ ধরিয়েছি, এমন সময় পূর্ব্বরাত্রের আগন্তুক অর্থাৎ অপরিচিত শ্বশুর মহাশয়ের স্বর কাণে গেল "ওরে—বেটারা। কে আছিস একটু তামাক দে। ওঃ—ওঃ—ব্যাটাদের যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা!"

'জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ'—বাসরের হাত থেকে নিস্তার পেলাম; সুমুখে আর এক বিপদ! বিরক্ত হয়ে সিগারেটটায় একটা সুখটান দিয়ে ফেলে দিয়ে, গম্ভীর ভাবে অগ্রসর হলাম। বাইরের প্রাকৃতিক অবস্থা দেখে বুঝলাম সেখানে এক শ্বশুর মশাই ব্যতীত সকলেরই অর্দ্ধেক রাত্রি। লজ্জা করে আর ফল নেই! বৈঠক খানার বারান্দায় উঠে, যেমন ঘরে ঢুকতে যাব—অমনি ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এল "এস—এস বাবা—"

আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাতেই আমার সুমুখে যে মূর্ত্তি—দেখলাম—তাতে আমি হতভম্ব!

—অ্যাঁ এ কি! এ যে—সেই রেল আফিসের, বড়বাবু—মাখন মজুমদার! কি সর্ব্বনাশ! ইনিই কি আমার শ্বশুর—না এখানে নিমন্ত্রণে এসেছেন। আমার মনে হল-আমি যেন ক্রমেই পাষাণ হয়ে যাচ্ছি। কথা কওয়া দূরের কথা—আমার এক পাও নড়বার ক্ষমতা ছিল না।

দূর থেকে আমায় দেখে শ্বশুর মশাই—প্রথমটা আমায় চিনতে না পেরে, গায়ের হাত কাটা ফতুয়া-টার পকেট হতে চশমা খানা বের করে, পরতে পরতে বললেন "এস বাবা—এস, কাল ট্রেণ মিস্ করে—তোমার গিয়ে——অ্যাঁ—একে। কিরণ! তু—তু—"

বালিসের তলায় সাপ দেখলে মানুষ যেমন আড়ষ্ট হয়ে ওঠে—শ্বশুর মহাশয়েরও তখন তদ্রূপ অবস্থা! দুজনে সেই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম বলতে পারি না। হঠাৎ বাবার কণ্ঠস্বরে উভয়েই চমকে উঠলাম। বাবা আমাদের নিকটে এসে বললেন "কিরণ, বেহাইকে প্রণাম কর। ইনিই—তোমার শ্বশুর!" শ্বশুর মশাই বলে প্রণাম না করলেও—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ভবিতব্যের পায়ে—মাথা নোয়াতে হল।

প্রজাপতির দৌত্য

(বড় গল্প)

[শ্রীঅজয়কুমার সেন]

(১০)

মেলা দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া যাইবার সময় তপেন পথে ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল, তরুণী নিশ্চয়ই সেই ট্রেণে-দৃষ্টা সরযূ ভিন্ন অপর কেহই নয়। আবার পরক্ষণেই মনে হইতে লাগিল, অন্য কোন রমণীও হয়ত হইতে পারেন?

তনেক ভাবিয়া যখন সন্দেহ নিরাকরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন সে মনে মনে চিন্তা করিয়া ঠিক করিল, বাসায় গিয়া বৌদিদির কাছে থেকে ঐ তরুণীর পরিচয় লইবে।

তার পর চিন্তা করিল—ভদ্রতার কোন হিসাবে সে আমি পর-রমণীর খোঁজ লইতে অগ্রসর হই-তেছি। ভদ্রতায় ধিক্ আমার!।

তপেনকে একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া রমেন কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "কি হে বড় যে চুপচাপ্?"

উত্তরে তপেন বলিল, "বল্‌বার কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছি না—এমনিই চলেছি।"

"অমনি কি হে—কি ভাবছ প্রাণ খুলেই বল না শুনি?" এই বলিয়া সে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রমেনকে অকারণে এইরূপ ভাবে হাসিতে দেখিয়া তপেন তাহার দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া রহিল।

কিছুকাল নীরব থাকিয়া রমেন কৌতুকভরে বলিল, "সরযূকে আজ কেমন দেখ্‌লে?"

"কি রকম—সরযূ!"

"তুমি কি তখন ধ্যানে ছিলে নাকি হে?"

"আমি ত তোমার কথা একটুও বুঝতে পার্‌ছি না:—খুলেই বল না কেন?"

"এ আর বুঝতে পার্‌বে না—এই সোজা কথাটা মাথায় ঢুক্‌ছে না বুঝি।" এই বলিয়া সে আবার হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তপেন রমেনের অর্থশূন্য হাসিতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, "যদি কথাই না বুঝতে পারলাম, তবে অমন কথা বলা না বলা সমান।" এই বলিয়া গাড়ী বাসার সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেই, সে ঝপ্ করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

মহিলারা সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে রমেন ও তপেন তাহাদিগের পশ্চাতে আসিতে লাগিল।

বাসার মধ্যে ঢুকিয়া রমেনের বৌদিদি সহাস্যমুখে তপেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, তোমার জন্যই আজ আমরা দেখ্‌তে পেলাম। দলের পক্ষ থেকে তোমাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি।" এই কথা বলিবামাত্র তরুণীদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জনের এক রব শোনা গেল।

অত লোকের সম্মুখে তপেনকে উদ্দেশ করিয়া

ঐ প্রকারের কথা বলাতে, সে যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার চোখ সেই তরুণীর দিকে পতিত হইবামাত্র, সে দেখিল, তরুণী স্থির-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

তপেনকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া, রমেণ তাহার বৌদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আচ্ছা বৌদিদি, প্রশংসা কেবল কি তপেনেরই একচেটে, আমরা কি সব দামোদরের বন্যায় ভেসে গেলাম?"

রমেণের কথা শুনিয়া তাহার বৌদিদি চমকিত হইয়া বলিলেন, "ও, বড় ভুল হয়েছে ত। তুমি যে একজন প্রশংসার অংশীদার আছ, সে কথা আমি একদম ভুলে গেছি। যা হোক তুমি কেবল আমার ধন্যবাদের পাত্র।"

"না বৌদিদি, এমন বোল্লে আর হবে না। একবার যা হোয়ে গিয়েছে।" এই বলিয়া সে তপেনের মুখের দিকে তাকাইল।

রমেণের কথায় তপেন বলিয়া উঠিল, "নাও নাও, অত প্রশংসাতে কাজ নেই। যদি তোমার প্রশংসা এতই দরকার হোয়ে থাকে, তবে আমার-টাও তুমি নাও। বৌদিদি, আপনি ভিতরে গিয়ে ওঁদের দেখুন-শুনুন।"

বৌদিদির দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া রমেণ বলিল, "হ্যাঁ বৌদিদি, তুমি আর দেরী কোর না—ওঁদের বড্ড কষ্ট হোচ্ছে।"

কথাটা শুনিবামাত্রই কি জানি কেন তপেন আর কোন কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে তাহাকে যাইতে দেখিয়া রমেণ বলিল, "ওহে তপেন, যাচ্ছ কোথায়—জামা কাপড় ছাড়।"

"সে আর ভাই তোমাকে কষ্ট কোরে বোলে দিতে হবে না।" এই বলিয়া তপেন বাহিরে চলিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিল—কি লজ্জার কথা, যদি তাঁদের কাণে এই সব গিয়ে থাকে? যদি তাঁহারা রমেণের ব্যঙ্গটা বুঝতে পেরে থাকেন। রমেণ একটা scoundrel!

এদিকে মহিলারা নিজ নিজ বাসার অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

(১১)

পরদিন বিকাল বেলায় রমেণের বৌদিদি অনাথ-বাবুর বাসায় পদার্পণ করিবামাত্র; কোথা হইতে চকিতে সরযূ হাসিমুখে আসিয়া বলিল, "দিদি, পথ ভুল বুঝি আজ আমাদের বাসায় পদার্পণ। গরীব বোনেদের কথা আর কি মনে থাকে?"

সরযূর কথায় রমেণের বৌদিদি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন থাকবে না সরযূ—যাতে আরো বেশী কোরে মনে থাকে তার ব্যবস্থা কোংতেই ত এসেছি।"

দিদির এইরূপ কথার ধরণ বুঝিতে পারিয়া, সরযূর হাস্যমুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার বুকের মধ্যে দপ্‌দপ্ করিয়া হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল।

সরযূর চির-প্রফুল্ল মুখ সহসা মলিন হইতে দেখিয়া রমেণের বৌদিদি তাহাকে সাগ্রহে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার গোলাপ-নিন্দিত গণ্ডে একটি চুম্বন দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে সরযূ, মাধবী কোথায় রে?"

"বৌদিদি ও ঘরে আছেন।" এই বলিয়া সরযূ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল।

হঠাৎ সরযূর সহিত দিদিকে আসিতে দেখিয়া, মাধবী তড়িত গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া, দিদির সামনে আসিয়া হাসিমুখে বলিল, দিদি, কি রকমের মানুষ তুমি—একদিনও কি আসতে নেই? ঠাকুরপোদের পেয়ে কি আমাদের একেবারে ভুলে গেলে—আচ্ছা মানুষ যা-হোক্ দিদি!"

"কি কোরে আসি বলত মাধবী—ঘরের কাজ-কর্ম্ম না সেরে ত আর আসতে পারি না। আজ যে শত কাজ ফেলে এসেছি নিতান্ত স্বার্থের খাতিরে—নইলে কি আর আসতুম?" এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

দিদির কথা শুনিয়া মাধবী উৎসুকভাবে বলিল, "কার সঙ্গে এমন কি কাজ দিদি?"

রমেণের বৌদিদি কৌতুক-মিশ্রিতকণ্ঠে বলিল, "কার সঙ্গে আবার—তোর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে। তোর কি এখন কাজ সারতে কিছু বাকী আছে মাধবী?"

"না দিদি, এমন কোন দরকারী কাজ নেই।" এই বলিয়া মাধবী দিদির কথা শুনিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া উঠিল।

মাধবীর উৎকণ্ঠাকে নিবারণ করিবার জন্য, রমেণের বৌদিদি একে একে সরযূ-তপেন সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা তাহাকে বলিল।

এই সব কথা শুনিয়া মাধবীর অন্তঃকরণ আনন্দে দুলিয়া উঠিল। সে অত্যধিক আনন্দে দিদিকে জড়াইয়া বলিয়া ফেলিল, "দিদি, যদি কোন রকমে তপেন বাবুর সঙ্গে সরযূর বিয়েটা দেওয়াতে পারেন—তা' হোলে বড়ই সুখের হয়।"

"ওরে মাধবী তোকে আর অত কথা বোলতে হবে না—সে সব আমি ও রমেণ ঠাকুরপো পরামর্শ কোরে ঠিক কোরেছি। আমি কেবল একবার সরযূর পিতার মতটা জানতে এলাম। যদি উনি বিবাহের মত দেন, তা' হোলে ঠাকুরপো কলকাতায় গিয়ে তপেন ঠাকুরপোর বাপের মত নেবে।"

"আমাদের এরা মত দেবার আগে আমিই মত দিচ্ছি দিদি। তপেনবাবুর মতন মানুষের হাতে যদি এঁরা সরযূকে সঁপে দিতে না চান; তবে আর কার হাতে দেবেন?"

মাধবীর কথা শুনিয়া রমেণের বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি মত দিলে ত চোল্‌বে না মাধবী—আমাদের মতে কি আসে যায় বল। যাঁদের মতে কাজ হবে, তাঁদের মত দরকার আগে।"

এই বলিয়া কিংক্ষণ নীরব থাকিয়া, কি ভাবিয়া আবার রমেণের বৌদিদি বলিলেন, "দেখ্ মাধবী, অনাথবাবু বাসায় ফিরলে আমি যা যা বলে গেলাম, তাঁকে সব কথা খুলে বোলবি। তিনি যেন তাঁর কাকাবাবুকে সব কথা বলেন। তাঁরা যা পরামর্শ কোরে স্থির করেন—আমাকে কাল বোল্‌বি, কাল ফের আমি এমনি সময়ে আবার বুঝ্‌লি ত?" এই বলিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তাঁহাকে এইরূপ ভাবে হঠাৎ উঠিতে দেখিয়া মাধবী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "দিদি, যদিও বা একটু পায়ের ধুলো দিতে এলে, কি একটু তবু বোসতে নেই?"

"না ভাই, আর আর বোসব না, অন্য একদিন এসে বোসব।" এই বলিয়া তিনি যাইবার সময় পুনর্ব্বার মাধবীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গেলেন, যাহাতে সে সব কথা তাঁদের বলে।

মাধবী স্মিত উন্মুক্ত-মুখে বলিল, "খুব মনে থাকবে দিদি—খুব মনে থাকবে। এখন তোমার হাত যশ।" এই বলিয়া মাধবী হাসিয়া ফেলিল।

যাইতে যাইতে রমেণের বৌদিদি বলিলেন, "আমার হাত যশ কিছু হবে না মাধবী, সরযূ কপালে লেখা থাকলেই হবে। তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র।"

(১২)

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাহিরের 'কল' সব শেষ করিয়া অনাথবাবু যেমনি ঘরের দরজায় পদার্পণ করিবেন, এমন সময় মাধবী ঘরে ঢুকিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "আজ বড় একটা সু-খবর আছে।"

গায়ের জামা খুলিতে খুলিতে অনাথবাবু বসিলেন, "কি এমন সু-খবর?"

মাধবী হাসিমুখে বলিল, "আগে তুমি একটু বিশ্রাম কর, হাত মুখ ধোও, তারপর সব খুলে বোল্‌বো।" এই বলিয়া স্বামীর হাত পা ধুইবার জন্য জল আনিতে চলিয়া গেল।

মাধবী জল লইয়া আসিলে অনাথবাবু বলিলেন, "সরযূ কোথায়—তাকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না?"

মাধবী বলিল, "সে বোধহয় উপরে আছে।"

হাত মুখ ধোওয়া শেষ হইয়া গেলে, অনাথবাবু বলিলেন, "কাল সরযূকে দেখ্‌বার জন্য আমার কয়েকজন বন্ধু আস্‌বেন।"

তখন মাধবী তার দিদির কথাগুলি তাঁহাকে শুনাইয়া দিল এবং বলিল, যে তোমাদের মত দিবার আগেই তোমার হোয়ে মত দিয়া দিয়েছি।

মাধবীর নিকট হইতে এই প্রকারের সু-সংবাদ শুনিয়া অনাথবাবু অত্যন্ত আনন্দের সহিতই বলিলেন, "এতে আর ত অমত কর্‌বার কোন কারণ নেই। দিন দুই হোল শেখরবাবুর ভাইএর সঙ্গে তার বন্ধুটীর কন্দর্প-নিন্দিত চেহারা দেখে অবাক্ হোয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে নিয়েছি।"

স্বামীর মুখে তপেনের রূপের প্রশংসা শুনিয়া মাধবী স্মিত-মুখে বলিল, "দিদি বল্‌ন, তাঁর স্বভাব তার দেহের চেয়ে সুন্দর—বড়ই মধুর। দিদির একান্ত ইচ্ছা যে তপেনবাবুর সঙ্গে সরযূর বিবাহ হয়। তোমার মত কি এখন তাই বল?"

অনাথবাবু হাসিয়া বলিলেন, তুমি ত আগেই আমার হোয়ে মত দিয়েছ, তখন আমার মতের দরকার কি বল?"

মাধবী বলিল, "মশায়ের মতের জন্য ত বোল্‌চি না, কাকাবাবুর মতটা ঠিক কোরেই দিন। তিনি উপরের ঘরেই আছেন। শুভকার্য্যে বিলম্ব কেন। তাঁর কাছে কথাটা পাড়ুন না; তিনিও ত তপেন-বাবুকে গাড়ীতে দেখেছেন।"

"তিনিও তোমার দেখ্‌ছি আর সয় না—আচ্ছা হুকুম তামিল কোরতেই চল্লুম।" এই বলিয়া তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

কাকাবাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া অনাথবাবু সরযূর বিবাহ সম্পর্কে যে নূতন সম্বন্ধ আসিয়াছে তাহা সবিস্তারে তাঁহাকে জানাইলেন। ইহা শুনিবামাত্র তিনি আনন্দাশ্রুপূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা অনাথ, শেখরবাবুর বাসা, কোনটা বল ত—একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা কোরে আসি!"

অনাথবাবু বলিলেন, "কাকাবাবু, অত উতলা হবেন না। সব ত শুন্‌লেন—এখন কর্ত্তব্য কি তাই বলুন। কাল বিকালে শেখরবাবুর স্ত্রী আসিয়া সমস্ত জানিয়া যাইবেন। তার পর যা করবার, রমেণবাবু তা কোর্‌বেন।"

কাকাবাবু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "বাবা অনাথ, তপনের মতন এমন ছেলেকে কি আমি আশা কোর্‌তে পারি—ইহা যে স্বপ্নাতীত!"

অনাথবাবু বলিলেন, "সরযূর অদৃষ্টে যদি ঐ পাত্র লেখা থাকে, তবে হবেই হবে। তবে তপেনবাবুর মতন সুপাত্র পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়?"

অনাথবাবুর কথায় তাঁহার দুই চক্ষে জলের ধারা দেখা দিল। তিনি কোন প্রকারে সেই অশ্রুকে দমন করিয়া গাঢ়-স্বরে বলিলেন, "বাবা অনাথ, সরযূর কি এমন সৌভাগ্য হবে!"

"হবে কি না হবে তা ভগবানের হাত তবুও আমরা চেষ্টা কোর্‌তে ছাড়্‌ব কেন কাকাবাবু?"

নিঃশব্দে কিছুকাল কাটিয়া গেলে অনাথ বাবু তাঁহার কাকাবাবুকে চিন্তান্বিত দেখিয়া বলিলেন, "কাকাবাবু, কাল তা' হোলে কি বলা যাবে?"

অনাথবাবুর কথায় চমকিত হইয়া তিনি বলিলেন, "বৌমা ও তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর বাবা।"

কাকাবাবুকে আর কিছু না বলিয়া অনাথবাবু ঘর হইতে চলিয়া আসিলেন।

অনাথবাবু বাহির হইয়া গেলে, তিনি সরযূর অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা—কত বিনিদ্র রজনী তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে সংযুর জীবন যাহাতে সুখে কাটে তাহার উপায় চিন্তা করিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন, আজ সরযূর ভাবী সৌভাগ্যের সূচনা দেখিয়া তাঁহার দুইগণ্ড বহিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

(১৩)

বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে

হঠাৎ একদিন বিকাল বেলায় রমেণ তপেনের খোঁজে মেসে আসিয়া দেখিল, তপেনের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। পাশের ঘরে খোঁজ লইয়া জানিল—তপেন আজ আর বাহির হয় নাই ঘরের মধ্যেই আছে। এই সংবাদ শুনিয়া রমেণ নীচে গিয়া মেসের ঠাকুরকে রাস্তার খাবার ইত্যাদি করিতে নিষেধ করিয়া পুনরায় উপরে উঠিয়া আসিয়া তপেনের দরজায় এক বিপুল বিরাশী ওজনের ধাক্কা দিল।

দরজাতে এমন সময়ে এইরূপ আঘাত হওয়াতে তপেন ঘরের মধ্য হইতে কহিল, "কে?"

রমেণ কোন কথার জবাব পর্য্যন্ত না দিয়া পুনরায় দরজায় ধাক্কা দিল।

ঘরের মধ্য হইতে তপেন গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "কে হে, দরজায় এমন ধাক্কা দাও—এত আর বেওয়ারীশ মাল নয়?"

তবুও রমেণ তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া দরজায় আর একবার ধাক্কা দিল!

এবার তপেন অসহিষ্ণু হইয়াই বলিল, "দাঁড়াও না—কি রকম বেরসিক হে?"

রমেণ তপেনের ব্যবহারে অধৈর্য্য হইয়া এমন জোরে দরজায় এক ধাক্কা দিল যে অর্গলটী খুলিয়া তপেনের পার তলায় পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে রমেণ ঝড়ের মতন তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রমেণকে এইরূপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তপেন চকিতে বলিল, "কি হে বিজয়ীবীর, দরজার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়োল্লাসে অধীর হোয়ে পোড়েছ যে।"

রমেণ প্রত্যুত্তরে বলিল, "কি করি বল, তুমি ত আর দরজা খুল্‌বে না; অগত্যা দরজার সঙ্গেই খানিকটা কসরৎ কোরে নেওয়া গেল!"

"কসরৎ ত খুবই দেখালে, এখন হঠাৎ এ রকম কোরে মহাশয়ের আসার উদ্দেশ্য কি তাই বল।"

এই বলিয়া তপেন রমেণের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"আমাকে বুঝি আর আস্‌তে নেই নয়?" এই বলিয়া রমেণ তাহার হাসিতে ঘরখানিকে ভরিয়া তুলিল।

তপেন তাহার কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

তপেনের দিকে চাহিয়া রমেণ বলিল, "এতক্ষণ ধোরে ঘরের মধ্যে কি কোর্‌ছিলে বলত?"

তপেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি আর কোর্‌ব—শুয়েছিলেম।"

ব্যঙ্গস্বরে রমেণ বলিল, "এই বুঝি তোমার শোবার সময়—কোন শাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে বল ত?"

তপেন বলিল, "কোন শাস্ত্রে অংশু এ কথা লেখা নাই সত্য কিন্তু কি করি ভাল লাগ্‌ছিল না বলিয়াই শুয়েছিলাম।"

অযুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া রমেণ বলিল, "শুয়েই-ছিলে না আর কিছু কোর্‌ছিলে? চল, চল, একটু বেড়িয়ে আসি।" এই বলিয়া তপেনকে জোর করিয়া বিছানা হইতে উঠাইয়া দিল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে রমেণ বলিল, "তোমাকে একটা সংবাদ দিতে একেবারেই ভুলে গেছি। কাল বৌদিদি বর্দ্ধমান থেকে এসেছেন—তোমাকে এক-বার দেখা করবার জন্য বলে দিয়েছেন। তুমি ভাই চল নচেৎ বৌদিদি কি মনে কোরবেন।"

বৌদিদি আসিয়াছেন শুনিয়া তপেন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রমেণের সহিত তাহাদের বাসার দিকে চলিল।

বাসায় পৌঁছিয়াই রমেণ আনন্দে অধীর হইয়া ডাক দিল, "বৌদিদি, বৌদিদি, আসামী হাজির।"

রমেণ ঠাকুরপোর গলার স্বর শুনিয়া তাহার বৌদিদি উপর হইতে উত্তর দিলেন, "তপেন ঠাকুর-পোকে উপরে নিয়ে এস।"

বৌদিদির কথা মত রমেণ তপেনকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া কহিল, "বৌদিদি, আমরা কোন্ ঘরে বোসব ?"

কথার উত্তর দিয়া বৌদিদি বলিলেন, "এই ঘরেই এস।"

ঘরে উপস্থিত হইয়া তপেন দেখিল—ঘরের একপার্শ্বে একটি কারুকার্য্য-সমন্বিত খাট—তাহাতে ধবধবে ফেননিভ এক অপূর্ব্ব শয্যা।

তপেনকে দেখিতে পাইয়া রমেণের বৌদিদি বলিলেন, "সেই যে এলে, আর ত আমাদের ওখানে গেলে না। লুকিয়ে লুকিয়ে বোধ হয় যাওয়া-আসা করা হয় তাই না কি ঠাকুর পো ?"

বৌদিদির কথার কোন জবাব না দিয়া তপেন চুপ করিয়া রহিল।

পুনরায় তিনি বলিলেন, "আজ যখন আসা হোয়েছে—তখন রাত্রে না খেয়ে কিন্তু যেতে দিচ্ছি না।" এই বলিয়া রমেণকে ইঙ্গিত করিলেন।

রমেণ তাহার বৌদিদিকে বলিল, "আমিও আস্‌বার সময় মেসের ঠাকুরকে খাবার তৈয়ার করবার কথা বারণ কোরে এসেছি।"

তপেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই বৌদিদি, আপনাদের কোন অভিপ্রায় আছে।"

উত্তরে রমেণের বৌদিদি বলিলেন, "আমাদের কোন অভিপ্রায় নেই এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

• • • •

খাওয়া শেষ হইয়া গেলে তপেন বাসায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলে, রমেণ বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, বৌদিদিকে পাঠিয়ে দিই, তাঁর সঙ্গে দেখা কোরে তুমি যেও।"

কিছুকাল কাটিয়া গেল অথচ বৌদিদি বা রমেণের আসিবার কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া, সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কাহাকে ডাক দিতে ও পারিল না—পাছে কেহ যদি কিছু মনে করেন। এই ভাবিয়া সে আরো কিছুকাল নীরব থাকিয়া তাহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।"

বৌদিদির পরিবর্ত্তে সে দেখিতে পাইল একটি সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা ষোড়শী স্ত্রীমূর্ত্তি ঘরের মধ্যে ঢুকিবামাত্রই বাহিরে হাসির উচ্চরোল উঠিল এবং এবার সহসা ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

গৃহের উজ্জ্বল আলোকে তপেন সরযূকে চিনিতে পারিয়া সহাস্যে বলিল, "তুমি এখানে—কবে এলে ?"

লজ্জায় রাঙা হইয়া সরযূ কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল, "কাল।"

বাহির হইতে বৌদিদি বলিয়া উঠিলেন, "তপেন ঠাকুরপো, বাসায় যাবে না ?"

জানালার ফাঁক হইতে রমেণ গাহিয়া উঠিল,

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবন,
কোথায় নিয়ে যায় কে জানে।"

মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। তপেনের বাবা তাহার আত্মীয় স্বজনগণের সঙ্গে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রির নয়টার লগ্নে দুইটী অভীপ্সিত হৃদয় মিলিত হইল। তপেনের সকলই যেন স্বপ্ন বলিয়া দেখিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

সমাপ্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

(শ্রীঅকুরচন্দ্র মিত্র)

বিগত ৮ই ও ৯ই আষাঢ় তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন নৈহাটীতে ও তৎপূর্ব্বে ১লা ও ২রা আষাঢ় 'বঙ্কিম সম্মিলন' কাঁঠালপাড়ায় হইয়া গিয়াছে। যেরূপ বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়া এ বৎসর সম্মিলনের কার্য্য হইয়াছে, তাহাতে এরূপ সুন্দর ভাবে যে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে অনেকের সন্দেহ ছিল। জাতীয় জীবন, জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়াই গঠিত হইয়া থাকে। এই যুগে সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতিহতার উদ্ধারনে যিনি প্রধান সহায়ক ছিলেন তিনি আমাদের সকলের নমস্য ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্য-গুরুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা তর্পণের জন্যই এ বৎসর নৈহাটীতে সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। গত বৎসর মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনে বঙ্কিমমণ্ডলের শেষ জ্যোতিষ্ক মাননীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্কিম-তীর্থে সম্মিলনীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এক বৎসর ধরিয়া অনেক বাদানুবাদ—অনেক বিচারবিতর্ক—অনেক জল্পনা-কল্পনা হইয়া মতান্তরের যে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অনেকের মুখে আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা দেশে যত সহজে মতান্তর মনান্তরে পরিণত হয়, জগতের অন্য কোন সভ্যদেশে তত সহজে হয় না। যৌথ-পরিবারের দেশে স্ব স্ব মত প্রাধান্য কখন ও ছিল না। স্ব স্ব মতকে যতই অভ্রান্ত বলিয়া মানব স্বীকার করুন, তথাপি বহুলোকের মতের বিরোধী মত সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া বাঙ্গালাদেশে ইতিপূর্ব্বে কখনও দাঁড়াইতে পারে নাই। আজ কলিকার স্ব স্ব মত প্রাধান্যের দিনে—তথাকথিত স্বাধীনতার যুগে—কেহই কাহাকেও পরাস্ত হইতে বলেন না; কিন্তু যুক্তি সাহায্যে অপরকে স্বমত সমর্থন জন্য আনয়ন করিতে না পারিলে, দল বাঁধিয়া সাধারণের মতের বিরুদ্ধে সাময়িক উত্তেজনা বা প্রবৃত্তি বশে কোনও একটা কাজ করা ভাল নয়। মতের বিরোধ থাকা মন্দ নয়, তাহাতে আলোচনার সুবিধা ও সত্যের স্বরূপ বুঝিবার সহায়তা হইতে পারে এবং অনেক স্থলে সুফলও ফলিয়া থাকে। ভুল ভ্রান্তি বুঝিবার পক্ষে বিরুদ্ধবাদীরা যেরূপ সহায়তা করিয়া থাকেন, স্বমতাবলম্বীরা সেরূপ করিতে পারেন না; কিন্তু জানিনা কোন দৈবরোষে আজিকাল মতান্তর মনান্তরেই পরিণত হয়—আজিকাল সাহিত্য-সম্মিলনে মতবিরোধীদের ভিতর যেরূপ দুর্জ্জয়ণীয় আলোচনার সৃষ্টি হইতেছে, তাহা দেখিয়া বাস্তবিকই ব্যথিত হইতে হয়। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে আধুনিক যুগকে দল-বাঁধার যুগ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় বলি,—"আজিকার হাওয়ার গতি দল-বাঁধার দিকে। যিনি যেখানে আছেন, তিনি সমানধর্ম্মা ব্যক্তিকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহার সহিত দল পাকাইতেছেন। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতির চর্চ্চা করেন, তাঁহারা কংগ্রেসে, কন্‌ফারেন্সে, জেলা সমিতিতে, পল্লী-সমিতিতে দল পাকাইতেছেন; যাঁহারা সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী, তাঁহারা সামাজিক কন্‌ফারেন্সে মিলিত হইতেছেন, যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের অনুগত, তাঁহারা ধর্ম্ম মহামণ্ডলে সম্মিলিত হইতেছেন; যাঁহারা শিল্পের উন্নতি চান, তাঁহারা দল বাঁধিতেছেন; যাঁহারা শিক্ষার উন্নতি চান, তাঁহারা দল বাঁধিতেছেন; আমরা সাহিত্য-

সেবীরাই কি চুপ করিয়া থাকিব? সকলের দেখা দেখি আমরাও জোট বাঁধিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। সকলেই যদি হাওয়ায় অনুকূলে গা চালিয়া দেন, আমরাই বা বসিয়া থাকিব কেন? আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলনকে যদি কেহ গড্ডালিকা প্রবাহের মত পরের অনুকরণ-জাত বলিয়া উপহাস করিতে চান, তাহাতে আমরা — কর্ণপাত করিব না।

করিব না, কেন না, যে হাওয়ার বেগে নৌযান হইয়া আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহা বিধাতার প্রেরিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস।" বাস্তবিকই জাতীয়-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগীতা যে আছে, তাহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু সামান্য বিষয় লইয়া মনোমালিন্য হইলেই আত্মাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া যে সঙ্ঘের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিতে হইবে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল পাকাইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। আর এরূপ করিলে এত বড় জনহিতকর প্রতিষ্ঠা টী অকালে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতে পারে। বিরোধের ভিতর সমন্বয়ের চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচি 'সংহতি কার্য্য সাধিকা'—অকারণ বলক্ষয় করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়।

এবারকার মূল সভাপতি বর্দ্ধমানাধিপতির ও বিজ্ঞান ও দর্শনের শাখার সভাপতিদ্বয়ের অভিভাষণ বেশ অল্প কথার মধ্যে লিখিত হইয়াছে। সাহিত্য ও ইতিহাস শাখার সভাপতিদ্বয়ের অভিভাষণ অতি বিস্তৃত হইয়াছে। ইতিহাস শাখার অভিভাষণে অনেক নূতন জানিবার কথা আছে। এমন সুচিন্তিত প্রবন্ধের যথোপযুক্ত আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের মনে হয় সভাপতিদিগের অভিভাষণ যত অল্প কথায় বলা হয় ততই ভাল। তু কেবল একটা বিষয় লইয়া আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত; কারণ পাঁচটী সভাপতির অভিভাষণ শ্রবণ ও ধারণ করিয়া রাখা শ্রোতাদের পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নয়। এমন মনোজ্ঞ ভাবে অল্প পরিসরের মধ্যে সভাপতিদের বক্তব্য বিষয়টী বলা উচিত, যাহাতে শ্রোতাদের মনের মধ্যে একটা দাগ (impression) রাখিয়া যাইতে পারে। নূতন তথ্যের সন্ধানও তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রোতারা চাহিয়া থাকেন।

তারপর যে ভাবে আজি কাল প্রবন্ধ পাঠ হয়, তাহার প্রশংসা কোন মতেই করিতে পারা যায় না। সময় সংক্ষেপ জন্য অনেক প্রবন্ধ বক্তৃতাকারে পঠিত হয়। ইহাতে রস ভঙ্গ হইয়া যায়—অনেক স্থলে অর্থবোধ ভারূপ হয় না —ভাবের পারম্পর্য্য, সঙ্গতি থাকে না। আমাদের মনে হয় সভাপতি মহাশয়েরা পূর্ব্ব হইতে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট পাঁচটী কি ছয়টী প্রবন্ধ বাছিয়া লইয়া সম্পূর্ণ ভাবে পাঠ করিবার অনুমতি দেন, তাহা হইলে সকলেই রস গ্রহণ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন। অপর প্রবন্ধ গুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইলেই চলে। যতদূর স্মরণ হয় ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস শাখার সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছিলেন; আর বর্দ্ধমানে ঐতিহাসিক প্রবর যদুনাথ সরকার মহাশয় স্বয়ং পঠিতব্য প্রবন্ধগুলির যে অংশটুকু পঠিত হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অর্থসঙ্গতির জন্য দু এক ছত্র করিয়া, তিনি স্বয়ং লিখিয়া দিয়া ভাবের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এরূপ করিলেও মন্দের ভাল হয়। তবে এই সম্পাদন কার্য্যে সভাপতি মহাশয়দের যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইবে। আর কোন কোন শাখা সভাপতি মহাশয়েরা কালকে প্রবন্ধপাঠের নিয়ামক করিয়া থাকেন। এবার দর্শন শাখায় এই নিয়মই অনুসৃত হইয়াছিল—সকল প্রবন্ধকারকেই

বঙ্গসাহিত্যের (চতুর্দ্দশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতি)

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন (দর্শন-শাখার সভাপতি ও বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা—সমিতির সভাপতি)

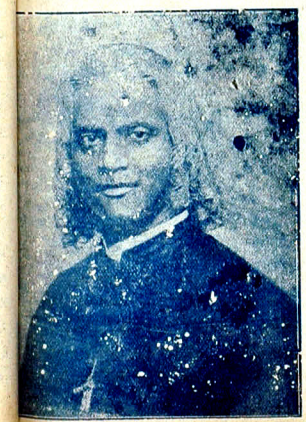

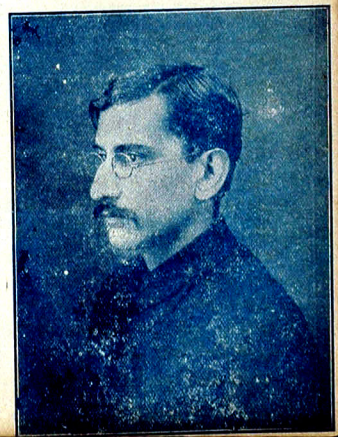

১৫ মিনিট সময় পড়িবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। এরূপ করিলেও প্রবন্ধের রস-মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। বক্তব্য বিষয়ের ধারণাও বেশ সুস্পষ্ট হয় না। এরূপ করাও যুক্তিসঙ্গত নয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্মিলনের সামাজিক যে একটা দিক আছে সে কথাটা আমরা ভুলিয়াই যাই। সাময়িক পত্রের সাহায্যে বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিবার আমাদের সুবিধা ও সুযোগ হয় সত্য; সম্মিলনের পঠিত প্রবন্ধও অনেক সময় সাময়িক পত্রে আমরা পড়িতে পাইয়া থাকি, কিন্তু সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের হৃদয়ের ভাব-বিনিময়ের—মেলা মেশার সুবিধা যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখাও কর্ত্তব্য। প্রবন্ধপাঠাদি বন্ধ করিয়া দিবার আমরা পক্ষপাতী নই; ঐ গুলি যথাসম্ভব কম করিয়া, সম্মিলন সামাজিকতার দিকটার প্রতি উদ্যোক্তাদিগের দৃষ্টি একটু আকর্ষণ করিয়া দিতে চাই। সভা বসিবার পূর্ব্বে ও পরে অধিক সময়েই বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে বাদানুবাদ চলিয়া থাকে; সমাগত ভদ্রমহোদয়দিগের ভিতর মেলা মেশার সুবিধা বড় থাকে না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া যাহাদের সহিত আমরা এক প্রাণ, যাহাদের সহিত আমরা সমধর্ম্মী—এক মতাবলম্বী, যাহারা আমাদের প্রকৃত সখা-বন্ধু তাহাদের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে মিশিবার সুবিধা এখানে সহজে হইতে পারে। বন্ধুর সহিত বন্ধুর চাক্ষুষ পরিচয়ের সুবিধা করিয়া দিবার ব্যবস্থা থাকা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। পত্র বিনিময়ে এ কার্য্যটা কতক পরিমাণে যে চলিতে পারে না, তাহা বলি না; তবে এ কথা ও বলিয়া রাখা ভাল 'দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে'!

এইবার আমরা সংক্ষেপে অভিভাষণ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দু চারি কথা বলিব। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর বরদাকান্ত মিত্র মহাশয়ের অভিভাষণ রসে ভরপুর ছিল। ইতিহাস সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যে সকল দেশের অতীত কাহিনী শুনিয়াছিলেন তাহা বলিবার পর তিনি বলেন,—'এই স্থানটী বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। আমার মনে হয়, সাহিত্যের পক্ষে এই স্থানটি কল্পতরুবিশেষ; অর্থাৎ সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের চর্চ্চার মালমসলা প্রভূতপরিমাণে এখানে জমা আছে। কুমারহট্ট হ'তে কাঁকনাড়ার পথে এই ভাগীরথীর বুকে সপ্তডিঙ্গা ভাসিয়ে দিয়ে একদিন শ্রীমন্ত ভেসে গিয়েছিলেন। কলিকাতা অবরোধের সময় বাঙ্গালী সেনার শেষ বিজয়বাহিনী ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে এইখানে গঙ্গাপার হ'য়ে রথডাঙ্গার মাঠে ছাউনি ফেলে ছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য একদিন আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী কুমারহট্টে (হালিসহর) শ্রীবাসের অঙ্গনে অবস্থান ক'রেছিলেন এবং তাঁর পুষ্করিণীতে স্নান ক'রেছিলেন। মহাপ্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য আমাদের গরিফার কন্দর্প সেনকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কন্দর্প সেনের সমাধি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হ'য়েছে। কন্দর্প সেনের বংশে বাংলার প্রথম অভিধানকার দেওয়ান রামকমল সেন জন্মগ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রপিতামহ মহামহোপাধ্যায় মণিরত্নচন্দ্র তর্কভূষণ নৈহাটীতে টোল ক'রে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান ক'রতেন। তাঁ'র হাতের লেখা পুঁথি শাস্ত্রী মহাশয়ের ঘরে আমাদের দেশের পুঁথির সামগ্রী হয়ে আছে। এর পরই ভাটপাড়ার অভ্যুত্থান হয়। ভাটপাড়ার হলধর তর্কচূড়ামণি ও রাখালদাস ন্যায়রত্ন প্রভৃতির নাম দেশবিদিত। শাস্ত্রী মহাশয় যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, রামকল ন্যায়রত্ন সেই বংশ উজ্জ্বল করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার অল্পবয়সেই বিধিনয়ী নৈয়ায়িক হ'য়েছিলেন।'

শ্রুতি থেকে এবার স্মৃতিতে আসা যাক। গরিফার রামকমল সেনের বংশে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। তাঁর মত বক্তা সে যুগে অতি

অল্পই ছিল। তাঁর খ্যাতি ভারত অতিক্রম করে' ইউরোপে ব্যাপ্ত হ'য়েছিল। তাঁর লেখা 'দেবকের নিবেদন' এত সরল ও সুন্দর যে আমার মত লোকের ও হৃদয় হরণ করে। কেশবচন্দ্রের বিধানেই ব্রাহ্ম সমাজে নববিধানের আবির্ভাব।

আপনাদের ও আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র এই কাঁঠাল পাড়ার লোক। তাঁর নামে যেন একটা মোহ আছে। • • • সাহিত্যে বঙ্কিম চন্দ্রের দানের বিষয় যদি কিছু বলি, সেটা আপনাদের পক্ষে বোঝার উপর শাকের আঁটীর সমান হইবে মাত্র। 'দুর্গেশনন্দিনীতে' রমণীর প্রেমের কমনীয় চিত্র, 'মৃণালিনীতে' প্রেমের ও কর্ত্তব্যের সংগ্রাম, 'বিষবৃক্ষে' ধর্ম্মবিহীন শিক্ষার উপর পাশ্চিম রূপের প্রভাব, 'কপালকুণ্ডলা'য় স্বভাবের শিশুর সহিত সমাজ-পালিতের পার্থক্য, 'দেবীচৌধুরাণী'তে ভোগের মাঝে ত্যাগের সাধনা, 'রাজসিংহে' আদর্শ রাজপুত চরিত্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ও দৃঢ়তা, 'আনন্দমঠে' আদর্শ মাতৃভূমির সেবা, 'সীতারামে' বাঙ্গালীর বল ও বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা, 'রজনী'তে বাহ্যদৃষ্টিহীন অন্ধের ও তাহার সঙ্গিগণের অন্তর্দৃষ্টী আত্মবিশ্লেষণ 'চন্দ্রশেখরের' সংযমেই প্রেমের গৌরব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একদিন এইখানেই তাঁর 'কমলাকান্তে' চটুলচাপল্যের সাথে জ্ঞান ও চিন্তার সংমিশ্রণ, 'বিবিধ প্রবন্ধে,' 'অনুশীলনে' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে' অতুলনীয় বিচার ও চিন্তাশক্তির সমন্বয় এবং গীতার টীকার সুগভীর দর্শনতত্ত্ব সমগ্র বাঙ্গালীকে স্তম্ভিত করেছিল। আজিকার এই সম্মিলন তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে দেওয়া অর্ঘ্য মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে দান নেহাৎ সামান্য নয়।

এই স্থান বর্ত্তমান যুগের অনেক মনীষীর আদি বাসস্থান। 'ইণ্ডিয়ান' মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রায় রাঁইয়া রঘুরাম মিত্র, বেঙ্গারিলাল গুপ্ত, কারতারক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা তারকচন্দ্র সরকার, তৎপুত্র নলিনবিহারী সরকার ও লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের দেশের গৌরব। ইহাদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ এখনও জীবিত।

ভৌতিক গল্প হয় ত আপনারা বলে অনেক শিখে থাকেন। যিনি সেই ভূতকুলের পরম ভীতির কারণ ছিলেন এবং যাঁর হুকুম ভূতপেত্নী হেঁটমুণ্ডে মান্‌ত সেই 'গঙ্গা মহরা'র জন্ম এই গ্রামে।

এইবার আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাথার মণির কথা বলা। হরে প্রসাদে হর প্রসাদকে পেয়ে আমার ধন্য। বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতের অতীত ইতিহাসের তত্ত্বালোচনায় তিনি যে এখনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তার আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একজন শিষ্য, আজ তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁর গুরুদেবের স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্য প্রদানের জন্য আপনাদের এখানে নিমন্ত্রণ করে' এনেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'ক এবং তিনি দীর্ঘজীবী হ'য়ে বঙ্গসাহিত্য ও নৈহাটীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে থাকুন।'

তারপর মূল সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি সাহিত্যিকবিগকে পুরস্কৃত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে যুক্তি পূর্ণ আলোচনা করেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

'একটা কথা স্থাপনাবের বিচারার্থে বিবেচন করা আমি একান্তই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। আমার মনে হয়, এ কথার অন্তর্নিহিত সত্য আপনারা সকলেই নিজ নিজ অন্তরে স্পষ্ট অনুভব করেন, কিন্তু ইহার সাফল্য সাধনে অদ্যাপি বিশেষ কোনও চেষ্টা হইয়াছে কি না জানি না। এইরূপ বৎসরিক সম্মিলন সজাগ রাখাই যদি আমাদের অভিপ্রেত হয়, বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণকে সজীব করাই যদি আমাদের জপ, তপ, ব্রত হয়, তবে যাহাতে তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে পারা যায় তাহাই করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহা করিতে হইলে বৎসরিক সম্মিলনীতে কেবল সুন্দর সুন্দর

প্রবন্ধাদি পাঠ ও শ্রবণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া কেবল সম্মিলনের অধিবেশনের ক্রিয়াকলাপ মুদ্রিত করতঃ বৎসরাবধিকাল একরূপ নিষ্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষা—বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত উচ্চসিংহাসনে বসাইবার জন্য—সাহিত্য-ক্ষেত্রের চূড়ামণিগণকে সম্মানিত করিয়া জনসাধারণের মনোযোগ তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা অনুসন্ধান পূর্ব্বক স্থির করিতে হইবে। বর্দ্ধমানে যখন অষ্টম সাহিত্য সম্মিলন হয়, তখন আমি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দিয়াছিলাম তাহাতে এই বিষয়েরই ইঙ্গিত ছিল। অদ্য আপনাদের অনুমতি লইয়া এই বিষয়েই আমি কিছু বিশদভাবে বলিতে চাই। আমার অভিভাষণের মূল উদ্দেশ্য তাহাই জানিবেন। আমি চাই যে আমাদের এই দরিদ্র দেশে Nobel prize এর মত সাহিত্যিকগণের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য কোনও prize বা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না হইলেও, প্রতি বৎসর চারি সহস্র মুদ্রা পরিমিত বা তদ্ধর্ম কোনও পুরস্কারের আয়োজন নিতান্ত অসম্ভবপর হইবে না। এই পুরস্কার প্রয়োজনানুসারে চারি বা ততোধিক সাহিত্য-শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, ইত্যাদি। প্রত্যেক বৎসর যখন সম্মিলন হইবে তখন একটী Executive committee (কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি) সম্মিলনের পক্ষ হইতে গঠিত হইতে পারে এবং তৎবৎসরের :—

মূলসভার সভাপতি
শাখা সভাপতিগণ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মিলন পরিচালনের সভাপতি ও সম্পাদক

এই সমিতির সদস্য হইতে পারেন। বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া লইয়া এই চারিটী শাখার চারিটী পুরস্কার কোন্ চারিজনকে দেওয়া হইবে তাহা এই সমিতির দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে। সম্মিলনের দ্বিতীয় দিবসে সম্মিলনের প্রধান সভাপতি এই পুরস্কার ঘোষণা করিবেন।'

এই প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তিনি বহু দুঃস্থ সাহিত্যিকের আশা পূর্ণ করিবার পথ সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকেই দুঃখ করিয়া থাকেন দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় ভাল পুস্তক প্রকাশিত হয় না। না হইবার কারণটা যদি একটু বিশেষ করিয়া অনুধাবন করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থকারদিগের উৎসাহের অভাবেও পুস্তক পাঠকের সংখ্যা কম বলিয়া পুস্তক বিক্রয়ের সংখ্যা ও কম। এরূপ পুস্তক হইতে ছাপাখানার খরচ ও উঠে না। পরিশ্রম করিয়া,ঘরের পয়সা খরচ করিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন? অবশ্য সাহিত্যকরের মধ্যে যদি ধনশালী কেহ থাকেন তাহা হইলে তিনি এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন; কিন্তু দুঃস্থ সাহিত্যকরের এপথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। সাহিত্যিকদিগকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যে সমীচীন তাহা কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। প্রতিভার উন্মেষে ইহা যে সহায়তা করিবে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

তৎপরে জগৎ বরেণ্য রবীন্দ্র নাথ সভাস্থলে সমাসীন হইয়া শ্রদ্ধার• অকৃত্রিমে বঙ্কিম-তর্পণ করিয়া যে সুললিত বক্তৃতা করেন তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অবশ্য সর্ব্বাগ্রে এ কথা বলিয়া রাখা ভাল সকল সভাপতি মহাশয়েরাই বঙ্কিম-তীর্থে আসিয়া বঙ্কিমের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা-অর্পণ করিয়াছেন। আর না করিবেনই কেন? স্মৃতির পূজা না করিতে শিখিলে কোনও জাতি কোনও কালেই বড় হইতে পারে না।

বিজ্ঞান শাখার সভাপতি আচার্য্য জগদানন্দ রায় মহাশয় তাঁহার অনবদ্য সুন্দর অভিভাষণে প্রথমেই বলিয়াছেন—,'জড়তত্ত্বের মূল ব্যাপার লইয়া আজ

যে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছেন, মহা-পণ্ডিত ডাক্তার মেঘনাথ সাহা তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। তিনি আজ বাংলাদেশের এবং ভারতের গৌরব। জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের যশো-রশ্মির ন্যায় তাঁহার শুভ্র যশঃকৌমুদীতে আজি জগৎ প্লাবিত হইতে চলিয়াছে। তাঁহার সাধনার ফল তাঁহার মাতৃভাষায় আমরা তাঁহারি কাছে শুনিতে চাহিতেছি। বিজ্ঞানের উচ্চতত্ত্ব সহজ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ইহা খুবই সত্য কথা। কিন্তু কঠিন বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। • • সাহা মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি তাঁহার গবেষণা-মন্দিরের বাহিরে যে সহস্র সহস্র কৌতূহলী নরনারী প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদিগকে তাঁহার তপস্যার কথা জানাইতে হইবে এবং সেই তপস্যার যে অমৃত লাভ হইয়াছে তাহার স্বাদ তাহাদিগকে দিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার দেশবাসী ধন্য হইবে। এবং তাঁহার সাধনাও সার্থক হইবে। দেশে জগদীশ প্রফুল্লচন্দ্র জ্ঞানচন্দ্র ও মেঘনাদের মত বৈজ্ঞানিক আছেন এবং রবীন্দ্রনাথের মতো জ্ঞানী কবি আছেন, এই বিশ্বাস দেশবাসীর হৃদয়ে যে বলের সঞ্চার করিবে তাহা অন্য উপায়ে সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব। কোনো জাতি যখন উন্নতির পথে যাইতে চাহে তখন এই বল পরম সহায় হয়।

আজ প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে। • • • • পরের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা ও গবেষণা করিয়া কোনো তত্ত্ব আবিষ্কার করা যে আমাদের পক্ষে সম্ভব ইহা গত ষাট বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর আমাদের মনে স্থান পায় নাই। তার পরে বাংলার পূর্ব্বগগনে জগদীশ ও প্রফুল্ল যুগলচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইলে আমাদের বিজ্ঞান-আলোচনা যে নূতন পথ ধরিয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। আজ প্রফুল্ল ও জগদীশচন্দ্রের শিষ্যদের গবেষণা-মূলক প্রবন্ধাদিতে বিদেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর পত্রিকা অলঙ্কৃত এবং "বহু বিজ্ঞানমন্দিরে" ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে বহু যুবক গবেষণায় নিযুক্ত। শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। ইহা দেখিলে আশায় বুক দুলিয়া উঠে। কিন্তু এই আশা পোষণ করিয়াই কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব? ছয় কোটি বঙ্গবাসীর কুড়িজন বা ত্রিশজন যুবক বিদেশে প্রতিপত্তি লাভ করিলে দেশের উন্নতি হয় না। বিজ্ঞানের শিক্ষা যখন আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের অস্থিমজ্জার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তখন বুঝিব দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা সার্থক হইয়াছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স জার্ম্মানি, প্রভৃতি দেশের যে কোনো বৈজ্ঞানিক পত্রের পাতা উল্টাইলে দেখা যায়, প্রতিদিন সেই সেখানকার শত শত লোকে বহু যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া পেটেণ্ট লইতেছে। কেহ চাষের জন্য নূতন সার আবিষ্কার করিয়া, কেহ ফলের উন্নতি করিয়া কেহ বা ফসলের কীটনাশের নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া সংবাদপত্রে প্রচার করিতেছে। আমাদের দেশে বৎসরে কত লোকে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া পেটেণ্ট লয় আপনারা তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কি? বিদেশে যাঁহারা নিত্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, নানা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তাঁহারা বিশ্ব বিজ্ঞালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী পণ্ডিত নয়। তাঁহারা আমাদেরি দশ জনের মতো চলনসই শিক্ষিত, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটা তাঁহাদের অস্থিমজ্জায় এমন বসিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা চোখ খুলিয়া পরখ করিতে জানেন, হাত পা নাড়িয়া কাজ করিতে পারেন, এবং চিন্তা করিয়া একটা কিছু উদ্ভাবন করিতে পারেন। আমাদের দেশে যতদিন ঐরকম মানুষ তৈয়ারি না হইবে ততদিন বলিব, দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে না। দেশের জনসাধারণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই একথা আমি স্বীকার করি না। এখনকার

বাংলাভাষাটি এমন সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাতে 'বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয় মোটামুটি প্রকাশ করিতে একটুও কষ্ট বোধ হয় না।' তাহার পর সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন এবং কোন প্রণালী অবলম্বন করিলে সাধারণে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবে তাহারও পন্থা স্থির করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"কোন্ প্রণালীতে অতি কঠিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেও জনসাধারণের বোধগম্য করা যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাহা সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরে একাধিক বার দেখাইয়াছেন। তা' ছাড়া হিন্‌ডাল বেলফিল্‌ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের উচ্চাসন হইতে নামিয়া জন-সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা এই সকল আচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিব না কি? সত্যের প্রচারে আমাদের দেশ কোনো কালে কোনো দেশের পশ্চাতে ছিল না। সত্যের সন্ধান পাইয়া আমাদের দেশের রাজার ছেলে সিংহাসন ছাড়িয়া, ভিক্ষুক তাঁহার পর্ণকুটীর ছাড়িয়া—ছুটিয়া বাহির হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সাধনার ধন জগৎ-মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া উপভোগ করিয়াছেন। আজো আমাদের দেশের অউল-বাউল উদাসী দরবেশ ও ফকিরের দল সত্যের আভাস পাইলে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন না,—নাচে গানে মাতোয়ারা হইয়া সব ছাড়িয়া সত্য বিলাইতে দেশের মাঝে বাহির হন। এই সব আপন-ভোলা ভবঘুরের দলই তো আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর অন্তরের সুধায় অন্নজল জোগাইয়া আসিতে-ছেন। ইঁহারা মন্ত্রগুপ্ত জানেন না। তপস্যার ধন দুই হাতে বিলাইয়া জীবন কাটাইতেছেন। যিনি বিজ্ঞানের যে মন্ত্রের সাধনা করিয়া সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি অবৈজ্ঞানিক জনসাধা-রণকে সেই মন্ত্রে দীক্ষা দিবেন। ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে, —আপনাদের আহ্বানে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে।

দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার আর একটি উপায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রচার। আমেরিকা ও য়ুরোপের বিজ্ঞানপ্রধান দেশে দেখা যায়, সরকারি বেসরকারি কারখানা কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে করিতে একটু নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইলেই তাহার বিবরণ পুস্তকাকারে দেশের সমস্ত লোকের হাতে পৌঁছায় এবং লোকে সেই সকল আবিষ্কার কাজে লাগায়। আজকাল আমাদের সরকারী কৃষিক্ষেত্রের চাষ আবাদের ফলের কথা ঐ পদ্ধতি কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রচার করিবার চেষ্টা হইতেছে,—কিন্তু তাহার আয়োজন যথেষ্ট নয়। কৃষকেরা তাহা জানিতে পায় না। কেবল কৃষি-বিভাগ নয় চিকিৎসা শিল্প প্রভৃতি সকল বিভাগেরই খবর সাধারণের কর্ণগোচর হওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞান-সম্বন্ধে সহজ ভাষায় লিখিত বাংলা পুস্তকাদির প্রচারও ত আমারা দেখিতে পাইতেছি না। আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয় আর আমাদের মধ্যে নাই। *মাননীয় যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের লেখনী এখন বিষয়ান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত। রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয় বোধ করি ভাবিতেছেন তাঁহার যাহা বলিবার ছিল বুঝি তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। সুলেখক শ্রীযুক্ত শরৎ রায় মহাশয়ের লেখনী এখন মন্থর গতিতে চলিয়াছে। ভূদেব ও অক্ষয়কুমারের যুগের সহিত তুলনা করিলে মনে হয় যেন নব্যলেখকদিগের বিজ্ঞান-প্রচারের উদ্যম অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আজ-কালকার বৃহদায়তন মাসিক পত্রগুলির পৃষ্ঠা ইংরাজি পত্রিকা হইতে গৃহীত আজগুবি বৈজ্ঞানিক সংবাদে ও চিত্রে পূর্ণ থাকে। ইহাতে এক দল পাঠকের মনোরঞ্জন হয়, কিন্তু শিক্ষা হয় না। পদার্থবিদ্যা,

ভূবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি ভাল পুস্তকও বাংলা ভাষায় নাই। ইহা লজ্জার বিষয় নয় কি? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যে ভাষায় "অব্যক্তকে" সুব্যক্ত করিয়াছেন, ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর স্বপ্নের কুহেলিকাকে সরাইয়া সুষুপ্তির চিন্তার ধারা যে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে ভাষায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও প্রাণিবিদ্যা রাসায়নীবিদ্যার পরিচয় দিবার পথ দেখাইয়াছেন, তাহাকে কখনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-প্রকাশের অনুপযোগী বলা যায় না। যাঁহারা দেশকে এবং বাংলা ভাষাকে ভাল বাসেন, এমন সুপণ্ডিত সুলেখকের অভাব নাই। পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাও এখন কম নয়। তবে কেন এত নিষ্কর্ম্মা? মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের প্রতি যে প্রীতি, যে শ্রদ্ধা লইয়া বর্ণপরিচয় লিখিয়া গিয়াছেন, আপনাদিগকে সেই প্রকারে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের সরল পুস্তক লিখিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ বালকবালিকা ও অজ্ঞানিক জনসাধারণকে বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করিতে হইবে। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর দশ বৎসর পূর্ব্বে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া এই বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশনে দাঁড়াইয়া বঙ্গের সুধীবর্গকে যে বিনীত অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, আজ আমি তাহারি পুনরুক্তি করিতেছি,—"আপনারা কৃতবিদ্য, আপনারা জ্ঞানী, আপনারা মনস্বী আপনাদের চেষ্টায় বঙ্গের নব জাগরণ আরব্ধ হইয়াছে। জননী বঙ্গভূমির কীর্ত্তিধ্বজা আপনাদের হস্তে ধৃত রহিয়াছে। আপনাদের নিজের যশোরশ্মি দেশ-দেশে ব্যাপ্ত হইতেছে। কিন্তু বঙ্গজননী আপনাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, বঙ্গভাষা আপনাদের স্নেহ প্রার্থনা করিতেছে, বঙ্গসাহিত্য আপনাদের করুণা-প্রার্থী, বঙ্গের জনসাধারণ আপনাদিগের অন্তেবাসী; আপনাদের সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে। এক্ষণে আপনার অবতরণ করুন।"

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ করিয়াছি। এখন আর একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। আজকাল আমাদের দেশে অনেক সাময়িক পত্র হইতেছে। (ঐ সব) কাগজের দুই চারি পৃষ্ঠা কি প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্য পৃথক্ রাখা যায় না? এই প্রকার স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া যদি সম্পাদকমহাশয়েরা দেশের লোককে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পোকামাকড় সাপ-ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরগিটি পশুপক্ষী, গাছপালার নাম ও বিবরণ লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন, তাহা হইলে এ টা বড় কাজ হয়। দেশের লোকে সাড়া দিবেই। চট্টগ্রামে যে রকম মাছ পাখী পে কামাকড় দেখা যায়, বীরভূমে তাহার সবগুলি দেখা যায় না, তাহাদের নামও জেলায় জেলায় স্বতন্ত্র। মাছেরা জলাশয়ের কি রকম স্থানে বাস করে, তাহাদের জীবনের ইতিহাসই বা কি, কোন্ পাখীরা কোন্ সময়ে আমাদের দেশে আসে, কখন চলিয়া যায়, পাখীদের বাসানির্ম্মাণ ও সন্তানপালনের পদ্ধতিই বা কি প্রকার—এরূপ তথ্য কি আমরা অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিব না? কয়েক বৎসর এই প্রকারে গাছপালা ও প্রাণীদের বিবরণ সংগৃহীত হইলে, বঙ্গদেশের উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-সম্বন্ধে সুন্দর পুস্তক রচনার সম্ভব হইবে। আর পঁচিশ বৎসর মাষ্টারি করিয়া দেখিয়াছি, ছেলে যখন নিজের চিন্তাকে বিসর্জ্জন দিয়া গুরুমশাইয়ের শরণাপন্ন হয়, তখন তাহাতে আর পদার্থ থাকে না। সে সুবোধ হয়, শান্ত হয়, নিয়মনিষ্ঠ হয়, বাধ্য হয় অর্থাৎ সার্টিফিকেটে যত গুণের তালিকা চায় তাহার সবগুলিই তাহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়,—খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেবল তাহার নিজের উপরে নিজের বিশ্বাস। সে সমস্ত জীবনই গুরুর সন্ধান করিয়া পুঁথি ঘাটে, গুরুর নির্দ্দেশ ব্যতীত সে এক পাও চলিতে পারে না। এই প্রকার গুরুশিষ্য-ব্যাপার সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন অপকার করে, বিজ্ঞান-জগতে ঠিক সেই রকমই অপকার করিয়াই আসিয়াছে। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক হক্‌সলি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, —Science commits suicide when it adopts a creed." তাই বলিতে চাই, যাঁহারা আমাদের দেশের প্রাণিবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবেন, তাঁহাদিগের ডারুইন ওয়ালেস্ বা মেচরলেও মতবাদ-সম্বন্ধে খোঁজ লইবার প্রয়োজন নাই এবং হুকসবরা, হিউম, ডিওয়ার ও ফর্ডানের পুঁথিতে কি লেখা আছে তাহাও দেখিবার দরকার নাই। স্বল্প দর্শনে যাহা চোখে পড়ে তাহাই লিপিবদ্ধ হউক। চোখ খুলিয়া প্রকৃতিকে দেখাই বিজ্ঞানের প্রথম শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হইলে যে ফল পাওয়া যাইবে তাহা অতুলনীয়।"

দর্শন শাখার সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সংক্ষেপে ষড় দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার গভীর জ্ঞানের ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সভাপতি রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের রচনা সরস হইলেও বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে তাহার নিকট হইতে আমরা যত-দূর আশা করিয়াছিলাম ততদূর পাই নাই। অনেক স্থলে রসটা একটু তরল ও হইয়াছিল। রস ব্যাপারে গাম্ভীর্য্য ও তিনি অনেক স্থলে রক্ষা করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি ও বিস্তৃতির আলোচনা না করিয়া, তিনি যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের নাটকের গতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় বুদ্ধের নাট্য-বিশারদের নিকট আমরা অনেক নূতন তথ্য লাভ করিতে পারিতাম; অবশ্য একেত্রে অল্প কথায় যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহাতেও শিখিবার কথা আছে, তবে উহাতে আমাদের তৃপ্তি হয় নাই। পরিশেষে বক্তব্য এই তাঁহাকে সভাপতিত্ব বরণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন কেবল যে তাঁহাকেই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার ন্যায্য দাবী যে পূর্ব্বে রক্ষিত হওয়া উচিত ছিল সে কথাও অস্বীকার করিবার নয়। স্বর্গীয় কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষকে এই সম্মাননই পদ বাঙ্গলার সাহিত্যেকরা কোন দিন দান না করিয়া যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছেন, মনে হয় রসরাজ অমৃতলালকে সেই পদে বৃত করিয়া নৈহাটীর অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যেরা বাঙ্গলা দেশের

—বাঙ্গলা জাতীর—বাঙ্গালার সাহিত্যিকের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

তার পর বয়স অর্থাৎ জ্ঞানে প্রাচীন ইতিহাস শাখার সভাপতি ডাক্তার কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহার অভিভাষণ সম্বন্ধে দুএক কথা বলিব। আমাদের মনে হয় যাঁহারা ইতিহাস আলোচনা করিয়া থাকেন এ অভিভাষণ তাঁহাদের নিকট সমাদৃত হইবে। উনবিংশ শতক হইতে ইতিহাসে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উৎকর্ষের ফলে ইতিহাসের উপকরণের পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন প্রত্নতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনার ফলে ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রাচীন পুঁথি হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য প্রাচীন পুথি সম্পাদন করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ যে শ্রমসাধ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুকরণ করিয়া একার্য্যে অগ্রসর হন আমাদের ঐতিহাসিকদেরও সেই পথ অবলম্বন করা উচিত। তৎপরে তিনি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, প্রাচীন ভারতীয়গণ ইতিহাসের সংস্কার যাপকতা কিরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহা সভাপতির নিজের কথায় বলি—'কেবল বংশতালিকা যে ইতিহাস নহে, তাহা এদেশের ঐতিহাসিকগণ বহুকাল পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। ইঁহারা জানিতেন "ইতিহাসে ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষের উপদেশ থাকে," অতীত ঘটনা পরম্পরা দ্বারা সমাজের ভাল মন্দ শিক্ষা হয়। সম্ভবতঃ ইতিহাসকে ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ করার দিকে একটু অধিক দৃষ্টি পড়ায় বস্তুতঃ পুরাণগুলির ঐতিহাসিক বিশুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল। ইতিহাসের ঐরূপ উপদেশাত্মক উদ্দেশ্য মনে রাখিয়াই বোধ হয়, মহাভারতকে প্রকৃষ্টতম ইতিহাস বলা হইয়াছে (মহাভারত, আদি ১, ২৬৮) এবং কল্পনাকেও ইতিহাসের পাশে স্থানে দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে; কারণ আমরা কৌটল্যের অর্থশাস্ত্রে (১,৫) দেখিতে পাই যে, তখন ইতিহাস বলিতে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এই সমস্তই বুঝাইত। ইতিহাসের এই ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি—কেন কোন কোন স্থলে (পদ্ম ২, ৮২, ১৫ ; বায়ু ৫৫, ২) নিতান্ত কল্পিত ঘটনাকেও ইতিহাস নাম দেওয়া

হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ছয়টি নামই ঐতিহাসিক সাহিত্যের মধ্যে পড়িলেও ভারতীয়গণ ইহাদের মধ্যে সত্য ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসের বিশেষত্ব কিরূপ তাহা জানিতেন।'

তার পর সভাপতি মহাশয় অধুনালুপ্ত প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রামের অস্তিত্বের প্রমাণ ও তাহাদের লোপ পাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ও তিনি কতকটা অনুমান করিয়া বলিয়াছেন,—"এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রাচীন ভারতীয়গণ ইতিহাসের আবশ্যকতা বুঝিতেন, তবে কোন ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আমাদের হস্তগত হয় নাই কেন? মৎস্মদীয় শাসনকালে বিহার ও ওদন্তপুরীর বিপুল গ্রন্থাগার ধ্বংসের মত ঘটনা হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।" তৎপরে সভাপতি মহাশয় পুরাণের ও চরিত-গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া যে সূক্ষ্মজ্ঞানের ও বিদ্যুজ্জার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসাই। লক্ষ্মীও বাণীরপুত্রদিগকে সাহিত্য-সাধনায় সমাহিত দেখিলে আমাদের প্রাণে অনমুভূত আনন্দের উদ্রেক হয়। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত করিয়া যশের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহন করিতে থাকুন।

সাহিত্যিকদিগের সেবা করিবার জন্য যে সকল স্বেচ্ছাসেবক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

শোক সংবাদ

স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের সুযোগ্য পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে আমরা অকালে হারাইয়াছি। তাঁহার রচিত সুন্দর গান গুলি অনেক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে গীত হইয়া শ্রোতাদিগকে প্রকৃত আনন্দ দান করিয়াছে। সাহিত্য-সেবীদের মেসা মেশার সুবিধার জন্য তিনি স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের সহযোগে পূর্ণিমা-মিলনের শুভ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্ধানের সহিত এই প্রতিষ্ঠানটী উঠিয়া গেলেও প্রতিবৎসর দোল-পূর্ণিমার দিন তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের তর্পণের পর সাহিত্যকর্ণিগকে তিনি একত্রে সমাবেশ করাইতেন। তাঁহার ন্যায় সাহিত্য সেবককে হারাইয়া আমরা সন্তপ্ত।

এমাসে আমরা আর একজন সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধককে হারাইয়াছি। তিনি পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়। 'জাতিতত্ত্ব বারিধি' লইয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে উপনীত হন। 'মানবের আদিম বাসভূমি' লিখিয়া তিনি যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া ব্যস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার সহিত অনেক স্থলে আমাদের মতের মিল ছিল না; কিন্তু তাঁহার একাগ্র সাধনার আমরা পক্ষপাতী। তাঁহার বিশ্বাস ছিল জগতে একদিন আসিবেই যে দিন মঙ্গোলিয়াই মানবের আদি বাসস্থান বলিয়া জগতের মনীষীরা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আপনার মতের প্রতি তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল। দেবতার অস্তিত্ব তিনি মানিতেন না। বেদ আলোচনায় তিনি জীবন সংসর্গ করিয়াছিলেন। 'বেদ-প্রকাশিকা' বাহির করিয়া তিনি বেদের সহজ সরল ব্যাখ্যানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পরিশেষে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে সকল গভীর আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। জাতীয় সংবিউদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। দারিদ্রের সহিত সমুখ সমরে কোনদিনই তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। ভগবান্ তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের মনে শান্তি দান করুন।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

যমুনা

প্রার্থনা নিরতা।

Popular Press, Calcutta.

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

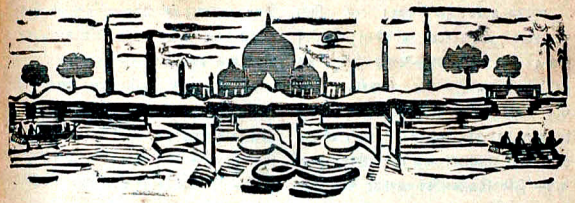

১৩শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৩০ { ৫ম সংখ্যা

শোকের পুরী

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,)

১

শোকের পুরী সেথায় ঘুরি মরছে কালো মেঘ
পাষাণ ঠেলি পড়ছে ঢলি রুদ্ধ জল বেগ।
দিবস ধরে বাষ্প জমে নিশায় ঝরে জল,
বাপ্‌সা করে ঝাপ্‌টা ঝালাস্ বইছে অবিরল।

২

বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজে, ভাসায় কেহ ঘট
কেউ বা চিতার অঙ্গারেতে গড়ছে তুলে মঠ।
কেউ বা সিথীর সিঁদুর মোছে,কেউ বা মুড়ায় কেশ।
দুকূল ছাড়ি কেউ বা পরে গৈরিকেরি বেশ।

৩

লয়ে সতীর দগ্ধ দেহ ফিরছে কেহ হায়
কেউ বা স্বামীর শবের সনে ভেলায় ভেসে যায়।
সেথায় সদাই হাহাকার আর চক্ষে বহে নীর
সংযুত হায় দুই কিনারে সজল চোখের ভিড়।

৪

সেথায় গলে ধারাবতী, প্রভাস ভরা জল
সেথায় ঘোরে অলক্ষিতে দেব দেবতার দল।
সেথায় থামে হুঙ্কার এবং কোদণ্ড টঙ্কার;
লবণ জলের শব্দে উঠে অনন্ত ওঁকার।

জ্যোতিষ

(শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন)

সনাতন ধর্ম্মের মূল বেদ। বেদ নিত্য অপৌরুষেয় এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতিষ শাস্ত্র এ হেন বেদের চক্ষু—"বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষু জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষম্"—নারদ (অর্থাৎ নারদ-ঋষি বলিতেছেন, অমলিন জ্যোতিষশাস্ত্র বেদের নির্ম্মল চক্ষু)। ভূমণ্ডলে এমন দেশ নাই, যেখানে জ্যোতিষের আলোচনা নাই। জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ শাস্ত্র—"চিকিৎসিত-জ্যোতিষ-তন্ত্রবাদাঃ পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি" (চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রতিপদেই বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া থাকে)। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রধানতঃ জাহাজ পরিচালনার জন্য জ্যোতিষের আলোচনা হইতেছে। আমাদের দেশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শুধু পোত চালনার জন্য জ্যোতিষের আলোচনা করিতেন না। ধর্ম্ম-কার্য্যের জন্য করিতেন,—"বিনৈতদখিল শ্রৌতং স্মার্ত্তং কর্ম্ম ন সিধ্যতি"—ইতি নারদঃ।

"বেদা হি যজ্ঞার্থ-মভিপ্রবৃত্তাঃ কাল্যুপূর্ব্বা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ।
তস্মাদিদং কালবিধানশাস্ত্রং, যো জ্যোতিষং বেদ
স বেদ যজ্ঞান্॥ ইতি বেদাঙ্গ জ্যোতিষম্"

জ্যোতিষ ধর্ম্মকার্য্যের কাল নির্ণয় করিয়া দেয়। কাল দ্বিরীকরণের কারণ হইতেছে—"বরমেকাহুতিঃ কালে না কালে লক্ষ কোটয়ঃ" (অর্থাৎ যথা কালে এক আহুতিতে যে কার্য্য—ফল—হয়, অসময়ে লক্ষ আহুতি দিলেও কোন কার্য্য হয় না)।

দৈনিক জীবনে আমরা ইহা দেখিতে পাই। যেমন রাজকর প্রদানের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ কর না দিলে সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়, একবার বিক্রয় হইলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, তেমন অধ্যাত্মজীবনে ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্টকালে কার্য্য না হইলে ঐ কর্ম্ম পণ্ড হয়—নিষ্ফল হয়।

এই সকল ছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্রের আর একটা দিক আছে। জ্যোতিষশাস্ত্র যে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাহা ইহার গণিত ও ফলিত ভাগের সাহায্যে প্রমাণিত হয়। ফলিত জ্যোতিষের দুইটি ভাগ আছে—একটি—রাষ্ট্র অর্থাৎ দেশের অবস্থা জ্ঞান; অন্যটি—জাতক অর্থাৎ মনুষ্যের জীবনের ফলাফল।

এই জাতক-জ্যোতিষ নানা বিভাগে বিভক্ত—যেমন—(১) হোরাস্কন্ধ অর্থাৎ কোষ্ঠীগণনা (২) নষ্ট কোষ্ঠী (৩) সাময়িক বা করকোষ্ঠী, ললাট গণনা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি লক্ষণ (৪) প্রশ্ন গণনা (৫) স্বরোদয় (৬) শকুন জ্ঞান ইত্যাদি।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একমাত্র জাতক-জ্যোতিষের সার-বত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। নভোমণ্ডল দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত, ঐ রাশিগুলিকে আবার ২৭টি নক্ষত্রে ভাগ করা হইয়াছে। আমরা রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—প্রধানতঃ এই ৯টি গ্রহ স্বীকার করি। পাশ্চাত্য দেশে জ্যোতি-র্ব্বেত্তারা রাহু ও কেতুকে একরূপ অস্বীকার করেন; কিন্তু ইউরেনস্ ও নেপচুন্ দুইটি গ্রহ স্বীকার করেন; মোট তাহারাও ৯টি গ্রহ স্বীকার করেন। ঐ গ্রহ, রাশি ও নক্ষত্র লইয়া রাষ্ট্র ও মানব জীবনের ফলাফল নির্ণয় করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ রাষ্ট্র এবং প্রাণীর উপর গ্রহের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই গ্রহশক্তি রাশি নক্ষত্র এবং রাশিচক্রে গ্রহগণের স্থিতি হইতে স্থির করিতে পারা যায়। এবং ঐ শক্তিতে রাষ্ট্র ও মনুষ্যের কি শুভাশুভ হয় ফলিত

জ্যোতিষ তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়। গ্রহশক্তি উপেক্ষার বিষয় নহে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সমুদ্রের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ এবং উদ্ভিজ্জ জগতে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রভাব কে অস্বীকার করিবে? এমন কি পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রও বর্ত্তমানে স্বীকার করিতেছে যে একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে শরীরে রক্তাধিক্য ঘটে—ইহা কি গ্রহশক্তির ফল নহে? ফলিত জ্যোতিষের সাহায্য লইলে এই গ্রহশক্তি রাষ্ট্র ও মানবের উপর কি ভাবে প্রকাশ পায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। জ্যোতিষ বিজ্ঞান ঐ গ্রহশক্তি বুঝিবার সুন্দর পদ্ধতি দেখাইয়া দেয়।

যে বিজ্ঞান মানব চরিত্র বুঝাইয়া দেয়, যাহার সাহায্যে মানবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জানিতে পারা যায়, সে শাস্ত্র কখনই সাধারণ শাস্ত্র নহে। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের ধারাবাহিক ঘটনা-বলী যদি ফলিত জ্যোতিষের চিরপ্রসিদ্ধ বিধি নিয়মের দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই জানা সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই বিজ্ঞানশাস্ত্র যে অতিশয় সমাদরের এবং প্রয়োজনীয়, তাহা কি সকলে স্বীকার করিবে না? একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল, সেই জাতক কতদিন জীবিত থাকিবে, কখন ব্যাধিগ্রস্ত হইবে, কখন কোন বিপদে পড়িবে, জীবনে সুখ ঐশ্বর্য্যলাভ করিবে কি না, জনসমাজে যশস্বী হইবে কি না, চরিত্রবান্ হইবে কি না, এই সমুদায় জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়তায় অনায়াসেই জানিতে পারা যায়। এই সকল বুঝিবার সরল রীতি আছে। এক্ষণে উদাহরণ সাহায্যে এই সকল স্ফুটতর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই ঐ শিশুর জন্ম সময় গ্রহণ করিয়া জাতচক্র বা জন্মকুণ্ডলী নির্ম্মাণ করা হয় অর্থাৎ জন্মকালে রাশিচক্রে কোন গ্রহ কোথায় অব-স্থান করিতেছে, তাহা স্থির করা হয়। তাহার পর দেখিতে হয়, ঐ শিশুর কোন রিষ্টাশঙ্কা অর্থাৎ বাল্যকালেই মৃত্যু বা অমঙ্গল সম্ভাবনা আছে কি না। ইহা দেখিলে দেখা যায় যে, যেখানে শিশুর কোষ্ঠীতে রিষ্ট পাওয়া যায়, সেখানে ঐ শিশুকে রিষ্ট-জনিত অমঙ্গল ভোগ করিতে হয়। যেমন পতাকী চক্রে (ইহা একরূপ রিষ্ট গণনা) বেধ (অশুভ) হইলেই ঐ গণনা নির্দ্দিষ্ট দিন' মাস বা বৎসরে শিশুর নিশ্চয়ই অনিষ্ট ঘটবে। নিম্নের উদাহরণ সাহায্যে কথাটা সহজেই বোঝা যাইবে,—

১। পতাকীরিষ্ট :—

জন্ম—১৩২৬ সাল ৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে ৬।২৭ মিনিট। জন্মকুণ্ডলীতে দেখা গেল যে, লগ্ন বৃষরাশির ২৪ অংশ ৫৫ কলা এবং র ১।৮' ম ১।৫' কে ১।১১' শু ২।১৯' বু ২।২২' শ ৩।২৯' রা ৭।১১' চ১০।৯' পতাকীচক্রে দেখা গেল রবির দণ্ডে জন্ম। রবি লগ্নে কেতু মঙ্গল যুক্ত, সুতরাং বিদ্ধ হইয়াছে; এমন কি চন্দ্রও লগ্নের ১০মে থাকায় চন্দ্রের সহিত বিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পতাকী গণনায় ৩৬।৮।১৭ ইত্যাদি মাস শিশুর পক্ষে রিষ্ট মাস নির্দ্দেশ করে। ঐ ১৭ মাসেই শিশু ইহধাম ত্যাগ করে। এখানে লগ্ন ও চন্দ্র দুইটি বিদ্ধ হওয়ায় রিষ্ট প্রবল—সুতরাং শিশু রক্ষা পাইল না।

বিশেষ যেখানে বুধের দণ্ডে বেধ পায়, সেখানে শিশু কদাচ রক্ষা পায়।

এই পতাকীর বহু উদাহরণ দিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত বহুবিধ যোগের রিষ্ট আছে। শাস্ত্রে ঐ সকল যোগ লিখিত হইয়াছে। এ প্রবন্ধে লিখিত যোগের উল্লেখ করিব না বলিয়া এখানে তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত হইল না। এ প্রবন্ধে অতি স্থূল ভাবে একরূপ ঘটনার কোষ্ঠীতে কেমন একভাবাপন্ন কয়েকটি গ্রহ থাকে, তাহা দেখাইব; এবং ঐরূপ গ্রহের সমাবেশে যে জীবনের ঘটনা ঐ একভাবের পথেই চলিয়া থাকে তাহার ইঙ্গিত কেমন সুন্দর পাওয়া যায়, তাহা বিবৃত করাই, এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

২। শিশুরিষ্ট :—

অনেক শিশুর কোষ্ঠীতে পতাকী রিষ্ট থাকে না

অথচ শৈশবে তাহাদের জীবনান্ত ঘটে। যেমন,—

(ক) জন্ম—১৮৩৯।৭।৯.১৯।১৬।৫১।৩৬ (১৯১৭ খ্রীঃ ১৭ নভেম্বর)—মৃত্যু ৮ মাসে।

জন্মকুণ্ডলী—লং ১১।১৫' র ৭।২০' বু ৭।২৩' চ ০।৯' বু ১।১৪' বক্রী কে ২।১০' শ ৩।২১' ম ৪।১৯' শু ৮।২৭' রা ৮।১০'

(খ) জন্ম—১৮৩৫।৭।১২।১১।৩২।৩০ (১৯১৩ ২৭শে নভেম্বর) মৃত্যু ১।৩ মাসে।

জন্মকুণ্ডলী :—লং ৯।১৮' রা ১০।২৯' শ ১।২৪' ম ৩।১' কে ৪।২৯' শু ৬।২৭' বু ৬।২৮' র ৭।১০' চ ৭।২৮' বু ৮।২৬'

দ্রষ্টব্যঃ—দুইটি কোষ্ঠীতেই শনি ৫ম গত এবং লগ্ন দুর্ব্বল। এইরূপ স্থলে শৈশবে মৃত্যু ঘটে। এ দুইটি উদাহরণকে যোগজ রিষ্টির মধ্যেও ধরা চলে।

শিশু সম্বন্ধে একজন শাস্ত্রকার ১২ বৎসর, অন্য শাস্ত্রকার ২৪ বৎসর, শিশুর আয়ু দেখিবে না বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই সময়ে পিতা মাতা বা শিশুর পাপে আয়ু অতি ক্রম করিয়া যে কোন সময়ে শিশুর মৃত্যু ঘটিতে পারে। এই সময় ঔষধ প্রয়োগে ও দৈব উপায়ে শিশুকে রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

(৩) অল্পায়ুযোগঃ—জ্যোতিষ শাস্ত্রে মানবের অল্পায়ু, মধ্যায়ু ও দীর্ঘায়ু ভেদে তিন প্রকার আয়ু নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মতভেদে ৩২, ৩৬, ৪০ বর্ষ অল্পায়ু; ৬৪, ৭২, ৮০ মধ্যায়ু এবং ৯৬', ১০৮, ১২০ দীর্ঘায়ু ধরা হইয়া থাকে।

অল্পায়ুযোগে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ঐ আয়ুর কোটা পার হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মধ্যায়ু ও দীর্ঘায়ু সম্বন্ধেও ঐরূপ। কে অল্পায়ু হইবে, কে মধ্যায়ু হইবে, ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিধি দ্বারা পরীক্ষা করিলেই জানা যায়। উহার সম্যক আলোচনা করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয় বলিয়া সময়াভাব প্রযুক্ত বিরত হইলাম এবং দুই তিনটি উদাহরণ দিয়া বুঝান সহজ নয় বলিয়া সে কার্য্যেও নিরস্ত রহিলাম।

৪। বহুস্থলে দেখা যায় যে, নবজাত শিশুর কোন অমঙ্গল ঘটিল না, কিন্তু তাহার পিতা বা মাতার, কোন স্থলে উভয়ের অল্পকাল মধ্যে জীবনান্ত ঘটিল। ইহার কারণ সন্তানের প্রবল পিতৃ মাতৃরিষ্টি। সন্তানের কোষ্ঠী হইতে উহার নির্দ্দেশ বিশেষ কঠিন ব্যাপার নহে। উদাহরণ :—

(ক) জন্ম—শক ১৮৪১।১৮।১২।৫০ (১৩২৬।৯ জ্যৈষ্ঠ)—মাতৃহানি ১৩২৬—৩রা কার্ত্তিক।

জাতচক্র :—লং ১।২৪ র ১।৮ ম ১।৫ কে ১।১১ শু ২।১৯ বু ২।২২ শ ৩।২৯ রা ৭।১১ চ ১০।৯ বু ০।১৮

দ্রষ্টব্য :—লগ্ন বৃষ রাশি, তাহাতে রবি ও মঙ্গল এবং ৭মে রাহু। ইহাতে পিতৃরিষ্টি ও মাতৃরিষ্টি বুঝা যায়। এবং মাতৃরিষ্টি প্রবল। বৎসর মধ্যে ইহার মাতার মৃত্যু ঘটে এবং পিতার বিশেষ পীড়া হইয়াছিল; যেখানে লগ্নে পাপ বাহুল্য ও ৭ম বা ৮মে পাপ থাকিবে সেখানে পিতৃমাতৃ সম্বন্ধে শঙ্কা বুঝিতে হইবে।

(খ) জন্ম—১৮২৬।৭।৪।৫।৫৩ (১৯০৪।১৭ এপ্রেল)—জন্মের পর মাতৃহানি।

জাতচক্র :—লং ১১।২ শু ১১।১৪ বু ১১।১৯ র ০।৪ ম ০।১৪ বু ০।২৯ চ ০।২৯ রা ৫।৫ শ ৯।২৫।

দ্রষ্টব্য :—এখানে শনি ও মঙ্গল উভয়েই সিংহের নবাংশে আছে এবং চন্দ্র ঐ দুই গ্রহের কেন্দ্রে পড়ায় মাতৃহানি হইয়াছে। অতএব শনি এবং মঙ্গলের কেন্দ্রে চন্দ্র থাকিলে মাতার অনিষ্ট প্রন বুঝিতে হইবে।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিধি মানিয়া স্ত্রীসহবাস করিলে অল্পায়ুযোগে পুত্র কন্যা জন্মে না, কিংবা সন্তানের বাল্যকাল পিতৃমাতৃ হানি হয় না। শাস্ত্রের আদেশ মানিলে ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যাও জন্মায় এবং ঐ সন্তান সৎ ও দীর্ঘজীবী হয়; আর পিতৃ মাতৃ রিষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। আমরা শাস্ত্র মানি না সুতরাং পুত্রশোক

সহজেই প্রাপ্ত হই। এই ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যে আমরা পূর্ব্বোক্ত বিপদ গুলি হইতে সহজেই রক্ষা পাইতে পারি।

৫। আমাদের হিন্দু রমণীর বৈধব্য এক ভীষণ ব্যাপার। আজকাল বিধবাবিবাহ বিশেষ আবশ্যক এইরূপ মত ব্যক্ত করিতে অনেক উদার হৃদয় পুরুষকে দেখা যায়। কিন্তু কয়জন প্রকৃত হৃদয়বান্ ব্যক্তি, যাহাতে বাল্যে বা যৌবনে বৈধব্য না ঘটে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া উহার প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। জ্যোতিষশাস্ত্র চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে পারে যে এই বালিকা বিধবা হইবে এবং এই যুবক বিপত্নীক হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে জ্যোতিষ শাস্ত্র সুধু ঐ বিপদ দেখাইয়া ক্ষান্ত হয় না; এবং প্রতিবিধানের এরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ যাহাতে ঐরূপ ভীষণ দুর্ঘটনা আদৌ ঘটিবে না। জ্যোতিষের প্রতি আস্থা থাকিলে এবং শাস্ত্রের আদেশ মানিয়া চলিলে অনায়াস সাধনও করা যাইতে পারে। অবশ্য বিজ্ঞ নিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ চিন্তাশীল জ্যোতিষীগণ বৈধব্যযোগযুক্ত ও পত্নীহানি যোগযুক্ত কোষ্ঠী দেখিয়া ব্যবস্থা করিলে ঐ যোগের বিপরীত ফল ঘটাইতে পারেন। এরূপ স্থলে শাস্ত্র বলিতেছে, "তাদৃশ যোগজ দারযুতশ্চেৎ, জীবতি পুত্রধনাদিযুতশ্চ" অর্থাৎ পুংকোষ্ঠীতে যেরূপ পত্নীহানি যোগ লক্ষিত হয়, ঠিক ঐরূপ বৈধব্য যোগযুক্ত স্ত্রীর সহিত ঐ পুরুষের বিবাহ হইলে, উভয়ের ঐ ভয়াবহ দোষ কাটিয়া "দোষ হয়ে হ'ল গুণ" হইয়া পড়ে। আমরা দেখিতে পাই যে, স্ত্রী বা পুরুষের কোষ্ঠীতে মঙ্গল লগ্ন, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম ও ১২শে থাকিলে স্বামী বা পত্নীহানি হয়। ইহার উদাহরণ এত বেশী যে তাহা এখানে তুলিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু নিপুণ শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ জ্যোতির্ব্বেত্তাগণকে একত্রিত করিয়া ঐরূপ দোষযুক্ত পাত্রীর কোষ্ঠী বিচার করিয়া সমান দোষাক্রান্ত পাত্রের সহিত বিবাহ দিলে, এই সকল অশুভ ঘটনা হইতে আমরা বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইতে পারি। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ শূন্য, সুতরাং অতি আবশ্যক বিষয়ে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট। আর এক কথা, অনেকে বিবাহে ষোটক বিচার করান। মনে করেন, সুধু "গণ" "বর্ণ" প্রভৃতি মিল করিয়া বিবাহ দিলেই বুঝি রীতিমত জ্যোতিষ-সম্মত বিবাহ দেওয়া হইল। সাধারণ জ্যোতিষীগণ ঐরূপ ষোটক বিচার করিতে জানেন এবং ঐরূপ বিচারে রাজযোটক হইয়াছে বা অন্য গণাদি বিষয়ে মিল হইয়াছে দেখিয়া কোষ্ঠী মিল করিয়া বিবাহের অনুমতি দিয়া বিবাহে মঙ্গল হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। অনেক আস্থাবান্ ব্যক্তি ঐরূপ শাস্ত্রজ্ঞান হীন অর্ব্বাচীন জ্যোতিষীর হাতে পড়িয়া কোষ্ঠীমিল ঠিক হইয়াছে বিধায়ে বিবাহ দিয়া থাকেন; তাহাতে অনেক স্থলে অশুভ ফল ফলিয়া যায়। তখন তাহারা শাস্ত্রে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন। বস্তুতঃ ইহাতে শাস্ত্রের দোষ নাই; দোষ হইতেছে মূর্খ জ্যোতিষীগণের। বিবাহে কোষ্ঠীমিল করিতে হইলে কি কি বিষয় দেখিতে হয়, তাহার জ্ঞান না থাকায়, তাঁহারা শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিয়া থাকে; ফলে বিশ্বাসীর মনে অবিশ্বাস জন্মে; প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ জ্যোতিষী উভয়ের ষোটক বিচার, আয়ুবিচার, শুক্র মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের এবং ভাববিচার করিয়া কোষ্ঠী মিল করিয়া দিলে, সেরূপ ক্ষেত্রে বিবাহে অশুভ হইতেই পারে না। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্য লইলে আমরা আমাদের কন্যা ভগিনী প্রভৃতিকে অকাল বৈধব্য হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা করিতে পারি।

৬। কতকগুলি লোকের আকস্মিক ঘটনায় মৃত্যু ঘটে। তাহাদিগের কোষ্ঠী দেখিলে তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া অসম্ভব

নহে। নিম্নে তিনখানি খুনি কোষ্ঠী দেখাইতেছি :—

(ক) ১৭৯৮।২।৭।১২।২৭।৩৯—৩৯।৭ মাসে পিস্তলের গুলিতে নিহত। লং সিংহের ১৫°। চ বৃ কন্যায়। কেতু তুলায়। শ মকরে। রা মেষে। র ম মিথুনে। বু শু কর্কটে।

(খ) ১৮০২।৬।১৪।৯।৫০—২৯ বর্ষে পিস্তলের গুলিতে নিহত।

লগ্ন ধনু। রা ধনুতে। বু মীনে। শ মেষে। কে মিথুনে। চ কন্যায়। র ম তুলায়। বু শু বৃশ্চিকে।

(গ) ১৮১৪।৮।২৩ রাত ১০ টায় জন্ম।= ২৬ বর্ষে পিস্তলের গুলিতে নিহত।

লং সিংহের ১৮°। চ সিংহে। শ কন্যায়। কেতু তুলায়। শু বৃশ্চিকে। র বু ধনুতে। ম বৃ মীনে। রাহু মেষে।

দ্রষ্টব্য :—উপরে লিখিত ৩টি কোষ্ঠী হইতে দেখা যায় যে, রবি মঙ্গল একত্র বা পরস্পরের কেন্দ্রে আছে। শনি ও রবি মঙ্গলকে দেখিতেছে বা কেন্দ্রে বা অষ্টমে আছে। আর অষ্টমভাব এবং লগ্নাদি তিনটি ত্রিকোণ পীড়িত। কোন কোষ্ঠীতে এইরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত গ্রহ সমাবেশ দেখা যাইলেই বলা চলিবে যে যাহার এই কোষ্ঠী তাহার আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা।

৭। কিরূপ গ্রহসমাবেশে পাগল হয়, কয়েকটি পাগলের কোষ্ঠী উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখান যাইতেছে :—

(ক) ১৮০৩।৫।১০।৫৮=লগ্ন কন্যার ১°। র কন্যায়। বৃ চ তুলায়। রা বৃশ্চিকে। শ মেষে। বু কে বৃষে। ম মিথুনে। শু সিংহে।

(খ) ১৮২২।১০।২৫।৪০।২১৪০—লগ্ন তুলা। চ তুলায়। রা বৃশ্চিকে। বৃ শ ধনুতে। র বু শু কুম্ভে। কে বৃষে। ম সিংহে।

(গ) ১৮২৮।৩।১১।১০।১।২=লগ্ন সিংহ। কে সিংহে। শ তুলায়। চ ধনুতে। রা কুম্ভে। ম মেষে। বু বৃষে। র শু মিথুনে। বৃ কর্কটে।

(ঘ) ১৮০৭।০।১৮।৭।১৮—লগ্ন মিথুন। শ মিথুনে। বৃ সিংহে। রা কন্যায়। চ বৃশ্চিকে। কে মীনে। র ম বৃশু মেষে।

দ্রষ্টব্য :—এখানে দেখা যায় যে ৫ম পতি দুর্ব্বল; রবি পীড়িত এবং মঙ্গল বা শনি দ্বারা বুধ বা চন্দ্র পীড়িত। বুধ পীড়িত হইলে মতি ভ্রষ্ট করে। যাহার কোষ্ঠীতে এইরূপ দোষ দেখা যাইবে, তাহার মস্তিষ্কের দোষ আছে বা হইবে; ইহা জানা যায়।

৮। পুরুষের কোষ্ঠী হইতে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর কোষ্ঠী হইতে স্বামীর অপমৃত্যু জান।

(ক) ১৭৮৭।৯।৭।৭।১১=লং মীন ১২°; কেতু লগ্নে। চ কর্কটে। রা কন্যায়। শ তুলায়। ম বৃ ধনুতে। র বু শু মকরে—স্ত্রীর জলে ডুবিয়া মৃত্যু।

(খ) ১৮১১,৬।২৬।২৮,২৫=লং মীন। চ বৃষে। রা মিথুনে। ম শু শ সিংহে। বৃ র কন্যায়। বু কে ধনুতে—২য় স্ত্রীর আগুনে পুড়িয়া মৃত্যু।

(গ) ১৮২৭।১১।২৪।৩৫।৩৬,৭=লং তুলায়। চ ধনুতে। শ মকরে। র শু কে বৃ মীনে। ম বু মেষে। রা কন্যায়—স্বামীর জলে ডুবিয়া মৃত্যু।

দ্রষ্টব্য :—উক্ত কোষ্ঠীগুলি হইতে দেখা যায় যে, শুক্র ও ৭ম ভাব পীড়িত। রবি রাহু পরস্পর যুক্ত, দৃষ্ট বা কেন্দ্রে। এইরূপ সমধর্ম্মাক্রান্ত গ্রহ-সন্নিবেশ-যুক্ত কোষ্ঠী হইলে স্ত্রী বা স্বামীর অপঘাত সম্ভাবনা নির্দ্দেশ করা চলিবে।

জ্যোতিষে যেমন দুর্ঘটনা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তেমন শুভ ঘটনাও জানাইয়া দেয়। উদাহরণে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে :—

(ক) ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোষ্ঠী—১৭৬০।২।১২।৩৯,৩১ লং ৯।১৮° রা ১১।১৮° ম ১।১৪° শু ১২।২৭° বু ২।১° র ২।১২,৫৮ ৪।৫,৫৪° বৃ ৪।২৬।২৩কে ৫।১৮° শ ৭।৩৩°

(খ) ৺ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী :—১৭৪২।৫।১১।১৫।৪২ লং ৮।৬° বৃ ১০।২৬° বক্রী রা ১১।২° শ ১১।১০।১৪ চ ১।৭।৪১° শু ৩।২৭।৪ম ৪।২৮।৪১° কে ৫।২° বু ৫।৮।৪০° র ৫।৩।১২

(গ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোষ্ঠী :—১৮৬০।২।৪।৫৩।১৭=লগ্ন মীনে। চ মীনে। র, বু, শু মেষে। ম, কে মিথুনে। বৃ কর্কটে। শ সিংহে। রা ধনুতে।

দ্রষ্টব্য :—ইঁহারা সকলেই স্বনাম-খ্যাত পুরুষ। কোষ্ঠীতে দেখা যায় যে চতুর্থ পঞ্চম—এবং দশম-পতি—ইহাদের সম্বন্ধ আছে। এই তিন অধিপতি বলবান্ হইলে—সম্বন্ধ থাকিলে—লোক যশস্বী হয়। লগ্নপতির বলও আবশ্যক। লগ্নপতি দুর্ব্বল হইলে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে।

ধনবান্ কে হইবে, রাজমান্য কে পাইবে এইরূপ শুভ ঘটনাও জ্যোতিষ বলিয়া দেয়।

গ্রহগণ কিরূপ সমান ধর্ম্ম পাইলে প্রায় একরূপ ফল দেয়, তাহা অতি স্থূল ভাবে বিবৃত হইল। ইহা হইতে জানা গেল যে, জ্যোতিষের ফলিত অংশ অগ্রাহ্য করিবার নয়। ইহার সাহায্যে মানব জীবনের ঘটনা-বৈচিত্র বুঝিতে পারা যায়।

মানব জীবনের উপর গ্রহের কিরূপ আধিপত্য তাহা দেখান হইল। এইবার রাষ্ট্রের উপর গ্রহ-শক্তির প্রভাব কিরূপ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্য পরিবর্ত্তন, অরাজকতা, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, ঝড়, ধর্ম্মঘট প্রভৃতি রাষ্ট্রজীবনের প্রধান বিষয়।

যুদ্ধ সংঘটন, রাজার মৃত্যু, বিদ্রোহ, রাজ্যচ্যুতি রাজ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি রাষ্ট্র ব্যাপারে শনিগ্রহই নিয়ন্তা। যে বিগত মহাযুদ্ধ হইয়া গেল এবং এখন যে পৃথিবী ব্যাপী ঘোর অশান্তি, যুদ্ধ হাঙ্গামা, বিদ্রোহ, প্রভৃতি চলিতেছে, তাহাও এই শনিগ্রহের অনুকম্পায়। শনি শুদ্ধ হইলে জগতে কিনা অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য খণ্ডের জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ মঙ্গলগ্রহকে ঐ যুদ্ধের ঘটক বলিয়া ছিলেন; কিন্তু আমরা স্থির জানি ঐ যুদ্ধের ঘটক একমাত্র শনি। মঙ্গল সময় সময় ঐ যুদ্ধের উগ্রতা বৃদ্ধি করিয়াছিল মাত্র। ঐ যুদ্ধ আগষ্ট মাসে আরম্ভ হয়, কিন্তু আমাদের দেশ হইতে ঐ যুদ্ধ যে নিশ্চয় য়ুরোপে বাধিবে তাহার ভবিষ্যৎ বাণী মার্চ্চ মাসেই করা হইয়াছিল। ভারতীয় ভবিষ্যৎ বাণী সম্বন্ধে বিলাতি মাসিক পত্রিকার মত উদ্ধৃত করা গেল।—"Modern Astrology" 1915. Page 170-171 :—

In the Indian "Astrological Magazine" for March 1914 an article appeared... a map..."of the solar year on Monday 13th April 1914, at about midday"... the Indian zodiac of constellations. The following quotations taken from the article.....

"Countries governed by Iaurus and Saturn will suffer to a considerable extent and the war fever will be at its highest pitch." Saturn's signs include amongst other places Russia, Prussia and parts of Eastern Europe.

"There will be great disturbances in England and the Irish question will assume a threatening aspect. In France, Germany, Russia and Turkey, councils of wars, increase of military expenditure, public demonstrations of defiance against law and authority, will assume a serious aspect, and the relationship among the firstrate powers of Europe, inspite of Ententes cordiales,

will be very highly strained. A European war is threatend."

"Two deaths among the European royalties are indicated and one of them will be from violence or treachery." King Carol of Roumania died 10.10.14. The Archduke Franz Ferdinand, heir to the throne of Austria, was assassinated 28-6-14.

"Political relations all over the world during the months of August and September will be highly excited." (the war began in August).

শনিগ্রহকে যে আমরা যুদ্ধের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহার প্রমাণ :—

"মিথুন স্ত্রী ধনুর্মীন রাশৌ মন্দো যদা ভবেৎ। তদা ভূপা বিনশ্যন্তি পৃথ্বী-শোণিত পুরিতা"। তথাচ "মিথুনেচ ধনুর্মীনরাশৌ মন্দঃ সমাশ্রিতঃ। ইত্যাদি

শনি মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন রাশিতে উপস্থিত হইলে রাজারা বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং পৃথিবী রক্তে পরিপূর্ণা হয়। অর্থাৎ উক্ত রাশির যে কোন রাশিতে শনি আসিলেই যুদ্ধ বাধে। বিগত যুদ্ধ যে পাশ্চাত্য খণ্ডে বাধিয়াছিল তাহার প্রমাণ :—

"মিথুনস্থে সূর্য্যপুত্রো রাহু বা যদি সংস্থিতঃ। দুর্ভিক্ষং জায়তে তত্র পশ্চিমাশা নৃপক্ষয়ঃ॥" অর্থাৎ মিথুন রাশিতে শনি বা রাহুর অবস্থান কালে দুর্ভিক্ষ হইবে এবং পশ্চিম দেশে রাজকুল বিনষ্ট হইবে।

শুধু শাস্ত্রের বচন আজকাল কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে চান না, প্রমাণ দিয়া, শাস্ত্র যে সত্য তাহা দেখাইতেছি। দেখিবেন যে, শনি যখনই উক্ত চারি রাশিতে আসিয়াছেন, তখনই যুদ্ধ, রাজ্যনাশ, রাজার মৃত্যু, রাজার পরিবর্ত্তন, বিদ্রোহ, প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত ঘটিয়াছে; এবং এইরূপ যে আবহমানকাল ঘটিবে তাহাও বুঝিতে হইবে। ঐতিহাসিক প্রমাণ :—

শনি—মিথুনে—খৃষ্টাব্দ = ১৭২৮-২৯॥১৮২৫—২৮॥
১৮৫৫-৫৭॥১৮৮৪-৮৫॥১৯১৪—১৬॥
„ কন্যায়—„ = ১৮০৩—৫॥১৯৩০—৩৫॥১৮৯১
-৬৪॥১৮৯১-৯৩॥১৯২০-১৯২৩॥
„ ধনুস্থে—„ = ১৮১১-১৪॥১৮৪০-৪৩॥
১৮৭০-৭৫॥১৮৯৯—১৯০২॥
„ মীনে—„ = ১৮১৯-২১॥১৮৪৮-৫১॥
১৮৭৮-৮০॥১৯০৭—৯॥

(১) মিথুনস্থ শনি = ১৭৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দ :—

১। 4th Mysore war and restoration of Hindu dynesty in Mysore.

২। Battle of Nile,

৩। Switzerland subdued by the French. etc

১৮২৫-২৮ খৃষ্টাব্দ :—

১। Capture of Bharatpur.

২। Massacre of the Tanizaries in Turkey 1826.

৩। Varna surrendered to the Russians. etc

১৮৫৫-৫৭ খৃঃঅঃ :—

১। The Sepoy Mutiny (1857).

২। Annexation of Oudh.

৩। English war with China and Persia.

৪। The Fallof Sibastopool 1855. etc

১৮৮৪-৮৬ খৃষ্টাব্দ :—

১। Annexation of Burma.

২। Alexander renounced the throne of Bulgaria 1886.

৩। Egyptian rebels captured Sanar 1855.

৪। French destroyed Chinese fleet on Min River 1884. etc

১৯১৪ - ১৬ খৃষ্টাব্দ :—

THE LAST GREAT WAR.

(২) কর্কস্থ শনি = ১৮০৩—৫ খৃষ্টাব্দ :—

১। 2nd Maharatta war.

২। War with Holkar.

৩। Tripolitan war. Bombardment of Tripoli.

৪। Battle of Trafalgar.

৫। Napoleonic war.

৬। Napoleon's victory at Austerlitz. etc

কন্যাস্থ শনি = ১৮৩২-৩৫ খৃষ্টাব্দ :—

১। Change of Viceroy in India.

২। Twice resignation of Ministry in England.

৩। 2nd War with Seminole Indians begins 1835.

৪। A 2nd insurrection in Rome suppressed by Austrian troops 1832.

৫। Death of Emperor Francis 1835.

৬। Greece becomes independent 1832. etc

১৮৬১-৬৪ খৃষ্টাব্দ :—

১। Change of Viceroy in India.

২। Riots in Baltimore & Battle of Bull Run 1861,

৩। Separation of the Ionian Islands from England and united with Greece 1863.

৪। The Polish Insurrection.

৫। Mexican War 1861.

৬। War in Japan 1862. etc

৩০

১৮৯১—৯৩ খৃষ্টাব্দ :—

১। Manipur Expedition.

২। Labour disturbance at Homestead.

৩। War in German South West Africa.

৪। Dispute with Swiss Republic. etc

১৯২০-২৩ খৃষ্টাব্দ :—

১। মোপলা বিদ্রোহ, অবহযোগ, মহাত্মা গান্ধীর জেল, জল-প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, উইলসনের ফিরাট বিভাট, নাভার রাজার রাজ্যত্যাগ ইত্যাদি।

২। আয়ারল্যাণ্ডের আংশিক স্বাধীনতা লাভ, মন্ত্রী পরিবর্ত্তন; আফগান সন্ধি, প্রেসিডেন্ট হার্ডিংএর মৃত্যু।

৩। ফরাসী হস্তে জার্ম্মানীর নিগ্রহ; বুলগেরিয়ার বিপ্লব প্রভৃতি অসংখ্যানী হাহাকার।

(৩) শত্রুস্থ শনি = ১৮১১—১৮১৪খৃষ্টাব্দ :—

১। The Nepal War.

২। The Napoleonic War.

৩। United States declare War against Britain. etc

১৮৪০-৪৩ খৃষ্টাব্দ :—

১। The Sindh War.

২। The Gwalior War.

৩। British took Amoy in Opium War. etc

১৮৭০-৭৩ খৃষ্টাব্দ :—

১। Change of Viceroy in India.

২। War between France and Germany. etc

১৮৯৯-১৯০২ খৃষ্টাব্দ :—

১। Death of Queen Empress Victoria.

২। Change of Viceroy.

৩। Boer War. etc

(৪) শনি—১৮১৯-২১ খৃষ্টাব্দ :—

১। Revolution in Spain.

২। Death of Napoleon 1821. etc

১৮৪৮-৫১ খৃষ্টাব্দ :—

১। The Battle of Chillianwala.

২। The 2nd Sikh war.

৩। Annexation of Punjab.

৪। Revolution and abdication of Louis Phicippe 1848. etc

১৮৭৮-৮০ খৃষ্টাব্দ :—

১। 2nd & 3rd Afghan War.

২। Cyprus first occupied by the English 1878.

৩। Russo-Turkish Treaty 1879.

৪। Zulu war. ect

নীলস্থ শনি—১৯৭১ খৃঃ—

১। French war in Morocco (1907-8)

২। Anglo-Russian agreement regarding control of Asia signed.

৩। Great fire in New Orleans. etc

রাষ্ট্রজীবনে মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীনরাশিগত শনির প্রভাব কিরূপ তীব্র ও প্রবল তাহা দেখা গেল। ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যেক মনুষ্যের উপর গ্রহগণ আপনাদের প্রভাব কেমন বিস্তার করে, তাহা দেখান হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতেই হয় যে, ব্যষ্টিভাবে বা সমষ্টিভাবে মানবের উপর গ্রহগণের অসীম আধিপত্য সপ্রমাণ আছে। সুতরাং গ্রহপ্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করিলে মানবের এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারা যায়। এই শাস্ত্র ভারতে একদা এরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে প্রতিমুহূর্ত্তের সংবাদও পূর্ব্ব হইতে বলিয়া দিতে পারা যাইত। ভৃগু, বশিষ্ঠ, নারদ, জৈমিনী, পুরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ এই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। তাঁহারা যে শুধু বহুদর্শনের ফলে এই শাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রভাবে এই শাস্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই শাস্ত্র যে কিরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভৃগুসংহিতা। দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ণ ভৃগুসংহিতা বর্ত্তমানে সুদুর্লভ। কাশীধামে ঐ সংহিতার খণ্ডিত অংশ আছে, তাহা হইতে মানবের তিন জন্মের সংবাদ পাওয়া যায় এবং এ জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের ঘটনা জানিতে পারা যায়। এমন কি কে কোন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাও জানা যায়। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলি—

১৩১৪ সালে ২৫ চৈত্র বেলা ৩।২৫ মিঃ সময়ে একটি বালক কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্মকুণ্ডলী :—

লং সিংহ। কে বৃষভে। বু কুম্ভে। র শ মীনে। ম তু বৃশ্চে। চ রা মিথুনে। বৃ কর্কটে।

ভৃগুসংহিতার ফল :—শ্রীগুরু উবাচ। বদনাথ দয়াসিন্ধো হরিবংশভাগুভম্। যত্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ বিপাকং দৃষ্টিগোচরং॥ ভৃগুরুবাচ। হরেশ গ্রোবধে জন্ম তদীশো নিধনে মৃনে। তদীশে ব্যয়গে শর্ম্ম চিত্রগুপ্তগৃহে জনি॥ [বস্তুতই এখানে চন্দ্রপতি বৃহস্পতি ব্যয়ে ১২শে রহিয়াছে] নাতিগৌরতরো নুনং যত্তেহ জনিপত্রিকা। কোশাধীশঃ কেন্দ্রবর্ত্তী বহুব্যয়ো নায়কঃ ইত্যাদি। ভৃগুসংহিতার বিচার পদ্ধতি এইরূপ। যিনি ব্রাহ্মণ তাঁহার কোষ্ঠীতে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম লিখিত আছে; শূদ্রবংশে যাহার জন্ম তাহার সম্বন্ধে শূদ্রবংশে জন্ম এইরূপ পাওয়া যায়। কেবল বংশবৃত্তান্ত নহে, জীবনের স্থূল ঘটনা যাহা বলে, তাহাও মিলে। কোন যুগযুগান্তরে ভৃগুমুনি সংহিতা লিখিয়াছেন, তৎকালে এই সময়ের গ্রহ-সংস্থান কিরূপ হইবে গণনা করিয়া তদনুসারে কোষ্ঠী রচনা করিয়া ফল লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্য ভাবে মিলিতেছে; ইহা কি অতিমাত্র বিস্ময়ের কথা নয়? জ্যোতিষের কি অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছিল। তাই বলিয়াছি যে এককালে জ্যোতিষ বিজ্ঞান এদেশে আশ্চর্য্যরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কালপ্রভাবে দেশের দুর্ভাগ্য আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের এই অমূল্য শাস্ত্র নষ্ট হইয়াছে। এখনও খণ্ডিতভাবে যাহা আছে তাহাও ধ্বংশ হইতে বসিয়াছে। আমাদের জ্যোতিষ এখন মৃত। ইহার কি গণিত কি ফলিত দুই ভাগই বিস্মৃতির অতল জলে নিমগ্নপ্রায়। আর পাশ্চাত্য জ্যোতিষের এখন শৈশবাবস্থা। এখন তাহার গণিত ও ফলিত দুই অংশই ক্রমোন্নত হইতে চলিয়াছে। গণিত-জ্যোতিষের ত কথাই নাই, ফলিত-জ্যোতিষ এখনই পাশ্চাত্য খণ্ডে এমন প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে ফলিত জ্যোতিষের মাসিকপত্রও পুস্তকের সংখ্যা বড় কম নয়। এমন কি ফলিত জ্যোতিষের স্থল কলেজ স্থাপিত হইয়া তথায় রীতিমত পঠন পাঠন চলিতেছে। অনেক বিজ্ঞলোক জ্যোতির্বেত্তাগণের পরামর্শানুসারে কার্য্যও করিতেছেন। আর যাহারা জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের উন্নতম চূড়ায় উঠিয়াছিল তাহাদের এখন কি ঘোর অধঃপতন। তাহাদের একটি পঞ্জিকার গণনা অশুদ্ধির সহিত মিলে না। ফলিত জ্যোতিষে যদিও তাহারা এখনও পাশ্চাত্যের ফলিত গণনা হইতে উন্নত রহিয়াছে, তথাপি তাহারা বহুদূর ভ্রষ্ট। দেশের উপর নানারূপ অত্যাচার উৎপীড়ন ঝড়ঝাপটা চলিয়া যাওয়ায় ঋষি প্রণীত প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের একরূপ লোপ সাধন

* চতুর্দ্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে বিজ্ঞানশাখায় পঠিত।

হওয়ায় ভারতীয় জ্যোতিষের এই দুর্দ্দশা। ইদানীন্তন মূঢ়মতি জ্যোতিষীগণের সঙ্কেত গোপন রাখিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় জ্যোতিষ-শাস্ত্র দুর্দ্দশার চরম শিখরে উঠিয়াছে। এখন এই লুপ্তরত্ন জ্যোতিষ শাস্ত্রের উদ্ধার সাধন করিতে হইলে, রীতিমত গবেষণা আবশ্যক। এখনও পুস্তক সংগ্রহ হইতে পারে, এমন যে সকল পুস্তক আছে, তাহা লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া গবেষণা করিলে, অনেক লুপ্তসূত্র উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু এমন সময়ের ব্যক্তি কে আছেন যিনি অন্ততঃ অর্দ্ধবর্ষ ধরিয়া এই শাস্ত্রের অনুশীলন করিবেন। যত প্রকার শাস্ত্র আমরা আলোচনা করি, তাহাদের অপেক্ষা এই শাস্ত্র কোন অংশে হীন নহে। তথাপি যুগধর্ম্মপ্রভাবে আমাদের দেশে এই জ্যোতিষ আলোচনা অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। হায় যাহার নাম "জ্যোতিনেত্রশাস্ত্র", আজ তাহার এই দুরবস্থা। তবে সত্য কথন ধ্বংশ হয় না; এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আশা করিতে পারি এমন দিন আসিবে, যখন এই শাস্ত্র পূর্ব্বের ন্যায় আপনার বিমল জ্যোতিতে জগৎকে আলোকিত করিবে।

যে শাস্ত্র-সাহায্যে সৎ ও দীর্ঘজীবী সন্তান সন্ততি উৎপাদন করা যায়, শৈশবে পিতৃমাতৃ হানি রক্ষা করা সম্ভবপর, বৈধব্য ও পত্নীহানি নিবারণ করিতে পারা যায়, দুর্ঘটনা, দুঃসময়, সুসময় প্রভৃতি নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেই শাস্ত্র অতি প্রয়োজনীয় মনুষ্যের অশেষ কল্যাণপ্রদ জ্যোতিষশাস্ত্র যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তাহার চেষ্টা করা মনুষ্যজীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

নাসারুদ্দীন

(শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ)

পাঠান তখন দিল্লী-আসনে বসিয়া শাসিছে দেশ,
বাদ্‌সা নামেই শান্ত সুধীর শুধের নাহিক শেষ,
বাসনা তাঁহার চরণে লুটিছে, ধর্ম্ম তাঁহার বুকে,
বাদ্‌সাতে তাঁহার বলের গরিমা, রাজ্য হাসিছে সুখে,
বাদ্‌সা-পত্নী রতন করে, গর্ব্ব নাহিক মনে,
পতির আহার নিত্য যোগাবে তৃপ্তি লভয়ে মনে,
অমনে দণ্ড অঙ্গুলি লয়ে দাঁড়াল বাদ্‌সা কাছে,
ভক্তি দাঁড়ায়ে ধর্ম্ম দুয়ারে, দুয়ারে পাইতে যাচে,
কহেন বেগম, "কেমনে তোমার যোগাব অন্নজল,"
কহিতে কহিতে করুণ নয়ন করি উঠে ছল ছল,
কহেন বাদ্‌সা "ভৃত্য প্রজার—তা' ছাড়া নহিত কেহ
দিল্লী-প্রাসাদ এ ধন-আগার ভেব না ভোগের গেহ,
ক্ষুদ্র লেখনী সম্বল যার অর্থ কোথায় তার,
অবসর দিতে আসিবে ভৃত্য লইতে সেবার ভার।"
"পতি যার মহা সেবায় নিরত, পত্নী তাহার দাসী"
কহিয়া বেগম নমিল চরণে শ্রীমুখে ফুটিল হাসি।

দোরসাহি মুদ্রা

(শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী বি, এ)

লাহোরের পালিনার উকীলে কোন এক মৃত্যু-সভায় মোর নাম্নী জনৈক মৃত্যুকুশলা নর্ত্তকীর রচিত পণ্যবেকশালী রণজিতের পরিচয় হয়। এই হাব্‌কাহাবিলাসিনী রমণী রণজিৎকে, আপনার আয়ত্তের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আনয়ন করে।

রণজিৎ ইহার মোহে এতদূর আবিষ্ট হন যে মধ্য অন্তঃপুর রমণীকে সঙ্গে লইয়া প্রায়ই হস্তীতে চড়িয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন।

মোর রণজিতের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে কোন এক সময়ে সাম্রাজ্ঞী মুমতাজ-মহলের ছায় মৃত্যুপূর্ব্বে রণজিতের নামের সহিত তাহার নাম মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মোরের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচারিত হয়; কিন্তু মুদ্রা দৃষ্টে মোরের অনুষ্ঠিত নিদর্শনের প্রমাণ পরীক্ষিত হয় না।

মোর শব্দ মধুর বাচক। মধুর পুতুই তাহার অস্তিত্বের একমাত্র নিদর্শন। যদিও পণ্য-বণিতারা "মোর কাঁচলি" নামে অভিহিত, তথাপি শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনা সমাজে মুদ্রাগুলি "মোরসাহি মুদ্রা" নামেই খ্যাত।

এই মুদ্রাগুলিতে আরসি চিহ্ন অঙ্কিত আছে। মৃত্য-গীত-পটীয়সী নর্ত্তকী, ধনী এবং সর্ব্বশ্রেণীর সদগর্হিতা রমণীরাও আরসি ধারণ করিত। কিন্তু কাল পরে এই মোর চিহ্নটী লুপ্ত হইয়া যায়।

"সাধি" পুস্তকের নির্দ্দেশানুসারে মুসলমান-রক্ষিতা পালন করা শিখদিগের গুরুতর অপরাধ। মোর কাশ্মীর-নিবাসিনী মুসলমান রমণী।

রণজিতের এই স্বেচ্ছাচার ধর্ম্মপ্রাণ শিখগণ বহু দিন নির্ব্বিচারে সহ্য করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারা তাঁহার ঐ অপরাধের সমুচিত দণ্ড বিধানের জন্য উদ্যত হইলেন।

প্রথমতঃ মন্দির তলে রণজিৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত পূজোপহার নিষিদ্ধ হইল। তৎপরে তাঁহারা তাঁহাকে অমৃতসরে পুরোহিতবৃন্দের এক সভামণ্ডপে আহ্বান করিলেন। পঞ্জাবের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ, জাতির এই কঠোর আহ্বানে নগ্নপদে যুক্তপাণি হইয়া সভাতলে খালসাদিগের প্রতিনিধিবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে একলক্ষ পঞ্চ বিংশতি সহস্র মুদ্রা, অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে দিতে আদেশ দিলেন। অর্থ কৃচ্ছ্রতা জানাইয়া রণজিৎ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন।

ইহার পর রণজিৎ মোরকে পাঠানকোটে প্রেরণ করেন। মোরের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল সত্য, কিন্তু চরিত্র দোষ তাঁহার দূরীভূত হইল না।

বংশের কলঙ্ক

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু বি, এ)

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ
শোকে সান্ত্বনা

কালীশঙ্করের বকুলবাগানের বাটী গভীর শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। শোকে সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ বন্ধ থাকে না। কাজ যেমন প্রত্যহ চলিয়া থাকে, তেমনই চলিতেছে, তবুও যেন সারা বাড়ীটা ব্যাপিয়া একটা চাপা কান্নার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। ভৃত্য পরিজন কাজ করিতেছে নীরবে, আজ্ঞা লইতেছে নীরবে, আজ্ঞা পালন করিতেছে নীরবে। যে গিয়াছে, সে যেন বাড়ীর সব হাসিটুকু সঙ্গে লইয়া গিয়াছে! হায়! সে যে সকলের নয়নানন্দ!

দ্বিতলের একটী কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর অনিলা রোগের যাতনায় ছটফট করিতেছে। দুইটী হাসপাতালের নার্স অহোরাত্র তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। যেদিন আসায় হইতে দুঃসংবাদ আসিয়াছে, তাহার পরদিনই অনিলা ঘোর সান্নিপাতিকে আক্রান্ত হইয়াছে। নিমন্ত্রিতগণ বিদায় হইবার পর অনিলা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। তাঁহাদিগকে আহার করাইবার উদ্যোগে ব্যস্ত থাকিয়া তাহার মনটা কতকটা চিন্তাশূন্য ছিল; কিন্তু নিমন্ত্রিতগণ বিদায় হইলে পর বাড়ীটা যখন শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তখন কোথা হইতে রাশি রাশি ভাবনা আসিয়া তাহার মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তাহার মনে হইতে লাগিল যেন এই পৃথিবীটার সব মিথ্যা, সে যাহা দেখিতেছে, যাহা বলিতেছে,—কিছুরই কোন অস্তিত্ব নাই; যেন সুখ, আনন্দ, হাসি বলিয়া কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নাই; যেন পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভিয়া গিয়াছে, যেন আলোর পরিবর্ত্তে কেবল অন্ধকারে সারা পৃথিবীটা ঢাকিয়া গিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে অনিলার মাথা ভয়ানক গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার চোখে এক ফোঁটা জল নাই। এটা বড় কুলক্ষণ। সন্ধ্যার সময়ে অনিলার মাথার ভিতরে এত জ্বালা করিতে লাগিল যে, সে আর সহ্য করিতে পারিল না, অনেকক্ষণ ধরিয়া মান করিল এবং শেষে আর্দ্রকেশে শুইল। লোকে ইহাই তাহার রোগের কারণ বলিয়া ধরিয়া লইল; কিন্তু ডাক্তারেরা ঘাড় নাড়িলেন, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার ফলেই এই দারুণ রোগ হইয়াছে।

রামসদয় বাবু ভীত হইয়া অনিলাকে বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু কালীশঙ্কর বাবু সেই অবস্থায় অনিলাকে নাড়াচাড়া করিতে দিতে চাহিলেন না। অনিলাও কিছুতে এই সময়ে তাহার জেঠামণিকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না।

আজ রোগের সাত দিন। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, অনিলার বয়সে এ রোগ দুশ্চিকিৎস্য, তাই সকলেই বিষণ্ণবদনে ঘরে বসিয়া আছেন। আজ দুই তিন দিন হইতে অনিলা প্রলাপ বকিতেছে। অনিলার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে একদিন রাত কাটে কিনা কাটে এমন হইল। সকলে প্রাণ হাতে লইয়া শেষ রাত্রের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কারণ ডাক্তারেরা বলিয়াছেন ঐ সময়টাই সাঘাতিক। রামসদয় মনের মধ্যে একটা উৎকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, সরোজনাথ অস্থির হইয়া বারাণ্ডায় পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এমন কি বালক অমিয়কুমারও বিনিদ্র হইয়া রোগিণীর ঘরে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। কেবল কালীশঙ্কর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনিলার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর বদনের প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে সেই সঙ্কটকাল উপস্থিত হইল, সজল অন্তরে ভগবানের নাম জপিতে লাগিলেন। রোগিনী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল, তাহার চোখ মুখ যেন হিমসীল হইয়া আসিতে লাগিল। ডাক্তারেরা বিষ প্রয়োগ করিলেন, সকলেই শেষে মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

কিন্তু ভগবানের দয়ায় অনিলার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল, ডাক্তারেরা সেই শুভ লক্ষণ দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ক্ষন পরেই তাহারা একবাক্যে বলিলেন যে আর ভয় নাই।

* * * *

সবে মাত্র তোর হইয়াছে, রোগিণীর ঘর হইতে সবাই চলিয়া গিয়াছে, কেবল কালীশঙ্কর শয্যাপার্শ্বে অনিলার হাতখানি ধরিয়া বসিয়া আছেন, আর একজন নার্স একখানা ইজি চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া ঈষৎ তন্দ্রাগত হইয়া ঝিমাইতেছে। হঠাৎ কালীশঙ্কর দেখিলেন, অনিলা চক্ষুরুন্মিলন করিয়া একদৃষ্টে তাঁহার পানে তাকাইয়া আছে, আহত পক্ষীর মত তাহার ক্ষুদ্র হাতখানি তাঁহার হাতের মধ্যে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, অনিলা স্থিরদৃষ্টি হইয়া যেন কোনও বিষয় স্মরণ করিতেছে। ক্ষণপরে তাহার ম্লানমুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে অতি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল "বাবা।"

কালীশঙ্কর সস্নেহে তাহার বিপুল কেশরাশির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি মা!"

অনিলা আবার চক্ষু নিমিলিত করিল। পরে ধীরে অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "ভোরবেলার স্বপ্ন সত্যি হয় বাবা?"

কালীশঙ্কর যে আবার অনিলাকে এমন করিয়া কথা কহিতে দেখিবেন তাঁহার এ আশা ছিল না, তাই বিপুল আনন্দে তাঁহার মনটা ভরিয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে সেই আনন্দ দমনে রাখিয়া তিনি বলিলেন, "কেন, মা ও কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

অনিলা আবার ধীরে ধীরে বলিল, "স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন অগণিত জঙ্গলীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যুদ্ধ করতে করতে সে পড়ে গেল, তার উপর দিয়ে জঙ্গলীরা নাচতে নাচতে চলে গেল; কিন্তু পরেই আর একটা ভীল জঙ্গলী তাকে কাঁধে করে নিয়ে কারখানার একটা ঘরে লুকিয়ে রইল। এখন তারা সেই জঙ্গলীর দেশে রয়েছে, এখন উঠে হেঁটে বেড়াতে পাচ্ছে। হাঁ, বাবা, মরা মানুষ কি আবার ফিরে আসে?

কালী শঙ্করের চোখদুটী জলে ভরিয়া আসিল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আখাস দিয়া বলিলেন, "আসে বৈ কি মা, কখনও কখনও আসে। সে কেবল ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করে।"

অনিলা আবার বলিল, "হাঁ বাবা ফিরে আসে পুরাণে কি মিথ্যে কথা লিখিছে? না হলে সত্যবান ফিরে এলেন কি করে?

কালীশঙ্কর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সাবিত্রীর সতীত্বের জোরে, পুণ্যের জোরে। সতীর পুণ্যে, সতীর সতীত্ব-তেজে মরা মানুষও ফিরে আসে। কিন্তু তাতেও ভগবানের দয়া ছিল। সতীত্ব মহিমা দেখাবার জন্যে ভগবান সাবিত্রীর মনে ঐ তেজ দিয়েছিলেন। অনিলা আর কিছু বলিল না।

আরও দুই চারিদিন পরে অনিলা পথ্য পাইল, এবং দুই চারিদিন পথ্য পাইবার পরে ক্রমে সুস্থ ও সবল হইতে লাগিল। এখন সে রামসদয় বা কালীশঙ্কর বাবুর হাত ধরিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া ইজি চেয়ারে বসিতে পারে। একদিন তাহারা বারাণ্ডায় বসিয়া আছে, এমন সময়ে একখানা ভাড়াটে টেক্সি আসিয়া দ্বারে লাগিল এবং উহা হইতে কয়েকটী লোক নামিয়া উপরের বারাণ্ডায় উপস্থিত হইল। সরোজনাথ নিচে ছিল, সেই তাহাদিগকে লইয়া আসিল।

আগন্তুকেরা উপস্থিত হইতেই সেখানে একটা অব্যক্ত উত্তেজনার স্রোত বহিয়া গেল, কেন না আগন্তুকেরা আর কেহ নহে, স্বয়ং সার আর্থার কেনেডি ও কোঠারে দম্পতী। গঙ্গা সিড়িতে উঠিবার সময়ে কান্নার রোলে তুলিয়াছিল বলিয়া সুরোজ তাহাকে অন্তর পাঠাইয়া দিয়াছিল। প্রথম আপ্যায়ণ সমাধানের পর মুহূর্ত্তকাল ঘটনাস্থলে গম্ভীর নীরবতা বিরাজ করিল। তাহার পর সাহেব উঠিয়া হঠাৎ কালীশঙ্করের হাত ধরিয়া আবেগভরে বলিলেন, "কালি, কি বলে তোমায় বোঝাব বা সান্ত্বনা দোবো, তা মাথায় আসছে না। তবে একটা কথা বলতে ভরসা হচ্ছে। আমরা পুরুষমানুষ, সংসারের খেলায় আমাদের হারজিত দুইই আছে। সুতরাং তোমার মত জ্ঞানী তাতে বিচলিত হবে না। আর অরুণ যে ভাবে চলে গেছে তা আমি নিজে বলব না—এই কোঠারের মুখে সব শোন।

তখন বৃদ্ধ কোঠারে বলিতে লাগিলেন, "বাবু, কি বলব, বলতে মুখে কথা সরছে না। একাধারে এত রূপ, এত গুণ আর কোথাও ত' দেখিনি বাবু। হায়! হায়! আমরা আমাদের জঙ্গলে তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম, এ দুঃখ রাখবো কোথায়। বাবু, আমার একমাত্র কন্যা, আমার বড় আদরের, বড় স্নেহের মৈথিলী—তার গুণের কথা এক মুখে বলতে পারি নি—বাবু, তাকে হারিয়ে এত ব্যথা পাই নি। যথার্থ কথা বলব, এই ক'মাসে আপনার ছেলে আমাদের যে কি মায়ার বন্ধনে ফেলেছিল, তা বলবার ভাষা পাই না। মৈথিলীর মৃত্যুর আগে আমরা জানতুম না যে সে আমাদের মনিব। একদিনের জন্য কখনও সে তাহার ব্যবহারে জানতে দেয় নি। কি হাসি হাসি মুখ, কি মধুর মিষ্টি কথা, কি সরল আচরণ, কি দয়া মায়া, কি স্নেহ ভালবাসা, বলব কি বাবু, নিজের গুণে সে সকলকে বশ করে ফেলেছিল।"

কোঠারে কাঁদিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে অশ্রুমোচন করিলেন। সাহেব হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কোঠারে, সব বললে, কিন্তু তোমার মেয়ে যে অরুণের জন্য প্রাণ দিয়েছিল, তা ত' বললে না।"

সকলে চমকিয়া উঠিলেন এবং কোঠারের মুখপানে একদৃষ্টে উৎসুক নয়নে রহিলেন। কোঠারে বলিতে লাগিলেন, "সে অনেক কথা। আমার মেয়ে তার কর্ত্তব্য কাজ করেছে। আমরা জানতুম, সে অরুণকে ভায়ের মত ভালবাসত; কিন্তু তার ভালবাসা যে তা হতে আরও গভীর, তা ত' জানতুম না, তাই সে অরুণের বিপদ দেখে আপনি বুক পেতে সেই বিপদ তুলে নিয়েছিল। সতীর এ হতে সুখের মৃত্যু কি হতে পারে? কিন্তু

ভেবে দেখুন, অরুণ কি জন্য, কার জন্য প্রাণ দিলে। যাদের সে রক্ষা করবার জন্যে অগণিত উন্মত্ত জঙ্গলী আরব দস্যুর সম্মুখে অচল অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়েছিল, তারা তার কে? সে ত' ইচ্ছা করলে আমাদের সঙ্গে পালিয়ে আসতে পারত। আবার যখন আমরা তার হাতে পায়ে ধরে আমাদের সঙ্গে আসবার জন্যে অনুরোধ করেছিলুম, তখন তার মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছিল, সে হাসি এ পৃথিবীর নয়। আমরা তখনই জেনেছিলুম, সে মরণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে? অসহায়কে রক্ষা করবার জন্যে—দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্যে—সে আপনার প্রাণকে আহুতি দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছে।"

রামসদয় বাবু এতক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না। দারুণ আবেগ ভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কালীশঙ্কর বাবুর দুটী হাত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কালি, ভাই, আমায় ক্ষমা কর। আমি নরাধম, তা না হলে চোখ থাকতে অন্ধ হব কেন? ভাই, তোদেরই কথা ঠিক। তুই যা বলেছিলি, সরোজ যা বলেছে, আমার নিলা মা যে চোখে তাকে দেখেছে, তাই ঠিক; আমি ঘোর ভুলের ফলে বংশের সুসন্তানকে বংশের কলঙ্ক বলেছি, আমিই তার অকাল মৃত্যুর কারণ হয়েছি। কালি, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ

অভাবনীয় প্রত্যাবর্ত্তন

"ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ ত' এখনও দেখেন নি! তোমাদের বলি শোন, তোমরা কালই আবার গিয়ে চেপে ধর, দেখি কেমন টাকা আদায় না হয়। বাবু ত' আসামের জঙ্গলে কুপো কাৎ হয়েছেন, এখা আর ভয়টা কি? কালই যাও। বেঁচে থাকলেই বড় ভয়টা ছিল!" গিরিবালার ঘরে বসিয়া রমেশ এই কথা বলিল। বলিবার সময় তাহার মুখে চোখে যে দারুণ হিংসা ও কুটিলতার চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল, তাহা মামলাবাজ পরশ্রীকাতর পাকা জানিয়াত জুয়াচোরেরও হয় কিনা সন্দেহ।

গিরি বলিল, "আমার যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের ঐ যে অনিলা, ঐ ছুঁড়িটাকে দেখলে বড় ভয় করে। ছুঁড়ি যেন অন্তরের ভিতরেও ভের করে দিটি দেয়! ইচ্ছে করে, নখ দিয়ে ওর চোখ দুটো উপড়ে ফেলে দিই—"

"আঃ কি বলছিস্ পাগলের মত? ও সব মেয়েদি ঝগড়া এখন রেখে দে। কাল তোরা যাবি। শুনেছি, কাল সাহেব আর রামসদয়টাও থাকবে, কাল ওদের একটা মজলিস হবে, সেখানে অনিলাকে পশ্চিম পাঠাবার কথা ঠিক হবে। কাল আমিও থাকবো সেই সময়ে, কেন না আমাকেও থাকতে বলেছে। তোরা আমায় খুব করে গালিগালার করবি, দোষ দিবি। তা হলেই দেখিস্ টাকা আদায় হবে, চাই কি এই একখানা বাড়ীও পেয়ে যাবি। আদালতের ভয় দেখালেই কাবু হবে। এতদিন ওদের ভরসা ছিল, অরুণটা এলেই সব সন্দেহ মিটে যাবে। এখন আদালতে দাঁড়ালে ওদের পক্ষে প্রমাণ কিছুই নেই, আমারে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ আছে। আদালতে দাঁড়াবার ভয়ে কলঙ্কের ভয়ে অরুণের বড় মানুষ বাপ টাকা দিতে পথ পাবে না!"

পরদিন যখন অনিমার স্নান পরিবর্ত্তনের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় মুক্তা-ওলী গিরিবালাকে লইয়া তথায় হাজির হইল। তাহাদিগকে দেখিয়াই কালী শঙ্করের শোকদগ্ধ হৃদয় অধিকতর যাতনাক্লিষ্ট হইল। সরোজ বিরক্তি ও ঘৃণার দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিল, সাহেব বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, রামসদয় বাবু ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন, অনিলা শূন্যদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া আবার আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

রমেশ মহাকুদ্ধ হইবার ভাণ করিয়া বলিল,

"আবার তোমরা এখানে পর্য্যন্ত আমায় ধাওয়া করেছ? এমন বেহায়া ত' কোথাও দেখিনি? তোমাদের কি সময় অসময় নেই, স্থান কাল নেই?

মুড়িওলী বিনীতস্বরে বলিল, "কি করবো বাবা! কোথায় যাব বাবা, এখানে না এসে, না খেয়ে মারা যাব কি বাবা? তুমিই ত' আমাদের যাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছ বাবা?"

রমেশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "আমি? তোমাদের সাহস ত কম নয়।"

হঠাৎ নিচে একটা ভয়ানক গোল উঠিল। ভৃত্য পরিজনের তুমুল হর্ষধ্বনি এবং হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি পড়িয়া গেল।

সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সকলের বিস্ময় অপনোদিত হইতে না হইতে, সেই বহুকণ্ঠে উচ্চারিত হর্ষধ্বনি আকাশে মিলাইতে না মিলাইতে, আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল। এ কি! যথার্থই কি মরা মানুষ ফিরিয়া আসিল!

সর্ব্বপ্রথমে অরুণকুমার ও তাহার প্রভুভক্ত কুকুর এক লাফে দুই তিনটী সোপান অতিক্রম করিতে করিতে এবং উহাদের পশ্চাতে বিস্তর লোক আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে উপরের বারাণ্ডায় উপস্থিত হইল। তখন সেখানে যে ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

অরুণ কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সরাসর একবারে কালীশঙ্করের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভূতলে জানু পাতিয়া বসিয়া তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা, বাবা!"

কালীশঙ্কর অরুণের মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন, বোধ হয় তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা দয়াল ভগবানের উদ্দেশে নীরব ধন্যবাদ উত্থিত হইতেছিল। ক্ষণপরেই তিনিও "বাবা, বাবা!" বলিয়া বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তকাল মাত্র। অরুণ নিজেই লজ্জিত হইয়া চোখের জল মুছিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুখে হাসি আনিয়া বসিতে লাগিল, "বাবা, কি মনে করেছিলেন আপনারা? আমি মরে গেছি? হাঁ আমারমত একটা অকর্ম্মণ্য নাকি শিগ্‌গির মরে?

এই যে সরোজ, বাঃ বেশ লোক ত', তোর সুখের খবর তুই নিজে নিলি নি, রমা দিলে, বাঃ রমা তুই যে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি? এই যে সার আর্থার, নমস্কার, ভাল আছেন। এই যে কোঠারে বাবু, বাঃ আপনিও এখানে এসেছেন? শুনে এসেছিলুম বটে, সাহেবের সঙ্গে আপনারা কলকাতা যাত্রা করেছেন। বড়কাকাও রয়েছেন দেখছি, বাঃ তা হলে সকলের সঙ্গেই দেখা হল এক যাত্রায়।"

বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল পরে আবার বলিল, "কেবল অমি আর—আর নিলার সঙ্গে দেখা হ'তে বাকি। তারা বোধ হয় আমাকে দেখলে দানোয় পেয়েছে ব'লে মনে করবে, হাঃ হাঃ হাঃ।"

অরুণ এত তাড়াতাড়ি কথা বলিয়া যাইতেছিল যে কাহারও জবাব দিবার অবসর হইল না। যখন সে অনিমার নাম করিল তখন সকলে যেখানে এক কোণে অনিলা বসিয়া ছিল সেইখানে দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু কেহ সেখানে অনিলাকে দেখিতে পাইল না; অনিলা মুহূর্ত্তপূর্ব্বে ঘরের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছিল।

অরুণ আবার সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, "কি ক'রে বাঁচলুম? ওঃ সে ভারি কপাল জোরে। শরীরের চুচার জায়গায় আঘাত লেগেছিল, সে সব জায়গা দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল ব'লে শরীরটা ঝিম ঝিম করতে লাগল, টলে পড়ে গেলুম। তারপর কি হয়েছিলো জানি নি। একটু একটু অস্পষ্ট ছায়ার মত মনে পড়ে, গালফ আবরোরা বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে আমাদের মাড়িয়ে চলে গেল। তারপর যখন চেতনা হ'ল,

তখন দেখলুম, আমি একটা কাঠের ঘরে রয়েছি, আর মায়ের মত আমায় কোলে ক'রে নিয়ে সেবা করছে এই জঙ্গলী আবর লুবাং পাশি।"

সকলে সবিস্ময়ে অরুণের নির্দ্দিষ্ট দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে দাঁড়াইয়া এক সম্পূর্ণ অপরিচিত মূর্ত্তি; তাহাকে দেখিতে অনেকটা মণিপুরী অথবা গুর্খা কুলীরই মত। অরুণ লুবাং পাশির বেশ ভূষা পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিল; সুতরাং এখন আর তাহাকে জঙ্গলী রাক্ষস বলিয়া বোধ হইতেছিল না।

কেনেডি সাহেব এইবার কথা কহিলেন। এই সামান্য বিবরণের মধ্যে অরুণ—আপনার অসামান্য সৌর্য্যবীর্য্যের কথা কেমন গোপন রাখিয়াছে, তাহা সাহেবের বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি অরুণের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "বুঝেছি, আম। সব বুঝেছি। আশা করি, তোমার মত ছেলে তোমাদের বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে হোক।"

তারপর লুবাং পাশি জানাইল বিনায়ক অরুণের কোট ও পিস্তল চুরি করিয়াছিল। সে যখন যুদ্ধে নিহত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন আবরেরা তাহাকে অরুণ মনে করিয়া তাহার মস্তক কাটিয়া লইয়া গিয়াছিল। তারপর সে কি করিয়া অরুণের প্রাণ বাঁচাইল—সে কথা যখন সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বর্ণিতে লাগিল, তখন সকলেরই মুখে একটা উদ্বেগ ও আনন্দের ছায়া পড়িল।

এই অসভ্য জঙ্গলী পাহাড়ী নরকঙ্কালের কোন্ স্পর্শমণির সংস্পর্শ গুণে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! রামসদয় বাবু হঠাৎ উঠিয়া অরুণের হাত দুটী ধরিয়া সাশ্রুনয়নে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা অরুণ, আমার চোখের আঁধার কেটে গেছে, আমি না বুঝে তোমায় বংশের কলঙ্ক বলেছিলুম, আমায় ক্ষমা কর। এখন বুঝছি তুমি শুধু আমার অনিলার উপযুক্ত নও, তুমি—"

অরুণ লজ্জিত হইয়া বলিল, "এ কি বলছেন বড়কাকা! আমি আপনাদের সন্তান, আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমাকে নরকে ফেলবেন না—"

হঠাৎ অরুণের দৃষ্টি মুড়ি-অলীর ও গিরিবালার উপর নিপতিত হইল, উহারা এতক্ষণ সকলের আড়ালে দেয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়াছিল; অরুণ চমকিয়া উঠিল। মুড়ি-অলী অরুণকে দেখিয়াই গিরির হাত ধরিয়া পলাইবার পথ খুঁজিতেছিল, কিন্তু রমেশ চকুর সঙ্কেতে তাহাদিগকে ভরসা দিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিয়াছিল বলিয়া তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল।

অরুণ তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "এরা কারা, এরা এখানে কি করতে এসেছে?"

সকলে নীরব, স্থানটা একটা দারুণ গম্ভীর নীরবভাব ধারণ করিল। অরুণ পুনরপি তাহাদিগকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "এ ত, দেখছি পাড়ার মুড়ি-অলী, আর এই স্ত্রীলোকটীকে দেখে বোধ হচ্ছে, একে গাঁ ছাড়া দিয়েছিলুম। আমি শেষাশেষি টাকা পাঠাতে পারি নি বলে বুঝি তোমরা বাবার কাছে দরবার করতে এয়েছ? স্ত্রীলোকটী কি এখনও সারে নি? তা, বেশ করেছ, বাবার কাছে এসেছ। দেখুন বাবা, ওদের একটা বন্দোবস্ত করে দিন, ওরা বড় দুঃখী, আমার গাড়ী চাপা পড়েই ওদের এত কষ্ট!"

রমেশ প্রমাদ গণিল, সে ভাবিল বুঝি তাহার সাধের সাজান মামলাটা ফাঁসিয়া যায়। তাই সে তাড়াতাড়ি ক্রুদ্ধ হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "তুমিও যেমন, ওদের কথা না কি শোনাবার মত, না এখন শোনবার সময়! স্পর্দ্ধা দেখ না, বলে কিনা আদালতে গিয়ে তোমার বিরুদ্ধে খোরপোষের জন্য নালিশ করবে! কিসের নালিশ, কিসের খোরপোষ?

খেই ধরাইয়া দিবা মাত্র মুড়ি-অলী হাত জোড় করিয়া বলিল, "বাবা, তোমরাই বিচার কর, ওরা কথা শুনলে না। তোমরাই ভরসা দিয়েছিলে

খোকার বাপ ফিরে এলে বিচার হবে; তা খোকার বাপ ত' এসেছে, এখন বিচার কর। তোমরা বিচার করলে আমাদের আদালত যেতে হবে কেন?

অরুণ তাহার কথার একবর্ণও বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণেককাল ফেলফেল নেত্রে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "বিচার? খোকার বাপ? এ সব কি, আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

মুড়ি-অলী হাত নাড়িয়া অভিনয়ের ঢঙ্গে বলিল, "সে কি বাবা, এখন ওসব কথা বল্‌লে হবে কেন? খোকার বাপ হয়েছে, এই খোকার মার মুখ না চাইলেও চাইতে পার, কিন্তু খোকার মুখও চাইতে হয়। বস না গো খোকার মা, আমি ত বাবুর উপরোধে তোমায় ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলুম মাত্র।"

অরুণ অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "আমার অনুরোধে একটী আহত স্ত্রীলোককে তুমি ঘরে ঠাঁইও দিয়েছিলে একথা ঠিক, সেই স্ত্রীলোকটী এই কিনা তাও ঠিক বুঝতে পারছি না—কিন্তু ওকে কি অবস্থায় তোমাদের ঘরে এনেছিলুম, তাও ত' তোমরা জান। না হয় বাবাজীকে ডাক না, সে সব বলবে এখন।"

মুড়ি-অলী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া অরুণের কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিল, "ওমা, তা জানিনি? আমি ত' তখনই বলেছিলুম যে ও পোয়াতি। আর বাছা তুমিইত সব খরচ পত্তোরের ভার নিয়ে ওকে আমার ঘরে থাকাস হবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলে। তা সবই ঠিক চলছিল, তবে মাঝে হতে ঐ তোমার বন্ধু ঐ মেছের রমেশবাবু খোরপোষ বন্ধ করে গোলযোগ ঘটালে।"

অরুণ বলিল, "আমি ত এর কিছুই অস্বীকার করছি না। সেই ডাক্তারই ত বলে গিয়েছিল ঐ স্ত্রীলোকটীর সব অবস্থার কথা, আর আমিই খরচ দিয়ে ওর চিকিৎসাপত্র করিয়েছিলুম। কিন্তু কি অবস্থায় পড়ে আমায় এই সব ভার নিতে হয়েছিল, তাও ত' তোমরা জান। সেদিন ভয়ানক দুর্য্যোগ, আঁধার রাত, বিষ্টি পড়ছিল। আমি ভিজবার ভয়ে চোখ অবধি বর্ষাতিটা টেনে তুলে দিয়ে খুব জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে আসছিলুম, হঠাৎ একটা স্ত্রীলোক ঠিক তোমার দোকানের কাছে এধার হতে ওধারে রাস্তা পার হ'তে গেল, আমি সামলাতে গিয়েও ঘোড়া সামলাতে পারলুম না, তাকে চাপা দিলুম। তাই ত' তার ভার নিয়েছিলুম। তার আগে তাকে, কখনও দেখিনি।"

মুড়ি-অলী সকলের অলক্ষ্যে এই সময়ে গিরিকে একটা টিপুনি দিল। গিরিবালাও অমনই ঘোমটা ফেলিয়া সকলের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অরুণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বটে, তার আগে আমায় জান্তে না চিন্তে না, দেখ নি? কলির ধর্ম্মই এই। কি শয়তানি গো মা, কি শয়তানি! নিজের সুখের জন্য আমার সর্ব্বনাশ করে এখন নেকা সেজে বলছ কিছুই জান না। না হয় তোমার ছেলেকে না নেবে, না হয় আমরা ভিক্ষে করে খাবো কিন্তু মিথ্যে কথা ব'লে সত্যি ঢাকবার চেষ্টা করছ কেন?"

অরুণ একবারে স্তম্ভিত। বলিল, "তোমরা বলছ, আমি তোমায় কুলের বার করে এনেছি, তোমার যে সন্তান হয়েছে তার কারণও আমি, কেমন তোমাদের এই কথা না?

গিরিবালা জবাব দিবার পূর্ব্বেই মুড়ি-অলী বলিল, "তা ত' তুমি নিজেই জান।"

অরুণ বলিল, "তাহলে আমি মিথ্যা বলছি। এ কথার মীমাংসা এখন হতে পারে না। কৈ সেই বাবাজী কৈ? কৈ সেই ডাক্তার কৈ? তা ছাড়া আসাম যাবার আগে রমেশকে সব খুলে বলে গেছি। রমা, তুই ত' সব জানিস্, সব বল ত' ভাই, তাহলে সকলের ভ্রম দূর হবে।"

রমেশ ঠোঁট ভিজাইয়া লইয়া বলিল, "আরে যাক গে, যেতে দেনা। ভারি মস্ত বাপারটা কি

না, ঐ নিয়ে আবার সাক্ষীসাবুদ, বিচার আচার! তুই রেখে দে।"

অরুন অবাক হইয়া তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল। সরোজ লাফাইয়া উঠিয়া অরুনের একখানা হাত ধরিয়া বলিল, "কি বলছিস রমা! এটা কি ছেলেখেলার কথা হচ্ছে?"

রমেশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা যদি বল, তা হলে মীমাংসা ত এর হয়েই গেছে। সেই বাবাজী ব'লে কোথাকার ত একদিন বক্তৃতার সামনে সেই ডাক্তারকে আর মেসের ক'জন বাবুকে এনে সাক্ষী দিয়ে গেছে; তুমি কি তা জান না?"

অরুন এই সময়ে সরোজকে বাধা দিয়া বলিল, "সাক্ষী দিয়ে গেছে আমার বিপক্ষে? কি বলেছে তারা?"

রমেশ বলিল, "দেখ, ওসব কথা আর না তোলাই ভাল। বরং তার চেয়ে এদের সঙ্গেই একটা বন্দোবস্ত করে বিদায় করে দিলেই ভাল হয়।"

অরুন উত্তেজিতস্বরে বলিল, "বল, কি বলেছে তারা।"

অরুনের মুখের ভাব দেখিয়া রমেশ ভীত হইল, আমতা—আমতা—করিয়া বলিল, "আমি কি বলব? কত্তারাও ত জানেন, ওঁদেরই জিজ্ঞাসা কর না।"

অরুন কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া—আবার দৃঢ়স্বরে বলিল, "বল।"

রমেশ তখন যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে বলিতে লাগিল, "বাবাজী বলেছে, তুমিই নাকি ঐ মেয়েটিকে ঘরের বার করে এনে কালীঘাটে রেখেছিলে, সে যে ডাক্তারকে এনেছিল সেই ডাক্তারও বলে গেছে, তুমি তাকে কালীঘাটে থাকতে ঐ মেয়েটার জন্ত কল দিয়েছিলে, তার পর ঐ স্ত্রীলোকটী অন্তঃসত্বা হলে, ওকে কাছে রেখে দেখা শুনা করবার জন্তে বাবাজীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে মুড়িওলীর বাড়ী রেখেছিলে। আমার মেসের বাবুরা তোমায় রাত-বিরেতে মুড়িওলীর বাড়ী যাওয়া-আসা করতে দেখেছে। আমি তাদের কথা বিশ্বাস করিনি বলে আমায় হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, আমায় শেষে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিয়েছে—"

মুড়ি-ওলী—তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "কেন, কেনা জানে? পাড়ার যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই বলবে, এ ত' আর ছাপা নেই বাবু।"

অরুন মুড়ি-ওলীর কথার জবাব না দিয়া রমেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বটে, এতদূর হয়েছে? তা যখন তোমার চাক্ষুষ দেখিয়ে দিলে, তখন তুমি আমায় সে কথা—বল নি কেন?

রমেশ বলিল, "বাঃ আমি বলতে যাব কেন? তুমি আমায় স্ত্রীলোকটী দেখা শুনা করতে বললে, খোরপোষে আর সেবা শুশ্রূষার টাকা দিয়ে গেলে, আমার কি বুঝতে বাকি থাকে কিছু? আমি ভাবলুম, তোমার একটা খেয়াল চেপেছে, আমি গোলযোগ করে—"

সরোজ সরোষে বলিল, "ওঃ তুমি অরুণের এই রকম খেয়াল বরাবর দেখে আসছ বলে মোটে আশ্চর্য্য হও নি? মিথ্যাবাদী—"

অরুণ বাধা দিয়া বলিল, "আঃ তুই থাম সরোজ। তাহলে রমেশ তোমার বিশ্বাস এই স্ত্রীলোকেরা যা বলছে, তা সব সত্য?—"

গিরিবালা এতক্ষণ নীরবে তর্ক শুনিতেছিল, অরুণের এই কথা শুনিয়া সে একবারে রায়বাঘিনীর মত মুখ ঝামটা দিয়া বলিল, "না তা সত্য হবে কেন, আমরা সব বানিয়ে বলছি!"

অরুণ স্তম্ভিত হইল। এ পৃথিবীটাতে এত কপটতা এত প্রবঞ্চনা থাকতে পারে! একি, হয় কে না এমন ভাবে করা যায়? সত্যিই কি সে অরুণকুমার, না আর কেউ?

অরুণ বিহ্বলের মত বলিল, আপনারা সব শুনলেন, আমার নামে কি ভয়ানক অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে। এর চেয়ে মানুষের আর কি অপবাদ হতে পারে? অবশ্য অপবাদ বলবার আমার অধিকার নেই, কেন না এতগুলি লোক—বিশেষতঃ আমার বন্ধু রমেশ—আমার বিপক্ষে প্রমাণ প্রয়োগ দিয়ে সাক্ষী দিচ্ছে, সুতরাং ওটাকে অভিযোগই বলতে হবে। সেই অভিযোগের বিপক্ষে আমার সাক্ষী কেবল আমার মুখের কথা। সে কথায় আপনাদের বিশ্বাস না হবারই কথা, কিন্তু তবুও আমি বলছি, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, আমি শুধু একটা হৈ চৈ হয়ার ভয়ে এই স্ত্রীলোকটিকে গাড়ী চাপা দেবার কথা সে সময়ে কাউকে বলিনি। থাক্, সে কথা ফলে এখন কে বিশ্বাস করবে? যে কর্ত্তব্য অভিযোগ আমার নামে উপস্থিত হয়েছে, তা হতে যতক্ষণ আমি মুক্ত হতে না পাচ্ছি, ততক্ষণ আমি আপনাদের সমাজে বা সংসারে উপস্থিত থাকবার অধিকারী নই। তাই আমি এখনই আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে যাচ্ছি।"

কালীশঙ্কর তাহার কথা শেষ না হইতেই দুই হাতে অরুণকে জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "কোথা, যাবে বাবা? যে যা বলে বলুক, আমার চোখে তুমি নির্দ্দোষ।"

সরোজ অরুণের একখানা হাত ধরিয়া বলিল, "কে দোষ দেয় তোকে? জগতের সকলে তোকে দোষী বললেও আমি বলবো না।"

এই সময়ে হঠাৎ কেনেডি সাহেব উঠিয়া অরুণের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন "অরুণ যে নির্দ্দোষ তাতে কারও সন্দেহ নাই। তবে ওর বিপক্ষে একটা ঘোর ষড়যন্ত্র হয়েছে। যতক্ষণ না সেই ষড়যন্ত্র ভেদ করে অরুণ নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করতে পারবে, ততক্ষণ ওর মনে শান্তি আসবে না, এখানে একরওও থাকতে পারবে না। ও ঠিকই বলেছে, এখান থেকে অন্যত্র গিয়ে থাকাই ওর কর্ত্তব্য। তা, এখন ও আমার সঙ্গেই আসুক, ওকে আমি কোঠারের বাসায় নিয়ে যাব। চল, কোঠারে। কালী দুঃখু কোরো না, তোমার ছেলে অপবাদমুক্ত হ'য়ে শীঘ্রই তোমার কাছে ফিরে আসবে।"

সাহেব এই কথা বলিয়া অরুণ ও কোঠারেকে লইয়া চলিয়া গেলেন, সরোজ ও লুবাং পাশি তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল।

(ক্রমশঃ)

নিত্যসুর

(শ্রীপ্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল,)

যে উদার সুরে বাঁধা বিশ্ব-বীণা খানি
ছোট বড় সব গানই পায় সেথা স্থান
বক্ষের কম্পন সনে নিখিলেরই প্রাণী
বিশ্ব-সুরে সুর দিয়া গায় নানা গান,
অতি তুচ্ছ স্বার্থ লাগি' দ্বন্দ্ব-কোলাহলে
অন্ধ থাকি' মোরা যবে ভুলি সেই সুর,
তখনো তুমি হে নাথ, বসিয়া বিরলে,
অন্তরের অন্তঃপুর কর সুরপুর।
তোমার সে চিরন্তন নিত্য-সত্য সুরে,
দেখি আর নাহি দেখি, মানি নাহি মানি,
হৃদয় হইতে তুমি কভু নহ দূরে,
তোমাতে আশ্রয় পায় তোবে সর্ব্ব প্রাণী,
অরণ্যের নীড়ে ইহা বুঝি স্পষ্ট করি'
নগরের ভিড়ে হায়, থাকি তা পাশরি'।

ভাগের পূজা

(ডাক্তার—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-ও, ডি-এস)

[কৃতজ্ঞতা :—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া (২) ইযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার, (৩) শ্রীমতী সরসীবালা বসু (৪) শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ, (৫) শ্রীমতী চারুবালা বসু, (৬) শ্রীযুক্ত অজয়কুমার সেন, (৭) শ্রীমতী লীলা দেবী, (৮) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, (৯) শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, (১০) শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায় (১১) শ্রীমতী গিরিবালা দেবী, (১২) রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, (১৩) শ্রীমতী স্নেহশীলা চৌধুরানী, (১৪) শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি. এ, (১৫) প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

গল্পটা হো, শচীর সঙ্গে প্রসাদের বিয়ের কথা যখন মায়ের কাছে পাড়িল, তখন প্রসাদ কাছেই ছিল। সে আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিল।

মনটা তার ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কেন তা' সে বুঝিতে পারিল না। সে ধাঁ করিয়া মায়ের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "না, আমার বিয়ের কথাটা তোমরা দয়া করে' আলোচনা করো না; আমি বিয়ে ক'রবো না।"

সেই দিনই সে হঠাৎ তল্পীতল্পা বাঁধিয়া কলিকাতা রওনা হইল—সে বলিল, তারী জরুরী দরকারে সে যাইতেছে। কিন্তু আসল কথা গয়লা বউর কাছ থেকে পলাইবার তাড়া ছিল।

ষ্টেশনে আসিয়া সে মহা বিভ্রাটে পড়িল। একটি অল্প বয়সের বউ হাবড়া ষ্টেশন হইতে শ্বশুরের সঙ্গে এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি ঝি। পূর্ব্বের ষ্টেশনে ভদ্রলোক কোনও কারণে ট্রেণ হইতে নামিয়া যান, কিন্তু আর উঠিতে পারেন নাই। ট্রেণে উঠিবার জন্য ছুটিতে ছুটিতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া খুব গুরুতর রকম আহত হইয়া পড়েন। তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়া ষ্টেশন মাষ্টার বউও ঝিকে নামাইয়া Waiting Roomএ রাখিয়াছেন। বধূ ভয়ে কাঁদিয়া ভাসাইতেছে, ঝি ভয়ানক চেঁচামেচি করিতেছে।

প্রসাদ ঝির কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার জানিল। এই অবস্থায় নারীকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে তার মন সরিল না। পথে ঘাটে অসহায় স্ত্রীলোকের উপর নানারকম অত্যাচার হয় তাহার জানা ছিল। তাই এই নারীদুইটি তাহাদের অভিভাবকের জিম্মায় না যাওয়া পর্য্যন্ত প্রসাদ তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিল না। সে তাহাদের কাছে গেল না, কেবল তফাৎ হইতে তাহাদের পাহারা দিতে লাগিল। কলিকাতার ট্রেণ প্রসাদকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা পর Up ট্রেণে ভদ্রলোকটি আসিয়া পৌছিলেন। তাঁর হাত পা ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ করা, দুইটি ভদ্রলোক ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নামাইল। দেখিয়া স্ত্রীলোকদুটি ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

ভদ্রলোকটির নাম উমানাথ। এলাহাবাদে তাঁহার কিছু বিষয় আছে, তাই দেখা শুনা করেন, আর এক আধটু ব্যাসার চেষ্টা করেন। বউট তাঁর পুত্রবধূ, গত বৎসর বিবাহ হইয়াছে। উমানাথ বাবু পুত্রবধূকে লইতে আসিয়া এমনি বিপদ্ হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রসাদের কাঁধে ভর করিয়া উমানাথ বাবু ওয়েটিং রুমে আসিয়া বসিয়াই বলিলেন, "ভাই গো এখন উপায়?"

তাই তো উপায়? এখন তাঁকেই বা দেখে কে আর বউকেই বা দেখে কে?

অনেক গবেষণার পর কোনও উপায়ই স্থির হইল না। একমাত্র উপায় এলাহাবাদে উমানাথ বাবুর ছেলেকে, না হয় মধুমনসিংহে বাপের কাছে টেলিগ্রাম করা। উভয়েই দুই দিনের ফের। এ দুই দিন উমানাথ বাবু থাকেন কোথায় আর কেই বা তাঁদের দেখে শোনে। প্রসাদ তাঁহাদিগকে নিজ বাড়ীতে লইতে চাহিল। উমানাথ তাহাতে বড় প্রসন্ন হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যদি দয়া করে গ্রামের কোনও ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে এলাহাবাদ পৌছে দেন তবে আমি তাঁর কেনা হ'য়ে থাকি।"

প্রসাদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁতে নখ কাটিতে লাগিল, তার যে কলিকাতা যাইবার বড় তাড়া। কলিকাতার কাজের ভিড়ের ভিতর ডুবিয়া সে সব ভুলিতে চায়।

উমানাথ আবার বলিলেন, "ব'লতে সাহস হয় না, কিন্তু আপনি নাকি বড় দয়া ক'রেছেন তাই বলি, যদি আপনার বিশেষ অসুবিধা না হয় তবে আপনি যদি আমাদের পৌছে দেন।"

ঘোমটার ভিতর হইতে বধূ যে কাতর নয়ন বিষাদের সহিত প্রসাদের মুখের উপর নিবদ্ধ করিল তাহা প্রসাদের চক্ষে পড়িল। সে আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল—তার যে বড় তাড়া।

হঠাৎ তার মনে পড়িল অমলের কথা—সে যে গুলিদেই যাইতে প্রস্তুত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রসাদ বলিল, "আচ্ছা, আমি আপনাদের লোক এনে দিচ্ছি।" বলিয়া অমলের সন্ধানে চলিল।

অর্দ্ধপথে তার আপনার উপর রাগ হইল। অমলের পক্ষে আজ গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়া যে ভয়ানক অসুবিধা হইবে তাহা সে জানিত। কাল হাটবার, রাজ্যের লোক তার কাছে আসিবে তুলা নিতে ও ওস্তা বেচিতে। এ কাজ অমল কিম্বা প্রসাদ দুজনের একজন না থাকিলে হইবে না। কাজেই অমল যদি যায় তবে প্রসাদকে গাঁয়ে থাকিতে হইবে। তা' ছাড়া প্রসাদই বা যাইবে না কেন? পরের হিত করিবার এমন অবসর, এতবড় একটা পুণ্য কর্ত্তব্যের সামনে সে সঙ্কুচিত হইবে কেন?

বিরক্ত হইয়া প্রসাদ ফিরিয়া বলিল, "চলুন, আমিই আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।"

উমানাথ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঘোমটার ভিতর হইতে আর একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টি আসিল। দুই ঘণ্টা পর প্রসাদ উমানাথ বাবুদের লইয়া এলাহাবাদ চলিল।

পথে তাঁহাদের পরিচয় হইল। উমানাথ বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রসাদের সঙ্গে অনেক বিষয় লইয়া আলাপ করিলেন। প্রসাদ দেখিল লোকটির অন্তর উদার, পৃথিবীর খবর তিনি রাখেন আর লোকহিতে তাঁর মতি আছে। উমানাথ বাবুর উপর তার শ্রদ্ধা হইল।

উমানাথ বলিলেন, "বাবাজীর কি বিবাহ হ'য়েছে?"

প্রসাদ বলিল "না।" বলিতে কিন্তু তা'র মুখখানা একটু লাল হইয়া উঠিল।

উ। বিবাহ ক'রবার ইচ্ছা নাই?

প্রসাদ বলিল, "না।" বলিতেই তার মনের ভিতর থম্ করিয়া উঠিল। সে কেন যে এই মৌঢ়ের কাছে ফট্ করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিল ভাবিয়া পাইল না। নিজের উপর রাগ হইল, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

উমানাথ তখন তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন যে বিবাহ করা উচিত। বিবাহ না করিলে মনের একটা স্থিতি হয় না। তাঁর অভিজ্ঞতায় যে কয়টা লোক বেশী দিন বিবাহ না করিয়াছিল তারা সবাই হয় পাগল হইয়াছে, না হয় অল্প বয়সে মরিয়াছে না হয় এমনি একটা কিছু হইয়াছে।

এ সব কথায় অন্য সময় হইলে প্রসাদ অনেক আপত্তি করিতে পারিত কিন্তু এখন তার চিত্ত এ

কথায় সম্পূর্ণ সায় দিল বলিয়া সে আপত্তি করিল না। সে বলিল, "আমি কখনও বিয়ে ক'রবো না এমন তো বলি নি। আপাততঃ ক'রবার ইচ্ছা নেই।"

"ওঃ বুঝেছি, বাবাজী বুঝি অর্দ্ধেক রাজত্ব ও বিদ্যুৎবর্ণা রাজকন্যার জন্য অপেক্ষা করছেন; তা' কিছু মনে করো না বাবা, আমরা বুড়ো হ'য়েছি, অনেক দেখেছি শুনেছি, ও সব আইডিয়া কোনও কাজেরই নয়। প্রথমতঃ পৃথিবীর কোনও দেশেই কোনও স্বামী এ পর্য্যন্ত স্ত্রী পেয়ে—বিয়ের বছর দুই পরে ষোল আনা সুখী হয় নি। কেউ দু আনা, কেউ দশ আনা কেউ বড় জোর বারো আনা—আর average ক'ষে নেও, সব দেশেই সাত আট আনায় দাঁড়াবে। বিয়ে, বাবাজী, কপালঠোকা ব্যাপার। একটু দেখে শুনে সামলে উপস্থিত ঘেটা থাকে চুঁ মেরে লেগে যাও—শেষ পর্য্যন্ত দু আনাই হ'ক দশ আনাই হ'ক, তোমার বরাত মত সুখ লেগে যাবে। এই ধর না আমার বিয়ে বাবা টেলিগ্রাফে ঠিক ক'রলেন। না তিনি, না আমি না মা মেয়ে দেখলেন। তাঁকে খবর দিলে এক বন্ধু। অমনি তাঁরে তাঁরে বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল। তা' বাবাজী, আমি জোর করে' বলতে পারি। আমি অন্ততঃ বারো আনার দলে দাঁড়িয়েছি। আর আমাদের ব্যারিষ্টার নবীন মুখুজ্যে, সাত রাজ্যি ঘুরে কোর্টশিপ করে' বিয়ে করলে, ষোল বছরের মেয়ে—পাঁচ বছর না যেতে যেতে মেয়ের রূপ হ'ল পেত্নীর মত আর গুণের জোরে মুখুজ্যে ভায়া প্র্যাকটিস ছেড়ে আজ দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াচ্ছে —এমনি গিন্নীর রাজ্য। সব এইখানে বাবাজী, সব এইখানে"—বলিয়া তিনি কপালে হাত দিয়া দেখাইলেন।

প্রসাদ একটু হাসিয়া বলিল, "আপনার ভাগ্যে বার আনা হ'য়েছে বলে' কি সবাই তারে বিয়ে ক'রবে ব'লতে চান?"

উমা। তা' ব'লতে চাইনে, তবে মোটের উপর ফলের যে খুব তফাৎ হ'বে তা ব'লতে পারি না। গড় পড়তা সেই লাভ আট আনাই থাকবে, আর কারও ভাগ্যে হ'বে বারো আনা কারো ভাগ্যে চার আনা।

প্রসাদ। আর কারো ভাগ্যে শূন্য!

উমা। তা' হ'তে পারে হয় তো। শূন্য ভাগ্যিও হ'তে যেমন হ'য়েছেন কোর্টশিপ করে মুখুজ্যে মশাই।

প্রসাদ। তবে আপনি ভালবাসাবাসি জিনিষটায় বিশ্বাস করেন না?

উমা। শ্রীবিষ্ণু! বল কি বাবাজি, তুমি ছেলে মানুষ তোমায় কিই বা ব'লবো? আমার একটা বদনাম আছে যে এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও আমি আর আমার স্ত্রী যেন lover রয়ে গেছি। ভালবাসায় বিশ্বাস করি না মানে কি?

প্র। যদি ভালবাসা আছে মানেন তবে স্বামী স্ত্রীর কপালঠুকে বিয়ে করে, শেষে ভালবাসার জন্যে স্বর্গের দিকে হাত পেতে থাকার চেয়ে ভালবাসা না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রলে দোষ কি? যাঁকে ভালবাসি তাকে যদি বিয়ে করি তবে এই আঁধারে ঢিল মারবার দায় থেকে তো মুক্তি পাওয়া যায়।

হাসিয়া উমানাথ বলিলেন, "এ সব তোমার Poetry বাবাজী, নিছক Poetry ভালবাসা বইতে প'ড়েছ, আসল জিনিষটার আস্বাদ পাও নি কি না তাই এই সব ব'লছো। বিয়ে হ'লে ভালবাসতে হ'বেই, তা সে দু আনাই হ'ক আর বার আনাই হ'ক। ওই যে শুর'র কথা বলে সেটা সম্পূর্ণ আমি মানি না। যার সঙ্গে দিনরাত শোয়া বসা একই interest নিয়ে নড়া চড়া, তার সঙ্গে মনের মিল কতকটা যে হ'তেই হ'বে। কাজেই বিয়ে করে' ভালবাসার জন্য কারও ভগবানের কাছে হাত পেতে বসে' থাকতে হয় না। তা' ছাড়া ভালবাসা হ'ল বিয়ের একটা bye-prooduct বিয়ের আসল উদ্দেশ্য তো নয়। সেই bye product এর জন্যে সারাজীবন হাঁ করে বসে' যে কাটাতে চায় তার মত বেকুব কেউ নেই। শুধু ভালবেসে স্বামী স্ত্রীর চলে না। তেমন চলে। যদ্দিন কোর্টশিপ হয়, পুরুষ থাকেন একখানে নারী থাকেন আর এক খানে। যেমন তেষ্টা পেলে লোকে জল খায় তেমনি। যখন তাদের ভালবাসা পায় তখন তাদের দেখা শুনা। স্বামী স্ত্রীর তো সেটি হ'বার জো নেই। তাদের সমস্ত চব্বিশ ঘণ্টার—বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের। তাদের সমস্তটা জীবন একেবারে সামনা সামনি হ'য়ে মেশামেশী হ'য়ে যায়। তাদের মধ্যে যত রকম কারবার হয় তার মধ্যে ভালবাসার আদান প্রদান সেরকে ছটাকের বেশী নয়। সেই প্রকাণ্ড কারবারের কোনও পুঁজীর উপায় না ক'রে যদি তুমি কেবল ভালবাসা সম্বল করে' জীবন স্রোতে গা ঢেলে দেও তবে তোমার দেউলে হ'বার ষোল আনা সম্ভাবনা।

"এই ধর না মুখুজ্যের কথা। তারা পরস্পরকে ভালবাসতো তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা' ছাড়া কোনও কিছুতেই তাদের মিল ছিল না। মুখুজ্যে ছিল পণ্ডিত, তার স্ত্রী প্রায় অকাট মূর্খ। মুখুজ্যে বেহায় খরচে, স্ত্রী ভীষণ কৃপণ, মুখুজ্যের মদ না হ'লে চলে না, স্ত্রী মদের গন্ধ সইতে পারে না। কাজেই ভালবাসা থাকলেও তা' নিয়ে সংসার চললো না। কত ছোকরাই তো উঠতি বয়সে একটা মেয়ের চাঁদমুখ দেখে শেষী বয়সও কপচাতে থাকেন আর ভালবাসেন। কিন্তু বস্, যদি ওইটুকু সম্বল নিয়ে তাঁরা বিয়ে করেন তবে পস্তাতে হ'বে নিশ্চয়। তুমি হয় তো গোড়া হিন্দু, তোমার তিনি খৃষ্টান, তুমি হয় তো দুধ ভালবাস তাঁর দুধ দেখলে ন্যাকার আসে। তুমি হয় তো গা ঘেঁসাঘেসি করে' শোয়া পছন্দ করো না, তার গা ছুঁয়ে না শুলে ঘুমই আসে না। তা ছাড়া তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, তোমার তিনি হয় তো নাস্তিনী—যার সঙ্গে তোমার মনের যোগ মোটেই হ'তে পারে না। এ স্থলে বিয়ে করা স্রেফ বেকুবী। 'লভ' করতে হয়, 'লভ' কর কিন্তু যেখানে মিল না আছে—কিম্বা মিল থাকবার সম্ভাবনা না আছে সেখানে বিয়ে ক'রোনা, ক'রলে খুদী হ'তে পারবে না। তাই আমাদের সমাজে আবহমান্ কাল থেকে স্বজাতিতে বিবাহ, সমান বিবাহ এই সব চলে আসছে, তাই ধনীর পক্ষে গরীব বিয়ে করা উচিত নয়, গরীবের ধনী বিয়ে ক'রতে নেই।"

প্রসাদ কটমট দৃষ্টিতে উমানাথের দিকে চাহিল। এ বুড়া কি তার অন্তরের কথার সন্ধান পাইয়াছে। না হইলে তার এ সব বকিবার কি প্রয়োজন। এ সব কথা তার মোটেই ভাল লাগিল না। সে একটু অসহিষ্ণুভাবে কথাটা চাপা দিয়া বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া রহিল।

উমানাথ বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিলেন না, অনেকটা বকিয়া একটু শ্রান্ত হইয়াছিলেন, হুঁকা কল্কি বাহির করিয়া তামাক খাইবার উদ্যোগ করিলেন।

এলাহাবাদে নামিয়াই উমানাথ বাবু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া তার আফিসে ঢুকিয়া দশ টাকা খরচ করিয়া একখানা লম্বা টেলিগ্রাম করিলেন প্রসাদের মার নামে।

তাঁহার সঙ্গে রওনা হইবার সময় প্রসাদ তার মার নামে একখানা চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল, তাহা উমানাথ দেখিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে সেই চিঠির ঠিকানা তাঁহার স্মরণ ছিল। টেলিগ্রাম করিয়া তিনি প্রসাদকে লইয়া বাড়ী গেলেন।

প্রসাদের মার কাছে তিনি নিজের নাম গোত্র-কোষ্ঠীর পরিচয় দিয়া লিখিলেন, প্রসাদের সঙ্গে তিনি কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। প্রসাদ তাঁহার সঙ্গে আছেন। প্রসাদের মায়ের যদি অভিপ্রায় হয় তবে অনুগ্রহ করিয়া এলাহাবাদে আসিয়া কন্যা দেখিয়া যান। যে পর্য্যন্ত তাঁর আসা না হয়

সে পর্য্যন্ত উমানাথ প্রসাদকে এলাহাবাদে রাখিবার অনুমতি চাহিলেন।

প্রসাদের কথা

ভাল ফ্যাসাদ করেছে এই উমানাথ বাবু। বাস্তবিক পরের উপকার ক'রতে নেই। সেকালে সিন্দবাদ একথা বুঝেছিলেন যখন সাগরের বুড়ো তাঁর কাঁধে ভর ক'রে ব'সেছিল, আর বুঝছি একালে আমি। উমানাথ বাবুর উপকার ক'রতে আমি এলাম এলাহাবাদ, পরের দিনই ফিরে যাব। তা' তাঁর আবদার সাতটা দিন তাঁর বাড়ীতে থেকে যেতেই হ'বে। আমি তো বুঝিয়ে বল্লাম আমার ভয়ানক তাড়া, ভয়ানক কাজ। কিন্তু উমানাথ যখন তাঁর ওই আশ্চর্য্য হাসি হেসে হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন কাজের রকমটা কি? তখন আমি তাঁকে কোনও একটা সুবিধামত জবাব দিতে পারলাম না। আমি ব'লে বসলাম যে "মার খুব জরুরী দরকারে কলকাতা যাচ্ছিলাম।

ভদ্রলোক আবার তেমনি ক'রে মুচকি হেসে একখানা টেলিগ্রাম বের করে দেখালেন, মা লিখেছেন "আপনি প্রসাদকে যতদিন ইচ্ছা রাখতে পারেন যদি তার কোনও আপত্তি না থাকে।" বস্ এ কথা ফেঁসে গেল। আসল কথাটাও বলা হ'ল না। কেন হ'ল না তা' ব'লতে পারি না, কেবল আমার মনে হ'তে লাগলো যে এই লাকটির কাছে মালতীর কথা উত্থাপন করাও অসম্ভব। কথাটি তুললেই নিশ্চয় ইনি আমার পেটের নাড়ী থেকে সব গোপন তথ্য বের করে' ফেলে এমন একটা মুহূ পরিহাসের হাওয়া উড়িয়ে দেবেন যে আমার সব রোমান্স একেবারে ফুঁ হ'য়ে উড়ে' যাবে।

যেতে পারলাম না, কিন্তু মহা অস্থির হ'য়ে উঠলাম। মনটা ভারী উত্যক্ত বোধ হ'ল, উমানাথের উপর তীব্রণ রাগ হ'ল। সমস্ত-ক্ষণ খুঁৎ খুঁৎ করে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু খুঁৎ খুঁৎ করবার খুব যে বিশেষ কোনও হেতু ছিল এ কথা জোর করে বলতে পারি না। ভদ্রলোকের সমস্ত পরিবারে মিলে আমায় এমন-তোয়াজে রাখছেন যে বলবার নয়। তাঁর বড় ছেলে সুধীর, যা'র স্ত্রীকে আমি অসময়ে বিপদে পতিত দেখে এই ফ্যাসাদে এসে পড়েছি, সে তো আমার গোলামী ক'রছে। আর তাঁ'র স্ত্রীটি সেতো গোড়া থেকেই আমার দাসী ব'নেই র'য়েছে। কথা সে কয় না আমার সঙ্গে, কিন্তু যতক্ষণ বাড়ীর ভিতর থাকি ততক্ষণ সে স্বামীর সঙ্গে আমার চারদিক দিয়ে ঘুর ঘুর করে' ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমার এটা ওটা সেটা করে' বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে কেবল তার ঘোমটার তলা থেকে তার ডর্ ডরে' চোখ তুলে সে কাতর কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে চায়। সে চাহনী যেন আমার অন্তরের খুঁৎখুঁতিকে লক্ষ্য করে' স্পষ্ট তিরস্কার করে, এমন চাবুক মারে মনের পিঠে যে আমি ভয়ানক লজ্জিত হ'য়ে উঠি। এ মেয়েটির বয়স বড় জোর পনেরো বছর হ'বে—একেবারে ছেলে মানুষ কিন্তু তার এমন ভারিক্কি চাল আর চক্ষের দৃষ্টি দিয়ে এমন গম্ভীর তিরস্কার কোথা থেকে এলো তা' ভেবে পাইনে।

আর একটি মেয়ে আছে, সুধীরের ছোট বোন চপলা। কথাটা অন্যায় ব'লাম। মেয়ে অনেকই আছে। উমানাথ বাবুর পাঁচটি মেয়ে। দুটির বিবাহ হ'য়েছে আর তিনটি এখনো ঘরে মজুত। তা' ছাড়া তাঁর ভায়ীও গুটি দুই আছে। কিন্তু আমার চ'খে লেগেছে কেবল ওই একটি মেয়ে। এমন একটা দস্যি মেয়ে ভুভারতে কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ। ভয়ানক বাড়ন্ত মেয়েটি, বয়স বছর চৌদ্দ হ'বে, কিন্তু সে লাফালাফি ছুটাছুটি করে' বেড়ায় যেন দশ বছরের খুকীটি। তার বাপ মা অনেক কষ্টে এইটুকু ক'রেছেন যে সে এখন বাইরে রাস্তায় ছুটে যায় না, কিন্তু বিদ্যাপণ বাড়ীতে করে আঠার আনা। ভাইবের সঙ্গে তার মারামারি লেগেই আছে, সুধীর যে তার আট বছরের

বড় তাও সে গ্রাহ্য করে না। তার উপর যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করে, দুই এক ঘা' মারও খায়, মার খেয়ে হেসে গড়ায়।

আমি যখন প্রথম এ বাড়ীতে আসলাম তখন চপলার ভারি লজ্জা। আমার কাছে আসে না; সে যেখানে থাকে সেখানে আমি গেলে সে দৌড় মারে তা' সে মাঠের পর মাঠ ছুটে হয়তো পালায়। অথচ আমাকে দেখবার কৌতূহলও তার খোল আনা আছে। আমি যখন ঘরে বসে থাকি হঠাৎ দেখি একদিককার ঝিল মিলির একটা পাখী উঠে গেল আর তার ভিতর দিয়ে চঞ্চল দুটো চোখ উঁকি মেরে আমাকে চেয়ে দেখছে। আমার চোখে চোখে পড়তেই সে ঝিল মিলি ছেড়ে দিয়ে এই ছুট! হ'ক চৌদ্দ বছরের মেয়ে, কিন্তু একে দেখে কোনও সঙ্কোচ হয় না, এর লুকোচুরী খেলা দেখে হাসি পায়, সঙ্গে সঙ্গে খেলতেও ইচ্ছা করে। তার আমাকে লুকিয়ে বেড়ান দেখে আমার ইচ্ছা হ'ল তাকে একবার ধরে' সামনা সামনি দাঁড় করিয়ে ফেলি। এ ইচ্ছা হবার কারণ এই যে আমি তাকে কিছুতেই চৌদ্দ বছরের মেয়ে ব'লে বিবেচনা ক'রতে পারি নি, তাকে ছোট্ট একটি আট দশ বছরের দুষ্টু মেয়ে ব'লেই আমি দেখেছি। তা ছাড়া এ মেয়েটাকে কেবল আবছায়ার মতই আমি দেখেছি। ওই ঝড়মড়ির ফাঁক দিয়া দুটো ডাগর চঞ্চল চোখ, দুয়ারের ফাঁকে চার পাঁচটা চাঁপার কলির মত আঙ্গুল—তার ডগায় ডগায় যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে—তা' ছাড়া হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা তার কৌতুক চঞ্চল মুখখানা আর তার পর মায়মান ললিত অঙ্গযষ্টি,—এ যেন তাকে দেখেও দেখতে না পাওয়া। কি জানি কেন আমার ভারি ইচ্ছা হ'ছিল মেয়েটাকে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে দেখতে। এই যে সিকি খানা দেখা, এতে যেন আমার ভারি অতৃপ্তি ও অস্বস্তি বোধ হ'চ্ছিল।

সে যখন আমার পাশের ঘরে ব'সে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে টান দিয়ে দিয়ে "We are elven" পড়তো, তখন আমার ভারী আশ্চর্য্য ঠেকতো। সেই চঞ্চল চপলা যে আবার এতখানি স্থির গম্ভীর হ'য়ে পড়ে আর সে যে চিরদিনই এতটা স্থির গম্ভীর হ'য়ে পড়ে' এসেছে যে তার এতটা বিদ্যা হ'য়ে গেছে, এ কথা ভাবতে আমার আশ্চর্য্য লাগতো। আমার ভারি ইচ্ছা হ'ত এই সময় তাকে দেখতে। এখনো কি সে বিদ্যাভারীর মত চঞ্চল নাকি তাই দেখতে ভারি মন চাইতো। কিন্তু দেখবার সুবিধা কিছুতেই হ'য়ে ওঠে নি।

একদিন সকালে আমি বেড়িয়ে ফিরছি। সুধীর আমার সঙ্গে ছিল' সে আমাকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে বাজারে চলে গেল, আমি একলা বাহিরের যে ঘরটতে আমি থাকতাম সেখানে ঢুকতেই দেখলাম চপলা আমার দিকে পিছন ফিরে টেবিলের কাছে বসে' একাগ্রমনে কি একটা দেখছে। বাগানের দিকে এই ঘরের আর একটা দরজা ছিল। আমি পা টিপে টিপে সরে গিয়ে সেই দরজায় দাঁড়ালাম। দেখলাম চপলা শান্তরূপ। দিব্য মেয়েটি। ইচ্ছা হ'ল এই ছবিখানা এঁকে নি। এ সে চঞ্চলা চপলাই নয়। তার চুলগুলো এলোমেলো হ'য়ে চারদিকে ছুটোছুটী ক'রছে, কাপড় চোপড়ও খুব আর্টিষ্টএর মত করে পরা নয়। কিন্তু তাতে একে মানাচ্ছিল বেশ। বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো সে চুলের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে সেই হাতের উপর মাথা ভর দিয়ে ব'সে সে বই প'ড়ছিল। তার ভারী পাপড়ীওয়ালা বড় বড় চোখ দুটো একাগ্রতৌতুংলে বইখানার ভিতর বসে গিয়েছিল। বইখানা যে উপন্যাস সেটা বলাই বাহুল্য।

হঠাৎ সে খিল খিল করে হেসে উঠলে, একটা বিজলী যেন তার মুখের উপর দিয়ে ঝল্‌মল্ করে খেলে গেল। ঝকঝকে দাঁতগুলি তার মুখের উপর যেন মুক্তোর মালা পরিয়ে দিলে। আমি একটু চমকে উঠে পিছিয়ে গেলাম। তেবে দেখলাম

এমন অবস্থায় একে দেখলে পরে লোকে মন্দ ভাবতে পারে। এখন আর তাকে সেই কচি খুকী মনে হচ্ছিল না, এখন সে রীতিমত তার চোদ্দটী বছর গয়নার মত পরে' ব'সেছিল, তাই আমি একটু সঙ্কোচ বোধ ক'রলাম। আমি ঘুরে গিয়ে আবার দরজার দিক দিয়ে বেশ শব্দ ক'রে ঘরে ঢুকলাম। চকিতা হরিণীর মত তড়াক করে উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে এক মুহূর্ত্তের মত তাকিয়ে একটু হেসে দে ছুট। কিন্তু সে ভুল ক'রলে; সোজা দরজার দিকে না গিয়ে বাড়ীর বাহিরে তার যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু সে অসম্ভব বলে, কিছু গ্রাহ্যই করে না। সে সটান জানলার উপর উঠে খাড়া পাচ হাত লাফ দেবার উদ্যোগ ক'রল।

আমি কিন্তু ধাঁ ক'রে দৌড়ে তার হাত ধরে ফেল্লাম। কেন? ব'লতে পারি না ঠিক। বোধ হয় ভাবলাম যে ওখান দিয়ে ওকে অমনি করে' লাফিয়ে প'ড়তে দেওয়াটা ঠিক হবে না। তা' ছাড়া তার এই চঞ্চলা হরিণীর মূর্ত্তিটে সোজাসোজি দেখবারও বোধ হয় একটু লোভ হ'য়েছিল। যাই হ'ক আমি তার হাত ধরে ফেললাম। সে জানালা থেকে নেমে ধাঁ করে মুখখানা ঢেকে ফেল্লে আর জোর করে হাত ছাড়াবার চেষ্টা ক'রলো। কিছুতেই যখন পারলে না তখন মুখ নীচু করে দু'হাত দিয়ে চেষ্টা ক'রতে লাগলো। আমি দু' হাতই ধরে ফেল্লাম। সে শরীরটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে নানা রকম করে জোর করতে লাগলো। আমার মত শুণ্ডার হাত থেকে তাতে সে মুক্তি পাবে কেমন করে? কিন্তু এটা বুঝলাম যে তার গায় জোর আছে; সে নবনীত কোমলা নয়, যদিও সে হাত দুখানা তার আমি হাতের ভিতর ব'রেছিলাম সে দুখানা ভারি নরম।

আমি হেসে বল্লাম "এইবার?"

সে কেবল, "ইঃ" "আঃ" "দেখুন" "যান" প্রভৃতি অস্ফুট শব্দ ক'রতে লাগলো। একবার হঠাৎ তার গোটা মুখখানা আমি দেখতে পেলাম। লজ্জায় সে রক্তজবার মত লাল হ'য়ে গেছে; সে তার আগুনের মত ঝাঁঝাল উজ্জ্বল চোখ দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে "ছিঃ"। আমি একদম মুসড়ে গিয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। ওই দৃষ্টি আর ওই "ছিঃ"এমন একটা তিরস্কার আমার মনের ভিতর এমনি ছুরীর মত হ'য়ে ব'সে গেল যে তা' ব'লবার কথা নয়।

তাই তো! এ কি বিসদৃশ কাণ্ডটা আমি করে' ব'সলাম! চপলা যে আর ছোট্ট মেয়েটি নয় তা' আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে এখন অনুভব ক'রলাম আর লজ্জায় ম'রে গেলাম। চপলা যে আমাকে কি ভাবলো তাতে আমার এক ফোঁটা সন্দেহ রইলো না। আমি তার কাছে একটা নেহাৎ পাশিষ্ঠ বনে গেলাম,আর আমার এই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ খেলাটা তার কাছে একটা ভয়ানক সাংঘাতিক চেষ্টা বলে দাঁড়িয়ে গেল। কি ঘেন্না!

সেদিন আর লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে পারলাম না। চপলার বৌদির চলন-চালন যেন আমার কাছে ভারী গম্ভীর গম্ভীর ঠেকলো। তিনি নিশ্চয় শুনেছেন আর শুনে না জানি কি ভাবছেন। সুধীরও সব শুনেছে বলেই মনে হ'ল। উমানাথ বাবুরও মুখে বড় একটা হাসি দেখা গেল না। আর চপলা সেই যে ডুব মারলো, তাকে তো সারাদিনের মধ্যে দেখাই গেল না। আমি ভারি অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগলাম। এ যে অধ্যাতি এ তো কইবারও নয় সইবারও নয়। কেউ আমার কাছে তো মুখোমুখী হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করছে না, তিরস্কারও করছে না যে বুঝিয়ে বসব। অথচ চোখে সবার এই তিরস্কার দেখতে পাচ্ছি। এর কি জবাব দেব? আর জবাব দেবই বা কি ছাই? আমার কথা কি বিশ্বাসের যোগ্য যে কেউ বিশ্বাস ক'রবে?

রাত্তিরে খাওয়ার পর আমি উমানাথ বাবুকে ব'ল্লাম "আমি কাল সকালেই যাচ্ছি।"

উমানাথ বল্লেন, "বিলক্ষণ, কাল তোমার মা আসছেন আর তুমি যাবে কি রকম?"

মা আসছেন? আমি আকাশ থেকে প'ড়লাম। উমানাথ বাবু আমাকে মার চিঠি দিলেন। তিনি লিখেছেন "আমার যদি মেয়ে পছন্দ হয় তবেই হ'বে, তাঁর আর মেয়ে দেখবার দরকার নেই। তবে যখন উমানাথ বাবু নিতান্তই পীড়াপীড়ি ক'রছেন তখন না আসছেন। বিশেষ আমি যখন এখানে আছি।"

এ সব কি কথা? তলায় তলায় এত সব কাণ্ড হ'য়ে গেছে, আমি তার কিছুই জানি না!

আমি সুধীরকে নিরিবিলি পেয়ে বেশ একটু উষ্ণ ভাবেই বল্লাম "এ সব কি? আমি তোমার বোনকে বিয়ে করবো না।"

সুধীর ভয়ানক আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে, "সে কি? আমার স্ত্রী তা' হ'লে মিথ্যা ব'লেছে?"

আমার সন্দেহই রইল না কি কথা সুধীরের স্ত্রী তাকে ব'লেছে। আমি একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেলাম। মুখ নীচু করে' ব'ল্লাম, "তিনি হয়তো ভুল বুঝেছেন, আমাকে মাপ করো।"

কিন্তু মাপ করবার কোনও রকম তার চেহারায় টের পেলাম না।

সেদিন রাত্রে ভারি এলোমেলো সব স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। মালতীর সঙ্গে চপলা মিশে গিয়ে কি সব যে দেখতে লাগলাম তা ভাবতেও লজ্জা করে। আমি চুপুর রাতে উঠে বসে জানালার উপর বসে' ভাবতে লাগলাম।

মালতীকে আমি ভালবাসি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেমন ভালবাসি। সে দিন উমানাথ বাবু ব'লছিলেন, "ভালবাসার রকম ফের আছে। আমি পাঁটা ভালবাসি খাবার জন্য। জকি লুইস সাহেব ঘোড়া ভালবাসে চড়বার জন্য; আর চৌষট্ গড়ের মহারাজা বাহাদুর ঘোড়া ভালবাসেন আস্তাবলে বেঁধে রাখবার জন্য। ইংরেজরা আমাদের দেশটাকে ভালবাসেন—এমন দেশ কি হয় এত টাকা, এত নবাবী দুনিয়ার আর কোথাও মিলে না। আমরাও এই দেশ ভালবাসি। আমরা একটা মানুষকে ভালবাসি চোখ দিয়ে—তার রূপ দেখবার জন্য, আর আর একজনকে ভালবাসি হয়ত তার রান্না খাবার জন্য, একজনকে ভালবাসি তার দুঃখের জন্য, আর একজনকে তার ভালবাসার জন্য। খাঁটি ভালবাসা তাকেই বলি, যেখানে আমার সব মন প্রাণ ইন্দ্রিয় দিয়ে আর একজনের সবটাতে আমি আনন্দ বোধ ক'রতে পারি। এমনটা সংসারে হয় না। তবে বারো আনা মাপে হ'তে পারে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে—যেখানে তোমার সবটার সঙ্গে তোমার স্ত্রীর সবটায় মেশামেশি মাখামাখি হ'য়ে গেছে।"

কথাটা মনে এখন বড় লাগলো। মালতীকে কি আমি ভালবাসি। তার রূপ মন্দ নয়, কিন্তু—এই ধর চপলার কাছে—তাকে রূপসী বলা চলে না তা স্বীকার ক'রতেই হ'বে। তার দুঃখটাই আমার অন্তরকে বেশী মথিত ক'রেছে। সেই দুঃখপীড়িতা মূর্ত্তি যা আমি ছবিতে এঁকেছিলুম সেইটাই তো আমার অন্তরের ভিতর বসে' রয়েছে। কিন্তু উমানাথ বাবু যা বলেছেন সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে—আমি মালতীর কিই বা জানি কিই বা ভালবাসি। ওকে নিয়ে ঘর ক'রতে পারি কি? তার সঙ্গে আমার মনের যোগ কোথায়? আমার আদর্শ, আমার চিন্তা এ সব তো তার মনের ধারে কাছেও নাই। দেশ বলতে আমাদের গাঁ-খানা বই কিছু সে বোঝে কিনা সন্দেহ। কবিতা তার প্রাণে কোনও সাড়া দেয় না। অন্য দিকে এই চপলা—এ লেখায় পড়ায় বুদ্ধিতে, কাজকর্ম্মে চঞ্চলতায় সব রকমেই আমার মনের চারিদিক দিয়ে বেড়ে তাকে তৃপ্তি দিতে পারে।

এ কথা ভাবতে আমার ভয়ানক রাগ হ'ল—নিজের উপর ভারি অশ্রদ্ধা হ'ল।

মালতীর কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করছি বলে

মনে হ'ল। কিন্তু সে তো আমাকে সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে। তবে আর বিশ্বাসঘাতকতাই বা কই ক'রলুম? তা' ছাড়া আর একটা কথামালতী আমার ভালবাসার মান কোনও দিনই রাখেনি। আমি যেই ক'লকাতার বাড়ীতে গেলুম সে অমনি বেরিয়ে গেল। আমি গেলুম ব'লেই যে গেল তা' নিশ্চয়। তারপর বিয়ের কথা সে অস্বীকার ক'রলে। আর শেষ শচীর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব করে' বসলো। তবে আর আমার দোষ কি?

এমনি সব এলোমেলো ভাবনা আমার হ'ল। যতই ভাবতে লাগলাম, ততই দেখতে পেলাম যে চপলাকে আমি বেশ রীতিমত—ভালবাসছি ব'লতে আর এখন ভয়সা করি না—কিন্তু রীতিমত কামনা ক'রছি; আর আমার মন আমার অজ্ঞাতসারেই তাকে সহধর্ম্মিণীরূপে কল্পনা করে' অপার আনন্দ অনুভব ক'রছে।

ছি—ছি—ছি—আমি কি একটা এমনি অপদার্থ! মাকে যে আমি এই বলে বেরিয়েছি যে আমি বিয়ে ক'রব না। আজ যদি হঠাৎ চপলাকে বিয়ে করে' নিয়ে তাঁর কাছে ফিরি তবে যে আর মুখ দেখাতে পারবো না! আমি নিজেই মনকে এই লঘুত্বের জন্যে খুব ধমকালাম শাসালাম, শেষে মালতীকে জোর ক'রে ধ্যান ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম।

কিন্তু মালতী যে নেই, সে আমার হবে না, হ'তে পারে না। সে পরস্ত্রী, তার কথা ধ্যান করাও যে আমার পাপ! আর এদিকে চপলাকে নিয়ে আমি যে কাণ্ডটা করে' ব'সেছি—তার বৌদি সেও টের পেয়েছে আর সুধীরকে ব'লেছে। এখন যদি আমি তাকে বিয়ে করবো না বলি তবে তারা যদি চাবুক নে আমার চামড়া তুলে দেয় তবু তো আমার কিছু ব'লবার থাকবে না। যদি চাবুক তারা না মারে সে কেবল তাদের অসময়ে উপকার ক'রেছিলাম বলে'।

ভেবে চিন্তে কিছুই ঠিক ক'রতে পারলুম না, মা এসে আমাকে এ দায় থেকে উদ্ধার ক'রবেন এই ভরসায় সমস্ত ভাবনা চিন্তা মার পায় সমর্পণ করে' দিয়ে আমি ঘুমিয়ে প'ড়লাম।

* * * *

মা এসে আমার উদ্ধার ক'রলেন—চপলাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে।

মালতীর কথা

আমি তখন কুটনো কুটছিলাম। মার কাছে মামাবাবু এসে একখানা লম্বা টেলিগ্রাম পড়ে শুনালেন। এলাহাবাদের উমানাথ বাবু আমাদের প্রসাদ বাবুর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চান।

তার শুনেই মা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। আমি লজ্জায় মরে গেলুম। আমার বুকের ভিতর যে ছুঁচ ফুটছিল তা' তাঁর কাছে লুকোবার জন্য একমনে তরকারী কুটতে লাগলুম।

উমানাথ বাবুর বাপের নাম মার শোনা ছিল। তিনি যে বড় কেওকেটা নন তা' তিনি জানেন। মা বল্লেন, "কি উত্তর দি বল্‌তো মালতী?"

কি লজ্জা! আমায় কেন জিজ্ঞাসা বল দেখি? আমার ইচ্ছা কি, তা কি মায়ের এখনো জান্‌তে বাকী আছে? আমি শুধু বল্লাম, "বেশ তো বেশ হয়।"

মার মুখখানা কিন্তু কেমন যেন শক্ত হ'য়ে উঠলো। তিনি খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন, "তুই লিখে দে নির্ম্মল, প্রসাদ যদি বিয়ে ক'রতে চায় তবে আমার অমত নেই। আর সে যতদিন ইচ্ছা সেখানে থাকুক। মামা বল্লেন, "কিন্তু দিদি, তোমায় যে যেতে লিখেছেন উমানাথ বাবু। আমি বলি চল না একবার।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মা বল্লেন, "না, আমার আর গিয়ে দরকার নেই।"

সেই তার করা হ'ল। তার পর উমানাথ বাবু ফের তার ক'রলেন। শেষ পর্য্যন্ত মা যাওয়াই স্থির ক'রলেন।

* * * *

বেশ তো বেশ! এই তো যোগ্য তার! আমি নীচ গয়লার মেয়ে, তায় বিধবা, আমার এতে কি বলবার আছে? আমার ওপর তাঁর মন পড়ে থাকবে এমন কি আছে আমার। তা'ছাড়া তাঁকে তো আমি পেতে পারি না। আমি যে গয়লা, বিধবা! তাঁর ভাল হ'ক—তাঁর বউ এসে তাঁকে আমার মত ভালবাসুক এই তো আমি চাই! তাঁকে আমি তো মুক্তিই দিতে চাই—তাই তো ঘর থেকে পালিয়েছিলুম। তবে কি?

বেশ তো বেশ!

কিন্তু, মন মানে কই। পোড়া চোখের জল মানে কই! বুক যে ভেঙ্গে যায়! হায় রে পোড়ারমুখী দুটো দিন তুই কি স্বপ্নই দেখেছিলি, আশার বাতাসে কোন্ স্বর্গে তুই উড়ে গিয়েছিলি? সব স্বপ্ন, সব মিছে! তাই না আজ তোর আছাড় খেয়ে তোর চিরপরিচিত মাটীর উপর পড়ে কেঁদে মরতে হচ্ছে! হায় হায়!

মা আমাকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছেন। পোড়া কপাল আমার! আমি বল্লুম, "আমাকে এ ক'দিন না হয় বাড়ীতেই রেখে যান।" তাই হ'ল, মা প্রয়াগ গেছেন।

* * * *

আজ খবর এসেছে, কাল প্রসাদ বাবুর বিয়ে, আর আমি তবু বেঁচে আছি! বাঘায় যখন বুক কাটে তখন লোকে মরে না কেন? কিসের আশায় আমার মত লোক বেঁচে থাকে। কেবল পরের গলগ্রহ হ'য়ে বেঁচে থাকবার জন্য—হায় রে কপাল!

আজ আর একটা কথা মনে হ'চ্ছে। প্রসাদ বাবু একদিন আমায় ভাল বেসেছিলেন,; আচ্ছা তাঁর বউ নিয়ে এখানে ফিরে এলে, আবার হয় তো আমায় ভালবেসে ফেলতে পারেন। যদি বাসেন, যদি তেমনি ক'রে এসে বলেন! তবু কি আমি বন্ধুর মত শত্রু হ'য়ে থাকতে পারবো? না পারবো না। আমার যদি সেই ভুবনমোহন বীরমূর্ত্তি আমার সামনে প্রেমের কাঙ্গাল হ'য়ে দাঁড়ায় তবে যে আমি কেবল তার পায়ে লুটিয়েই পড়বো তা বুঝতে পারলুম।

তবে?—কি সর্ব্বনাশ!

এখানে আর থাকা চলে না। থাকতে পারবোও না। এখনি আমার মনটা বউয়ের উপর হিংসায় ভরে উঠছে। আমি শেষ পর্য্যন্ত কি ক'রে বসবো তা' কে জানে। যাকে সব চেয়ে ভালবাসি সেই প্রসাদের জন্য আমার ঘরে কি শেষে আগুন জ্বালবো।

তার চেয়ে দীঘির জল মন্দ কি?

* * *

শেষ

মালতী আবার নিরুদ্দেশ হওয়ায় সবাই নানা রকম কাণাঘুষা করিতে লাগিল। তিন দিন পর নূতন বউ লইয়া প্রসাদ ও তার মা ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন দীঘির জলে মালতীর দেহ ফুলিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে।

বাদলের বেদনা

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

মন যে কেমন করে ওগো,
মন যে কেমন করে!
বৃষ্টি-মাখা ভিজে বাতাস
ঢুক্‌চে আমার ঘরে,—
আমার মন যে কেমন করে!
ভিজে বাতাস, ভিজে বাতাস!
কোন্ দরদে প্রাণকে মাতাস্,
তোর বন-দোলানো কাজ-ভোলানো
মেঘ-রাগিণীর স্বরে,
আমার মন যে কেমন করে!

মেঘেরা সব কাহার চিতার
ভস্ম গায়ে মাখে,
আকাশের ঐ নীলকমলে
আড়ালেতে ঢাকে।
যে দিকে চাই ঝাপ্‌সা যে চোখ,
গাঁয়ের পথে নেই কোন লোক,
চিল্‌'র আলো জ্বলে নেবে
বাঁকা নদীর চরে,
আমার মন যে কেমন করে!

সাঁঝের আঁধার জমাট্ হয়ে
উঠ্‌ল তিলে তিলে,
হাঁসের সারি, বকেরা আর
নেইকো ঝিলে-বিলে।
ক্ষেতের জলে, ধানের শীষে,
একলা হয়ে গেছে মিশে,
গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে
কাঁদ্‌চে কাহার তরে,
আমার মন যে কেমন করে!

তাদের কথা ভাব্‌চি কেবল
পালিয়ে গেছে যারা,
এখান থেকে নিয়ে ছুটি
কোথায় হোলো হারা!
একলা ঘরে ব'সে আজি,
দেখ্‌চি খুলে স্মৃতির সাজি,
নিঃশ্বাসেতে বুকের তলা
উঠ্‌চে ভ'রে ভ'রে,
আমার মন যে কেমন করে!

বন-বিহগী

(গল্প)

(শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়)

(১)

দুই হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নামাল ধরিয়া এক সাঁওতাল-যুবতী দুলিতেছিল। দোল্‌না দোলার তালে তালে তরুণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গানের সুর, অস্তরবির রক্তাভা-রঞ্জিত তরুরাজির পাতায় পাতায় প্রতিহত হইয়া বনানী-প্রান্তে ঘুরিয়া মরিতেছিল। সে গাহিতেছিল,—

বনের মাথায় সোনার আলো,
আকাশের একদিকে মেঘ উঠেছে,
আমার দোল্‌না দুল্‌ছে,
আমি আর গাঁয়ে ফির্‌ব না,—
হেইয়া হো! হেইয়া হো!!

হো, হো,—বলিয়া জোরে ঠেলা দিতেই দোল্‌না উপরে উঠিল, আবার নামিয়া আসিল, আবার উঠিল, আবার নামিল!

অনতিদূরে স্নিগ্ধ শ্যামল তরুছায়াচ্ছন্ন কয়েকটা ক্ষুদ্র পাহাড় এবং তাহার পাদমূল পরিবেষ্টন করিয়া দুর্বিভেদ্য বৃক্ষশ্রেণী, সাঁওতাল পল্লীটিকে সযত্নে বক্ষে ধরিয়া, প্রান্তরের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে!.....

বনৌষধিপূর্ণ পাহাড়ের পাশে, পত্র-পুষ্প-সুরভিত অরণ্যের একান্ত বুকের তলায়, উদার আকাশের স্নিগ্ধ-করুণ শ্যামলিমার নীচে, উন্মুক্ত রবি শশীর তরুণ কিরণোদ্ভাসিত প্রান্তরে, শান্তিময় কুঞ্জকুটীর বাঁধিয়া, প্রকৃতির দুলাল, নয় বর্ব্বর অনার্য্যের দল মনের আনন্দের স্বচ্ছন্দ-জীবন যাপন করিতেছে!

দুলিতে দুলিতে চঞ্চল বাতাসে তরুণীর আলু-লায়িত কেশগুচ্ছ এবং অসংবৃত অঞ্চলপ্রান্ত দোল্ খাইতেছিল।

অকস্মাৎ পশ্চাতে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল, কে যেন একটী অপরিচিত লোক সেইদিকে অগ্রসর হইতেছে। লোকটার পরনে সাদা ধুতি, গায়ে রঙিন জামা, হাতে ছাতা ও ছড়ি। তরুণী ভাবিল, এই পরদেশী পথিক বোধ হয় পথ হারাইয়াছে।

লোকটা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে খেয়ালের ঝোঁকে আরও দুইবার দোল্ খাইয়া আগন্তুকের মুখের পানে তাহার হরিণ-চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি হানিয়া কহিল,—ও কারিন্ তুহিন্ কানা? (তুই কোথা থাকিস্ রে)

লোকটা সাঁওতালিভাষা জানিত না। হাতের ইসারায় বুঝাইয়া দিল, সে তাহার ভাষা বুঝে না, এবং তরুণী যদি তাহাকে তাহাদের গ্রামে লইয়া যাইতে পারে তাহা হইলে ভাল হয়।

হাটের দিনে এখান হইতে প্রায় চার পাঁচ ক্রোশ দূরে একটা গ্রামে তাহারা 'সয়দা' করিতে যাইত, কাজেই এখানের সাঁওতাল অধিবাসীরা প্রায় সকলেই একটু আধটু বাংলা বলিতে পারিত।

তরুণী বলিল, তুদের বাংলা আমি জানি। বলিয়াই ফিক্ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া ইসারায় এই পরদেশী পথিককে তাহার পশ্চাতে আসিতে ইঙ্গিত করিল।

এই শ্যামলীর সারাদেহে নিটোল স্বাস্থ্যভরা যৌবনের অম্লান জ্যোতি,—মুখে চোখে নির্দ্দোষ চপলতার গতি ভঙ্গি! যুবক পশ্চাতে চলিতেছিল,

তরুণী ফেলিয়া ছুলিয়া চঞ্চল চরণে একটুখানি অগ্রসর হইয়া সংশয়ে কহিল,—তার ঘরকে যাবি ?

—তোদের গাঁয়ে মাতব্বর মুরুব্বি লোক কেউ নেই ? তার ঘরেই চল্।···আমি কে জানিস্ ?·· পুলিসের লোক।···

পুলিশের নাম শুনিয়া রমণী একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ও! পুনরায় চলিতে লাগিল। অন্য কেহ হইলে হয়ত' একটু চমকিয়া উঠিত, কারণ এই আত্মনির্ভর স্বাধীন বনবাসী দল জানে যে তাহাদেরও আর সেদিন নাই,—এই ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষে তাহাদিগকেও প্রতি পরবিক্ষেপে আইন মানিয়া চলিতে হইবে, নচেৎ এই পুলিশ নামধারী রাজার ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীবৃন্দ তাহাদের বনের উন্মুক্ত স্বাধীনতাকে কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খলে বন্দী করিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। সেইজন্য মাঝে-মাঝে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদের বহুবিধ অত্যাচার এই নিরীহ সাঁওতালেরা মুখ বুজিয়া সহ্য করে। বৎসর খানেক পূর্ব্বে পুলিশের নাম ধরিয়া একটা লোক এই গ্রাম হইতে প্রায় ত্রিশ চল্লিশজন 'জোয়ান'কে আমাদের চা-বাগানে পাঠাইয়া দিয়াছে। পরে, আবার আর-একজন আসিয়া, প্রচুর টাকা 'দাদন্' দিয়া লোভ দেখাইয়া, নেশা খাওয়াইয়া, প্রায় ত্রিশজন সাঁওতাল পুরুষ-রমণীকে কয়লা কুঠিতে লইয়া গেছে। ফিরিবার নাম নাই, বরং একে-একে তাহাদের মৃত্যু সংবাদ গ্রামে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আরও কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক বাঙ্গালী পাদ্রি-সাহেব, এই প্রকৃতি-পূজক অসভ্য সাঁওতাল জাতিকে উদার রাজধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সভ্য এবং শিক্ষিত করিবার সৎ উদ্দেশ্যে একপ্রকার জোর করিয়াই দুইটি গৃহস্থকে আঁধার হইতে আলোকে টানিয়া লইয়া গেছে। সেই নব-মন্ত্র জাগরিত পরিবারদ্বয় যন্ত্রণাজের চরণতলে জীবনের সুখশান্তি এবং আত্মমর্য্যাদা চিরতরে আহুতি দিয়া এখনও সভ্যতার চরম সীমায় পৌঁছিতে পারিয়াছে কি না কেহ বলিতে পারে না, তবে সম্প্রতি তাহাদেরই মধ্যে একজন নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত পুনরায় এই বনপ্রান্তের পর্ণকুটীরে ফিরিয়া সমাজ-পরিত্যক্ত অবস্থায় বাস করিতেছে মাত্র।

তরুছায়া-শীতল গ্রামে প্রবেশ করিয়া তরুণী একটা ঘরের প্রাঙ্গনে এই নব-পরিচিত অভ্যাগতের জন্য একটা 'খাটিয়া' বিছাইয়া দিয়া কহিল, ব'স্, আমি ডেকে' দিচ্ছি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীরখানির দিকে তাকাইয়া আগন্তুক কহিল,—এটা তোর নিজের ঘর নাকি ?··· তোর নাম কি ?

—আমার নাম মুকুরী আছে। হঁ, ইট আমার ঘর বেটে। আমার আর কেউ নাই।···

—তবে তুই খাস্ কি করে ?

মুকুরী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কেনে আমাদের কি খাবার আঁনা আছে নাকি ? যার ঘরে পাই, তার ঘরেই খাই।

—তবে তুই কয়লা-কুঠিতে চল্ না ? সেখানে দেখ্‌বি কত ফুর্ত্তি, কত টাকা, ভা-রি সুখ।

—না, না, আর কেউ যায় ত' আখ্, আমি যাব নাই। বলিয়া, মুকুরী, সর্দ্দারকে ডাকিবার জন্য ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ঘরে প্রাচীরের বালাই ছিল না, কাজেই এই অভ্যাগত সভ্যব্যক্তিটিকে দেখিবার জন্য দু' একটি ছেলে ছোকরা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মুকুরী হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিল।

পশ্চাতে বৃদ্ধ সর্দ্দার।

(২)

বস্তুতঃ, এই বাবুটি যে পুলিশের লোক নহে এবং রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী একটা কয়লাকুঠীর সামান্য একজন বেতনভোগী 'রিক্রুটার' (Recruiter) মাত্র, সে কথাটা পুরা মাত্রায় গোপন করিয়া পুলিশের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া লোকটী কহিল,—হই মুকুরী, তোদের সর্দ্দার কোথা ?

সর্দ্দার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখে আসিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, এই যে, আমি গঃ !

বৃদ্ধ সর্দ্দার তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বাবুর প্রায় হাতটা ধরিতে গিয়া বসিয়া উঠিল,—না, না বাবু, না। লেখিস্ না বাবু। আচ্ছা, উঁহাকে আমি ডেকে' দিচ্ছি। বলিয়া দূরে একটা গাছের নীচে একজন সাঁওতাল যুবকের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া ডাকিল,—হুজুম হো ! (এখানে আয়)

লোকটা আসিতেছিল, সর্দ্দার কহিল, এই যে সোনা আস্‌ছে বাবু,...তুঁই খেলি নাই যে। এগুতে খেয়ে লে। আমরা কাঁঠালটা ভেঙ্গে দি।

সর্দ্দার কাঁঠালটা ভাঙ্গিতে বসিল। সোনা কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বাবু বলিল, তোর নামে ওয়ারেণ্ট আছে সোনা। তোকে যেতে হবে।···

—হঁ যাব। বলিয়া, সোনা খাটের কাছে বসিল।

বাবু কহিল, সর্দ্দার! এ যে যাব বল্‌ছে।

সর্দ্দার খুসী হইয়া বলিল, বেশ। উহার যাবার খুসী হয়, যাক্। আমরা সে রকম জাত লই বাবু—তুঁই ত জানিস্। যার যা খুসী, করুক—আমরা কিছুই বল্‌ব নাই।

বাবু, সোনাকে বলিল, তাহ'লে তুই এইখানেই থাক্ সোনা। আজই ভোর রেতে উঠে, আমার সঙ্গে যেতে হবে।···এইখানেই থাক্, বুঝ্‌লি ? ···তা না হ'লে হয়ত রেতে উঠে' বেটা কোথাও পালাতে পারে।

সর্দ্দার উচ্চকণ্ঠে কহিল, ক্ষেপেছিস্ ? যাবেক্ কি ? মুখের কথাটি বলে, আবার আর একটি কাজ করবেক্ ? না, না,—তা করবেক নাই, তুঁই দেখে' নিস্।···ত, তুঁই এইখানেই থাক্ কেনে সোনা! মুকুরীর কাছে তো তুই থাকিস্ ?

সোনা একবার মুকুরীর ঘরের পানে তাকাইল।

সে তখন উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখে বনের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিল। বনের মাথায় পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে। বনফুল-সুরভিত স্নিগ্ধ বাতাসের গোলাপী আমেজে সমগ্র বনানী মাতালের মত টলিতেছিল।.....

বাবু বলিল, জল কোথা রে ! এক গ্লাস জল দে।

বাবুর মুখের পানে তাকাইয়া সর্দ্দার বলিল,—আরও থা বাবু, খেলি নাই যে !···তুরা ত' আমাদের হাতে জল খাবি নাই বাবু,-ওই ঝরণা থেকে পেঁয়ে আয় গা।.....যারে সোনা, বাবুর সঙ্গে যা। তুই ও যা মুকুরী, একটা ঘাট নিয়ে তুইও যা বাবুর সঙ্গে।

সোনা ও মুকুরী বাবুকে সঙ্গে লইয়া অদূরে প্রান্তরের পাশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ওই দ্যাখ্ গা, ওইখানে জল খুব ভাল।

বাবু দেখিল, বনের ধারে একটা স্থান একটু খানি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া তাহাতে একটু খানি জল ধরা হইয়াছে। বিশেষত্ব এই যে, সে স্বচ্ছ নির্ম্মল জলটুকু কখনও ফুরাইয়া যায় না। পাহাড় ও জঙ্গলের অপর প্রান্ত দিয়া যে নদীটা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার দুরন্ত কিছু বেশী বলিয়া ইহারা এই সহজ পন্থাটুকু আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। কেমন করিয়া এই বর্ব্বর অসভ্যজাতি মাটির নীচে এই অফুরন্ত শুপ্ত জলস্রোতের সন্ধান পাইল, অর্দ্ধ সভ্য বাঙ্গালার বাবুটি তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। সে তখন নিজ কর্ম্মসিদ্ধির আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল। সে যে কেমন করিয়া নিজের বুদ্ধির জোরে এই সরল বিশ্বাসী সাঁওতাল দিগকে ভুলাইয়া তাহাদের স্বাধীন মুক্ত বন্য জীবনকে কয়লা-কুঠির আবিলতায় বন্দী করিতে চলিয়াছে, এই কথাটা তাহাকে এত বেশী উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল যে, তাহার নিকট আজিকার চন্দ্র-কিরণোদ্ভাসিত বনপ্রান্তের পরমাশ্চর্য্য প্রাণধারার শুদ্ধ ইতিহাসটুকু নিতান্ত একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া মনে হইল।

ফিরিবার পথে দেখা গেল, সোনা ও মুকুরী ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছে। সোনা বলিতেছে, তাহাকে যাইতেই হইবে, কারণ এ স্থানটা তাহার আর ভাল লাগিতেছে না।

মুকুরী বলিতেছে, তুই কেনে যাবি?

এই লইয়া বিবাদের সূত্রপাত।

বাবুকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া সোনা বলিল, এই! বাবু আস্‌ছে, চুপ কর্।

মুকুরী জোর গলায় বলিল, চুপ করলেই হলো আর কি! কই, তুই যা দেখি?

বাবু জিজ্ঞাসা করিল, কি হলো কি রে তোদের?

মুকুরী কি বলিতে যাইতেছিল, সোনা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, দ্যাখ, বাবু, ই আমাকে বল্‌ছে তুদের দেশে যেতে হবেক্ নাই।

বাবু বলিল, কেন? তোদের দুজনার এত ভাব কিসের? সোনা তোর কে হয় রে মুকুরি?

মুকুরী ঈষৎ হাসিয়া একটা সলজ্জ কটাক্ষ হানিয়া কহিল, হঁ রে! উ আমার কে হয়, সবাইকে বলে' বেড়াই। তুর বেশ আক্কেল বাবু!...সোনা আমার কেউ নয়,—হলো? তুই উয়াকে নিয়ে যাস্ না বাবু, তা হ'লে আমাকেও যেতে হবেক্।

শ্যামা বসুন্ধরার শান্তিময় নিভৃত নিবাসটুকু ছাড়িয়া এই বনবিহগকে যদি অন্য কোথাও বন্দী হইতে হয়, তাহা হইলে সদা হাস্যময়ী এই মুকুরীর প্রাণে যে কত বেশী বাজিবে, সে সংবাদ এই পার্শ্বের অগোচর ছিল বলিয়াই, উত্তরে সে বলিল, 'তুই ও চল্। এখানের চেয়ে ঢের সুখে থাক্‌বি।'

অভিমানিনী তরুণীর কান্না কাতর কণ্ঠের সুর ধ্বনিয়া উঠিল, হঁরে! খুব সুখ! তাথেই যে তুর অমন সুখের চেহারা···আমি জানি রে জানি, খুব জানি। তুদের দেশে উ নেশা খেতে শিখে এসেছে, সেই নেশার টানে ছুট্‌ছে। আর কিছু লয়।···

বাবু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া কহিল যাব না বল্‌লেই হলো কি না,—ওর নামে ওয়ারেণ্ট, সোনাকে যেতেই হবে।' তুইও চল্ আমাদের সঙ্গে।

তাই যাব, বলিয়া মুকুরী হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

৩

জোড় জানকী কয়লাকুঠির একটা খড়ো বাঙলা ঘরে সোনা, মুকুরী এবং আরও দুইজন আসাম-যাত্রী আসিয়া বাস করিতে লাগিল। স্বামী দর্শন প্রার্থিনী হইয়া যে দুইজন সাঁওতাল রমণী আসাম যাইবে বলিয়া সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা যে প্রতারিত হইয়াছে, সে কথা গোপন রহিল না। সোনা ও মুকুরীর কলহ তখনও মিটে নাই, কাজেই এসব দিকে নজর রাখিবার অবসর তাহাদের ছিল না।

কয়লা খনিতে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন পাতাল পুরীর সুড়ঙ্গের মধ্যে সোনার সহিত কয়লা কাটিতে মুকুরীর বড় আনন্দ হইত। দিবারাত্রির প্রায় সমস্ত সময়টাই হাসি ও গানের কলোচ্ছ্বাসে মুকুরী তাহাদের বন্দীজীবনের অশেষবিধ যন্ত্রণা ভুলাইয়া রাখিত। ভাবিয়াছিল, এমনি করিয়াই কিছু দিন কাটিবে, কিন্তু একদা এক আসন্ন সন্ধ্যায় এই বন-বিহগীর সে মনের ভুল ভাঙিয়া গেল।

সেদিন ম্যানেজার সাহেবের বাংলোর পাশ দিয়া মুকুরী দোকানে সওদা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের মাঝে একজন হিন্দুস্থানী চাপরাশী তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—চল্ তুকে সাহেব ডাঁকেছে!

মুকুরী কোন কথা না বলিয়া চাপরাশীর পশ্চাৎ সাহেবের বাংলোর ভিতর প্রবেশ করিল। চাপরাশী তাহাকে একটা কক্ষের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল।

সাহেব মদ খাইয়া রক্তিম নয়নে একটা চেয়ারে

গায়ে হেলান দিয়া চুরুট টানিতেছিল। মুকুরী বলিল কি বল্‌ছি সাহেব?

সাহেব মুখে কোন কথা না বলিয়া মুকুরীর এক খানা হাত দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।

মুকুরী সবিস্ময়ে বলিল, ই কি, ছাড়্...হাতটা টানিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অসুরের মত বলশালী পশু-প্রকৃতি এই দানবের মুষ্টি শিথিল করিতে পারিল না।

সাহেব আর একটা হাত দিয়া মুকুরীকে জড়াইয়া ধরিতে গেল। মুকুরী আর স্থির থাকিতে পারিল না। আত্মরক্ষার নিমিত্ত সাহেবের বিরাট উদরের উপর সজোরে এক ঘুসি চালাতেই সাহেব যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল, My God!···

তাহাকে ছাড়িয়া সাহেব পেটে হাত দিয়া তৎক্ষণাৎ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

মুকুরী কাল বিলম্ব না করিয়া ছুটিয়া তাহাদের খাওড়ার দিকে চলিয়া গেল।·····

সোনা বাহিরে উঠানের ধারে দাঁড়াইয়াছিল, মুকুরী তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, চলে আয়,—চলে' আয় সোনা এখানে থাকিস্ না।

মুকুরীর হঠাৎ এরূপ ভাব দেখিয়া সোনা একটু বিস্মিত হইয়া কহিল,—কেনে মুকুরী, কেনে বল্।

আয়। বলিয়া মুকুরী অন্ধকার প্রান্তরের উপর ছুটিতে আরম্ভ করিল।

কুঠির সীমানা ছাড়িয়া বহুদূরে আসিয়া মুকুরী থামিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, সোনা, সাহেব আমাকে জোর করে' ধরেছিল। আর কোথাও পালাই চল্।···

সোনা বলিল, চল্ তবে। ওই যে খাদের আলো দেখ্‌তে পেছিস্ ওই কুঠিতে চল্। বলিয়া অনতিদূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

খাওড়ার নিকটে কে একজন কুলী দাঁড়াইয়াছিল, মুকুরী জিজ্ঞাসা করিল, ইখানকার সাহেব কেমন রেটে রে?

লোকটা বলিল, খুব ভাল সাহেব। কেনে?···

সোনা বলিল, তুদের সর্দ্দারের কাছে আমাদিকে নিয়ে চ দেখি,—আমরা এই খানে কাজ কর্‌ব।

আয়, বলিয়া, লোকটা তাহাদিগকে কিয়দ্দূর লইয়া গিয়া সর্দ্দারের খড়ো ঘরটা দেখাইয়া বলিল, ওই ঘরে যা।

সর্দ্দার জাতিতে সাঁওতাল। বলিল, বেশ। কাল থেকে কাজ করিস্ তুরা। আজ আমার ঘরেই থাক্। কাল তুদিকে একটে ঘর দিব।

সর্দ্দারের বাড়ীতে এই আগন্তুক অনাত্মীয়ের যন্ত্রের ত্রুটি হইল না।

আহারাদির পর মুকুরী বলিল, কিন্তুক্ সর্দ্দার, আমাদের দুজনার বিয়া দিয়ে যেতে হবেক্ তুথে।

সর্দ্দার সম্মতি জানাইয়া কহিল, হঁ দিব। করকে?···কত টাকা খরচ করতে পারবি?

সোনা বলিল, টাকা কোথা পাব আমরা?

সর্দ্দার ঈষৎ হাসিয়া কহিল, আমি যে বড় গরীব রে! বেশ, তুরা দু'টাকার মদ দিস্ আর আমি কিছু দিব। আট-আনা করে' রাখ্‌লেই চার দিনে দু'টাকা।···বুঝ্‌লি?

৪

সামান্য একটা কুলি রমণীর হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া জোড়জানকীর ম্যানেজার সাহেব একেবারে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিল।

তৎক্ষণাৎ মুকুরীর সন্ধান করিবার নিমিত্ত খাওড়ায় চাপরাশী পাঠানো হইল, কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে তাহারা খাওড়া ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে।

সাহেব পুরস্কার ঘোষণা করিল, যে তাহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকেই দশ টাকা বক্‌সিস্।

···চার পাঁচদিন পরে এক চাপরাশী আসিয়া সংবাদ দিল যে তাহারা তপসীর কুঠিতে কাজ করিতেছে, কিন্তু কোন প্রকারেই আসিতে চায়

না। বরং ভাল করিয়া তাহাদিগকে আসিতে বলিলে তাহারা উদ্ধতভাবে বলে যে সুযোগ মিলিলে ম্যানেজার সাহেবকে খুন করিতেও কসুর করিবে না।

সাহেব মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছিল, কহিল, আমি নিজেই যাব সেখানে। চল্ তোরা কে যাবি।

তপ্‌সীর কুঠি সেখান হইতে মাইল খানেকের পথ। সাহেব পায়ে হাঁটিয়াই বাহির হইল। ষণ্ড লইয়া একজন চাপ্‌রাশী সঙ্গে চলিল।

সেদিন মুকুরী ও সোনার বিবাহ-উৎসব! ধাওড়ার প্রায় সমস্ত কুলি-কামিন এই আনন্দে যোগ দিয়া নৃত্য-গীতে ও কলহাস্যে সে স্থানটা মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল।...সম্মুখে তাহাদের ম্যানেজার সাহেবের 'বাংলো' বাড়ী হইতে একটা বিলাতি কুকুরের অবিশ্রান্ত চীৎকার শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। এই উৎসব-গীতি-মুখর প্রান্তরের মধ্যে কুকুরের বর্কশ চীৎকার নিতান্ত বেসুরা শুনাইলেও উপায় নাই।

সাহেবের নিদ্রায় ব্যাঘাত হইতেছিল বলিয়া জনৈক খান্‌সামা আসিয়া সংবাদ দিল, ওরে সর্দ্দার, তোরা আজকার মতন গান থামা,—সাহেবের ঘুম হচ্ছে না।

মুকুরী বলিয়া উঠিল, বা রে? আমরা গায়েন্ করছি, তাও কর্‌তে দিবি নাই, আর সাহেবের কুকুরটা যে চেঁচাচ্ছে, তার বেলায়?

খান্‌সামা বলিল, সাহেবের কুকুর একশ'বার চেঁচাবে, তাই বলে' তোরাও চেঁচাবি নাকি?

—হুঁ, গায়েন্ কর্‌ব। তুই বল্‌গা তুর সাহেবকে। বলিয়া মুকুরী ঈষৎ হাসিয়া, খানসামার গায়ের উপর একটা পলাশ ফুলের গুচ্ছ ছুঁড়িয়া দিল।

পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ মুকুরীর পৃষ্ঠে সজোরে একটা চাবুক পড়িতেই সে ফিরিয়া দেখিল, জোড় জানকীর সেই দুরন্ত ম্যানেজার সাহেব আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

চাবুকের আঘাত খাইয়া মুকুরীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া কহিল,—সোনা, এই সেই সাহেব,—মার্ ইথাকে। বলিয়া সদর্পে একটা ঘুঁসি উচাইয়া মুকুরী সাহেবের দিকে অগ্রসর হইল।

ইতিমধ্যে সকলেরই দৃষ্টি সাহেবের উপর পড়িয়াছিল!

সোনা একটা লাঠির সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাইতেছিল। সাহেব হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া মুকুরীর উদ্যত হস্তের উপর আর এক ঘা চাবুক বসাইয়া দিল। মুকুরী এইবার প্রাণপণে অগ্রসর হইয়া সাহেবের বুকের উপর লক্ষ্য করিয়া এক ঘুসি তুলিল, কিন্তু সে আঘাত সাহেবের অঙ্গে বাজিবার পূর্ব্বেই, সাহেব পকেট হইতে গুলিভরা পিস্তলটা বাহির করিয়া মুকুরীর বুকের উপর ধরিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া মুকুরী মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সাহেবের কলকের কাহিনী আর কখনও প্রচারিত হইবে না জানিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

সোনা একটা লাঠি হাতে লইয়া সাহেবের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, সর্দ্দার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিষেধ করিল।

মুকুরী কিয়ৎক্ষণ হাত পা ছুড়িয়া ধূলার উপর ছট্‌ফট্ করিল, পরে রক্ত-রঞ্জিত দেহে উৎসব ক্ষেত্রের একপার্শ্বে নিস্তব্ধ হইয়া গেল! তাহার শিথিল কবরীমুক্ত রক্ত-পলাশের গুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠানটাকে "খুন্-আলুদা" করিয়া তুলিল।

...একে ত' এই বিবাহ-উৎসবের আনন্দ কলরব শুনিয়া ম্যানেজার সাহেবের ঘুম আসিতেছিল না, তাহার উপর অকস্মাৎ একটা গুলি ছোড়ার শব্দে চমকিত হইয়া সাহেব তাড়াতাড়ি বাংলোর বাহিরে আসিতেই দেখিল দ্রুতপদে জোড় জানকীর ম্যানেজার-সাহেব সেইদিকে আসিতেছে! পরস্পরের মধ্যে আলাপ আপ্যায়িত হইল, কথাবার্ত্তা

হইল, পরামর্শ হইল এবং আরও যে কত কি হইল তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী জানেন।

এই বন্দিনী বন-বিহঙ্গীর মৃত্যু-সংবাদ সুচতুর রিজু-টায়বাবু শুনিল কি না বলিতে পারি না। এই অভাগার শোচনীয় পরিণাম কাহিনী, বনানী-পরিবেষ্টিত গহিনদী পার হইয়া, শ্যামা বসুন্ধরার নিভৃত কোলের নিরীহ সাঁওতাল অধিবাসী বৃন্দের নিকট কোনদিন পৌঁছিতে পারিবে কিনা জানি না, তবে এই টুকু মাত্র বলিতে পারি যে, পরদিন প্রভাতে এ সম্বন্ধে কোথাও কোন আন্দোলন দেখা গেল না,—এখানকার কাক-পক্ষীর নিকটেও মুকুরী ও সোনার অকস্মাৎ অন্তর্ধানের ইতিহাস অগোচর রহিয়া গেল।

রেল-পথে

(ইংরাজী হইতে)

(শ্রীমোহিত লাল মজুমদারবি, এ)

চড়েছি রেলের গাড়ী, গাছ-পালা ঘর-বাড়ী
মোদের পিছনে সব দ্রুতবেগে ধায়!
মাঠের উপরে দেখি সারাটা আকাশ এ কি!—
সবগুলি তারা নিয়ে সাথে সাথে যায়!

আকাশের সব তারা—গতি পায় গতিহারা!
রূপালি কপোত যেন নিশীথের বনে!

নীরস ধরারে ছাড়ি' ঝাঁকে ঝাঁকে যেয় পাড়ি—
যেন সব চলিয়াছে আমাদেরি সনে!

তবে আর কি ভাবনা ওগো ইন্দুনিভাননা!
যতই ছুটুক গাড়ী, যতদূর হোক্—
মোদের পায়ের নীচে মর্ত্ত্য সরে' যায় পিছে,
হেরে তবু সাথে আছে ওই স্বর্গলোক!

নারী

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত)

(চুঁচোনিভ হইতে)

আমরা দুজনে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু কিন্তু এক অশুভ মুহূর্ত্তে এসে আমাদের বন্ধুত্বের ডোরকে হঠাৎ ছিন্ন করে দিয়ে চলে গেল!.....

তারপর দীর্ঘবৎসর চলে গেছে।...গ্রামে ফিরে এসে শুনলুম, সে অসংযতভাবে পীড়িত। আমাকে দেখতে চায়।.....

.....তা'র ঘরে ঢুকলুম। আবার চারিচক্ষের মিলন হ'ল।.....উঃ, রোগের আক্রমণে তার চেহারা এমন হ'য়ে গিয়েছিল যে চেনা যায় না। দুর্ব্বল জরাজীর্ণ দেহখানিকে নিয়ে সে তখন চুপ করে বসেছিল। আমাকে দেখে সে তা'র ক্ষীণ, দুর্ব্বল হাতখানা আমার দিকে নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিলে। আগ্রহভরে দু'হাতে তুলে নিলুম।...

অনেকক্ষণ তা'র পাশে বসে ছিলুম। হঠাৎ মনে হ'ল আর একজন কে যেন আমার হাত দুটোকে ধরে আছে! মনে হোল যেন আমাদের দু'জনের মাঝখানে আর একজন দীর্ঘ, স্থির, শ্বেতকায় নারী বসে আছে। তা'র আপাদমস্তক যেন একটা লম্বা পোষাকে মোড়া। তা'র গভীর চোখ দুটো ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, বন্ধ বিবর্ণ ঠোঁট দু'টো নীরব!...

বুঝলুম, এই নারীই আমাদের হাত দুটোকে যুক্ত করে রেখেছে!.....সে-ই আমাদের চির-মিলন করে দিয়েছে!

হাঁ,—সেই 'নারীই' বুঝি 'মৃত্যু'!.....

সেকালের কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ

আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।—বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যার খ্যাতি সেকালে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; এখনও তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা দেশবাসী বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সরল কথোপকথনশক্তির কথা অনেকেই অবগত নহেন। আমরা নিম্ন দুইটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সরস উক্তি।—(১) একদিন কলিকাতায় একজন বিখ্যাত ধনী কয়েকজন য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ইংরাজী মতে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণকর্ত্তা স্বয়ং ইংরাজী খানা খাইতেন না, সুতরাং আহারকালে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। একজন নিমন্ত্রিত সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন 'আহা, আহারের সময়ে আমাদের Host (নিমন্ত্রণকর্ত্তা) স্বয়ং অনুপস্থিত হইলেন!' কৃষ্ণমোহন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন "ইহাতে দুঃখের কারণ নাই, কারণ আমরা প্রত্যেকেই এক একটি Host অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে একাই একশ!"

(২) একবার স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে কৃষ্ণমোহন এক সভায় সভাপতিরূপে বক্তৃতা দিতেছিলেন। বক্তৃতার শেষভাগে অতিশয় ওজস্বিনী ভাষায় দেশবাসীর সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়া অবশেষে বলিয়া উঠিলেন 'যেখানে লোকেরা স্ত্রীজাতির মানসিক উন্নতি সাধনে এতদূর উদাসীন, সেখানে থাকিতে নাই, সেখান যত শীঘ্র পরিত্যাগ করা যায় তত্ই মঙ্গল—" এই বলিয়া লাঠিটী গ্রহণ করিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

(শ্রীনাথ ঘোষ)

হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার অগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র ও শ্রীনাথ সেকালে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন এবং স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাদিগকে 'সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কৈশোরে শ্রীনাথ ও গিরিশচন্দ্র 'বেঙ্গল রেকর্ডার' নামক একখানি ইংরাজী সম্বাদপত্র প্রকাশিত করিতেন। ছাপাখানা হইতে ফিরিবার সময় কসাইটোলায় মাতাল গোরাদিগের নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাঁহারা স্বয়ং মাতাল গোরাদিগের অনুকরণে এরূপ ইংরাজী কহিতে কহিতে আসিতেন যে, একবার একজন গোরা দূর হইতে তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাঁহারা কোন্ জাহাজে কর্ম্ম করেন। 'বেঙ্গল রেকর্ডারে' ইংরাজী প্রবন্ধাদি পড়িয়া কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজ এতদূর চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে শ্রীনাথের একটী চাকরী করিয়া দেন। শ্রীনাথ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইসচেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ ইংরাজীভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব করিতেন না। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলিতেছি।

নিরভিমান পাণ্ডিত্য।—একবার শ্রীনাথের কর্ম্মস্থলে একজন ইংরাজ কর্ম্মোপলক্ষে গমন করেন। শ্রীনাথ যে ইংরাজী জানিতে পারেন একথা সেই ইংরাজ অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহার সহিত ভাঙ্গা হিন্দীতে কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীনাথও যেন ইংরাজী জানেন না এইরূপ ভাণ করিয়া ভাঙ্গা হিন্দীতেই তাঁহার প্রশ্নের উত্তরাদি দিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শ্রীনাথের উচ্চতন ইংরাজ কর্ম্মচারী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং সেই ইংরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শ্রীনাথ ঠিক আমাদেরই মত বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা কহিতে পারেন, তাঁহার সহিত এরূপ কষ্ট করিয়া হিন্দীতে কথা কহিবার প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া তিনি শ্রীনাথের সহিত বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথোপকথন সুরু করিলেন। পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ বিস্মিত হইয়া শ্রীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেকালে উড়িষ্যা বিভাগে যে সকল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রেরিত হইতেন তাঁহাদিগকে উড়িষ্যা-ভাষা শিখিতে হইত। উড়িষ্যাভাষায় তৎপ্রদেশীয়

লোকের সহিত কিরূপ অনর্গল কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন তাহা একজন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সিবিলিয়ানের সম্মুখে পরীক্ষিত হইত। শ্রীনাথকে একজন নবীন ইংরাজ সিবিলিয়ানের সম্মুখে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। শ্রীনাথের উড়িষ্যাভাষার জ্ঞান সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ—প্রধানতঃ পাকা বেহারাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী সিবিলিয়ান পরীক্ষক মহাশয়ের নিকট পরীক্ষা দিতে তিনি একটুও সঙ্কুচিত হইলেন না। পরীক্ষক মহাশয় একজন উড়ে বেহারাকে ডাকাইয়া শ্রীনাথকে তাহার সহিত কথা কহিতে বলিলেন। শ্রীনাথ সেই বেহারাকে গালাগালি দিয়া দুই চারিটী কথা বলিলেন। ইহাতে সে ভয়ানক রাগিয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীনাথ মৃদু মৃদু হাসেন আর একটি করিয়া গালাগালি সূচক কথা বলেন। উড়িষ্যাবাসী উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সাহেব পরীক্ষক মনে করিলেন শ্রীনাথ বেশ উড়িয়া ভাষা জানেন, তাহা না হইলে এতক্ষণ উড়িয়া বেহারার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া শ্রীনাথকে উড়িষ্যাভাষাজ্ঞানের প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিলেন। শ্রীনাথ বালেশ্বরে বহুদিন ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং উড়িষ্যাভাষার জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

টিক্‌টিকির বিবাহে

(নক্সা)

(শ্রীঅমরেন্দ্র মিত্র)

সে আজ অনেকদিনের কথা। তখন আমাদের গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। প্রত্যহ ৯টার পূর্ব্বে আহারাদি সারিয়া ষ্টেসনে যাইয়া ট্রেণ ধরিতে হইত এবং আমাদের ষ্টেসনের ২.৩টা ষ্টেসনের পর জেলার সদর ষ্টেসনে নামিয়া সেইখানের বিদ্যালয়ে আমাদের ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের বালকেরা পড়িতে আসিত। নিকটে আর কোন ভাল উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। প্রত্যহ যে সময়ে ষ্টেসনে যাই, সেইদিনও ঠিক সেই সময় ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অন্যদিন ষ্টেসনে আমাদের সমপাঠীরা বা সদর বিচারালয়ে যাইবার যাহাদের প্রয়োজন, তাহারা ব্যতীত বড় একটা কেহ আসিত না। কিন্তু সেদিন চেনা ও অচেনা বহু লোকের সমাগম দেখিলাম। ট্রেণ আসিতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সেদিন কোন এক 'সিদ্ধবাবা' গুরু আখ্যাধারী মহাপুরুষের আসিবার কথা, তাঁহারই সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এই জনতার সমাবেশ।

আমাদের ট্রেণ আসিবার কিছু পূর্ব্বে অপর দিকের ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাতেই সিদ্ধবাবা পুরুষ আসিলেন। ট্রেণ দাঁড়াইবামাত্র সকলেই মধ্যম শ্রেণীর কামরার দিকে ছুটিল। আমিও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেইখানে গিয়া

দেখিলাম মহাপুরুষ মধ্যম শ্রেণীর দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখে মৃদুমৃদু হাসি ক্ষণিক প্রকাশ পাইতেছে এবং ক্ষণিক মিলাইয়া যাইতেছে। তাঁহার শিষ্য বা ভক্তেরা সকলে সেই দরজার সামনে সটান শুইয়া পড়িয়া অভিনন্দন করিতেছে। একটু পরে একজন অগ্রসর হইয়া গুরুদেবের গলায় একগাছি ফুলের মালা দোলাইয়া দিলেন এবং পরক্ষণেই গুরুদেব গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। গুরুদেবের গায়ের বর্ণ পোড়া মাটীর মত, বয়স আন্দাজ চল্লিশ, গায়ে গেরুয়া রংএর হাফকাটা সিল্কের পাঞ্জাবী ও গেরুয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র। চেহারায় বা পরিচ্ছদে বিশেষ কোন বিশেষত্ব দেখা গেল না। বেজায় ভীড় বলিয়া গুরুদেব অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। সকলেই মনোরঞ্জনে তটস্থ।

আমাদের ট্রেণের প্রায় সময় হইয়াছে বলিয়া অপর পারে যাইতেছিলাম, এমন সময় আমাদের একজন সমপাঠী আসিয়া খবর দিল যে হঠাৎ কি কারণে (এরূপ হঠাৎ কারণ মধ্যে মধ্যে হয় বলিয়া আমাদের গা সওয়া হইয়া গিয়াছিল) আগের ষ্টেসনে ইঞ্জিন খারাপ হইয়া গিয়াছে এবং ঘণ্টাদুয়ের আগে আর গাড়ী যাইবার কোন আশা নাই। অগত্যা সেইদিনকার মত বিদ্যালয়ে যাইবার আসায় জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় গুরুদেব দর্শনে যাইলাম। ভক্তবেষ্টিত গুরুদেব তখন সবেমাত্র ষ্টেসন হইতে বহির্গত হইয়া নিকটেই একটী গ্রামে কোন শিষ্যের বাড়ী পদব্রজেই যাইতেছেন এবং পশ্চাদ্গামী লোকেরা গুরুদেব যে স্থানের উপর দিয়া যাইতেছেন, তথাকার মাটী লইয়া কেহ বা মস্তক বা জিহ্বাতে স্পর্শ করিতেছেন এবং কেহ বা আনন্দাতিশয়ে নাসিকার উপর তিলক কাটিতেছেন। আমরাও গুরুদেবকে অনুসরণ করিয়া সেই গ্রামে উপস্থিত হইলাম।

গুরুদেব গৃহে পৌঁছিয়া অন্দরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বাহিরে আসিয়া দেখা দিলেন এবং একখানি কাল বিড়ালের চামড়ার আসন পাতিয়া তাহাতে বসিলেন। তখন তাঁহার একজন সেবক —যোড়হাতে গুরুদেবের নিকট কোনও বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং গুরুদেব সেবককে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে নিষেধ করিলেন। সেবক কিন্তু নাছোড়বান্দা। গুরুদেবও দেখিলাম তাহাতে কম যান না। সেবক যতই আগ্রহ প্রকাশ করে, গুরুদেবও তাহাতে ততোধিক বিরত হইতে বলেন। তখন স্থানীয় আরও দুই চারিজন সেবকের সঙ্গে যোগদান করিলেন। কাজে কাজেই গুরুদেব যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু অসন্তোষেরই সহিত মত দিলেন।

তখন সেই শিষ্য যাহা বলিলেন, তাহা হইতে বুঝা গেল যে গুরুদেব মাত্র ট্রেণ ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন। কোনও একটা পর্ব্ব উপলক্ষে সেদিন গাড়ীতে বেশী ভিড় হইয়াছিল। প্রায় গাড়ীতেই জায়গা ছিল না। কিন্তু একটী কামরা একেবারেই খালি। সেটা সাহেবদের জন্য। অন্যস্থানে সুবিধামত জায়গা না পাওয়ায় গুরুদেব সশিষ্য সেইখানেই উঠিলেন। অদূরে একজন দেশীয় টিকিট পরিদর্শক দাঁড়াইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া গুরুদেবকে ঐ গাড়ীতে (উহা শুধু সাহেবদের জন্য বলিয়া) উঠিতে বারণ করে। গুরুদেব তাহাকে কর্কশ বাক্যে কিছু বলিলে সে সাহেব ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিতে যায়। এমন সময় একজন গুরুদেব অপেক্ষাও ঢের বেশী নিকৃষ্ট কাল বর্ণের (এবং বোধ হয় জাত হিসাবে আরও অধম) মেম সাহেব আসিয়া গুরুদেবকে ঐ গাড়ী হইতে নামিতে বলে এবং সেই সময়েই সেই দেশীয় টিকিট পরিদর্শক ও সাহেব ষ্টেশন মাষ্টারকে লইয়া সেখানে আসিয়া পড়ে। সাহেব গুরুদেবকে নামিতে বলিলে গুরুদেব

উত্তর দেন যে তাঁহাকে নামিতে বলা সাহেবের পক্ষে বিশেষ অন্যায়। কারণ এরূপ করিলে সাহেবের দেশীয় ধর্ম্মের উপর হাত দেওয়া হয়। মহামান্য সরকার বাহাদুরও ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন, এরূপ স্থলে সাহেব যে কোন সাহসে এইরূপ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা সেই ভগবানই জানেন। গুরুদেব ফিরিয়া আসিয়া এ বিষয়ে সাহেবের উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে জানাইবেন বলিয়া ভয়প্রদর্শনও করেন। কিন্তু সাহেব তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন যে গাড়ী ছাড়িবার আর বেশী বিলম্ব নাই, অতএব গুরুদেব আপনা হইতে না নামিলে তিনি পুলিশ ডাকিয়া গুরুদেবকে নামাইয়া দিবেন। তখন গুরুদেব সাহেবের সহিত বচসা না করিয়া তাঁহার উপর এক চাল চালিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে ছোট হাত-ব্যাগ ছিল, তাহা খুলিয়া একটা পুরাণ ছেঁড়া ও ময়লা মেয়েদের (যাহা উত্তর পশ্চিমে চলে) পায়জামা বাহির করিয়া কাপড়ের উপরেই টানিয়া টানিয়া পরিতে লাগিলেন। পায়জামাটা কিছু ছোট ছিল। টানাটানিতে প্রায় আধ কোমর অবধি যখন উঠিয়াছে, তখন সাহেব গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি করিতেছ?" গুরুদেব গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন "I am trying to become European." (আমি সাহেব হইবার চেষ্টা করিতেছি)। উত্তর শুনিয়া সাহেব হাসিয়া খানিকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, তার পর মেম সাহেবকে বলিলেন, যে গুরুদেব যখন সাহেবী পোষাক পরিয়াছেন তখন তাঁহাকে আর নামাইয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। কারণ কলিকাতার ঘোড়-দৌড়ের মাঠেও অনেকে ওরূপ পোষাকে সজ্জিত বাঙ্গালী এবং বিশেষ করিয়া মাড়োয়ারীরাও আসে এবং ঢুকিতে পায়। অতএব মেম সাহেবকে অন্য স্থান খুঁজিয়া লইতে বলিয়া ষ্টেশনের সাহেব চলিয়া গেলেন। গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

উপস্থিত সকলে এই কথা শুনিয়া একবাক্যে গুরুদেবের বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং এই বলিয়া সমস্বরে পরিতাপ করিতে লাগিল, "হায়রে, দেশের সকল লোক যদি গুরুদেবের মত সংসাহসী হইত, তাহা হইলে সাহেবদের এ দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া অত্যন্ত সহজ হইত। তাহার মধ্যে একজন নাপিত শিষ্য বলিয়া উঠিল যে সাহেব যখন গুরুদেবকে পুলিশ ডাকিয়া নামাইয়া দিবার প্রস্তাব করে তখন তাহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে সাহেবকে বেশ করিয়া কুকথা শুনাইয়া দেয় এবং জানাইয়া দেয় যে গুরুদেবের জন্মদাতা পুলিশই ছিলেন। কিন্তু গুরুদেব নিজে উপস্থিত থাকায় তাহা আর হইয়া উঠিল না। পরে শুনিলাম যে গুরুদেবের পিতাঠাকুর নাকি পুলিশের জমাদার শ্রেণীর জীব ছিলেন এবং ঘোর মদ্যপানে শেষে কোনও ইতর রমণী পল্লীতে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে পরলোক যাত্রা করেন। কাজে-কাজেই গুরুদেব (বোধ হয় reactionএর ফলে) পুলিশের উপর ভয়ানক চটা এবং তাঁহার পিতাও যে পুলিশ ছিলেন তাহাও সময়ে সময়ে স্বীকার বিশেষে সুবিধা পাইলেই পরোক্ষভাবে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কোথাও বা সফল হন এবং যেখানে ধরা পড়েন তথায় ঠাট্টা করিতেছিলেন বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি এই প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য অন্য কথার অবতারণা করিতেন। শুনা যায় যে গুরুদেব স্বয়ং নাকি পূর্ব্বে কোন অফিসের গুদামে বা ঐরূপ কোন একটা দোকানে সামান্য বেতনে কার্য্য করিতেন, এবং তথা হইতে কিছু মোটা রকমের টাকা আত্মসাৎপূর্ব্বক কিছুদিন গা ঢাকা দেন। পরে হঠাৎ গুরুদেবরূপে আবির্ভূত হয় এবং অদ্যাবধিও সেই গুরুগিরি চলিতেছে। অবশ্য এই দুটা কথা গুরুদেবের শত্রুপক্ষের রটান। কাজেকাজেই ইহার সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি।

সেইদিন সেইখানে আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া গুরুদেবের আরও দু চারিটা কীর্ত্তিকলাপ বা গুহ্য-কথা শুনিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

গুরুদেবের নামের নাকি কিছু বিশেষত্ব ছিল। তাঁহাকে হঠাৎ চেনা যাইত না বলিয়া কেহ 'বর্ণ ঢোরা আম', কেহ বা 'বর্ণ শঙ্কর' ইত্যাদি নাম দিয়াছিল। আবার কেহ কেহ (গুরুদেব কিছু মোটা রকমের টাকা লইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া) 'মোটা' বলিয়া ডাকিত। ঠিক নাম (বোধ হয় এখনও সেই নামে ওয়ারেণ্ট আছে বলিয়া) এখনও জানা যায় নাই। এমন কি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যেরাও জানে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তাহার পর দুই তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন হঠাৎ কোন বন্ধুর সেই গুরুদেব সম্বন্ধে বলিলেন যে লোক পরম্পরায় শুনা যাইতেছে যে সেই গুরুদেব কিছুদিন হইতে সিদ্ধাক্ হইয়াছেন। এবং তিনি যাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন তাহাই সঙ্গে সঙ্গে ফলিতেছে। এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে আবার দেখিবার ইচ্ছা হইল এবং একদিন আমি ও আমার এক বন্ধু গুরুদেবকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। গুরুদেব তাঁহার পূজার ঘরের মধ্য স্থলে একখানি মৃগ চর্ম্মের আসনে বসিয়াছেন। তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী হইতে প্রকাশ যে, ওই চর্ম্মে বসিয়া তিনি অভীষ্ট দেবতাকে ধ্যানমগ্ন হইয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাহার পর হইতেই সিদ্ধাক্ হইয়াছেন।

আমরা যাইয়া প্রণামাদি করিবার পর তিনি আমাদের কুশল প্রশ্ন করিলেন। আমার প্রণামটা করিতে তত ইচ্ছা ছিল না, কারণ পূর্ব্বে যেন এক বার শুনিয়াছিলাম যে তিনি চাঁড়াল বা ডোমরই একটা কাহাকাছি জাতীয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কৃপায় তাঁহার জাতের পরিচয়টা বা খবরটা রাখা আর কেহ প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতেও কেহ পিছাইয়া যায় না। অতএব আমার নব্য বন্ধুর মতে তাঁহাকে সম্মান না দেখান ভদ্রতার বহির্ভূত হইলেও হইতে পারে বলিয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আমিও বন্ধু সহ যথারীতি অভিবাদন করিয়াছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে তিনি ঈষৎ হাস্যের সহিত জানাইলেন যে আজ তাঁহার ঘরের টিকটিকির বিবাহ হইবে। তাঁহার ঘরে একটী টিকটিকি ছিল এবং সেটা একেলা দেয়ালের গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার জোড়া ছিল না। সে প্রায়ই টিক্‌টিক্ করিত এবং সুবিধা পাইলেই পোকা মাকড় ধরিয়া খাইত। কখনও গুরুদেবের পূজার উপকরণের উপর কেহ কাছে না থাকিলে যতটুকু সম্ভব ভাগ বসাইত। কিন্তু গুরুদেব তাহাতে বিরক্ত হইতেন না। বরঞ্চ মাঝে মাঝে এক আধ কুচা ফল দূরে টিকটিকির উদ্দেশে ফেলিয়া দিতেন এবং তাহাতে নামিয়া খাইতে দেখিলে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। গুরুদেবের এইরূপ সর্ব্বজীবে সমদয়া দেখিয়া শিষ্যবর্গ মোহিত হইতেন। সঙ্গিনীহীন টিকটিকিটার জন্য গুরুদেব নাকি প্রায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেন। এবং প্রায় প্রত্যহই শিষ্যদের সমুখে আঁক কাটিয়া গণিয়া বলিতেন, না, আজও টিকটিকিটার বিবাহের কোন সম্ভাবনা নাই। আবার দুই একদিন বলিয়া বসিতেন আজ টিকটিকিটার ঠিক বিবাহ হইবে কিন্তু খানিকক্ষণ এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সোৎসুক শিষ্যগণকে বলিতেন, হইল না, হইল না আজ আর বিবাহ হইল না।

আজ আমরা যাইবার পর, তিনি হঠাৎ খাম-খেয়ালী ভাবে বলিয়া বসিলেন, আজ ঐ বিবাহ হইবেই। অমনই তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। গুরুদেবের অভিপ্রায়ানুসারে

কেহ থাবার কেহ বা ফুল ইত্যাদির জোগাড়ে ব্যস্ত হইলেন। গুরুদেবের টিকটিকির আজ বিবাহ এবং গুরুদেব সিদ্ধবাক হইয়া সেই কথা আজ সকলকে জানাইয়া চমৎকৃত করিয়াছেন। স্বয়ং গুরুদেব পৌরহিত্য করিবেন। আর যায় কোথা! গুরুদেব নিজে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আপনার খোল ও বৃহদায়তন তম্বুটীকে চন্দন চর্চ্চিত করিলেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সবেগে চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিবাহের প্রায় সকল অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হইয়া আসিল, কিন্তু পাত্রীর এখনও কোন উদ্দেশ নাই। সকলেই যেন পাত্রী অভাবে ভাবিত হইয়াছে, শুধু সিদ্ধবাক্যীর আশ্বাসে একেবারে নিরাশ হয় নাই। বেলা ২টার মধ্যে বিবাহ হইবার কথা। ২টা বাজিতে সামান্য বাকী আছে। এমন সময় দূরে দেখা গেল যে একজন লোক কতকগুলি মাছুর মাথায় লইয়া সামনের রাস্তা দিয়া যাইতেছে। একজন মাদুর বিক্রেতাকে ডাকিবার প্রস্তাব করিল, আর একজন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মাদুরওয়ালাকে ডাকিয়া আনিল। মাদুরওয়ালা আসিয়া যেমন মাদুরের বস্তাটী নামাইয়াছে, অমনি গুরুদেবের টিকটিকিটা শব্দ করিল। সেই মুহূর্ত্তে মাদুরের বস্তার মধ্য হইতে অপর একটা টিকটিকি লাফাইয়া পড়িল এবং এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেই গুরুদেবের টিকটিকি পুনরায় শব্দ করিল। তখন মাদুরওয়ালার টিকটিকি দৌড়িয়া যাইয়া গুরুদেবের টিকটিকির সঙ্গে মিশিল এবং দুজনে একসঙ্গে গুরুদেবের টিকটিকির বাসার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। গুরুদেব তখনই শাঁক বাজাইলেন এবং স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি করিলেন। শিষ্যের দল মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল 'জয় সিদ্ধ বাকুজীর জয়' ধ্বনিতে সমস্ত গ্রাম সচকিত হইয়া উঠিল। আর আমরা খানিকক্ষণ বোকার মত নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া চরম বুজরুকির স্মৃতি লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

শকাব্দ

(শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ বি এ)

প্রচলিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শকাব্দের প্রচলন হয়। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক এ মতটা ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

আমরা উভয় পক্ষের মতবাদগুলি আলোচনা করিয়া সত্যে উপনীত হইবার একটু চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে কাটিহার ও উজ্জয়িনী প্রদেশের শক নৃপতিবর্গ এই যুগের সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৯১০ সালের "রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিজ্ জর্ণেল্" নামক পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় ডাক্তার ফ্লীট্ বলেন যে সুবিখ্যাত শকরাজ নহপণই এই যুগ প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ৭৮ খ্রীঃ অঃ হইতে ১২৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ৪৭ বৎসর রাজত্ব করেন। অপর পক্ষে প্রাচ্য দেশীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন, দাক্ষিণাত্যের শত বাহন নৃপতিগণ শক নামক প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশীয় জাতিকে

পরাজিত করিয়া "শালিবাহন শক" নামক এই যুগের প্রচলন করেন। ভারতের বহু স্থানে আজিও এই মত প্রচলিত। সম্প্রতি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ রাজবাদী তাঁহার "ধন্যেশ্বরী" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শকু নামক নৃপতি এই যুগের প্রবর্ত্তক। শক কথাটি বিদেশী নহে, মহারাষ্ট্রীয় 'শক' হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনেক মনীষী অনুমান করেন, এবং এই 'শকু'র নামও নাসিকের গুহায় খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বাগ্রে অধ্যাপক রাজবাদীর নূতন মতটি আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে শক জাতিকে পরাজিত করিয়া এই যুগের নাম 'শকাব্দ' হইল কেন? ইহার উত্তরে উপরি-উক্ত অধ্যাপক মহাশয় বলেন, শতবাহন নৃপতিবর্গের মধ্যে শকু নামক এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহারই নামে এই যুগের নাম শকাব্দ হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক রাজবাদী, এই নৃপতির রাজ্যকাল অথবা নাসিকা গুহায় খোদিত লিপির কোনও উল্লেখ করেন নাই; অথবা পুরাণাদিতেও যে শকুর কোনও উল্লেখ আছে তাহাও আমাদিগকে বলেন নাই। শতবাহন নৃপতিবর্গের নামাবলী অনুসন্ধান করিলে আমরা শকসেন নামক জনৈক নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাই। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ভিন্‌সেন্ট স্মিথ্ তাঁহার Early History of India নামক গ্রন্থে বায়ু ও মৎস্য পুরাণোক্ত অন্ধ্র শতবাহন নৃপতিবর্গের নাম ও রাজত্বকালের তালিকা দিয়াছেন। এই তালিকায় আমরা দ্বাবিংশ নৃপতি "শিবস্কুর মধরীপুত্র শকসেনের" নাম দেখিতে পাই। তিনি ৮৫ খৃঃ অঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা দুই এক বৎসরের অধিক রাজত্ব করেন নাই। কিন্তু এই নৃপতি ২৮ বৎসরকাল রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বিনিবায়কুর এবং পৌত্র দ্বিতীয় পুলুমায়ী দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি ছিলেন। এই শকসেনের নাম যদি নাসিকা গুহায় লিখিত থাকে তাহা হইলে তাঁহার নামেই যে যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অনুমান করিতে পারা যায় অথবা এরূপও হইতে পারে যে শকসেন কিছুকাল পূর্ব্বেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কেন না, স্মিথের তালিকায় রাজাদের রাজ্যকালের অধিকাংশ স্থলই অনুমানিক। যাহা হউক, অধ্যাপক রাজবাদীর একটা কথা আমরা খুব সমীচীন বলিয়া মনে করি। তিনি বলিয়াছেন যে যদি এই যুগ আর্য্য হিন্দু নৃপতি কর্ত্তৃক প্রচলিত না হইত তাহা হইলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতিতে ইহা কখনই ব্যবহৃত হইত না।

কিন্তু অধ্যাপক রাজবাদীর মতের বিরুদ্ধে আমরা কতকগুলি কারণ দেখিতে পাই, যাহার জন্য তাঁহার মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। প্রথমতঃ সংস্কৃত গ্রন্থে এবং বিবিধ প্রস্তর লিপিতে আমরা শকবংশীয় নৃপতিবর্গের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু শক নামক কোনও রাজার নাম অনুসন্ধান করিয়া আমরা পাই না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মালব ও শকবংশীয় নৃপতিগণের যুগের উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ দুই বংশের যুগ প্রতিষ্ঠাতা নৃপতির কোনও নাম আজ পর্য্যন্তও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। শক বংশের নৃপতিগণ এই যুগ মানিয়া চলিতেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তক যে কে তাহা নির্ণয় করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। বহু, বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৮০।১০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের কোনরূপ মীমাংসার চেষ্টাও হয় নাই। আমাদের মনে হয় যে কোনও শকসেন নামক নৃপতিকর্ত্তৃক এই যুগের সৃষ্টি হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, দাক্ষিণাত্যের শতবাহন নৃপতিগণ এই যুগের নাম তাঁহাদের কোনও মুদ্রায় ব্যবহার করেন নাই। যদি মধরীপুত্র শকসেন এই যুগ প্রতিষ্ঠা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার বংশধরগণ নিশ্চয়ই

এই যুগ তাঁহাদের মুদ্রালিপিতে ব্যবহার করিতেন। আবার, শকসেন কর্ত্তৃক শকদিগের পরাজয়ের কথাও আমরা কোনও শতবাহন লিপিতে দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় বিলিয়াকুর গৌতমীপুত্র কর্ত্তৃক শকরাজ নহপণের পরাজয় কথা নাসিকের গুহায় আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। অপর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গৌতমীপুত্রের মাতা বলশ্রী পুত্রের জয়লাভের প্রশংসা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার স্বামীকে (যাঁহাকে অধ্যাপক মহাশয় যুগ প্রবর্ত্তক বলিতেছেন) শকারি বা যুগ প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কোনও উল্লেখ করেন নাই। এই দুইটি কারণে আমাদের মনে হয় যে এই যুগ শকসেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

এক্ষনে অধ্যাপক মহাশয়ের মত পরিত্যাগ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামত দেখা যাউক। তাঁহারা বলেন যে শকরাজ্যবর্গ কাটিয়ার ও উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন এবং ইঁহারাই এই যুগের প্রচলন করেন। এই সমুদয় নৃপতিগণ তাঁহাদের মুদ্রায় শকাব্দ ব্যবহার করিতেন এবং মুদ্রাগুলিও বহু পুরাতন। প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শকাব্দ শকরাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ও মুদ্রাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমাদের মনে হয় ৭৮ খৃষ্টাব্দে অথবা ঐ সময়ের দুই এক বৎসর পূর্ব্বেই শকাব্দের উৎপত্তি হয়।

কিন্তু কাহার দ্বারা এবং কি ঘটনা উপলক্ষে এই যুগের প্রচলন হইয়াছিল সে সম্বন্ধে এখনও সমীচীন সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতে পারি নাই, পূর্ব্বেই আমরা ডাক্তার ফ্লীটের কথা বলিয়াছি। তিনি বলেন যে, নহপন নামক নৃপতি কর্ত্তৃক এই নব যুগ প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু, কোথা হইতে ইহা অবগত হইলেন, তাহার কোনও উল্লেখ তিনি করেন নাই। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন যে নহপন দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কখনই এই যুগ প্রচলন করিতে পারেন না। নহপনের পরবর্ত্তী নৃপতি শঙ্কন ও কনরন দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রাজত্ব করেন। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের মধ্যে কেহ জীবিত ছিলেন না। হইতে পারে যে শকগণ উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের বংশধরগণের উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ শতকে মালবের যশোধর্ম্মণের এবং সপ্তম শতকে শ্রীহর্ষের রাজ্য এবং মৌর্য্য ও গুপ্ত বংশব্য অধিকদিন স্থায়ী ছিল না। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে যে শক্তির বীজ ৫৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা কালে বৃক্ষরূপে জন্মিয়া ৭৮ খৃঃ অব্দে সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়। শকগণ সম্ভবতঃ এই বংশের দুর্ব্বল শেষ নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়া নব যুগ প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু যাহা হউক, ইহাও আমাদের ধারণা মাত্র। বিষয়টি যে গভীর রহস্যজালে আচ্ছন্ন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পরিশেষে আমরা আর একটি মতের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই মতটি নূতন নহে। শকাব্দ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই বিক্রমাদিত্য ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি শকগণকে বিতাড়িত করিয়া শকাব্দের প্রচলন করেন। কিন্তু যদিও এই মতটিকে সাধারণ লোকে আজিও বিশ্বাস করে, তথাপি ইহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে শকাব্দের কথা আছে। "শকনৃপকাল" এবং "বর্ত্ত নৃপান্তকাল" এই দুইটি কথার উল্লেখ জ্যোতিষ শাস্ত্রে স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন এই জ্যোতিষশাস্ত্র কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে? ডাক্তার ফ্লীট ইহার উত্তরে বলেন যে ৪০০ খৃঃ অব্দে হিন্দুরা গ্রীকদের জ্যোতিষ শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করেন। ডাক্তার ফ্লীটের কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, ইহাতে কতকটা যে সত্য নিহিত আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দুজ্যোতিষের বহু অংশ গ্রীকদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু ৪০০ খৃঃ অব্দে হিন্দু ও গ্রীকের সংস্পর্শ প্রথম সংঘটিত হয় নাই। মাসিডনাধিপতি বীর সেকেন্দরের সময় হইতে (২০০-১০০ খৃঃ খৃষ্টাব্দে) ভারত ও গ্রীস তাহাদের পরস্পর সভ্যতা আদান প্রদান করিতেছে। সুতরাং ৪০০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুজ্যোতিষ যে রচিত হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। হিন্দুজ্যোতিষ তাহার বহু পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। আবার

শকনৃপতিগণ বিদেশী হইলেও অশিক্ষিত ছিলেন না। কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত, কলা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল এবং গ্রীকদের নিকট হইতেও তাঁহারা যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আমরা আরও শুনিতে পাই যে, তাঁহাদের অনেকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। হিন্দু জ্যোতির্ব্বেত্তাও সময়কে সত্য ত্রেতাদি চারিযুগ এবং কলিযুগকে শকাব্দ অব্দতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

"রোগশয্যার প্রলাপ" ও ব্যোমকেশ মুস্তফী

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র)

'রোগশয্যায় প্রলাপ'—শ্রীরোগাতুর শর্ম্মা ওরফে ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রণীত। শ্রীনলিনী রঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। মূল্য ১৲ টাকা পত্রাঙ্ক ১০৬)

পুস্তকখানিতে ১৬টী রচনা আছে। পূর্ব্বে 'মানসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি পাঠ করিয়া তখন রসও জানিতে পাইয়া বাঙ্গালী পাঠক ধন্য হইয়াছিল। রচয়িতা যে কে তখন অনেকে জানিতেন না; লেখক মহাশয়ের বন্ধু বান্ধবেরা তাহা জানিতেন। আজ সে গোপন কাহিনী ব্যক্ত করিয়া নলিনী রঞ্জন ভায়া বাঙ্গালী পাঠকের ঔৎসুক্য নিবারণ করিয়াছেন এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই রচনা গুলি মুস্তফী মহাশয়ের শেষ রচনা।

সম্পাদক ভায়া তাঁহার নিবেদনে লিখিয়াছেন, —"তাঁহার শীর্ণ হস্তের ক্ষীণ-লেখনী-প্রসূত এই রচনা, প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রিয় দেশবাসী সাদরে ও সানন্দে গ্রহণ করিবেন।" রচনাগুলি মরণপথযাত্রীর শীর্ণ হস্তের লেখা সত্য; কিন্তু এগুলি ক্ষীণ-লেখনী-প্রসূত নয়। ভাবের সৌষ্ঠাপর্য্য নষ্ট কোথাও হয় নাই। চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা এ প্রলাপের ছত্রে ছত্রে বিরাজ করিতেছে। ভাবের দুর্ব্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা বা জড়তার চিহ্ন কোথাও নাই। মৃত্যুর করালছায়া তাঁহার শরীরের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার মনের উপর কিছুমাত্র অবিদিতা বিস্তার করিতে পারে নাই। এগুলিকে লেখক মহাশয় 'প্রলাপ' আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু এগুলি জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে চিন্তার আহার জোগাইবে—চিন্তার ধারাকে প্রকৃত পথে নিয়ন্ত্রিত করিবে। ভাষার সহজ সরল গতি সুন্দর।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল—আমি এ পুস্তকের সমালোচনা করিতে বসি নাই—সে শক্তি আমার নাই। আমার জীবনের আদর্শ—বাল্যের দাদা, কৈশোরের ও যৌবনের বন্ধু, প্রৌঢ়ের পরামর্শদাতা, আদর্শ কর্ম্মবীর—ত্যাগী পুতপরিত্র দেবচরিত্র সদা হাস্যময় সেই মনীষীর লেখার সমালোচনা করিবার আমি উপযুক্ত পাত্র নই। জীবনে তাঁহার নিকট হইতে যে সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছি, তাহা

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী

দু একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর নিকট ছাড়া বড় পাই নাই। স্নিগ্ধদী দাদাকে আমার শোকে ও কোন দিন মুহ্যমান হইতে দেখি নাই, আবার আনন্দে আত্মহারা হইতেও দেখি নাই। দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া যিনি জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন—সুখ দুঃখকে সমভাবে যিনি ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, সেই মহাপ্রাণ সাহিত্য রসরসিকের সম্বন্ধে যে সকল সত্যকথা নলিনী ভায়া বলিয়াছেন, তাহার একটী বর্ণও অতিরঞ্জিত নয়—বাস্তবিকই "খুব যেন বদ্ধ হইয়া আপনার সুগন্ধ বিস্তারে অপর সকলের চিত্তকে মোহিত করে, ব্যোমকেশও তেমনি সাহিত্য যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, সাহিত্যের সেবায় ও কল্যাণ কামনায় নিজের শরীরের শেষ রক্ত বিন্দুটী পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এ দানের ঋণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বা বাঙ্গালার সাহিত্যিক-সমাজ কোন দিন পরিশোধ করিতে পারিবে না।"

কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন ব্যোমকেশ বাবু বাঙ্গালার স্থায়ী সাহিত্যে কি দিয়া গিয়াছেন, তাহার উত্তরে যে আমি কি বলিব, তাহা এখন ভাবিয়াই ত পাইতেছি না। সাহিত্য-পরিষদ প্রচারিত—"গঙ্গা ভক্তিতরঙ্গিণী" ও "দুর্গা-মঙ্গল" সম্পাদন ও ছোট গল্পের পুস্তক "ললাট-লিখন" ভিন্ন তাঁহার নিজ নামে প্রকাশিত পুস্তক ত বড় মনে পড়িতেছি না। প্রথম দুই পুস্তক সম্পাদনে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, প্রাচীন গৌড়ীয় সাহিত্যের সহিত তিনি কতটা যে সুপরিচিত ছিলেন তাহার যে নিদর্শন দিয়াছেন, তাহা অনন্য-সাধারণ। তিনি স্বনামে বড় কিছু রাখিয়া যান নাই। পরিষৎ পত্রিকায় ও অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু 'বেনামা' প্রবন্ধের তালিকা ও পুস্তক যদি সাধারণে প্রকাশ করা কোন দিন সম্ভবপর হয় তখন মুক্ত কণ্ঠে বাঙ্গালীকে স্বীকার করিতে হইবে বঙ্গবাণীর মন্দিরে তাঁহার দান বড় অল্প নয়।

আলোচ্য পুস্তক সম্বন্ধে দু এক কথা বলিবার পূর্ব্বে, আর একটা কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলিব, সাহিত্য-সেবীর সেবায় উৎসৃষ্ট প্রাণ ব্যোমকেশ যেখানেই কোন সাহিত্যিকের সন্ধান পাইয়াছেন, সেইখানেই গিয়া তিনি তাহার ন্যায্য প্রাপ্যের অধিক দান করিয়া, সাধারণের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। সাহিত্যিকের গুণের কীর্ত্তন করিতে কোন দিন কেহ তাঁহাকে বিরত দেখে নাই।

সরস করিয়া বলিবার ক্ষমতা ব্যোমকেশের খুব ছিল। লেখাগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার রস-জ্ঞানের পরিচয় সকলেই পাইবেন। প্রথম প্রলাপে রোগের কথা আছে—তারপর পনেরটী প্রলাপের কয়েকটীতে সামাজিক সমস্যার সমাধান আছে—

শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, ব্যবহারিক শিক্ষার কার্য্যকারিতা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। জাতিতত্ত্ব ঐতিহাসিক আলোচনাও এ প্রলাপে বাদ পড়ে নাই। প্রলাপগুলির সূচী এই :—২। বৈদ্যরা কে? ৩। বাঙ্গালীর এত অজীর্ণ, অম্ল, প্রস্রাবের পীড়া কেন? ৪। একান্নবর্ত্তী পরিবার টিকিতেছে না কেন? ৫। বিধবারা আমাদের সমাজে নিরাশ্রয় হইতেছে কেন? ৬। কেরাণীদের ছেলেদের লেখাপড়া হয় না কেন? ৭। কায়স্থের উপনয়নে ব্রাহ্মণ সমাজের ক্ষতি না লাভ? ৮। বাঙ্গালী যুবকেরা কেন ঘাড়ের চুল খাটো করিয়া ছাঁটে? ৯। বাঙ্গালী করিবে কি? ১০। সংবাদ পত্রের দুর্দ্দশা কেন? ১১। বাঙ্গালীর কঞ্জুষতায় ১২। আমাদের ইতিহাস নাই কেন? ১৩। কলিকালে ভ্রষ্টাচারী ব্যক্তি দেখিয়া আমরা দুঃখিত হই কেন? ১৪। ভারতবাসী এমন পতিত কেন? ১৫। বিদেশ প্রত্যাগত কৃষি ও অন্যান্য ব্যবসাভিজ্ঞ লোকদিগের সুবিধা কি প্রকারে হইতে পারে? ১৬। আমাদের অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাবের কারণ?

এই সকল প্রশ্ন রোগাতুর ব্যোমকেশের মনে উদয় হইয়াই লয় পায় নাই; তিনি কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য চিন্তা করিয়াছিলেন। প্রতী-কারের পন্থা ও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরা এই সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলির আলোচনা দেখিতে চাই—দেখিতে চাই আমাদের কৃতবিদ্য উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাঁহার মতগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না, তাঁহার চিন্তার গভীরতা ও বিস্তৃতি কতদূর ছিল—তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও বিচার-বিশ্লেষণ শক্তি কিরূপ সূক্ষ্ম ছিল। কার্য্য-কারণ-পরম্পরা বুঝিবার তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। সর্ব্বোপরি ছিল তাঁর উদার প্রাণ। সহমর্ম্মিতায় ব্যথিত হৃদয় দীন দুঃখীর দুঃখমোচন জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্তছিল। কিসে তিনি

আপনাকে দীন দুঃখীর কাজে লাগাইতে পারিবেন তাঁহার জন্যই—তাঁহাদের ব্যথার ব্যথী হইবার—তাঁহাদের অন্তরস্থ দুঃখমোচনের জন্য তিনি চিন্তা করিয়া যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন তাহা জাতির সম্পৎরূপে একদিন গণ্য হইবে। এই পুস্তকখানি আমরা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের গৃহ-পঞ্জিকা রূপে দেখিতে চাই।

এখানে পাঠকদিগকে লেখক মহাশয়ের একটী চিন্তার ধারার সহিত পরিচয় করিয়া দিব। আজ-কাল অন্ন ও বস্ত্র সমস্যা হইয়া আমার অন্নবিস্তর সকলেই বিব্রত। গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায় তাঁহারই কথায় এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিব। "অন্নাভাবের কারণ হইয়াছে—বিদেশে শস্য রপ্তানি এবং বস্ত্রাভাবের কারণ হইয়াছে—বিদেশী বণিকের মস্তিষ্ক প্রসূত কলকারখানার প্রস্তুত সুলভ ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের আমদানি; আর এই দুইয়ের উৎপাতে দেশে সুখস্বচ্ছন্দ্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতীকার কি নাই? মন আর ও ভাবিতে লাগিল, এই শস্য রপ্তানীতে ত দেশের কৃষক সম্প্রদায় অর্থশালী হইতেছে, সুতরাং ইহাতে ক্ষতি কি?—ক্ষতি আছে। কৃষক শস্য দেশে বিক্রয় করিলে দেশের লোকও তাহাকে অর্থ দিয়া আপনাদের অন্ন ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু বিদেশে শস্য বিক্রয় করিলে বিদেশী অর্থ কেবল কৃষকের হস্তগত হয়, দেশের লোক তৎক্ষণাৎ সে অর্থ পায় না। তাহাদের নিজের অর্থ দিয়াই তখন বিদেশে অন্ন ক্রয় করিতে হয়, তাহাতে ক্রমশঃ দেশের অর্থও (দেশের শস্যের ন্যায়) বিদেশীর করগত হইয়া পড়ে এবং কালে দেশই শস্য ও অর্থ—উভয়েই বঞ্চিত হইয়া পড়ে।" ইহার প্রতীকার করিতে হইলে,—"আমাদেরও অপর দেশে গিয়া আমাদের দেশের অন্ন পণ্য বিনিময়ে, অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্ন অন্নশালী দেশ হইতে অন্ন ক্রয় করিয়া আনিতে হইবে।" অবশ্য তাঁহার উদ্ভাবিত উপায় কার্য্যে পরিণত করা বড় সহজ ব্যাপার নয় তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু সকল কার্য্যের ভাল দিকটা তিনি দেখিতেন বলিয়া, তিনি আশ্বাস দিয়াছেন বহির্বাণিজ্য চালাইবার শক্তি ভারতবাসীর আছে? তিনি বলিয়াছেন,—"দক্ষিণ আমেরিকার বৃটিশ গায়নায় যদি লক্ষাধিক হিন্দুস্থানী বণিক্ বসবাস করিয়া বিদেশী বাণিজ্য চালাইয়া তাহাতে সম্যক্ সাফল্য ও কৃতিত্ব লাভ করিয়া থাকিতে পারে, তবে আমাদের দেশের এই অসম্ভব সম্ভব হইতেই বা বিচিত্র কি? ইহার জন্য প্রাথমিক চেষ্টা কিরূপ করিতে হইবে, কিরূপ লোক লইয়া কার্য্যের সূত্রপাত করিতে হইবে, ইহার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন হইলে, সেরূপ শিক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক-শিক্ষা-সাহায্য-সমিতির সাহায্যে কোন কোন দেশে শিক্ষার্থী পাঠান আবশ্যক কি না,—ইত্যাদি বিষয়ে দেশের ধুরন্ধরগণের ভাবিবার ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

অবশ্য কথাটা যে ভাবিবার বিষয় তাহা আর কাহাকেও বিশদ করিয়া বলিতে হইবে না। দেশের ধনাগম বৃদ্ধির ইহা যে একটা উপায়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে অর্থাগম হয় সত্য—ভূগর্ভস্থিত খনিজ পদার্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে লাভবান হওয়া যায়; কিন্তু এ কথাটাও অবিসংবাদী সত্য যে বিদেশীরা আমাদের দেশ হইতে বৎসর বৎসর যে পরিমাণ অর্থ লইয়া যাইতেছেন, তাহার বিনিময়ে আমরা যদি বিদেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া জাতির ধনভাণ্ডার পূর্ণ না করিতে পারি, তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে যেদিন আমরা বিশ্বসমাজে নিঃস্ব হইয়া পড়িব—আর সেদিন আসিতে যে বড় দেরী আছে তাহাও ত মনে হয় না। তাই বলি এ বিষয়ে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের বলে

রাখা উচিত 'কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে বেশী দিন চলে না।'

এবার পুস্তক হইতে দু একটী রসের কথা তুলিয়া রসিক লেখক মহাশয়ের রসজ্ঞানের পরিচয় দিব:—'আমি একটু খুসী আছি;—দেখিতেছি, ডাক্তারেরা কবিরাজের প্রত্যহ আসিতেছেন—ললাটে, হৃদয়ে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে টোকা মরিতেছেন—বক্ষাবাসের রিহার্স্যাল দেওয়া হইতেছে, দুইহাতে দুইদিকে চাপ দিতেছেন, কেহ বা একেবারে বর্ণ পরিচয় হইতে সুরু করিয়া এ, বি, সি, ডি, বলাইতেছেন, কেহ বা নাইন্টি-নাইন বলাইয়া, আমি যে নিরানব্বইয়ের ধাক্কায় পড়িয়াছি, তাহা উপলব্ধি করাইতেছেন।'

'ছয় মাসের রোগী আছি বেশ আছি! তারপর আহার—কেমন খাইতেছি—বেদানা, আঙ্গুর,—যাহা সুস্থ বেলায় চক্ষে দেখিতে পাইতাম না—সিন্দুরিয়াপটীতে আসিবার সময় যদি কোন দিন লোভবশতঃ কিনিবার কথা মনে উঠিত, অমনি পাওনাদারের মুখ মনে পড়িয়া সঙ্কুচিত হত আরও ক্ষুদ্র হইয়া যাইত।'

পরিশেষে একটা কথা বলিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। সেটা হইতেছে লেখক মহাশয়ের জাতির প্রতি উদগ্র ভালবাসা। তাঁর জাত যে জগতের মধ্যে বড় ছিল—আবার যে বড় হইবে এ ধারণাটা তাঁর সকল সময়েই ছিল, তাই যেখানে তিনি বিদেশীর নীচ অনুকরণ দেখিয়াছেন সেই খানেই কশাঘাত করিয়াছেন। ৮ম নিবন্ধ পাঠ করিলে কথাটার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। জাতির অনুভূতি ও চিন্তার সাহায্যে, বিদেশীর চিন্তা সাজসজ্জা প্রভৃতিকে নিজস্ব করিয়া লইতে সর্ব্বদাই তিনি ব্যগ্র ছিলেন।

আপন মুখে আপন কথা কইব না আর কইব না

(শ্রীলীলা দেবী)

কথা ক'য়ে সাধ মেটে না তাইতো কথা কইব না,
অকূল অপার ভাব পারাবার ভাষার বাঁধন বইব না;
কইব কথা পাখীর গানে,
বেণুর বনে মধুর তানে;
কল্লোলিনী নদীর প্রাণে,
প্রাণ মিলাব গানের বাণে;
সীমার মাঝে রইব না।

কথা ক'য়ে জুড়ায় না মন, তেমন কথা কইব না,
প্রেমহীন নীরস অশোভনে অন্তরে আর সইব না;
আমার মনের কথা নিয়ে,
যায় যে সমীর সুবাস দিয়ে,
নবীন ঘন সজল মেঘে
জমাট জলদ উঠ্‌লো বেগে,
আমার কথাই বইতো না।

আপন মুখে আপন কথা কইব না আর কইব না,
আমার মনের কথাই কাঁপায় বনের পাতায় ঐতো না;
শুভ্র কাশের চামর দোলা,
কুমুদ কমল আপন ভোলা
কয় যে আমার অমল আশা,
তার চেয়ে নয় আমার ভাষা;
বিকশিত হইব না।

সমালোচনা

(সত্যবান)

ব্রজেন্দ্রবেণু—গীতিমঙ্গল। সুকবি শ্রীকালী দাস রায় কবিশেখর বি, এ প্রণীত। মূল্য ৸৹।

ব্রজেন্দুর গোকুল-গীত মূর্চ্ছনায় মিঠাস্থরের রস 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মন প্রাণ আকুল করিয়া দেয়।' ঝুলন-রাস-হোলি-চঙ্কস, চির-কিশোরীর দোহুল দোলার তালে তালে, কবির বাঁশরী—কালিন্দীর কল-কল্লোলের মতই লীলায়িত। কোথাও উতলা, মধু-মঞ্জরী রঙীন্ কাপাকাপি, কোথাও 'কুঙ্কুম—ভাঙ্গা রঙে রাঙা-রংলানের ফাগ-রেণু,' আবার কোথাও বা ধারা-কদম্ব-বীথিকায় অভিসারের বাঁশী ফুকারিয়া ফুকারিয়া উঠিয়াছে।

'মহাপ্রেম-জয়', 'তিলোত্তম,' 'মায়ের প্রাণ', শিব চণ্ড', 'ঝুলন-মিলন,' 'প্রবেশন' প্রভৃতি কবিতাগুলি বিরাট বৈষ্ণব রস-সাহিত্যে নিত্যকাল ধরিয়া যে চিরন্তনী রাগিণী কীর্ত্তন-স্বর-লিপিতে স্বয়ং ধরা দিয়াছে,—সেই এক অখণ্ড সুর ব্রজেন্দুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে রণিয়া উঠিয়াছে। স্থানাভাবে মনোরমছত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। দু একটী স্থল পাঠকগণের অবগতির জন্য বলিতেছি :—

'দিকে দিকে তব একই যে রঙ্গ ভঙ্গিমা, ইত্যাদি' (৩১ পৃষ্ঠা) 'দেরী হ'লে তুই উঁকি দিস্ ঘেরে আঁখি মেলি ইত্যাদি' (৫৯ পৃষ্ঠা) 'পায়ের নূপুর ইত্যাদি··· মণির খাচায় সোণার কিশলে বাঁধা থাকি অবিরল' (৫৩ পৃষ্ঠা)) এগুলি যে বাস্তবিকই উপাদেয় তাহা কবিত্ব-রসপিপাসুদিগকে আর অধিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। এগুলি প্রকৃত রস মাধুর্য্যে ভরপুরবাণীর পূজার অর্ঘ্যে নিবেদিত প্রফুল্ল কমল। পূর্ব্বোক্ত এই সুন্দর কবিতাগুলি আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পণ্ডিত শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত এম এ, পি এই এইচ ডি, বি লিট্, বার এটল 'পরিচয়ে, যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও ভাবুকতার পরিচায়ক। চিরন্তন ভাবের ধারা-বাহিকতা ও পারম্পর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু আমাদের ধারণা যদি সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব সম্পদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাগুলি নির্ব্বাচিত হইত তাহা হইলে অধিকতর শোভন হইত। সুন্দর 'শিব চণ্ড' কবিতার পার্শ্বে 'সুধাপাত্রার' এবং রসোচ্ছল 'জন্মাষ্টমী' কবিতার পূর্ব্বে 'লীলাচতুর্দ্দী' স্থান পাইত না। চলন সই 'দুর্দ্দিন' 'সোহাগিনী' ও 'হৃদিরাণী' এমন সুন্দর কাব্যে স্থান না পাইলেই ভাল হইত। 'ধ্রুব রাখাল' কবিতায় ভাষার পরি-পাট্য থাকিলেও ভাবের মনোহারিত্বের অভাব লক্ষিত হয়। আমরা কবির অনুরাগী ভক্ত। কবি প্রতিভা তাঁহার যথেষ্ট আছে। সে প্রতিষ্ঠা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ও তাঁহার কবি যশঃপ্রভা যাহাতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয় তাহার জন্যই দুই একটী অপ্রিয় সত্য দুঃখের সহিত বলিতে হইল। কাব্য খানিতে সূচীপত্রের অভাব লক্ষিত হয়।

ফুলেলা—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত কাব্য। মূল্য এক টাকা। ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদ-পট সবই ভাল। সুকবি হেমেন্দ্রলালের কবিতা মাসিকপত্রের পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নয়। এই প্রথম কাব্য লইয়া তিনি বঙ্গবাণীর মন্দির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কবিতাগুলি বাছাই করিবার ও সাজাইবার ভার যিনি নিয়েছেন, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে সর্ব্বজন পরিচিত রসরসিক শ্রীযুক্ত

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। কবিতাগুলির স্থান বিন্যাসে ও নির্ব্বাচনে তিনি যথার্থই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

কাব্য-গ্রন্থ প্রায়ই কবিতাগুলি সুনির্ব্বাচিত হয় না, কারণ কবিরা যাহাই লেখেন তাহাই গ্রন্থ-কারে প্রকাশ করে থাকেন। অবশ্য আপনার লেখার প্রতি মমতাবশেই তাঁরা এরকম কাজ করে থাকেন। হেমেন্দ্র বাবু শিল্পী প্রমথ চৌধুরী মহা-শয়ের ন্যায় বোদ্ধার হাতে কবিতাগুলি নির্ব্বাচনের ভার দিয়ে ভাল কাজই করেছেন। তাঁর মত জহুরীর কষ্টি পাথরে যাচাই হয়ে কবিতাগুলির মধ্যে যে গুলি খাটি সোণা সেগুলির স্থানই একাগ্যে হ'য়েছে। কবিতাগুলি যিনিই পড়বেন তিনিই কবির সজীব সতের সরল প্রাণের সাড়া পেয়ে মুগ্ধ হবেন। বাঙ্গালীর জীবনের রোজগার ঘটনা—বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ে লোকদের জীবনের অনুভূত চিরকালের সত্য ও পল্লীরাণির নিখুঁত ছবি মধুছন্দের ভিতর দিয়া সুন্দরভাবে বাহির হ'য়েছে। আলোচ্য কাব্যে কবি তাঁহার বিশেষত্বের যে একটা ছাপ দিতে পেরেছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বড় সুখী হয়েছি। 'ফুলের ব্যথা,' 'আলিঙ্গন,' 'চুম্বন,' 'দৃষ্টি' 'প্রিয়ার পথ', 'বরষায়,' 'মানা' প্রভৃতি কবিতার আমাদের বেশ ভাল লেগেছে।

সেকালের লোক—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম এ, এফ এম এস, এফ আর ই এস প্রণীত সচিত্র চরিত কাহিনী ; মূল্য দেড় টাকা মাত্র। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর। আলোচ্য পুস্তকে তিন-জন মনীষীর জীবন চরিত আলোচিত হইয়াছে—চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে তাঁদের চরিত্রের দৃঢ়তায়,তাঁদের নির্ভীকতার জন্য বাঙ্গালী তাহাদিগকে সম্মানের আসন দান করিয়াছিলেন,—তাঁহারা মনীষী কৈলাস চন্দ্র বসু, নীরব কর্ম্মী রমাপ্রসাদ রায় ও আচার্য্য লাল বিহারী দে, প্রথম দুইটী চরিত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ও শেষটী আমাদের 'যমুনায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা সাগ্রহে প্রকাশের সময়ে পাঠ করিয়াছিলাম ও এগুলিকে পুস্তকাকারে দেখিবার বাসনা করিয়াছিলাম। লেখক মহাশয় আমাদের সে বাসনা চরিতার্থ করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে জ্ঞাতব্য বিষয় এত অধিক মাত্রায় আছে, যে আশ্চর্য্য হইয়া যাই কি করিয়া তিনি এত গুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং একজন সুপণ্ডিত ও চিন্তাশীল সুলেখক দ্বিতীয়তঃ তিনি Bengaleeপত্রের প্রথম সম্পাদক ও প্রবর্ত্তক রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথিতযশা মনীষী গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র ; বোধ হয় তাঁহার দপ্তরগুলি উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইয়াছেন ও তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক এ পুস্তক প্রকাশ করায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন 'বাঙ্গালী জাতটা আত্ম-বিস্মৃত জাত।' কথাটা খুবই সত্য। তাই আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কথা ভুলিয়া যাই তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির আদর করিতে আমরা পারি না; যাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপ ও জীবনের উচ্চ আদর্শ আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যায় তাহাদিগের স্মৃতির যথোপযুক্ত সম্মান না দেখাইতে পারিলে জগতের মধ্যে আমরা একটা জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব না। মন্মথবাবু শ্রদ্ধার শ্রুক-চন্দন দিয়া প্রাণের আবেগে মনীষী ত্রয়ের পূজা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বড় বড় বহু মহাত্মার বাণী ও শুনাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানিতে ৩৬জন বিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্র আছে। তাঁহারা সকলেই বরেণ্য ও স্মরণীয় ব্যক্তি। এই চরিত কথার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে আমিত্বের প্রভাব আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। চরিত গ্রন্থে প্রায়ই বিবৃত চরি-ত্রের ব্যাখ্যান অপেক্ষা লেখকের সহিত পরিচয়ও সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ের কথাই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকে 'ওরিয়েণ্টাল সেমি-

নারী' বিদ্যালয়ের ইতিবৃত্ত বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। অধুনালুপ্ত তদানীন্তন 'চার্টার সভা', 'বেথুন সভা', 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা,' 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গুলির সুন্দর বিবরণ আলোচ্য পুস্তকে আছে। সার জন কে-প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ 'কলিকাতা রিভিউ' 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার, 'ফ্রাইডে রিভিউ' প্রভৃতি সাময়িকপত্রের কথা ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকের বহুল প্রচলন আমরা দেখিতে চাই। আলোচ্য পুস্তকের তিনটী চরিত্র —জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি নিষ্ঠার প্রতীক বলিয়া লেখক মহাশয় বোধ হয় গ্রহণ করিয়াছেন। আর এই তিনের সমবায়ে যে আদর্শ চরিত্র সৃষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। আশা করি বাঙ্গালীর জীবনে এই তিনটী গুণের সমবায় দেখিতে পাইয়া আমরা ধন্য হইব।

পরিশেষে লেখক মহাশয়ের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া ভবিষ্য সংস্করণে বিষয়ানুক্রমিক একটী সূচী দেন; কারণ পুস্তকখানিকে আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করি এবং পাশ্চাত্য Book of Reference গুলিতে যেরূপ বিষয় সূচী থাকে এখানিতেও সেরূপ দেখিতে চাই, কারণ ভবিষ্যতে তৎকালের কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কথা কেহ আলোচনা করিতে গেলে সেই পৃষ্ঠাগুলি অনায়াসে তিনি দেখিয়া লইতে পারেন।

দূরাগত

(শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি, এ,)

সজল কাজল বাদল নিশায়,
আবার বেজেছে মিলন-সুর,
তৃষিত ধরার দয়িত এসেছে—
বন্ধু এসেছে চির-মধুর।

স্বপনপুরীর দোলায় দুলিয়া,
নীল সাগরের ঢেউ উতরিয়া,
এল প্রিয়তম ভুবন ভরিয়া—
শীতলিয়া হিয়া বেদনাতুর।

কেতকী রচিয়া বাসর-শয়ন
সার্থক করে বাসনা তার;
বকুল সাজায় বরণ ডালাটি,
যুথিকা গাঁথিছে কণ্ঠহার।

মিলন-বাঁশরী মেঘেরা বাজায়,
বিজলী দোহাগ-প্রদীপ জ্বালায়,
আদরে গলিয়া বাদল ধারায়
ঝরে অমরার মমতা-ধার।

যুগ যুগ ধরি চলিছে এমনি
রসের ভিয়ান বাদল রাতে,
দূরের বন্ধু মিলিছে আসিয়া
নব অনুরাগে ধরণী সাথে।
বাদল নিশার মাতাল পবন
সে দূরাগতের গাঢ় পরশন,
চুম্বন তার আনে যৌবন—
তোলে শিহরণ হৃদয়-পাতে।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত উদ্যান দৃশ্য।

POPULAR PRESS—SHYAMBAZAR

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

১৩শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩০ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আত্মঘাতীর চৈতন্য

(গল্প)

(শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ)

(১)

সামান্য চল্লিশ টাকা বেতনের শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথের পুত্র সত্যপ্রিয় যে দিন সরকারী ডাক বিভাগে দুই শত টাকা মাহিয়ানায় চাকুরী পাইল, সে দিন প্রতিবেশীমণ্ডলে এই দরিদ্র শিক্ষকের পরিবারই আলোচনার কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইল।

যোগেন্দ্রনাথ মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় একখানি ছোট একতলা বাড়ীতে বাস করিতেন।

পাশের এক দ্বিতলগৃহে রাত্রে আহারের পর কর্ত্তা গৃহিণীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

কর্ত্তা কহিলেন, "বেচারা যোগেনদা এতদিন যে রকম কষ্ট পেয়েছে, এইবার শেষ জীবনটা তেম্‌নি সুখে কাটাতে পারবে।"

গৃহিণী কহিলেন, "হাঁ গা, সত্যর এখন ত দু'শ টাকা মাইনে হ'ল, পরে কত অবধি মাইনে হবে।"

কর্ত্তা কহিলেন, "হায়ার বার শ টাকা ত হ'বেই, এমন কি আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত হ'তে পারে।"

গৃহিণী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "বল কি গো! তোমার চেয়েও বেশী মাইনে হবে।"

কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন, "আমার আর কত মাইনেই হবে, এখন আড়াই শ টাকা পাচ্ছি, মেয়ে কেটে না হয় শেষ পর্য্যন্ত চারশ টাকাই হবে।"

গৃহিণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এবার আর রাঙ্গু দিদির মাটীতে পা পড়বে না।" রাঙ্গু দিদি অর্থাৎ সত্যপ্রিয়ের জননী রাসমণি।

কর্ত্তা কহিলেন, "অমন ছেলে ক'জনের হয়, হীরের টুক্‌রো।"

গৃহিণী কহিলেন, "তা যা বলেচ, শুধু লেখা পড়ায় নয় সব দিকে।"

কর্ত্তা কহিলেন, "আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেছল, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি যে ঐ ভোরে সত্য সব বাড়ী ঘর ঝাঁট দিচ্চে।"

গৃহিণী কহিলেন, "তুমি আজ দেখ্‌লে, পাছে মার কষ্ট হবে বলে সত্য রোজ দু'বেলা বাড়ী ঘর ঝাঁট দেয়, ছাড়া-কাপড় কাচে, বাসন মাজে, উনুনে আগুন দেয়!"

কর্ত্তা কহিলেন, "হাঁ মাতৃভক্তি বটে! এ রকম ছেলের উন্নতি না হ'য়ে পারে না।"

(২)

মাস দুই পরে সত্যপ্রিয়ের সহকর্ম্মী বন্ধু যোগেশ, আহারের জন্য তাহাকে হোটেলে নিমন্ত্রণ করিল। সে দিন আরও তিন জনেরও নিমন্ত্রণ ছিল। তাহারা সকলেই মোটা মাহিনার রাজকর্ম্মচারী।

মদের বোতল দেখিয়াই সত্যপ্রিয়ের মুখ শুকাইয়া গেল।

তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া যোগেশ হাসিয়া কহিল, "হুইস্কি না খাস্, শ্যাম্পেন সেরী, কি খাবে বল? তাই আনিয়ে দিচ্ছি।"

সত্যপ্রিয় হাত জোড় করিয়া কহিল, "একটাই না, গাঁয়ের ছেলে শেষে মারা যাব।"

রমেশ কহিল, "ডিনার খেতে গেলে একটু আধটু না খেলে চলে নাকি! আর অত ভাল ছেলে হ'য়ে কাজ নেই; এক চুমুক খেয়েই দেখ না।"

সত্যপ্রিয় গম্ভীর মুখে কহিল, "না ভাই ও কায আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না।"

চারিজন বন্ধু মিলিয়া তাহাকে অনেক সাধ্য সাধনা পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু সত্যপ্রিয় অচল অটল হইয়া কহিল, "খাওয়া ত দূরের কথা মদ স্পর্শ করাও আমি অন্যায় পাপ বলে মনে করি। তোমরা ও জিনিষটা স্পর্শ ক'র না।"

যোগেশ কহিল, "সত্য, তোমার দেখছি সব তাতেই বাড়াবাড়ি। আমরা কি রোজ খাই, না মাত্তাল হই। কোন মাসে হয় ত একদিন আবার কোন মাসে মোটেই খাই না। সেখাপড়া শিখে বড় চাকরী করে এ রকম কুসংস্কার থাকা তোমার কিছুতেই শোভা পায় না। সুসভ্য দলে মিশে যদি এ সব খেতে আপত্তি কর, তা হ'লে সবাই অসভ্য বর্ব্বর বলে ঠাট্টা করবে।"

সত্যপ্রিয় হাসিয়া কহিল, "মদ খাওয়াটাই যদি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হয়, তা হ'লে অমন সভ্যতায় আমার কাজ নেই। আমি অসভ্য হ'য়েই থাকতে চাই।"

রমেশ কহিল, "তাই থাক—তোমার সঙ্গে বকে বকে আমাদের গলা শুকিয়ে গেছে, এখন গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক্।"

আহারের পর যোগেশ ও অপর দুই বন্ধুর মধ্যে গোপনে কি পরামর্শ হইল, সত্যপ্রিয় তাহার কিছুই জানিল না।

ট্যাক্সি ডাকিয়া রমেশ সত্যপ্রিয়কে কহিল, "উঠে পড় হে।"

সত্যপ্রিয় কহিল, "তোমরা যাবে এক দিকে, আমি যাব আর এক দিকে—তা ছাড়া ট্রাম রয়েছে, অনর্থক ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া কেন?"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "তোমার ভাড়া দিতে হবে না, ভয় নেই হে। এখন উঠে পড়।" এই বলিয়া এক রকম জোর করিয়া সত্যপ্রিয়কে ট্যাক্সিতে বসাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে ট্যাক্সি আসিয়া যে বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল, সে বাটীর উপর নীচের তলা হইতে পাঁচ সাতটী হারমোনিয়াম ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, আশপাশের বাড়ীগুলি হইতে উত্থিত অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দের সহিত মিশিয়া সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া তুলিতেছিল।

সত্যপ্রিয় বিবর্ণ মুখে কহিল, "এ কোথায় এলে?"

রমেশ ইতিপূর্ব্বে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল।

যোগেশ সত্যর হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, "ভয় নেই, এরা বাঘ ভালুক না যে, তোমায় একেবারে গিলে খেয়ে ফেলবে। জীবনী শক্তির বৃদ্ধির জন্যে, পরিশ্রমের অবসান দূর করবার জন্য দুই একদিন আমোদ প্রমোদ দরকার যে, এও তোমায় বুঝিয়ে বল্‌তে হবে?"

তিনজনে মিলিয়া সত্যকে ধরিয়া জোর করিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল।

সত্যপ্রিয়র সারা দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া কক্ষকর্ত্রী বলিয়া উঠিল, "এ ভদ্রলোকটীকে এখানে এনেচ কেন?"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "ও ভদ্রলোক আর আমরা ছোটলোক নাকি?"

কক্ষকর্ত্রী হাসিয়া কহিল, "সে তোমরাই ভাল জান, উনি ভদ্রলোক ওঁকে ছেড়ে দাও।"

যোগেশ কহিল, "দেখ দেখি সত্য তোমার জন্য আজ আমাদের গালাগালি খেতে হ'ল, শুন্‌লে ত আমাদের মুখের ওপর ছোটলোক বল্‌লে।"

সত্যপ্রিয় দুই হাত জোড় করিয়া পাংশু মুখে বন্ধুদের দিকে চাহিয়া নবমীর পাঁঠার মত কেবলই কাঁপিতে লাগিল।

হরেন কহিল, "ওকে ছেড়ে দাও, দেখ্‌চ না, মুখখানা কি রকম সাদা হ'য়ে গেচে; শেষকালে খুনের দায়ে ঠেক্‌বে।"

রমেশ কহিল, "এ রকম বেরসিক তা বুঝতে পারি নি, যোগেশ ওকে নামিয়ে দিয়ে এস।"

সত্যপ্রিয় যখন বাটীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে, তাহার বুকটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। সে এক মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়াইল না—চোখ কান বুজিয়া কোন রকমে সে গলিটী পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িয়া কপালের মুখের ঘাম মুছিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার মনে হইল আজ জীবনের একটা মস্ত বড় ফাঁড়া কাটিয়া গেল। গৃহে পৌঁছাইয়াই জননীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দুই হাতে তাঁহার পদধূলি লইয়া মাথায় দিয়া জামা কাপড় ছাড়িবার জন্য নিঃশব্দে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, মদ খাওয়া আর বারবিলাসিনীকে লইয়া কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদ করা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র।

(৩)

মাস ছয়েক পরের কথা। সত্যপ্রিয় তাহাদের পুরান গৃহের ঠিক পাশেই এক দ্বিতল গৃহ ভাড়া লইয়াছে। একদিন রাসমণি নূতন চুড়ি, নূতন তাগা, নূতন হার পরিয়া পাড়াপ্রতিবেশীদের গৃহে বেড়াইয়া গেলেন।

দ্বিতলগৃহের গৃহিণী রাত্রে কর্ত্তাকে কহিলেন, "রাঙ্গু দিদির যদি আজ সাজের ঘটা দেখ্‌তে! আমাদের ত অমন কাপড় পরে বেরুতে ত লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে যেত। তবুত আমি রাঙ্গু দিদির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। বাবুয়ানার চূড়ান্ত করচে, উনি এখন আর ওপর থেকে নামেন না। রাত দিনই পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছে। ঠাকুর মুখের গোড়ায় থালা সাজিয়ে ভাত দিয়ে যায়, এক গেলাস জল অবধি নিজে গড়িয়ে খান না, তাও দাসীতে

এগিয়ে দেবে। দেখলে হাড় জ্বলে যায়! যাইবল না কেন, অতটা বাড়াবাড়ি ভাল না।"

কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন, "ত্রিশ টাকা মাইনের স্কুল মাষ্টারের ছেলে যদি হঠাৎ বড় চাকুরে হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে মাষ্টার-পত্নীর অবস্থা ঐ রকমই হয়। তবে সত্য ছেলে ভাল, তার চাল তেমন বদ্‌লায় নি।"

গৃহিণী কহিলেন, "তোমার কাছে চাল দেবে, এর মধ্যে সত্যর এত সাহস হবে—তবে শুনি আপিসে নাকি খুব সাহেববিয়ানা করে?"

কর্ত্তা কহিলেন, "তা করে বৈ কি! তাদের যা কাজ তাতে একটু আধটু দরকারও হয়, তবে সত্য কিছু বাড়াবাড়ি করে সে কথা ঠিক। কেরাণীদের সঙ্গে ইংরেজি ছাড়া বাঙ্গলায় কথাই বলে না—; নতুন চাকরীতে ঢুকেছে, ভাব্‌ছি কি হ'য়ে গেছি—চাকরী কি জিনিষ দু'দিন পরেই তা বুঝতে পারবে—জেন ও চানটাল সব বদ্‌লে যাবে।"

গৃহিণী কহিলেন, "সত্যর চাল হয় ত বদ্‌লে যেতে পারে, কিন্তু ওর মার চাল দিন দিন বেড়েই যাবে তা তুমি দেখ। জানেই ত দু'টো মেয়েকে ভিক্ষে সিক্ষে করে কোন রকমে পার করে জাত রক্ষে করেছে—কখনও একটা পয়সার জিনিষও দিতে পারে নি—এখন সপ্তাহে দু' তিন দিন মেয়েদের বাড়ী জিনিষ যাচ্ছেই। ছোট মেয়েটীকে চাল ডাল অবধি পাঠাতে হয়। সত্য ত তার সংসারের দিকে চেয়েই দেখে না। যা করে মা,—মা বেশ দু হাতে টাকা ছড়িয়ে দিচ্চে। এতটা কি আর ভাল, না এ বেশী দিন সইবে, সত্যর ত বিয়ে থাওয়া হবে।"

কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন, "তাই ত তোমার রাঙ্গু দিদি যে দু'দিন পারে সখ মিটিয়ে খরচ করে নিচ্ছে। তবে সত্য তার মাকে যে'রকম ভক্তি করে, তাতে ত মনে হয় না,—বিয়ে করলেই তার মাতৃ-ভক্তিতে ভাটা পড়ে যাবে।"

গৃহিণী কহিলেন, "সত্য মানুষ ত, হ'লেই বা মা, তাই বলে কত বাড়াবাড়ি সহ্য করবে। বউ আসুক না, তখন রাঙ্গু দিদির মেয়েকে চাল ডাল পাঠান বেরিয়ে যাবে। সত্য কি এখন কিছু জান্‌তে পারে—যখন জানাবার লোক হবে, তখন ওসব বন্ধ হয়ে যাবে।"

ইহারই দিন কতক পরে সত্য কি একখানি দরকারী কাগজ বাড়ীতে ফেলিয়া গিয়াছিল। আপিসে পৌঁছিয়া সে কথা মনে পড়িতেই তাড়াতাড়ি খান দুই জরুরী কাগজ সই করিয়া আধ ঘণ্টা পরেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। গলির মোড়টা ঘুরিয়া গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেই দেখিল, তাহাদের বাড়ীর দাসী একটা চাঙারীতে করিয়া কি লইয়া যাইতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র ঝি হঠাৎ ভীত হইয়া লুকাইবার চেষ্টা করিল। সত্যর সন্দেহ হইল, ঝি নিশ্চয়ই কিছু চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু পথের মাঝখানে ঝিকে কিছু না বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই জননীকে দেখিতে পাইয়া কহিল, "মা তুমি ও ঝিকে ত খুব ভাল বল, কিন্তু আমার মনে হয় সে চোর। এই মোড়ের কাছে আমার সঙ্গে দেখা—আমাকে দেখেই সে যেন কি লুকোবার চেষ্টা করিল।"

সত্য যে হঠাৎ এমন অসময়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে এবং ঝিও যে তাহার সামনে পড়িয়া যাইবে রাসমণির একথা একবারও মনে হয় নাই। তাই সত্যর কথায় বিচলিত হইয়া অথকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, "আসুক দেখি ঝি, জিজ্ঞেস করব কেন সে তোমায় দেখে লুকোচ্ছিল?"

সত্য আর কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া টেবিলের উপর হইতে দরকারী কাগজখানি লইয়া তখনই বাটীর বাহির হইয়া গেল।

যথাসময়ে আফিস হইতে ফিরিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় সম্মুখেই ঝিকে দেখিতে পাইয়া সে কহিল, "তখন চাঙারীতে করে কি নিয়ে যাচ্ছিলি?"

ঝি থতমত খাইয়া থানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া অসংলগ্নভাবে কহিল, "দিদিমণির বাড়ীর জিনিষ নিয়ে যাচ্ছিলাম।"

সত্য আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "দিদিমণির বাড়ীর জিনিষ নিয়ে যাচ্ছিলি, আর মা কিছু জানে না? তবে আমাকে দেখে লুকোচ্ছিলি কেন?"

ঝি তাহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল, সত্য তাহা বুঝিতে পারিল না। ঝি যে মিথ্যা কথা বলিতেছে সে বিষয়ে সত্যর কোন সন্দেহ রহিল না। রুক্ষস্বরে সে কহিল, "চুরি করে আবার মিথ্যে কথা বলা হ'চ্ছে, চল্ মার কাছে।"

এই মিথ্যা চোর-অপবাদ ঝিও নীরবে সহ্য করিল না, ঝাঁজিয়া কহিল, "চোর চোর বলবেন না, দাদাবাবু, চুরি করে থাকি, পুলিশে দেবেন দেবেন না মার কাছে।"

ক্রোধ চাপিয়া সত্য তাহার জননীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, ঝিও তাহার অনুসরণ করিল।

সত্য কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ঝি রাসমণির দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "রইল তোমার চাকুরী মা, তুমি লুকিয়ে মেয়ের বাড়ী জিনিষ পাঠাবে আর আমি চুরির দায়ে ধরা পড়ব!"

সত্যপ্রিয় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাসমণি মনে মনে সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন, "আমার তখন কথাটা মনে ছিল না বাবা, খুকীকে ত কখনও কিছু দিতে পারিনি তাই কিছু খাবার কিনে ঝিকে দিয়ে তখন পাঠিয়েছিলাম।"

সত্য বেদনাপীড়িত অন্তরে নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল। আপিসের পোষাক পরিয়া চেয়ারের উপর অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। জননীর আজিকার এই ব্যবহারটা তাহার নিকট একটা নূতন বিস্ময়ের মত ঠেকিল; তাহার ভাবনার সূত্রগুলি যেন কেমন জোট পাকাইয়া গেল।

(৪)

এই সময়ে যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার এক বন্ধুর কন্যার সহিত মাত্র দুই হাজার টাকা পণে সত্যর বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। বিয়ের বাজারে তাঁহার এই পুত্ররত্নটীকে ফেলিয়া দিলে সে যে চতুর্গুণ মূল্যে বিকাইত তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না; কিন্তু যোগেন্দ্র নাথ তাহা করিলেন না, গৃহিণী আগুন হইয়া রহিলেন। যাহা হউক বিবাহের পর রাসমণি তাঁহার শিক্ষক স্বামীকে প্রকাণ্ড বিদ্রোহী ও বৈবাহিককে অতি বড় প্রতারক বলিয়া গালি পাড়িয়া গজ্ গজ্ করিতে করিতে নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

বিবাহের পর উৎসবাদিক কাটিয়া গেল, পল্লী চপলাকে পাইয়া সত্য যেন এক নূতন জীবন লাভ করিল। আপিসের সময়টুকু বাদে সব সময় চপলা তাহার কাছে থাকিত। পল্লীর সহিত গল্প করিয়া সত্যর যেন কিছুতেই তৃপ্তি মিটিত না। তাহার মনে হইত যদি আফিস না গিয়া সেই সময়টুকুও সে স্ত্রীর কাছে থাকিতে পাইত তাহা হইলে তাহার মনের ক্ষুধা পরিপূর্ণভাবে মিটিত। এক আধ দিন যদি কোন কাজে চপলার আসিতে এতটুকু দেরী হইত, সত্য অস্থিরচিত্ত ঘর-বাহির করিয়া বেড়াইত। চপলাকে লইয়া এমনই তন্ময় হইয়া থাকিত যে, চপলা কি খায়, কি পরে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার তাহার অবসরও থাকিত না। সংসার বা টাকাকড়ি সম্বন্ধে ও চপলার সহিত তাহার কোন কথা হইত না; উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইত, তাহার সহিত বাস্তব রাজ্যের বড় একটা সম্বন্ধ থাকিত না। অতি সহজই বন্ধু মহলে তাহার স্ত্রৈণ বলিয়া অখ্যাতি রটিয়া গেল। রাসমণিও এতটা বাড়াবাড়ি ভাল লাগিত না। তবে পুত্রের প্রতিমাসের সমস্ত মাহিনাটা তিনি নির্ব্বিবাদে খরচ করিতে পাইতেন বলিয়া এই বাড়াবাড়িটা মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাইতেন।

সেদিন কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী এক বিবাহে রাসমণির নিমন্ত্রণ ছিল। দুই কন্যা পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া তিনি যথাসময়ে নিমন্ত্রণ-গৃহে উপস্থিত হইলেন।

রাসমণির একজন আত্মীয় আর একজন আত্মীয়াকে কহিল, "বউটার কেমন হাল করে এনেছে দেখেছ ভাই?"

দ্বিতীয়টী কহিল, "তা আর দেখিনি! আমরা ছাকা কি-না যে কিছুই বুঝি না, ওদের ঘরের খবর কিছু রাখি না। মেয়ে দুটোকে ত নমোনমঃ করে পার করেছিল, জামাইরা পঁচিশ ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরী করে, চাল নেই চুলো নেই, সেই মেয়ে দুটোকে আবার যৌয়ের গয়না কাপড় পরিয়ে ঘটা করে সাজিয়ে আনা হয়েছে। শুধু তাই নয় নিজেও ভাল কাপড় জামা গয়না পরে সেজে আসা হয়েছে। লজ্জাও করে না! আর সেজে গুজে এয়েছিস্ কিনা সেই বাড়ীতে যারা তোদের হাঁড়ির খবর রাখে।"

নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতে রাসমণির অনেকটা বিলম্ব হইয়া গেল। সত্যপ্রিয় আহার সারিয়া রাস্তায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল, প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সে ক্লান্ত হইয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিতেই বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামার শব্দ তাহার কাণে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইতেই সে দেখিতে পাইল তাহার জননী গাড়ী হইতে নামিতেছেন। পরে তাহার দুই ভগিনী ও চপলা গাড়ী হইতে নামিতেই রাসমণি বধূকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ বৌমা, নেমন্তন্ন বাড়ীর কাপড় জামা পরে একবারে ছুটে শুতে যেয়ো না। আমার ঘরে কাপড় জামাগুলা খুলে রেখে তবে যেখানে খুসী যেয়ো।"

সত্যপ্রিয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জানালার ধার হইতে সরিয়া গিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। তখন রাসমণি তাঁহার দুই কন্যা ও বধূকে লইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন, সত্য তাহার ছোট ভগ্নীকে ডাকিয়া কহিল, "খুকী, তোর বৌদিকে একবার ডেকে নে ত।"

রাসমণি বধূর দিকে একবার চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাপা-গলায় কন্যাকে কহিলেন, "বলনা কাপড় জামা ছেড়ে তারপর যাবে।"

খুকী সে-কথা বলিলে, সত্যপ্রিয় কহিল, "বল, একটা কথা শুনে তার পর কাপড় জামা ছাড়তে যাবে।"

রাসমণি আর কিছু বলিলেন না, ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। চপলা কুণ্ঠিত স্বামীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সত্য তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতেই সে কহিল, "মা নিশ্চয়ই রাগ করেছেন।"

সত্য কহিল, "আমি তোমায় ডেকেছি বলে মা কখনও রাগ করতে পারেন?"

সে কথার উত্তর না দিয়া চপলা কহিল, "ডাকলে কেন?"

সত্য হাসিয়া কহিল, "ওকথা আবার জিজ্ঞেস কচ্ছ! কতক্ষণ তোমায় কাছে পাই নি, বল দেখি?"

চপলা পুলকিত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তা' এতক্ষণই বন্ধ করেছিলে, আর পাঁচ মিনিটও না হয় থাকতে, এখন আমায় ছেড়ে দাও।"

সত্য কৃত্রিম অভিমান দেখাইয়া কহিল, "বেশ ত যাওনা।"

চপলা হাসিয়া কহিল, "যুবে ত বলছ যাওনা, কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছ কৈ?"

উত্তরে সত্যপ্রিয় পত্নীকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া মুখ চুম্বন করিল।

অল্পক্ষণ পরে চপলা মুক্তি পাইয়া দ্বারের নিকট যাইতেই সত্য ডাকিল "শোন।"

চপলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল "আবার কিছু চাই! এসে সব শুনব।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে ফিরিয়া আসিলে সত্য কহিল, "তখন একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব করেও ভুলে গেলাম। ও রকম সাজে যে বড় নেমন্তন্ন বাড়ীতে গেছ্‌লে?"

চপলা হাসিয়া কহিল, "চেনা বামুনের আবার বুদ্ধি পৈতের দরকার হয়? তোমার পরিচয়েই ত আমার পরিচয়। আমি সেজে গুজে না গেলেও ত লোকে জানবে, আমি কার স্ত্রী।"

সত্যপ্রিয় উজ্জ্বল মুখে পত্নীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

দিন পনর পরে আপিস হইতে ফিরিয়া সত্য পত্নীকে কহিল, "এখনি তৈরী হয়ে নাও যোগেশের বাড়ী তোমার আমার নেমন্তন্ন।"

চপলা মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া কহিল, "সাজ গোজ করে যেতে হবে না কি?

সত্য কহিল, "না সাজ গোজ কিছু করতে হবে না। তবে খালি 'দু' গাছা রুলী হাতে দিয়ে যেয়ো না। চুড়ি ও হারটা পরে যেয়ো। তোমার একখানা মাদ্রাজি কাপড় ছিল না? সেইটে পরে নিও, তাতে তোমায় বেশ দেখায়।"

চপলা মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "সে কাপড় ত নেই।"

সত্যপ্রিয় হাসিয়া কহিল, "এর মধ্যে কবে পরলে যে ছিঁড়ে গেল?"

চপলা কহিল, "সে কাপড়খানা মা ছোটঠাকুর ঝিকে দিয়েছেন।"

সত্য কহিল, "তবে সেই ঢাকাইখানা পরে যেয়ো।"

চপলা কহিল "সেখানা ও নেই।"

সত্য হাসিয়া কহিল, "বেশ যা হয় পরে এস।"

চপলা কহিল, "তা আস্‌চি। তবে চুড়ি হারও আমার নেই, ঠাকুরঝিরা পরে গেছে। গয়না না পরে গেলে কি চল্‌বে না?"

সত্য খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আর চুড়ি তোমার হাতে হবে না? আর মাকে ত সে দিন এক ছড়া নূতন হার গড়িয়ে এনে দিয়েছি। আজকের মতন তাই পরে চল। একবারে রুলী হাতে দিয়ে যাওয়াটা ভাল দেখাবে না।"

(৫)

দিন দশেক পরে সত্য আপিস হইতে ফিরিতেই চপলা তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া প্রতিদিনকার মত আজ স্বামীর কোট খুলিয়া দিয়া সযত্নে আলনায় ঝুলাইয়া রাখিয়া জুতার ফিতা খুলিবার জন্য স্বামীর পায়ের কাছে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

সত্য হাসিয়া কহিল, "তুমি দেখ্‌ছি ভগবানের দেয়া আমার এ হাত দু'খানাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য না ক'রে নিয়ে ছাড়বে না। জামা জুতো খোলবার মত শক্তিও কি আমার এ হাত দু'খানায় নেই? তোমাকে কি এই জন্যেই বিয়ে করে এনেছি না কি?"

চপলা জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে কহিল, "আবার ঐ কথা! তুমিই ত বল, মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর কারুর হাত দেয়া অন্যায়। আমার এসব কাজ ভাল লাগে আমি করি, তুমি বাধা দিতে আস কেন? তা ছাড়া তোমার হাতের ওপর তুমিই ত অবিচার করতে চাইছ। এই ত সারা দিন ঐ হাত দিয়ে কলম পিষে এলে তার বুঝি একটু জিরুবারও দরকার নেই?"

হাস্যোজ্জ্বল মুখে সত্য কহিল, "ঘাট হয়েছে। তোমার সঙ্গে ত আর কথায় পারবার জো নেই?"

চপলা জুতাজোড়া যথাস্থানে রাখিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল, "এইবার প্যাণ্ট খুলতা

ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় পরে একটু সুস্থ হও।"

চপলার হাত হইতে ধুতিখানি লইয়া সত্য কহিল, "এইবার পাখা নিয়ে হাওয়া করতে আরম্ভ কর! দেখো, কোন কাজে যেন ভুল না হয়; তা' হ'লে মাইনে কাটা যাবে।"

চপলা কহিল, "বাইনে কেটে একবার দেখো না!" এই বলিয়া টেবিলের উপর হইতে পাখাখানা আনিতে গিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "ঐ কাগজের বাক্সে কি গা?"

সত্য কহিল, "তোমার সেবার মোহে ও বাক্সের কথা একবারে ভুলেই গেছলাম। খুলে দেখ না, কি আছে?"

বাক্স খুলিতেই একখানি মাদ্রাজি সাড়ী চপলার চোখে পড়িল।

সত্য কহিল, "মাকে এখনই একবার দেখিয়ে এসো, আমি ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে আসি।"

চপলা প্রফুল্লমুখে কাপড়খানা হাতে লইয়া তাহার শ্বশ্রূর নিকট উপস্থিত হইল।

কাপড়খানার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাসমণি কহিলেন, এর মধ্যে গিয়ে বুঝি লাগানো হয়েছে? একখানা পুরাণো কাপড় খুকীকে দিয়েছি তা' বুঝি আর সহ্য হ'ল না? এত হিংসে!"

চপলার কান্না আসিল। অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "আমি ত কাপড় আন্তে বলি নি, মা।"

রাসমণি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে কহিলেন, "তুমি বলতে যাবে কেন, সত্য তোমার বাক্স খুলে দেখেছে কাপড় নেই তাই তোমায় কিনে এনে দিয়েছে! আমি কচি খুকী কিনা!"

চপলা আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার স্বামী তখন ও হাতমুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসেন নাই। তাড়াতাড়ি অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া সে স্বামীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্য জলযোগ সারিয়া সুস্থ হইয়া বসিলে চপলা কহিল, "কেন তুমি কাপড় কিনে আন্লে? মা কত রাগ করছেন।"

সত্য আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তুমি কি বল্ছ, তার ঠিক নেই। তোমায় কাপড় কিনে দিয়েছি বলে মা রাগ করবেন! তা' কি কখনও হয়? আমি এখনি যাচ্ছি মার কাছে।" এই বলিয়া সত্য চপলাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জননীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "মা, তুমি না কি রাগ করেছ?"

রাসমণি অন্তরের ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, "কার ওপর রাগ করব রে?"

সত্য হাসিমুখে কহিল, "ওকে একখানা কাপড় কিনে দিয়েছি বলে, তুমি না কি রাগ করেছ?"

রাসমণি বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া কহিলেন, "শোন একবার কথা! তুই একথা বিশ্বাস করি? এ আহ্লাদ করবার কথা, না রাগ করবার কথা! এখনকার বৌ ঝিদের যেমন ধারা হয়েছে। সব কথা তারা উল্টো করে বুঝতে চায়। খাশুড়ীকে তারা একটা ফলগ্রহ বলে মনে করে, মা'র মত দেখতে জানে না।"

সত্য হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "এ কথা এদ্দিন তুমি আমায় বলনি কেন মা? আমি তাকে এখনি গিয়ে বলচি, তুমিও তাকে বেশ করে বুঝিয়ে দিও মা," এই বলিয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া গিয়া দেখিল, চপলা শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে সত্য কহিল, "লক্ষ্মি, মাকে আমার ভুল বুঝো না, মা কি কখনও আমাদের ওপর রাগ করতে পারেন! আমার মা কি তোমার মা নয়?"

চপলা আর কান্নারোধ করিতে পারিল না, স্বামীর বুকে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সত্য তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কাঁদ্‌ছ কেন?"

চপলা মুখ তুলিয়া কহিল, "তুমি কেন আমায় ওকথা বল্লে? ছেলে বেলায় আমার নিজের মা মরে গেছে, আমি আবার সেই মা ফিরে পেয়েচি। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমার মা যে আমারই মা, একথা আবার তুমি আমায় বলে দেবে!"

সত্য কাপড়ের খুটে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিল, "তা' কি আমি জানিনি। বেশ ও কথা আর আমি তোমায় বলব না।"

মাস দুই পরে সত্য আপিস হইতে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িবার পূর্ব্বে চপলাকে কহিল, "দেখি, তোমার ডান্ হাতখানা।"

চপলা বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হাতখানা বাড়াইয়া দিতেই সত্য পকেট হইতে পাঁচ গাছা চুড়ি বাহির করিয়া হাতে পরাইয়া দিল; তারপর আর পাঁচগাছা চুড়ি চপলার হাতে দিয়া কহিল, "আগে বাঁ হাতে পর, তার পরে তোমার কথা শুনব।" চপলা বাষ্পাকুলনেত্রে চুড়ি কয়গাছা পরিয়া সত্যর দিকে চাহিতেই, সত্য এক ছড়া হার তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিয়া হাসিয়া উঠিল।

চপলার চোখের কোণ দিয়া দুই ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ব্যথা-ভরা কণ্ঠে কহিল, "কেন তুমি আমার জন্যে এ সব আনলে? এত ওলো টাকা নষ্ট করলী"

পত্নীর এই আর্দ্র কণ্ঠস্বর ও মুখের ব্যাকুল ভাব লক্ষ্য করিয়া সত্য আশ্চর্য্য হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

চপলা কহিল, "গয়না পরাটাই যে মেয়েদের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য, তা' যদি মনে করতাম তা' হলে ত তোমার কাছে আমি নিজেই চাইতাম। এ সব না আন্লেই ছিল ভাল।"

সত্য তাহার কথার অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া কহিল, "কতগুলো বাড়তি টাকা পেলাম তাই দিয়ে তোমার জন্যে এ দু'খানা গয়না তৈরী করে এনেছি। এতে যে, তোমার চিন্তার কারণ কিসে হ'ল তা'ত আমি বুঝতে পার্‌চি না!"

চপলা মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "ও তোমার সঙ্গে তামাসা করছিলাম তা' ও তুমি বুঝতে পারলে না? তুমি সখ করে গয়না তৈরী করে এনে আমায় পরিয়ে দিয়েছ, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে?"

সত্য খুসী হইয়া কহিল, "যাও মাকে দেখিয়ে মার পায়ের ধুলো নিয়ে এসো।"

(৬)

অল্পক্ষণ পরে সত্য নিজেই কাপড় জামা ছাড়িয়া জননীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল চপলা মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে, জননীর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। কিন্তু পুত্রকে দেখিবামাত্র রাসমণির মুখের সে গাম্ভীর্য্য অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং মুখের উপর প্রফুল্লতা টানিয়া আনিয়া তিনি কহিলেন, "হার ও চুড়ি বেশ সুন্দর হয়েছে, বাবা।"

সত্য প্রফুল্লমুখে কহিল, "কতগুলো বাড়তি টাকা পেলাম মা, তাই দিয়ে গয়না দুখানা গড়িয়ে এনেছি। অরু আর খুকীকে যে হার আর চুড়ি দিয়েছ তা' আর যেন ফেরত নিওনা মা! ওদের বিয়ের সময় ত কিছুই দেয়া হয় নি!"

রাসমণি আবার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "বৌমার বাপের বাড়ীও চুড়ি হার আমার বাক্সেই পড়ে আছে, ওরা তা' নিতে যাবে কেন। আমিই বা তা' দিতে যাব কেন?"

সত্যপ্রিয়র বড় বোন্ অরুন্ধতী জননীর পাশেই বসিয়াছিল, তাহার গলায় তখনও চপলার বাপের বাড়ীর সেই হার ছড়াটী দুলিতেছিল, রাসমণির সে কথা একবারেই মনে ছিল না। তীক্ষ্ণদৃষ্টি অরুন্ধতী জননীর সেই ভুলটী শুধরাইয়া লইয়া কহিল, "হার

ছড়াটা মার বাক্সে শুধু শুধু পড়ে থাকবে, তাই আজ বের করে পরেছি, দাদা। মা কি আর তা' জানে!"

সত্য হাসিয়া কহিল, "তা' পরেছিস, বেশ করেছিস। ও আর তোকে ফিরিয়ে দিতে হবে না।"

অরুন্ধতী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "বৌদির ও বাপের বাড়ীর হার আমি নিতে যাব কেন দাদা? একদিন নেমন্তন্ন-বাড়ী পরে গেছলাম বলে বৌদি আর সে দিন থেকে রাগ করে ও হার পরে নি, মার বাক্সে পড়ে ছিল। কে শাপ কুড়োতে যাবে দাদা?"

রাসমণি কহিলেন, "বেঁচে থাক্ আমার হরিশ, অক্রুর গয়না পরার ভাবনা কি!"

কিন্তু হরিশ অর্থাৎ অরুন্ধতীর স্বামী সামান্য তিন টাকা মাইনের কেরাণী। সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কোন রকমে দুই বেলার অন্নের সংস্থান করে। সে তাহার স্ত্রীকে গয়না গড়াইয়া দিবে, কথাটা সত্যর নিকট কেমন অদ্ভুত ঠেকিল। তাহার উপর অরুন্ধতী চপলার সম্বন্ধে যে কথা বলিল তাহা শুনিয়া সত্য অন্তরে বিষম বেদনাও পাইল।

অরুন্ধতী জননীর মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া কহিল, "আমরা পুরনো গয়না নেব কেন দাদা, নতুন গয়না যদি নিতেই হয় নেব।"

সত্য অন্যমনস্কভাবে কহিল, "বেশ, আমি নতুন গয়নাই গড়িয়ে দেব।" এই বলিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। খানিক পরে হাত মুখ ধুইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিল অরুন্ধতী খাবারের রেকাবী হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া রেকাবী হইতে একটা সন্দেশ তুলিয়া লইয়া গালে ফেলিয়া দিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া এক গেলাস জল পান করিয়া গেলাসটা যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

অরুন্ধতী কিছু না বলিয়া রেকাবীখানি হাতে করিয়া জননীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "এই দেখ মা, দাদা কিছুই খেলে না। তোমারই ত দোষ, প্রথম থেকে যদি আলগা না দিতে তা' হলে তোমার বৌকি অমন করে তোমার ছেলেকে বশ করতে পারত! এখন থেকে খুব সাবধান হও মা, না হ'লে আমাদের সবাইকে অনেক দুঃখ পেতে হবে। তুমি ত গতরের মাথা একবারে খেয়ে বসনি যে ছেলেকে খাবারটা অবধি দিয়ে আসতে পার না!"

রাসমণি অপ্রসন্নমুখে কহিলেন, "আর বাকি যন্ত্রণা দিস্‌নে মা। সত্য, বৌটার অমন জ্ঞাতিটা হ'য়ে পড়েছে দেখে আমি একে জলে পুড়ে মরচি, আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্‌নে। সাবধান হ'তে হবে বৈ কি তা আমি বুঝি না, বৌমাকে এমন দিব্যি দিয়েছি, সে যদি বন্ধর লোকের মেয়ে হয় তবে দিনের বেলায় আর সত্যর সাম্‌নে যাবে না।"

সে দিন গভীর রাত্রে চপলা শয়ন করিতে আসিল। সেই যে সে তাহার শ্বশ্রূকে গয়না দেখাইতে গিয়াছিল তার পর এই প্রথম সে এ কক্ষে প্রবেশ করিল। সত্য হাতের উপর মাথা রাখিয়া চোখ চাহিয়াই শুইয়াছিল। চপলা তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে দুই হাতে তাহাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া কহিল, "আমি কি করেছি যে তুমি আমার ওপর এমন নিষ্ঠুর হলে?"

চপলা স্থির করিয়া আসিয়াছিল, সে আর স্বামীর সম্মুখে কিছুতেই চোখের জল ফেলিবে না, কিন্তু তাহার সে সংকল্প কোথায় ভাসিয়া গেল। সে চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সত্যপ্রিয় কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, এদিকে চপলার কান্নার বেগও অনেকটা কমিয়া আসিল। গাঢ়স্বরে সত্য প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে আমায় বল, আমি যে কিছুই বুঝতে পারচি না! মা কি তোমায় বকেছেন?"

চপলা নিরুত্তর হইয়া রহিল।

সত্য ভাবিল তাহা হইলে মাই হয়ত তাহাকে তিরস্কার করিয়াছেন। যদিই বা করিয়া থাকেন তাহা হইলে এতটা রাগ করা চপলার কখনই উচিত হয় নাই। মা ত যাহা কিছু বলেন তাহা ত তাহারই ভালোর জন্য, তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য। তাহার মাকে নিশ্চয়ই চপলা নিজের মার মত দেখিতে অভ্যস্ত হয় নাই, এই ভাবিয়া সত্য কহিল, "মার কথায় যদি রাগ কর তা' হলে সত্যি আমার ভারি কষ্ট হয়।"

চপলা এবারও নিরুত্তর হইয়া রহিল।

সত্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "মার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারনি। আচ্ছা, তিনি কি বলেছেন শুনি?"

চপলার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কণ্ঠ তখনও তাহার ভিজিয়াছিল। সে আর্দ্রকণ্ঠে আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি, আমায় কোনো কথা জিজ্ঞেস করো না।"

সে কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিবে তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে ছোটলোক বেশ্যার মেয়ে বলিয়া গালি দিয়াছে। সত্য কি ভাবিয়া তাহাকে আর কোন প্রশ্ন করিল না সেও যেন বাঁচিয়া গেল।

পর দিন সত্যর ঘুম ভাঙিবার পূর্ব্বেই চপলা শয্যাত্যাগ করিয়া সেই যে ঘরের বাহির হইয়া গেল, সত্য আপিস যাওয়ার পূর্ব্বে সে আর তাহার সহিত দেখা করিল না। সত্য আপিস হইতে যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল এবং বহুক্ষণ চপলার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল, কিন্তু চপলা আসিল না।

খানিক পরে তাহার জননী কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "এখনও কাপড়-জামা ছাড়নি বাবা? সেই কোন্ সকালে দুটী খেয়ে বেরিয়েছ, মুখ যে একবারে শুকিয়ে গেছে! যাও বাবা, কাপড়-জামা ছেড়ে শীগ্‌গির করে হাত মুখ ধুয়ে এসো, আমি খাবার নিয়ে আনি। বৌমার যে কি হয়েছে বাবা, তা' ত কিছুই বুঝতে পারচি না। এত করে বল্লাম সত্য এসেছে, কাপড় জামাটা গুছিয়ে তুলে রেখে এসো, খাবারটা দিয়ে এসো; তা' বোধার যে কি গো, সে কিছুতেই এল না। পরের মেয়ে, বেশী কিছু ত বলতে পারি না! যাও বাবা, আর বসে থেকো না, সেই কখন এসেছ," এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সত্য খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আসিলের পোষাক পরিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং অনির্দ্দিষ্টভাবে এখানে সেখানে ঘুরিয়া অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিল।

সঙ্গে সঙ্গে রাসমণি তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কাপড়-জামা না ছেড়েই যে আবার বেরিয়ে গেছলে বাবা,; বিশেষ কাজ ছিল বুঝি?"

জননীর কাছে মিথ্যা কথা বলা সত্যপ্রিয়ের অভ্যাস ছিল না। কিন্তু তাহার কি যে হইয়াছে, তাহা সে নিজেই বোঝে না। তাই সে স্পষ্ট করিয়া কোন উত্তর দিতে পারিল না—কহিল, "শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছিল না, তাই গড়ের মাঠে একটু বেড়িয়ে এলাম মা।"

জননী কহিলেন, "তা' বেশ করেছ বাবা, এখন শরীরটা সেরেছে?"

সত্য শান্তভাবে কহিল, "হাঁ মা, শরীরটা বেশ ঝর্‌ঝরে হয়েছে।"

সেদিনও অনেক রাত্রে চপলা শুইতে আসিল। সত্য ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই চপলার আগমন জানিতে পারিল না।

এমনি করিয়া দিন কয়েক কাটিয়া গেল। প্রতিদিনই গভীর রাত্রে চপলা শুইতে আসে এবং ভোরে উঠিয়া চলিয়া যায়, সারাদিনের মধ্যে সত্যর সহিত আর তাহার দেখা হয় না। সত্য অতৃপ্ত উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রতিদিন আপিসে যায় এবং

আসিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া খানিকক্ষণ যেন চপলার প্রতীক্ষায় দ্বারের পানে চাহিয়া থাকে। তারপর আপিসের পোষাক ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া মায়ের সামনে বসিয়া জলযোগ করিয়া বাটীর বাহির হইয়া যায়, কখনও অকারণে গড়ের মাঠে পায়চারি করিয়া বেড়ায়, কখনও বা কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হয়। এমনিভাবে বেড়াইয়া গল্প করিয়া সে অনেক রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আসে। কোন দিন চপলা আসিবার পূর্ব্বেই সে শ্রান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়ে, কোন দিন চপলার অপেক্ষায় জাগিয়া শুইয়া থাকে, কিন্তু চপলার সহিত দেখা হইলে উভয়ের মধ্যে দুই চারিটীর বেশী কথা হয় না।

ক্রমে চপলার এই ব্যবহার সত্যর নিকট অসহ্য বোধ হইল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে তাহার জননীর উপর অকারণ অভিমান করিয়া চপলা তাহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতেছে। তাহারই সম্মুখে তাঁহার জননী চপলাকে সকালে বিকালে তাহার কাছে আসিবার জন্য কত অনুরোধ উপরোধ করিয়াছে, তবুও চপলা নিজেরই কোট্ বজায় রাখিয়াছে, তাহার কাছে আসে নাই। তাহার স্ত্রী হইয়া যে তাহার জননীকে অবজ্ঞা করিবে ইহা তাহার নিকট একবাক্যে অসহ্য বোধ হইল। কিন্তু ইহার প্রতিকার যে কি তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। অথচ চপলাকে সব সময় কাছে পাইবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তভাবে তাহার মনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল।

(৮)

এমনি একদিন মধ্যাহ্নে জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে সত্য গৃহে ফিরিল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে হঠাৎ অরুন্ধতীর একটা কথা কানে যাইতেই সে রেলিং ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল "বৌদিকে খুব দিব্যি দিয়েছ ত মা। সেই দিন থেকে দিনের বেলায় আর দাদার ঘর মাড়ায় না। কি এমন দিব্যি দিয়েছ মা?"

রাসমণি কহিলেন, "যার চেয়ে বড় দিব্যি আর হয় না। রেণু তুমি যদি ছোটলোক বেহারার মেয়ে না হও তা' হলে দিনের বেলায় আর ওষুধ মুখো হবে না। শুধু তাই নয় আরও বলে দিয়েছ, আমি যতক্ষণ না খুব ততক্ষণ রাত্রে ও সে ঘরে শুতে যেতে পারবে না। কেমন, ঠিক করেছি কি না? সত্য আমার খুব ভাল ছেলে, তাকে আমি যা' বুঝিয়ে দিয়েছি, সে তাই বুঝেছে। বৌ'কে ও আমি দিব্যি দিয়ে এসব কথা বলতে মানা করে দিয়েছি। তাই ত সে বলে না, না হলে কি আর সে চুপ করে থাকতো?"

অরুন্ধতী হাসিয়া কহিল, "তা ঠিক করেছ মা, না হলে দেখতে দু'দিন পরে 'বৌদির হাতে দাদা সব টাকা দিয়ে দিত।"

রাসমণি কহিলেন, "সেই ভয়ই ত আমার সব সময় হ'ত। বৌমার হাতে টাকা পড়লে তোদের কি আর কিছু দিতে পারতাম? এই যে তোদের ওখানে চা'র ডাল পাঠাই তা' কত লুকিয়ে পাঠাতে হয় তা' তোরা বুঝতে পারিস্‌নে। সে অনেক দিনের কথা, একদিন ঝি মাগী ত সত্যর সাম্‌নেই পড়ে গেছল। কত কষ্টে সে দিন ত সামলে নিয়েছি।"

সত্য আর শুনিতে পারিল না। তাহার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল তাহার পায়ের নীচে হইতে যেন পৃথিবী ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে, চোখের সামনে দিনের আলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কোন রকমে টলিতে টলিতে সে নিজের কক্ষে যাইয়া পৌঁছিল এবং শয্যার উপর আছড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ সে প্রায় অর্দ্ধ অচৈতন্যাবস্থায় তেমনি ভাবে শয্যার উপর পড়িয়া রহিল, হঠাৎ এক সময় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা।"

অসময়ে পুত্রের আর্ত্তকণ্ঠস্বর শুনিয়া রাসমণি

ব্যস্ত হইয়া পুত্রের শয়নকক্ষে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন সত্য বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে।

রক্তবর্ণ চক্ষে জননীর দিকে চাহিয়া বার দুই সত্য কেবল 'মা মা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিতা জননী পুত্রের শিয়রে বসিয়া কপালে হাত দিয়া চমকিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "ও বৌমা ও-অরু! তোরা শীগ্‌গির এ ঘরে আয়। সত্য আমার জ্বরে একবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছে।"

শ্বশ্রূর অতি বড় কঠোর অভদ্র দিব্যের কথা মন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়া চপলা ছুটিয়া কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাসমণি আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "এদেছ বৌমা, একবার কপালে হাত দিয়ে দেখ যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে।"

চপলা রাসমণির পার্শ্বে বসিবামাত্র সত্য তাহার দুই জলন্ত হস্তে তাহার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া তাহার বুকের উপর রাখিল।

সে রাত্রে জ্বরের এতটুকু উপশম হইল না, পরদিন ও জ্বর কমিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার আসিল, ঔষধের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু রোগ দিন দিন বাড়িতে লাগিল, সত্যপ্রিয় প্রায় সব সময় অচৈতন্যের মত পড়িয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে অল্পক্ষণের জন্য যখন তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইত, সে 'মা মা' বলিয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া উঠিত।

এমনি করিয়া দিন দশেক কাটিয়া গেল। এগার দিনের দিন রোগের একটু উপশম দেখা গেল। সত্যর মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া আসিল। এখন সে লোক দেখিলে চিনিতে পারে, লোকের কথা শুনিলে বুঝিতে পারে। এমনি অবস্থায় এক দিন মধ্যাহ্নে সে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। রাসমণি চপলাকে একটু দূরে ডাকিয়া চাপা গলায় কহিলেন, "ডাক্তাররা বলে গেল শুন্‌লে ত, কোন ভয়ের কারণ নেই, কিন্তু রোগ সারতে এখনও অনেক দেরী। যে ক'টা টাকা ছিল তা' ত এ ক'দিন ডাক্তার ও ওষুধের দাম দিতেই সব ফুরিয়ে গেছে। এখনও কম টাকা ত লাগবে না। তোমার বাক্স থেকে কিছু বার করে দাও, না হ'লে চালাব কি করে?"

চপলা বিস্মিত নেত্রে শ্বশ্রূর মুখের দিকে চাহিয়া রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, "আমি টাকা কোথায় পাব মা?"

রাসমণি সে কথায় কাণ না দিয়া কহিলেন, "সত্য আমাকে যে ক'টা টাকা দেয় তা'ত সংসারেই খরচ হয়ে যায়। আমি কি তার থেকে কিছু বাঁচিয়ে রেখেছি যে এখন বার করি। তুমি বাছা এ সময়ে টাকা গুলো লুকিয়ে রেখ না,—বের করে দাও। এক বছরে সত্য ত তোমায় কম টাকাটা দেয় নি। আমাকে কি মাইনের সব টাকা দিয়েছে যে, বাকি টাকাগুলো সবই ত তোমার বাক্সে আছে। ছেলের অসুখে এক আমার মাথার ঠিক নেই। তোমায় জোড় হাত ক'রে বল্‌ছি বাছা আর আমায় জ্বালিয়ো না। সত্য একটু ঘুমিয়েছে, মিছে বকাবকি করে তার ঘুমটা ভেঙে দিয়ো না।—টাকা কটা বের করে দাও।" একটু থামিয়া আবার কহিলেন, "এখন কাঠের পুতুলের মত বোবা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ত আমার চল্‌বে না—ছেলের চিকিৎসা ত করতে হবে। টাকা না দাও, একখানা গয়না খুলে দাও, তাই বন্ধক রেখে টাকা এনে আগে ছেলেকে ত বাঁচাই।"

জ্বর হইবার দিন দুই পূর্ব্বে সত্যর হাতে ডাক ঘরের একখানি কাগজ পড়িয়াছিল। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্ঞানপ্রিয় ঘর নামে শেভিং ব্যাঙ্কে ৩০৫ প্রাঁচশত টাকা জমা পড়িল, ঐ কাগজখানিতে তাহারই সংবাদ দেওয়া ছিল। তাহা ছাড়া তাহার জননী যে সংসারের খরচ হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া মাস খানিক পূর্ব্বে তাহার অগোচরে একখানি পাঁচশ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ

করিয়াছি, না, সে সংবাদও সত্যর কানে আসিয়াছিল।

এইমাত্র রাসমণি যে কথাগুলো চপলাকে বলিলেন, সেগুলো অতি নিদারুণ ভাবে সত্যর কানে গিয়া বাজিল। তাহার দুর্বল মস্তিষ্কের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার আহত বক্ষস্থল ভেদ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠের ভিতর দিয়া 'মা' 'মা' ধ্বনি বাহির হইয়া সমস্ত ঘরখানিকে কাঁপাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

(৯)

সত্যপ্রিয় রোগমুক্ত হইয়া কাজে বাহির হইবার মাস ছয়েক পরে পাশের বাড়ীর সেই গৃহিণীটি কর্ত্তাকে হাসিয়া কহিলেন "কিগো, সত্য নাকি খুব ভাল ছেলে? সত্য'র মত ছেলে হয় না, তার সুখ্যাতি তোমার মুখে ধরতো না, এখন যে পাড়ায় একবারে ঢি ঢি পড়ে গেছে!"

কর্ত্তা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "গরীবের ছেলে, হঠাৎ অনেক টাকা হাতে পড়ে গেছে, মাথাটা ঠিক রাখতে পারে নি, দু'দিন পরে সাম্‌লে যাবে।"

গৃহিণী কহিলেন, "যাবে বলে ত মনে হয় না, আগে একটু আধটু মদ খেতে এ খবর আমি পেয়েছি, কিন্তু মাস খানেক থেকে শুনচি বড্ড বাড়াবাড়ি করচে। সেই ভাত খেয়ে সকালে বেরিয়ে যায়, রাত্রি দু'টোর আগে না-কি আর বাড়ীই ফেরে না, সন্ধ্যে থেকে কোন্ চুলোয় পড়ে থাকে। যেমন ভাল ছেলে ছিল তেমনই অধঃপাতে গেছে।"

কর্ত্তা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এতটা বাড়াবাড়ি হয়েছে, তা আমি আগে জান্‌তাম না, তবে শুনতে পাই চারদিকে ধার করে বেড়াচ্ছে। অত মদ খেলে কি মাইনের টাকায় কুলোয়। ওদের সংসারও বোধ হয় খুব কষ্টে চল্‌ছে, কি বল?"

গৃহিণী গালে হাত দিয়া কহিলেন, "ওমা একটুও না, বরং রাসুদিদির নবাবী আরো চতুর্গুণ বেড়েছে! মেয়ে দুটো ত ঘরের মধ্যে পঁচিশ দিন এসে থাকে, তাদের সাজ গোজ ও হেসে ঢলে পড়বার ঘটা দেখলে, সত্যি বলচি, আমার গা একবারে জ্বলে যায়। তার ওপর জামাইদের ত প্রায়ই নেমতন্ন হচ্ছে, খাওয়ানোর ঘটা কি!" একটু থামিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিলেন, "কিন্তু কষ্ট হয় বউটাকে দেখে, ক'মাসের ভেতর বেচারির মুখে আমি একদিনও একটু হাসি দেখতাম না, মুখখানা যেন সব সময় শুকিয়েই আছে। একখানা ভাল কাপড় একদিনও তাকে পরতে দেখি নি।"

একদিন সত্য রাত্রে কিছু সকাল সকাল বাড়ী ফিরিল, তখন অশ্রু রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, চপলা ও সবেমাত্র শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। অবসন্ন ক্লান্তদেহে সত্য চেয়ারে বসিতেই চপলা পাখা লইয়া নিঃশব্দে হাওয়া করিতে লাগিল। সত্য অনেকটা সুস্থ হইলে চপলা তাহার জুতা খুলিয়া পোষাক ছাড়াইয়া দিল। সত্য ধুতি পরিয়া তেমনি নিঃশব্দে চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল। চপলা তাহার পায়ের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যথাভরা দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "কেন তুমি এমন হলে?"

সত্যর বুক ফাটিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। জড়িত কণ্ঠে সে কহিল "চপলা আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না। আমি ত তোমায় কোন কথা জিজ্ঞেস করি না।"

চপলা স্বামীর পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সত্য দুই হাতে চপলার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "চপলা আমি তোমার কোন দিন অনাদর করেছি, রূঢ় কথা বলেছি?"

চপলা বেদনাক্লিষ্ট দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

সত্য সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি যত মদই খাই না কেন, এ জ্ঞানটুকু আমার থাকবে যে তোমার অনাদর করা কটু কথা বলার মত অন্যায় আর কিছু নেই। উঃ বড় যন্ত্রণা চপলা, বড় যন্ত্রণা।"

চপলা স্বামীর কাঁধে মাথা রাখিয়া কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "আর ও সব খেয়ো না, কোথায় যেয়ো না তোমার নিন্দে আর শুনতে পারি না।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সত্য কহিল, "অনেকদূর এগিয়েচি, ফেরবার ইচ্ছে ও নেই, শক্তিও নেই। তুমি আমায় কিছু বল না।"

চপলা দুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

দিন দুই পরে আপিসের কাজ শেষ করিয়া সত্য এক হোটেলে আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়া মোটরে চাপিয়া গৃহে ফিরিল। তখনও সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব ছিল, সত্য এক তাড়া নোট পকেট হইতে বাহির করিয়া হাতে লইয়া টলিতে টলিতে জননীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নোটের তাড়াটা তাঁহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া জড়িতকণ্ঠে কহিল, "নোট কখানা ভাল করে গুণে নাও মা। এমাস থেকে আমায় আরো পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়েছে। আমি ওর থেকে একটা পয়সাও খরচ করি নি, তুমি ভাল করে গুনে দেখ মা।"

রাসমণি নোটের তাড়াটি মাটী হইতে তুলিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তেমনি জড়িতকণ্ঠে আবার সত্য কহিল, "খালি নোট তুলে নিলে হবে না মা, গুণে নিতে হবে, না হ'লে আমি এখান থেকে কিছুতেই নড়ব না মা, এই বসে পড়লাম" এই বলিয়া ধপাস্ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

তাহার দুই ভগিনী জননীর পাশেই বসিয়াছিল, তাহারা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। রক্তবর্ণ চক্ষে তাহাদের দিকে চাহিয়া মস্তক-সঞ্চালন করিতে করিতে সত্য কহিল "আমি মাতাল হয়েচি মনে করেচিস! মা তুমি নোট গুণে নাও, না হলে আমি এখান থেকে নড়চিনে, মা,!"

তাহার দুই ভগিনী হাসিয়া উদ্দাম হইয়া উঠিল, হাসিয়া এ ওর গায়ে লুটোপুটি খাইতে খাইতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাসমণি সভয়ে নোট কয়খানি গুণিয়া দেখিলেন।

সত্য তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল, "ঠিক হয়েছে পঞ্চাশ টাকা বেশী পেয়েছ মা? মা, মা!"

রাসমণি কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা পেয়েছি। তুমি এখন কাপড় চোপড় ছেড়ে ওঘরে গিয়ে শোও গা।"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কোন রকমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্খলিত পদে সত্য কক্ষের বাহির হইয়া আসিল।

চপলা বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরণে একখানা আধ-ময়লা কাপড় এবং হাতে দুই গাছি শাঁখা ছাড়া আর কোন অলঙ্কার ছিল না। সত্য সেই দিকে চাহিতেই দেখিল, চপলার দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সত্য স্থির হইয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে মাথা তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, সমস্ত দেহ তাহার দুলিতে লাগিল। একবার বা দেওয়াল একবার বা রেলিং ধরিয়া নিজেকে কিছুক্ষণ সোজা রাখিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল এবং নীচে নামিয়া গিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সেদিন গভীর রাত্রে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় সত্য গৃহে ফিরিল। বাড়ীর সকলে তখন নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতেছিল, কেবল চপলা উৎকর্ণ হইয়া সিঁড়ির উপর বসিয়াছিল। পরমুহূর্ত্তে পাইবামাত্র সদর দরজা খুলিয়া দিয়া সে কোন রকমে সত্যকে উপরে আনিয়া শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল। ভোরের সময় সত্য কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া চাহিতেই দেখিল,চপলা

তাহার শিয়রে বসিয়া তখনও হাওয়া করিতেছে। সত্য হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যথিতকণ্ঠে ডাকিল, "চপলা!"

চপলার দুই রক্তবর্ণ চক্ষু ফাটিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

সত্য যন্ত্রণা-পীড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "উঃ; আর পারি না যে মদ খাস, যে বেশ্যা বাড়ী যায় আমি যে তাকে আত্মঘাতী বলে ঘৃণা করতাম!"

কাঁদিতে কাঁদিতে চপলা কহিল, "আমি তোমায় আর কি বলব, তুমি ত সব বোঝ। আমিও যে আর আর সহ্য করতে পারচি না।"

সত্য সহসা তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিল এবং একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

সে দিন সত্য আর আপিস গেল না, শয্যা হইতে উঠিল না; কিছু মুখেও দিল না। গত রাত্রের অত্যধিক মদ্যপান হেতু তাহার শরীর কেমন অবসন্ন বোধ হইতেছিল। কিছুই যেন তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাহার মনটা কেমন হু হু করিতেছিল। কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, সে কেন এমন ভাবে মৃত্যুর মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। কেন? উঃ, সে চক্ষু মুদিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া শয্যার উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আত্মঘাতীর রক্ষা পাইবার কি কোন উপায় নাই? সঙ্গে সঙ্গে চপলার দীন ম্লানমূর্ত্তি তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত উঠিল। এই ত এবজন আছে যে টাকা চাহে না, শুধু তাহাকেই চাহে? এ কথাটা ত তাহার এতদিন মনে পড়ে নাই। সত্যপ্রিয় আজ যেন বহু আকাঙ্ক্ষিত সত্যের সন্ধান পাইল। সম্মুখে কাষ্টখণ্ড দেখিতে পাইলে মজ্জমান ব্যক্তির হৃদয় যেমন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, সত্যর ক্ষত বিক্ষত হৃদয় তেমনই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সে ক্রমাগত ঘরময় পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং বারম্বার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

• • • •

দিন সাতেক পরে পাশের বাড়ী কর্ত্তা কহিলেন, "সত্য শুনচি মদ ছেড়ে দিয়েচে?"

গৃহিণী কহিলেন, "এখন সন্ধ্যার আগেই বাড়ী আসে,আর ত বেরুতে দেখিনি। ভাল হ'লেই ভাল।"

কর্ত্তা কহিলেন "আমি ত তোমায় বলেছিলাম, দু'দিন পরে সামলে যাবে।"

গৃহিণী কহিলেন, "আবার আরম্ভ করতে কতক্ষণ। যাক্, রাত হ'য়েছে এখন ঘুমাও।"

ইহার পর আটটা দিন কাটিয়া গিয়াছে। এক দিন প্রাতঃকালে সত্য জননীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "মা, আমরা যাচ্চি।" চপলা পিছনে দাঁড়াইয়াছিল।

কোথায় যাইতেছে এ প্রশ্ন করিবার সাহস রাসমণির হইল না। তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন ফিরবে?"

সত্য কহিল, "জানি না মা।" আর কিছু সে বলিল না, চপলাকে লইয়া তখনই কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

পরদিনও সত্য ও চপলা যখন ফিরিল না, তখন রাসমণি ব্যস্তভাবে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "সত্য বৌমাকে নিয়ে কোথায় গেল বল দিকি? আজও ত ফিরলে না।"

রাসমণির স্বামী সংসারের কোন কথায় থাকিতেন না, কহিলেন, "আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করে ত কোন লাভ নেই।"

রাসমণি আঘাত খাইয়া নিঃশব্দে নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

জনপ্রিয় আপিস হইতে সংবাদ লইয়া আসিল যে তাহার দাদা এক বৎসরের ছুটী লইয়াছে; কিন্তু কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ জানে না।

পূজা

(শ্রীলীলা দেবী)

আজ পেয়েছি খুঁজিতে মাথা অপরাধীর পায়ে,
সেই গরবে বক্ষ আমার দুলছে প্রসাদ বায়ে।
ছোটর কাছে ছোট হ'লেম, এড়িয়ে মানের দায়,
এ মন-কুসুম আপনি যে তাই পড়ল হাতা পায়,
যারা আমায় বেদন দিল তাদের দু' হাত ভ'রে,
যা ছিল মোর বিলিয়েছি যে সেই সুখে চোখ ঝরে;
রিক্ত আমায় করল যারা তিক্ত বচন ক'য়ে,
সিক্ত তাদের তপ্ত এ পথ, ক'রছু হে প্রেম ব'য়ে।
যাদের হাতের নিঠুর আঘাত দাগ দিল এ বুকে,
বিলিয়েছি মোর সব অমৃত তাদের বিষয় মুখে,
আমায় যারা সাজিয়ে দিল স্বার্থ ভীষণ সাজে,
তাদেরই আজ মধুর ক'রে দিয়েছি প্রেম লাজে,
এই কাজেতে পাইনি সময় অশ্রুজলে ভেসে,
ব্যথার শোণিত দাগ ধুয়াতে ব্যথায় ভাল বেসে;
তোমার পূজার ফুল চন্দন, তোমার গলায় মালা,
হয় নি চয়ন, হয় নি গাঁথা, হয় নি প্রদীপ জ্বালা,
তোমার মাথার অগুরু বাস তিলক মৃগমদ,
তোমার স্নানের কর্পূর আর দুগ্ধ ঢালা হ্রদ,
হয় নি রচন, হয় নি আসন, আল্পনাতে আঁকা,
হয় নি যে আজ বসন তলে পরাণ রেখু রাখা;

এইটুকু মোর পূজা হে আজ পুড়িয়ে অহঙ্কার,
সুগন্ধ ধূপ ছন্দ গীতে গেঁথেছি এই হার।

সমালোচকের কাজ

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র)

সেদিন কোন এক সভায় জনৈক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সমালোচকদের উপর অযথা আক্রমণ করিয়া বলেন, 'যাঁহারা সমালোচনা করেন তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা বই লেখেন তাঁহারা যে কম বুদ্ধিমান এ কথা ত মনে হয় না? সমালোচকের গঠন করিবার শক্তি কোথায়? ভাল-মন্দ বিচার করিয়া দিবার তাঁহারা কে?"

কথাটা মনে লাগিল না। গঠন করিবার শক্তি সকল সমালোচকদের না থাকিতে পারে; কিন্তু কাহারও যে না থাকিবে এ কথা কেমন করিয়া স্বীকার করি। এ দেশে সমালোচকের সংখ্যা খুব কম। তাহার উপর যাহারা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহাদের জ্ঞানের গভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিচার শক্তির অভাব যে লক্ষিত হয় না তাহাও বলি না; অথচ এখন তথা-কথিত সমালোচনার নামে নিছক স্তুতি বা নিছক নিন্দা যে বাহির হয় তাহাও সমর্থন করি না। মধ্যে মধ্যে সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারিত হইতে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। ইংরাজীতে যাহাকে Destructive criticism বলে কেবল দোষ-দেখান, ভাঙ্গন

রীতিই যে এমন বাঙ্গলা সাহিত্যে চলিতেছে তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু Constructive criticism বা গঠন-মূলক সমালোচনা যে মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই তাহাও ত অস্বীকার করিতে পারি না।

ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি মানুষ মাত্রেরই অল্পবিস্তর আছে। ঈশ দত্ত এই শক্তির সদ্ব্যবহার করেন এমন সমালোচকও আছেন। তীক্ষ্ণধী সমালোচক যে কোন ক্ষেত্রেই লেখক অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ হন না, এ কথা স্বীকার করি না। লেখক রূপে যশঃ অর্জ্জন করিতে না পারিয়া সমালোচক হ'ন এই প্রাচীন কথাটা হতেই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বোধ হয় চলিয়া আসিতেছে। নির্ভীকতা ও সত্য বলিবার সাহসও অনেকের আছে। অবশ্য আমাদের বুদ্ধির মাপ কাটিতে লেখক ও সমালোচকদিগকে সকল সময় যাচাই করা চলে না।

এক্ষণে আমি প্রকৃত সমালোচকের কাজ কি তাহারই একটু আলোচনা করিব। প্রসিদ্ধ সমালোচক Jennings সাহেব তাঁহার সুচিন্তিত বহুতথ্য পূর্ণ Curiosities of Criticism পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে সত্যই বলিয়াছেন, সমালোচকের পক্ষে এটা অত্যাবশ্যকীয় নয় যে তিনি যে বিষয়ে অভিমত দিবেন, তাহার উপর নূতন কিছু গঠন করিতে পারেন। বিচার বিশ্লেষণ-প্রতিভা, গঠন-প্রতিভা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রায়ই এক ব্যক্তির ভিতর এই দুইটী শক্তির পূর্ণভাবে বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। দুইটী শক্তির পৃথক অস্তিত্ব মানব হৃদয়ে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা যে, যে ব্যক্তি জীবনে কখন তুলি ধরেন নাই বা রংএর ব্যবহার করেন নাই তিনি চিত্র-সমালোচক হইতে পারেন না। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। স্বাভাবিক জ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ লোকে চিত্রকর চিত্রে কি ফুটাইতে চান তাহা বুঝিতে পারে; এবং বলিতে পারে কতদূর চিত্রকর সেই ভাব ফুটাইতে পারিয়াছেন—তাহার আদর্শ কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে। চিত্রের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার স্বাভাবিক শক্তি ও অনেকের আছে ও থাকে। সেইরূপ রঙ্গমঞ্চে কোনদিন দণ্ডায়মান না হইয়া—দুই ছত্রও এক সঙ্গে আবৃত্তি করিতে না পারিলেও নটের সমালোচনা সাধারণে করিতে পারে। গঠনকারী লেখকই যদি সমালোচক হইত, তাহা হইলে সমালোচনের উপকারিতা থাকিত না; কারণ এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দলের সংখ্যা খুবই কম তাহার উপর তাহারা আপন আপন চরকায় তৈল দান না করিয়া অপরের চরকায় তৈলদান করিতে যাইবেন, তাহা ত মনে হয় না। অধিকন্তু এরূপ কার্য্য করিলেও দোষগুণ যে কেবল তাহাদের ধরিবার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকিবে এরূপ মনে করা যায় না।

প্রকৃত সমালোচকের রসজ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাহার রুচি মার্জ্জিত হওয়া চাই। পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিবার স্বাভাবিক শক্তি থাকা চাই—সর্ব্বোপরি থাকা চাই সহজ জ্ঞানরূপ বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের আদর্শ উপলব্ধি করিবার শক্তি। এক কথায় বলিতে গেলে যা কিছু ভাল তা তারিফ করিবার শক্তি না থাকিলে কেহ ন্যায়বান সমালোচক হইতে পারে না। সমালোচকের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকা চাই। শৌলমিথী প্রকৃতির সকল বিষয়ের রহস্যের সহিত তাহার পরিচয় থাকা আবশ্যক। দুনিয়ার সংবাদ রাখাও তাঁহার দরকার। কেবল পুঁথিগত জ্ঞান থাকিলে চলিবে না। তাঁহাকে মানুষের চরিত্র পাঠ করিতে হইবে—হৃদয়ের অনুভূতিগুলি বুঝিতে হইবে, কারণ অনুভূতিই ত কার্য্যের উৎস—কার্য্যের প্রেরণা অনুভূতিই দিয়া থাকে। অনুভূতির বিকাশ ও প্রসার কিরূপে হয় তাহা তাঁহার ভালরূপে জানা থাকা চাই। মনস্তত্ত্বের চিরন্তন সত্যগুলি তাঁহার জানা থাকা বিশেষ দরকার। কোন অবস্থায় মানুষ কি ভাবে চিন্তা করে বা কাজ

করে তাহার সঠিক খবর জানা না থাকিলে সমালোচক আলোচ্য চরিত্রগুলি বুঝিতে পারিবেন না।

কোন রূপ পূর্ব্ব ধারণা বা সংস্কারে লইয়া সমালোচনা করিতে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নয়। আসক্তি বা টান থাকা (Bias) সমালোচকের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। মাথু আর্ণল্ডের মতে disinterestedness নিঃস্বার্থ ভাবে আলোচনাই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকৃত সমালোচকের কোন দলের বা গণ্ডীর সংকীর্ণতার মধ্যে বাস করা উচিত নয়। উহাদের ভিতর থাকিলে অপরোক্ষভাবে তিনি দলের মতের দিকে যে অধিক পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে বিচিত্রতা কি? এ দেশে ধর্ম্ম মতের সমালোচকদের মধ্যে পূর্ব্বে পক্ষপাতিত্ব দোষ দেখা যাইত, এক্ষণে রাজনৈতিক আলোচনার বিভিন্ন দলের মুখপত্রদের সমালোচনাতে এই পক্ষপাতিত্ব দোষ বেশ পরিস্ফুট ভাবে দেখা যাইতেছে। নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করা দলের মধ্যে থাকিয়া বড় সহজ নয়। আজকাল সাহিত্যিকদের ভিতর ও ঐক্যের দল বাঁধিবার চেষ্টা হইয়াছেও হইতেছে। দলের লোকের লেখার সমালোচনাও যথাপূর্ব্বরূপে হইতেছে না। অবশ্য দল বাঁধার দোষটাই প্রথমে বলিলাম। দল বাঁধার অত্যধিক প্রীতির ফলে সমালোচন যে ভালরূপ না হইতে পারে তাহার একটা কারণ দেখাইলাম। দল সৃষ্টির গুণও খুব আছে। দলের ভিতরে থাকিলে দলের মতটা বেশ সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। চলমধ্যস্থ সাহিত্যিকদের ভাবের আদান প্রদান হইয়া ভাবের ধারাটা পুষ্টিলাভ করে; কিন্তু আবার অন্যান্য দলের ভাবের সহিত পরিচয় না থাকার দরুণ, বিরুদ্ধ বাদীদের মতটা জানিবার সুযোগ না থাকায় বা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা না করার দরুণ প্রত্যেক দলের ভাব সকল পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

মত পার্থক্য জগতে থাকিবেই থাকিবে। আমার মতের সহিত অপরের মতের মিল না থাকিলে বিরুদ্ধ মতটার যে কোন মূল্য নাই একথা যাহারা মনে স্থান দেন, তাহারা অহমিকার ও আত্মম্ভরিতার বশেই ওরূপ করিয়া থাকেন। সত্য ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এবং কোনরূপ বিদ্বেষ প্রণোদিত না হইয়া যাহারা মতের পার্থক্য রাখেন তাহাদিগকে দোষ দিবার কিছুই নাই। জগতে প্রকৃত মত পার্থক্য honest differences of opinions থাকিবেই থাকিবে। আর সেরূপ থাকাও দরকার। মতের যাচাই করিবার জন্য—মতের প্রকৃতি ঠিক করিবার জন্য বিভিন্ন মতের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে। বার্ক সত্যই বলিয়াছেন, Antagonists are our real friends. যাহারা আমাদের ভুল ধরাইয়া দেন তাহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু। কারণ তাহারা আমাদের দোষগুলি দেখাইয়া দেন। বিচার বুদ্ধি দ্বারা আমরা সে গুলিকে যাচাই করিয়া লইতে পারি। সমালোচকের মতের উদারতা থাকা খুবই দরকার।

এখানে কিন্তু একটা কথা উঠিতে পারে। সমালোচকদের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে আমরা কোন পথে চলিব। কাহার মত শিরোধার্য্য করিয়া লইব। ডাক্তারদের মধ্যে মত বিরোধ হইলে রোগীর প্রাণ লইয়া যে টানাটানি হয় তাহা ত সকলেই জানেন। উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই, নিজের বিবেক বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করা উচিত কোন মতটা গ্রহণীয় আর কোনটা ত্যাজ্য। অবশ্য বিরুদ্ধ মতের সময় এই পন্থাই প্রকৃষ্ট। কিন্তু মনে রাখা উচিত অধিকাংশ স্থলে সমালোচকেরা একদেশদর্শী হইয়া মত দিয়া থাকেন, অবশ্য তাঁহারা যে সকল ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়া এরূপ করেন তাহা বলিতেছি না। সমালোচকের নিকট সত্যের যে বিকাশ ফুটিয়া উঠে সেই দিকটা দেখিয়াই তিনি মত প্রকাশ করেন। অনেক স্থলে বহুরূপীর ভিন্ন ভিন্ন রং দেখিয়া তার গায়ের ভিন্ন ভিন্ন রংএর কল্পনার মত, অর্থাৎ হস্তীর অংশ বিশেষ দেখিয়া অংশ বিশেষের পরিচয়ের মত সমালোচকেরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া

থাকেন। এগুলি আমরা পুরণ করিয়া এক অখণ্ড সত্যে উপনীত হইতে পারি।

আসক্তির অত্যধিক ফলে সমালোচনার নামে যে ইচ্ছাকৃত অযথা নিন্দা ও কুৎসা কিংবা অযথা প্রশংসা বাহির হয় তাহা দেখিয়া বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইতে হয়। অবশ্য কালের ন্যায় প্রকৃত সমালোচক কেহ নাই তাহা জানি। কাল যে লেখাকে ধরিয়া রাখিতে পারে তাহাই স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবে। কালের কষ্টি পাথরে যাচাই না হইলে কোন দেশের কোন সাহিত্যই টিকিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন সমালোচকের অযথা নিন্দা বা প্রশংসায় কি ই বা আসিয়া যায়? আসিয়া যায়। এখানে লর্ড মেকলের একটা কথা তুলিয়া দি :—"Though we hve no apprehensions that puffing will ever confer permanent reputation on the understanding, we still think its influence most pernicious. Men of real merit will, if they persevere, at last reach the staion to which they are entitled, and intruders will be ejeted with contempt and derision But it is no small evil that the avenues to fame should be "blocked-up by a swarm of noisy pushing, elbo-wing pretenders, who thongh they will not ultimately be able to make good their own entrance hinder, in the meantime, those who have a right to enter" সমালোচকের অযথা বাহবায় অযোগ্য-লোকের স্থায়ী যশ কখনও হইবে না, তাহা আমরা জানি; কিন্তু এরূপ করা ও গর্হিত কাজ। যারা প্রকৃত গুণী তারা সাধনা বলে যশের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে, সেই সকল অযোগ্য লোকদের দূর করিবে ইহা সত্য; কিন্তু যশের পথ গুলিতে প্রবেশ করিবার যাহাদের প্রকৃত অধিকার আছে, তাহাদের প্রবেশ করিতে না দিয়া যারা অনধিকারী তারা অনর্থক পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে বা তথা-কথিত সমালোচকদের মিথ্যা সমালোচনায় যারা সেই সকল পথে ভিড় করিয়া থাকিবে তাহারা বাণীর মন্দিরে ত প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাদের ঠেলাঠেলি করাই সার হইবে। আর এ ক্ষেত্রে আরও একটা কথা মনে পড়িল, আজকাল কোন কোন সমালোচকের কোন কোন লেখকের লেখার উপর অযথা প্রীতি দেখিয়া—তাহাদের উপর অর্পিত সুখ্যাতির পুষ্প বৃষ্টি দেখিয়া জনৈক ইংরাজী সমালোচকের ভাষায় বলিতে গেলে indisicriminate distribution of praise দেখিয়া, বন্ধুর বা দল-প্রীতিই ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পুস্তক-প্রকাশকদের মুখের দিকে চাহিয়া ঐরূপ যে করা হয় না তাহাও বলিতে পারি না। কোনরূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া সমালোচনা করা উচিত নয়। এই পবিত্র কার্য্যে যিনি ব্রতী হইবেন স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য।

কোনও পুস্তক বা চিত্রের সমালোচনা করিতে হইলে কেবল মাত্র দৌর্ব্বল্য বুদ্ধি বা রস জ্ঞানের সাহায্যে করিলেও চলিবে না। প্রথমেই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে লেখক বা চিত্রকরের প্রতিপাদ্য বিষয় কি। তিনি কি আমাদিগকে নূতন তথ্যের সন্ধান দিতে চান—কি শিখাইতে চান—তাঁহার বক্তব্য বিষয় কি? তারপর দেখিতে হইবে সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে। ফলশ্রুতিতে কি পাইলাম। উদ্দেশ্য সৎচিত্র হওয়া যে বাঞ্ছনীয় তাহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। অনেক লেখক অশ্লীলতার চিত্র—পাপের চিত্র অঙ্কিত করেন, শ্লীল ও পুণ্য চিত্রের পার্থক্য দেখাই-বার জন্য। ইহাদের এরূপ কার্য্য আমরা অনুমোদন করিতে পারি, যদি পাপের প্রতি প্রকৃতই তাঁহাদের লেখা পড়িয়া ঘৃণা আসে ও পুণ্যের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। নচেৎ যে সকল লেখক কেবল মাত্র লালসার ও পাপের চিত্র অঙ্কিত করেন তাহাদিগকে কোন রূপে সমর্থন করা যায় না। আমরা সমাজ-বদ্ধ জীব। সমাজ-সংস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিত্র অঙ্কিত না করিলে সে চিত্রের সৌন্দর্য্য লোকে অনুভব করিতে পারিবে না। লেখকের বক্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝা সমালোচকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সমালোচকের সত্যের প্রতি যতই কেন অবিচলিত নিষ্ঠা থাকুক না, লেখকের বা চিত্রকরের ভাবের—বক্তব্যের—উদ্দেশ্যের—প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে প্রকৃত সমালোচনা হইতেই পারে না। গেটে কথাটা জোর করিয়া বলিয়াছেন, যে লেখক ও সমালোচকের ভাবের সমতা যদি না থাকে তা হ'লে খাঁটি সমালোচনা হ'তে পারে না। সমা-লোচকের ও লেখকের দৃষ্টির মুখ একদিকে হওয়া চাই।

আর আমার মনে সেই সমালোচকই বড় সমালোচক যাঁর মনটা তরল। যাঁর মনটা গলা ইস্পাতের মত ঢল ঢলে। যে কোন মূর্ত্তি তা থেকে গড়ন করতে পারা যায়। ভাবের তরলতার মাপকাটিতে ও সমালোচকদিগকে যাচাই করা উচিত। যাঁর ভাব পাথরে খোদার মত দৃঢ় অপরিবর্ত্তনীয়, তাঁর কাছ থেকে ভাল সমালোচনা আশা করা যায় না। সমালোচকের কাজই হইতেছে লেখকের লেখা পড়িয়া তাঁর মতটা, তাঁর ভাবটা যদি বিচারসহ হয়, তাহা হইলে অকুণ্ঠচিত্তে তাহা গ্রহণ করা—জগতে লেখক-প্রচারিত সত্যের ঘোষণা করা। জগতে ভাব ছাড়া কিছু থাকে না। ভাষার নিয়তই পরিবর্ত্তন হয়। ভাব চিরন্তন। ভাবের ধারা যে বদলাইয়া যায় না তাহা বলি না, পুরাতন ভাব-ধারার মরাগাঙে, বান আসে সত্য কিন্তু নূতন ভাব, পুরাতন ভাবকে আপনার করিয়া তবে দাঁড়াইতে পারে। জগতে ভাবের বিদ্রোহ যে হয় না, বা

হয় নাই তাহা বলি না, তবে অধিকাংশ স্থলে যাহা হয় তাহাই বলিলাম। ভগীরথের ন্যায় ভাবের নব-গঙ্গা মনীষী, ব্যতীত কেহই আনিতে পারে না। মনীষীরা ভাবের অগ্রদূত। তাঁহাদের ভাব-ধারার সহিত পরিচিত হইতে হইলে শ্রদ্ধার সহিত বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। সাধনায় সমাহিত হইয়া লেখকের নূতন ভাব সকলকে আয়ত্ত করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম লেখকের প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে প্রকৃত সমালোচনা হইতে পারে না। অবশ্য যদি বিচার বুদ্ধি, বিবেক বলে—নূতন ভাবকে গ্রহণ করা সমীচীন নয় বলিয়া নির্ভীক সত্যসন্ধ সমালোচক মনে করেন—যদি তিনি মনে করেন সাহিত্য ও সমাজের ঐ ভাব চলা উচিত নয়, তাহা হইলে সেই ভাবকে দূর করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা করা উচিত। কর্ত্তব্য ও অনুরোধে সংঘর্ষে দাঁড়ান উচিত।

রুগ্ন ও অসুস্থ শরীরে কোন কিছুরই সমালোচনা করা উচিত নয়। বদ-মেজাজী লোক কখনও ভাল সমালোচক হইতে পারে না। ধীর শান্ত সমাহিত ভাবে আলোচনা না করিতে পারিলে প্রকৃত সমালোচনা হইতে পারে না। তিনিই প্রকৃত সমালোচক হইবার উপযুক্ত পাত্র যিনি সর্ব্বদাই সংযতবদনে থাকেন—যাহার শরীর ও মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার বা জড়তার জন্য যাহার ভাব বা চিন্তা পঙ্গু নয়, যাহার স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় মনে সংসারের ছবি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়—যাহার মনে বিদ্বেষ বা শত্রুতা স্থান পায় না—যাহার চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া বাহিরের অনুভূতি লইবার জন্য ব্যগ্র, তিনিই প্রকৃত সমালোচক হইবার উপযুক্ত পাত্র।

সমালোচনার ভিতর বিদ্বেষ থাকা কোন মতেই ভাল নয়। অপরের মনে অযথা কষ্ট দেওয়া সমালোচকের কাজ নয়। মনে রাখা উচিত ভুল

ভ্রান্তি মানবেরই হইয়া থাকে। জ্ঞানকৃত ভুলের জন্য সাজা হইতে পারে; কিন্তু শাস্তির বিধান এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সে ব্যক্তি আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া আপনাকে সংশোধন করিতে পারে। নির্ম্মমভাবে সমালোচনা করিলে সে সমালোচনার কোন ফল পাওয়া যায় না। ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে justice tampred with mercy সমালোচনায় এই পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া উচিত। সমালোচকের রায়ে দয়ার পরিচয় যেন দেখিতে পাওয়া যায়। সমালোচকের দায়িত্ব গুরুতর বলিয়া তাঁহার রায়ে সত্যের সহিত সহানুভূতি আমরা দেখিতে চাই। প্রতিষ্ঠা ও যশ অর্জ্জনের দিকে সমালোচকের লক্ষ্য রাখা উচিত নয়—কর্ত্তব্যের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহার মনে রাখা উচিত মানবের ভ্রান্ত ধারণা দূর করা তাহার জীবনের উদ্দেশ্য—মতের আলোচনা না হইলে সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব। সাধারণের রুচির পরিবর্ত্তন প্রকৃত সমালোচক যত সহজে করিতে পারেন অপর কেহ তাহা পারেন না। গুণ ও গুণীর পরিচয় করাইয়া দিতে সমালোচকের যত্নবান হওয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। মুক্তকণ্ঠে গুণীর সুখ্যাতি করা উচিত, এখানে ভাষার কৃপণতা করিলে তাহার প্রত্যবায় থাকিবে। নগণ্য লেখকের গুণের পরিচয় পাইলে সমালোচক যদি তাহার গুণ ব্যাখান করিতে কৃপণতা না করেন, তাহা হইলে কালে সেই লেখক সাধনা বলে জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিতে পারে। সমালোচকদের দোষে কত শিল্পীর শিল্প-সাধনা যে অকালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না—কত না শিল্পীর মানসকুসুম তাহাদের সহমর্ম্মিতার বারি সেচনের অভাবে শুকাইয়া গিয়াছে কে তাহার সংখ্যা গণনা করিবে? তাই বলিতেছিলাম সমালোচকদের প্রধান গুণ থাকা চাই সহমর্ম্মিতা। মর্ম্মে মর্ম্মে লেখকের ভাবকে অনুভব করা চাই—আর ভাষায় প্রকাশ করা চাই তাহার বিশেষত্ব কোথায়। দোষ যাহাতে সংশোধিত হয়, তাহার জন্য দোষটা দেখান উচিত বটে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে গুণের আদর করা চাই। অগ্রে গুণ বিচার করিয়া পরে দোষ কীর্ত্তন করা ভাল।

আজকাল কোন কোন সমালোচক নূতন লেখকদের প্রতি অযথা সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। তরুণ মতি লেখকের লেখার দোষ অনেক আছে, কিন্তু এটা কি মনে রাখা উচিত নয় যে, জলে না নামিলে সাঁতার কি করিয়া শিখিতে পারা যায়? লিখিতে লিখিতে ভাষায় দোষ সংশোধিত হইতে পারে—ভাবের পারম্পর্য্য রক্ষিত হইবে। প্রথমেই তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করা কোন মতে উচিত নয়। আমার মনে হয় সমালোচকদের ইহা অবশ্য করণীয় যে যেখানে লেখকের বা শিল্পীর শক্তির সামান্য মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে উৎসাহের বারিসেচনে সে শক্তি-বীজকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখা। অনাবৃত বা অপরিস্ফুট প্রতিভার বিকাশের সহায়ক হওয়া সমালোচকের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যদি সে বীজের জনন-শক্তি না থাকে তাহা হইলে তাহা ফল দিতে পারিবে না। এরূপ করিলে সাহিত্যে ক্ষতি কিছু হইবে না; কিন্তু উৎসাহের ফলে লেখকের মনে সাধনার পথে অগ্রসর হইবার বাসনা জাগিয়া উঠিবে। সংযে উৎসাহ পাইয়া অনেক লেখক যে সৎসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন তাহার নিদর্শনও সাহিত্যে অনেক আছে।

আর একটা অতীব প্রয়োজনীয় কথা বলিতে চাই। সমালোচকের হৃদয়-তন্ত্রীর সহিত প্রকৃতির সংযোগ যেন থাকে। প্রকৃতির সুখে দুঃখে—প্রকৃতির সহিত সহমর্ম্ম হইয়া সমালোচক ও যেন সুখী হাসী দুঃখী হ'ন। প্রকৃতির সহিত হাত ধরিয়া না চলিতে পারিলে মনীষীদের প্রতিভার আলোচনা

করা কোন সমালোচকের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। মনীষীদের প্রকৃতিই শিক্ষাদাতা। প্রকৃতির অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া মনীষী যে বড় বড় লোকেরা যে সকল সত্যে উপনীত হইয়াছেন, প্রকৃতির সহিত পরিচয় না থাকিলে—সে সকল সত্যের সন্ধান কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? প্রকৃতির সহিত সহমর্ম্মী না হইলে উচ্চগ্রামে উঠিতে পারা যায় না। কবির ন্যায় অনুভূতিও আসিতে পারে না—চিত্রকরের সুন্দর চিত্রের মাধুর্য্যও উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সাধারণ মানবের সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষাদির প্রকৃত অনুভূতিও করা যায় না, কারণ মানব ত প্রকৃতির বাহিরে নয়। দুর্ব্বল মানবের দুর্ব্বলতা বুঝিতে—পাপপ্রবণ মানবের প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিতে তখন বিলম্ব হয় না। মানবকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া তাহার ভুল ভ্রান্তির জন্য অনুকম্পা আসিয়া থাকে। সহাই Jennings সাহেব বলিয়াছেন, "One touch of Nature makes the critic kin with those great authors and artists who have gone to Nature herself for their inspiration. Without that touch he can never fathom the fulness of their meaning, and his words are but as the sounding brass and tinkling cymbal," প্রকৃতির সোণার কাটির মোহনস্পর্শে সমালোচক, প্রসিদ্ধ লেখক ও চিত্রকরের সমধর্ম্মাভুক্ত হন; কারণ সৃষ্টি রহস্য ও উদ্ভাবনী কৌশল প্রকৃতিই তাঁহাদিগকে শিখাইয়াছেন। প্রকৃতির সে কৌশল বুঝিতে না পারিলে মনীষীদিগকে বুঝা অসম্ভব। আর যে সমালোচক তাহা বুঝিতে পারেন তিনিই স্রষ্টাকে বুঝাইবার ক্ষমতা ধরেন। সকল সমালোচক তাহা পারে না। প্রকৃত সমালোচক ও লেখক, চিত্রকর বা কবিবিদের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না। সমালোচক প্রসিদ্ধ লেখকদের ভাষ্যকার ব্যাখ্যাতা মাত্র। তবে একথা না বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, সময়ে সময়ে সমালোচকেরাও নূতন ভাবের প্রেরণা দিয়া লেখকের মনীষাকে উজ্জীবিত করিয়া দেন—ভাবকে স্ফুটতর সহজ বোধ্য করিয়া দেন। সমালোচক যে ভাবের প্রচারক তাহাতে ত সন্দেহ করিবার কিছু নাই। আবার স্থলবিশেষে ভাবের নূতন আলোক সম্পাতে জগতের অনুশীলন Culture এর সহায়তা যে সমালোচকেরা কত করিয়াছেন ইতিহাস পাঠকের নিকট তাহা অপরিজ্ঞাত নয়। সহমর্ম্মী সংযমী ও পণ্ডিত সমালোচক জগতের যে প্রকৃত উপকার করিতে পারেন তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। যাহারা কালিকলমের ব্যবহার করে থাকেন তাঁহাদেরই সংযম গুণটী পাওয়া খুব দরকার।

এ সম্বন্ধে ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সুপ্রসিদ্ধ "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় 'সমালোচনা ও সমালোচক' প্রবন্ধে আমি এবিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান আলোচনা শেষ করিলাম:—প্রকৃত সমালোচকের কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা—অন্ততঃ সৃষ্টি করিবার শক্তি না থাকিলেও যাহাতে সকলে লেখকের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকা উচিত। সৌন্দর্য্যানুভূতির উদ্রেক করাই সমালোচকের প্রধান কর্ত্তব্য। কোনও লেখকের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বা বিরাগ থাকা উচিত নয়। রাগ দ্বেষ, হিংসা বা কোনরূপ অনুভূতি লইয়া সমালোচকের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কলা-সমালোচকের (art-critic) কার্য্য সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলাই তাহার কার্য্য। তাঁহার অনুশীলন ফলে যাহাতে লেখকের সৌন্দর্য্য সন্ধানের চক্ষে প্রতিফলিত হয় সে দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আলোচ্য বিষয়ে তাঁহার সাধারণ জ্ঞান প্রখর থাকা দরকার। সমালোচকের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে তিনি বিচারক। ন্যায়পরায়ণ বিচারক কোন পক্ষের

অর্থগ্রাহী ব্যবহারজীবী নন, সে কথাটাও তাঁহার ভুলিলে চলিবে না। বাস্তবিক ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা বিচারকের যেমন একমাত্র কর্ত্তব্য, সত্যের অনুরোধে লেখকের গুণানুবাদ করাও তেমনই সমালোচকের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত হিসাবে লোককে তিনি পছন্দ না করিতে পারেন, সমালোচকের দায়িত্বপূর্ণ অধিকার গ্রহণ করিলে তাঁহাকে লেখকের রচনার উপর আলোচনা করিতে হইবে—তাঁহার বক্তব্যের ভিতর দিয়া রসের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে কি না দেখাইতে হইবে—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে লেখকের ব্যক্তিত্বকে না ভুলিলে সমালোচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। মনে রাখা উচিত সমালোচনা লেখকের নয়—লেখার।

অপর দিকে সমালোচককেও আপনার ব্যক্তিত্ব হারাইতে হইবে—ভুলিতে হইবে তিনি সমাজ বা কোন সাহিত্যিক দলের নন। বিচার বুদ্ধিবলে লেখার বিশ্লেষণ করিয়া সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লেখকের সৃষ্ট রস হইতে সাধারণে যাহাতে আনন্দ (ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা) লাভ করিতে পারে তাহার জন্য যিনি আলোচনা করেন তিনিই প্রকৃত সমালোচক।"

রোগী ও ব্যাধি

(শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত)

রোগী কহে ব্যাধিগুলো মরণের আগে
প্রহরীর মত কেন কাছে মোর জাগে?
সুস্থেতে মরিতে চাহি যাক্ দূরে সরে,
ব্যাধি কহে, "যাবে তুমি দেবতার ঘরে
শুচি হয়ে যেতে হবে, আমার যন্ত্রণা
ভেঙ্গে দেয় ইন্দ্রিয়ের বলুষ কামনা,
স্নাতপুত ভক্ত সম দেবতার ঘরে,
নিয়ে যাব তোমা সপি শমনের করে।"

তুমি

(শ্রীমতী লতিকা রাণী)

তুমি সুন্দর শান্ত মধুর উজ্জ্বল ভবপতি,
তুমি আদিত্য চির-সুন্দর পুরুষ প্রধান জ্যোতিঃ।
তুমি ত' কার্য্য তুমি হে কারণ, জীবন মরণ তুমি;
তুমিই সসীম তুমি সীমাহীন তুমি অণু ব্যোম ভূমি।
তুমি ত' বিধাতা ধ্রুব-মঙ্গল তুমি ভয়-ভয়হারী,
তুমি হে নূতন তুমি পুরাতন, তুমি নর তুমি নারী।
তুমি তোমাময় সৃজন প্রলয় ভাঙ্গা গড়া তুমি সবে,
তোমাগত প্রাণ কেন ভগবান আমার নাহিক হবে?

বরুণ-উৎসবে

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

আজ বরুণের আসর মাঝে, বাদল-মেঘে মৃদং বাজে,
ধারার চপল তারে তারে বাতাস বাজায় বেয়ালা,—
নদীর গায়ে কাজল গোলা, অধীর জলের বিউনি খোলা,
ঢেউ-শিশুরা দিচ্ছে তালি,—জেগেই করে বেয়ালা!
আজ আঁখি যে রূপের বণিক, মেঠো-পথের উতল পথিক,
বনের মর্ম্ম চুলচে কেঁপে মর্ম্মরিত মল্লারে,
হঠাৎ যেথায় থাম্‌কা রেগে, ঝোড়ো-হাওয়ার দম্‌কা জেগে
তাল-তমালে বেতাল মাতাল তুলচে তুমুল হল্লা রে!
বাজের রাজা ঝল্‌কা হেনে, দিচ্ছে আগুন-কল্‌কা টেনে,
চম্‌কে ঝরে পল্‌কা ডালে ত্রস্ত কুসুম-বধূরা,
কোমল-কড়ি'র হচ্ছে খেলা, সুর-বেসুরে জম্‌চে মেলা,
আজ প্রকৃতি কতক কঠিন, কতক মৃদু-মধুরা!

• • • • •

মাঠের ধারের ঘরখানিতে, ব'সে আছি জান্‌লাটিতে,
জাগ্‌চে কতই ভাব্‌না চিতে, এই বিজনে একাকী!
ভাবের ঘরে যাচ্ছে দেখা, কল্পনারি চিত্র-রেখা,
জলের ছাঁটের আল্পনা যা'—সে-সব চলে লেখা কি?
এই বুঝাই এম্‌নি ক'রে, জন্ম যুগের সেতু ধ'রে,
ভুবন-ভবন ভ'রে এসে ফিরে চ'লে গিয়েছে!
আজ বাদলে আমারো প্রাণ, যে রূপ-ধারা করচে সো পান,
শিলা-যুগের আদিম মানুষ সেই মধুই তো পিয়েছে!
পুঞ্জ-মেঘের পার্ব্বনীতে, সেই সেকালেও এই ক্ষিতিতে,
কুঞ্জবনের শ্যাম-মুকুটে নাম্‌ত যখন যামিনী,
ব্যথা-ব্যথায় মর্ম্ম ভ'রে, কাঁদ্‌ত ভিজে অশ্রু-লোরে,
একলা-ঘরে কোন্ সে অচিন্ বিরহিনী কামিনী!

• • • • •

"না-জানি কোন্ গহন-বনে, যুঝ্‌চে দানব-পশুর সনে,
সঙ্গীহারা মনের মানুষ লগুড়-হাতে,—বীর যে সে!
না-জানি কোন্ তেপান্তরে, নীল-সাগরের দ্বীপান্তরে,
না-জানি কোন্ কাঁটার ঝোপে—কেমন ক'রে ফির্‌বে সে!"

আমরা ইটের ঘরের দ্বারে, থাকৃত তারা ওধার ধারে,
মোদের গায়ে শাল-দোশালা—তাদের পশু-চর্ম্ম গো!
কেবল, মোরা বল্‌চি যেমন, বল্‌তনাকো তারা এমন,
"বর্ষেরি বিপুল প্রকাশ—জড় প্রকৃতির ধর্ম্ম গো!"
দেখ্‌ত তারা এই প্রকৃতি, বিশ্ব দেবীর প্রতিকৃতি
গন্ধ-ধ্বনি-স্পর্শময়ী শক্তিরূপা জননী!
বিদ্যুতে তাঁর ক্রোধের অনল, বৃষ্টি সে তাঁর নেত্রেরি জল,
ভাব্‌ত তারা, জলদ-পুরে জাগেন দানব-হননী!

• • • • •

তারপরেতে লাখ্ বরষা বহ্‌লে ধরা শ্যাম-সরসা,
নয়তো তবু এই প্রকৃতি গদ্যময়ী—কবিরা!
মেঘচ্ছায়া ঘনিয়ে বুকে, স্তোত্র রচি দিলেন সুখে
কালিদাস আর জয়দেব আর বিদ্যাপতি কবিরা।
সেদিনেও তো ঐ বরষণ, আন্‌ত কোমল কবির স্বপন,
জাগিয়ে দিত দেবার ঘুমে,—বৃন্দাবনের যমুনা।
বর্ষা-কবি কুঞ্জেতে হায়, পথিতেরা খুঁজে বেড়ায়,
এখন কেবল ভূগোল এবং প্রশ্ন তত্ত্বের নমুনা!
বৈজ্ঞানিকের হাতের ফাঁসী, পেলাকেও বল্‌লে দাসী,
মুক্ত ব্যোমের পাগ্‌লা ঝোড়ো দেয় পাঠিয়ে প্রণামী,
মেঘদূতের ঐ চাদর খুঁড়ে, কলের বিমান যাচ্ছে উড়ে,
বৃষ্টিধারাপুষ্ট প্রপাত করচে নরে গোলামী।

• • • • •

হে বিচিত্রা! হে বরষা! আছে তবু এই ভরসা
দুই-চারিটি বাউল কবি আজও তোমায় ভোলে-নি,
মেঘ-ডমরুর গভীর রোলে, চিত্ত-দোলা দোদুল দোলে,
আজও তাদের ভাবের ফাল্গুন কলের ধোঁয়ায় ফোলে-নি!
আজও তারা কাগিস্ পাহাড়, তোমার সজল নাট্যশালায়,
আজও তারা গিরি দাঁড়ায় ভুলে কাজের তাড়া রে!
তায় নিয়ে তোর রূপ-মাধুরী, বৃষ্টি-ঝরা তুই আদুরী,
ঐ দাদুরীর মেঘ্‌লা গানে পাই যেন তোর সাড়া রে!
শুরু শুরু বাজুক্ দেখা, দুরু দুরু কাঁপুক্ কেয়া,
ঝুরু ঝুরু ঝরিতা হাওয়া বহুক্ বাদল-জড়িতা—
চিক্‌মিকে আন্ জলের মালা—যেন হীরে-মণি তা!

জুই-কামিনী কোথায় ফোটে, কদম কোথায় পিটিয়ে ওঠে,
জুই-চাঁপা সে রয়না চাপা, দোলে কমল জলে কই!
দাও আগুনের সাপ খেলিয়ে, মেঘ-পাহাড়ের তলে ঐ!
মত্ত কেকার জ্যান্ত বাঁশী, শুন্‌লে যে প্রাণ হয় উদাসী,
বন পেরিয়ে মন ছুটে যায়,—যেন আকুল হরিণী,
বর্ষা লো তুই কবির সখী,—তোমায় তুচ্ছ করি-নি!
ভিজে মাটির গন্ধ আনো, শোনাও যত ছন্দ জানো,
ঘোরাও ধারা-ময় ঘোরাও ধরার ধারা-শ্রাবণে,
যাক্ বসুধার বুক ভেসে যাক্ স্নিগ্ধ প্রেমের প্লাবনে।

একটি সত্যিকারের রূপকথা

(শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়)

ছেলে জন্মাল, মা-বাপের মনে আনন্দ আর ধরে না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ছেলের মাথায় মগজের বদলে চেলা চেলা সোনা ভর্ত্তি। মাথাটাও ছিল তার দেহের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়, তাই ডাক্তার বদ্যি বল্লে এ ছেলে বাঁচবে না, বাঁচতে পারে না। ডাক্তার-বদ্যির চরম-বাণী উপেক্ষা করেও ছেলেটি বেঁচে রইল, শুধু বাঁচা নয়, শুক্লপক্ষের চাঁদের মত দিন দিন সে মা-বাপের আদর সোহাগে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু অতি বৃহৎ মস্তিষ্ক নিয়ে বেচারা সময় সময় ভারী মুস্‌কিলে পড়ে যেত। অতটুকু দেহ অতবড় মাথা বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারবে কেন, তাই সময় সময় পড়ে গিয়ে এমনি ধারা আঘাত পেত যে, মায়ের প্রাণ ভারী উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠত। একদিন বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে এসে পড়ল। ফলে তার কপালের একপাশে এমন চোট লাগল যে, অনেকটা জায়গা একেবারে ফাঁক হয়ে গেল। সকলেই মনে করলে, সে আর বেঁচে নেই, কিন্তু মা যখন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে ঘাট ঘাট করে তাকে কোলে তুলে নিলেন, তখন দেখা গেল, ফাটাস দিয়ে রক্তের সঙ্গে দু'তিন ছোঁটা গলা সোনা চুইয়ে পড়ছে। এর থেকেই মা-বাপ জানতে পারলেন তাঁদের এ খোকাটি কোন কথা-তেই "সোনার চাঁদ" নয়, আর অতবড় মাথাটার মধ্যে সত্যিই অনেকখানি সোনা আছে—মগজের বদলে।

বলা বাহুল্য, কথাটা তাঁরা প্রাণপণে গোপনেই রাখলেন। বেচারা ছেলেটিও অবশ্য জানতে পেলে না যে, সে অতবড় একটা সম্পদের অধিকারী। আস্তে আস্তে সে হাঁটতে শিখলে, কথাবার্ত্তাও সে দিব্য বলতে পারে।

একদিন ছেলে তার মাকে শুধালে, "আমায় কেন তুমি বাইরের ছেলেদের সাথে খেলাধুলো করতে দাও না, মা?"

মা জবাব দিলেন, "সোনা আমার, মাণিক আমার, তারা তোমায় চুরী করে নিয়ে যাবে যে!"

তারা তাকে চুরী করে নিবে, এই ভয় দেখিয়ে তাঁরা তাকে আপনাদের আঙিনাতেই ঠেকিয়ে

রাখলেন। তখন থেকে ঘরের মধ্যে সে একাই নিজের সঙ্গে খেলা করত, বাইরে যাওয়ার আব্দারও আর কখনো করত না।

ক্রমে সে বড় হয়ে উঠল। তার যখন আঠার বছর বয়েস তখন তাঁরা তাকে জানান যে, ঈশ্বর তাকে কি অসীম সম্পদের অধিকারী করেই না দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আঠার বৎসর কাল তাঁরা তাকে কত না কষ্ট, কত না বেদনাগুমরমর্ম দিয়ে লালন পালন করে আসছেন, তাই আজকে তাঁরা তার কাছে খানিকটা মগজের দাবী করলেন। ছেলে এইটুকু ইতস্তত না করে ওফুনি মাথার খুলি ভেঙে খানিকটা সোনার চেলা বার করে মায়ের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিলে। আর সেই মুহূর্ত্তেই তার মনে হল, দুনিয়ায় তার মত সম্পদশালী আর কে আছে? তাই আপনার ধনমদে বেচারার মাথা ঠিক রাখা সম্ভব হল না। একদিন সে মা-বাপকে কিছু না বলে আপনার মনে সংসারের উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়াল।

স্রোতস্বিনীর বাঁধ ভেঙে দিয়ে যেমন তীব্র বেগে জল বইতে থাকে, তেমনি জীবনের আঠারটি বছর মা-বাপের চোখের আড়ালে যে ছেলে বেড়ে উঠেছে, সে একদিন সহসা ছাড়া পেয়ে দুনিয়ার উদার খোলা আকাশের তলে এসে দাঁড়াল, যে ছেলে আপন জন্মপল্লী ছেড়ে শান্তিনিকেতনেও কোনদিন বড় একটা যেতে পায় নি, সে যখন একেবারে শহরের সকল বিলাস ব্যসনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল তখন যে তার দেহে মনে একটু পরিবর্ত্তন এসে যাবে—তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অর্থের অভাব নেই, হিসেব নিকেসেরও ভাবনা নেই, খোলামকুচির মত সে আপনার খেয়ালমাফিক ব্যয়বাহুল্য বাড়িয়েই চল, সে যেন কোন বাদশাহজাদা বা নবাবপুত্র! ফলে মস্তিষ্কের যেরূপ অপব্যবহার হতে লাগল তাতে তাকে মনে হওয়া অসঙ্গত হবে না যে, তার মাথার সোনার খনিটি যেন কোন কালেই নিঃশেষ হবে না, হতে পারে না। কিন্তু কথায় আছে, ছিদ্রকে দিয়ে যেতে খরচ করলে রাজার গোলাও শেষ হয়ে যায়, তা তার মাথার খনি নিঃশেষ হবে তাতে আর বিচিত্রতা কি!

ক্রমে তার চোখ দুটো কোটরে সেঁধিয়ে গেল দুই নিষ্প্রভ হয়ে এল, গাল ভেঙে গেল। একদিন সারারাত উদ্দাম চাঞ্চল্যের পর অভিনয় শেষের রঙ্গমঞ্চের মত, তৈলহীন দীপশিখার মত সে হতভাগ্য যুবক অবসন্ন দেহ মন নিয়ে ঘরের এককোণে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে রইল।

হঠাৎ তার মনে হল, এমনি অবসাদগ্রস্ত রোগীর মত বসে থাকলে তো তার চলবে না, তাকে খাটতে হবে, খেটে খেতে হবে। কেন না সঞ্চিত ধনাগার তো প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, যক্ষের মত তখন সে তার সোনার খনিটিকে আগলে রাখবে। যে করেই হোক আপনার জীবিকা তাকে নিজেই অর্জ্জন করতে হবে। তাই সব ভুলে সে কাজে লেগে গেল। খনি আর সে কোন কারণেই ছুঁইবে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তার প্রাণের বন্ধু তার এ গোপন ধনাগারের সন্ধানটি যে জানত একথা সে কোন দিনই মনেও ভাবতে পারে নি। একদিন সে গভীর রাত্তিরে আপনার বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, এমন সময় বন্ধুবর তার পা টিপে টিপে চোরের মত ঘরে ঢুকল। হঠাৎ মাথায় এক বিষম আঘাত পেয়ে সে যখন জেগে উঠল তখন বেশতে পেলে বন্ধুবর তার, কি একটা জিনিষ তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে ঘরের বার হয়ে গেল।

তার মাথার খনি থেকে আর এক টুক্‌রা মগজ বন্ধুবরের কবলে চলে গেল!

কিছুদিন যায়, বেচারা একদিন কথা নেই, বার্ত্তা নেই, এক বালিকা বধূকে বরণ করে ঘরে নিয়ে এল। খুব সুন্দরী কিশোরী তার বধূ, সকল প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে সে তাকে ভালো বাসে। বধূও তাকে ভালোবাসে। তার অর্থের অভাব

ছিল না, আর কাজেই সে আপন ইচ্ছা মত বধূকে সাজায়, বধূর শত আব্দার সানন্দে তামিল করে। না-চাইতেই কত সুন্দর সুন্দর সব বিলাস সামগ্রীতে বধূর ঘর ভরে গেল।

বধূর নিত্যনতুন আব্দারের শেষ ছিল না, বেচারীও প্রাণপণে সে আব্দারের খরচ জোগায়। বধূর প্রাণে আঘাত লাগবে ভয়ে কোথা থেকে কি উপায়ে সে অর্থ আহরণ করে, কোনদিনও তা বুঝ ফুটে বলতে পারে নি।

বধূ বলে, "তাঁর দয়ায় আমাদের তো কিছুরই অভাব নেই, তোমার আয়ও তো প্রচুর!"

বেচারা জবাব দেয়, "তা বই কি, কেন তোমার কি চাই?" বলেই প্রেমবিহ্বল চোখে সে তরুণী বধূর দিকে চেয়ে হেসে ফেলে। সে জানেও না যে, এই প্রিয়তমাই তার মগজ তিল তিল করে গ্রাস করছে! তবু এক এক সময় তার মনে ভয় হত, না এবার থেকে একটু বুঝে চলতে হবে, এভাবে অনিয়মিত ব্যয় করা তো আর চলবে না। হাত এবার থেকে গুটোতে হবে, আয় ঠিক সেই সবই হয় তো তরুণী স্ত্রী হাসতে হাসতে মৃদাবাদ্যছন্দে স্বামীর সুমুখে এসে দাঁড়াত।

—ওগো শুনছো, ওরের বাড়ীর ছোট বোয়ের গলায় সুন্দর একটি হার দেখে এলুম। কেমন সুন্দর নতুন তার গড়ন আর পাথরগুলি কেমন ঝক্ ঝক্ করছে। দামও নাকি খুব বেশী নয়। হাজার দশেক হবে। একবার দেখবে?"

—তার জন্যে কি। আজই পাবে। যথা সময়ে বধূর গলায় সে হার এনে ঝুলিয়ে দিয়ে পরম গৌরবে আত্মপ্রসাদে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠত।

এমনি করে তাদের জীবনের আরো ক'টি বছর দিবা আরামে একটা সুখ স্বপ্নের মত কেটে গেল, একদিন বেচারা দেখতে পেলে তার প্রিয়তমার দেহ হিম শীতল, অসাড়। স্বর্গের দেবী ফাঁকি দিয়ে কোন্ মুহূর্ত্তে তার বুক খালি করে কোন্ এক অজ্ঞাত পথে মহাযাত্রা করেছে। তার ধনাগারে খুব সামান্য ধনই তখন সঞ্চিত ছিল। কিন্তু তা হলে কি হয়, সমাজে যার অত প্রতিষ্ঠা, তার স্ত্রীর সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি তো আর সাধারণ লোকের অবস্থার অনুযায়ী হলে চলবে না। মোণে মোণে চন্দন কাঠ ও ঘি, শ্মশানে মহুয়ার হল আর তারই সঙ্গে তার জীবন সঙ্গিনীর ফুলের মত কোমলখানি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যথাসময়ে যুথধামের সঙ্গে শ্রাদ্ধও হয়ে গেল। খুরুত, ধোপা, নাপিত—কেউ বাদ গেল না। শ্রিয়ার অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে, পণ্ডিতদের এ পার্শ্বে বচন শুনে সে দু'হাতে দানধ্যান শেষ করলে, আহারের ব্যাপারও কম ছিল না।

খুব ঘটা আর যুথধামের সঙ্গে কাজ সারা হয়ে গেল। তখন দেহমন তার একান্ত অবসন্ন, মাথা যেন একেবারে খালি—একেবারে খাঁ খাঁ করছে, কেবল মাথার খুলির এককোণে দেখোণে এক আধকণা তখনো পড়ে রয়েছে, পথ বেয়ে চলেছে সে, রুক্ষ কেশ, উল্কাবের মত উদাস চাউনি দেখে মনে হয় যেন অনেক কাল ধরে সে ক্রমাগত সুরাপান করেছে, এই মাত্র উলতে উলতে উঠে এসেছে।

গঙ্গা স্নান শেষ করে সে যখন বাড়ীর দিকে ফিরছে তখন আগত সন্ধ্যা। রাজপথের দুধারে আলোগুলি জ্বালানো হয়েছে, দোকানের বাতি গুলির অর্দ্ধমুক্ত আলোয় আলোকিত রাজপথের সৌন্দর্য্য আরো বাড়িয়েছে। ঘরমুখী জনতা আপন মনে চলেছে—নীরবে। উদ্‌ভ্রান্তের মত আপনার মনে রাস্তা চলছিল, হঠাৎ এক মণিকারের দোকানের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল, দেখল স্তরে স্তরে কত অলঙ্কার পত্র সাজান রয়েছে। অপলক চোখে সে চেয়ে রইল। তার গৃহলক্ষ্মী যে তার ঘর আঁধার করে চলে গেছে, একথা তার তখন মনেই ছিল না। সে আপনার মনে হেসে বলে উঠল, "বাঃ কেমন সুন্দর জিনিষগুলি! এগুলি

পেলে কত সুখী হত সে?" তখন সে ওড়নি কেনবার জন্যে দোকানে প্রবেশ করল।

দোকানের একপাশে দোকানের কর্ত্রী বসেছিল। হঠাৎ চীৎকার শুনে সে কোরের দিকে চেয়ে দেখে, একটা লোক কাঁচের আলমারীর সামনে একহাতে আলমারীর তালাটা ধরে, অপর হাত সে দোকানীর দিকে বাড়িয়ে রিয়েছে, সে হাত রক্তমাখা, তাতে মার একটুকরা নোনা পড়ে আছে। লোকটা দোকানীকে বেধে হতভম্ব হয়ে তার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। *

* আরফেঁস বোয়েজ্যার অবলম্বনে

সূচনা ও সমাপ্তি

(শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,)

(১)

কালের করাল ভেরী উঠিল কি বাজি'
রুদ্র তালে নৃত্য করে উন্মত্তের দল,
নৈঋত ঈশান অগ্নি বায়ু কোণ আজি
রক্ত নেত্রে চাহে যেন দহিতে ভূতল;
প্রলয়-রজনী এল এ ধরণী মাঝে!
প্রচণ্ড ভৈরব রোলে ঝড়ের নর্ত্তন,
বিনাশিতে সৃষ্টি তাই একত্র বিরাজে
বিদ্যুতের তীব্র হাসি অশনি-গর্জ্জন;
ভীষণ বিষাণ কার উঠিল ফুকারি'
ঈশানের ভূত-প্রেত নন্দী-ভৃঙ্গী আদি
সংসা কি ছাড়া পেয়ে ছুটিল হুঙ্কারি'
আতঙ্কে শঙ্কিত বিশ্ব উঠিল নিনাদি;
গুরু গুরু গরজনে ভরিল গগন
কাঁপিল কুটীর সনে রাজ-সিংহাসন।

(২)

ঘুরিল কালের চক্র শুভ্র ব্যোম পথে
নিমেষে নয়নে ভাসে নব দৃশ্য-পট,
দীপ্তমুখে হিরণ্ময় সপ্ত অশ্ব রথে
গগন প্রাঙ্গনে রবি হইলা প্রকট;
কোথা গেল প্রলয়ের সেই সৃষ্টি—ঝড়;
সে অন্ধকারের আর মিলে না সন্ধান
বিধি কি ছিঁড়িয়া জীর্ণ সৃষ্টির নিগড়
নব উপাদানে বিশ্ব করিলা নির্ম্মাণ!
মনে হ'ল এ সুদিন রবে চিরদিন,
নবীন রবির আলো নিবিবে না আর,
র'বে সুখ, রবে শান্তি চির অন্তহীন
আশার সাগরে নিত্য বহিবে জোয়ার;
— অমনি কহিল বাণী অন্তর দেবতা
দিবসের পরে রাতি ভুলো না এ কথা।

সমালোচনা

(সত্যবান)

দিল্লীশ্বরী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক চিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রচারিত আটা-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অন্যতম গ্রন্থ। ইহাতে রাজিয়া নূরজাহানের চিত্র বিবৃত হইয়াছে। নিবেদনে শ্রীমান্ লিখিয়াছেন, 'যাহাতে ইতিহাসের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য ইতিহাসের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়াও রচনা যথাসম্ভব সরস করিবার চেষ্টা করিয়াছি।" আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, রচনা বেশ সরস হইয়াছে—ভাষার পরিপাটা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। সাধারণের বোধগম্য করিয়া লিখিতে হইলে যেরূপ ভাষা ব্যবহার করা উচিত, আমাদের মনে হয়, ঠিক তদনুরূপ ভাষাতেই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্র নাথ সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চরিত্র দুইটী বিবৃত করিয়াছেন। কল্পনার সাহায্যে মনোমদ চিত্র কোথাও অঙ্কিত করেন নাই। যথাযথ বাস্তব-চিত্রই তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। আজ কালকার ঐতিহাসিক গ্রন্থে 'সম্ভবতঃ', 'খুব সম্ভব,' 'বোধ হয়' এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, এ কথা বহুবার দেখিতে পাই। ইতিহাসে ওরূপ আনুমানিক কথা না থাকাই যুক্তিযুক্ত। আলোচ্য পুস্তকে ও রকমের কথা নাই, তবে দুই স্থলে পাদটীকায় ঐরূপ আছে যথা:—১০ পৃষ্ঠা 'সুতরাং সিংহাসন প্রাপ্তিকালে রাজিয়ার বয়স যে আনুন ২৫ এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।' ইহার পূর্ব্বেই যুক্তি বলে শ্রীমান্ প্রমাণ করিয়াছেন, 'সিংহাসন আরোহণকালে রাজিয়া বালিকা বা কিশোরী ছিলেন না—প্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন।' ইহার পর ওরূপ ফাঁকা কথা দিবার আবশ্যকতা কিছুমাত্র নাই। ৮০ পৃষ্ঠায় ব্রজেন্দ্র ভায়া লিখিয়াছেন, 'বাদশাহ জাহাঙ্গীর তখন লাহোর হইতে কাবুলের পথে—ঝিলম্ নদীর পূর্ব্বতীরে পট্টাবাসে।' পাদটীকায় লিখিয়াছেন, 'খুব সম্ভব গৌরাঙ্গবার নামক স্থানে।' এরূপ মনে করিবার কারণ তিনি দেন নাই; বা কোথা হইতে পাইলেন তাহাও উদ্ধৃত করেন নাই। ভাষার উচ্ছ্বাসের অতিশয়োক্তি ও দু একস্থলে আছে। একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—'রাজকার্য্যে মন দিবার অবসর তাঁহার (জাহাঙ্গীরের) অতি অল্প। কিন্তু মকনন্দিনী নূরজাহান্ শুধু প্রেমের বস্তুতন্ত্রতাহীন কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্য সম্রাটকে বরমালা অর্পণ করেন নাই ইত্যাদি' (৬৬ পৃষ্ঠা) আশা করি কালে এরূপ উচ্ছ্বাস থাকিবে না। চরিত্র দুইটী উপন্যাসের ন্যায় মনোরম—ঘটনাগুলিতে নাটকীয় বিশেষত্ব আছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠিতে পারা যায় না। রাজিয়া যে দৃঢ় হস্তে তিন বৎসর তিনমাস ছয় দিন দিল্লীশ্বরী হইয়া রাজত্ব করিয়াছিল,—স্বদেশে বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা কতকটা আনিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। 'চিরচরিত প্রথার বিরুদ্ধে—জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজের মজ্জাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে' তিনি অটলভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া অনেক শত্রু তাঁহার জুটিয়াছিল। বিদেশীয় চাকর জামাল্ উদ্দীনের প্রতি অধিক মাত্রায় অনুগ্রহ প্রকাশ করায়, তুর্কী আমির ওমরাহগণের বিষ নয়নে তিনি পড়িয়াছিলেন। সেই সকল আমিরগণের প্ররোচনায় তবরহিন্দার সামন্তরাজ প্রবল পরাক্রমশালী অল-

তুনিয়ার অধিনায়কত্বে স্মাজ্ঞী রাখিয়া বিদ্রোহী দমন করিতে গিয়া অতর্কিত অবস্থায় ধৃত হইয়া তবরহিন্দার দুর্গে বন্দী হন। এই যুদ্ধে দিল্লীশ্বরীর শরীর রক্ষা করিতে গিয়া হাবশী জমাল উদ্দীন প্রাণ বিসর্জ্জন করে। অল্‌তুনীয়া নিজ স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিশিয়া ছিলেন, কিন্তু যখন আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন—তখন রাজিয়ার অনুগ্রহের বিনিময়ে তিনি তাঁহাকে বন্দী করিয়া প্রকৃতই অনুতপ্ত হইলেন। গোপনে, কারাগারে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন—আর প্রস্তাব করেন তাঁহার হৃদয়ের বিনিময়ে তাঁহার পাণি-গ্রহণ। রাজিয়া দেখিলেন হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইবার এমন সুবিধা হওয়া আর সম্ভবপর নয়, তাই তিনি সম্মতি দিলেন; কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। বই আলের হিন্দু জমিদারগণের হস্তে বন্দী হইয়া রাজিয়া নিহত হন। বহু সদগুণে বিভূষিতা দিল্লী সম্রাজ্ঞী রমণীর অভাবনীয় পরিণাম দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না! কোন কোন লেখক রাজিয়ার চরিত্রে অযথা কলঙ্কারোপ করিয়াছেন। প্রাগুক্ত হাবশীর প্রতি 'অতিরিক্ত অনুগ্রহ' তিনি দেখাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ব্রজেন্দ্র ভায়ার কথায় বলি,—'রাজিয়ার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিবার মত কোন প্রমাণ ইতিহাসে নাই।' পুস্তকের নাম "দিল্লীশ্বরী" রাজিয়ার চরিত্র ব্যাখ্যানে অযথা হইয়াছে, কারণ দিল্লীর সিংহাসনে তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে আর কোন মুসলমান মহিলা বসিয়া রাজদণ্ড পরিচালন করেন নাই। নূরজাহানের অঙ্গুলী চালনায় জাহাঙ্গীর সকল কার্য্য করিতেন; তিনি ও তাঁহার শেষ জীবনে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই দিল্লীশ্বরী ছিলেন, সম্রাট্ জাহাঙ্গীর নামে মাত্র সম্রাট্ ছিলেন; এই অর্থে তাঁহাকেও দিল্লীশ্বরী বলিতে পারা যায়। এই বুদ্ধিমতী রমণী শিরোমণির চরিত্র কাহিনী ব্রজেন্দ্র ভায়া সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই উপাদেয় গ্রন্থের একটী প্রমাণপঞ্জী তিনি পুস্তকের পরিশেষে দিয়াছেন। পুস্তকগুলির কতটুকু প্রামাণ্য তাহাও তিনি আলোচনা করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্র নাথকে আমরা তাঁহার পরিশ্রম ও গবেষণার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।' তাঁহার সাধনা জয়যুক্ত হউক—তিনি ও ধরণীর দেবার নিমিত্ত থাকিয়া আমাদিগকে মূল্যবান মূল্যবান কথা শুনাইতে থাকুন।

সহচরী—উপন্যাস—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা; পৃষ্ঠা ১৭৮। উপন্যাসখানি লেখক মহাশয়ের অধুনা বিলুপ্ত "মায়ার শৃঙ্খল" গল্পের পরিণতি। উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। গল্পাংশ সংক্ষেপে এই :—মহিম বড় মানুষের মেয়ে প্রিয়বালাকে বিবাহ করিয়া, শ্বশুরের অর্থে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া ওকালতী পড়িতেছে। পরদুঃখকাতার তাহার প্রাণ ভাবুকতার দিকে ছুটিত না—বাস্তবের দিকে ছুটিত। মেসের আর পাঁচজন 'ভাবুকতা দিয়ে দিব্য একটা ভাব ভোর ভোর কুহেলিকাময় দেশমাতার এক রূপক মূর্ত্তি গড়ে পূজা করিত' তখন সে হাসিত। তার প্রাণটা কাঁদিত দেশের গরীব দুঃখীর দুঃখ দেখে। একদিন এক অসহায়া ব্রাহ্মণ কন্যা আসিয়া তাঁর অবিবাহিতা কন্যার বিবাহের জন্য তাহাকে ধরিয়া বসিল এবং কন্যাটীও দেখাইয়া দিল। রূপসী কন্যা দেখিয়া সে ভাবিল, অবিবাহিত কোন বন্ধুর সহিত বিবাহ দিতে পারিবে, কারণ তাহার দলের মধ্যে অনেকেই তখন 'পণ-নিবারণ' সভার সভ্য ও অবিবাহিত ছিল, কিন্তু কার্য্যকালে সে দেখিল মিথ্যার একটা অন্ধ হাতে সকলেই সরিয়া পড়িল। তখন অগত্যা 'জাতি রক্ষার' দায় থেকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে রক্ষা করিবার জন্য সে মামলাতাকে বিবাহ করিল। প্রিয়বালা সপত্নীর কথা শুনিয়াই স্বামী কি ক্ষেত্রে বিবাহ করিয়াছেন, কিংবা কি সর্ত্তে বিবাহ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বলিবার অবসর না দিয়া রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যান। কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া সেস্থান তাহার ভাল লাগিল না। সে স্বামীকে প্রকৃতই প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। মহিম যখন শ্বশুর বাড়ীতে আসিল, তখন আবার ছাড়ী হৃদয় মিলিল। এখন সে মনে করিল বাহিরে গিয়া স্বামীকে লইয়া ঘরকন্না করিতে পারিলে সপত্নীর হাত থেকে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে। ওদিকে নূতন বৌ অন্তঃস্বত্বা হইয়া মার কাছে চলিয়া যায়। কথাটা মহিমকে কেহ জানায় নাই। সে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল; কারণ ফুলশয্যার রাত্রি ভিন্ন, সে কোনদিন স্ত্রীগৃহবাস করে নাই। দুঃখিনীর মেয়ে প্রিয়বালা, বিবাহের সময় জাতি রক্ষা ভিন্ন অন্য কোনরূপ সর্ত্ত না থাকায়, কোনদিন স্বামীর সংসারে আপনার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে নাই। সে তাহার সপত্নীর সংসারে আগুন জ্বালাইতে চায় নাই। তারপর দুই বৎসর কাশীবাসে মহিম ও প্রিয়বালা সুখসচ্ছন্দে সংসার ধর্ম্ম চালাইতে লাগিল। সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে সপত্নীর সুলক্ষে দেখিয়া তাহার ভয় হইল পাছে স্বামী তাহার পর হইয়া যায়, তাই সে আবার দেশে ফিরিয়া আসিল। ইতিপূর্ব্বেই তাহার সপত্নী, মাতা ও পুত্র সহ শ্বশুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রিয়-বালার চেষ্টাতেই যে এতদিন মায়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই তাহা ধরা পড়িবার পর প্রিয়বালা উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। মহিম প্রিয়বালাকে লইয়া সংসার করিতে লাগিল। তার পর খোকা মোহন স্পর্শে প্রিয়বালার মোহ টুটিল। গেল—ভুল ভাঙ্গিয়া গেল, আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল—'ওরে তুই আমার মায়ার শৃঙ্খল! আমার বৈতরণীর সেতু! আমার স্বর্গের বাতি!'

পুস্তকখানির চরিত্রগুলি সজীব রক্ত মাংসে গঠিত দোষগুণে মানুষ। মানসিক ভাব বিশ্লেষণে গ্রন্থকার বড় কম কৃতিত্ব দেখান নাই। চরিত্র গুলির মধ্যে মায়া, মায়ার মা ও প্রিয়বালার চরিত্র অতীব সুন্দর হইয়াছে। মহিমের জ্যেঠাইমার ও শ্বশুরের চরিত্র দুএকটী রেখায় তিনি যেরূপ ফুটাইয়াছেন, তাহা সুদক্ষ শিল্পীর উপযুক্তই হইয়াছে। মহিমের মা ও বাপের চিত্র ভাল ফুটে নাই। মহিমের চরিত্র তত চিত্তাকর্ষক হয় নাই। তাহার দায়ে পড়িয়া বিবাহ কার্য্যে রাজী হওয়ায় তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব যেমন ফুটিয়াছে, 'জাত রক্ষা' করার অজুহাতে বিবাহিতা পত্নী মায়ার প্রতি কর্ত্তব্যে অবহেলা তার চেয়ে বেশী মাত্রায় তাহার চরিত্রে কালিমা লেপন করিয়াছে। তাহার জ্যেঠাইমা বিবাহিতা পত্নী মায়ার প্রতি তাহার যে কর্ত্তব্য আছে তাহা স্মরণ করাইয়া তাহার বিবেক বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইলেন না,—যখন শুনিলেন, "আমার কর্ত্তব্য বিধবার জাতিটী রক্ষা করা—এই পর্য্যন্ত"—তখন শুধু যে তিনিই বিস্মিত হইয়া গেলেন তাহা নয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও স্তম্ভিত হইয়া পড়ি! অর্থের কিংবা প্রথমপত্নী প্রিয়বালার প্রেম তাহাকে এতদূর চরিত্রহীন করিয়াছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। প্রিয়বালাকে বুঝাইতে গিয়া যে সে নির্দ্দোষ, মহিম বাড়ীর সকলকেই ভুলিয়া গেল—এমন কি মাকে বিজয়ার প্রণাম করিতেও সে শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করিয়া যখন নড়িল না; দ্বিতীয়া পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যের কথাও তার মনের মধ্যে একবারও উঁকি মারিল না—অধিক কি হিন্দু বিবাহকে চুক্তি বলিয়া মনে করিয়া, চুক্তির সর্ত্ত—জাতরক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া যখন সে আত্মপ্রসাদলাভ করিল, তখন তাহার প্রতি অনুকম্পা হয়। হায় ভ্রান্ত মহিম! দেবতা ও অগ্নির সমক্ষে একদিন তুমি যে মন্ত্র

পড়িয়াছিলে, তাহার কি কোন অর্থই নাই। সে কি কেবল নির্থক প্রলাপ বচন। তার শ্বশুর অমরেশবাবুর সহিত বলিতে হয়,—"আগে তার মধ্যে একটু তেজস্বিতা ছিল, তাই আমার তার প'রে শ্রদ্ধা ছিল! কিন্তু এমন দেখ্‌চি দিন দিন-বিল্‌কি-তায় আর মোহে তলিয়ে যাবার জন্যে অযোজনে মেতেছে।' তিনি 'তার মধ্যে আত্মমর্য্যাদার—আত্মসম্মানের ভাংটা ফিরে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।' প্রিয়ংবালার হাতেই খেলবার সামগ্রী হ'য়ে মহিম যে দাঁড়িয়েছিল, সেও পরে তা বুঝতে পেরেছিল—সে যে তাকে পঙ্গু করে রেখেছে সেটা স্পষ্ট করেই একদিন মহিম তাকে শুনিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে যে শেষ রক্ষা করতে পেরেছিল এইটাই ভাল।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে পুস্তক খানিতে বর্ণশুদ্ধি বড় বেশী। ভাষার দোষও অনেক আছে। দুএকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—'ম্লানিমা' 'ম্লানিমা' কথা দুইটী বহুবার দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯পৃষ্ঠা—'সাগর যে আগে হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া নদীবারার সঙ্গে ম্লানিমাকে (?) সমস্ত বেদনাবোধকে আপনার বিরাট প্রবাহার (?) মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া নিরুদ্দেশ রহস্যতীর্থের দিকে উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল' ইত্যাদি। ২১পৃষ্ঠা 'স্ত্রীর দিকে বিগলিত (?) এক চাহনি চাহিয়া'। ৩৩পৃষ্ঠা 'ম্লানিমা'র (?) উপর নারীত্বী বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মূক-মহিমা (?) যেন নীরবেই প্রকাশ করিয়াছিল ;" উদাহরণ আর অধিক দেখাইতে চাহি না, এদিকে গ্রন্থকারকে একটু অবহিত হইতে অনুরোধ করি। আর একটা কথা বলি, যাহার মুখে যে কথাটা বলিলে শোভা পায়—যাহাকে বলা হইতেছে তাহা তাহার নিকট দুর্ব্বোধ্য না হয়, সেরূপ-ভাবে কথোপকথন করা উচিত। ৫০ পৃষ্ঠায় নিরক্ষর সাধুচরণকে মহিম বলিতেছেন—'সাধুদা, এতটা মদ্‌ত কোন মেয়ে-মানুষ যে কোন-দিন দেখ্‌বো তা আশাও করিনি। এক দিকে ব্যবহারেই যতদূর বুঝেছি, তাতে তুমি যা ব'লেছ, ও মেয়ে তার "পকল কাঁটা ধক্ করে ফুল ফোটাবে পার্শে" (?) সাধুচরণ 'কাটা ধক্ ক'রে ফুল ফোটান যে কি, তাহা কিছুমাত্রই বুঝিতে পারে নাই, একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

এই পুস্তকখানি উপন্যাস প্রিয় পাঠকদিগকে আনন্দ দিতে পারিবে, একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। শিখিবার অনেক কথা ইহাতে আছে—অনেক পুরাতন কথা এমন নূতন ভাবে বলা হইয়াছে যে নূতনে একটা ছাপ রাখিয়া যায়। দু একটা নমুনা দিই :—'কার কর্‌তে হ'লে তার চাই, সতাকে প্রাণের মধ্যে অনুভব করা চাই।' (৩৮ পৃষ্ঠা) 'সুখে দুঃখে আনন্দ-বঞ্চাই মার উপজ্ঞা।' (৫২পৃষ্ঠা) 'নারীর মুক্তি (স্বামীর বৈ মলিন পর্ণকুটীরে) সেই তীর্থ ফেরে, সেই ভক্তি ক্ষেত্রে' (৮০ পৃষ্ঠা) (বড় লোকের) টাকা সাধু-রণের—আমি ভাণ্ডারী মাত্র।" (১৩৭ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি।

জলধর গ্রন্থাবলী—প্রথম অংশ—রায় বাহাদুর জলধর সেন প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা। পৃষ্ঠা ৩২৪; প্রকাশকের নিবেদনে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—'সাধারণতঃ গ্রন্থাবলী যে ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে, আমরা তাহার অনুসরণ করি নাই; আমাদের এই গ্রন্থাবলীর আকার বৃহৎ, কাগজ উৎকৃষ্ট, ছাপা সুন্দর, প্রচ্ছদপট সুরক্ষিত কাগজে ছাপা;—আমরা ইহাকে সুন্দরভাবে প্রকাশিত করিতে যত্ন চেষ্টাও অর্থ ব্যয়ের ত্রুটী করি নাই।' কথাগুলি সব সত্য—কিন্তু প্রচ্ছদপটটী সু (?) রক্ষিত ভাবে ছাপা নয়।

সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবশঃ জলধর বাবুর পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র—বঙ্গ ভাষাভাষী মাত্রের সহিতই অল্প বিস্তর তাঁহার পরিচয় আছে।

তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা একটা কথা প্রথমেই বলিয়া রাখি। আজ কয়েকবৎসর ধরিয়া তাঁহাকে গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলাম। গরীব বাঙ্গালা দেশের সাধারণ পাঠকেরা যাহাতে অল্পমূল্য দিয়া তাঁহার পুস্তক ক্রয় করিতে পারে—পড়িতে পারে—সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও রস অনুভব করিতে পারে, তাহার জন্য বহু বার বলিয়াছি, কিন্তু প্রতি বারেই তিনি কাতরভাবে একই উত্তর দিয়াছেন,—আমার মৃত্যুর পর তারা সে যাহা হোক, ছেলেদের সরামর্শ দিয়ে করে-কারণ আমার গণাদিনও ঘুনিয়ে আস্‌চে। একাধিক প্রকাশককে তিনি অনেক টাকা পাইবার সর্ত্তেও অনুমতি দেন নাই; কিন্তু আজ আমার সে উপরোধ রক্ষা হইয়াছে দেখিয়া—সাধারণের হাতে তাঁহার সুন্দর লেখা পৌঁছিতে পারিবে এই আনন্দে আমি উৎফুল্ল। জানি না যে কথাটা আমি তাঁহাকে বুঝাইতে পারি নাই, প্রকাশক মহাশয় কি করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া রাজী করাইলেন। যাক্ সে কথা। আমার বিশ্বাস সাধারণের নিকট এই গ্রন্থাবলী আদৃত হইবে। পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া পাঠকেরা আনন্দের সহিত শিক্ষালাভ করিবে Mass Education লোকশিক্ষার জন্য যাহারা চীৎকার করিয়া থাকেন—সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের যাহারা সত্য সত্যই পক্ষপাতী তাহারা এই গ্রন্থাবলী প্রচলনে প্রকৃতই আনন্দিত হইবেন।

আলোচ্য গ্রন্থে সর্ব্বজন পরিচিত ও সাহিত্য সমাজে সমাদৃত দুই খানি ভ্রমণ—"হিমাদ্রি ও 'প্রবাস চিত্র', তিন খানি উপন্যাস 'পাগল' 'চোখের জল' ও 'রসিক সেখ' এবং দুইখানি গল্পের বই 'পুরাতন পঞ্জিকা ও 'আশীর্ব্বাদ' আছে। কথাসাহিত্যে জলধর বাবুর বিশেষত্ব করুণ চিত্র অঙ্কনে। সে পরিচয় পাঠকগণ এই গ্রন্থাবলীতে খুবই পাইবেন। পাশ্চাত্য জগতে ভ্রমণ কাহিনী লেখার রূপটা একটু বদলাইয়া গিয়াছে। সেখানে ভ্রমণের ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। শুধু 'দেখার' ও 'শোনার' কথা তাহাতে তত বেশী থাকে না, যত থাকে দেখা লোকের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় তার প্রাণের পরিচয় দেবার চেষ্টা। দেশ বিদেশের প্রাচীন ইতি-হাস থাকে; কিন্তু তার চেয়ে বেশী কথা থাকে সেখান থেকে শিখিবার যাহা পাওয়া যায় তাহার সংগ্রহ, এখন সাহচর্য্য-সাহায্যে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া দিবার পদ্ধতি ভ্রমণ কাহিনীতে অনুসৃত হয় (Association school of Travel). এ হিসাবে কিন্তু বাঙ্গালা ভ্রমণ কাহিনী গুলি একটু সেকেলে হইতে পারে; কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে তিনি যে কালে ঐগুলি লিখিয়াছিলেন, সেকালে পাশ্চাত্য জগতেও সে নূতন আদর্শ ছিল না। তার মনোমদ ভ্রমণকাহিনী যত বারই পড়ি, ততবারই আমাদের ভাল লাগে—পুরাতন হইতে জানে না। জলধর বাবুর ভাষার সহজ সরল গতি বড় মনোরম—ভার প্রীতিপ্রদ।

বাঙ্গালী এই গ্রন্থাবলীর সমাদর করিবে যে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই পুস্তক খানিতে একটী সূচীপত্র থাকিলে ভাল হইত।

সৌন্দরানন্দ কাব্য—শ্রীবিমল চরণ লাহা এম্‌ এ, বি এল কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲ টাকা। মুখবন্ধ ও অনুবাদকের কথা ।৵০ পৃষ্ঠা। গ্রন্থখানি বর্দ্ধিত মেতে ১৯৬ পৃষ্ঠা। ছাপা, কাগজ বাঁধ ই সুন্দর। পুস্তকখানি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশিত অশ্বঘোষ-বিরচিত 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যের বঙ্গানুবাদ। শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। তাহার কথাতেই আখ্যান বস্তুটী বলি ;—"বুদ্ধদেব বাপের বাড়ী আসিয়াছেন, কিন্তু ভিক্ষা করিয়া খান এবং আপনার শিষ্য শ্রাবককে লইয়া বাহিরের বাগানে থাকেন। তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিল, নাম

নন্দ। বুদ্ধদেব যখন বিবাগী হইয়া গেলেন তখন বাবা ভাবিলেন—"আঁচালাও যে দিকে যায় পাচালাও সেদিকে যায়," নন্দ ও ত বিবাগী হইয়া যাইতে পারে তাই তাহার বিবাহ দিলেন। এমন একটী সুন্দরী কন্যা দিলেন যে নন্দ তাহাতে একেবারে মজিয়া গেল। দুটীতে কখনও কাছ ছাড়া হয় না। একদিন তাঁহারা বসিয়া একখানি আরসির সম্মুখে নানারূপ কীর্ত্তি করিতেছেন, এমন সময়ে দাসী আসিয়া খবর দিল বুদ্ধদেব বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, কাহাকেও না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। নন্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বুদ্ধদেবকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য যাইতে চায়, সুন্দরী যাইতে দেয় না। শেষে শীঘ্র আসিব বলিয়া নন্দ চলিয়া গেল। বুদ্ধদেব তখন একটু আগে গিয়াছেন। নন্দ পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল, বুদ্ধদেব এ গলিও গলি করিয়া অনেক ঘুরিয়া শেষে আপনার আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। নন্দ গিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। বুদ্ধদেব কিন্তু রাজী হইলেন না, তখনই নাপিত ডাকাইয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া ভিক্ষু করাইয়া দিলেন এবং তাহার শিক্ষার ভার বৈদেহ মুনির হাতে দিয়া দিলেন।

দুই চার দিন পরে বৈবেক আসিয়া বুদ্ধদেবকে খবর দিল—নন্দ সংসারে ফিরি যাইতে চায়, সে তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহে না। বুদ্ধদেব নন্দের কাছে গেলেন এবং তাহা হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল নন্দ, বেড়াইতে যাই।" নিকটে হিমালয়। বুদ্ধদেব হিমালয়ে উঠিতে লাগিলেন। বন জঙ্গল, ফোয়ারা, স্থান পার হইতে হইতে এক জায়গায় একটা কাণা বানরী কি করিতেছে। বুদ্ধদেব নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্ত্রী কি বানরী অপেক্ষা সুন্দরী?" নন্দ বলিল, "সে কি! এটা বানরী, আর সে অনুপম সুন্দরী, তার সঙ্গে কি এটার তুলনা হয়?" বুদ্ধদেব আর কিছুই বলিলেন না, ক্রমে উঠিতে লাগিলেন, উঠিতে উঠিতে একেবারে স্বর্গে গিয়া উপস্থিত। সে একেবারে ইন্দ্রভুবন, কারণ নন্দনবন, অপ্সরীরা নৃত্য করিতেছে। বিদ্যাধরেরা গান করিতেছে। বুদ্ধদেব এক অপ্সরাকে দেখাইয়া নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপ্সরা সুন্দরী না তোমার স্ত্রী সুন্দরী?" নন্দ বলিল "বানরী হইতে আমার স্ত্রী যত তফাৎ, আমার স্ত্রী হইতে এই অপ্সরা ততই তফাৎ।" বুদ্ধদেব বলিলেন, "তবে একটী অপ্সরা লইবে?" নন্দ বলিল, "হাঁ।" বুদ্ধদেব বলিলেন, "তবে তপস্যা কর, বিনা তপস্যায় ত অপ্সরা পাওয়া যায় না।" নন্দ বলিল, "হাঁ, তা করিব।" বুদ্ধদেব তাহাকে আবার আশ্রমে ফিরাইয়া আনিলেন ও তপস্যায় লাগাইয়া দিলেন। সে খুব তপস্যা করিতে লাগিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের শিষ্যেরা তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "নন্দ অপ্সরার জন্য তপস্যা করিতেছে।" তখন নন্দের তপস্যা একটু মিষ্টি লাগিয়াছে। সে বলিল, "আমি অপ্সরা চাহি না, আমি তপস্যাই করিব।" বুদ্ধদেব তাহাকে অনেক উপদেশ দিলেন, সে একাকী নির্জ্জনে তপস্যা করিতে লাগিল। এক সময়ে সে যেমন স্ত্রীর প্রতি একাগ্র হইয়া গিয়াছিল, এখন তেমনি তপস্যার ফল নির্ব্বাণ লাভের জন্য একাগ্র হইয়া উঠিল, এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সিদ্ধিলাভ হইল। সে আসিয়া বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিয়া বলিল, "গুরুদেব, তুমি আমাকে সংসার পথ হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদ পাওয়া দিলে।" বুদ্ধদেব বলিলেন, "তা বেশ হইয়াছে, তোমার কাজ শেষ হইয়াছে। কিন্তু বসিয়া থাকিলে চলিবে না, তুমি আর লোককে এই পথে আনিবার চেষ্টা কর।" লোকে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল যে ঘোর বিলাসী নন্দ পরমযোগী হইয়াছে। অনেকে নন্দের চেলা হইতে লাগিল। কত সুন্দরী আসিয়া নন্দের চেলা হইল।

আলোচ্য কাব্যে অশ্বঘোষ কাব্যের ভিতর দিয়া

যুক্তির পথ দেখাইয়া দার্শনিক সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীমান্ বিমলা চরণ এ কাব্যের বঙ্গানুবাদ করিয়া সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বোধ হয় তিনি অগ্রগামী। অনেক স্থলেই অনুবাদ মূলের অনুগামী হইয়াছে; মূলের সৌন্দর্য্যও অনেক স্থলে রক্ষিত হইয়াছে। মূলের অর্থবোধ করিতে যেখানে পারেন নাই, সেই খানেই অনুবাদক ভাবানুবাদ দিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে একখানি পুঁথি হইতে শাস্ত্রী মহাশয় পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছেন, অপর পুঁথিও কেহ পান নাই। পাওয়া গেলে দুর্ব্বোধ স্থলগুলির মীমাংসা করিবার সুবিধা হইবে। যতদিন তাহা না পাওয়া যায়, ততদিন অনুবাদক এরূপ করিতে বাধ্য। ভাষা যতদূর সম্ভব সরল হইয়াছে। ইদবিসের আর একটু মার্জ্জিত হইলে ভাল হইত।

গত বৎসর আষাঢ় মাসে পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল; ছয় মাসের মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে বাঙ্গলা দেশে সৎসাহিত্যের আদর কিছুমাত্র কমে নাই।

পাদটীকায় দার্শনিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা এ সংস্করণে নূতন সংযোজিত হওয়ায় পুস্তকখানির উপাদেয়তা অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। আরও কয়েকস্থলে পাদটীকা দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

ভুয়ান্‌জল—প্রবীন ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস। শালখিয়া যোগেন্দ্র লাবণিশি হাউস হইতে তারক দাস গাঙ্গুলী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা। ছাপা কাগজ বাঁধা সবই ভাল।

উপন্যাস খানির গল্পাংশ এই:—বাল্যকালে সতীনাথ পিতৃমাতৃহীন হইয়া পিতামহীর নিকট মানুষ হইতে লাগিল। এম এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাগুলি বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি পড়িতে লাগিল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে সংসার ধর্ম্ম করিবে না এইরূপ ইচ্ছাই তাহার ছিল, কিন্তু বৃদ্ধাঠাকুরমার অত্যধিক আগ্রহে তাঁহাকে বিবাহে সম্মতি দিতে হয়। কলিকাতার বড় গৃহস্থ অতুল চন্দ্রের কন্যা সুরমার সহিত তাহার বিবাহ হয়। ফুলশয্যার রাত্রিতে সতীনাথ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম কথা বলেন,—"ঠাকুরমা'কে যত্ন করিও।" সুরমা ওই কর্ত্তব্য পালন করিতে কোনদিন ত্রুটী করেন নাই। সরলপ্রাণা বৃদ্ধাও তাহার ছোট নাতবৌটীকে বড়ই ভালবাসিত। সতীনাথ ও সুরমা উভয়ে উভয়কে খুবই ভালবাসিত।

ওকালতী পাশ করিয়া মফঃস্বলে গিয়া সতীনাথ ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

কুশাগ্রবুদ্ধি সতীনাথ অল্পদিনের মধ্যেই পসার বেশ জমকাইয়া বসিলেন। সুরমার প্রাচীনা দিদিশাশুড়ী তার উপর সংসারের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। সুরমা ও স্বাধীনতার মাধুরী উপভোগ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত।

চারিবৎসর প্রবাস বাসের পর সুরমা তাহার এক ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে পিত্রালয়ে যান, কিন্তু অধিক দিন থাকেন নাই। সুরমার পিতার চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল তাঁর অর্থ-লালসা। তাঁর মার মৃত্যুর সময় নগদ টাকাকড়ি যাহা ছিল তাহা তিনি তাঁর অন্য ভাইদের ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করেন। এ সময় তাহার ব্যবসায় মন্দা পড়িয়া যায়। দুই মেয়ের বিবাহে যেরূপ ধুমধাম করিয়াছিলেন তৃতীয় কন্যার বিবাহে ও ঠিক তদনুরূপ ধুমধামেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন; ফলে ঋণভারে জর্জ্জিত হইলেন। নানারূপ মানসিক দুশ্চিন্তায় 'ব্রেণ ফিবার' তিনি অল্প দিনের মধ্যে মারা যান। ভারেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা মকদ্দমা হইয়া পৈতৃক বাটীর বিভাগ হইয়া গেল। এদিকে সুরমা মধ্যে মধ্যে বুকের মধ্যে খুব যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। একবার খুব বাড়াবাড়ি হইল। সতীনাথ সুরমাকে লইয়া

কলিকাতায় তার জ্যাঠামশায়ের বাড়ীতে উঠিল। সুরমার জীবনের আশা ছিল না—সে আপনার জন্য কিছুমাত্র ভাবিত ন'—ভাবিত তার স্বামীর জন্য। চোরা সংসারের কোন খবরই ধারে না। মেয়েময়ী দিদিশাশুড়ী ও মরিবার সময় তাহার হাতে সতীনাথকে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন। সে ভার কাহারও হাতে না দিয়া সুরমা নিশ্চিন্ত মনে মরিতে পারিতেছে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া একবার ঠিক করিল, যদি তার ছোট বোন অনুপমার সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার হাতে স্বামীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারেন। রোগশয্যায় শুইয়াই সুরমা তাঁর জ্যেঠাইমার কাছে কথাটা তুলিলেন। মার চেয়েও সুরমা তাঁহাকে অধিক ভালবাসিত তার কোলে পিঠেই সে মানুষ হ'য়েছিল। কথাটা শুনিয়াই তিনি স্তম্ভিত হ'য়ে যান। তাঁহার পর তার যুক্তির সারবত্তা দেখে তিনি তার প্রস্তাবে আর কোনরূপ প্রতিবাদ করে নাই। তার মাঝ ছোট ভাই এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে কোন মতে সায় দিতে পারিল না। তারপর কথাটা সুমা যে ভাবে অনুপমার ও স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিল। তাহাতে শিল্পীর কৃতিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। অনুপমা রাজী হইল—দিদির ত্যাগ স্বীকার দেখে—সে যে কতটা ছোট, কতটা স্বার্থপর তা বেশ বুঝিতে পারিল। দিদি স্বামীর সুখের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, আর সে মৃত্যু-পথ যাত্রী দিদির জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে ভয় পাইতেছে। সুরমা আনন্দের সহিত উভয়ের বিবাহ দিয়া দিলেন। আত্মীয় কুটুম্ব কেহই এ বিবাহের সমর্থন করিতে পারিল না; কেবল সকলেই সুরমার ত্যাগে মুগ্ধ হইল। আর সতীনাথ তাহার বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতে লাগিল। তাহার আদর্শ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহার সাধুতার গর্ব্ব দূর হইয়া গিয়াছে—সে সমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে না। সে আপনার কাছে আপনি অপরাধী। তাঁহার হৃদয়ে তুষানল জ্বলিতে আরম্ভ হইল। সুরমার চরিত্র অতি সুন্দরভাবে নিপুণ শিল্পী অঙ্কিত করিয়াছেন। স্বামীর সংসারে ও স্বামীর হৃদয়ে অনুপমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সুরমার যত্নের ত্রুটি ছিল না; কিন্তু শেষ কার্য্যে তিনি সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। অনুপমা দিদির সেবা-শুশ্রূষাতেই ব্যস্ত থাকিত। একদিন স্বামী তাহার নিকট ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে আসিয়াছিল দেখিয়া ঘৃণায় সে তাহাকে প্রত্যাখান করে। সতীনাথ ও আহত অভিমানভরে দূরে সরিয়া যায়। আগুন দুজনেরই বুকে জ্বলিয়া উঠিল। সতীনাথের মনের তুষানলের শিখা সুরমাকে বহন করতে লাগিল। সে আরো অসুস্থ হইয়া পড়িল। স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য যে কি তাহা তার কে কিছু বুঝাইয়া দিতে পারিল না। স্বামী চরিত্রের ব্যাখ্যান দিদির কাছে শুনিয়া সে মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিল। স্বামী একদিনের আলাপ হইতে সে ধরিয়া লইল স্বামী তাহাকে অপমান করিতে উদ্যত। তাহাকে কোন মতেই প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না! তাহারও মনের ভিতর তুষানল জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু আমরা অনুপমার এই কার্য্যের অনুমোদন কিছুতেই করিতে পারি না। যে রমণী মাতৃত্ব লাভের পবিত্র সাধনার চেষ্টাকে ঘৃণায় প্রত্যাখান করে তাহাকে আমরা কখনও আদর্শ হিন্দুরমণী বলিতে পারি না। লেখক মহাশয়ের দার্শনিকতার ধারাও আমরা বুঝিতে পারি না। সত্য কথা বলিতে কি নাম পরিচ্ছেদটী আমাদের আদৌ ভাল লাগে নাই। দার্শনিকতার কারণ লেখক মহাশয় খুব্ই দেখাইতেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। "ত্যাগের মধ্য দিয়া ভোগ" ও "ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগ" ইত্যাদি যে সকল বড় বড় কথা লিখিত হইয়াছে তাহা লেখক মহাশয় বুঝাইতে পারেন নাই। সতীনাথের দোষ কিছুই নাই—সে অনুপমাকে বিবাহ করিয়াছে—মন্ত্র পাঠের সহিত

যে দায়িত্ব সে গ্রহণ করিয়াছে তাহা পূর্ণ করা তাহার পক্ষে অবশ্য করণীয়। সেই কর্ত্তব্যের জন্য—সে কর্ত্তব্য ভোগলালসার নামান্তর হইলেও—তাহার বাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা অন্যায় নহে। অনুপমা যে তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না এটা যে অস্বাভাবিক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্য কথা বলিতে কি অনুপমার মনের চিন্তার ধারা আমরা বুঝিতে পারি না। লেখক মহাশয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন অনুপমার দিদির প্রতি অযত্নে জন্যই সে স্বামীকে শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই। অবশ্য সে যে ভুল বুঝিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুপমার চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, আমরা তাহার কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না। এ চিত্র আমাদের দেশীয় চিত্র নয়—বিদেশীয় স্বামী স্ত্রীর চিত্তর 'বন্ধু ভাবে'র যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় এ সেই চিত্রের অনুকরণ মাত্র—'তনু মন দিয়া সকল সপিয়া' এক হইবার ভারতীয় চিত্র ইহা যে নয় তাহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। অনুপমার হৃদয়ের তুষানলও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। ভ্রান্ত অনুপমার জন্য আমরা দুঃখিত। সেবা-নিরতা অনুপমার চিত্র বড়ই উপভোগ্য। সুরমার মৃত্যু করুণরসাত্মক। তুষানলটা ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য হেমেন্দ্রবাবু যেখানে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি করিলে স্বাভাবিক হইত, সেখানে না করিয়া পুস্তকখানিকে অযথা বাড়াইয়াছেন। সুরমার ত্যাগ ও সতীনাথের হৃদয়ের তুষানলের অনল দেখাইয়া পুস্তকখানি শেষ হইলে সুন্দর হইত। অনুপমার হৃদয়ের তুষানলটা না জ্বালাইলে উপন্যাসের কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না। সুরমাকে সুস্থ করিয়া পুনরায় উদ্বেগের ভিতর না ফেলিলে উপন্যাসখানি করুণ রসাত্মক হইত না বটে; কিন্তু রস-সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র অভাব থাকিত না। অন্যান্য চরিত্রও বেশ ফুটিয়াছে।

পুস্তকখানির ভাষা ও রচনারীতি সুন্দর। উপন্যাসগুলি হৃদয়গ্রাহী।

পল্লী-যুধিষ্ঠির

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি,এ)

দুঃশাসন ত অনেক ভাল দুর্য্যোধন ত বার
সবার চেয়ে অতি ভীষণ পল্লী-যুধিষ্ঠির।
মাথায় টিকী পরণ ভাষী
মিষ্ট বিনায় মুচকী হাসি
হরির নামে ভয়ে তাঁহার চক্ষে বহে নীর।

(২)

সদাই হৃদয়ের পক্ষপাতী, চক্ষেন দেখে দোষ
অত্যাচারের শত্রু মুখে, বেজায় অসন্তোষ।
নিলামে দাম বাড়িয়ে নিয়ে
অক্লেশে কন মিথ্যা গিয়ে,
অনুতাপের লেশ নাহিক এমনি তিনি ধীর।

(৩)

সত্য দলিল জাল করাতে নাইক দ্বিধা তার
দুশক বিঘা জমি যদি পায় সে পুরস্কার।
সাক্ষী শেখায় রাত্রি জাগি,
অনেক করে পরের লাগি,
হিন্দুগণের দেবতা তিনি সুদলমানের পীর।

(৪)

'সাইলক' ও হায় কল্‌কে না পায় কাঁদ্‌ছে 'হায় গো'
সহতানেরো ঈর্ষাতে হায় জ্বল্‌ছে হিয়া গো।
সত্যাসুযাগ প্রবল বড়
সবাই তারে প্রণাম কর
সশরীরে তাহার বাপু স্বর্গে যাওয়াই স্থির।

(৫)

অনেক কুকুর এবার তাহার সঙ্গে যাবে ঠিক
তাদের অগাধ পুণ্যে হায় হয় না যে নিরিখ।
ধর্ম্মকথার জ্বালায় কাটে, শক্তিবলের চরণ চাটে,
পল্লী মায়ের বাস্তুসাপে আস্ত নোয়ায় শির।
সবার চেয়ে অতি ভীষণ পল্লী-যুধিষ্ঠির।

সদাশিবের দপ্তর

(শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্ বি, এ সি, লণ্ডন)

গঙ্গা

গঙ্গা প্রেমপ্রবাহিনী, পতিত পাবনী, অধম তারিণী। মহাপাপীও গঙ্গা স্নানে নিষ্পাপ হইতে পারে। গঙ্গার পাত্রাপাত্র বিচার নাই সকলেই তাহার কাছে মোক্ষ পাইতে পারে। সামান্য আরাধনায় তিনি তুষ্ট হইয়া থাকেন,—ভক্তনাধনহীন পঞ্চম বর্ষীয় বালক ভগীরথের করুণ রোদনে তিনি দ্রব হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তির দাসী; আবার গর্ব্বিতের লাঞ্ছনকারী। মত্তমাতঙ্গ হিমালয় উৎপাত কালে দম্ভ করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করিবার বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বেগ সহিতে পারিল না। দেবদেব মহাদেব তাঁহার বেগ সামলাইতে পারেন কি না সন্দেহ করিয়া এককালে গঙ্গা স্বয়ং দম্ভ করিয়াছিলেন। দর্পহারী ভগবান তাঁহার সে দর্প রাখেন নাই। মহাদেবের জটা মধ্যে সহস্র বৎসর পরিভ্রমণ করিয়াও তিনি পথ পান নাই। তুমি আমি কোন্ ছার—গর্ব্বের পতন অবশ্যম্ভাবী। সন্দেহ কর প্রেমে মুক্তি নাই, কুবাসনা মুক্তি পাইবে না—গঙ্গা প্রেমদায়ী, মোক্ষদায়িনী, কৈবল্যদায়িনী। অতএব যেখানে প্রেম সেইখানেই স্বর্গ; স্বর্গের নামান্তর প্রেম। বাঙ্গালায় চৈতন্যদেব প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, নানাবেশ, নানা পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া নদীর স্রোত চলিতেছে, নানা দেশ পবিত্র হইতেছে। গঙ্গে! তুমি সকলের দুঃখে কাঁদিতে জান। যে তোমার উপাসনা করে না তাহার প্রতিও কৃপা কটাক্ষে চাহিয়া থাক, সুতরাং পুরাণে তোমার অপার মহিমা, তোমার অপার দয়া, তোমার অপার প্রেম,—অতি সামান্য স্থানে তুচ্ছার কমণ্ডলুস্থ মাত্র তোমার তনু, কিন্তু কার্য্যগুণে তুমি মহীয়সী; তুমি ভারতবাসীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পূতপবিত্র। আমরা তোমার পবিত্র সলিলে অবগাহন করি, তোমার পবিত্র সলিল পান করি, এমন কি স্পর্শ করিলে মুক্তি পাই। তোমার যে কুলু কুলু শব্দ দিন নাই রাত্র নাই—তাহার এত প্রেম, এত রস, তাহাতে এত কবিতা যে সেক্সপিয়রের "এথেলোতে" নাই, শ্রীতোমার মণিবিদ্যুপূর্ণ পত্রে নাই, কালিদাসের "কুমার সম্ভবের" ৩য় সর্গে নাই। আবার সেই কুলু কুলু শব্দে এত অশ্রুবিন্দু, এত হাহাকার, এত মনস্তাপ যে তাহা এডিসনের "কেটোতে" নাই, "রাবের বনবাসে" নাই, দীনবন্ধুর "নীলদর্পণে" নাই। কিন্তু লোকে তোমার ভাষার অর্থ বুঝে না, ঐ যা দুঃখ। ইংরাজ জাতি তোমায় বাঁধিয়াছে, তাহারা তোমার মহিমা বুঝে না। লোকের ছেলে হ'লে তোমার পূজা দেয়, লোকের মৃত্যু হ'লে তোমারই কূলে সমাহিত হয়। এ সকলের কি কিছু অর্থ নাই? আছে—কিন্তু কয়জনে তাহা বুঝে? তোমার ঐ যে ভাষা, ঐ যে অব্যক্ত মধুর কুলুকুলু রব তাহাতে মানবের এমন কোন্ও অনুভূতি নাই,যাহা বুঝান যায় না। তাহার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না এমন ভাষা মানবের মনে উদয় হয় না। যে দুঃখী সে তোমার তরঙ্গকে শোকের তুফান মনে করিয়া তোমার জলে নিজের অশ্রুরস মিশায়; যে সুখী সে তোমার লহরীতে তাহার আনন্দলহরী মিলায়। তোমাকে যে যেমন রূপে দেখে তুমি তাহার কাছে তেমনই। তুমি সকল সময়ে সকলের দুঃখে দুঃখী, সকলের সুখে সুখী। তোমায় যে উপহাস করে, তোমার উপর যে দম্ভ করে তুমি তা'র সর্ব্বনাশ কর। কথিত আছে জগৎশেঠ তোমার মহিমা না বুঝিয়া দম্ভ করিয়াছিল, সুতরাং তোমার সলিলেই তাহার জীবনের সকল দম্ভই লীন হইয়াছে। গঙ্গে শুনিতে পাই চাঁদসদাগর তোমার পূজা দেয় নাই, তুমি তাহাকে ফলে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তথাপি অবোধ মনুষ্য তোমার পবিত্রতা বুঝে না, তোমার উপদেশ গ্রহণ করে না। তুমি জড় পদার্থ অজ্ঞান তথাপি তোমার এত সদুপদেশ—কিন্তু মহামূর্খ আমরা তাহা বুঝি কই? যেদিন জানিব হরিদাসের রোদনে রোদন করিতে পারি, রামদাসের মুখে হাসিতে পারি সে দিন জানিব যে আমি তোমাকে স্পর্শ করিবার উপযুক্ত হইয়াছি।

প্রাচীনকালে লোকে পরের দুঃখে কাঁদিতে জানিত, পরের সঙ্গে সমানে চিন্তা জ্বালা, রোগ শোক ভোগ করিত। তখন তুমি মানবের দুঃখে সমদর্শিতায় দুকূল ভাসাইয়া চলিতে—এখন আর সেদিন নাই। সোণার ভারত অধঃপাতে গিয়াছে। আমি এখন 'আমি' লইয়াই ব্যস্ত, দিনান্তে 'তুমি' এক মুষ্টি ভক্ষণ করিলে কি না তাহা জানিবার আমার সময় বা অবসর নাই। তোমার প্রণয়িনী ভার্য্যার মৃত্যু হইয়াছে তুমি একা তাহার জন্য রোদন করিবে, বক্ষে করাঘাত করিবে আমার তাহাতে কি? আমি কি করিব! লোকে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না। অলোকান্দা, ভাগীরথী ও ভোগবতী ত্রিভুবনময়ী হইয়া প্রত্যেক পরমাণুতে মিশিয়া যখন এক হইবে তখন অবোধ মানব তোমার মর্য্যাদা বুঝিবে; কিন্তু তখন বুঝিয়াও উপায় হইবে না, আর তোমাকে পাইবে না। সময় থাকিতে মানুষে জিনিসের মর্য্যাদা বুঝে না এইত দুঃখ। সময় যাইবে কিছুতেই থাকিবে না। কেবল স্মৃতি কালের ক্ষুদ্রতা স্মরণ করাইয়া দিবে। তাই বলি এখনও সময় আছে, এখনও তোমার মর্য্যাদা বুঝিবার অবকাশ আছে। পোড়া লোকে বুঝে না—ঐ দুঃখে মরি। জগতে হিংসা, দ্বেষ আধুসুখ ইত্যাদি নানাপ্রকার নানা জাতীয় রাক্ষসী জন্মিয়াছে পতিত পাবনী অধম তারিণী গঙ্গে! তুমি তাদের বিনাশ কর। অপবিত্র লোকদিগকে তোমার সলিলে পবিত্র করিয়া দিয়া যাও। তুমি যে বীজমন্ত্র লইয়া অনবরত দিনরাত্র বহিতেছ সেই বীজ মন্ত্র দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ ও আমূল সংস্কার করিয়া যাও। তোমার এমন সরল কথা তবু আমরা বুঝি না কেন? তুমি অনিশি এক কথা এক রাগে এক তালে বলিতেছ—তবু আমরা বুঝিনা, কেন না যদিও তুমি সারা গলায় বলিতেছ তোমার শ্রোতার সহানুভূতি নাই, সে পরের জন্য চিন্তা করিতে জীবনে শেখে নাই, সে তোমার কথা বুঝিবে কেমন করিয়া। সে ছোট, তুমি মহৎ, সে দুঃখী তুমি সুখী। যে পরের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে শিখিল না তাহার পক্ষে ও অন্যের পক্ষে কষ্টকর। আমি আমার জন্য বিদ্যা উপার্জ্জন করি, আমার জন্য ধন উপার্জ্জন করি। কিন্তু জানিয়া রাখা ভাল যাহা আমার,আমার সহিত তাহার আরম্ভ, আর আমার সহিত তাহার শেষ। আমি আমারই সুতরাং আর কাহারও নহি। অন্যের সুখ দুঃখের উপর আমার কোনও হাত নাই, সুতরাং আমারও সুখ দুঃখের উপর কাহারও হাত নাই, অতএব এমন অবস্থায় যে জীবন তাহা সুখের ত' কোনও অংশে নয়; বরং এক প্রকার খাতে চলে বলিয়া একঘেয়ে জীবন বড়ই কষ্টদায়ক। এই রকম যে কেহ—আপন কে স্বতন্ত্র রাখিয়াছে জগতের সহিত যে সকল সম্বন্ধ-ছেদন করিয়াছে সে কেন সুখী হইবে? সুখের ভাণ্ডারে তাহার অধিকার কি?

অনেকে বলে সুখ নির্জ্জনে পাওয়া যায়, মনুষ্য সমাজের বাহিরে অরণ্যে বসিয়া পাওয়া যায়। সেটা সুখ না শান্তি? কোন্ ঋষি, কোন্ তপস্বী সুখ সম্ভোগের আশায় জন-সমাজ ত্যাগ করিয়া পান্থ-নিবাস অবলম্বন করিয়াছেন? সুখলাভের আশায় কোন্ মহাব্রত ধারী পর্ণকুটীর সার করিয়াছেন? বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য ক্ষমতা, 'হিলারিজ'র উদ্দেশ্য "নোবেলার্ড"। পরকাল যে তাহাদের উদ্দেশ্য

ছিল না তাহাকে বলিতেছে, কিন্তু পর্বকুটীর অবলম্বন করার হেতু পরকাল নহে। অবশ্য কোনও শোচনীয় ঘটনা তাহাকে ঐ কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। পরে ফলে পরকালের চিন্তা করিয়া তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহকালে যে সুখ লাভে বঞ্চিত রহিল না তাহার পরকালের আবশ্যকতা কি? এই যে কালের স্রোত বহিতেছে ইহাই সুখের স্রোত, প্রেমময়ী ভাগীরথীর ন্যায় ইহাই সুখের কল্লোলিনী। প্রেমানন্দে পরহিতে রত থাক, পরের জন্য কাঁদিতে শিখ কর; এই যে প্রতি অশ্রু বিন্দু তাহার এত মূল্য যে সহস্র রাজ ভাণ্ডারের মণিমুক্তা একত্র করিলেও তাহার সমতুল হয় না। আপনার হৃদয় হইতে লক্ষ লক্ষ তন্তুর সহিত আপনাকে বাঁধ—এই সকল তন্তু বিমল আনন্দ ও ও অকৃত্রিম সুখ বহন করিবে, আর এই জগতই

সুখের জগত বলিয়া প্রতীতি হইবে, পরকালের প্রয়োজন হইবে না। সুখের জন্যই ত পরকাল চিন্তা, পরকালের চিত্র অতি মনোহর, অতি সুখকর, অতি তৃপ্তি কর—তাই আমরা পরকালের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকি। যদি ইহজগতেই সুখ মিলিল তবে পরকালের আবশ্যক কি? এই জন পূর্ণ পৃথিবীই সুখের স্থান। মানুষ মানুষের হিতে গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হউক তাহাতেই আত্মার মুক্তি।...

Man to man, the world o'er,
Shall brother be for a that!"

যদবধি তব নীরং পাতকী নৈতি সঙ্গে
তদবধি মলজালৈঃ বৈ মুক্তঃ কলৌ স্যাৎ।
তব জলকনিকানাং পাপিনাং পাপশুদ্ধৈ
পতিত পরম দীনান্ ত্বাং পাপি প্রপন্নান্।"

• • • •

অন্ধকার ও নক্ষত্র

(শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন কবিরত্ন)

শুদ্ধ অন্ধকার কহে,—"হে নক্ষত্র রাজি,
আমারে তাড়াবে বলি আসিয়াছ সাজি!"
হাসিয়া নক্ষত্ররাজি করিলা উত্তর,
"পরস্পর মিলে মোরা হয়েছি সুন্দর,
সুখ কভু নাহি পারে দুঃখ নাশিবারে,
তাই পরস্পর মিলি শোভিছে সংসারে।"

বংশের কলঙ্ক

(শ্রীদত্যেন্দ্রনাথ বসু বি, এ)

ষড়্‌বিংশতি পরিচ্ছেদ

অতি বুদ্ধির পরিণাম

যখন নিচে একটা বিপুল আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল, বহু লোক সমস্বরে "দাদাবাবু! দাদাবাবু!" করিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন অনিলা চমকিয়া উঠিল; সে উৎকর্ণ হইয়া উৎসুক নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর যখন সোপানে অসংখ্য পদশব্দের মধ্যে সে সেই

চিরপরিচিত পদধ্বনি শুনিতে পাইল, তখন দারুণ উত্তেজনা বশে তাহার হৃৎপিণ্ডটা ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল! ভগবান কি যথার্থই মুখ তুলিয়া চাহিলেন? তাহার অন্তরের অন্তস্তলের নীরব কাতর ক্রন্দন কি সেই রাজরাজেশ্বরের সিংহাসন তলে পৌঁছিল?

সেই মুহূর্ত্তে তাহার লোলুপ দৃষ্টিপথে সেই চিরপরিচিত চিরপ্রিয় দীর্ঘ শালতরুনিভ মূর্ত্তি উপস্থিত হইল। যখন অনিন্দ্য তাহার লোকের মুখে আন্তরিক হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল, যখন ভৃত্যপরিজন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ভগবানের জয় গাহিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, তখনও অনিলা আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে সাহসী হইল না। তখনও তাহার চক্ষে সমস্ত স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল যেন এ দৃশ্য রঙ্গমঞ্চের অভিনয় মাত্র!

কিন্তু যখন অরুণকুমার সত্যসত্যই ছুটিয়া আসিয়া কালীশঙ্করের হাত ধরিয়া আনন্দ গদ্‌ গদ স্বরে "বাবা, বাবা" সম্বোধন করিল, তখন অনিলার হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া যেন একবারে শুষ্ক হইবার উপক্রম করিল। এখন অনিলার বিশ্বাস হইল যে, সে বাস্তব জগতে রহিয়াছে, সে যাহা দেখিতেছে শুনিতেছে সে সব স্বপ্ন নয়, সত্য। অমনই কোথা হইতে শরীরের সমস্ত রক্ত তাহার মুখে চোখে ছুটিয়া আসিল, কোথা হইতে দারুণ লজ্জা আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এ ভাবটা গোপন করিবার জন্য সে সকলের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে গিয়া একখানা সোফার উপর শুইয়া পড়িল, তখনও তাহার সমস্ত শরীরটা থর্‌থর্ কাঁপিতেছিল।

তাহার পর সেইখানে থাকিয়া সে একটী করিয়া সব কথা শুনিল। শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হর্ষ, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ক্রোধ, ঘৃণা, নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। অরুণের মহত্ত্বের, অরুণের সৌম্য বীর্য্যের, অরুণের দয়ামায়া স্নেহ মমতার কথা শুনিতে শুনিতে তাহার সমস্ত শরীরটা স্রোতোমুখে বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, নীলোৎপল নয়ন দুটী অপূর্ণ স্নেহরসে ভরিয়া আসিল। আবার যখন রমেনচন্দ্র ও পাড়ার স্ত্রীলোক দুইটা অরুণের কলঙ্কের কথা সবিস্তারে ঘোষণা করিতে লাগিল, তখন ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল।

যখন সাহেব অরুণকে লইয়া চলিয়া গেলেন এবং সরোজ ও কোঠারে তাঁহাদের অনুগমন করিল, তখন অনিলা ধীরে ধীরে উঠিয়া নিজের শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল, এই যষ্ঠী কালীশঙ্করের ইচ্ছায় অনিলার জন্য চিরদিনই নির্দ্দিষ্ট ছিল। অনিলা কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া দিল! তাহার মনের ভাব চোখে মুখে পাছে ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে তখন কাহারও সহিত দেখা করিতে প্রস্তুত ছিল না।

ঘরের দেয়ালে একখানি রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির ছবি ছিল; সেখানি অনিলার বড় ভক্তির জিনিষ ছিল। অনিলা সেই আরাধ্য যুগল মূর্ত্তির সম্মুখে নতজানু হইয়া গলদশ্রুকণ্ঠে আন্তরিক ভক্তিভরে প্রণাম করিল; একবার নয়, বার বার সে ধূলায় মাথা লুটাইয়া দেবতার উদ্দেশে অন্তরের অন্তস্তলের দীনতা, ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল, চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। সর্ব্বশক্তিমান দয়াময় ভগবান তাহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়াছেন, তুচ্ছ অধম সে, এত দয়া তার প্রতি?

কতক্ষণ অনিলা এই ভাবে ছিল, তাহা সে জানে না, কিন্তু যখন কক্ষদ্বারে গঙ্গার গলার আওয়াজ পাইল, তখন সে ঝটিতি উঠিয়া বসিল এবং চোখের জল মুছিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। "কিরে গঙ্গা", বলিতে না বলিতে সে উত্তেজিতস্বরে বলিল, "এই যে দিদিমণি! তুমি এখানে? আর বাড়ীশুদ্ধ লোকে তোমায় খুঁজতে

দিদিমণি, দিদিমণি, শুনেছ কি, আমাদের দাদাবাবু ফিরে এসেছে? চল, চল, বাবুরা সব বাইরের বারোণ্ডায় ব'সে আছে—"

অনিলা বাধা দিয়া বলিল, "না গঙ্গা, সেখানে যাবার দরকার নেই, আমি সব জানি। তুই এইখানে বস্, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, হাঁরে কোঠারে বাবুর মেয়ে প্রাণ দিয়ে তোর দাদাবাবুকে রক্ষা করেছিল শুনলুম। কথাটা কি সত্য?"

গঙ্গার মুখ গম্ভীর হইল; চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সে তখন একে একে মৈথিলীর সেই অপূর্ব্ব আত্মদানের কথা বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু জলে পুরিয়া আসিল, সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দিদিমণি, সে ভগ্‌গা ঠাকরুণের কথা পাপ মুখে কি বলব? দাদাবাবু তারে মার পেটের বোনের মত ভাল বাসতো। কিন্তু সে যে কি চক্ষে দাদাবাবুকে দেখেছিল, তা কেউ জানত না, কেবল আমি জানতুম। দাদাবাবুর গায়ে একটী কাঁটা ফুটলে, আমি দেখতুম তার সর্ব্ব শরীরে কে যেন হাজার হাজার কাঁটা বিঁধুচ্ছে। এমন করে দাদাবাবুর সেবা করত যে দাদাবাবু সেই জন্যলেও এতটুকু কষ্ট টের পেত না। অথচ সব লুকিয়ে করত, কেউ জানতে ও পারত না। দাদাবাবু জানত, আমিই সব কচ্ছি। আহা! শেষে প্রাণটাও দিলে। যখন ঝোপের আড়াল থেকে বিনায়ক দাদাবাবুকে বাণ মারলে, তখন দাদাবাবুর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আড়াল করে রইল। দিদিমণি! বড় ভাল ছিল সে গো, বড় ভাল ছিল! আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে শুনেছি, বিপদ থেকে দূরে রাখবার জন্য মরবার আগের দিনেও সে দাদাবাবুকে কলকাতায় চলে যেতে বলেছে, কত আশার কথা বলেছে, কত বুঝিয়েছে, কত শান্ত করেছে।"

ভাবাবেশে গঙ্গা কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তার পর বেগবমানা ক্রন্দনরতা অনিলাকে দেখিয়া কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল, "হাঁ ভাল কথা। যাবার সময় তুমি যে বই দাদাবাবুকে দিতে বলেছিলে, দাদাবাবু সেই বই খানা তোমায় ফিরিয়ে দিতে বলেছিল। সেই বই কি তোমায় দোবো, না দাদাবাবুকে ফিরিয়ে দোবো?"

অনিলা ত্রস্তে বলিল, "না, না, বই আমায় দে, এক্ষনই এনে দে।"

গঙ্গা তাহার চঞ্চলতা দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু তখনই নিচে ছুটিয়া গিয়া বই আনিয়া দিল। গঙ্গাকে নিচে যাইতে বলিয়া অনিলা শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল এবং আগ্রহভরে পুস্তকখানির পাতা খুলিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একস্থানে দুইখানি পাতার মধ্যে আঁটা একখানা চিরকুট কাগজ বাহির হইয়া পড়িল; অনিলার হাত কাঁপিতে লাগিল, বুক গুরুগুরু করিতে লাগিল; সে কম্পিত হৃদয়ে দেখিল সেই চিরকুটে তাহারই হাতের লেখা রহিয়াছে,—"আশায় মানুষ বাঁচিয়া থাকে, নিলা", আর তাহারই নিচে লেখা রহিয়াছে, —"আশা পূর্ণ হ'ল না, নিলা। প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে, তোমরা সুখী হও।

অরুণকুমার।"

অনিলার বুকের ভিতর কি করিয়া উঠিল, তাহা অন্তর্য্যামী ব্যতীত কে বুঝিবে! অনিলা ভাবিল ক্রুর কপট রমেশের কারসাজীতে অরুণকুমারের মনে সন্দেহের বীজ প্রবিষ্ট হয়েছে। বোধ হয় সে ভাবিয়াছে আমি অপরের সহিত বিবাহিত হইয়াছি। পরক্ষণেই সে আশ্বস্ত হইয়া ভাবিল মিথ্যা কখনও আপনার আসন ঠিক ভাবে রাখিতে পারে না।

• • • •

যখন অনিলা এই সকল কথা ভাবিতেছিল, তখন মানুষের ভাগ্যবিধাতা অরুণের সম্পর্কিত সংসার-লীলা সূত্রের আর একটী গ্রন্থি উন্মোচন করিতেছিলেন। বাহিরের ঘরে বসিয়া অরুণ

ভাবিতেছিল, "এ্যাঁ, আমার দ্বারা এই কুৎসিত কাজ হয়েছে, অথচ আমার কিছু মনে পড়ছে না! কি আশ্চর্য্য! কি মিথ্যা অভিযোগ!' নিলা যদি বিশ্বাস করিয়া থাকে—'আর সে ভাবিতে পারিল না। চক্ষু বুজিয়া শোফায় শুইয়া পড়িল।

সরোজ তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া ভীত হইল, সে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখিয়া অরুণকে ভুলাইবার মানসে তাহাকে লইয়া কোথাও বেড়াইয়া আনিবার সঙ্কল্প করিল। হঠাৎ সে বলিল, "ওরে অরুণ, আজ খড়দায় যাবি, আজ সেখানে মস্ত মেলা, শ্যামসুন্দরেরও আজ গুপ্ত ঘটা, যাবি?"

অরুণের কাণে কোন কথা গেল কি না সন্দেহ, তখন তার মাথার ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল, সে শুধু বলিল, "এ্যাঁ, কি বলছিস, যেতে হবে? চল।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও তাহার স্নানাহার হয় নাই। সে হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া বলিল, "পাগল না কি, এবেলা কি আর গাড়ী আছে, যেতে হলে ওবেলা; না হয় মোটরে গেলেও হয়। কিন্তু মোটরে যেতে হলে চান আহারটা করে যাওয়া উচিত। আয় চান করে নিই।"

যন্ত্রচালিতবৎ অরুণ উঠিল; সরোজের সহিত স্নান করিল, তাহার পর সরোজের ইঙ্গিতে ঠাকুর জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিল; উভয়ে কিছু খাইল। তারপর সরোজ একখানা টেক্সি আনাইয়া অরুণকে লইয়া খড়দা যাত্রা করিল।

টেক্সিতে যাইবার সময় অরুণ গম্ভীর হইয়া, বসিয়া রহিল, নানা কথা কহিবার চেষ্টা করিলেও সে 'হাঁ না' ছাড়া বেশী কথা কহিল না। কেবল একবার কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল, "দেখ্ সরোজ, তুই যে আমার সঙ্গে এখনও মেলা-মেশা করছিস, এইটেই তোর মহত্ত্ব। বড় ভাগ্য যে নিলা তোর হাতে পড়েছে। আচ্ছা ভাই, আমায় এই সুখের কথা লিখিসনি কেন? রমেশ না লিখলে কিছুই জানতে পারতুম না ত'।"

বিস্মিত সরোজ অরুণের হাত দুটা ধরিয়া বলিল, "তোর একটা মস্ত ভুল অরুণ যে তুই রমেশটাকে অত বিশ্বাস করিস। এই দেখনা, কত বড় মিথ্যে কথা বলে তোকে জীবন্তে মেরে রেখেছিল!"

"মিথ্যে কথা? কি মিথ্যে কথা?"

"এই আমার বিয়ের সম্বন্ধে? ভাই বোনে কখনও বিয়ে হয়? তুই কি জানিস নি, অনিলা আমার—বোন?"

"তবে, তবে, রমেশের কথা ঠিক না?"—বলিয়া অরুণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া সরোজের হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সরোজের মুখপানে উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল।

রমেশ বলিস, "মোটেই না। অনিলার বর ত' ঠিক হয়েই আছে। সে যে মনে মনে কাকে বরণ করেছে, তা ত' অনেক আগেই তোকে বলেছি—"

অরুণ সরোজের হাতটা আবেগ ভরে চাপিয়া ধরিল, অরুণের শরীরের ভিতর দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল, মুখে চোখে রক্তস্রোত খেলিয়া গেল, সে সরোজকে বাধা দিয়া বলিল, "সরোজ, ভাই, যদি তোর কথা সত্যি হয়, তা হ'লে মুখ বুজে এই অপবাদ সহ্য করব না, এ তোকে বলে দিলুম। আগে ভেবেছিলুম, ওদের কথার প্রতিবাদ করব না, ওদের কথা মত টাকা কড়ি দিয়ে বিদেয় করে দেবো। কার জন্য মিথ্যা অভিযোগ স্খালন করবো। কিন্তু এখন আর তা পারিনি। সত্যি বলছিস, আমার আশা পূর্ণ হবে?"

সরোজ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি কি কখনও মিথ্যে বলি? তুই কি আমায় নতুন

জানলি অরুণ? কিসে তোর বিশ্বেস হবে? ভাই, আমাদের বন্ধুত্বের শপথ নিয়ে বলছি, আমি এমন প্রমাণ পেয়েছি যে অনিলার মনের উপর অধিকার এ জগতে আর কারও হতে পারবে না। কেমন, বিশ্বেস হ'ল?"

অরুণ নীরবে গম্ভীরভাবে বলিল, "সরোজ, কলকাতায় ফিরে সেই বাবাজীটাকে ধরতে হবে, এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত না করে আর আমি কিছুতে হাত দিচ্ছিনি। যতখণ না নিলার মনের সন্দেহ দূর হয়, ততখণ আমার স্বস্তি নেই।"

সরোজ বলিল বটে, আমি এতদিন বিশ্বেস করি নি। কিন্তু এখন সত্যি বলে মনে হচ্ছে।"

অরুণ বলিল, "হুঁ।"

সরোজ বলিল, "দেখ না, তোর বিপক্ষে এদের হয়ে কেমন ওকালতি করলে। অনিলা বলছিল, সে অনেকবার লক্ষ্য করেছে, ওদের সঙ্গে রমেশের গুপ্ত সঙ্কেত চালাচালি হয়েছে। জানিস অরুণ, রমেশটা কাকাবাবুকে জপিয়ে অনিলাকে বিয়ে করবার চেষ্টায় ছিল।

অরুণ উত্তেজিতস্বরে বলিল, "কাকে?"

সরোজ বলিল, "অনিলাকে। তার পর দেখ, তোকে মিথ্যে চিঠি লিখে মন খারাপ করে দিয়েছিল। ওর নিশ্চয় একটা কিছু মতলব আছে তোর সম্বন্ধে।"

অরুণ বলিল, "আমার সম্বন্ধে? কেন, আমি ত' ওর কখনও কোনও অনিষ্ট—"

সরোজ বাধা দিয়া বলিল, "অনিষ্ট? বরং ভালই করেছিস, তা ত' জগৎশুদ্ধ লোকে জানে। যাক গে, মেলায় এসে পৌঁছিল গাড়ী, আয় নামি। কলকাতায় ফিরে যা হয় করা যাবে। পয়সা ফেললে ভাল গোয়েন্দারও সাহায্য পেতে পারবো।"

দুই বন্ধুতে হাত ধরাধরি করিয়া মেলায় প্রবেশ করিল। মেলায় ভয়ানক ভিড়। হাজার হাজার লোক মেলা দেখিতে বা বিকিকিনি করিতে আসিয়াছে। উভয়ে বহুক্ষণ যাবৎ মেলায় ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া একটা দোকানে আসিয়া বসিল। দোকানদার তাহাদের জন্য ভাব চুলিতেছে, এমন সময়ে মাথায় উড়ানী-জড়ান একটা লোক দোকানে ঢুকিয়া বলিল, "ভাই, আমারে একটু জল খাওয়াতে—"

লোকটার কথা শেষ হইল না, হঠাৎ অরুণের দিকে দৃষ্টি পড়াতে তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল, সে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে অরুণ স্তম্ভিত হইয়া করিয়া অরুণের দিকে চাহিয়া রহিল। অরুণের দুই বাহিরে বেলা দিকে ছিল বলিয়া সে লোকটাকে ভাল দেখিতে পায় নাই। তাহার পর যখন সেই লোকটা ছুটিয়া অরুণের পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া "দাদাবাবু, দাদাবাবু" বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন অরুণ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সেই লোকটা আর কেহ নহে, জয়হরি কুলপী-ওয়ালা। তাহার চেহারা অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া গিয়াছে, তাহাকে অতিকষ্টে চেনা যায় মাত্র।

অরুণ তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "একি জয়হরি, তুমি এমন হয়ে গেছ? এতদিন কি করছিলে, কোথায় ছিলে? তোমার খবর ভাল?"

জয়হরি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি, দাদাবাবু। সেই তোমার সঙ্গে কামাখ্যায় দেখা হ'ল, তারপর দেশে চলে গেলুম। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখলুম ভণ্ড বাবাজী বেটার সব কথা মিথ্যে। রেগে কলকাতায় ফিরে সেই বেটার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে বেরুচ্ছিলুম, কিন্তু গেরোর ফেরে ফেরবার দিনেই আবার বেয়ামে পড়লুম। সেই যে বিছানা নিয়েছিলুম, তার পর ছমাস আমায় নিয়ে বন্দে মাতরম টানাটানি চলো। বাপপিতমোর পুণ্যিতে হাড় কখানা বজায় রইলো, কিন্তু দেহ আর সপ্তপু সারলো না। মাস খানেক হ'ল

উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছি। একটু সামলে নিয়েই আজ দিন সাতেক আগে কলকাতায় রওনা হয়েছি। পথে দুই একদিন বিলম্ব হয়েছে জিরো-বার জন্যে। গেল পরশু কলকাতায় পৌঁছেই সেই বাবাজী বেটার সন্ধানে বেরিয়েছিলুম, আমাদের পূর্ব্ব দেশের গো জান ত বাবু। মুড়ি-মুলীর বাসায় প্রথমে না উঠে আগে পাড়ার ময়রার দোকানে ঢুকলুম, ইচ্ছে আগে সব সন্ধান নিয়ে বাবাজী বেটাকে গলা টিপে ধরব। কিন্তু ময়রার গো প্রথমেই যে খবর দিলে তাতেই একবারে শুয়ে পড়লুম।"

অরুণ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি বাবাজী বাসায় নেই, এই ত'?"

জয়হরি বলিল, "না দাদাবাবু, ওখবরে বড় একটা এসে যেত না। সে খবরটা তোমারই সম্বন্ধে। আজ তোমায় স্বচক্ষে না দেখলে ঐ খবরটাই বিশ্বেস করে দেশে ফিরতুম। যখন শুনলুম, দাদাবাবু আমাদের জঙ্গলে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে, তখন দুর্ব্বল শরীরে সেই খবরটা সহ্য হল না, মাথা ঘুরে টলে পড়ে গেলুম। চেতনা হলে আর কোন কিছুতে আস্থা হ'ল না, অমনই দেশে ফিরতে প্রস্তুত হলুম, কলকাতায় থাকতে আর এক দণ্ডও ইচ্ছে হল না। তার পর দিনেই একজন সঙ্গী পেলুম, তার সঙ্গে দেশে যাত্রা করলুম। সেই বন্ধুই, আমায় মেলা দেখতে এখানে নামিয়েছে। কালই আবার রেলে চড়বার কথা। কিন্তু দেহতোর যোগাযোগ, তা না হলে এখানে নামব কেন, আর না নামলেই বা তোমার সঙ্গে দেখা হবে কেন? তোমায় যে আবার দেখবো, এ আশা ছিল না, মা কালীর দয়ায় যে বেঁচে ফিরে এসেছ, এই আমার সুখ। এখন বাবাজীর সন্ধান পাই না পাই ক্ষতি নেই। বেটা বদমাস ভণ্ড, ওর জুয়াচুরি ত' বুঝতে পেরেছি, তাই ঢের। ছোচ্চোর ভণ্ড বিটলে কালীঘাটের সেই খুনে কপাল কাটা ডাক্তার বেটার সঙ্গে যোগ দিয়ে ছুঁড়িটাকে খালাস করবার জন্যে মুড়ি-অলীর—"

অরুণ লাফাইয়া উঠিয়া কম্পিত হস্তে জয়হরির হাত ধরিয়া বিষম আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ডাক্তার? কার কথা বল্লে জয়হরি?"

জয়হরি অরুণের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল, ততোধিক বিস্মিত হইল সে তাহার প্রশ্নের ভঙ্গী শুনিয়া। সে বলিল, "কেন দাদাবাবু, সে ডাক্তারের খোঁজে তোমার দরকার কি? সে বেটা মহা পাতকী, মায়ের পীঠস্থানে বসে ঘোর নরকের পাপ কচ্ছে।"

"কে সে? তার সঙ্গে বাবাজীর সম্পর্ক কি? ঐ স্ত্রীলোকটা কেন মুড়ি-অলীর বাসার সামনে এসেছিল? ওর বাড়ী কোথায়? বল, বল, জয়হরি তুমি যদি জান এখই বল, বললে আমার বড় উপকার করবে।" অরুণের দেহ থর থর কাঁপিতে লাগিল।

সরোজ এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া উহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল, এইবার অরুণের ভাব দেখিয়া সে উহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিল এবং দোকানীর হাতে দুইটী টাকা গুঁজিয়া দিয়া একটা নির্জ্জন স্থান দিতে বলিল। সেখানে অরুণ, সরোজ ও জয়হরির মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সেই কথোপকথনের ফল পাঠক পরে জানিতে পারিবেন।

* * * *

আজ কালীশঙ্করের রাজপ্রাসাদ তুল্য বিশাল ভবনে মহা মজলিস বসিয়াছে। প্রকাণ্ড হল-ঘরে বিস্তর লোক জমায়েৎ হইয়াছে। সকলের অনুরোধে স্বয়ং সার আর্থার কেনেডি বিচারপতির আসনে বসিয়াছেন, তাঁহার একপার্শ্বে কালীশঙ্কর, রামসদয়, সরোজ, অরুণ ও রমেশ এবং অপরপার্শ্বে বাবাজী, ডাক্তার, মুড়ি-অলী, গিরিবালা, মেসের বাবুগণ এবং আরও দুই তিনটী পাড়ার লোক উপবিষ্ট রহিয়াছেন। (অনিলাও যে পার্শ্বের কক্ষে

গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না)। প্রথমে সাহেব সকলকে অভয় দিয়া সত্য কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি নিরপেক্ষ বিচার করিবেন এবং বাদিনী যদি তাহার দাবী প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি প্রতিবাদীপক্ষকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন।

একে একে সকলে সাক্ষ্য দিল। প্রথমে গিরিবালার সাক্ষ্যে প্রমাণ হইল যে, সে বিধবা, অরুণ তাহাদের পাড়ায় প্রায় যাইত এবং তাহার সহিত গোপনে প্রেমালাপ করিত, তাহার পর তাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলে লোকলজ্জার ভয়ে নিজের কাছে আনিয়া রাখিবার জন্য একদিন ঘোর দুর্য্যোগের সময় তাহাকে কুলের বাহির করিয়া লইয়া আসে এবং মুড়ি-অলীর দোকানের সন্নিকটে তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেয়; ঠিক সেই সময়ে অম্বটা (অরুণের ইচ্ছাক্রমে কি না সে বলিতে পারে না) লাফাইয়া উঠিতেই সে পড়িয়া যায় এবং তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগে। তাহার পর বহুদিন সে অচৈতন্য ছিল! যখন চেতনা হইল, তখন হইতে সে আর তাহার পূর্ব্বের ঘর সংসারের কথা কিছুই মনে করিতে পারে না। তবে সে মুড়ি-অলীর বাসাতেই পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে এবং অরুণ এযাবৎ তাহার সমস্ত ব্যয় বহন করিতেছে। রমেশ বাবু যদি তাহার খোর-পোষ বন্ধ না করিতেন এবং তাহাকে ঐ বাসা হইতে উঠাইয়া দিবার ভয় না দেখাইতেন, তাহা হইলে এই সমস্ত কেলেঙ্কারী হইত না।

মুড়ি অলী ও বাবাজী গিরিবালার কথার প্রতিধ্বনি করিল মাত্র। বাবাজীর কথার ভঙ্গীতে সেই গুরুতর বিষয় মীমাংসাকালেও একটা অস্ফুট হাসির রব উঠিল। ডাক্তারের সাক্ষ্যের সময় সমস্ত ঘটনা নিস্তব্ধ হইল। ডাক্তারও পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষীগণের সমর্থন করিলেন, অধিকন্তু বলিলেন যে, অরুণ বাবু তাঁহাকে গোপনে বলিয়াছিলেন যে অম্বালেবা যদি তাঁহার পরম প্রিয়, সুতরাং তাহাকে বাঁচাইতে যত টাকা ব্যয় হয় সমস্তই তিনি স্বয়ং বহন করিবেন। মেসের বাবুরাও সাক্ষ্য দিলেন যে, তাহারা অনেকে অরুণ বাবুকে সময়ে অসময়ে মুড়ি-অলীর বাসার ভিতরে যাওয়া আসা করিতে দেখিয়াছেন। বাবুদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে, অরুণবাবু আসাম যাত্রার পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার সময় মেস-বাড়ীতে গিয়া রমেশকে তাঁহার হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটীর ভার লইবার জন্য সাগ্রহে অনুরোধ করিয়াছিলেন এ কথা তাঁহারা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। সর্ব্বশেষে রমেশের পালা পড়িল। গিরিবালার কথিত মত রমেশচন্দ্র নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাহেবের হাতে অরুণের সর্ব্বনাশ প্রদান করিল।

সাহেব এইবার অরুণকে তাহার পক্ষের কথা বলিতে আদেশ করিলেন। অরুণ অনতিক্ষোভে নির্ভয়ে তাহার সমস্ত কথা বলিয়া গেল। তাহার পর সাহেব সাক্ষীগণকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। সাহেবের জেরাতে গিরিবালার মুখে এইটুকু প্রকাশ পাইল যে, সে তাহার পূর্ব্বের ঘরদুয়ারের অথবা আত্মীয়স্বজনের কথা পীড়াদেহে ভুলিয়াছে অথচ অরুণের সহিত সম্পর্কের কথা ভুলে নাই। মুড়ি-অলী ও বাবাজীর কথায় নূতন কিছুই প্রকাশ পাইল না।

ডাক্তারের জেরাকালে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ডাক্তার প্রথমে বলিলেন যে, তিনি বাবাজীদের চিনিতেন না, তিনি ঘটনার দিন ভবানীপুরে একটা রোগী দেখিয়া ফিরিতেছিলেন, সেই সময় বাবাজী তাঁহাকে পথ হইতে লইয়া যায়। সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই রোগীর বাড়ী কোথায় এবং তাঁহার বাড়ী কোথায়, তখন ডাক্তার সপ্রতিভ হইয়া ঠিকানা দিলেন। কিন্তু যখন সাহেব হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার বাড়ী কালীঘাটে, তাঁহার নাম

প্রবীণ ডাক্তার, রামতারণ ডাক্তার নহে, তখন তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, এতো আর আদালত নয় যে, শপথ করা হচ্ছে, এ কেবল বাড়ী ডেকে এনে ভদ্রলোককে অপমান করা হচ্ছে, অতএব এখান থেকে চলিয়া যাওয়াই উচিত। এই কথা বলিয়া যেন তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, অমনই সরোজ তাঁহার পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে বলিল, "এখান থেকে এখন একপাও কেউ নড়তে পারবে না। বিচার চেয়েছে যারা, তার বিচার সাঙ্গ না হলে যেতে পাবে না।"

বাবাজীদের দলের সকলের ভিতর একটা আশঙ্কিক চাঞ্চল্য দেখা গেল। রমেশও একটু বিচলিত হইবার ভাব প্রকাশ করিল। জেরা চলিতে লাগিল। মেসের বাবুদের জেরার সময় আর একটা নূতন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহাতেও বাবাজীর দলে আরও অধিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সার্কেল মহাশয় জেরার মুখে বলিয়া ফেলিলেন যে, তিনি ঘটনার দিন কেন, ঘটনার দিনের পূর্ব্বেই ঐ খোকার মাকে মুড়ি-অলীর বাসায় থাকিতে দেখিয়াছেন এবং তিনি হলপ করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি মুড়ি-অলীর সঙ্গে ইহাকে একদিন মহা কলহ করিতে স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, একথা তিনি মেসের অন্যান্য বাবুদিগকে হয়ত অনেক পূর্ব্বে বলিয়াছেন।"

কক্ষে মহা উত্তেজনা-স্রোত দেখা দিল। সাহেব সকলকে নিস্তব্ধ হইতে বলিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই বাবুরা বলছেন, তাতে প্রমাণ হচ্ছে, ঘটনার দিনের আগে থেকে এই স্ত্রীলোক মুড়ি-অলীর বাসায় ছিল এবং সেকথা মুড়ি-অলী বা বাবাজীর জানা ছিল; অথচ মুড়ি অলী ও বাবাজী বলছে যে, অরুণবাবুই প্রথমে ওকে এনে ঐ বাসায় তুলেছেন তা হ'লে এদের কথা মিথ্যে বলেই প্রমাণ হচ্ছে। এতে বাবাজী তোমাদের কিছু বলবার আছে?"

বাবাজী সাফাই গাহিয়া বলিলেন যে, "মেসের বাবু নিশ্চয়ই দূর থেকে ভুল দেখেছেন ভুল শুনেছেন, তাঁরা যখন বলছেন অরুণ বাবুই প্রথমে মেয়েটাকে বাসায় এনে তুলেছেন, তখন উনি নির্ব্বাক আর কোন স্ত্রীলোককে বাসায় ঝগড়া করতে শুনেছেন।

সাহেব এতক্ষণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন, এইবার বলিলেন, "আর আমি যদি আর একজন সাক্ষী এনে প্রমাণ করাতে পারি যে ঐ স্ত্রীলোকটী ঘটনার দিনের পূর্ব্ব হতেই মুড়ি-অলীর বাসায় ছিল, তা হ'লে বাবাজী কি বলবে, রমেশ বাবুই বা কি বলবেন?"

রমেশ চমকিয়া উঠিল। তাহার বিস্ময় অপ-সারিত হইতে না হইতে পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া রামদয় বাবু একটী নূতন লোককে লইয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন; তিনি সাহেবের ইঙ্গিতে আগেই উঠিয়া গিয়াছিলেন। আগন্তুককে দেখিয়া বাবাজী, মুড়ি-অলী, গিরিবালা ও ডাক্তার যুগপৎ দারুণ ভয়বিস্ময়ের ধ্বনি করিয়া উঠিল, যেন তাহারা প্রেতাত্মা দেখিয়াছে এইরূপ আতঙ্কের ভাব ব্যক্ত করিল।

রমেশচন্দ্র আশ্চর্য্য হইল। একি, এ ত' জয়হরি কুলপী ওয়ালা, ইহাকে দেখিয়া উহারা এরূপ আতঙ্কিত হইল কেন? একি, বাবাজী ও ডাক্তার পলাইবার চেষ্টা করিতেছে কেন? বস্তুতঃ বাবাজী প্রথমে পলাইবার পথ খুঁজিতেছিল, কিন্তু সরোজের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইয়া অনুযোগ করিল যে, কুলপী-ওয়ালা চোর, মুড়ি-অলীর যথার্থবন্ধু লইয়া দেশে চম্পট দিয়াছিল, উহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

এই সময়ে জয়হরি অগ্রসর হইয়া কটমট দৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে চাহিয়া কঠোরকণ্ঠে বলিল, "আমার কথায় বিশ্বাস হবে না, আমি চোর, কেমন না বাবাজী? আমি চোর, আর তুই সাধু? ভণ্ড জোচ্চোর! হুজুরেরা সব দেখেছেন, আমি যদি চোর, তবে আমায় দেখে ওরা আঁৎকে উঠবে

কেন, পালাবার পথ খুঁজবে কেন? হুজুর, ধর্ম্ম সাক্ষী করে বলছি, আমি চুরির বিন্দুবিসর্গ জানি নি, এই জোচ্চোর বাবাজী মিথ্যে ভয় দেখিয়ে আমায় কলকাতা ছাড়া করেছিল। কেন, তা এখন বেশ বুঝতে পেরেছি। আজ আট মাস কাল পরে মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে বকুল বাগানে ফিরে এসে বাবাজীর খোঁজ করতে গিয়ে যখন মুড়ি-অলীর বাড়ী থেকে কালীঘাটের কপালকাটা খুনে ডাক্তারকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলুম, তখনই বুঝে-ছিলুম যে, যে চুঁড়িটার জন্যে বাবাজী বেটা আমায় কলকাতা ছাড়া করেছিল, তার সম্বন্ধে কিছু রহস্য আছে।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম, সব ভেঙ্গে বল।"

জয়হরি আবার বলিতে লাগিল, "সব বলছি, আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরে শুনে যান। এই আমার দাদাবাবু—এই যে আপনাদের অরুণবাবু—আমার মত গরীব দুঃখীদের উপর বাঁর দয়া মায়ার কথা একমুখে বলতে পারি নি—সেই দাদাবাবুর মৃত্যুর কথা শুনলুম, তখন আর একদণ্ড কলকাতায় থাকতে ইচ্ছে হ'ল না। তাই যখন দেশে ফিরে যাবার দিন মুড়ি-অলীর বাসার দিকে আসতে আসতে দূর হতে জগদীশ ডাক্তারকে বেরুতে দেখলুম, তখন মনে নানা সন্দেহের কথা উদয় হলেও কিছু না বলে রেলে চেপে দেশে রওনা হলুম। ভাগ্যে খড়দার মেলায় দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হল আর ঐ কপাল কাটা খুনে ডাক্তারের কথা উঠলো, তাই সব বুঝতে পারলুম। হুজুর, ঐ বেটা ডাক্তা-রীর ভাণ করে অনেক দিন থেকে কালীঘাটে এক পাপের আড়ত খুলে বসেছে। সেখানে হয় না এমন কাজ নেই। গর্ভপাত ভ্রূণ-হত্যা, মেয়ে চুরি, মেয়ে বেচা, ইত্যাদি সকল গর্হিত কাজই হয়? মিথ্যে সার্টিফিকেট, জাল জুয়াচুরি, লুকিয়ে বিষ দেওয়া, সংসারের এমন অপকর্ম্ম নেই যা না ঐখানে হয়। তাই ওর নাম শুনে ডাক্তার। একবার এক পাড়াগাঁয়ে গেরস্তর মেয়ে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এমন মার খেয়েছিল যে এখনও ওর কপালে তার দাগ আছে, আর একবার কালী-ঘাটের ঐ রকম এক কাণ্ডে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল—"

অরুণ এই সময়ে বলিয়া উঠিল, সে কাজের কথা আমি জানি, তখন আমি কালীঘাটে খেলতে যেতুম।"

জয়হরি আবার বলিতে লাগিল, "তার পর সে পাড়া ছেড়ে সা'নগরে গিয়ে উঠলো, সেখানেও ঐ ব্যবসায় চালাতে লাগলো। এই মেয়েটাকেও নিশ্চয় ঐ বেটা কোন গেরস্তর ঘর থেকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে বাবাজীর জেম্মায় রেখেছে—"

ডাক্তার লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "দাদাই আপনাদের, এ মেয়ের কথা আমি জানি নি। মুড়ি-অলী ওকে খুব ছেলেবেলায় দক্ষিণের এক কায়স্থ গেরস্থর বাড়ী থেকে চুরি করে এনেছিল, ও মাগী তাদের বাড়ীর ঝি ছিল—"

মুড়ি-অলী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ করেছি এনেছি, তোর তাতে কিরে ডেরা মুখপোড়া! মিন্সে সাদ্ সাজতে এয়েছে, মর আর কি! আরে তুই মুখপোড়া যে ট্যাকার লোভে ওর মিথ্যে মাথার পোঁড়ের দোহাই দিয়ে এইখেনে রাখিয়ে দিলি, তার বেলা দোষ হল না? নচ্ছা কে,থাকার, আলায় বলে মাগী! মাগী তোর—"

বাবাজীর সমস্ত ইসারা ইঙ্গিত ব্যর্থ হইল। মুড়ি-অলী রাগের বশে ভিতরের সব কথা বলিয়া ফেলিল। তখন সাহেব ধীরে ধীরে মুড়ি-অলীকে বলিলেন, "হাঁ বাছা তুমি ভাল লোক, তুমি মাগী হতে যাবে কেন? ঐ ডাক্তারটাই যত নষ্টের গোড়া। তা ওকে পেলে কোথায়?"

বাবাজীর গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি

কথা পাল্টাইয়া লইবার চেষ্টায় বলিল, "হুঁ ডাক্তারটা যেন কেমন ধারা নোক গো! ডাক্তার—"

ডাক্তার তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "বটে ডাক্তার মন্দ লোক হ'ল? ঐ ত' নিজের মুখে বলেছে, তা ছাড়া আমিই ত ওরে বাঁচিয়ে দিই—"

"কোন রতনপুর?"—ভয়ঙ্কর উত্তেজিত স্বরে রমেশ এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। এতক্ষণ রমে-শের দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না, এখন সকলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে রমেশের চেহারা বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। গিরিবালার চোখেও দারুণ বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকটিত।

ডাক্তার জবাব দিবার পূর্ব্বেই মুড়ি-অলী চীৎ-কার করিয়া বলিল, "তুমি আমায় বাঁচিয়ে দিয়ে-ছিলে, না? মেয়ের রোজগারে ভাগ বসিয়েছিস কে? কেবল ঐ রাধা মিত্তিরের মেয়ে নয়? তা ছাড়া কত ভদ্দরলোকের মেয়ে রোজগারের জন্যে তুমি কালীঘাটে রেখেছিলে—"

রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কোন রতন-পুর? কোন রাধারমণ মিত্তির? বল, বল।"

মুড়ি-অলী নাক ঘুরাইয়া বলিল, "আহা, যেন নেকা? রতনপুর আবার কটা? ঐ গোপাল নগরের কাছে গো। ঐ নাটের গুরু ডাক্তার—"

আর বলিতে হইল না, রমেশ ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ সে দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, সকলে অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর যখন সে কথা কহিল, তখন সকলে তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন।

রমেশ গিরিবালাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ওকে কি সবাই পুঁটী বলে ডাকত? ওর আসল নাম কি সুরবালা ছিল?"

মুড়ি-অলী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন বল দেখি বাবু?"

রমেশের চোখ দুটা কোটর হইতে ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সবলে মুড়ি অলীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বল, বল!"

"আঃ বলছি, হাত ছাড়, হাতে নাগে যে বাবু। রাধা মিত্তিরের বাড়ী কাজ করতুম আমি, ঐ গাঁয়ে কৈবর্ত্তদের মেয়ে কি না আমি। রাধা মিত্তির বুড়ো বয়েসে দোজপক্ষে বিয়ে করলে, নতুন বৌ ঘরে এসে সতীন ঝিকে বড় যন্ত্রণা দিতে লাগলো। এই গিন্নিবালা বলে যাকে দেখছো, এই সেই সতীন ঝি গো, এইই নাম—"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ"—রমেশ বিকট হাস্য করিয়া উঠিল, সকলে তাহার ভীষণ চেহারা দেখিয়া ভীত হইলেন। রমেশ উন্মাদের মত বিকট হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ হয়েছে, পাপের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। তুমি রমেশ—কুঁড়েঘরের গরীব মা বাপের সন্তান—তুমি রাজতক্তের স্বপ্ন দেখছিলে, না? বড় বুদ্ধিমান তুমি! অরুণ ধনকুবেরের একমাত্র সন্তান —বড় হিংসে তার! তার হিংসেয় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল, কেমন না? অরুণ সব নিয়েছে, আবার অনিলাকে—ত্রিভুবন সুন্দরী অনিলাকেও নেবে! রমেশ, তোর বুদ্ধি কোথা গেল? কালীঘাট থেকে তোর সেই মেয়ে মানুষটাকে নিয়ে আয়। কোন মেয়েমানুষটা? কেন, যেটা শেষ মুড়িঅলি তোকে যুগিয়ে দিয়েছিল। এই মেয়ে থাকতে এমন অনেক মেয়ে মানুষ ত' মুড়ি-অলী তোকে যুগিয়েছে। এটা কে? এটা রতনপুরের রাধারমণ মিত্তিরের মেয়ে। বাঃ বাঃ কি যোগাযোগ! এই রাধা মামার প্রথম পক্ষের মেয়েই ত' দশ বছরের সময় হারিয়ে যায়! রাধা মামা! আপন মামা তোর রমেশ। খুব বুদ্ধি তোর, হাঃ হাঃ হাঃ—" রমেশ দুই হাতে মুঠা মুঠা চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ঘরের বাহির হইয়া গেল,

অরুণের ইঙ্গিতে সরোজ তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

এই বিচিত্র কাণ্ডের আর বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার প্রবৃত্তি হয় না। পাপীর নিজমুখেই সমস্ত পাপের কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। মেঘমুক্ত নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মত অরুণকুমার এই ঘটনাচক্র হইতে বাহির হইয়া আসিল। অনুতপ্ত রামসদয় সকলের আগে অরুণের দুইটী হাত ধরিয়া ছল ছল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার চোখ ছুটি নীরব ভাষায় অরুণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। কালী শঙ্কর বাবু সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বাবাজীর দলকে পুলীশের হাতে না দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু একথাও বলিয়া দিলেন যে, যদি অতঃপর তাহাদের কাহাকেও কলিকাতায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে আর ক্ষমা করা হইবে না।

সপ্ত বিংশতি পরিচ্ছেদ

স্মৃতি-মন্দির

"বল, নিয়ে যাবে, বল। না বল্লে এমনি রাগ করবো, সে আর কি বলবো! হাঁ, সত্যি বলছি, বড্ড রাগ করবো,"—অরুণের বিশাল উরসে ন্যস্ত-শিরা অরুণের কণ্ঠলগ্না অনিলা কৃত্রিম কোপের সহিত এই কথা কয়টী বলিল।

আজ ছই মাস হইল অরুণের সহিত অনিলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, স্বয়ং সরোজনাথ সেই বিবাহের প্রধান উদ্যোগী। সে ঘটা, সে ধুমধাম, দীয়তাং ভুজ্যতাং, সে আমোদ প্রমোদ, সে নাচগান, সে হাসি তামাসা ভবানীপুর ও বালিগঞ্জের লোকের বহুদিন মনে থাকিবে। অরুণ এ সকলে একবারে নারাজ ছিল, কিন্তু সরোজের উৎসাহের তোড়ের মুখে এবং চারিজন বুড়ার (কালীশঙ্কর রামসদয় স্যার আথার কেনেডি ও কোঠারে মহাশয়ের) নির্ব্বাতিশয়ে তাহার আপত্তি ভাসিয়া যায়।

আজ অরুণ ত্রিতলের বসিবার কক্ষে আরাম কেদরায় ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়া একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিল। এই ছুটা মাস যে যেন এক স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়াছে ফিরিয়াছে, বেড়াইয়াছে, বসবাস করিয়াছে। সত্যই কি সে অনিলাকে পাইয়াছে? না, এ কোন স্বপ্ন? না, স্বপ্ন ত' নয়। সরোজ যা বলেছিল তা ত' সত্য। এই ছই মাসে প্রত্যেক খুটিনাটি কাজে সে যে তাহার প্রতি অনিলার প্রগাঢ় প্রেমের বহু পরিচয় পাইয়াছে। আর চোখের সামনে কাগজখানা থাকিলেও এবং চোখ ছুটা কাগজের উপর পড়িয়া থাকিলেও অরুণের চিন্তাধারা পূর্ব্বোক্ত খাতেই প্রবাহিত হইতেছিল। ঠিক এমনই সময়ে অনিলা টিপি টিপি ঘরে ঢুকিয়া একবারে কাছে আসিয়া কাগজখানা টান মারিয়া ফেলিয়া দিল এবং কৃত্রিম ক্রোধাভিমানজড়িত স্বরে পূর্ব্বোক্ত অনুযোগ করিল; তাহার কথার সুরে অভিমান আর ক্রোধ, কিন্তু অধরের কোণে ছুই হাসি, চোখের কোণে অতৃপ্ত ভালবাসার বিলোল কটাক্ষ।

অরুণ সেই ভুবন সুন্দরী কিশোরীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ক্ষণকাল নীরবে চক্ষু নিমিলিত করিয়া রহিল, ভাবিল সত্যই কি সে ভগবানের অপার দয়ায় তাহার অনিলাকে প্রেমময়ী পত্নীরূপে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। স্বামীর আদরে অনিলাও ক্ষণকাল ভাবাবেশে বিভোর হইয়া রহিল। তাহার পর অনিলা তাহাকে নীরব দেখিয়া বলিল, "বল না, কি ভাবছ? ওঃ নিয়ে যাবে না বুঝি! তাই চুপ করে আছ? আচ্ছা বেশ,—" এই কথা বলিয়া অনিলা চঞ্চল হয়ে অরুণের জামায় বোতাম খুলিতে ও পরাইতে লাগিল।

অরুণ প্রগাঢ় প্রেমাবেশে তাহার সেই সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিল, "নিলা

পরীক্ষার কি শেষ হয় নি? এ বাড়ীতে আমি কে? সর্ব্বেসর্ব্বময়ী কর্ত্রী তুমি, তোমার হুকুমে কে নাচলে? তুমি—"

অনিলা কোমল করপল্লবে অরুণের মুখ চাপিয়া কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, "যাও! কি যে বল, ছাই!"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "না নিলা, আমি কি মিথ্যে বলেছি, এ বাড়ীতে আমার উপরোধ অনুরোধ না থাকতে পারে, কিন্তু তুমি যা বলিবে তা পালন হয়বে না, এমন লোক কে আছে? বাবা কি তা হ'লে তাকে আস্ত রাখবেন? কি জানি, কি মন্তর জান, বাবাকে ত' একবারে বশ করে ফেলেছ—"

অনিলা তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর তোমাকে?" অরুণও হাসিতে হাসিতে বলিল "ইস্! তা আর হতে হয় না। সে বরং আমি এককালে বলতে পারে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই গো মশাই, তাই। এখন, যা বলছিলুম, তার কি হ'বে?"

"হার আর কি? সে ত' হয়েই রয়েছে। যখন তুমি বলেছ যাবে, তখন হবেই,—"

অনিলা স্নিগ্ধহস্তে তাহার মুখ চাপা দিয়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে বলিল, "দেখ, এক শো বার অমন কথা বোলো না। ঠাট্টা তামাসা করে একবার আধবার বল্‌লে, এই ঢের। আমি কে? আমি তোমার চরণ সেবার দাসী। আর বাবা? তিনি দেবতা, তাঁকে আমি যথার্থ মনে মনে পূজো করি, তাঁর সম্বন্ধে এমনই করে বল্‌লে আমার মনে বড্ড ব্যথা লাগে।" অনিলার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

অরুণ বিস্মিত হইল না, সে অনিলার ভিতর বাহির সমস্তই জানিত। সেও ভারি গলায় বলিল, "না নিলা, আর বলবো না। যাওয়া ত' ঠিকই আছে। তুমি যেদিন প্রথমে এই কথা পেড়েছিলে, সেই দিনেই বাবা মত দিয়েছিলেন। তবে তখনও পথঘাট সব নিরাপদ হয় নি বলে তোমায় নিয়ে যেতে সম্মত হন নি। এখন সাহেব নিজে গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করছেন। তোমার মনের ইচ্ছা যে দিন ব্যক্ত হয়েছিল, সেই দিন হতেই সাহেব এই কাজে উদ্যোগী হয়েছেন। সাহেবের চিঠি পেয়েছি, সাডিয়া থেকে সিবাং-মাবো পর্য্যন্ত সমস্ত পথটাই এখন রীতিমত পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছে। এই বার সাহেব আমাদের যেতে বল্‌লেই রওনা হ'ব। সরোজকে বলেছি, সে কিন্তু যেতে চাইছে না, অথচ আগে বিদেশে বেড়াতে এত ভাল বাসতো!"

অনিলা বলিল, "আহা, সরোজদার মত মানুষ কি হয়!"

অরুণ উৎসাহভরে বলিল, "তা ঠিক, ওর তুলনায় একটা মানুষও ত' আমি দেখতে পাই নে। ওর কথা উঠ্‌লে এবং রমেশের কথা মনে পড়ে, তখন ভাবি ভগবান কত ভিন্ন ধাতুতে মানুষ গড়েছেন—"

অনিলা বাধা দিয়া বলিল, "ও লোকটার নাম মুখে এনো না। এত শয়তান, এত খল—"

অরুণ বলিল, "তার শাস্তিও চরম হয়েছে, একবারে উন্মাদ হয়ে গেছে। বাবা তাকে বহরমপুরের পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন। সকলেই বলছে, তা না হলে সে খুব সম্ভব আত্মহত্যা করতো।"

অনিলা বলিল, "যাক্, ওর কথা থাক, ওকথা মনে হ'লেই কষ্ট হয়। দেখ, গঙ্গাটাও যেতে চাচ্ছে। ওকে নিয়ে যাবে ত'?"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "ওকে না নিয়ে গেলে তোমার কাছে পার আছে কি না! আর যাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, সে সব ত' আগেই বাবার কাছে ঠিক করে ফেলেছ।"

অনিলা আরও দৃঢ়বন্ধনে অরুণের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া প্রেমপুলকিত নয়নে অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবু তুমি একবার বল।"

অরুণ হাসিয়া বলিল, "ওঃ আমার হুকুম না হলে

বুঝি হবে না? তবে ত' আমি একটা যে সে লোক নই। তোমার যাকে ইচ্ছে হবে নেও, বাবা কাউকে বারণ করবেন না। অমিকে নিতেই হবে, সে ত আমায় ছিঁড়ে খেয়ে ফেললে। আর দেখ, সরোজকে তুমি একবার বলে দেখ না, তোমার কথা ফেলতে পারবে না।

অনিলা হাসিয়া বলিল, "বেশ মানুষ যা হ'ক, আমি বললেই হবে যেন।" তাহার পর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখ, সরোজদাকে পীড়াপীড়ি করে কাজ নেই। তুমি বলেছ, অথচ তোমার কথাও মনে রাখতে অসম্মত হচ্ছে, তখন নিশ্চই কোন কারণ আছে। সরোজদা তোমায় কত ভালবাসে, কি চক্ষে দেখে তা জান ত'?"

"জানি নি?"—বলিতে বলিতে শক্তিমান অরুণের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। সে আবার বলিল "সরোজ আমার জন্যে করতে পারে না এমন কাজ নেই। সেই সরোজ কেন আমার কথা রাখছে না, বুঝতে পারলুম না।"

কথাটা চাপা দিবার জন্য অনিলা অন্য কথা পাড়িল।

• • •

ঘোর রোলে গর্জ্জন করিয়া বেগবতী সিবাংনদী ব্রহ্মপুত্র-সঙ্গমের উদ্দেশে ছুটিয়াছে। ভীষণ জলাবর্ত্ত কুণ্ডলি চক্রের ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুরিতেছে। কত তৃণলতা বাষ্পীয় শকটের গতিতে নদীর খর স্রোতে বাহিত হইয়া নিমিষে অন্তর্দ্ধান করিতেছে। নদীর জল যেন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, আর সেই জলে অস্তমিতপ্রায় তপনদেবের রক্তআভা পড়িয়া কি শোভাই ফুটাইয়াছে!

নদীতটের শ্যাম বনরাজী রক্তরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই রাঙ্গা আলোয় স্নাত হইয়া দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি হাত ধরাধরি করিয়া নদীতটাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, সেই মূর্ত্তি দুইটী অরুণ ও অনিলার। জলেস্থলে রাঙ্গা আলো, সেই আলোয় তাহারাও আলোকিত। মাথার উপর শব্দায়মান বিহঙ্গকুল কুলায় অভিমুখে উড়িয়া যাইতেছে, ক্রমে গোধূলির আলো-আঁধার ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে।

নদীতটে জনপ্রাণী কেহ নাই; নদীবক্ষেও প্রাণের সাড়া নাই, নদীর পরপারেও সাড়াশব্দ নাই অরুণ বেড়া-ঘেরা একটী স্থানের সমীপবর্ত্তী হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, সেই স্থানটীর মধ্যে আর কিছু নাই, কেবল একটী কুসুমিত করবীতরু। কম্পিত কণ্ঠে অরুণ বলিল, "নিলা এইখানে।"

অনিলা চকিতে স্বামীর মুখখানে তাকাইয়া দেখিল, সে মুখে কি ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে! তাহার দৃঢ় বলিষ্ঠ স্বামীর দেহ বাত্যান্দোলিত বেতস পত্রের মত থর থর কাঁপিতেছে, তাহার স্বামীর বিশাল নয়ন দুটী অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে। অনিলা গুরু আশঙ্কিনে স্বামীর দেহ আবদ্ধ করিয়া রহিল। অনিলা সান্ত্বনার কথা কহিতে গেল, কিন্তু তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। সে কেবল তাহার কোমল করে স্বামীর হাতখানি ধরিয়া সজল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। ক্ষণপরে ভূতলে নতজানু হইয়া পথের ধূলায় মাথা লুটাইয়া অস্ফুট অব্যক্তস্বরে বলিল, "দিদি! সতী সাধ্বী পুণ্যবতী তুমি! কি ছার কীটানুকীট আমি, তোমার চরণ রেণুরও যোগ্য নই। তুমি তোমার অক্ষয় অনন্ত পুণ্যবলে আমায় এই সুখের অধিকারী করে দিয়ে গিয়েছ। স্বর্গ থেকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার এই অমূল্য দানের উপযুক্ত হ'তে পারি।"

যখন অরুণ সযত্নে অনিলার হাতখানি ধরিয়া তুলিল, তখন অনিলার নীলোৎপল নয়ন দুটী জলে ভাসিয়া গিয়াছে; অনিলা ফুঁফাইয়া ফুঁফাইয়া কাঁদিতেছে। অরুণ সেই প্রেমপ্রতিমাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রেমভরে মুখচুম্বন করিল, তাহার নয়নের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "চল নিলা, বাসায় যাই।"

আবার অনিলার চোখ দুটী জলে ভরিয়া আসিল সে স্বামীর হাঁ'ত দুটী ধরিয়া আগ্রহপূর্ণ নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

অরুণ সস্নেহে তাহার কপোলদেশ হইতে অনক-গুচ্ছ অপসারিত করিতে করিতে বলিল, "কি অনুরোধ? তোমার কোন্ অনুরোধ—"

অনিলা ভারি গলায় বলিল, "বল, এইখানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করে দেবে?

অরুণ বলিল, "তাই হবে, নিলা। আমার মনের বাসনার প্রতিধ্বনি করেছ তুমি। মৈথিলী ত' এ পৃথিবীর ছিল না!"

• • •

কালীশঙ্কর বাবু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে লইয়া আগামের কালা জঙ্গল সিবাংআবো গ্রামে আসিয়াছেন। তাহারা সকলেই বার বার অরুণের সেই আত্মদানের স্থান দেখিয়াছেন এবং সেই স্থানে একটী স্মৃতিরক্ষার মন্দির করিয়াছেন। কিন্তু কেহই সেই ক্ষুদ্রায়তন করবী-চিহ্নিত নিভৃত স্থানটী দেখিতে যান নাই—যেখানে আর একটী অক্ষুত আত্মদান ব্যাপার নীরবে সংঘটিত হইয়াছিল। এই পৃথিবীতে কত স্থানে কত সময়ে ঐরূপ কত নীরব নিঃস্বার্থ আত্মদান ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে, কয়জনেই বা তাহার সংবাদ রাখে?

অনিলা কিন্তু একটা উদ্দেশ্য লইয়াই সিবাং-আবো আসিয়াছিল। সে অরুণের কীর্ত্তিকলাপের স্থান ত' দেখিলই; পরন্তু স্বামীর সঙ্গে সেই সিবাং তটে করবী মূলে—যেখানে মৈথিলী প্রাণ বলি দিয়া আপনার প্রিয়তমকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল—যেখানে প্রত্যহ গোধূলির অব্যবহিত পূর্ব্বে—যে সময়ে মৈথিলী তাহার প্রিয়তমের বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া এই মরজগৎ হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছিল—সেই সময়ে অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা ভালবাসার উপহার দিতে আসিত। অনিলার চক্ষে মৈথিলী অতুলনা সতী, তাই সে সেই সতী-তীর্থে পূজা দিয়া পরম শান্তিলাভ করিত। অনিলা পুষ্পগন্ধ ধূপদীপাদি দিয়া অর্ঘ্যা নৈবেদ্য অর্ঘ্যাদি সাজাইয়া করবী তলে পূজা দিত না; কিন্তু প্রত্যহ সে পূজান্তে বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যদি কেহ সে স্থানটী লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইত সেই করবী তলের মৃত্তিকা বিনা বারিপাতে ভিজিয়া গিয়াছে। অনিলা কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রত্যহ নয়নাসারে সেই স্থানের পূজা করিত।

তাহার পর অনিলার অনুরোধে কালীশঙ্কর সেই স্থানে বহু মূল্যব্যয়ে একটী স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-মূর্ত্তি কিছুই ছিল না, মাত্র গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে মর্ম্মর-বেষ্টনীর মধ্যে একটী কুসুমিত করবীতরু। তাহারই নিত্য পূজা, ভোগ, আরত্রিক হইত; তাহারই প্রশস্ত অতিথি অভ্যাগতের মধ্যে বিতরিত হইত। মন্দির-শীর্ষে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল:—

"সতী-মন্দির"

আর মন্দির-সোপানের পদতলে লিখিত হইয়াছিল:—

"ভরণ-সেবিকা অনিলাবালা"

সম্পূর্ণ।

রাত্রির ধ্বনি

(খণ্ডগিরির ডাক-বাংলোয়,—ঘোর দুর্য্যোগে)

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

ঝিম্-ঝিম্ ঝিম্-ঝিম্ ; ঝিম্-ঝিম্ ঝিম্-ঝিম্,
থম্-থম্ দুম্-দুম্, দিদ্দিম টিম্-টিম্ !
উস্‌খুস্ চিত্ত—ধুক্‌পুক্-ধুক্‌পুক্ !
যন্ত্রার লাল চোখ—খক্‌খক্ খুক্‌খুক্ !
শাঁৎ সব ছাঁৎ-ছাঁৎ, স্যাঁৎ-স্যাঁৎ, হিম-হিম,
ঢাক্ মুখ, বোঁজ্ চোখ—ঝিম্-ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ !

চুপ্ চুপ্ ! ঐ শোন্—রম্-ঝম্ রম্-ঝম্ !
ঝঞ্ঝার ঝন্-ঝন্,—চারধার্ গম্-গম্ !

বাদ্‌লার ঝুপ্‌সী—ঝর্-ঝর্ ঝুপ্-ঝুপ্ !
চক্ষে ঘুম্-ঘুম—বক্ষের তাল খুব !
ঝুন্-ঝুন্ ঝুম্-ঝুম্ ঝিঁঝির ঝুমঝুম্ !
বিজ্‌লী ঝিক্‌মিক্ ! অগ্নির বুদ্বুদ !
জল খায় ঘোর রাত্—চক্-চক্ সুপ্‌সুপ্ !
সিক্ত পৃথ্বী—ঝর্ঝর্, ঝুপ্‌ঝুপ্ !

চুপ্ চুপ্ ! ঐ শোন্—রম্ঝম্ রম্ঝম্ !
ঝঞ্ঝার ঝন্-ঝন্—চারধার গম্‌গম্ !

দুদ্দাড্ ভাঙ্ ধার—ঝড় দেয় ঝাপ্‌টা !
বাঁশ-ডাল টল্‌টল্—ফোঁশ্-ফোঁশ্ সাপ্‌টা !
ঝট্‌পট্ প্যাচার্ ঝট্‌পট্ বাদুড়,
চীৎকার ঐ কার—শব হয় আদুড় !

তছ্‌নছ্ সব গাছ ! স্তম্ভিত্ রাত্‌টা !
উদ্দাম ধুম্‌গাম—ঝড় দেয় ঝাপ্‌টা !

চুপ্ চুপ্ ! ঐ শোন্—রম্ঝম্ রম্ঝম্ !
ঝঞ্ঝার ঝন্ ঝন্—চারধার গম্‌গম্ !

কিচ্‌কিচ্ পিক সব—বন্যার কল্-কল্ !
অট্ট হাসচে ভূত্-প্রেত্ খল্‌খল্ !
হুতার হৈ-হৈ, হুল্লোড়, হাড়-তাল,
দাউ-দাউ চিতা ! আন্ মাস্—ঝাড় ছাল্ !
কুক্কুর ঘেউ-ঘেউ—ব্যাঘ্রের দলবল—
ঝর্ণার ঝর্ঝর্—বন্যার কল্-কল্ !

চুপ্ চুপ্ ! ঐ শোন্—রম্ঝম্ রম্ঝম্ !
ঝঞ্ঝার ঝন্‌ঝন্—চার্‌ধার গম্‌গম্ !

বিদ্‌নায় আইটাই—জান্ যায়, জান্ যায় !
ক্রন্দন হায় হায়—আন্ধার-আর্ ছায় !
ভয়-ভয় সব দিক্—ঐ দিক, এই দিক—
কে দায়, কে চায়, কে গায়, নেই ঠিক !
কৈ চাঁ—কৈ, কৈ,—আয় ভোর, আয় আয় !
প্রাণটা হিস্‌সিস্—জান্ যায়, জান্ যায় !

চুপ্ চুপ্ ! ঐ শোন্—রম্ঝম্ রম্ঝম্ !
ঝঞ্ঝার ঝন্ ঝন্—চার্‌ধার গম্‌গম্ !

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

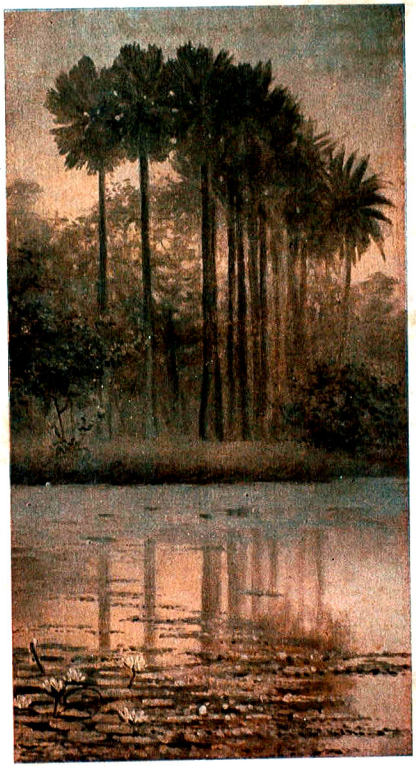

আলো ও ছায়া

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র শীল

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার এম.এ মহাশয়ের সৌজন্যে

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

১৩শ বর্ষ, } কার্ত্তিক, ১৩৩০ { ৭ম সংখ্যা

দেবী দুর্গা

(শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

দুর্গাপূজা শারদীয়া পূজা। শরৎ বলিতে এখন আমরা বুঝি—ভাদ্র-আশ্বিন; পূর্ব্বে বুঝাইত আশ্বিন-কার্ত্তিক; তাই শারদীয়া পূজা ভাদ্রে হয় না। আশ্বিন-কার্ত্তিকেই হয়। এটী খুব বড় পূজা। এত বড় পূজা বাঙ্‌লায় আর নাই—ভারতেও নাই। এই জন্যই এই পূজার নাম মহাপূজা। এই মহাপূজা বাঙ্‌লার বৈশিষ্ট্য।

এ পূজার প্রবর্ত্তন করিয়া কে, তা' ঠিক জানা যায় না। প্রথম দুর্গাপূজা সম্বন্ধে দু'একখানি পুরাণে একটু আধটু খবর পাওয়া যায়। শারদীয়া পূজাকে লোকে বলে অকাল পূজা। অকালে পূজা বলিয়া এই পূজার বেশী আদর। তাতে আবার এটী নাকি রামচন্দ্রের পূজা। পুরাণ কিন্তু তাহা মানিতে চায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ত্রেতার আগেও প্রমাণ যোগাইয়াছেন। এই পুরাণের মতে, স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য প্রথমে দুর্গাপূজা আরাধনা করিয়া ফল পাইয়াছিলেন। দেবীভাগবত আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন, ভারতে সুরথ রাজা সর্ব্বপ্রথম দেবীর পূজা করেন। এ সব সে কালের আখ্যান। এ কালে এ পূজার প্রবর্ত্তক কে তা' এখনও জানিতে পারা যায় নাই। একালের দুর্গাপূজার একটা পাথুরে প্রমাণ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমপাদে রাজা মহেন্দ্রমর্দ্দন বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, তিনি অষ্টভুজা দুর্গামূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন। বাঙ্‌লাদেশে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের নাম সকলেই জানে। তিথিতত্ত্ব ইঁহার একখানি গ্রন্থ। ইহাতে অনেক তত্ত্ব আছে, দুর্গোৎসব তত্ত্বও আছে; কাজেই রঘুনন্দনের সময়ে যে দুর্গোৎসব হইত, তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। তাহা না হইলে এ পূজার বিধি-ব্যবস্থা কেন? আকবর বাদ্‌শাহের আমলে এই পূজার সুচনার সংবাদ পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় বাঙ্‌লায় এই সংবাদটী প্রথম প্রচার করেন। আকবরের চৌপদার রাজা কংসনারায়ণ বাঙ্‌লার দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম বিখ্যাত টীকাকার কুল্লুকভট্ট, পিতামহের নাম উদয়নারায়ণ—রাজা গণেশের জ্ঞাতক। ইনি এক মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন। বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুর রাজাদের পুরোহিত। তাঁহাদের মধ্যে

রমেশ শাস্ত্রী বাঙ্‌লা-বেহারের সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলিলেন—মহাযজ্ঞ চারিটী —বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ। একালে এ সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব। তিনি তাঁহাকে দুর্গোৎসব করিবার ব্যবস্থা ও আদেশ দেন। আট নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে এই দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। রমেশ শাস্ত্রী দুর্গোৎসব-পদ্ধতি লেখেন। এই পূজাপদ্ধতি দেখিয়া জগৎনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পূজা করেন। এ পূজা হইল বাসন্তী পূজা। তারপর সাঁতোড়ের রাজা ও আরও অনেক লোকে দুর্গোৎসব প্রচলিত করেন। সেই পূজা আজও চলিয়া আসিতেছে।

দুর্গাপূজা আমাদের দেশে চলিতেছে। প্রতিমা গড়িয়া পূজা হয়। বাঙ্‌লার বাহিরে কোন কোন দেশে শুধু নবপত্রিকায় পূজা হয়। নেপালে নবপত্রিকা পূজা হয়। কালী, দাড়িম্ব, ধান্য, হরিদ্রা, মান, কচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তী—এই নয়টী গাছের পাতা এক সঙ্গে করিয়া তাহার উপর পূজা করা হয়। কোন প্রতিমা থাকে না।

দেবী দুর্গাকে লইয়া, দুর্গাতত্ত্ব উপলক্ষ্য করিয়া অনেকে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। দেবী দুর্গা কোথা হইতে আসিলেন, তিনি বৈদিক দেবতা কি না, এই সকল প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্‌স্ মূলর লিখিলেন, দুর্গা বৈদিক দেবতা নন। তিনি মত দিলেন, অনার্য্যদের দেবতা দুর্গা আর্য্যদের দেবতা বলিয়া হিন্দুসমাজে চলিয়া যান। এই মত প্রচারিত হইবার পর হইতেই আমাদের দেশের কয়েকজন পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কতকগুলি নজির বাহির করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, পূর্ব্বে আর্য্যদেবতাদের গণ্ডীর মধ্যে দুর্গাদেবীর স্থান ছিল না। তাঁহারা জোর গলায় বলিয়া দিয়াছেন, দুর্গা-দেবী বৈদিক দেবতা নন।

আমরা এই দেবীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদ (২য় মণ্ডল, ২৭শ সূক্ত, ৯ম ঋক্) উপদেশ করিতেছেন—

ওঁ ধিষা চক্রে বয়েণো ভূতানাং গর্ভমাদধে।
দক্ষস্য পিতরং তনা॥

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদি বা কুণ্ডের নাম যে "দক্ষ-তনয়া" ছিল, এইটী বোধ হয় তাহার একটী কারণ। যজ্ঞ-বেদিতে অগ্নি থাকিত বলিয়া, অথবা দক্ষ-তনয়া অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেন বলিয়া লোকে বৈদিকযুগের শেষ দিকে ধারণা করিয়া লইল, দেবী দুর্গার পতি মহাদেব। মহাদেব অগ্নি ব্যতীত আর কেহ নন। কেন না, "রুদ্র" শব্দে অগ্নি ও মহাদেব উভয়ই বুঝাইত। তা' ছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নির পৌরাণিক আখ্যায়িকার যে অষ্টমূর্ত্তির নাম—রুদ্র, ধর্ম্ম, পশুপতি, উগ্র, অগ্নি, ভব, মহাদেব, ঈশান পাওয়া যায়, শিবের সহিত দক্ষ-কন্যা সতীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই আখ্যায়িকার মূলে এই বৈদিক ব্যাপার। অগ্নির সহিত বেদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, এইটুকু বুঝাইবার জন্য বোধ হয়, পুরাণে শিব-দুর্গার বিবাহ ব্যাপার।

বেদি কিরূপে দুর্গাতে পরিণত হইল? এ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাচীন ভারতের একটী ঘটনা স্মরণ করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়াই রাখিতেন। সে সময়ে তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্য কোনই অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সযত্নে বেদি রক্ষা করিতেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ ঋগ্বেদের বাণী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ঋষিরা (১।১৩৬।৩) উপদেশ করিতেছেন—

"জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎ ক্ষিতিং সর্বতাতিম্"—

"যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণফলা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

ঋষিরা এই বেদি বা কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া গভীর ধ্যাননিমগ্ন থাকিতেন। তারপর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়া গেল, তখন তাঁহাদের অগ্নির নিকট হবিঃ প্রকৃতি দানের দরকার হইল। ঋষিরা কিন্তু পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত না করিয়া কুণ্ডের উপর—অর্থাৎ 'দক্ষকন্যা'র উপর পীতবর্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিতেন। এই মূর্ত্তিকে তাঁহারা অগ্নি বলিয়া বুঝিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে ইহাকে "হব্যবাহনী" বলিতেন। ঋগ্বেদেও তাই (১০।১৮৮।৩) ঈরিত হইয়াছে—"ধাক্ষতো জাত-বেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ। তাভির্যো যজ্ঞ-মিচ্ছতি" অগ্নির এই নাম হইবার কারণ, তিনি দেবতার নিকট হবা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। এই মূর্ত্তিই আমাদের দুর্গা। কুণ্ডের দশ দিক্ দুর্গার দশ হাত। কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটী দেবতার সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ইঁহাদের একজন যোদ্ধা কুণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকেন, একজন যজ্ঞের সূচনা করিয়া দিয়া থাকেন, তাঁহার চারি হাত। একটী দেবী যজ্ঞজ্ঞানদাত্রী, আর একজন যজ্ঞের ভস্ম অর্থাগমের সাহায্য করিয়া থাকেন। দুর্গার সঙ্গে আরও কয়েকটী ছোট দেবতা থাকায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা বৈদিক কুণ্ডের পূর্ণ স্বরূপ। মূর্ত্তিমান্ বেদজ্ঞান হইতেছেন সরস্বতী। যজ্ঞানুষ্ঠানের ভস্ম যে অর্থের প্রয়োজন, তাহাই লক্ষ্মী। সেনাপতি কার্ত্তিকের যজ্ঞ রক্ষা করিতেন—আর গণেশ যজ্ঞের সূচনা করিয়া দেন, তাই তাঁর চার হাত। বৈদিক যজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক্, পুরোহিত ও যজমান, এই চারি হাত। দুর্গার পদ্মেও এগুলি ঠিক খাটে। এ ছাড়া আমরা পাই—

বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রুরুজো অমীবাঃ। ৩।১৪।১

"তুমি বিস্তীর্ণ তেজোদ্বারা অত্যন্ত দীপ্তিমান্, তুমি শত্রু দিগকে এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর।"

আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, বৈদিক যজ্ঞে অগ্নিদেবতার নিকট অসুরগণকে বধ করা হইতেছে।

দুর্গাই যে বৈদিক অগ্নি, তাহার আর একটী প্রমাণ এই—

দুর্গা দেবীর অর্চ্চনাকালে আমরা সামবেদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করি,—

"ওঁ অয় আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে
নি হোতা সৎসি বর্হিষি।"

বৈদিক যুগের শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, 'দক্ষ-কন্যা' ক্রমশঃ 'উমা'তে পরিণত হইলেন, 'উমা' 'অম্বিকা'য়, এবং 'অম্বিকা' 'দুর্গা'য় পরিণত হইলেন। এ সময় আর তিনি যজ্ঞবেদি রহিলেন না; যজ্ঞবেদি ও অগ্নির সম্মিলিত শক্তি স্ত্রী-দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন।

শুক্ল যজুর্বেদ (৩।৫৭) [বাজসনেয়ী সংহিতা] বলিতেছেন—হে রুদ্র, এই তোমার হবির্ভাগ তুমি তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত আস্বাদন কর—"এষ তে রুদ্রভাগঃ স্বসা অম্বিকায়া তং জুষস্ব স্বাহা।" তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আমরা দুর্গা, মহাদেব, কার্ত্তিক, গণেশ, নন্দিকে এক সঙ্গে পাইয়াছি। এই সময় রুদ্র ও মহাদেব অভিন্ন হইয়াছেন। উমা, অম্বিকা ও দুর্গা এক হইয়াছেন। মহাদেব রুদ্র তখন উমাপতি, অম্বিকাপতি। তখন উমা বা অম্বিকা মহাদেবের ভগিনী নন। আমরা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের উক্তি-গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

১। পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মীঢুষি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্র-তুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে চক্রতুণ্ডায় ধীমহি। [১০ম প্রপাঠক। ১ম অনুবাক। ৫] তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় মহানেনায় ধীমহি। তন্নো ষণ্মুখঃ প্রচোদয়াৎ। [১০।১।৬]

২। কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।* [১০।১।৭] [সায়ন ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, বেদে লিঙ্গব্যত্যয় হইয়া থাকে। তাই 'দুর্গা' বুঝাইতে 'দুর্গি'র প্রয়োগ হইয়াছে। 'দুর্গিঃ দুর্গলিঙ্গাদিব্যত্যয়ঃ সর্ব্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।']

৩। নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায় হিরণ্যপতয়েঽম্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে নমো নমঃ। ১০।১৮।

বৃহদ্দেবতা বৈদিক দেবতার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইহাতে (২।৭৮,৭৯) আমরা দেখিতে পাই, অদিতি, বাক্, সরস্বতী এবং দুর্গা অভিন্ন। আমরা যে দুর্গার পূজা করিয়া থাকি, তাঁহার বাহন সিংহ। দেবী বাক্ নিজেকে সিংহে পরিণত করেন এবং দেবতার বিশেষ সাধ্যসাধনায় তাঁহাদের নিকট গমন করেন। এই বাক্ ও সিংহ যে অভিন্ন, শাস্ত্রে† তাহার প্রমাণ আছে। বাক্ এবং দুর্গা যে অভিন্ন, বৃহদ্দেবতা তাহার প্রমাণ। আমরা যতটুকু পাইলাম, তাহা হইতে দুর্গার সহিত সিংহের সম্প্রবের একটা কারণ স্থির করা যাইতে পারে। ঋগ্বিধান ব্রাহ্মণে (৪।১৯) রাত্রিসূক্ত পাঠনের নির্দ্দেশ আছে। পূজাকালে স্থালিপাক যজ্ঞরাত্রির পূজা করিতে হয়। দেবী বাক্ ও যজ্ঞরাত্রি মূলতঃ এক হইলেও রূপতঃ বিভিন্ন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।৪।৬।১০) উল্লেখ আছে যে, ইঁহারা কখন কখন সম্পূর্ণ অভিন্ন। রাত্রিসূক্ত ইঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের খিলসূক্ত (২৫) রাত্রিদেবীকে দুর্গা নামে অভিহিত করা হইয়াছে, আর এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটী তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১) স্থান পাইয়াছে। এই আরণ্যকে তিনি হব্যবাহন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুর্গা, হব্যবাহনী ও অগ্নি এই তিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দুর্গা ও অগ্নি, অভিন্ন বলিয়া দুর্গাকে জিহ্বাশালিনী বলা হইয়াছে। এই জিহ্বা সাতটী। তাহাদের নাম কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং শুচিস্মিতা। এই সপ্তজিহ্বা প্রকট করিয়া যে দুর্গা বলিগ্রহণ করেন, গৃহ্যসংগ্রহ (১।১।১৪) তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। †

বৈদিক যুগে অনেকগুলি দেবতার পূজা হইত। সেই দেবতাগুলি বৈদিক যুগের শেষ দিকে দুর্গা নামে প্রচারিত ও পূজিত হয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রভগিনী। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১৮) দুর্গা রুদ্রস্রষ্টা। এই আরণ্যকে (১০।১) আবার দুর্গাদেবীর আরাধনা আছে। সেইখানে তিনি বৈরোচনী। বিরোচন সূর্য্য বা অগ্নির নাম। অন্যত্র (১০।১।৭) যেখানে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেখানে দুর্গার (দুর্গির) আরও দুইটী নাম আছে—একটী কাত্যায়নী, অপরটী কন্যকুমারী। কেনোপনিষদে (৩।২৫) গাওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞা দেবী হৈমবানের কন্যা উমা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১৮) রুদ্রকে উমাপতি বলা হইয়াছে। এই আরণ্যকে (১০।২৬।৩০) সরস্বতীকে বরদা, মহাদেবী সন্ধ্যাবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পরে আবার এগুলিকে দুর্গাদেবীর গুণরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

বৈদিক যুগ হইতে পরযুগের সাহিত্য আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে দুর্গাতত্ত্বের আরম্ভ হইয়া রামায়ণ-মহাভারত যুগে ইহা সম্পূর্ণ হয়। বারান্তরে দুর্গাতত্ত্ব আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

* নারায়ণোপনিষৎ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছে—"কাত্যায়নায়ৈঃ বিদ্মহে কন্যাকুমারীং শীমহি তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।"

† Shakti and Shakta by Sir John Woodroffe pt: 456-467.

† Shakti and Shakta, p 456.

সে

(শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়)

ওগো মনের চোখে মেঘলা কাজল বুলিয়ে কে
এই পথ-ভোলাকে পাগল করে' ভুলিয়েছে ?
ওই 'সন্ধ্যা-তারা' চেনে গো তার 'সন্ধ্যামণি'র 'দুল' দুটি—
ওরে ক্ষ্যাপা হাওয়া পালায় চুলের ফুল লুঠি'।

আজি তার বিরহের বেদনা বাজে এই বুকে,
মরি, তারই অধর-সুরার সুবাস মোর মুখে ;
দুটি কালো আঁখির কটাক্ষে সে পূর্ণিমাকে ভুলিয়েছে,
ঘাটে জল ভরিতে মো-যমুনা গুলিয়েছে।

সে যে চাঁদনী-গাঙ্গে একুলা খেয়ায় পেরিয়েছে,
আজি, তার ওরী হায় বার-দরিয়ায় বেরিয়েছে ;—
শোনো সারেঙ্গীতে সুর বেঁধেছে মূর্চ্ছনায়,
গীতে তাল দিতে তার নীল চেউএরা লজ্জা পায়।

সে যে চির-কিশোর ফাল্গুনেরি পাটরাণী,
ফুলে সাজিয়াছে মোর মধু-রাতের ফুল-দানী ;
ও সে গোলাপ-ময়ী কোন্ 'বসোরা' রং-পুসরা দেয় ডালি,
করে অপ্সরীরা তার মিলনে ঘট্-কালি।

ওই অলক-ছোঁয়া পলক-হারা নয়নাতে
মিঠে চাউনি-খেলা কৌতুকী-নীল কায়নাতে,—
কোন্ সোনালি জেস্‌মিনেরি রেশ্‌মি-কেশর উরসি'
হাসে গোরোচনা-গৌরী রূপের উর্ব্বশী।

এস বরণ-বেলা গন্ধমালায় চন্দনে,
বাজে জংলি 'পিলু' যৌবনেরি নন্দনে,
জাগে জোৎস্না-বধূর উলুধ্বনি বকুল-বনের আবছায়ে,
শুনি প্রথম-লাজে নূপুর বাজে তার পায়ে।

আমি পড়ছু আদি কাব্যখানি তার সে যাদু-ইঙ্গিতে,
ফোটে স্বর্গ-ভাতি তার শ্রীমুখের ভঙ্গীতে ;

কাঁপে লক্ষ-যুগের পদ্ম-ফোটা ঠোঁট দু'খানি থরথরি'
সে যে চুম্ দিল রে পঞ্চশরে জয় করি'।

ফিরে এস গো মোর সাগর-মথা ধুলহরা
সখি, জাগো বাঁধের জীবন-পথের দুখ হরা,
এই জগৎ-নাগের বিষের জ্বালা বুকের মাঝে জমিয়েছে
ঝড়ের হাওয়া বেল-কুঁড়িদের ঝরিয়েছে।

আমার ডাক্তারী

(রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর)

(১)

শুনেছিলাম, কোন রকমে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারলেই 'পাশ'—একেবারে ফার্ষ্ট ডিবিসনে। কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা—নিন্দা করা যাদের স্বভাব, তারাই এ কথা বলে থাকে। নইলে আমি, শ্রীঅম্বুকুলচন্দ্র মিত্র, কায়েতের ছেলে; আমি এক-বার নয়, দুইবার নয়, তিন-তিনবার ঐ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে 'ফেল' হব কেন? সরস্বতী কিছুতেই তাঁর বড় কারখানায় আমাকে প্রবেশ করতে দেবেন না, জিদ্ ধরেছিলেন।

যাদের বাপ-মা আছেন, তেমন ছেলেও যদি আমার মত এমন করে তিনবার প্রবেশিকায় ফেল হয়, তা হ'লে তারও স্থান গৃহে হয় না। আমি ত পিতৃমাতৃহীন, মামা-মামীর অসীম অনুগ্রহে তাঁদের অন্নধ্বংস করি। তাঁরা যে ধৈর্য্য ধারণ করে তিন-তিনবার আমাকে পরীক্ষা দিতে দিয়েছিলেন, এ দৃষ্টান্ত সহজে মিলে না।

লোকে বলে, বার বার তিনবার; আমি ত তিনবারই দেখ্‌লাম; সুতরাং এখন সরস্বতীর দুয়ার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। এই ১৯ বৎসর মাতুলের অন্ন ধ্বংস করিয়াছি; এখন আর সে কুকর্ম্ম করিতে মন সরিল না। 'পাশ'ই বা হয় করিতে পারিলাম না, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যে চক্ষু লজ্জা হারাইতে হইবে, এমন ত কোন কথা নাই। সুতরাং স্থির করিলাম, মামা-মামীকে না জানাইয়া পলায়ন করিতে হইবে। স্থির করিলেই ত হয় না, অনেক ভাবিতে হয়। প্রথম ভাবনা, যাই কোথায়? আত্মীয় কুটুম্ব যে কোথায় কে আছেন, তাহা জানি না; আর, জানা থাকিলেও সে সব স্থানে যাই কি বলিয়া। শুনিয়াছি, কলি-কাতায় গেলে না কি চাকুরী মিলে; সেখানে অনেক আফিস আছে; সে সব আফিসে আমার মত বিদ্যা লোকের দু পয়সা উপার্জ্জনের বাধা নাই। বেশ, কলিকাতাতেই যাই, এবং সেখানে আমার মামার বাড়ীর গ্রামের কয়েকটী ছেলে কলেজে পড়ে, তাহাদেরই বাসায় উঠিয়া দুই চারি দিন চেষ্টা করিলেই একটা না হয় একটা চাকরী জুটিয়াই যাইবে; আমার সে বন্ধুরা কয়েক দিন আমার বাস-খরচ যোগাইতে কাতর হইবেন না।

একটার ব্যবস্থা হইল; কিন্তু কলিকাতা যাইতে হইলে যে পথ খরচের প্রয়োজন, তাহার কি ব্যবস্থা হইবে? আমার হাতে একটী পয়সাও নাই; মামা দয়া করিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। তিনি যে আমাকে মাসে মাসে বা মধ্যে মধ্যে

খরচ খরচ বলিয়া কিছু কিছু দিবেন, নিতান্ত বাতুল না হইলে এ আশা কেহই করিতে পারে না। এক পথ আছে, মামার বাক্স ভাঙ্গিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই সম্বল করিয়া পলায়ন; কিন্তু, ছিঃ! শেষে কি চুরি করিতে হইবে? না, এমন কর্ম্ম আমার দ্বারা হইবে না; তিন বার মাটক ফেল করিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া চুরি করিতে পারি না।

Never mind.—কলিকাতা আর কতই বা দূর—ষোল ক্রোশ পথ বই ত নয়—হাঁটিয়াই যাইব; উনিশ বৎসর বয়স, শরীরও বেশ সুস্থ, সবল; এই ষোল ক্রোশ পথ আর হাঁটতে পারিব না? খুব পারিব! ভোরে বাড়ী হইতে বাহির হইলে নাগাদ সন্ধ্যা, বড় বেশী হয় ত রাত্রি আটটার মধ্যে কলিকাতায় পৌঁছিতেই পারিব। পথে নদীও নাই যে, পারের পয়সা দিতে হইবে। আহার —তোষ, একবেলা আর উপবাস দিতে পারিব না?

তবে হাঁটিয়া যাওয়া হইবে না; কলিকাতায় বন্ধুরা আছেন, তাঁহাদিগকে একটু আগে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। তখন মামীর নিকট হইতে একটী পয়সা চাহিয়া লইয়া একখানি পোষ্টকার্ড কিনিয়া আমার বন্ধু মহেশের মল্লিককে লিখিলাম, বুধবার সন্ধ্যার সময় আমি তাঁহাদের মেসে অতিথি হইব।

তাহার পর আর কি? সত্যসত্যই বুধবারে প্রত্যুষে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা সাতটার সময় আমি শ্রীঅম্বুকুলচন্দ্র মিত্র বত্রিশ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া বন্ধুগণের সুকিয়া ষ্ট্রীটের মেসে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুরা ত আমার ভ্রমণ বিবরণ শুনিয়া অবাক্! অনাহারে, পথে একটুও বিশ্রাম না করিয়া তের ঘণ্টায় বত্রিশ মাইল পথ পদব্রজে অতিবাহন করা—হাঁ, বীরের উপযুক্তই বটে।

(২)

বন্ধুদের বাসায় থাই, প্রতিদিন সন্তব-অসম্ভব স্থানে চাকুরীর উমেদারীতে ফিরি, কেহ সদয়ভাবে বিদায় করিয়া দেন, কেহ বা নির্দ্দয়ভাবে তাড়াইয়া দেন। এমনই করিয়া প্রায় একমাস কাটাইলাম —চাকরী আর হয় না, এদিকে এখন কতদিন বন্ধুগণের গলগ্রহ হইয়াই বা আর কতদিন থাকি? মেসের ছেলেরা সকলেই আমাকে ভাল বাসিতেন, কেহ কেহ আমার জন্য চেষ্টাও করিলেন; কিন্তু কাহারও কোন চেষ্টা ফলবতী হইল না।

শেষে, একদিন মেসের সকলে একটী কমিটী করিলেন। নরেশবাবু মেডিকেল কলেজে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন। তাঁহার বাড়ী মুর্শিদাবাদ; তাঁহার আস্থাও ভাল; দেশে অভিভাবক না থাকিলেও অর্থাভাব নাই। তাঁহার পিতা যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া পরলোকগত হইয়াছেন; তাঁহার বাড়ীতে মা ও একটী বিধবা দিদি আছেন। নরেশ বাবুই মেসের ম্যানেজার এবং মুরুব্বী।

কমিটী আমাকে লইয়া। এতদিন চেষ্টা করিয়াও যখন কোন সুবিধা করা গেল না, তখন আমার সম্বন্ধে কি করা যায়, কমিটীর তাহাই আলোচ্য বিষয়। এক একজন এক এক রকম প্রস্তাব করিলেন। অবশেষে নরেশ বাবু বলিলেন "দেখ, অম্বুকুলের সম্বন্ধে আমি একটা প্রস্তাব করি। এখনকার দিনে চাকুরী পাওয়া সহজ নয়। আমি বলি, অম্বুকুল হোমিওপাথী ডাক্তার হোক।"

বন্ধু মহেশ বলিলেন "ডাক্তার হোক বল্‌লেই ত হোলো না; অন্ততঃ তিনটা বৎসর পড়িতে হয়।"

নরেশ বাবু বলিলেন "তিন বৎসর! কি যে তোমরা বল। তিন দিনের মধ্যেই ওকে আমি ডাক্তার বাবু করে দিচ্ছি। একটা হোমিওপাথী ঔষধের বাক্স, আর ইংরাজী বাঙ্গলা খান চার পাঁচ বই—ব্যস্, আর কিছুর দরকার নেই—শিক্ষা যেটুকু দরকার, তা আমি দুই তিন দিনেই শেষ করে দেব। তারপর আসছে সপ্তাহেই বড়দিনের বন্ধ। আমি বাড়ী যাব। আমাদের গাঁয়ের চারিদিকে তিন ক্রোশের মধ্যে ডাক্তার নেই বল্লেই হয়। ওকে

নিয়ে গিয়ে আমাদের গাঁয়ে ডাক্তারীতে লাগিয়ে দিয়ে আসব। আর দুটো বছর পরেই আমি একটা মস্ত ডাক্তার কি না; কাজেই আমি যদি দেশে গিয়ে বলি যে, আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র একজন বড় হোমিওপ্যাথ, তা হ'লে দেশের ইতর ভদ্র সবাই সে কথা মেনে নেবে। ও আমাদের বাড়ীতেই থাকবে, খরচপত্র কিছু লাগবে না। আর চিকিৎসা—তার জন্য কোন ভাবনা নেই; ইপিকাক্, একোনাইট, পল্‌সেটিলা; এই রকম গুট কয়েক ওষুধের নাম জান্‌লেই হোলো। কেমন করে ডাক্তারী করতে হবে, তা আমি দুইদিনে তালিম করে দেব। তোমরা দেখো, তিনমাসের মধ্যে শ্রীমান্ অনুকূল দেশ জয় করতে পারবে। উপার্জ্জনও বেশ হবে। আর একটা কথা জান কি, এই যে হোমিও ওষুধ; এতে উপকার হোক না হোক, অপকার হবেই না; সুতরাং বেশ নিরাপদ চিকিৎসা; ওষুধ দিয়ে রোগী মেরে ফেলেছে, এ কথা কেউ বলতে পারবে না। কেমন অনুকূল, ডাক্তার হ'তে পারবে? আরে, আমরা কায়েতের ছেলে, বুদ্ধিতে কারও চাইতে কম নই। দেখো তোমরা, ছমাস যেতে না যেতেই অনুকূল কেমন শুছিয়ে নেয়। কি বল হে?"

আমি বলিলাম "আপনারা যা বল্‌বেন, তাই করব। কিন্তু, আমি টাকা কোথায় পাব?"

নরেশ বাবু বলিলেন, "সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না; সে সব আমি ঠিক করে দেব। কত আর লাগবে; বই, ওষুধপত্র আর সাজসজ্জা, এতে খুব বেশী লাগলেও এক-শ টাকার উপর খরচ হবে না। আমি তা তোমাকে দিচ্ছি; দান বল্‌ছিনে, ধার দিচ্ছি। যখন পসার জমে যাবে, তখন ইচ্ছা হয় আমার ধার শোধ দিও, না হয়, না দিও।"

সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এক সপ্তাহ পরেই বড়দিনের ছুটি হইল। আমি শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসুর সহিত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সাজিয়া একটী ঔষধের বাক্স, কয়েকখানি বই, একটী বুক পরীক্ষার যন্ত্র এবং ডাক্তার বাবুর উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের দেবগ্রামে উপস্থিত হইলাম। নরেশ বাবুর কৃপায় সকলে শুনিলেন যে, আমি একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক; দেবগ্রামে নরেশ বাবুর গৃহে থাকিয়া চিকিৎসা কার্য্য করিব।

দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই আমি ডাক্তারী আরম্ভ করিয়া দিলাম। নরেশ বাবু প্রথম প্রথম আমার সঙ্গী হইতেন এবং ডাক্তারীর আদব-কায়দা শিখাইয়া দিতেন। শেষে তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন; আমি ডাক্তার হইয়া বসিলাম।

(৩)

প্রায় এক বৎসর এই দেবগ্রামে ডাক্তারী করিলাম; চিকিৎসা কেমন করিয়াছি তাহার প্রমাণ এই যে, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমার হাতে দুই তিন শত রোগী আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে দশ পনরটীর বেশী মারা যায় নাই; আর যাহারা মারা গিয়াছে, বলিতে গেলে তাহারা মরার দাখিলই হইয়া ছিল, তাহাদের বাঁচিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। দেবগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামে আমার বেশ পসার প্রতিপত্তিও হইয়াছিল। এই এক বৎসরের মধ্যে কত উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে একটা সঠিক জমাখরচ দিতে পারিব না, কিন্তু মোটামুটি বলিতে পারি, নরেশ বাবুর টাকা শোধ হইয়া গিয়াছে, ডাকঘরে প্রায় ছয় শত টাকা জমা হইয়াছে, তাহার পর কাপড়-চোপড় সাজ-সজ্জাতেও একটু বেশী রকমই খরচ করিয়াছি—পাড়াগাঁয়ে একটু অধিক মাত্রায় পোষ-পোষাকী না হইলে পসার জমে না, এ উপদেশ নরেশ বাবুর কাছেই পাইয়াছিলাম, সুতরাং, বলিতে গেলে রাজার হালেই ছিলাম।

কিন্তু, অদৃষ্টে কষ্ট আছে, কে তাহা খণ্ডন করিবে? পূজার সময় পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়া একটু বেশী মাত্রায় দেখা দেয়; আমার তখন আহার নিদ্রার সময় পর্য্যন্ত থাকে না; হোমিওপ্যাথি ঔষধে সে সময় তাল রক্ষা করা যায় না; তাই নরেশ বাবুর নিকট হইতে তিন চারিটী এলোপ্যাথি ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া লইয়াছিলাম, ঔষধপত্রও কিছু আনাইয়া লইয়াছিলাম। হোমিওপ্যাথি ঔষধ বলিয়া কুইনিন মিক্‌চার, ফিভার মিক্‌চার দুই হাতে চালাইতাম; ফলও হইত, টাকাও আসিত।

এই সময়ে একদিন একটী তিন বৎসরের ছেলের জ্বর হইল; শুধু জ্বর নয়, তার সঙ্গে মাথার অসহ্য যন্ত্রণা। ছেলেটী এক ব্রাহ্মণ বিধবার একমাত্র সন্তান। আমাকে চিকিৎসার জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি প্রথম দিন হোমিওপ্যাথি কি একটা ঔষধ তিন দাগ দিলাম। জ্বর ত কমিলই না, মাথার যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন যাইয়া দেখি, বালক প্রলাপ বকিতেছে। আমি ত ভাবিয়া পাই না কি ঔষধ দিব। বালক চীৎকার করিতেছে, তাহার মা কাঁদিতেছেন। আমি যাইতেই খোকার মা আমার হাত জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা, দোহাই তোমার, আমার ছেলেটীকে বাঁচাও। আমার যে আর কেউ নাই। আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে দিব।"

আমি বলিলাম, "ভয় নাই মা! কাতর হইবেন না, তিন চারি দিনের মধ্যেই খোকাকে সুস্থ করিব। আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না।" তাঁহাকে ত বলিলাম চিন্তা করিবেন না, আমি কিন্তু অকূল সমুদ্রে পড়িলাম। খোকা বিকারের ঘোরে কেবল বলে "মা ঐ শোন কত বাজনা বাজ্‌ছে। শোন না।" আর কোন কথা নাই, রোগের যন্ত্রণার কথা নাই; শুধু "ঐ শোন বাজনা বাজছে।"

আমি কি করিব, নরেশ বাবুর প্রদত্ত ব্যবস্থা-পত্র অনুসারে ঔষধ দিলাম, কিছুই হইল না। অন্য সব রোগী দেখা ত্যাগ করিলাম; আমার প্রাণের মধ্যে যে কেমন করিতে লাগিল, তাহা কি বলিয়া প্রকাশ করিব। তিন দিন তিন রাত্রি খোকাকে লইয়া রহিলাম। শুধু ঐ দেখি, আর খোকার মুখের দিকে চাই, আর যা মনে আসে সেই ঔষধ দিই। আমার কি তখন মাথার ঠিক ছিল। আমার রোগী ক্রমাগত বাজনা শুনিতেছে, আর আমি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নর-হত্যার বিভীষিকা দেখিতেছি। এতদিন চিকিৎসা করিয়াছি, একদিনও যে কথা মনে হয় নাই, এই বালকের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে বসিয়া সেই কথাই মনে হইতেছে—আমি নরহত্যাকারী। কিছু জানি না, কিছু শিখি নাই, অথচ মানুষের জীবন লইয়া এ কি খেলা করিতেছি। হায়, হায়, এ কি পাপে আমি লিপ্ত হইয়াছি!

ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার সময় খোকার শয্যাপার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া আছি, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার শেষ নিঃশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছি। আর তাহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। খোকা নিঃশব্দে বিছানায় পড়িয়া আছে; তাহার সংজ্ঞালোপ হইয়াছে। হতভাগী মাতা একমাত্র পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন; তিনিও বুঝিতে পারিয়াছেন, আর আশা নাই।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই প্রতিবেশী মিত্রদিগের বাড়ীতে বাজনা বাজিয়া উঠিল, মা দুর্গার অধিবাস হইতেছে। খোকার সেই সময় একবার জ্ঞান-সঞ্চার হইল; সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিল "ঐ শোন মা, বাজনা বাজছে।" তাহার পরই সব শেষ! আমি তাহার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলাম না। আমারও মাথার ভিতর ভীষণ রবে বাজনা বাজিয়া উঠিল; আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম, আমার সম্মুখে যমদণ্ড উদ্যোলিত দেখিলাম।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিলাম "ঐ শোন বাজনা বাজছে।" পর মুহূর্ত্তেই আমি ছুটিয়া বাহির হইলাম!

সেই যে সেই ষষ্ঠীর রাত্রিতে একবস্ত্রে দেবগ্রাম ত্যাগ করিয়াছি, আর সে গ্রামে যাই নাই, আর সে নরহত্যার সঞ্চিত অর্থের দিকে চাহি নাই; আর এমন কার্য্য করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু এখনও মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার পর, যখন চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তখন আমার মাথার মধ্যে কে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে 'ঐ শোন বাজনা বাজছে।"

নবমীতে নরবলি

(গল্প)

(শ্রীকণীন্দ্রনাথ পাল)

(১)

নিঃসম্পর্কীয় প্রতিবেশীর সাত বৎসরের কন্যা মনোরমা ছায়ার মত অনুপমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। তাহাকে নিজের গৃহে বড় কেহ দেখিতে পাইত না। আহারের সময় মাতা আসিয়া তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু কোন রকমে আহার শেষ করিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আবার অনুপমার নিকট আসিয়া হাজির হইত। কোন দিন বৈধাৎ কোন কারণে যদি তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইত অনুপমাও ভাতের থালায় হাত দিত না, তাহার প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে বসিয়া থাকিত,—মনোরমা তাহার পাত হইতে মাছ তরকারি কাড়িয়া না খাইলে তাহার খাইয়া তৃপ্তি হইত না, মনোরমারও ক্ষুধার জের মিটিত না। এমনই ভাবে ষোড়শী যুবতী অনুপমা ও সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা মনোরমার মধ্যে গভীর স্নেহের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

দুই বৎসর হইল অনুপমার বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামী শচীনাথ কলিকাতার মেসে থাকিয়া বি-এ পড়িতেছিল। সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে শ্বশুর গৃহে আতবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া, ছুটির পর দিনই সে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমা ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিতেই শচী নাথ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিল।

তাহার কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া সুমিষ্ট স্বরে মনোরমা বলিয়া উঠিল, "যান্ আপনি ভারি দুষ্ট, অনু'দিদিকে বলিয়া দেব কিন্তু।"

শচীনাথ জোর করিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আর একটী চুম্বন করিয়া কহিল, "আচ্ছা বোকা মেয়ে ত, সতীনকে বুঝি এ কথা কেহ বলিয়া দেয়।"

মনোরমা তাহার কচি মুখখানি হাসিতে ভরিয়া ছোট্ট একটী কিল দেখাইয়া কহিল, "ফের ও কথা বলিলে কিন্তু মার খাইবেন।"

শচীনাথও হাসিয়া কহিল, "যখন দুই বৌ লইয়া ঘর করিতে হইবে, তখন ছোট বৌয়ের কাছে ত মার খেতেই হইবে।"

মনোরমা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "আমি বুঝি আপনার বৌ! ও কথা বলিলে কিন্তু আমি আপনার কাছে আর আসিব না।

শচীনাথ কহিল, "আমি তোমায় ছাড়িয়া দিলে ত তুমি যাইবে। কেমন করিয়া যাইবে যাও দেখি।" এই বলিয়া সে আবার মনোরমাকে চুম্বন করিল।

সে দিন রাত্রে মনোরমা জিদ ধরিয়া বসিল, সে কিছুতেই বাড়ী যাইবে না, জামাই বাবুর কাছে থাকিবে।

শচীনাথ হাসিয়া কহিল, "মনু তুমি কখনো

যাইও না, যাইলে তোমার সতীন কিন্তু তোমার বরটিকে একেবারে বেদখল করিয়া লইবে।"

মনোরমা তাহার দিদির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনুপমা ঘোমটার ভিতর হইতে মনোরমার উপর সহাস্য চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাপা গলায় কহিল, "গেলে সত্যই বেদখল হইয়া যাইবি, বরকে—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া মনোরমা তাহার হাতে চিমটি কাটিয়া কহিল, "ধা, তুই ভারি দুষ্ট দিদি! জামাইবাবু আমার বর বুঝি?"

শচীনাথ গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া কহিল, "আচ্ছা আমি তোমার বর নয় ত?"

মনোরমা মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "হুঁ, বর বৈ কি! আপনি ত দিদির বর।"

শচীনাথ কহিল, "দিদির বর ত! আচ্ছা, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার আড়ি হইয়া গেল। তোমার সহিত আর আমি কথাও বলিব না, তোমার দিদির ঘরে তুমি থাকিতেও পাইবে না।"

মনোরমা ছলছল চোখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। জামাইবাবু তাহার সহিত আড়ি করিয়া দিবে এ ঘরে তাহাকে আর থাকিতে দিবেন না!

অনুপমা তাহাকে সস্নেহে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া নীচু হইয়া তাহার জলভরা চোখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "তুই ভাব করিয়া ফেল্ না, বল না, আপনি আমার বর।"

মনোরমা চোখ মুছিয়া কহিল, "আপনি আমার বর।"

শচীনাথ তাহাকে স্ত্রীর বাহুবন্ধন হইতে জোর করিয়া মুক্ত করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। তারপর মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "ভাব, ভাব, ভাব! ছোট বৌয়ের উপর কি আমি রাগ করিতে পারি।"

মনোরমার কচি মুখখানি গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমনইভাবে কখনও শচীনাথকে বর বলিয়া স্বীকার করিয়া, কখনও বা বর বলিতে অস্বীকার করিয়া শচীনাথের চুম্বন লাভ করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া, পিতামাতা বাড়ীঘর সমস্ত বিস্মিত হইয়া তাহার দিদির গৃহে মনোরমার দেড়টা মাস হাওয়ার মত উড়িয়া গেল।

তার পর শচীনাথের বাড়ী ফিরিবার দিন স্থির হইল। অনুপমা চুপি চুপি মনোরমাকে কহিল, "তোর বর যে কাল বাড়ী যাইতেছে।"

মনোরমা কহিল, "ইস্, যাইলেই হইল, আমি কিছুতেই যাইতে দিব না।"

অনুপমা কহিল, "আচ্ছা দেখিব কেমন করিয়া তুই আট্‌কাইয়া রাখিস্।"

মনোরমা সত্যই শচীনাথকে আট্‌কাইয়া রাখিল। যাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিনটা সে এমন ভাবে তাহাকে জড়াইয়া রহিল যে শেষে শচীনাথকে পরাজয় স্বীকার করিয়া, শুধু সে দিনটা নয়, আরও দুইটা দিন থাকিতে হইল এবং অনুপমাকে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া পরবর্ত্তী যাত্রার দিনটা মনোরমার নিকট হইতে গোপন রাখিয়া শচীনাথ দিন দুই পরে লুকাইয়া কলিকাতা ফিরিল।

(২)

মাস তিনেক পরে মনোরমা বর্ষাকালের এক মেঘ মুক্ত সন্ধ্যায় নিজের গৃহ হইতে ছুটিয়া অনুপমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "দিদি তোমরা নাকি চলিয়া যাইতেছ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনুপমা গাঢ়স্বরে কহিল, "হ্যাঁ ভাই মনু, আমরা যাইতেছি।"

মনোরমার অন্তর সে কথা কিছুতেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "কেন যাইতেছ দিদি! না, না, তোমরা যাইয়ো না।"

অনুপমা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, "না যাইয়া যে আমাদের উপায় নাই ভাই, বাবাকে যে বদলি করিয়া দিয়াছে।"

মনোরমা কিছু বুঝিল না, সে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাহার দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কে বদলি কহিল, কোথায় বদলি করিল, বদলি করিলেই যে যাইতে হইবে, এমন কি কথা আছে, তাহার মনের মধ্যে কেবলই এই সব প্রশ্ন জাগিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার কচি বুকখানি দুরু দুরু করিতেছিল।

অনুপমা ব্যথা-ভরা কণ্ঠে কহিল, "তিন দিন পরেই আমাদের এ জায়গা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে মনু।"

মনোরমার দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অনুপমার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। খানিক পরে মনোরমা বাষ্পজড়িতকণ্ঠে কহিল, "আমিও তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, অনু দিদি, তোমরা যেখানে যাইবে আমিও সেইখানে যাইব।"

অনুপমা চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "তোর বাপ মা তোকে ছাড়িয়া দিবে কেন ভাই।"

মনোরমা প্রাণপণে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি অনু দিদি, আমায় সঙ্গে লইয়া যাইবে।"

অনুপমা তখনকার মত তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সস্নেহে কহিল, "তোকে লইয়া যাইব।"

দেখিতে দেখিতে অনুপমাদের যাত্রার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমা তাহার দুইবানি কাপড় সযত্নে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া অনুপমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার প্রফুল্লমুখের দিকে চাহিয়া অনুপমা কান্না রোধ করিতে পারিল না। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মনোরমা তখনও জানে, তাহার অনুদিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, তাহাকে এখানে ফেলিয়া যইবে না! তাই সে তাহার দিদির কান্না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অনুপমা চোখের জলে বুক ভাসাইয়া জনক জননীর সহিত গাড়ীতে গিয়া উঠিল। মনোরমা তাহার জননীর বাহু বন্ধনের মধ্যে ছটফট করিতে করিতে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, "অনুদিদি তোমার পায়ে পড়ি, আমায় সঙ্গে লইয়া যাও, ফেলিয়া যাইয়ো না, আমি তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না!

অনুপমা সেদিকে চাহিতে পারিল না, অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু চাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনুপমা চলিয়া গেল, মনোরমা তাহার জননীর সহিত গৃহে ফিরিল। বালিকার চোখের জল ঝরিয়া অবশেষে শুকাইয়া গেল, কিন্তু তাহার চোখের পাতা সজল হইয়াই রহিল। তাহার হৃদয়ে আঘাতের বেদনা এমনই গুরুতর ভাবে বাজিয়াছিল, জননীর বহু প্রকারের সান্ত্বনা বাক্যে তাহার একটুও উপশম হইল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহার অনুদিদি নাই কেমন করিয়া সে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিবে। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, অনুদিদি আবার কবে আসিবে, তাহাও বলিয়া গেল না। সে জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল, "মা অনুদিদি আবার কবে আসিবে?"

জননী তাহাকে ভুলাইবার জন্য কহিলেন, "শীঘ্রই আসিবে মা।"

মনোরমা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "কাল, না পরশু?"

জননী বুকের ব্যথা চাপিয়া কহিলেন, "পরশু।"

মনোরমা সেই পরশুর অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিল। পরশু আসিল, কিন্তু অনুপমা তো আসিল না। ভোর বেলায় তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া সে অনুপমার গৃহের দিকে ছুটিল। কিন্তু রুদ্ধদ্বারে সম্মুখে পৌঁছাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল সেই গৃহখানি যেন হাঁ করিয়া তাহাকে গিলিতে আসিতেছে। সভয়ে সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "অনুদিদি, অনুদিদি।" শূন্য গৃহ হইতে সে সঙ্গে করুণধ্বনি ফিরিয়া আসিয়া তাহার কচি বুকখানির উপর সজোরে আছাড়াইয়া পড়িল। সে ছুটিয়া নিজের গৃহে গিয়া প্রবেশ করিল। সারাদিন সে অনুপমার গৃহের দিকে ভুল চাহিতে পারিল না—নিজের গৃহের কোণে লুকাইয়া রহিল। এমনই ভাবে দিন কয়েক কাটিয়া গেল। মনোরমা ক্রমে বুঝিল, তাহার অনুদিদি আর আসিবে না; তাহার জামাইবাবুর সহিত আর তাহার দেখা হইবে না; আর কেহ তাহাকে আর করিয়া ছোট বৌ বলিয়া ডাকিবে না, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুম খাইবে না! জননীকেও আর সে কোন প্রশ্ন করিল না। কেবল শূন্য নিরানন্দ মনে দিনগুলা কাটাইয়া দিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের ক্ষতের উপর বাহিরের দিক দিয়া একটা সুস্থ আবরণ পড়িল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা বেদনা রহিয়া গেল।

(৩)

বৎসর তিনেক পরে একবার দিন দুইয়ের জন্য শচীনাথ ও অনুপমার সহিত ঠাঁই মনোরমার দেখা হইয়া গেল।

শচীনাথ তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কি গো ছোট বৌ, এতদিন পরে বরটাকে মনে পড়িল?"

তাহার উত্তরে মনোরমা লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া হাসিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

শচীনাথ তবু ছাড়িল না, জোর করিয়া তাহার মুখখানি নিজের দিকে ফিরাইয়া কহিল, "এমনই করিয়া কি সতীনের হাতে বরটাকে একেবারে ছাড়িয়া দিতে হয়?"

মনোরমা মুখ নত করিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "যান্!"

বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ তিন বৎসর পূর্ব্বেকার সেই আকাঙ্ক্ষিত শাস্তির কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল এবং সেই শাস্তির অপেক্ষায় সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া রহিল।

কিন্তু শচীনাথ আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না, শুধু হাসিয়া কহিল, "আজ রাত্রে সতীনকে আগুলিয়া থাকিবে ত?"

মনোরমা অনুপমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

বিদায়কালে শচীনাথ কহিল, "আমার ছোট বৌকে যদি কেহ বেশ্বর করিয়া লয়, তাহাকে কিন্তু সহজে ছাড়িব না, তাহা বলিয়া রাখিতেছি। তাহাকে তুমি পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়া দিও।"

মনোরমা আজ আর তাহাকে কিল দেখাইতে পারিল না, তাড়াতাড়ি আরক্তিম মুখে তাহাকে প্রণাম করিয়া জননীর পিছন পিছন গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

মনোরমার যখন পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর, তখন অমূল্য চরণের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের বৎসর দেড়েক পর মনোরমা স্বামীর বুকের উপর মাথা রাখিয়া হাসিয়া কহিল, "আমার আর একটী বর আছে, সে কথা কিন্তু তোমায় এত দিন বলি নাই।"

আর একটী বর! অমূল্য আশ্চর্য্য হইয়া পত্নীর রাঙ্গা মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

মনোরমা সকৌতুকে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে বড় চাহিয়া আছ যে? সত্যি ছেলেবেলাকার একটী বর আমার আছে—তিনি কি বলিয়াছেন জান,—তোমাকে সাবধান করিয়া দিতে যে, তোমার দেখা পাইলে তিনি সহজে তোমায় ছাড়িবেন না, তুমি তাঁহার ছোট বৌকে বেদখল করিয়া লইয়াছ।" এই বলিয়া সে অপর্য্যাপ্তভাবে হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে সে স্বামীর কাছে তাহার বাল্য জীবনের সুখপ্রদ ইতিহাসটুকু সবিস্তারে বলিয়া গেল, বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

অমূল্য পত্নীর মাথাটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমি মনে করিয়া ছিলাম, বুঝি বা পরের বোঝা আমি এতদিন অনর্থক বহিয়া বেড়াই-লাম; যাহার বোঝা তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া বুঝি বা কৌণীন ধারণ করিতে হয়।"

মনোরমা কহিল, "এখনও ত তিনি দাবী করেন নাই, কাজেই তুমি আপাততঃ নিশ্চিন্ত। যদি বা ভবিষ্যতে কোন দিন তিনি তাহার এই ছোট বৌটিকে দাবী করিতেই আসেন, তুমি তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিবে। জয়ী হইতে পারিলে, আমি তোমার গলায় বিজয়মাল্য পরাইয়া দিয়া তোমারই একলার সামগ্রী হইয়া যাইব।"

অমূল্য হাসিয়া কহিল, "যদি আমার পরাজয় হয়?"

মনোরমা কহিল, "তাহার ব্যবস্থা তখন করা যাইবে।"

এমনই ভাবে বড় সুখে তাহাদের দাম্পত্য জীবনের আরও দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল। তার পর সহসা নির্ম্মল স্বচ্ছ আকাশে আশু ঝঞ্ঝার সূচনা করিয়া গভীর কালো মেঘ দেখা দিল।

তখন সমগ্র বাঙ্গালা দেশে অনন্তরকম চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। বহু মনিষী যুবক বিপ্লবের নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিন সংবাদপত্রের স্তম্ভে নূতন নূতন অদ্ভুত ডাকাতির কথা, পিস্তলের গুলিতে দারোগা খুনের কথা, বোমা ফাটার কথা, বড় বড় অক্ষরে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। মনোরমার স্বামী অমূল্যচরণ অতি সহজেই বিপ্লব-বাদীদের দলে যোগদান করিল।

(৪)

এই ভাবে আরও মাস কয়েক অতিবাহিত হইয়া গেল। পূজার আর বেশী বিলম্ব নাই। পথে

ঘাটে আকাশে বাতাসে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। এমনই দিনে অমূল্যর উপর এক ভীষণ কাজের ভার পড়িল। একজন তরুণ দারোগা বিপ্লববাদীদের ভয়ানক পিছনে লাগিয়াছে। কিন্তু সে এমনই সতর্ক যে, বিশেষ চেষ্টা করিয়া আজ পর্য্যন্ত বিপ্লব সম্বন্ধে তাহাকে পরলোকের পথে পাঠাইতে পারে নাই। এ বৎসর তাহার বাড়ীতে পূজা। তাই গোপনে পরামর্শ হইয়াছে শম্ভুনাথ সম্মুখে পিস্তলের গুলিতে তাহাকে নিধন করিতে হইবে।

সেদিন গুপ্ত আড্ডা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অমূল্য ব্যথিত কণ্ঠে মনোরমাকে কহিল, "তোমাকে কাল আমাদের দেশে রাখিয়া আসিব। সেখানে পিসিমা আছেন, তাঁহার কাছে তোমায় কিছুদিন থাকিতে হইবে।"

মনোরমা বাষ্পাকুল নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি তোমার পায়ে কি অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমায় বনবাস দিতে চাহিতেছ। আমি তোমায় ছাড়িয়া কোথায় যাইতে পারিব না।"

অনেক কাকুতিমিনতির পর শেষে স্থির হইল, ষষ্ঠীর দিন অমূল্য মনোরমাকে লইয়া গ্রামে যাত্রা করিবে।

পঞ্চমীর দিন গভীর রাত্রে অমূল্য ও তাহার এক সহকর্ম্মীর মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

মনোরমা তখন পাশের ঘরে শয্যার উপর চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা কথা কানে যাইতেই সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল।

সহকর্ম্মীটি অমূল্যকে বলিতেছিল, "এইবার দেখ। যাইবে শচীনাথ দারোগা কত বড় ধড়িবাজ, তোমার অব্যর্থ গুলির হাত হইতে কি করিয়া সে রক্ষা পায়। নবমীতে নরবলি, হা, হা, হাঃ।"

দারুণ ভয়ে মনোরমার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। শচীনাথ যে তাহার জামাই বাবুর নাম, অমূলদিদির স্বামীর নাম তাহার ছেলেবেলার বয়ের নাম! সেই শচীনাথকেই কি তাহার স্বামী হত্যা করিতে যাইতেছে, এই কথাই মনোরমা সভয়ে ভাবিতে লাগিল। শচীনাথ যে কি করে, কোথায় থাকে, তাহা মনোরমা জানে না, তবুও তাহার নামের সহিত হত্যা কথাটি জড়িত থাকায় তাহার বুকটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। এক এক সময় তাহার মনে হইতেছিল শচীনাথ ত কত লোককেই নাম হইতে পারে, ঐ শচীনাথ দারোগা হয় ত তাহার জামাই বাবু নহে! কিন্তু তাহার স্বামী নরহত্যা করিবে? মানুষ মারিতে তাহার বুকে একটু বাজিবে না! তিনি কেমন করিয়া এতবড় নিষ্ঠুরতা করিবেন? উঃ বলিয়া সে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল। এমন সময় আর একটা কথা তাহার কানে গেল, বজ্রশুদ্ধ! তাহাকে যেখানে বনবাস দেওয়া হইতেছে, তাহারই সন্নিকটে এই বজ্রশুদ্ধ গ্রাম। সে বারবার মনে মনে ঐ নামটি উচ্চারণ করিতে লাগিল। হঠাৎ বার বৎসর পূর্ব্বেকার একটা স্মৃতি অতি ক্ষীণভাবে তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। বজ্রশুদ্ধেই তাহার অমূলদিদির শ্বশুর বাড়ী। তাহার হৃৎপিণ্ডটা ধরিয়া কে যেন সজোরে নাড়া দিয়া গেল। কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর অমূল্য শয়ন করিতে আসিয়া দেখিল, মনোরমা বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। ঘুমাইতেছে মনে করিয়া অমূল্য নিঃশব্দে তাহার পাশে শয়ন করিল।

ষষ্ঠীর দিন তাহাকে পল্লীভবনে পিসিমার নিকট রাখিয়া অমূল্য যখন সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল, মনোরমা সহসা অমূল্যর পায়ের উপর পড়িয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "ও কাজ তুমি করিতে না।"

অমূল্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তবে কি মনোরমা তাহাদের সেদিনকার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছে?

মনোরমা কেমনই ভাবে তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন জড়িতকণ্ঠে কহিল, "ও কাজ আমি তোমায় কিছুতেই করিতে দিব না। আমায় হত্যা না করিয়া তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।"

অমূল্য মহা বিপদে পড়িয়া গেল। কেমন করিয়া কি বলিয়া সে তাহার পত্নীর হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবে? সে ত ইচ্ছা করিয়া ঐ নিষ্ঠুর কাজের ভার লয় নাই, তাহার উপর সে ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে নিরুপায়—কি করিবে সে!

মনোরমাকে সে বহু প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই যখন মনোরমা তাহার পা ছাড়িতে চাহিল না; তখন সে একরকম জোর করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া পাগলের মত ছুটিয়া সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। মনোরমা মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

(৫)

অষ্টমীর দিন শচীনাথের অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া মনোরমা ডাকিল, "অমূলদিদি।"

অমূলমা বারান্দায় দাঁড়াইয়া কাহার সহিত কথা বলিতেছিল, চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "কে গা?"

মনোরমা ম্লান হাসিয়া কহিল, "আমায় চিনিতে পারিলে না অমূ দিদি, আমি যে মনু, তোমার সতীন।"

অমূলমা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মনু, মনু, তুই! আমরা যে তোকে কত খুঁজিয়াছি। আঃ, এবারকার পূজা—মামাদের সার্থক হইল।" এমন সময় একটী পাঁচ বৎসরের বালক "মা মা" বলিতে বলিতে সেইদিকে ছুটিয়া আসিল। মনোরমা আগ্রহভরে দুই হাত দিয়া তাহাকে কোলে লইতে গেলে, সে শঙ্ক হইয়া দাঁড়াইল। অমূলমা হাসিয়া কহিল, "আরে বোকা ছেলে, ও যে তোর ছোট মা; কোলে যা।"

তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেই মনোরমার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

অমূলমা মনোরমাকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া এ কথা সে কথার পর স্বামীর চাকুরীর কথা উঠিতেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমার দিনগুলো যে কি রকম ভয়ে ভয়ে কাটিতেছে, তাহা আর তোকে কি বলিব ভাই? আমার সব সময় মনে হয়, এই বুঝি কে ওঁকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল।"

মনোরমা কোন রকমে হৃদয়ের যন্ত্রণা চাপিয়া কহিল, "আমাইবাবুকে বল অমূদিদি, তিনি যেন এখনই ও চাকুরী ছাড়িয়া দেন।"

অমূলমা বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিল, "কত বলিয়াছি ভাই, কিন্তু কোন কথায় তিনি কান দেন না। হাসিয়া বলেন, যখন জন্মিয়াছি, তখন একদিন মরিতেই হ'বে, মিথ্যা ভয় করিয়া লাভ কি?"

মনোরমা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় —শচীন্দ্রনাথ, 'ও গো' বলিয়া কক্ষ মধ্যে আসিয়া কহিল, "এত জরুরি তলব কিসের জন্য?

অমূলমা সমস্ত মুখখানি হাসিতে ভরিয়া কহিল,

"আমার সতীন আসিয়াছে যে, দেখিতে পাইতেছ না।"

শচীনাথ আশ্চর্য্য হইয়া মনোরমার দিকে চাহিতেই, মনোরমা ঘোমটা টানিয়া দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

অমূলমা শচীনাথের বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "চিনিতে পারিলে না, আমাদের মনু, তোমার ছোট বৌ, আমার সতীন।"

এইবার শচীনাথের সব কথা মনে পড়িয়া গেল। হাস্যোজ্জ্বলমুখে সে কহিল, যে তাহার বরটিকে এতদিন ফেলিয়া থাকিতে পারে তাহাকে "কি করিয়া চিনিবে বল, তাহা ছাড়া ছোট বৌ বলিবার অধিকার কি আর আমার আছে। যাহাকে ও নাম ধরিয়া ডাকিবে সে গালি দিবে এবং অপর এক জনের কানে সে কথা উঠিলে সে আমায় খুন করিবে।"

এ যে কত বড় সত্য, তাহা বুঝিয়া মনোরমা শিহরিয়া উঠিল! সে পরিহাসে সে যোগদান করিতে পারিল না; নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

শচীনাথ কহিল, "কি গো, ছোট বউ, আমার শত্রুটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ? নিশ্চয়ই কিন্তু মনে আছে ত সে কথা, তাহাকে কিন্তু আমি সহজে ছাড়িব না। কোথায় তাহাকে বসিয়া রাখিয়াছ আমি জানিতে চাই।"

তাহার হইয়া অমূলমা হাসিয়া উত্তর দিল, "মনুর কি প্রাণে ভয় নাই যে, সে জানিয়া শুনিয়া শত্রুপুরীতে তোমার নূতন বরটিকে লইয়া আসিবে।"

শচীনাথ হাসিয়া কহিল, "যাক্, তাহা হইলে আমি এখন নিশ্চিন্ত, ক'দিন প্রাণ খুলিয়া ছোট বৌয়ের সহিত কথা বলিতে পারিব।"

সে রাত্রে মনোরমা অমূলমার পাশেই শয়ন করিল। শয়ন করিবামাত্র শ্রমক্লান্ত অমূলমা ঘুমাইয়া পড়িল। মনোরমা বিনিদ্র অবস্থায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। শেষ রাত্রে সে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, "অমূদিদি!" ঘুম ভাঙিয়া অমূলমা তাহার গায়ে হাত দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "কি হইয়াছে রে মনু।" মনোরমা অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কিছু না অমূ দিদি, তুমি ঘুমাও।" এই বলিয়া সে দুই হাতে অমূলমার দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

নবমীর দিনের বেলাটা পূজার আনন্দের মধ্যে কে. মে কাটিয়া গেল; মনোরমার কেবলই মনে হই লাগিল আজ সন্ধ্যাটা যেন না আসে। কিন্তু যথাসময়ে সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশের কোলে আত্মগোপন করিল এবং সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে আসিয়া ধরনীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

শচীনাথ তখন বাহিরে ছিল। মনোরমার আহ্বানে ভিতরে আসিতেই মনোরমা হঠাৎ শচীনাথের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "জামাই বাবু, আপনাকে আমি আর বাহির যাইতে দিব না। আমার সহিত বসিয়া সারারাত্রি আপনাকে গল্প করিতে হইবে।"

শচীনাথ হাসিয়া কহিল, "আজিকার রাত্রিটা আমায় ছাড়িয়া দিতে হইবে, তারপর ছুটির বাকি ক'টা দিন সারাদিন সারারাত্রি বসিয়া তোমার সহিত গল্প করিব। তোমার দিদি ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে, নূতন পাইলে পুরাতন কে চাহে বল ত?"

মনোরমা ব্যঙ্গ হইয়া কহিল, "আমি কোন কথা শুনিব না। আজ আর আপনাকে আমি কিছুতেই বাহিরে যাইতে দিব না।"

মনোরমার কম্পিত কণ্ঠস্বর, বিবর্ণ মুখ ও ভয়-চকিত দৃষ্টি তীক্ষ্ণবুদ্ধি শচীনাথের মনে হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগাইয়া তুলিল! কিন্তু মনের ভাবটা চাপিয়া হাসি মুখে সে কহিল, "আজ আমার উপর এত অনুগ্রহ কেন বল ত?"

অল্পকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মনোরমা মিনতি ভরা কণ্ঠে কহিল, "আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, আমি উত্তর দিতে পারিব না। আমি যাহা বলিব, আপনাকে তাহা শুনিতে হইবে। এখন হইতে সারারাত্রি এই ঘরে আপনাকে বসিয়া থাকিতে হইবে।"

শচীনাথ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল, তাহারই সম্বন্ধে সে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

সহসা মনোরমা তাহার পায়ের উপর পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আমাকে একটী ভিক্ষা দিতে হইবে জামাইবাবু! বলুন দেবেন?"

শচীনাথ মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, কি চাও বল?"

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া করুণ কাতর নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার হাতের নোয়া সিঁথীর সিঁদুর আপনাকে বজায় রাখিতে হইবে।"

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটী বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন।

শচীনাথ মনোরমার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি কিছু ভাবিয়ো না মনু, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। কে ডাকিতেছে, আমি শুনিয়া আসি।"

শচীনাথ চলিয়া গেল। মনোরমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া হঠাৎ তাহার অনুসরণ করিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বাহিরের দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া সম্মুখের দিকে চাহিতেই মনোরমা পাষাণ মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ হইয়া গেল। তাহার স্বামী অমূল্যচরণ ও শচীনাথ মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং অমূল্যর ডান হাত খানি তাহার কোটের পকেটের মধ্য হইতে কি যেন টানিয়া বাহির করিতেছে!

মনোরমা উন্মাদিনীর ন্যায় প্রাণপণে ছুটিয়া গিয়া শচীনাথকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওগো আমার জামাইবাবু!"

সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁশির শব্দে প্রাঙ্গনতল মুখরিত হইয়া উঠিল।

নাকছাবি

(শ্রীগিরিজাকুমার বসু)

সুধামুখ-সাগরের রূপের তুফানে
পথভ্রান্ত দিশাহারা প্রেম নাবিকের
কিরণ-ইঙ্গিত তুমি উন্মুখ নয়নে,
চিরদীপ্ত বাতিটুকু আলোক গৃহের—
আশাহরা চিন্তাহরা; অপরূপ করে
তুমি যেন স্নিগ্ধ শুভ্র তনু গগনের
স্থির ধ্রুবতারাকাটি; সোহাগ-শিখরে
তুমি বুঝি নবোদিত প্রীতি-অরুণের
সমুজ্জ্বল হেমশিখা; ফণী-ফণা-শিরে
তুমি আঁখি-বিমোহিনী মণি জ্যোতিষ্মতী
নিখিল-হৃদয়-লোভা; দীনের কুটিরে
তুমি শান্ত প্রদীপের কান্ত ভাতি অম্লি!
অধরের জয়টীকা তুমি চিরন্তন
মরমের হরষের পরশ-রতন!

পল্লীগ্রামে ব্যাঘ্রশিকার

(শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়)

পল্লীগ্রামে আমাদের বাস। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরের অধিবাসীরা আমাদের সুখদুঃখ আমাদের সুবিধা অসুবিধা বুঝিতে পারিবেন না; তাই আমাদের পল্লীজীবন যাপন প্রণালীর একটি ধনতিরঞ্জিত আলেখ্য তাঁহাদের সম্মুখে ধরিতেছি; আশা করি ইহা দেখিয়া তাঁহারা আমাদের অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিবেন; হয় ত পল্লী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন।

আমাদের গ্রামের চতুর্দ্দিকে আট দশ ক্রোশের মধ্যে যত পল্লীগ্রাম আছে—তাহাদের সকলগুলি অপেক্ষা আমাদের পল্লীখানি অধিক সহজ এবং কতকটা সুন্দর ভাবাপন্ন, কারণ ইহা একটি সুবিস্তীর্ণ মহকুমার সদর ষ্টেশন। এখানে থানা, আদালত স্কুল, মিউনিসিপালিটী, দাতব্য চিকিৎসালয়, লোকাল বোর্ডের আফিস হইতে হোটেল ও মুদির দোকান প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার কোন উপাদানেরই অভাব নাই। তথাপি ইহার কোন দিকে প্রায় দশ ক্রোশের মধ্যে রেলের লাইন নাই। বহু-দূরবর্ত্তী রেল ষ্টেশনে যাতায়াতের জন্য জেলাবোর্ডের একটি ইটকৃত পথ আছে, তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। টিকেদার প্রতিবৎসর তাহার জীর্ণসংস্কারের ভার গ্রহণ করে বটে, কিন্তু জেলাবোর্ডের টাকাগুলি দিয়া পথটকে সুগম করিবার চেষ্টা করিলেও মাড়োয়ারী মহাজনদের মালবাহী গরুর গাড়িগুলির লৌহনির্ম্মিত হাল বেষ্টিত চক্রের ক্রমাগত ঘর্ষণে অতি অল্প দিনেই সেই সকল রিফুকর্ম্ম অদৃশ্য হইয়া পথের দৈর্ঘ্যের অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট হয় এবং গ্রীষ্মকালে গগনস্পর্শী ধুলার আতিশয্যে ও বর্ষাকালে আজানু-গভীর কর্দ্দমের দুর্দ্দমনীয় পাক্রমে এই পথ কিরূপ দুর্গম হইয়া উঠে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের কল্পনা করা দুঃসাধ্য! ইহার উপর মধ্যে মধ্যে এই পথে দস্যুভীতি চূড়ার উপর ময়ূরের পাখা'র ন্যায়

বিরাজ করিয়া নিরীহ ও নিরস্ত্র পাখুগণের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে! সরকারের ডাক দৈবাৎ কোনদিন লুপ্তিত হইলে এই দীর্ঘ পথের স্থানে স্থানে লাল-পাগড়ীর নিশান উড়িতে দেখা যায়, এবং ডাকবাহী ঘোড়ার গাড়ীর কোচবাক্সে বন্দুকধারী 'ট্রেজারী গার্ড' কোন চৌরে, মিশির বা তেওয়ারী কপিধ্বজ রূপে সংস্থাপিত হইয়া অদৃশ্য দস্যুদের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করে।

গ্রামে নদী নাই বলিলেও চলে। গ্রামপ্রান্ত বাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সূক্ষ্ম রজতসূত্রবৎ বিরাজিত, তাহার দুই পারে বহুদূর পর্য্যন্ত বৈশাল ও টোপা-পানায় সমাচ্ছন্ন; অধিকাংশ স্থান 'মজিয়া' গিয়াছে বা ভরাট হইয়া উঠিয়াছে। স্নানের ঘাটগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়; গ্রামের জনসাধারণ স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা যে সকল ঘাটে স্নান করে, সেই সকল ঘাটে একহাঁটু জলের নীচে এক বুক পাঁক, কোন সবল ব্যক্তির সহায়তা ব্যতীত দুর্ব্বল স্নানার্থীগণের সেই মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করা অতি দুরূহ ব্যাপার! নদীর জল যতই শুকাইয়া যাইতেছে—ততই 'গোসড়কে মুচির পরব' জাঁকিয়া উঠিতেছে; নদীতীরে যে সকল চাষী গৃহস্থের শস্যক্ষেত্র আছে—তাহারা সেই সকল ক্ষেত্রের সীমা জলের কিনারা পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া তাহা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইতেছে ও সেখানে ফসল বপন করিতেছে! 'নগরের পিতৃগণে'র এদিকে আদৌ দৃষ্টি নাই, কিন্তু সুদূর মফস্বলের পল্লী হইতে কোন্ শুক্কর গাড়ী মিউনিসি-পালিটীর টিকিট নিতথ দেশে না আঁটিয়া নগরে ধান চাউল বা মকর মস্তুরী বিক্রয় করিতে আসিতেছে, সন্ধ্যার পর লণ্ঠন জ্বালিয়া না বাঁধিয়া কোন্ গাড়ী পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে—তাহার সন্ধান লইয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য শ্যেনদৃষ্টি প্রহরীর অভাব নাই!

আমাদের পল্লীর সকল ত্রুটি কিন্তু জঙ্গলেই ঢাকিয়া লইয়াছে। আমাদের এই গোবিন্দপুরে পূর্ব্বে বহু লোকের বাস ছিল, ম্যালেরিয়া জলের ও বসন্তের প্রকোপে অনেকদিন পূর্ব্বে অনেকেই নির্ব্বংশ হইয়াছে; তাহাদের ভিটায় বাতি দিবার লোক নাই। সেই সকল ভিটা এখন দুর্গম অরণ্যে সমাচ্ছন্ন; যেখানে এক সময় দুর্গোৎসব, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ জন-কোলাহলে মুখরিত হইত, ধূপধুনার সৌরভ বায়ুস্তর সুরভিত করিত, অগণ্য ভক্তের মস্তক যেখানে অবনত হইত, এবং আলোকে পুলকে অপরূপ শোভা বিকাশ করিত, সেই অট্টালিকা সমূহ এখন বিধ্বস্ত; সেখানে সুবৃহৎ বট পাকুড়ের গাছ চতুর্দ্দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের নীচে বেতবন, কালকাসিন্দে, ভাঁট ও লাল ভেরেণ্ডার জঙ্গল, তাহাদের সেখানে 'শিয়রে থেকে বেঁকে ফুকারে গভীর,' আর রাত্রে সেই সকল স্থানের নিকট দিয়া কোন লোক যাতায়াত করিতে সাহস করে না; সেই সকল অরণ্যে বট পাকুড়ের তলে বসিয়া হুতুম প্যাঁচার দল গম্ভীর স্বরে আলাপ করিয়া পল্লী শ্মশানের গাম্ভীর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত করে, ব্যাঘ্রের আঘ্রাণ পাইয়া তৃষ্ণার্ত্ত বন্য বরাহ যুথ প্রাণ ভয়ে গ্রাম্য ভিতর দিয়া অরণ্যান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে, চারিদিকে 'ফেউ' ডাকিতে আরম্ভ করে; তাহার পরেই বৃন্দাবনের ব্যাঘ্রাচার্য্য মহাশয় সপ্তস্বরাবরে গৃহস্থপল্লী বক্ষ বিস্তৃত বেতসকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া সুগভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পল্লীর মধ্যস্থলে অবস্থিত মিউনিসিপাল পুষ্করিণীতে জলপান করিতে আসে। দুই পাশে গৃহস্থের মুখকুটীর, ছোট ছেলে মেয়েরা হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিলে, মা বলে, 'চুপ্, ঐ শোন বাঘ ডাকছে!'—সেই জলদ গম্ভীর হুঙ্কার শুনিয়া ছেলে মেয়েদের কান্না থামিয়া যায়।—বস্তুতঃ আমাদের পল্লীতে একালের বাঘ সেকালের বর্গির মত অধিকার করিয়াছে!

এখন রাত্রি একটা। গাঢ় মেঘে সমাচ্ছন্ন, উদ্দাম বায়ু প্রবাহ সন্ সন্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে।

ঝাঁড়ীর কন্‌ষ্টেবলেরা রোঁদে বাহির হইয়া অন্ধ গাড়ায় ঘুরিতে ঘুরিতে 'ডাকাত পড়া'র মত সমস্বরে বিকট চিৎকার করিয়া নিদ্রিত গৃহবাসীদের হুসিয়ার হইতে আদেশ করিতেছে; হঠাৎ আমার বাড়ীর দুই তিনশত গজ পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীর ধারে ব্যাঘ্র-গর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছে! বাঘ ও বাঘিনী উভয়ে নিভৃতে প্রেমালাপ করিতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি! একটার স্বর খুব গম্ভীর, এক নিশ্বাসে অনেকবার 'হুঁকর হুঁকর' করিতেছে; আর একটার স্বর অপেক্ষাকৃত চাপা এবং ক্ষীণতর; বোধ হয় সেটাই বাঘিনী। ঘরের বাহিরে গিয়া লণ্ঠন লইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই বোধ হয় দর্শনে বোধগম্য হয়; কিন্তু এতদূর আগ্রহ ও সাহস এই উষ্ণরক্তই অভাব বশতঃ রুদ্ধদ্বার গৃহে কেরো-সিনের ল্যাম্পের কাছে বসিয়া অতঃপর কি ঘটে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

প্রায় দশ মিনিট পরে একটা ব্যাঘ্রেরই গর্জ্জন পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাইতেছি; বোধ হয় বাঘিনীটা জল পানে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহার শাবকগণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়াছে। কারণ গ্রাম প্রান্তস্থ যে আমবাগানে বাঘের আড্ডা, সেই দিকে 'ফেউ' খুব উৎসাহের সঙ্গে ডাকিতেছে শুনিতেছি। ডাকিতে ডাকিতে এক একবার কম্পিত কণ্ঠে 'ফ্যাক্ ফেউ' শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছে। ফেউ নিকটে গিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলে বাঘ বা বাঘিনী উক্তরূপ হইয়া যখন তাহাকে তাড়া করে, সেই সময় পলায়ন পর 'ফেউ' এই ভাবেই আর্ত্তনাদ করে।

যাহা হউক, বাঘটা মধ্যে মধ্যে গর্জ্জন করিতে করিতে আমার বাড়ীর সুমুখস্থ রাজপথের অপর পার্শ্বে ডাকঘরের পশ্চাতে আমার প্রতিবেশীর বাগানে আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। দশ মিনিট পরে সে নীরব হইল।

আমার বাড়ীর ঠিক দক্ষিণেই একটি ছোট বাগান। এই বাগানের দক্ষিণে আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ীর সীমা। বাগানে গোটাকত কাঁঠাল, কুল, নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। এই বাগানের মধ্যে মিনিট দশেক পরে একটা শব্দ হইল 'মাও'—বিড়ালের কণ্ঠস্বর বটে, কিন্তু সেই স্বরে কতখানি ভয়, ব্যাকুলতা ও যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিল, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। সঙ্গেসঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, এবংবিধ বেগে বোধ হয় বাতাস বহিতেছে। দ্বিতীয় বার বিড়ালো সেইরূপ আর্ত্তনাদ শুনিলাম—আমার ঘরের প্রায় কুড়ি হাত দূরে, বাগানের উত্তর দিকের বেড়ার অতি নিকটে; চক্ষুর নিমিষে ঝম্ করিয়া একটা শব্দ হইল! বুঝিলাম, বাঘটাই বিড়ালটাকে মুখে লইয়া বেড়া ডিঙাইয়া আমাদের বাহিরের আঙ্গিনায় লাফাইয়া পড়িল! ল্যাম্পের তীব্র আলোকে বাতায়ন-পথে বাহিরের আঙ্গিনার অনেক দূর আলোকিত করিয়াছে, বোধ হইল কি একটা জানোয়ার নক্ষত্র বেগে পথের দিকে চলিয়া গেল। তাহার অবয়ব স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ডাকঘরের পার্শ্বস্থ বাগানের নিকট হইতে আর একবার বিড়ালটার বিষ্ণুর কণ্ঠে কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। তাহার পর নিস্তব্ধ! ঘড়িতে ঠং করিয়া দেড়টা বাজিল; আমি দৃঢ় নির্ব্বাসিত করিয়া দ্বিতলে আমার শয়ন কক্ষে চলিলাম।

প্রভাতে উঠিয়া বিড়ালটার সন্ধান লইবার জন্য আগ্রহ রহিল।

প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে বিড়ালটার সন্ধান লই-লাম। রাত্রে বাঘে কোন্ বিড়াল ধরিয়া লইয়া গিয়াছে তাহা স্থির করা কঠিন হইল না। একটা খুব বড় লাল কুণো বিড়াল সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ীতে আসিত, অত্যাচার যথেষ্ট করিত; কিন্তু সেই দিন হইতে আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই! পূর্ব্ব রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল, ডাক ঘরের কাছে নরম মাটীর উপর ব্যাঘ্র-পদচিহ্ন অঙ্কিত দেখিলাম।

আমাদের প্রতিবেশী শ্রীমান্ ভূতনাথ অত্যুৎসাহী

মৎস্য শিকারী ছিলেন, এখন তিনি 'কেউটে ধরেন,' অর্থাৎ বাঘ শিকার করিতে যান। বিভাগীয় কমিশনর সাহেব উৎকৃষ্ট দোনলা বন্দুক ছিল, ঘোড়াবিহীন বন্দুক। সাহেব সিভিল সার্জিসের মায়া কাটাইয়া 'হোমে' যাইবার সময় সেই বন্দুকটি তাঁহার প্রিয় খানসামাকে বকশিস্ দিয়া যান। ভূত নাথ সেই বন্দুকটি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া ব্যাঘ্র শিকারের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যে দিন বাঘের সন্ধান মিলিল, সে দিন তিনি কার্য্যান্তরোরে শিকারে যাইতে পারিলেন না; তাঁহার প্রতিবেশী বন্ধু ভবতোষের শিকারের উৎসাহ আরও অধিক! ভবতোষ শুনিলেন, পুরুদিগীর ধারে একটা বড় আমগাছের ছায়ায় বেতবনে বাঘ লুকাইয়া আছে। ভবতোষ ভূতনাথের সেই বন্দুকের একনলে ছররা পূর্ণ টোটা, আর একনলে গুলি বিশিষ্ট টোটা ভরিয়া কয়েক জন লোক সঙ্গে করিয়া শিকারে চলিলেন। তাঁহার পায়ে ডবল মোজার উপর বুট, তাহার উপর পট্টি জড়ানো। পরিধানে উপযুক্তপরি তিনটা হাফ্ প্যাণ্ট; বুকপিঠ ও দুই হাতে পুরু করিয়া কম্বল জড়াইয়া তাহার উপর তিনটি কোট আঁটিয়াছেন, বাঘের নখ যাহাতে দেহচর্ম্ম ভেদ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা। গলায় মফিলার গলাবন্ধ পুরু করিয়া জড়ান, মাথায় পাকড়ী উপর হ্যাট বাঁধা! ক্যামেরা থাকিলে আমি এই শিকারী বেশের ছবি তুলিয়া লইতাম। কিন্তু সেরূপ সুযোগ না থাকায় অগত্যা অভিনব শিকারী মূর্ত্তি দেখিয়াই নয়ন সফল করিলাম। ভবতোষ বন্দুক ঘাড়ে লইয়া বীরদর্পে ব্যাঘ্র শিকারে চলিলেন, সঙ্গে এক পাল ছেলে।

নির্দ্দিষ্ট আমগাছের নীচে বাঘের সন্ধান না পাইয়া ভবতোষ আদেশ করিলেন, "জঙ্গলে ঢিল মার।" আশে পাশে যে জঙ্গল ছিল তাহাতে লোষ্ট্র বর্ষিত হইতে লাগিল বাঘটা বেতস কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া অদূরে অগভীর ভাট বনের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল। একটি ঢিল তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র সে গর্জ্জন করিয়া খোলা মাঠের আসিয়া পড়িল। বেশ বড় বাঘ! সম্মুখে সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া শিকারী ভবতোষের আত্মা পুরুষ খাবি খাইতে লাগিল; 'ওরে ঐ যে বাবা, বাঘরে! এখনই খেয়ে ফেল্‌বে" বলিয়া ভবতোষের সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ চম্পট দান করিল। ভবতোষ সেই স্কটজনক অবস্থায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে ও ঘামিতে লাগিলেন। বাঘ বোধ হয় শিকারীর শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, এই জন্য ভবতোষের প্রতি কৃপা কটাক্ষ পাত না করিয়া হেলিয়া দুলিয়া অন্যত্রাভিমুখে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চলিল।

বাঘ পলায় দেখিয়া ভবতোষ। সাহস হইল; তিনি ভাবিলেন, বাঘ অনেক দূরে গিয়াছে, এত গুলিতেই উহাকে সাবাড় করিতে পারিবেন; গুলি খাইয়া যদি আক্রমণ করিতে আসে—তৎপূর্ব্বেই চম্পট দিতে পারিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি বুকের কাছে বন্দুক ধরিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া এক চক্ষু মুদিয়া কম্পিত হস্তে 'ফায়ার' করিলেন। তাহারা তখন 'বাঘ মারী' লাগিয়াছিল, গুলির পরিবর্ত্তে যে নলে 'ছররা' ছিল, সেইই 'ফায়ার' হইয়া গেল! সৌভাগ্যক্রমে বাঘ তখন এতদূরে গিয়া পড়িয়াছিল যে, একটা ছররাও তাহার লোমস্পর্শ করিতে পারিল না। সে বিকট হুঙ্কার একবার পশ্চাতে চাহিয়া গভীর অরণ্যে অদৃশ্য হইল। যদি দৈবক্রমে দুই একটী ছররা বাঘের গায়ে বিঁধিত, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া ভবতোষের ভবলীলার অবসান করিয়া দিত সন্দেহ নাই। তাঁহার কম্বল ও পাকড়ীর বল তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত না। বাঘটা দূরে হইলে ভবতোষ বীরদর্পে ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অকম্প দেহেই বাড়ী ফিরিলেন; বন্ধুগণকে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কি বল্‌বো! বাঘটা আমার ওর পালিয়ে গ্যালো, আর আমারও গুলি মারিতে ভুল হয়ে গ্যালো; নৈলে আজ কি এমন শিকার হাত ছাড়া হয়? আমি যে পায়ে হেঁটে গিয়ে বাঘকে গুলি করেছি—এজন্যে আমার সাহসকে তোমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

কিন্তু এই ভবতোষ শিকারী অপেক্ষাও একজন বড় দরের শিকারী আমাদের এ অঞ্চলে আছেন; আমরা মিঃ এলেন বলিয়া তাঁহাকে পরিচিত করিব। তিনি এই অঞ্চলের ইংরাজ জমিদারের স্থানীয় এজেণ্ট। আমাদের গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে পিটুলীর কুঠীতে তাঁহার আড্ডা। তিনি কতকগুলি ইতর বাঙ্গলা গালি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতেই কুঠীর কাজ চলে! দিবসের অধিকাংশ সময় ঘোড়ায় চড়িয়া চাবুক হাতে লইয়া মাঠে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, কারণে অকারণে সেই চাবুক কালা আদমির পিঠে পড়ে; তাহারা যখন কাতর হইয়া যখন পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে মুখ ব্যাদন করিয়া আর্ত্তনাদ করে,—তখন সাহেব মজা দেখিয়া হাসেন!

সাহেব যেমন বাঙ্গলা ভাষায় বুৎপত্তি, তাঁহার কুঠীর তহশীলদার হারাধন সরকার সেইরূপ ইংরাজী ভাষায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত; সাহেব তাঁহার ইংরাজী কথা শুনিয়া আমোদ পান, এজন্য হারাধন সাহেবের সহিত ইংরাজী ভিন্ন বাঙ্গলায় কথা বলে না। সাহেব কিন্তু তাহার সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষাতেই আলাপ করেন।

একদিন হারাধন সাহেবকে বলিল, "সার, টাইগারস্ টিরানী বিগণ্ডো রাইজ, ইফ্ ইউ কিল ওয়ান, অ্যাণ্ড সো টিণ ফল ডেড, আউয়ার টাইগার ফিয়ার টেক ফেয়ারওয়েল।"—এই অপূর্ব্ব ইংরাজীর অর্থ এই—"মশায়, বাঘের অত্যাচার বড়ই বেড়ে উঠেছে; যদি আপনি একটা মারেন, সে মরে দাঁত বের ক'রে প'ড়ে থাকে, তা হ'লে আমাদের ভয় দূর হয়।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "বাঘ দেখ্‌লাও, হামি এক গুলিটে টাহার পঞ্চটা লাড কোরিব।"

কিন্তু বাঘ খুঁজিয়া দেখাইতে হইল না। এক দিন প্রভাতে সাহেবের সহিস পরদিবস জবাই বোধ হয় এক প্রকাণ্ড বাঘ কুঠীর হাতায় ফুলবাগানের মধ্যে বসিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমে সৌরভ আঘ্রাণ করিতেছিল! বাগানের মালী মতি সর্দ্দার বাগানে কাজ করিতে আসিয়া সম্মুখে বাঘ দেখিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; তাহারও সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিয়া সাহেবে চেয়ার বসি।

সাহেব তৎক্ষণাৎ বন্দুক টোটা ভরিয়া বারান্দায় আসিলেন; কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া বাঘ দেখিতে পাইলেন না, অথচ সেই নিরূপায় স্থান হইতে নামিয়া বাগানে প্রবেশ করিতেও তাঁহার সাহস হইল না! তিনি বাগানের মালীকে আদেশ করিলেন—সে বাগানে গিয়া বাঘটাকে তাঁহার কামরার জানালার দিকে তাড়াইয়া দিবে; তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সেই জানালার গরাদের ভিতর দিয়া গুলি চালাইয়া বাঘ মারিবেন!

মালী বলিল, "হুজুর, বাঘ যদি ওদিকে না যায়? আপনি নামিয়া আসুন, বেশ ফাঁকা যায়গায় আছে; এক গুলিতেই মারিতে পারিবেন।"

সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন; "নেই নেই, সো হোগা নেই; ও বাঙ্গালী নেহি, বাঘ আছে। কুছু ডর নেই, টুম্ নীচু যাও।"

সাহেব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন, এবং জানালার গরাদের ভিতর দিয়া বন্দুকের নল বাহির করিয়া লক্ষ্য স্থির করিতে লাগিলেন। মালী সাহেবের হুকুমে নিরুপায় হইয়া বাগানে প্রবেশ পূর্ব্বক এক লাঠি হাতে লইয়া 'হেই, হেই' করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বাঘটা লাফাইয়া মালীকে আক্রমণ করিল, এবং তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া নখর দন্তাঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিল। তাহার পর তাহাকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায়

ফেলিয়া রাখিয়া দুই লম্ফে বাগানের প্রাচীরের নিকট আসিল; সাহেব তখনও বন্দুক ধরিয়া লক্ষ্য স্থির করিতেছিলেন। বাঘ একলম্ফে প্রাচীরে উঠিয়া যখন অন্তর্দ্ধান করে—তখন সাহেব মহাক্রুদ্ধরে 'ফায়ার' করিলেন।

বাঘ প্রস্থান করিলে সাহেব দ্বার খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন; মালীর তখন চৈতন্য বিলুপ্ত প্রায়, তিনি তাহার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িলেন, এবং হাতে লাঠী থাকিতে অতবড় জোয়ানটা আত্মরক্ষা করিতে পারিল না বলিয়া তাহার কাপুরুষতার নিন্দা করিলেন! তাহার পর তাহাকে গরুর গাড়ীতে তুলিয়া আমাদের গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। তিন দিন পরে মতি মালী জন্মের মত মালীগিরি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। তাহার অনাথা বিধবা ক্ষুদ্র শিশু সন্তানটিকে কোলে লইয়া এখন পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এলেন সাহেব যেরূপ বীরপুরুষ বিগত জর্ম্মান যুদ্ধে উপস্থিত থাকিলে বীরত্বে তিনি স্বজাতির মুখ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া সেনাপতির গৌরব লাভ করিতে পারিতেন।

মতি মালীর মৃত্যুর পর আমাদের স্বয়ংসিদ্ধ শিকারী শ্রীমান্ ভূতনাথ ভায়া এলেন সাহেবের উপর টেক্কা দিয়া বাঘ 'শিকারের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিবার কারণ ঘটিল।

একদিন সন্ধ্যার পর বসন পাল নৈশ ভোজন শেষ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে তাহাদের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া, দ্বার হইতে হাত তিনেক উঁচাতে একখানি চেয়ারে বসিল, এবং তামাক সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিল। বৈঠকখানার দ্বার একটি, তাহা খোলা ছিল; সামনেই রাজপথ, পথের দুইদিকে বাগান, মধ্যে মধ্যে গৃহস্থের বাড়ী। বসন পাল কলিকায় ফুঁ দিতে দিতেই কিছু দূরে দুইটি কুকুরের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। দুই মিনিটের মধ্যেই দুইটি কুকুর সবেগে তাহার বৈঠকখানার প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিল; এক পাশে একখানি খাটিয়া ও অন্য পার্শ্বে একটি আলমারি ছিল, একটি কুকুর সভয়ে খাটিয়ার নীচে, অন্যটি আলমারির আড়ালে লুকাইল! বসন পাল হুঁকা হাতে লইয়া সাগ্রহে ঘরের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় আচম্বিতে এক বৃহৎ ব্যাঘ্র একলম্ফে বসনের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিয়া চেয়ারের প্রায় দুই হাত দূরে দ্বারের নিকট 'থাবা গাড়িয়া' বসিল, এবং কুকুর দুইটি কোন্ দিকে আছে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল! বসন পাল এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "বাঘ ঘরে ঢুকে খেয়ে ফেল্লে রে বাবা!"—ক্ষুর কক্ষ, সম্মুখে একটি মাত্র দ্বার, সেই দ্বার আটক করিয়া দুই হাত দূরে বাঘ বসিয়া আছে, এবং শিকার ধরিবার আশায় চারিদিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছে! বসন পালের মনের অবস্থা পাঠক কল্পনা করুন। তাহার আর্ত্তনাদে পাড়ার অনেক লোক 'হুলুই দিতে দিতে' বৈঠকখানার সম্মুখে দৌড়াইয়া আসিল; তখন বাঘটা শিকারের আশা ত্যাগ করিয়া বৈঠকখানার বাহিরে আসিল, এবং একলম্ফে বারান্দার নীচে নামিয়া তীরবেগে পলায়ন করিল। ইচ্ছা করিলেই সে আগন্তুক লোকগুলির একজনকে মুখে করিয়া লইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু বোধ হয় সে তখনও নরশোণিতের স্বাদ পায় নাই; 'মানি ইটারের' পর্য্যায়ে প্রমোশন পায় নাই।

বাঘ পলায়ন করিলে পাড়ার লোক কেহ কেনেস্তারা বাজাইতে লাগিল, কেহ কাঠের উপর লাঠির আঘাত করিতে লাগিল; অনেকেরই মুখে মার মার শব্দ! দশ মিনিট পরে বাঘটা আর মাইল দূরবর্ত্তী সেখ পাড়ায় প্রবেশ করিয়া, এক

মুসলমান কৃষকের গোশালার পশ্চাতে বসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। গোশালায় যে সকল গরু বাছুর থাকে—সেগুলিকে ভয় দেখাই। যূথভ্রষ্ট করিবার জন্য গ্রামের গরুর এ একটা কৌশল। বাঘের ডাক শুনিয়া গরু বাছুরগুলি 'গোহাল' হইতে বাহির হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল; সেই সুযোগে বাঘটা একটা বাছুর মুখে লইয়া বাঁশবন পার হইয়া আমবাগানের ভিতর দিয়া গহীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিল।

এরূপ কাণ্ড প্রায়ই ঘটে! বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের গ্রামের এক বিশ্বাসঘাতক ঘোষ্‌নী বাঘের মুখ হইতে বাছুর কাড়িয়া লইয়াছিল!

শ্রীমান্ ভূতনাথ বাঘের এই অত্যাচারের কথা শুনিয়া বাগানের ভিতর এক মাচা বাঁধিয়া একজন বন্দুক সেই মঞ্চের উপর দুই রাত্রি সশস্ত্র বাস করিলেন। মাচার নীচে একটি ছাগল বাঁধিয়া রাখিল; কিন্তু বুদ্ধিমান বাঘ তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মুখরোচক ছাগ মাংসের লোভ সংবরণ করিল, মাচার নিকট ঘেঁষিল না।

ইতিমধ্যে ডাকবাঙ্গলার প্রহরী একদিন প্রভাতে সংবাদ দিল, "বাবু, বাঘে আমার ঘোড়ার বাচ্চাটাকে কাল রাতে মেরে খেয়েছে। আধখানা খেয়েছে, বাকি আধখানা, যে গাছের 'খোঁড়লে' তার বাসা, সেই গাছের তলায় টেনে নিয়ে গিয়েছে।"

ডাক বাঙ্গলার প্রায় এক মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড বটগাছ। সেই বটগাছের ওঁড়ির ভিতর একটি বৃহৎ গহ্বর আছে; সেই গহ্বরে একটি বাঘ দিবাভাগে বিশ্রাম করে, রাত্রে শিকারে বাহির হইয়া সেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লী সমূহে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং গৃহস্থের ছাগল, ভেড়া, বাছুর, কুকুর ধরিয়া লইয়া যায়। একটা বনের ভিতর শৃগালের অগণ্য অস্থি, কঙ্কাল! বাঘে এত শিয়াল মারিয়াছে যে, কিছুদিন হইতে গ্রামে শিয়ালের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না! প্রভাতে ও সায়ংকালে দলবদ্ধ শৃগালের যে ঐক্যতান সঙ্গীত শুনিতে হইয়াছে।

ভূতনাথ ভায়া রাজ পোষাক পরিয়া বন্দুক ঘাড়ে লইয়া সদলে বৃক্ষগহ্বরবাসী ব্যাঘ্রের সন্ধানে চলিলেন। তাঁহারা যখন বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন তখন প্রায় মধ্যাহ্ন কাল। যে গহ্বরে বাঘ ছিল, সেই গহ্বরেরই নীচের দিকে একটি অনতি বৃহৎ ছিদ্র ছিল; সেই ছিদ্র দিয়া ব্যাঘ্রে লাঙ্গুল দেখিতে পাওয়া গেল। 'খোঁড়লে' বাঘ আছে শুনিয়া চারিদিকের মাঠ হইতে অনেক রাখাল, কৃষাণ, চাষা কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া মজা দেখিতে আসিল। নিকটস্থ পল্লী-সমূহের অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই মুসলমান; তাহাদের অনেকেই লাঠী ও বংশখণ্ড লইয়া ব্যাঘ্র সম্বর্দ্ধনোপায় রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, "বাঘের 'ন্যাজ' দেখা যাচ্ছে, ঐ কোকর দিয়ে সুমুন্দীর জাল্‌টা টাঙ্গে বার করা গেলে বাঁধো; তা' হ'লে শালু খোঁড়লের মদ্দি আট্‌কা পড়্যা যাবে। তখন গাছে উঠ্যা ভাত কোপান্।"

শিকারী ভায়া ইহা সুযুক্তি মনে না করিয়া বলিলেন, 'আমি ওপাশের ঐ ডুমুর গাছে বন্দুক উঠিয়ে ব'সে থাকি, তোমরা ধোঁয়া কর। বোধ হয় চোকে বাঘ বাপ্ বাপ্ ক'রে, হাঁড়োল থেকে, পালাবার পথ পাবে না। বেরিয়ে যেমন নীচে নামবে, আর আমি গুলি করবো। এক গুলিতেই কুপোকাৎ হবে।"

চাষারা তখন একরাশি অরহরের খড়ি লইয়া আসিল। অরহরের গাছ ছয় সাত হাত বা ততোধিক দীর্ঘ; চাষারা তাহার অগ্রভাগে মশিনার কাটী বাঁধিয়া আগুন ধরাইল। মশিনার কাটীতে আগুন দিলে প্রচুর ধূম উত্থিত হয়। বাঘের 'হাঁড়োলে'র চতুর্দ্দিকে এরূপ ধোঁয়া উঠিতে লাগিল যে, ধূমে বৃক্ষকাণ্ডের বহু উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত অন্ধকার হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপও দুঃসহ হইয়া উঠিল। গুরাগারা ব্যাঘ্রের শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; সেই গুরার

এক পাশে একটি বৃহদাকার 'ফুকর' ছিল, বাঘ সেই ফুকর দিয়া বাহির হইয়া ভূতলে লম্ফ প্রদান করিল। সে ফাকা যায়গায় আসিবামাত্র শিকারী ভায়া পূর্ব্বোক্ত ডুমুর গাছ হইতে তাহাকে গুলি করিলেন। গুলি তাহার পশ্চাতের একটি উরু ভেদ করিল; কিন্তু সে পড়িল না, গম্ভীরস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া ছাঁচড়াইতে ছাঁচড়াইতে যথাসাধ্য দ্রুত চলিয়া দুরন্তী একটি অরণ্যে প্রবেশ করিল। ভূতনাথ তাহাকে দ্বিতীয় গুলি মারিবার সুযোগ পাইল না। দর্শকগণ বলিতে লাগিল, "পাকা শিকারী হ'লে ঐ এক গুলিতেই কুপোকাৎ ক'রে।"

দর্শকগণের উৎসাহ শিথিল হইল না, বাঘ যে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিল, বাঘ আধা-হামাগুড়ি দিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে! এক সাহসী মুসলমান যুবক বাঘের নিকটে গিয়া তাহার লম্বা লাঠির অগ্রভাগ বাঘের মুখে পুরিয়া দিল! এবার বাঘ মরিয়া হইয়া লাফাইয়া উঠিল, এবং লাঠী মুখ হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া ক্রখিয়া আসিল; ভয়ে দর্শকগণ দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। ইত্যবসরে আর একটি মুসলমান যুবক সেই ঝোপের আর এক পাশে দাঁড়াইয়া মুখ বাড়াইয়া মজা দেখিতেছিল; তাহার উপর বাঘের দৃষ্টি পড়িবামাত্র বাঘটা এক লম্ফে তাহার উপর নিপতিত হইল, এবং নখরাঘাতে তাহার মুখমণ্ডল ও স্কন্ধ দেশ ক্ষত বিক্ষত করিল। শোণিত-স্রোতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গেল।

'বাঘরে, মেরে ফেল্লেরে!' শব্দে সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার সাহায্যের জন্য অনেকেই তাহার কাছে দৌড়াইয়া আসিল, একজন সাহসী যুবক তাহার হাতের সুদীর্ঘ লাঠী বাঘের মুখের ভিতর গুঁজিয়া দিলে বাঘ তাহার শিকারকে আর বেশী ক্ষণ কবিবার সুযোগ না পাইয়া রণে ভঙ্গ দিল, এবং বিকট গর্জ্জনে সেই বনভূমি কম্পিত করিয়া অদূরবর্ত্তী আর একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। বাঘটা যখন পলায়ন করে তখনও তাহাকে একটু খোঁড়াইতে দেখা গিয়াছিল।

পদব্রজে আহত ব্যাঘ্রের নিকট গিয়া তাহাকে গুলি করা বিপজ্জনক মনে করিয়া শিকারী শিকার ছাড়িয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিলেন; গ্রামের অনেক লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নানা প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিল; তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, হাতী না থাকায় তিনি বাঘটাকে মারিয়া আনিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তার 'দাপ্‌নায় যে গুলি লাগিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয়ই সেখানে ক্ষত হইবে; শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইলে বাঘ হাড়, কাঠ, করিত প্রভৃতি দ্রব্য সেই ক্ষতস্থলে পুরিয়া দেয়, এ বাঘটাও তাহাই করিবে, ক্ষত ক্রমেই বড় হইবে, তাহার উপর মাটি বসিয়া পোকা পাড়িবে, শেষে সে বাবায় মরিয়া যাইবে।'

আহত মুসলমান যুবককে গাড়ীতে তুলিয়া গ্রামের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল; সেখানে তাহার চিকিৎসা চলিতেছে, সে এ যাত্রা বাঁচিতেও পারে; কিন্তু বাঘের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল না, বরং প্রতি রাত্রেই ব্যাঘ্রের গর্জ্জন চারিদিক হইতে শুনিতে পাইতেছি!

স্বপ্ন-মাতা

(শ্রীনরেন্দ্র দেব)

আচ্ছা নতুন দিদি,
গড়ো ক'রে দিলেন যদি বিধি
কোলে একটি ছেলে
ক'ন ক'রে বাছাকে ভাই ফেলে
একলাটি এই ঘরে
কের ওপর বিছানো এই ছেঁড়া কাঁথার পরে
ঘুরে বেড়াস্ এদিক সেদিক শুনি?
ধি যায় না ঘুমন্ত এই চাঁদকে বুকে নিয়ে
শম পশম তুলোর কাঠি রঙীন সুতো দিয়ে
খোকার জন্যে একটা কিছু বুনি?
অবাক আমি কাণ্ড তোদের দেখে!
কেমন ক'রে এমন ছেলে একলা ফেলে রেখে
অন্য কাজে পারিস্ যেতে চলে?
আমার খোকা হোলে
দেখিস্ আমি রাখ্‌বো তাকে
সদাই কোলে কোলে!
হয় হোক্ সে বোঁচা খাঁদা
কিম্বা কালো গোবদা হাঁদা
ছটফটা মাথাটা তার থাকুনা যতই মুখে—
তবু আমি তাকেই নিয়ে থাক্‌বো দেখিস্ সুখে!
তাই-তাই-তাই শেখাবো আর হাঁটি-হাটি-পা
চাঁদকে ডেকে বোল্‌বো ও চাঁদ টপ দিয়ে যা—
আমার কাছে শিখ্‌বে হাবা
মা-মা-তা-তা-দা-দা-বা-বা!
আধো আধো মিষ্টি বুলি বুলবুলি সে বল্‌বে কত
ময়না শালিক টিয়ের মতো!
পাড়াপড়শী হয়তো দিদি বল্‌বে এ সব পাগ্‌লামী—
তবু কিন্তু একটা দেখিস্ আমি
তার সঙ্গে হেসে হেসে তার ভাষাতেই কথা কবো!

তাই বলে কি ছেলের আমি
কেবল মা'টি হ'য়েই রবো?
সাঁঝ সকালে দুপুর বেলা
খোকার ছোট্ট বোনের মতো
তার সঙ্গে ক'র্‌বো খেলা,
আমি খোকার বন্ধু হবো,
আমি হবো খোকার সাথী
করবো কত ছুটোপাটি
ঝগড়া ঝাঁটি
মাতামাতি!
খোকার একটু অসুখ হ'লে সব কিছু কাজ রেখে
নড়বনা তার মাথার শিয়র থেকে;
দিবারাত্রি থাকবো কাছে কাছে
ডেকে যদি না পায় বাছা! কষ্ট কিছু
হয় যদি ভাই পাছে!
রোগা ছেলে মা ছাড়া কি থাকে?
নিজের হাতে নাইয়ে দেবো তাকে
খাইয়ে দেবো নিজে,
তার জন্যে কোমর বেঁধে রাঁধ বো দেখিস্ কত কীযে!
বুকের ওপর আঁকড়ে দেবো
চাঁদমুখে তার হাজার চুমো
শুইয়ে তাকে পাশটিতে মোর
বোল্‌বো যাদু ঘুমো-ঘুমো!
আমার ছেলে এমনি ক'রে
মানুষ কর্‌বো হাতে ধ'রে
গড়্‌বো তাকে নিজের মনের মতো;—
টিনের বাঁশী টিনের পুতুল আন্‌বো কিনে
খেল্‌না আছে যতো,
কাঠের ঘোড়া চড়্‌বে খোকা
হাট্ হাট্ হাট্ হাঁকবে বোকা

ঘুম যাবেনা কিছুতে সে না পেলে তার পুতুল বাঁশী
হার মান্‌বে বারে বারেই ঘুম পাড়ানী পিসী মাসি!
দুধ খেতে সে করবে লড়াই,
যা কিছু তার বাড়বে ছাই
ঝিনুকখানি দিতে গেলেই মুখে;
অথচ রোজ স্নানের জলে নির্ব্বিকারে
চুমুক দেবে সুখে!
নিত্যি তাকে সাজিয়ে দিয়ে
বেড়াই যদি কোলে নিয়ে
তিন মিনিটের বেশী তবু থাক্‌বে না সে পরিষ্কার;
শৈশবে যে সব শিশুদের ধুলো কাদাই অলঙ্কার!
আমার মণি আমার মাণিক
চখের আড়াল হ'লে খানিক—
উৎকণ্ঠায় আকুল হ'য়ে উঠ্‌বে দেহ মন;
কেন কেন—কান্না কেন—এই যে যাদু,
এই যে আমি ধন!
যাট্ যাট্ যট্! বাছা আমার!
আহা দিদি তুই কি চামার?

দেখ্, দিখিনি ক্ষিধেয় বাছার পেটের ভেতর
সেঁধিয়ে আছে পেট!
তোর জন্যেই ধোলো আমার খোকার কাছে
মাথাট আজ হেঁট!
কি জানে বল্ কচি ছেলে
ক্ষিধের সময় দুধ না পেলে
রাগ তো এমন সবার হ'য়েই থাকে!
এরা কি আর খাতির কারুর রাখে?
মায়ের মেহ্ মনে ক'রে চক্‌চকিয়ে টান্‌লে বাছা কত
গলাটুকু ভিজিয়ে নেবার মতো
দু'ট বোঁটায় একটি ফোঁটাও পায়নি যাদু মোর,
তাইত' হঠাৎ ভাত্‌ল ঘুমের ঘোর;
ছোট্ট ক্ষুধে দুধে দাঁতের এমনি কামড়
বসিয়ে দিলে বুকে—
তাতে কিন্তু ব্যথার চেয়ে সুখে
হায় আমার উদ্বেলিত আজ!
শুধু একটা অপূর্ণতার লাজ
কাঁটার মতো বিঁধ্‌ছে আমায় দিদি!
বল্‌না কবে আমার কোলেও আস্‌বে এমন
বুক জুড়ানো-নিধি!

নূতন গান

(শ্রীদীনেন্দ্রনাথ বসু এম, এ,)

১

বাসনার ক্লান্তি

কোন প্রবল প্রতাপান্বিত পারস্য সম্রাট স্বীয় পত্নীর কলুষিত চরিত্র দর্শন করিয়া ক্রমে সমগ্র নারীজাতির প্রতি বিশ্বাস হারাণ। ফলে অতি নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করিয়া পত্নীত্বের পবিত্রতা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন। প্রতি সন্ধ্যায় একটী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিতেন, এবং তাহার সহিত রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে তাহাকে মশানে বলি দিতেন। 'আরব্য রজনী' নামক গ্রন্থে আছে যে সম্রাটের উজির কন্যা সম্রাটের পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়া পর পর সহস্র রজনী সম্রাটকে মনমুগ্ধকর উপন্যাস শুনাইয়া তাঁহাকে এই নিষ্ঠুরতার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি সেই উজির কন্যার ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিতা শিক্ষিতা রমণী নিজের জীবনকে নিদারুণ বিপদাপন্ন করিয়া এই ভাবে সম্রাটকে এবং সমগ্র নারী জাতিকে উদ্ধার না করিতেন,—তাহা হইলে কি হইত?

এই প্রশ্নটী কেন মনে উঠিয়াছিল বলিতে পারি না। অবশ্য মনে অনেক 'কেন' উঠিয়া থাকে, এবং অধিকাংশ সময়েই না পাওয়া যায় তাহার মানে, না পাওয়া যায় তাহার সমাধান। যাহা হউক কথাটা ভাবিতে ভাবিতে কোথায় কতদূর চলিয়া গিয়াছিলাম বলিতে পারি না। মনে হয় যেন প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হইয়া, কত পাহাড় পর্ব্বত পিছনে ফেলিয়া, কত নদ নদী সাগর পার হইয়া, এক বিশাল নগরীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে দেখিলাম প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সংখ্যা নাই, কিন্তু সমস্তই যেন বিষাদ-মলিন। নগরীর প্রমদোদ্যানগুলি জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘিগুলি শেওলায় পুরিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের কৃত্রিমগুলি আর পুষ্পভারে লতাগ্র প্রেমিকার ন্যায় নয়নকোনে হাসি ঢালিয়া দেয় না। আগাছা, ঝোপ, জঙ্গল, কাঁটাগাছে সকল স্থান পুরিয়া গিয়া বিষধর সর্পের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। রাস্তার ধারে ধারে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। প্রথমে ভাবিলাম, এ নগর কি জনশূন্য? প্রাচীন রূপকথার ন্যায় কোন ভীষণ নরভুক রাক্ষস আসিয়া কি এখানকার সমস্ত মানুষ খাইয়া ফেলিয়া তৃপ্ত রসনা লইয়া কোন আগন্তুকের জন্য বসিয়া আছে? প্রথমে শিহরিয়া উঠিলাম। কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না। ঐ যে রাস্তার ধারে মানুষ দেখা যাইতেছে; কিন্তু মুখ দেখিলে মনে হয়, কি একটা দারুণ অন্তর্দাহে তাহাদের ভিতর পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। মুখে অসীম হতাশার ভাব, মাঝে মাঝে কত দীর্ঘশ্বাস, কি করুণ চাহনি!

এতবড় নগরীর এ দুর্দ্দশা কেন? এখানে কি কোন ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে, অথবা দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে? কোন বিদেশী শত্রুর হাতে কি এ নগরী পরাজিত, বিধ্বস্ত? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করি। কাহাকেও ত চিনি না। দেখিলাম অনেকেই বড় রাস্তা ধরিয়া উত্তর দিকে চলিয়াছে। আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। অনেক দূর চলিয়া সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড উদ্যান দেখিতে পাইলাম। উদ্যানে নানা জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, কিন্তু সেগুলির উপর মনুষ্য-হস্তের যত্নের চিহ্ন কিছুই দেখিতে পাইলাম না, মাঝখানে একটী বিশাল সরোবর, কিন্তু জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কতকগুলি লোক লাগাইয়া সংস্কার করা হইতেছে। যাহারা কাজ করিতেছে, তাহারা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়, অতিশয় বিষণ্ণমুখে, নিতান্ত বাধ্য হইয়া কাজ করিতেছে। সম্মুখে বিশাল অট্টালিকা। তাহার বিপুল স্তম্ভ গুলি গ্রীক শৈলীর স্থপতি বিদ্যার পরিচায়ক। সহস্র সোপান শ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া থাকে থাকে মৃন্ময় পাত্রে কত সবুজ বৃক্ষের শুষ্ক মূল। বুঝিলাম এইটী রাজ প্রাসাদ। জনসঙ্ঘের সহিত প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম। এই বিশাল বিপুল পুরীতেও রাজসভার সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। কারুকার্য্য খচিত রত্নবেদীতে বহুমূল্য পোষাক পরিহিত পারিষদের অভাব নাই। দেওয়ালে দেওয়ালে বিচিত্র বর্ণের চিত্ররাজিতে নয়ন ঝলসিয়া যায়। মাথার উপরে অসংখ্য ঝাড়লণ্ঠনের বিচিত্র বাহার। স্বর্ণসোপানাবলীর উপরে স্বর্ণ-সিংহাসনে সম্রাট উপবিষ্ট। চারিধারে স্বর্ণ-ছত্র হইতে স্বর্ণ-ঝালর ঝুলিতেছে। স্বর্ণ-চামর হইতে গোলাপগন্ধ বিচ্ছুরিত হইতেছে। আমি অবাক হইয়া বিশাল কক্ষের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলাম।

প্রথম কথা বলিলেন রাজমন্ত্রী—মহারাজ, যুবতী রমণী আর পাওয়া যায় না। রাজদূত আজ প্রাতে এসে নিবেদন করেছে, জগতের সর্ব্বত্র লোকে অল্প বয়সেই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। নিতান্ত তিন চার বৎসরের শিশু ভিন্ন আর সমস্ত রমণীই আজ বিবাহিত। এ অবস্থায় সম্রাটের আদেশের জন্য এ দাস অবনত মস্তকে উপস্থিত।

সম্রাট।—মন্ত্রীবর, এরূপ নৃশংস অভিনয়ের আর প্রয়োজন নাই। আগুনে ইন্ধন যোগালে আগুন

নেবে না, বেড়েই যায়। জনয়ের প্রবৃত্তিতে আর নুশংসতার ইন্ধন দিয়ে এ ধ্বংস লীলায় আমার ইচ্ছা নাই।

সকলে।—জয় সম্রাটের জয়।

মন্ত্রী।—সম্রাটের এ আদেশে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হবে। উৎসবে উৎসবে দেশের সর্ব্বত্র পূর্ণ হয়ে যাবে। এখন সম্রাটের উপস্থিত আদেশ—

সম্রাট।—মন্ত্রীবর, নগরে উৎসব আয়োজন করুন। তবে আমরা প্রাচীন ত্যাগ করে কিছু নূতনত্ব উপভোগ করতে চাই। বহুদিন অবধি নিষ্ঠুর নির্ম্মমতার দ্বারা লালসা পরিতৃপ্ত করেছি। এবার দেখতে চাই শান্তির সৌন্দর্য্যে কি বিশিষ্টতা আছে, কি তৃপ্তি আছে!

মন্ত্রী।—সম্রাটের যেরূপ আদেশ।

সম্রাট।—মন্ত্রীবর, এখনও আদেশ কিছু হয় নি। আমরা একবার সঙ্গীতে কি নূতনত্ব আছে তাই উপভোগ করব। যে সে গান নয়, ক্রমাগত আমাদের নূতন গান শোনাতে হবে। আমরা শুনতে চাই সেই গান যা পৃথিবীতে আজও কেউ শোনে নাই।

মন্ত্রী।—সম্রাটের অভিরুচি অনুযায়ী আদেশ পালনে সম্রাটের এ দাসানুদাস নত মস্তকে চির-কালই প্রস্তুত।

সম্রাট।—কিন্তু মন্ত্রীবর, আমাদের এ অভিন-বাসনার পরিমাণ উপলব্ধি হয়েছে কি? জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদদের সংবাদ পাঠান। সত্বর এ পুরীতে উপস্থিত হয়ে অবিশ্রান্ত নূতন গানে আমাদিগকে মোহিত করতে হবে।

মন্ত্রী।—সম্রাটের বাসনার পরিমাণ উপলব্ধি করবার জন্য এ অধীনের প্রয়োজন নাই। সম্রাটের আদেশ যথাযথ পালিত হবে।

তারপর সেদিনের মত সভাভঙ্গ হইল। নগরীর রাজপথে পুনরায় বহির্গত হইয়া দেখিলাম সেই হিরণপুরীর সমস্ত আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবার মানুষের মুখে বর্ষাস্নাত রবিকরের ন্যায় প্রফুল্ল হাসি দেখিয়া অন্তঃকরণের সংকোচভাব তিরোহিত হইল। নৃত্য গীত, বাদ্যি বাজানার তুমুল উৎসবে আনন্দে সমস্ত দিন কাটাইয়া সন্ধ্যায় নগরীকে আলোকমালার বিপুল সজ্জা দেখিলাম। পরদিন বড় বড় ওস্তাদের গান শুনিবার আশায় এক সরাইতে রাত্রি যাপন করিলাম।

(২)

বাসনায় জলসেক

মন্ত্রী।—মহারাজ, জগতের সমস্ত দেশ থেকে প্রধান প্রধান ওস্তাদগণ সমাগত। সকলেই সম্রাটের আদেশের অপেক্ষায় রাজ সভায় সমাসীন।

সম্রাট। মন্ত্রীবর, ওস্তাদগণকে আমাদের আদেশ জানান, যে, মানব কল্যাণকর, মানব মন প্রফুল্লকর, এবং কার্য্যে উৎসাহদায়ক সঙ্গীত আমরা শুনব।

প্রথম ওস্তাদ। বিরাট্ বিপুল বিশ্ব কবে কোথায় কি ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা আমি জানি না। বিশ্বস্রষ্টার কোনদিনও সন্ধান পাই নাই। জ্ঞানেরই প্রসার নিত্য সন্দেহের জ্বালা বৃদ্ধি করে। সৃষ্ট হউক আর স্বয়ং উদ্ভূতই হউক, বিশ্ব রহস্যময়। এ তত্ত্ব কখনও উপলব্ধি না হইতে পারে, কিন্তু চঞ্চল চিত্তের তন্ময়তায় প্রকৃত শান্তির আবাদ মিলে। চিত্ত চাঞ্চল্য নিরোধ মানবের চরম কল্যাণকর।

সম্রাট। ওস্তাদ, তোমার সঙ্গীত সুরতানলয় মনোমুগ্ধকর। বহু পরস্পর বিসম্বাদী দর্শনের সমন্বয় সাধন করে তুমি বিশ্ব পূজার কল্পনা করেছ। বৈদিক বিরাট্ প্রকৃতির কল্পনার সম্মুখে তোমার এ সঙ্গীত নূতন নয়। ধর্ম্ম চির পুরাতন, তাতে আক্ষেপ। ওস্তাদ, জগতের বহুপরিবর্ত্তনের ভিতর ধর্ম্মের কোন নূতন পরিচ্ছদ দেখা যায় নাই। মন্ত্রীবর, ওস্তাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন। আর ওস্তাদের সঙ্গীতের আয়োজন করুন।

দ্বিতীয় ওস্তাদ। সত্য প্রেম আমার সমস্ত মা

পরমাণু হইতে উদ্ভূত হইয়া যেখানে জীবন সেইখানেই আনন্দের আগার সৃজন করে। পরিত্যক্ত বিষ্ঠা-বৎ আমার শরীরজ ক্লেদ হইতে ঈর্ষা ঘৃণা উৎপন্ন হইয়া এক পরম বিষাক্ত বহ্নির উৎপাদন করে। তাহা সত্য প্রেমের সংহারের জন্য নিত্য সংগ্রামশীল। এস, আমরা বিশ্বের সমস্ত সত্যপ্রেম একত্র করে বিরাট্ দুর্গ প্রাকার রচনা করি, এবং জগতের সমস্ত ঈর্ষাবহ্নি নির্ব্বাপিত করে সর্ব্বত্র আনন্দময় শান্তিবারি বর্ষণ করি।

সম্রাট। প্রেম ও ঈর্ষা উভয়ই উভয়ের অস্তিত্বের কারণ। একের উচ্ছেদে অন্যটির জীবন অসম্ভব। ওস্তাদ, আজ সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান বিস্তারের পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নব পর্য্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

তৃতীয় ওস্তাদ। সকল মানবের প্রাণের একই গতি। আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও ঈর্ষা নিত্য আন্দিনে আবদ্ধ, একমুখী স্রোতে চির প্রবহমান। তবে কোথায় কোন্ সুরে কোন্ বিরাট্ বাঁশরী বেজে ওঠে, আমার সারা মন প্রাণ সেই সুরের তানে তালে তালে নীরব হয়ে ভেসে চলে যায়। প্রাণের সমস্ত প্রলয় বহ্নি শীতল সঙ্গীতের স্পর্শে তরল শান্ত শান্তি ধারায় বয়ে যায়। আমার পরম বিমুগ্ধ গতি, আমার সকল চাঞ্চল্যের অবসান, আমি সেখানে তৃপ্তি অতৃপ্তি কিছুই আর খোঁজ পাই না। সন্ধ্যার অলক্তক রাগরশ্মি যেন স্তব্ধ, বিশ্বের গতি থেমে গেছে। সন্ধ্যারাগে আর অবসাদের সূচনা নাই। বুঝি সুরের মোহিনী আকর্ষণে দিনকর পশ্চিম দিক থেকেই উঠে আসছেন। সন্ধ্যায় প্রভাবের আনন্দ হিল্লোল বহিছে। বৃক্ষপত্র, শ্যামল দূর্ব্বাদল, শিশির স্নিগ্ধ, না আকুল প্রেম ধারায় স্নাত হয়েছে। কিছুই বুঝি না—কিন্তু এটা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই সকলে সেই সুরের পানে ছুটে চলেছে।

সম্রাট। বৈষ্ণব কবিগণের অমূল্য প্রেম গাঁথার পরে আর প্রেমগান জমে না? ওস্তাদ, প্রেম বোধ হয় আজ বৃদ্ধ। প্রেমে বালিকার স্নিগ্ধ অকপট চাঞ্চল্য আর নাই। যৌবনের সজাজ চাহনিতে আবরণের বৃথা প্রয়াস, অথচ দ্বিধা বিমোহনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তাও বুঝি আর নাই। এখন যেন প্রৌঢ়ার কৃত্রিম হাসির অন্তরালে শুষ্ক বালির চড়া। আর কে কি নূতন গান শোনাবে?

মন্ত্রী। মহারাজ, পাশ্চাত্য দেশ থেকে কয়েক-জন ওস্তাদ সম্প্রতি আগমন করেছেন।

সম্রাট। মন্ত্রীবর, তাঁহাদের সসম্মানে উপস্থিত করুন।

চতুর্থ ওস্তাদ। জ্ঞানের অজ্ঞাত বহু বিষয় আছে, এ কথা বিশ্বাস করি। কিন্তু প্রত্যক্ষের অতীত সুখের আশায়, মানুষকে প্রত্যক্ষ দুঃখে নিত্য মগ্ন করে রাখা জ্ঞান বৃদ্ধির সম্যক অবমাননা ভিন্ন আর কিছুই নয়। জগতে প্রকৃত পক্ষে কেহই পরজন্মের দুঃখের আশায় ইহজন্মে শুধু দুঃখ সার করে না। আমি যাহাতে সুখী হই অন্যেও তাহাতে সুখী হয়। আমি যাহা চাই অন্যকে কেন তা থেকে বঞ্চিত করি! জগতে বেঁচে থাকবার অধিকার সকলেরই আছে। পার্থিব ধর্ম্ম, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের যে অত্যাচার, তার নিরাকরণ। সাম্যনীতি জগৎকে শান্তির মাধুর্য্যে উৎফুল্ল করিবে।

সম্রাট। সাম্যের বীভৎস মূর্ত্তি ফরাসী দেশে দেখা দিয়েছিল। অবশ্য সাম্যনীতি তার পূর্ব্বেই জগতে গীত হয়েছে। সাম্যের আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্তঃকরণে আছে সত্য, কিন্তু সর্ব্বত্র সাম্যের সম্যক অভিব্যক্তি অসম্ভব। বিশ্বের গতি বৈষম্যেরদিকে। সেই গতি চিরতরে থেমে না গেলে সম্পূর্ণ সাম্য কেমন করে হবে, ওস্তাদ? আর তা যেদিন হবে, সেদিন ত বিশ্বের অস্তিত্বই থাকবে না, সেদিন আর কারও কোন কার্য্য থাকবে না।

পঞ্চম ওস্তাদ। বৈষম্য সৃজনের শক্তিতে যে ঈর্ষার উৎপত্তি তাহাও জগতের উপকার করিতে পারে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতার বহ্নিতে আমরা ব্যক্তিগত ঈর্ষাকে আহুতি দেব। দেশে

দেশে মানুষে মানুষে শান্তি প্রীতি ফুটে উঠবে। প্রতিযোগীতার বহ্নিতে উর্ধ্বা উচ্ছল আভায় মণ্ডিত হয়ে জাতীয় গৌরবের সৃষ্টি করবে। তাতে মানুষের অসীম কার্য্যকরী শক্তি উৎপন্ন হবে। আমরা বৈষম্য-সাম্য উভয়কে একই ভাবে একই সময়ে শান্তির সংস্থাপক করে তুল্‌বো।

সম্রাট। এ গানেও নূতনত্ব কিছুই নাই। এমনি করেই প্রাচীন কালে আর্য্যজাতি, এবং তৎসম্ভূত অনেক জাতি অন্য জাতিকে আক্রমণ করে, বিধ্বস্ত করে, জাতীয় গৌরব অনুভব করতো! তারপর অনেকদিন চলে গিয়েছে। এখন এক একটী জাতি এক একটী দেশ ত্যাগ করে ভিন্ন দেশে গিয়ে আর বসবাস আরম্ভ করে না। বহু বিবর্ত্তন বিপ্লবের পর আজ ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের ভিতর যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তিটা সাধারণ অবস্থা স্বরূপে গণ্য হয় না। প্রাচীন কালের বিজাতীয় বিদ্বেষের একটা সুবিধা ছিল। এক জাতির লোক অন্য জাতির লোকের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না। যাতায়াতের সুবিধা না থাকায় যাওয়া আসাও বড় ঘটে উঠ্‌তো না। আজ বিজ্ঞানের বহু উন্নতির ফলে জগতের সকল দেশের লোকই সকল দেশে অতি অল্প সময়ের ভিতর যাতায়াত কর্‌ছে। যতদূর দেখা যাচ্ছে এরূপ যাতায়াতের সুবিধা ও সময় সংক্ষেপ আরও আশ্চর্য্যরূপে বেড়ে যাবে। তখন বিজাতীয় বিদ্বেষ থাকলে মানুষে আর কিছুতেই শান্তি পাবে না। ওস্তাদ, ভবিষ্যৎ জগতে সমস্ত মানব সমাজে মাত্র একটী জাতি থাকবে বলে মনে হয়। তখন ত এ গানের আর কোনই অর্থ থাকবে না।

ষষ্ঠ ওস্তাদ। মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষ। তার হিংস্র প্রবৃত্তি বিনা কারণে জেগে ওঠে না। সে প্রবৃত্তির প্রধান কারণ অভাব। মানুষের জ্ঞানের উপর অভাববোধ নির্ভর করে। তাই সকলের সমান অবস্থা না করলে মানুষের অভাববোধ দূর হবে না। মাঠের ফসল, ঘাটের জল সকলে সমান ভাবে উপভোগ করুক। সুন্দর বিলাসভবন রচনা করে আরাম শয্যায় সকল সমান সুখে শয়ন করুন। না হয় সকলে সমানরূপ দুঃখভোগ করে জীবন চালাক। পার্থক্যহীন জগতে মানুষের মনে একই ধারা প্রবাহিত হবে। সকলে সমান পরিশ্রম করে, সমান ফল উৎপন্ন করে, সমান ভাবে ভোগ করবে।

সম্রাট।—বর্ত্তমান সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) আর বলশেভিজম বা ধ্বংসবাদ কোন না কোন ভাবে জগতে বহুকাল থেকেই প্রচলিত আছে। ধরুন যদি সকলেই সমান ভাগ পেয়ে থাকে তা হ'লে কি মানুষের পরিশ্রম করবার প্রবৃত্তি আর থাকবে? যদি ঈশ্বর বস্তু জগতে কিছুই না থাকে, তা হ'লে ঐক্য মমতা কি কোথাও প্রকৃতভাবে হৃদয়ে স্থান পাবে? মানুষের অন্তঃস্থলে যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিত্য জাগরূক তার তৃপ্তি সাধন না কর্‌তে পেলে, মানুষ কি কোন কাজ করবে?—জগৎ কি শুধু মাত্র কতকগুলি অলস জড়পিণ্ডের বাসভূমিতে পরিণত হবে না? জোর করে কতকটা এমনি ব্যবস্থা করতে গিয়েই কি ভারতবর্ষের পতন হয় নি?—ওস্তাদ, সর্ব্ব মানব সমাজে সাম্য অমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে না।

সপ্তম ওস্তাদ।—মানুষ তার হিংস্র প্রবৃত্তিকে সমাজের বাহিরে, দমন করে সমাজবদ্ধ হ'বে। সে জগৎকে বশে এনে মানুষ তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকে স্বীয় দাসত্বে নিযুক্ত করে মানুষ তার প্রভুত্বের বাসনা পরিতৃপ্ত করবে। মানুষ তখন অভাবকেও করায়ত্ত করবে। তখন তার অভাবও থাকবে না আর জড়পিণ্ডেরও সে পরিণত হবে না। মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতায় মানুষের হিংস্র প্রবৃত্তি বা বিদ্বেষ ভাবকে চরিতার্থ করিবার কোন আবশ্যক থাকবে না। তখন সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করবে।

সম্রাট।—প্রকৃতিকে পরাভব করবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের নূতন নয়। বোধ হয় জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত

আদিমযুগ হইতেই মানুষের মন প্রকৃতির অন্তঃস্থল ভেদ করে তার শক্তির পরিচয় পেয়ে তার পূজা আরম্ভ করে দিয়েছিল। তারপর সভ্যতারসে শক্তির বৃদ্ধির সহিত যতই পরিচয় পেতে থাক্‌লো ততই সে বুঝ্‌তে পার্‌ল ঐ শক্তিগুলাকে বশে আন্‌তে না পার্‌লে জীবনে সুখ পাওয়া যাবে না। তার পর মানুষ বুদ্ধিবলে স্থির করলে শুধু প্রকৃতি আর ইতর জীবগুলির উপর প্রভুত্ব করতে পেলেই মানুষ সুখী হতে পারে না।—জড়ও চৈতন্যের ভিতর প্রতিযোগীতা থাকতে পারে না। প্রতিযোগীতা ত সমকক্ষের কাছে। সে প্রবৃত্তি থাকবেই আর মানুষে মানুষে বিবাদ বিসম্বাদও থাকবে। ওস্তাদ, নূতন গান সম্ভব নয়। পুরাতনে নূতন রং লাগিয়ে তাহার দিয়ে সাধারণ লোককে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়। তৃপ্তি তাতে বড় বেশী হয় না।

সম্রাট, ওস্তাদগণকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করবার আদেশ জ্ঞাপন করুন। লোকে বলে জগতে বাসনার শেষ নাই। কিন্তু বাসনা না কি প্রকৃত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আমাদের সে জ্ঞান কতটুকু। বাসনারই বা শেষ নাই কেন? এ 'কেন' সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্তও ত পেলাম না।

• • • • •

নগরীর এক উদ্যান মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পার্শ্বে তারকাখচিত নীল আকাশ তলে শুইয়া শুইয়া গানের বিষয়গুলি মনে মনে আলোচনা করিতে ছিলাম। দূরে উৎসব আমোদের মধুর গীত ধ্বনি শুনা যাইতেছিল, বৃক্ষ পত্র মর্ম্মরিত হইয়া তালে তালে শীতল সমীর বহিয়া যাইতেছিল। নিদ্রার কোমল কোল হইতে যখন পাখীর কলরবে জাগিয়া উঠিলাম, তখন চাহিয়া দেখি জানালা দিয়া প্রভাতের প্রথম রবিকর ঝিক মিক করিতেছে। বিছানার উপর সেদিনকার সংবাদ পত্রখানি কে রাখিয়া গিয়াছে। তাহার প্রথম পৃষ্ঠার বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "ভারতে বলশেভিক মত প্রচার।"

মাসিক পত্রে

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ)

১

কোথাও পাবে রবির আলোর ঝরণা
সোণার টানায় সোহাগ সুতার ভর্ণী।
কোথাও শরৎ আকাশ করি লাল্‌চে
যেথায় সেথায় মুক্তা মাণিক ঢালছে।
প্রভাত কোথাও খুলছে সিঁদুর কৌটা
অাকাশ গাঙ্গে লাগছে জালের ঢেউটা।
জলধরের সুধার ধারা বৃষ্টি
সাঁজের নভে, রামধনুকের সৃষ্টি
'নরেন' 'চারু'র 'রককেলারের' বিস্ত
না দেখ তো বঞ্চিতোহসি মিত্র।

২

কর্ণ দীনেশ, কুবের হ'য়ে ধন্য,
রত্ন তাহার গোলাম খানার পণ্য ;
ইতিহাসের মিনার গাঁথে অক্ষয়,
তাহা দেখে কতই লোকের সখ হয়।
গন্ধ ছেড়ে যোগীন লেখেন কাব্য
শক্তি তাঁহার কোন কাঠাতে মাপ্‌বো।
চিত্রে ফুটায় চিত্তে অরবিন্দ
তুলির রাঙ্গা ভাবুক অবনীন্দ্র।
নন্দ অসিত হেম ভবানীর চিত্র
না দেখ তো বঞ্চিতোহসি মিত্র।

৩

পর্ণপুটে করো পীযূষ পান গো,
করো ললিত ফোয়ারাতে স্নান গো।
কালিদাসের কাঁচ বেণুর গানটী
ঝরা ফুল ও নাগ কেশরের ঘ্রাণটী।
পরিমলের উৎসব ও আনন্দ,
অরি বীণার নৃত্যদোদুল ছন্দ ;
ফুলের ফসল ! মালিক হারা খেতটী—
কুহ ককোর নীরবতার ছেদটী,
দেখ্‌বে তুমি সজল হ'বে চিত্ত
না দেখ তো বঞ্চিতোহসি মিত্র।

৪

গভীর বাণী শুনান রামানন্দ
পাঁচকড়ি ও সব্যসাচি অন্ধ,
বাস ভূমিতে প্রবাসী ওই কাঁদছে
বিশ্বখানা বুকের কাছে টানছে।
এক হল আজ সারা ভারতবর্ষ,
বসুমতীর আর ধরে না হর্ষ।
'বঙ্গ বাণী' 'ভারতী' আজ বিশ্বের ;
নয়কো পূজা নয় কো রে আর নিঃস্বের।
একই শরৎ 'রমরমা'রি ইন্দু,
আজ দেখো ভাই হিন্দু ও অহিন্দু।

স্রোতের কুটো

(গল্প)

(শ্রীআশুতোষ সান্যাল)

নিমাই মুখুজ্জের সঙ্গে যাদবপুরের কোন রক্তের সম্বন্ধ না থাকলেও, ভগবান তাকে গ্রামখানার প্রত্যেক সুখ দুঃখের সঙ্গে এমনি করে জড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে—সহস্র ঝড় ঝাপ্টা মাথায় করেও সে এই গ্রামের মাটি কাঁমড়ে পড়ে ছিল। কথায় বলে, যার বরাতে যেখানকার জল বাতাস যতদিন থাকে, তাকে তা ভোগ করতেই—হবে। তাই দূরে পূর্ব্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করেও, নিমায়ের অদৃষ্টের গন্ধ তাকে জন্মভূমি, আত্মীয় স্বজনের বন্ধন ছিন্ন করে এনে, এই ক্ষুদ্র গ্রামখানার মায়ার ডোরে আষ্টে পৃষ্ট বেঁধে দিয়েছিলেন।

দশ বছর বয়সে বাপ মা হারিয়ে, বালক নিমাই যখন এতটুকু স্নেহের অন্বেষণে চারদিক হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, তখন দূর সম্পর্কীয় অপুত্রক দিদি তাকে বুকে করে এখানে এনেছিলেন। ভগ্নীপতি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এই নূতন জীবটির আগমনে সন্তুষ্ট না হলেও, স্ত্রীর খাতিরে তাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ক্রমে এই অনাথ বালকটির উপর আকৃষ্ট হয়ে তাঁকেই তার লালনপালনের ষোল আনা ভার নিতে হয়েছিল।

কথায় বলে, 'যার ব্যাথা তার সাড়া নেই—পাড়া পড়সীর 'আহা মরি'। নিমাইকে আনায় দুর্গাদাসের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হোক না হোক, গ্রামের লোকের চোখ টাটিয়ে উঠ্‌ল। তারা সুমুখে না বল্‌লেও, পেছনে ছাই করতে ছাড়ল না যে—ওমুক পুষ্যি পুত্তুর এনেছে, বিষয় হতে জ্ঞাতি গুষ্টিদের ফাঁকি দিতে। কিন্তু তাদের প্রাসাদ—মিথ্যা অপবাদ চিরদিনই ভিত্তিহীন, কাজেই দুর্গাদাস যখন গ্রামবাসীদের কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, তখন নিমাই বেশ রীতিমত ভাবে দুর্গাদাসের খাড়ী কাম্লো হয়ে বসল—মৌরসী নিয়ে।

দুর্গাদাস এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে গ্রামের লোক কিছুতেই না পেরে উঠে, তারা নিমাইকে নিয়ে পড়ল। নানাবিধ লাঞ্ছনা গঞ্জনা—তাকে উত্যক্ত করতে লাগল। কিন্তু অবশেষে নিমায়ের কাছেও তাদের পরাজিত হতে হল।

সে বার গোয়ালা পাড়ী আগুন লাগলে, তারা আপনাপন প্রাণ বাঁচাতে যখন ছোট ছেলেটাকে ঘরের ভেতর ফেলে এসে বাড়ীর ও পাড়ার লোক বাইরে দাঁড়িয়ে নিষ্ফল হাহাকার করতে লাগল, তখন গ্রামের চক্ষুশূল নিমাই তাদের সুমুখ দিয়ে বুক ফুলিয়ে সেই জ্বলন্ত ঘরের ভেতর থেকে তাকে বের করে আনল। আরও একদিন মিত্তিরদের মেয়েটাকে জলে ডুবে মরার হাত থেকে সেই বাঁচিয়ে দিয়ে এসে গ্রামবাসীদের তাক্ লাগিয়ে দিল। গ্রামবাসীরা নিমাইয়ের অদ্ভুত সাহস ও আত্ম-নির্ভরতা দেখে ক্রমেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, এর পর হতে নিশ্চিন্ত মনে নিমাইয়ের ঘাড়ে ভাল মন্দ সকল কাজই ধীরে ধীরে চাপিয়ে দিতে লাগল। সেও এমন নিপুণ হস্তে, হাসিমুখে সকল কাজ করে যেত, যে গ্রামবাসীর হিংসার ধোঁয়া ক্রমেই ফরসা হয়ে গেল, অতি আপনার জনের মত তারা

নিমাইকে তাদের সুখদুঃখের সাথী করে নিল।

পড়া শোনায় অনিচ্ছা না থাকলেও, মা সরস্বতী তাকে বিশেষ কৃপা করলেন না। দশের কাজ করে যেটুকু সময় সে পেত, তাতে ইস্কুলের পড়া মুখস্ত করা, এবং ইস্কুলে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া তার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠ্‌ত, কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে অল্প বয়সেই বিদ্যালয়ের নিকট বিদায় নিতে হয়।

(২)

গ্রামের এত লোক থাকতে, ভাগ্যবিধাতা হঠাৎ একদিন নিমাইএর ভাগ্যের ঘরে হুকুম জারি করে, সংসারের একমাত্র অবলম্বন তার দিদিটিকে ইহ সংসার হতে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। নিমাই চারি দিক অন্ধকার দেখল। দিদিকে হারিয়ে নিমাই বড়ই মনমরা হয়ে পড়ল; কিন্তু থাকে গ্রামের লোকের অষ্ট প্রহর আবদ্ধক, তার চুপ করে বসে থাকা চলে না। দিন কতক শোকের তাড়নায় সে ভ্রিয়মাণ থেকে, আবার বুকের বল ফিরিয়ে আনল, দশের মুখ চেয়ে সে মনকে বোঝাল —চিরদিন মানুষ বেঁচে থাকে না।

কিন্তু এই একটা মানুষের অভাবেই জীবনে একটা বিপর্য্যয় ঘটে গেল, প্রথমে সেটা সে না বুঝলেও, পরে সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারল। পত্নী বিয়োগের পর পাড়া প্রতিবাসী যখন দুর্গাদাস বাবুকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিল, যে পত্নীর মৃত্যু ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন অপর কিছুই নয়, তখন অপুত্রক দুর্গাদাসের প্রাণে পুনর্ন নরকের জ্বালাটা এমনই প্রবল হয়ে উঠ্‌ল যে নবোঢ়া পত্নী অপেক্ষা কচি মুখের কল্পনা তাঁকে পুনরায় বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত করে তুলল। দুর্ভিক্ষ পীড়িত বঙ্গদেশে সকল বস্তুর অভাব হলেও মেয়ের কমতি নেই, আর মানুষ কন্যাদায় গ্রস্ত অপেক্ষা এমনই স্বার্থগ্রস্ত, যে কন্যার অনুষ্ঠ অপেক্ষা ধনবান জামাতার দিকটাই দেখে বেশী। দুর্গাদাসেরও পাত্রীর অভাব হল না,

পার্শ্বস্থ গ্রামের নবীন চাটুর্য্যের বয়স্থা কন্যা জগৎ-মোহিনীকে এক শুভলগ্নে বিবাহ করে ঘরে আনলেন। ধনীর পত্নীত্ব লাভ করে, দারিদ্রেও বর্দ্ধিত মোহিনী, নিজের রহিনি সঞ্চিত আশা আকাঙ্কার মোহিনীজাল বিস্তার করে সংসারের হাল শক্ত করে ধরে দুর্গাদাসের গৃহিণীর আসনে বসল। স্বামীর ব্যয় অপব্যয়ের হিসাবগুলার খুঁটি নাটি করে দেখতে গিয়ে তার প্রথম দৃষ্টি পড়ল নিমাইয়ের প্রতি। সতীনের ভাই, সংসর্গ সম্মান ভক্তি দেখালেও তাকে স্নেহ দৃষ্টিতে সে দেখতে পারল না। দিদির মৃত্যুর পর হতেই নিমাইয়ের মন ভেঙ্গে পড়েছিল। তার ওপর সংসারের হেনস্থা পদে পদে তাকে লাঞ্ছিত করে, ক্রমেই তাকে দুর্গাদাসের সংসার হতে বিচ্ছিন্ন করতে লাগল। ভাল করে জ্ঞান হবার পূর্ব্বে সে দিদির সংসারে এসে ঢুকে, স্নেহের কাঙ্গাল নিমাই, স্বদেশ, স্বজন ভুলে এই সংসারে স্নেহের বিনিময়ে, পরকেই এতদিন আপনার ভেবে প্রাণের ভাণ্ডার খালি করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল। আজ পরিবর্ত্তনের চক্রে পড়ে নিজের অসহায় অবস্থা বুঝে, ভবিষ্যত দূরের কথা, বর্ত্তমান অবস্থার বিচার করতে গিয়ে দিশে-হারা হয়ে পড়ল। সে সব ছেড়ে, একেবারে হাত গুটিয়ে বসল।

(৩)

যাদবপুরের ভূতনাথ ডাক্তার কর্ম্মবীর নিমাইকে আপন সহোদরের মতই স্নেহ চক্ষে দেখতেন। নিমাই যখন হতাশ হয়ে এসে তাঁর ডাক্তার খানার ফরাসের উপর আড্ডা নিল, তখন তিনি তার ভবিষ্যত ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দুর্গাদাস গ্রামের ধনী মাতব্বর ব্যক্তি, পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হন, সেজন্য ভূতনাথ ডাক্তার নিজের বাটিতে নিমাইকে ইচ্ছা সত্ত্বেও স্থান দিতে পারছিলেন না। দুর্গাদাসের সংসারের সঙ্গে তাই দুবেলা দুমুঠো আহারের সম্পর্ক তখনও নিমায়ের রাখতে হল।

নিমায়ের উৎসাহহীনতায় সারা গ্রামের ওপর একটা অভাবের ছায়া পড়ল—গ্রামের লোক প্রতি কাজে নিমায়ের অভাব অনুভব করতে লাগল। কিন্তু নিমাইকে কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনবার কোন প্রতিকারই তারা করিতে পারল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস জড়ের মতন নিমাইয়ের দিনগুলো অলসভাবে কেটে যাচ্ছে দেখে, ভূতনাথ ডাক্তার অনেক বুঝিয়ে তাকে ডাক্তার খানার কার্য্যে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু কর্ম্মের আহ্বান আর তাকে উত্তেজিত করতে পারল না। গ্রামের সংঘ অভাব অভিযোগ তার পায়ের তলায় কেঁদে লুটিয়ে পড়লেও সে ফিরে তাকাত না।

দুর্গাদাসের সংসারের সঙ্গে নিমায়ের যেটুকু সম্বন্ধ অবশিষ্ট ছিল, ভাগ্যবিধাতা তাও বেশীদিন রাখলেন না। অপুত্রক দুর্গাদাসের সন্তান ভাগ্যের কুয়াশা গুলো মুছে দিয়ে, বিধাতা তাঁকে সন্তান-ভাগ্যে সৌভাগ্যবান করলেন। নবীন আগন্তুক এসে দুর্গাদাসের সংসারে এতখানি স্থান দখল করে বসল যে নিমাই আশৈশবের লীলাভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল; কারণ যে স্নেহের দাবীতে সে এতদিন এই পরিবারের একজন হয়েছিল, তা সে অনেকদিন হারিয়েছে। জগৎমোহিনী আগার পরও যেটুকু বিবেকের বেড়ী নিমাইয়ের পায়ে আটকে ছিল, পুত্রের আগমনে দুর্গাদাস নিজের হাতে তাও কেটে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিলেন। গোধা হরিণ ছানার মত মুক্তি পেয়েও নিমাই মুক্ত বাতাসের স্বাদ অনুভব করতে পারল না, এতদিনের স্মৃতির দাগ একেবারে মুছে ফেলা তার পক্ষে অসম্ভব হ'ল। সে মর্ম্মাহত হয়ে, ভূতনাথ ডাক্তারের বাড়ীতে আশ্রয় নিল। মানুষের মনে চিরদিন কিছুই বাসা বেঁধে থাকে না। শোক দুঃখ পাহাড়ে পাখির মত, এক ঝতুতে আসে—আবার তার অবসানেই চলে যায়। নিমায়ের দুঃখের ক্ষত, সংসারের ধুলায় ঢাকা পড়ে গেল। স্রোতের কুটোর মত সে সংসার তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিল

(৪)

দশ বৎসর কেটে গিয়েছে। কর্ম্মজীবন হতে অবসর নেওয়ার পর জীর আর মানুষের মত নিমায়েরও সুখে দুঃখে দিন কেটে যাচ্ছিল। এই সময় সারা বিশ্বে নবজাগরণের সাড়া পড়ে গেল। এবং সেই প্রাণোন্মাদকারী উত্তেজনার ঢেউ যখন মাধবপুরের ওপর দিয়েও চলে গেল, তখন নিমায়ের প্রাণের সুপ্তসিংহ সেই বিজয়মন্ত্র-রবে জেগে উঠল, তার এতদিনের বধির শ্রবণ কার জলদগম্ভীর সুরে ভরে গেল——

"কর্ম্মী তোমার কর্ম্মের ডাক
পড়েছে আজ জোরে
অলস শয্যা ছেড়ে আবার
দাঁড়াও পায়ের পরে।
হস্ত তোমার অযুত হাতীর
মত্ত বিজয় বলে
আস্ফালিয়া উঠুক আবার,
বক্ষ উঠুক ফুলে।"

সে আহ্বান নিমায়ের প্রাণে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করে দিল। যে শক্তি এতদিন সংসারের নির্ম্মম আঘাতে বুকের মাঝে জমাট বেঁধে ছিল, সেই শক্তি কার বিরাট স্পর্শে গ'লে শতধারে ছুটে চলল,—নিমাই আবার কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ল।

গ্রামের যারা এতদিন নিমায়ের কাছে বিনা সুদে শুধু হাতে টাকা নিয়ে এসেছিল তারা কিন্তু নিমাইয়ের এই নবীন উদ্যম বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখল না; বরং তারা অমঙ্গল আশঙ্কায় তাতে বাধা দিতেই দাঁড়াল। দুশ্চিন্তা নিমাইকে অন্যায় অত্যাচারে কেউ কোন দিনই কর্ত্তব্যচ্যুত করতে পারে নি। যখন সে গ্রামের অসহায়দারী অসাধুদের কাছে কোন সহানুভূতিও পেল না তখন বাধা প্রাপ্ত প্রচণ্ড স্রোতের মত তার গতিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল তাদের দিকে, যারা বিদ্যাবুদ্ধির ধাপ্পাবাজীতে ধরণীর বুক হতে দিন দিন লয় হতে চলেছে। ছ'মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে নিমাই গ্রামের দীন, দরিদ্র, পতিতদের নব জাগরণে জাগরিত করে, তাদের প্রাণের মরা গাঙ্গের দুকূল ছাপিয়ে তুলল —বিরাট কুরুক্ষেত্র মহামন্ত্রে—'চাষা—তাঁত—ক্ষেত—খামার'।

যারা পতিত অস্পৃশ্য, যারা দীনহীন পথের কাঙ্গাল, তারা নিমায়ের আহ্বানে সকলের সমান হ'বে, এতখানি উদারতা গ্রামবাসীর ছিল না। অচ্ছুতেই তাদের এই আন্দোলনের মূলচ্ছেদ করতে গ্রামবাসীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। নিমাই ভ্রূক্ষেপ করল না। সে সমান ভাবে এই নব মন্ত্রের দীক্ষা দান করতে লাগল। দলে দলে বালক, যুবা, পিতা মাতার শাসন উপেক্ষা করে, নিমায়ের কাছে ছুটে আসতে লাগল। দীন, দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটে বেরুল। অন্নের সন্ধান তারা পেয়েছে। সুখের পথ, মানুষের অধিকার নিমাই তাদের চিনিয়ে দিয়েছে। দ্বিগুণ উৎসাহে তারা দলে দলে নিমায়ের দল বাড়াতে লাগল।

মুষ্টিভিক্ষুক নিমাই আজ ভিখারীর বেশে রাজার সম্মান পাচ্ছে দেখে, গ্রামবাসীদের অন্তর্দাহ হ'ল। অনেক যুক্তিতর্কের পর, গ্রামের জন কতক মাতব্বর মিলে কলিকাতা বাসী জমিদারের নিকট গিয়ে সকল কথা বলে নিমায়ের দমনের প্রার্থনা করল। জমিদার তাঁদের আশ্বস্ত করে বিদায় দিলেন।

(৫)

সেদিন 'গান্ধী পুণ্যাহ'। বন্ধপরিকর নিমাইয়ের দল বাজারের দোরে দোরে হত্যা দিয়ে পড়েছিল, অন্ততঃ সেইদিনটার মত বিদেশী দ্রব্যের বেচা কেনা বন্ধ করতে। দুর্গাদাস ছিলেন নিমায়ের এই অবে-শীতার বিরোধীদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। এর কারণেও একটু ছিল। জমিদার, তাঁর প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের পদ প্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা।

দিন বুঝে জগৎমোহিনীর শাড়ী কিনিবার দরকার হয়ে পড়ল। তিনি স্বামীকে সে কথা বলতে

দুর্গাদাস নিষ্ফল চিত্তে হারান মল্লিকের দোকানে গিয়ে একজোড়া বিলাতী শাড়ী কিনে গাড়ীতে এসে দাঁড়াতেই ছেলের দল তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কাপড় ফেরত দিতে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তাঁকে চলে যেতে দেখে ছেলেরা তাঁর পায়ের তলায় বুক পেতে দিয়ে শুয়ে পড়ল, দুর্গাদাস তাদের চোখ রাঙ্গিয়ে ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন। দুর্গাদাসের ভাবগতিক দেখে ছেলেরা যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, তখন নিমাই সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ব্যাপার শুনে, দুর্গাদাসের সুমুখে গিয়ে মিনতির স্বরে বলল, "দাদা, তুমি বিলাতী কাপড় কিনেছ!"

দুর্গাদাস অত্যন্ত রুক্ষস্বরে বললেন "হাঁ, কিনেছি —তা হবে কি! দেখ নিমাই ডেঁপোমি করিস নে—পথ ছাড়্।" দুর্গাদাস কয়েকপদ অগ্রসর হতে —নিমাই তাঁর কাপড় শুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল "দাদা—আজ আমায় ভিক্ষে দাও—"

"কি এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমায় হাত থেকে কাপড় ছিনিয়ে নিতে চাস। আমারই খেয়ে মানুষ, আর আমারই ওপর জুলুম! দাঁড়াও—তোমার তেজ ভাঙ্গছি।" কাপড় জোড়াটা রাস্তার ওপর টান দিয়ে ফেলে, দুর্গাদাস রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। ছেলের দল তাঁর ভাবগতিক দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

(৬)

পরদিন সকালে উঠে নিমাই ডাক্তার খানার কাজকর্ম্ম শেষ করে, তার প্রতিষ্ঠিত চরকা স্কুলে বসে ছেলেদের কাজ শিখাচ্ছিল। হঠাৎ বাইরে গোলমাল শুনে সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল, একজন দারোগা দু'তিন জন কনেষ্টবল নিয়ে স্কুলের দিকেই এগিয়ে আসছে। পুলিশ দেখে নিমাই বাইরে বেরিয়ে এসে ব্যাপার কি জানবার জন্য দারোগাকে জিজ্ঞাসা করল; কিন্তু দারোগা তার কথার উত্তর না দিয়ে একজন কনেষ্টবলকে নিমাইয়ের হাতে হাতকড়ি পরাতে হুকুম দিয়ে বললেন, "তোমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।" বিস্মিত নিমাই কারণ জিজ্ঞাসা করায় দারোগা বলল, "বাজারের ভেতর কাল যে-আইনি জুলুম জবরদস্তি করেছ, লোকের ইচ্ছায় বাধা দিয়েছ।"

"কার ওপর জুলুম করেছি—দারোগা বাবু?"

"দুর্গাদাস বাবুর ওপর।"

বজ্রাহতের ন্যায় নিমাই স্তম্ভিত হয়ে কণকাল দাঁড়িয়ে রইল। আজ তার দিদির কথা মনে পড়ল। নিজের অজ্ঞাতসারেই নিমাইয়ের দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে খানিকটা অশ্রু পড়ে তার বক্ষ সিক্ত করে দিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে নিজের দুর্ব্বলতা দেখে লজ্জিত হয়ে, দুর্ব্বল প্রাণকে কঠোর পীড়ন করল। তার দুর্ব্বলতা দেখ্‌লে তার কর্ম্মীরা যে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। সে প্রশান্তভাবে সবাইকে ডেকে তার এই পুণ্য অভিযানের কারণ বুঝিয়ে দিয়ে তাদের স্থিরভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে চল্‌তে আদেশ দিল। তারপর অবিচলিত কণ্ঠে দারোগা বাবুকে সম্বোধন করে বলল, "চলুন দারোগা সাহেব, আর দেরী করে লাভ নেই—অনেকটা পথ যেতে হবে।"

দারোগা কনেষ্টবলদের নিমাইকে থানায় নিয়ে যেতে হুকুম দিয়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে দুর্গাদাস বাবুর বাড়ীর দিকে চলে গেল। আর সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্র মাথায় করে অনাহারী নিমাই —সাধারণ চোর ডাকাতের মত চার ক্রোশ দূরবর্ত্তী থানার দিকে পা চালিয়ে দিল।

নিমাইয়ের ভক্তেরা তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এল। নিমাই তাদের ফিরে যেতে বলল। কিন্তু তারা ফিরল না, নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত সেইখানে দাঁড়িয়ে প্রদীপ্ত সূর্য্যের অস্তাচল গমন দেখতে লাগল। ধীরে ধীরে নিমাই তাদের দৃষ্টির

অন্তরালে চলে গেল। কিন্তু তখনও তারা সেইখানে যুদ্ধের মত দাঁড়িয়ে নিমায়ের বজ্রগম্ভীর গানের স্বর শুনতে পাচ্ছিল—

'যায় যাবে জীবন চলে।
শুধু দেশের লাগি তোমার কাজে,
বন্দেমাতরম্ —বলে।'

দৃষ্টি-লাভ

(শ্রীপ্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ, বি এল)

সুধার সুতীব্র জ্বালা ভুলিবার তরে
সুধাপায়ী লয় যথা সুরারই আশ্রয়,
শান্তি আশে তেমনি গো এতকাল ধরে'
শান্তিহীন লোকালয়ে বাঁধিনু আলয়;
আয়ু গেল বৃথা কাজে, শুধু বৃথা আশে
বাড়িয়া চলিল গুঢ় হৃদয়ের ক্ষত,
অবশেষে বুঝিলাম কি মূঢ় বিশ্বাসে
জীবন-যাত্রার পথে জন্মান্ধের মত
চলেছি ধ্বংসের পানে; করুণা তোমার
অকরুণ নিদারুণ দণ্ডরূপে আসি'
সংসা পড়িল যবে মস্তকে আমার
তখনই গো, দয়াময়, আঁখি জলে ভাসি'
গৃহ ছাড়ি' পশিলাম কাননের তলে;
আপনারে সঁপিলাম ও পদ কমলে।

সদাশিবের দপ্তর

(২)

বন্ধন

(শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, বি, এ, সি, লণ্ডন)

বাঙ্গালীর শাশুড়ী ঠাকুরাণীরা জামাইকে 'ষড়ি দিয়া কিনিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া' থাকেন। এ কোন্ দেশী বাঁধন? লোকে দড়ি দিয়া ছাগল, গরুই বাঁধে। দড়ি ছাড়া জগতে বাঁধিবার সামগ্রী আরও অনেক আছে, তবু পোড়া লোকে ঐ দড়ি দিয়াই বাঁধিতে চায়। এ পাপ সংসারে সকলেরই বাঁধন আছে, স্বাধীন কেহই নহে। জড় জগতে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বাঁধন আছে। জননী জঠরে জরায়ুর মধ্যে জীব নাড়ীর বাঁধনে থাকে। সাপের রোজা আগে বাঁধন দেয়, পরে চিকিৎসা আরম্ভ করে। চোরে ঘর বন্ধন, ঘার বন্ধন দিয়া থাকে। সৈনিক পোষাক পরিয়া কোমর বন্ধ দিয়া শরীরটাকে বাঁধে।

এমন যে ইংরাজ জাতি, যাহারা স্বাধীনতার খুবই বড়াই করিয়া থাকেন, তাহারও আঁতাতের (entente) বন্ধন আছে। তাহা না হইলে শক্তির তুলাদণ্ড এক পেশে হইয়া পড়িত। এতবড় যে সচল পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইহাদেরও বাঁধন আছে, তাহা না থাকিলে তাহারা কক্ষচ্যুত হইয়া ছুটিয়া পলাইত। গাছকে না বাঁধিলে চর

দেয় না। বায়ুকে রজ্জু হইয়া নগেন্দ্রকে বেষ্টন না করিলে অমৃত উঠিত না! এ সংসারে বন্ধনের বশ নয়, এমন ত' কাহাকেও দেখি না। এমন যে উন্মাদ সদাশিব, যাহার সকল দিক শূন্য, তাহাকেও বিজ্ঞানসুন্দরী বেঁধেছিল, কাব্যকাননী বেঁধেছিল আর ও পাড়ার উমাসুন্দরী বেঁধেছিল। বন্ধন না থাকিলে লোকে বহিয়া যায়—বোধ হয় এই জন্যই গুরুশূন্য ব্যক্তি প্রায়ই বহিয়া গিয়া থাকে। নদীর স্রোত কেহ বাঁধিতে পারে না বলিয়া নদী সর্ব্বদা বহিতে থাকে। বায়ু বাধা মানে না, বায়ু দিন রাত্র বহিতেছে। আমি তোমার কাছে বাঁধা আছি, তুমি বাঁধন কাটিয়া দাও, আমি পড়িয়া মরিব। জগতে যে বাঁধা না পড়িল তাহার জীবন বিড়ম্বনা; বাঁধিলে সে মহা সুখী। চৈতন্য জগতকে প্রেমে বাঁধিয়াছিলেন, তাই চৈতন্য অবতার। যীশুখৃষ্টও ঐরূপ বাঁধিয়াছিলেন, তাই তিনি ঈশ্বরের পুত্র। প্রত্যেক দলপতি এক এক জন মনীষা সম্পন্ন, না হয় শক্তিমান লোক! মিল, কোমত, ডারুইন্, ক্যাণ্ট্ ইঁহারা সকলেই মনীষী। প্রত্যেক গ্রামের সর্দ্দারকে মোড়ল বলে, প্রত্যেক প্রধান 'চাঁই' নামে খ্যাত।

সংসার আপনার সহিত অন্যকে, এবং অন্যের সহিত আপনাকে বাঁধাই মহত্ব। এই জন্য পণ্ডিতেরা বন্ধুত্বের ভুঁয়ো ভুঁয়ো প্রশংসা করিয়া থাকেন। বিজ্ঞেরা প্রণয়ের ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন। বন্ধুর অপেক্ষা প্রণয় কথাটি শুনিতে মিষ্টি লাগে—মাধুর্য্যও বেশী। বন্ধুর একটি ফুল—প্রণয় একটী গুচ্ছ। প্রণয় কথাটী বড় গাল ভরা একদিন বাঙ্গালীর জাতীর কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

'হাতে সূতা বেঁধে কভু প্রেমে বাঁধা যায়;
বন্ধন দেখিলে প্রেম অমনি পালায়।'

মনে রাখ্‌বেন তিনি সূতার বাঁধনের কথাই বলেছেন—প্রাণের বাঁধনের কথা বলেন নি। প্রাণের বাঁধন না থাকিলে প্রেমের বাঁধন হয় না। যে দাম্পত্য প্রণয়ের সুখ স্বর্গসুখ হইতেও বোধ হয় বেশী, আজকাল শারদীয় কৌমুদীরশ্মির ন্যায় যাহা বঙ্গে বিরাজ করিতেছে, সেই প্রণয়ের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা এমনিই একটা আলোক সম্পাত করিয়া দিতেছে যে তাহাতে এদেশের মামুলী দাম্পত্য প্রণয়রূপ চারা গাছগুলি বৈশাখের গোদে ঝলসিয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য দেশের প্রণয়টা রং করা কাগজের ফুলের মত। সেখানকার আতরগোলাপ মাখান, 'নামাই ইভনিং ড্রেস' পরান দাম্পত্য প্রণয় আমরা চাই না। ইহা অপেক্ষা শুদ্ধ সুন্দরী জ্যেষ্ঠা ভগিনী অফিসে সুন্দরী প্রণয় মিঠা। নানা সাজে সজ্জিত, নানা রঙ্গে রঞ্জিত চড়কের সাজের ন্যায় কাব্য কুমারীর প্রণয়ও আমাদের কাছে অধিক তৃপ্তিকর। য়ুরোপীয় সভ্যতার পায়ে কোটী নমস্কার। ঐ সভ্যতা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলে আমরা কাঁদিয়া বাঁচি। ছাড়িয়া দিলে গবর্ণমেণ্টের দক্ষিণার তুল্য সামগ্রী সাতরার দিতে প্রস্তুত আছি। আবার বলি আজকাল আমেরিকা পৃথিবীর জাতিকে প্রণয়-ডোরে বাঁধিবার চেষ্টায় আছে। তাহারা জগতের গতি যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টায় আছে। পারিবে কি? পারিলে পক্ষপক্ষীও হার মানিবে। তবে 'বজ্র আঁটনির স্থলে ফস্কা গিরা' না হইয়া যায়, কারণ এমন জগতের সকল জাতিই প্রখর, টাইট্ কেহই নয়, যেন সমুদ্রতীরে অংখ্য বালুকা—তাহাতে আবার যদি একটু বাতাস উঠে ত' কে কোথায় সরিয়া দাঁড়াইবে তাহার ঠিক নাই।

সমাজে বন্ধন আছে ও থাকিবে। আমরা আমাদিগের স্থবরের সামগ্রী স্থায়েই বাঁধিয়া রাখিব, না হয় শয়ন গৃহের পালঙ্কের পায়ার সহিত বাঁধিয়া রাখিব, তবু গড়ের মাঠে খোলা হাওয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতার দূষিত বায়ুতে যাইতে দিব না। পাঁচটা বাজিলে, প্রত্যেক বঙ্গবাসীর গৃহে যেন বার মাস

ফুল ফুটে। বাঙ্গালীর 'বস' নাই বলিয়া 'বিলিয়ার্ড' ও নাই—বাঙ্গালী নিষ্কণ্টক। তবু আমাদিগকে লইয়া অনেকে খোঁচাখুঁচি করে কেন তাহা জানি না। যাহারা করে তাহারা বোধ হয় 'এণ্টিনক্রিও পেট্রাং' নাম শুনে নাই, 'বিদ্যা সুন্দরের' মর্য্যাদা বুঝে না, 'রোমিএ জুলিয়েট' পড়ে নাই, কৃষ্ণকান্তের প্রণয়ের যে অতল স্পর্শ গভীরতা তাহা অনুভব করিতে সমর্থন নয়। যাহারা এই ক্ষুদ্র মহুয়া হস্তাহীন সামগ্রীর মর্য্যাদা বুঝে না, তাহারা যে প্রণয়ের ঐশ্বরিকতা বুঝিবে তাহা অসম্ভব। প্রণয় রজ্জুতে শাকওসিংহ জগতের বার আনা অংশ একত্র বাঁধিয়াছিলেন। চৈতন্য দেব ভারতের সমাজকে নূতন করে বেঁধেছেন। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনে নাই এমন লোক কে আছে? এসব ধর্ম্মাশ্রয়ে প্রেমের বন্ধনকে লোকে ধর্ম্ম বন্ধন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে; তার কারণ ধর্ম্ম শব্দের ধাতুগত অর্থই হইতেছে যাহা ধারণ করিয়া রাখে। যেখানে দেখিবে যে অধিক সংখ্যক লোক কোন এক সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইয়াছে সেই খানেই জানিবে যে ধর্ম্ম বন্ধন তাহার মূল। পৌরাণিক ইতিকথা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাজক ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে যেতেন তাদের পাপকে মহা পাপ বলে গণ্য করা হ'ত। আর সে সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল প্রাণদণ্ড। যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ অনেক স্থলেই ধর্ম্ম লইয়া। লোকে বলে যে সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান হেতু দন্তযুক্ত টোটার চর্ম্ম কাটা। প্যালেষ্টাইনের মহাযুদ্ধ(crusades) ধর্ম্ম লইয়া। যীশু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের দোহাই দিয়াছিলেন লোকে এই বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ক্রুসে বিদ্ধ করিয়াছিল। মুসলমানদিগের খিলাফৎ আন্দোলন ধর্ম্মের জন্য।

বাঙ্গালীর মত কাহারও সমাজ বন্ধন দৃঢ় নহে। বাঙ্গালীর মত কেহও ধর্ম্মকে এতটা আগ্রহের সহিত ধরিয়া থাকে না। আমাদের দানে ধর্ম্ম, ধ্যানে ধর্ম্ম, শ্রাদ্ধে ধর্ম্ম, বিবাহে ধর্ম্ম, পাক্কি ভোজনে ধর্ম্ম—সকল কর্ম্মে ধর্ম্ম। পথের ধারে গাছ পুঁতিলে ধর্ম্ম, পুকুর খনন করিলে ধর্ম্ম, রাজদর্শনও ধর্ম্ম। গঙ্গাজল পতিত পাবনী, শিবপর ও দুর্গা দেব দেবীর লাগে। দেবতার নাম করিয়া শয়ন করিলে পুণ্য হয়। পক্ষী পুষি তাহাও পুণ্যের জন্য। পুণ্যাহ দিনে জমীদারির কর আদায় করি, বাড়ী হইতে বিদেশে যাই। ঠাকুর দেবতার নামে ছেলে মেয়েদের নাম রাখি। চন্দ্র সূর্য্য আমাদিগের দেবতা, গ্রহণের সময় স্নানদান করিলে অক্ষয় স্বর্গ হয় আমাদের ধারণা। ধর্ম্মেরবন্ধন যার শিথিল আমরা তাহাকে একঘরে করি, তাহাকে সমাজের বাহির করিয়া দিই। শাস্ত্রকারেরা সমাজবন্ধনের যে সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি তাহা অবহেলা করিবে আমরা তাহাকেই সমাজ হইতে দূর করিয়া দিই। ক্রীশ্চান সম্প্রদায় মধ্যে যে ক্রাইষ্ট বিশ্বাস করে না সমাজ তাহাকে উৎখাত করিতে ক্রটী করে না। সক্রেটস্ (Socrates) লোকের অন্ধ বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করাইতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। সহস্র সহস্র মারাথনের নাম আজিও শুনা যায়, সে সকল হত্যা বিবরণ শ্রবণ করিলে আজিও শোণিত শুষ্ক হইয়া আইসে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম দ্বারা সমাজ বন্ধন থাকা ভাল; কিন্তু দেশাচারের অজুহাতে সমাজের বন্ধন হইলে তাহা কখনও দেশের কল্যাণপ্রদ হয় না। যাহা হউক যদি আজকাল আমাদিগের মনুষ্য-সমাজের কোন বন্ধন থাকে তবে সে ধর্ম্ম বন্ধন। প্রণয় বন্ধন উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু তাহা বড় দেখা যায় না। এ পোড়া বিংশ শতাব্দীতে সহস্র তন্তুরায় তাঁত বুনিতেছে বটে, কিন্তু সকলেই আপন আপন কোলে ঝোল মাখে। আমি মহাপ্রকৃতি নিময় হইয়াছি, তুমি আমাকে সেই সময় দূর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে, দাঁড়াইয়া দেখিবে ও হাসিবে এবং যদি পার টাপিয়া ধরিবে; হাত বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করা আজকাল যেন জগতের রীতিই নয়। আবার

যে পঙ্কে নিমগ্ন হয় নাই, তাহাকে বন্ধনের লোভ দেখাইবে। মনুষ্য চিরকাল জ্ঞান বুদ্ধি স্বত্বেও মহামূর্খ। মনুষ্যস্রষ্টা জগতের পিঞ্জর মধ্যে পক্ষী পুষিয়া তাহাতে সর্প ছাড়িয়া দিয়া দূরে বসিয়া রঙ্গ দেখিয়া থাকেন। কেন জগদীশ! এ কোন্ দেশী পুরুষত্ব! তুমি কাহার ইচ্ছায় এ সকল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমারও কি কেহ স্রষ্টা আছে না কি? অথবা তুমি স্বয়ম্ভূ। কেহ বলে যে তোমার উপরওয়ালার ইঙ্গিতে তুমি সকল কার্য্য করিয়া থাক। তুমি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ, আবার কেহ বলে যে তুমি পরমাণুরূপে জড় জগত। জড়ই হও আর চৈতন্যই হও এ দুয়েতেই শক্তি আছ মানি; দুয়ের ভিতর পার্থক্য পেয়ালার ভিতর আর বাহিরে যে পার্থক্য। কিন্তু যিনিই ঈশ্বর হউন তিনি শক্তিই হউন আর জড়ই হউন, তাঁহার জ্ঞান নাই তাঁর আক্কা নাই এ কথা বলতে বাধা! তিনি সুখেও আছেন আবার দুঃখেও আছেন, সম্পদেও আছেন, আবার বিপদেও আছেন। সংসারকে তিনি কি সুখের করিয়া সৃষ্টি করিতে পার্তেন না? সংসারে দুঃখ সৃষ্টি করবার দরকার কি ছিল? সংসারে সৃষ্টির জন্য—ঈশ্বরের আবশ্যক কি? সামান্য মনুষ্য বুদ্ধিও যখন কোন কর্ম্ম ভাল করিতে না পারিলে মন্দ করিতে অগ্রসর হয় না, তখন ত্রিভুবনব্যাপী ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে পঙ্কে নিমগ্ন করেন, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় গ্রন্থিতে বাঁধিতে আপত্তি করেন, ইহা কেন লোক বিশ্বাস করিবে? হে জগতের নাথ! যদি তুমি করি বর্ণিত যথার্থই অনন্ত শক্তিমান হও, তবে যে শক্তিতে মনুষ্যের পরমাণুতে পরমাণুতে বাঁধিয়া এই সুখদুঃখ সঙ্কুল মানবদেহ সৃষ্টি করিয়াছ তাহা কাটিয়া দাও আমাদিগের দেহস্থিত জড়পদার্থ সকল অসংখ্য বালুকারূপে পরিণত হউক। তোমার জগত লইয়া তুমি দুইয়া খাও, আমরা নিশ্চিন্ত হই—আমাদিগের সকল বাঁধন টুটিয়া যাউক।

অজ্ঞতা

(সংসাচি)

আমি ত ভাই তোমাদিকে
বলেছিলাম তখুনি,
লাঙ্গল ভেঙ্গে হয় না রে ভাই—
হয় না গড়া লেখনী।
হাসির কথা বল্‌বো কারে,
মুনীশ দিয়ে টোল খোলারে,
গাণ্ডীবে হায় কেমন করে
ধর্‌বে বল শকুনি।

২

উপন্যাসের হাত্ত কেন
উঠ্‌বে না এ ললাটে,
অশ্বমেধের পত্র খানা
আঁটলো গাধার ললাটে।
রণে গরুর বাথান গেঁথে
লড়তে এলে রামের সাথে,
বুঝ্‌লে না ত সইবে না সে
পবন বানের ঝাঁকুনী
আমি ত'ভাই তোমাদিকে
বলেছিলাম তখুনি।

৩

বৈষ্ণীমধুর মধুর ভোগে
মৌমাছিদের আসরে,
গুবরে পোকা কর্ত্তা হলো
পেট ভরে সব হাস রে।
চেমনা কেলে, ভোমনা চিতে
লখীন্দরকে এলেন খেতে
জন্মেজয় যে যজ্ঞ করেন
তোমরা ত তা দেখনি।
আমি ত ভাই তোমাদিকে
বলেছিলাম তখুনি।

শাস্ত্র ও স্বাধীনতা

(শ্রীরেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ)

জগতের বড় বড় মনীষীরা একবাক্যে বলিয়া থাকেন, পরাধীনতা জীবনের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক। সেই পরাধীনতাও আবার দুই প্রকারের, এক বাহিরের, অপর ভিতরের। বাহিরের পরাধীনতায় দুর্ব্বল সবলের বশীভূত হয়, সবল দুর্ব্বলকে তাহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে বাধ্য করে, দুর্ব্বলের সকল ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান তাহারই ইচ্ছাক্রমে নিয়ন্ত্রিত হয়, অনেক স্থলেই সবল দুর্ব্বলকে আপনার স্বার্থ সিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। এ অবস্থায় বাহিরে দুর্ব্বল সবলের বশীভূত হইলেও ভিতরে ভিতরে সে কতকটা স্বাধীনই থাকে, সে স্বাধীন ভাবে ভাবনা করিতে পারে, ভাল মন্দের বিচার, কল্যাণ—অকল্যাণের চিন্তা করিতে পারে, প্রবলের ইঙ্গিত ক্রমে সে যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে বাধ্য হয়, তখন পরাধীনতার যে দুঃখ তাহাও সে সম্পূর্ণ রূপেই অনুভব করে, আর সেই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার যে গৌরবময় ছবি তাহাও তাহার চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত হয়। এ অবস্থায় তাহার বাহিরের বৃত্তিগুলি অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও ভিতরে সে একেবারে পরাধীন হইয়া যায় না; স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই তাহার অন্তরে জাগরূক থাকে। সে কেবল একটা সুযোগ ও সুবিধারই অপেক্ষা করে, কোনও রূপে বাহিরে একটু শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলেই অন্তরের স্বাধীনতা তাহার বাহিরের ক্রিয়ার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়।

ইহা ছাড়া আর একপ্রকারের অধীনতা আছে তাহা অন্তরের অধীনতা; এ অধীনতায় মানুষের অন্তরের স্বাধীন ভাবটা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, দীর্ঘকাল অপরের অধীনতা ভোগ করিতে করিতে তাহার অন্তরটা সে অধীনতায় এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, সে অধীনতার ভাবটাই যেন তাহার স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ কেবল বাহিরেই অধীন থাকিলে সেই অধীনতার সহিত ভিতরে ভিতরে তাহার যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ চলিয়া থাকে, বাথারঅনুভব জাগিয়া থাকে,এ ক্ষেত্রে তাহার কিছুই হয় না,কোনও রূপ স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন আকাঙ্ক্ষাও তাহার মনে স্থান পায় না, তাহার চিন্তা ভাবনা, অধীনতার গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই তাহার মধ্যে স্ফূর্ত্তি লাভ করে, আশা আকাঙ্ক্ষা সে অধীনতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, অধীনতার দুঃসহ বেদনাও তাহার অন্তরে কোনরূপ তরঙ্গ তুলিতে সমর্থ হয় না। দীর্ঘকাল অধীনতার মধ্যে থাকিয়া তাহার চিত্তটা অধীনতার সঙ্গে এরূপ অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশিয়া যায় যে, সে অধীনতাটা তখন তাহার মধ্যে প্রতিকূল ভাবে গৃহীত না হইয়া অনুকূল ভাবেই গৃহীত হয়, অধীনতার মধ্যে থাকিয়াই যেন সে আরাম বোধ করে।

এই দুই শ্রেণীর অধীনতার মধ্যে শেষের অর্থাৎ অন্তরের অধীনতাটা বড় ভয়ানক জিনিষ। ইহাতে মানুষকে একেবারে অমানুষ করিয়া তোলে। বাহিরের অধীনতা মানুষ অনেক সময় কাটাইয়া উঠে, কিন্তু অন্তরের অধীনতা পূর্ণতালাভ করিলে, তাহার উদ্ধারের আশা আর প্রায়ই থাকে না।

বাহিরের অধীনতা অপেক্ষাও একটা বড় অধীনতা ভারতবর্ষের হিন্দু জাতির অন্তরে অন্তরে যুগযুগান্তর ধরিয়া সঞ্চিত আছে। আর তাহারই ফলে ইহার মনোবৃত্তিসকল এরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়া

পড়িয়াছে যে, কোনওরূপ স্বাধীনভাব—বিকাশের অবকাশ আর সেখানে নাই। সে অধীনতা বাহিরের অধীনতা নহে, সে অধীনতা—হিন্দু জাতির পুরুষ পরম্পরাগত শাস্ত্রাচারের অধীনতা, সে অধীনতা—হিন্দু জাতির সমাজবিধির অধীনতা। শাস্ত্রের শাসন ও সমাজের বাঁধন, এ দুয়ের চাপে পড়িয়া হিন্দুজাতি এ কথাটা একেবারে ভুলিয়া যাইতেই বসিয়াছে যে, সে মানুষ, মানুষের মত তাহারও একটা অন্তঃকরণ আছে, ভাল মন্দ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারের ক্ষমতা আছে, মানুষেরই মত তাহারও গন্তব্য পথে স্বাধীন ভাবে চলিবার সামর্থ্য আছে; মানুষের মত সেও একটা সজীব বস্তু, অপরের হস্তের ক্রীড়া-কন্দুক, অথবা অপরের শক্তিতে পরিচালিত তুচ্ছ যন্ত্রের ন্যায় জীবন বহন করিবার জন্যই মানব জন্ম নয়! সে একথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে যে কর্ম্মজগতে তাহার নিজেরও কিছু করিবার আছে! সে জানে তাহার সকল কর্ত্তব্য তাহার জন্ম গ্রহণের বহু পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার এক চুল এদিক ওদিক করিবার অধিকার তাহার নাই। তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার ধারাও তাহার শাস্ত্র পুঁথিতে লিপিবদ্ধ, সে ধারার মধ্য দিয়াই তাহাকে বলিতে হইবে কোনওরূপ নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। তাহার শাস্ত্র তাহার জীবনের লক্ষ্যরূপে, যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছে, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে তাহাকে সে লক্ষ্যেরই সাধন করিতে হইবে। শাস্ত্রের শাসন ও সমাজের বিধান অতিক্রম পর্য্যন্ত তাহার শাস্ত্র বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই যে অন্তরের অধীনতা, ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দু জাতির মনের উপর আধিপত্য করায় তাহার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যে কোনরূপ স্বাধীন চিন্তাই আর সেখানে স্থান লাভ করিতে পারিতেছে না। আহারে বিহারে আচারে ব্যবহারে শাস্ত্র-সমাজের দাসত্ব করিয়া যে জাতি আপনার স্বাধীন সত্তার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে, ভাবে ও কর্ম্মে, অন্তরে ও বাহিরে পরাধীনতাই যে একমাত্র তাহার প্রাপ্য বস্তু তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন দেখা যাউক সত্যই কি ভারতের হিন্দু জাতি অন্তরের এই অধীনতার মধ্যেই চিরদিন প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে? আর এই যে শাস্ত্রের শাসন ও সমাজের বিধান ইহাকে কি সে চিরদিনই অধীনতার নাগপাশ রূপে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে? নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে কোন ক্রমেই একথা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই স্বারাজ্য বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভেই জীবের মুক্তি,* ইহার সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা সমস্ত শাস্ত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই মুক্তির পথেই জীবকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "সর্ব্ব বন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্য নাময়ং" ইহাই যে, শাস্ত্রের শেষ কথা সে শাস্ত্র কাহারও অন্তরে অধীনতা বুদ্ধির সহায়তা করিয়াছে, একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর হিন্দু জাতি শাস্ত্রের শাসন মাত্র করিয়া চলিয়া আসিলেও, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে তাহার বিচার বুদ্ধি ও অন্তর সুমোদনের যে কোনও স্থান ছিল না তাহাও নয়। "স্ব কেনাস্য সত্ত্বস্য সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" যিনি স্বীয় বিচার বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রের সহায়তায় ধর্ম্ম তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন, অপরে নহে; ইহা শাস্ত্রেরই বাক্য। তদ্ব্যতীত স্বরূপের অনুমোদন "স্বরমেবাত্মতুষ্ঠাতঃ", (মনু) আত্মার তুষ্টি "আত্মন স্তুষ্টিরেব" (মনু) স্বীয় অন্তরের অনুকূলতা "স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ" (মনু) ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে এ সকলের স্থানও শাস্ত্রকর্ত্তৃই নির্দ্দিষ্ট আছে। কাজেই মানুষকে স্বাতন্ত্র্যহীন যন্ত্ররূপে পরিণত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহা বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

তবে ধর্ম্মের পথে হিন্দুজাতি প্রধানতঃ শাস্ত্র

* স স্বরাট ভবতি শ্রুতি।

বাক্যের উপরই নির্ভর করে একথা সত্য, কিন্তু এ অভিযোগ কেবল একমাত্র হিন্দু জাতির উপরেই যে প্রযোজ্য তাহা নহে, পৃথিবীর সকল জাতিই আপন আপন ধর্ম্ম সাধনায় নিজের নিজের শাস্ত্র বা মহাজনগণের বাণীর নির্দ্দেশ অনুসারেই বলিয়া থাকে। তবে সে সকল জাতির ধর্ম্মের ক্ষেত্র কিছু সঙ্কীর্ণ; উপসনা বা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ তাহাদের ধর্ম্মের ক্ষেত্র এজন্য সে সকল অনুষ্ঠানেই তাঁহাদের শাস্ত্রের আনুগত্য লক্ষিত হয়। বাহিরের আচারে ব্যবহারে তাঁহারা একরূপ স্বাধীনই থাকিয়া যান। হিন্দু জাতির ধর্ম্মের ধারণা ইহা হইতে একটু ব্যাপক, আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া আহার বিহার আচার ব্যবহার এ সকলই তাহার ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, এজন্য সকল বিষয়েই তাহাকে ধর্ম্মের শাসন মানিয়া চলিতে হয়। কাজেই হিন্দুর দিকে দৃষ্টি করিলে তাহার সার্ব্বাঙ্গিক শাস্ত্রানুগত্য যেরূপ সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অপর জাতির সেরূপ হয় না, এইটুকুই তফাৎ।

স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে অন্যান্য জাতির ধারণা যাহাই থাকুক এবিষয়ে হিন্দুর ধারণা একটু স্বতন্ত্র। অপরকে আপনার অধীন করিলে অথবা আপনাকে অন্য-নিরপেক্ষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলেই যে স্বাধীনতা লাভ হয় এবিষয়ে হিন্দুর নাই। হিন্দু বলে—"স" শব্দের অর্থ আত্মা "স" এর অধীন, আত্মার অধীন, ইহাই স্বাধীন শব্দের অর্থ; অর্থাৎ অন্য কিছুর অধীন না হইয়া মানুষের যে কেবল আত্মার অধীনতায় অবস্থান, তাহারই নাম স্বাধীনতা। কথাটা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক।

মানুষ স্বভাবতই আত্মশক্তি প্রধান। মানুষের মধ্যে বাহিরের যে সকল শক্তি ক্রিয়া করে, ভাবের যে সকল তরঙ্গ উঠে, তাহার উপর আধিপত্য করার, সেগুলিকে যথেচ্ছভাবে নিয়ন্ত্রিত করার সামর্থ্য মানুষের আছে। মানুষ যদি যথোচিত ভাবে আত্মশক্তির অনুশীলন না করে, তাহা হইলে, তাহার আত্মা স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন আর সে সকল ক্রিয়া বা ভাবের উপর আধিপত্য করার সামর্থ্য তাহার থাকে না। সে সকলের উপর আধিপত্য করা ত দূরের কথা পক্ষান্তরে তখন সে সকলের দ্বারা আত্মা নিজেই পরাভূত হইয়া থাকে। মানুষের আত্মশক্তি যতদিন অক্ষুণ্ণ বা অপরাভূত থাকে, ততদিনই তাহাকে স্বাধীন বলা যায়। আর সে অবস্থাতে সে যে সকল চিন্তা করে তাহাই স্বাধীন চিন্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আমরা যাহা ভাবি, চিন্তা করি, যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, আমরা মনে করি সে সকল আমরা স্বাধীনভাবেই করিতেছি, কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে দেখা যায় তাহার মধ্যে যথার্থ স্বাধীনতা আমাদের অল্পই আছে।

নানারূপ শিক্ষা, সংসর্গ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার, আবেষ্টন, এসকলের দ্বারা মানুষের মধ্যে যে সকল সংস্কার সঞ্চারিত হয়, সাধারণতঃ মানুষের অন্তঃকরণ তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। সেরূপ অন্তঃকরণে সে সকল চিন্তা ভাবনা বিচার বিতর্কের আবির্ভাব হয়, যে সকল ক্রিয়ার উন্মেষ ঘটে, সে সকল সেই সঞ্চিত সংস্কার রাশিরই অনুরূপ। আত্মা সে ক্ষেত্রে আপনার স্বাধীন শক্তির প্রয়োগ করিয়া তাহার উপর আধিপত্য করিতে পারে না, আর আত্মশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পায়না বলিয়া, অন্তঃকরণ ও সেসকল সংস্কারের উর্দ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা, ভাবনা, বিচার বিতর্ক কোনরূপ ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিতে পারে না; সে যাহা করে, যাহা ভাবে, যতটুকু বোঝে, সেসকলই তাহার সঞ্চিত সংস্কারের অধীনতায় তাহারই অনুকূল রূপে সম্পন্ন হয়। এ অবস্থায় মানুষের আত্মা সেই সঞ্চিত সংস্কার রাশির মধ্যে আপনাকে এইরূপ হারাইয়া ফেলে যে তখন উহার মধ্যে আর তাহার পৃথক সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার "স"

তখন সংস্কারের বা সংস্কার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যে সকল বিষয় তাহার সংস্কারের অনুরূপ সে সকল বিষয়েই তাহার অনুরাগ জন্মে, আর যাহা তাহার সংস্কারের প্রতিকূল, তাহাকেই সে দ্বেষ করে। ভাল মন্দের বিচার ও তাহার সংস্কারের অনুকূলতা প্রতিকূলতা এবং তন্মূলক রাগ দ্বেষাদি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এরূপ অবস্থায় মানুষের সত্যানুভূতি বা সত্য নির্ণয়ের ক্ষমতা তিরোহিত হয়, স্বয়ং অপরের অধীন বলিয়া তাহার মধ্যে কোনওরূপ স্বাধীন বৃত্তির বিকাশই সম্ভবপর হয় না।

আর মানুষের এই "স্ব" বা আত্মা যখন এ সকল অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া আপনার শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠালাভ করে, তখন তাহার উপর সেই সকল সংস্কারও তন্মূলক রাগদ্বেষ, এবং তাহার বশীভূত ইন্দ্রিয়ও অন্তঃকরণ বর্গ, ইহার কাহারও আধিপত্য থাকে না। তখন ইহারা সকলেই তাহার অধীন হইয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। তখন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ বর্গ স্বাধীনভাবে কোনও ক্রিয়া করেনা, "স্ব" বা আত্মার ইচ্ছা ক্রমেই পরিচালিত হয়। সংস্কার এবং তন্মূলক রাগ দ্বেষও "স্ব" এর ইচ্ছারই অনুবর্ত্তন করে। তখন স্থূল হইতে সূক্ষ্ম সমস্ত ফেক্টার মধ্যে আত্মার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই যে আত্মার অপরের অনধীনতায় অবস্থান অথবা অপর সকলকে (সংস্কারও তাহার বশীভূত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি) নিজের অধীনতায় সংস্থাপন, ইহাই আত্মার ব্যবহারিক স্বাধীনতা। এই অবস্থায় উপনীত হইলেই মানুষের স্বাধীন চিন্তার অধিকার জন্মে, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদির মধ্য দিয়া তাহার নিকট যাহা যাহা উপস্থিত হয়, পক্ষপাতশূন্য বিচারের দ্বারা তখন তাহার ভাল মন্দের বিবেচনা করিতে পারে, সত্যাসত্যের নির্দ্ধারণ করিতে পারে। কোনওরূপ সংস্কার বা বাহ্যভাবের দ্বারা তখন তাহার কোনও প্রকারের ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকেনা। মানুষ এ অবস্থায় উপনীত না হইয়া যদি স্বাধীন চিন্তার বড়াই করিতে যায় তবে তাহার দ্বারা তাহার নির্দ্ধুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়।

হিন্দুজাতি এ কথা বুঝিতেন, এজন্য তাহারা জীবনের পথে নিজের বিচার বুদ্ধিকে অধিকপ্রশ্রয় দান করেন নাই; শাস্ত্রে যে সকল স্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে অন্তরের অনুমোদন প্রভৃতিকে প্রমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে সকল স্থলেও যথেষ্ট সাবধানতাই অবলম্বিত হইয়াছে। "অদ্বেষরাগি ভি হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতং।" রাগ দ্বেষ হীন ব্যক্তির হৃদয়ের দ্বারা অনুমোদিত, যে কোনও ব্যক্তির অনুমোদিত নহে; 'আত্মনস্তুষ্টি' আত্মার তুষ্টি, "স্বস্য প্রিয়মাত্মনঃ" স্বীয় আত্মারই প্রিয় অপরের নহে, বলা বাহুল্য স্বাধীন আত্মার পক্ষেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। এজন্য হিন্দুজাতি শাস্ত্রকেই আশ্রয় করিয়াছেন। কারণ শাস্ত্র আমাদের ন্যায় সাধারণ পুরুষ বা অধীন আত্মার কল্পনাপ্রসূত কোনও বস্তু নয়। তাহা স্বাধীন আত্মা সকলেরই উচ্ছ্বাস, অথবা তদপেক্ষাও বৃহৎ এক অখণ্ড অপরাজেয় জ্ঞানশক্তির বাঙ্ময় বিলাস। অন্ততঃ হিন্দুর এরূপই ধারণা! হিন্দু জানে যদি জীবনের পথে স্বাধীন চিন্তাকেই আশ্রয় করিতে হয়, তবে শাস্ত্র বা আত্মদর্শী স্বাধীন মহাজনগণের বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। যাঁহারা মনে করেন হিন্দুজাতি নির্ব্বিচারে শাস্ত্রের আনুগত্য করিয়া স্বাধীন চিন্তার অবমাননা করিয়াছেন—হিন্দু জাতির স্বাধীনতার আদর্শের সহিত তাঁহাদের পরিচয় খুব কম বলিয়া মনে হয়। যদি কেহ মনে করেন তিনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতেছেন, তখন তাঁহার ভাবিয়া দেখা উচিত—তখন তাঁহার 'স্ব' কোথায় তাহার অবস্থাই বা কিরূপ; তবে যদি কেহ আত্মশক্তির অনুশীলনের ফলে প্রকৃতপক্ষেই অন্তরের স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিজের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে পারেন, তাহাতে কোনও বাঁধা নাই।

নির্ব্বাচারে শাস্ত্রাচারে অনুসরণ করিয়াই যে হিন্দুজাতি আন্তরিক স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিয়াছে একথাও সঙ্গত মনে হয় না। কারণ নিয়মের অনুবর্ত্তিতায় আন্তরিক স্বাধীনতার উপচয় ব্যতীত অপচয় ঘটে না। আর শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থা গুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, সে সকলের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে, মানুষের আত্মাকে পূর্ব্বোক্তরূপে স্বাধীন করিয়া তোলা। যদি একথা সত্য হয় তবে অন্তরের অধীনতার উপরই বাহ্য অধীনতার প্রতিষ্ঠা। মানুষ অন্তরে অন্তরে যে পরিমাণে স্বাধীনতা লাভ করিতে থাকে, তাহার বাহিরের অধীনতাও ঠিক সেই পরিমাণেই শিথিল হয়। সেজন্য শাস্ত্র এই আন্তরিক স্বাধীনতাকেই উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই হইল শাস্ত্রের সহিত স্বাধীনতার সম্বন্ধ!

উপরে যে স্বাধীনতার কথা বলা হইল তাহাই হিন্দুজাতির স্বাধীনতার চরম আদর্শ নহে। হিন্দু স্বাধীনতার চরম আদর্শ ইহারও একটু উপরে। সে অবস্থায় আত্মা আপনাতে আপনিই পরিপূর্ণ, তখন কেহই তাহাকে অধীন করে না, সেও কাহাকে অধীন করে না, স্থূল সূক্ষ্ম প্রাকৃত রাজ্যের কোন কিছুরই সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না—সে এক অচিন্তনীয় অনাবিল অবাধিত অবস্থা। ইহাই হিন্দু স্বাধীনতার চরম আদর্শ—হিন্দু সাধনার চরম সিদ্ধি—ইহাই হিন্দুর স্বারাজ্য। কিন্তু সে স্বাধীনতার সহিত ব্যাবহারিক জীবনের সম্বন্ধ নাই বলিয়া—ব্যাবহারিক জগতে হিন্দুর যেরূপ স্বাধীনতা, তাহাই উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিজয়া

(শ্রীলীলা দেবী)

"আজ কি বিজয়া?
ঐ যে বাজিছে দূরে সানায়ের সুর
সাজায়ে বরণ-ডালা পরিয়া সিঁদুর
নব রক্তাম্বর বাসে, পরি নব বেশ—
—এল কত পুরবালা——অর্চ্চনার শেষ,—
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ, ঝঙ্কারি' কঙ্কণ,—
বিজয়ার কোলাকুলি প্রেম আলিঙ্গন!
এল যে বিজয়া!
ওরে রিক্ত সর্ব্বহারা তোরে চায় হিয়া!

"এ আনন্দে নাহি মোর ভাগ!
আমি অভাগিনী মোর ব্যর্থ অনুরাগ!
এই সানায়ের সুরে এই শান্তিজলে
এই স্নেহ আলিঙ্গনে পূর্ণ-কুম্ভ-তলে
এই কদলীর ছায়ে আম্রের শাখায়—
—সাজায়ে তোরণ দ্বার, কেন ডাকো হায়!
রহিব আঁধার কোণে লুকায়ে নীরবে
বাজুক্ বাজনা, দিক্ উলুধ্বনি সবে!

দন্ত রুচি কৌমুদী

(শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী বি, এ)

বাবু ও বালক

বাবু। কি হে ছোকরা! চুল আঁচড়াওনি কেন?

বা। চিরুণী নেই

বাবু। তোমার নেই—তোমার বাপের আছে ত।

বা। বাবার চুল নেই।

ভয়ার্ত্ত আরোহী ও মাঝি

আ। ওরে বাবা মাঝি! ঢেউয়ে প্রাণটা গেল যে।

মা। আর এই বাঁকটা গেলিই, ঠাণ্ডা হবিনি কর্ত্তা।

আ। তার আগেই ঠাণ্ডা হবে।

পাদরি ও মাতাল

পা। (মদে আবিষ্ট মাতালকে) ওহে শুনচো—

মা। আর শোনা শুনিতে দরকার নেই বাবা—এই নাও এক গ্লাস।

বাবু ও চাকর

বা। ওরে হরে! জলটা এত কালো কেন? —কি ঢেলেছিস?

চা। আগ্‌গ্যা না বর্‌তা, কিছুছুই ডালি নাই—তবে গে কালাছাদ বাবু চেনান্ কোরছিল।

বাঙ্গালী সাহেব ও বালক

গল্লী-পথে

বালক। ও ভাই—ছাহেব আছ্‌চে। চল ছ্কাই দেখি গিয়ে।—(নিকটে গিয়া) আছ্‌তে হবে না—ছাহেব না, ছাহেব না—ছেজেছে।

বিদ্যালয়

আংচুরি মোকদ্দমা।

শি। আমি জানতে চাই Ringleader (দলপতি) কে? নির্ম্মল, তুমি কিছু কোরেছিলে?

নি। আমি?—না—Sir—আমি খালি আঁবটা নিয়েছিলুম।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও খোদাইকারক

প্র। এই যে বেশ পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে inscriptionটা। উঃ কত কাল কেটে গেছে তবুও অক্ষর গুলো ঠিক তেমনিই আছে!

খো। (সানন্দে)—কর্‌তা, অই ল্যাংড়া মুই লেখ্‌ছিলাম।

শিক্ষক ও বালক

শি। সবাই মা-বাপের কথা শুনবে।

বা। মার কথা?—আমি ও শুনি বাবাও শোনে Sir।

দার্শনিক ও স্ত্রী

দা। জগৎ মায়াময়—কেউ কারো নয়—স্ত্রী পুত্র পরিবার কিছু নয়—কেউ না।

স্ত্রী (সরোষে)। কি আমি কেউ না—আচ্ছা চল্লুম আমি—তুমি রেঁধে বেড়ে খেও।

দা (সচকিতে)। আরে না—না—ও সব কেতাবি—কেতাবি কথা।

কবি ও কেরাণী

ক। (গৃহমধ্যে সুখাসনে)—ঝর ঝর করে বাদল ধারা—বাঃ আজকের দিনটা কি সুন্দর!

কে। (বর্দ্ধমান পথে)—উঃ শা—বড় কি রে।

সিদ্ধি

(গল্প)

(শ্রীনিশিকান্ত সেন)

শ্রীমন্ত শুধু ছবিই আঁকত, আর দিনরাত ঐ ছবির কথাই ভাবত, আর কোনোদিকে তার খেয়াল ছিল না। কাজেই চাল তার ফুটো হয়ে জল পড়ত, কাপড় তার ময়লা হয়ে ছিঁড়ে যেত, পেটের ভাত কোনো দিন জুটত, কোনো দিন জুটত না। দশদিকে চোখ না থাকলে যে সংসারে সুবিধা করা যায় না, এমন কি ছবিরও যে একটা ব্যবসায়ের দিক আছে, সে জ্ঞান তার আদপেই ছিল না! কাজেই ছবি তার বিকাত খুবই কম, এবং দাম মিলত নামমাত্র। খরিদ্দার দাম দিয়ে মনে করত, দয়া করলুম—কে-ই বা কেনে অমন ছবি পয়সা দিয়ে! আর শিল্পী দাম নিয়ে ভাবত—জলের দরেও এ সংসারে মাণিক বিকোয় হায়রে!

বন্ধুরা বলত, কি করছ মাথামুণ্ডু! ওতে কিছু হবে না। হবার হলে কোন্‌ দিন তা হয়ে যেত, আর কিছু করো। আত্মীয়েরা বল্‌ত, চাকরী করতে না পারো, মুদিখানার দোকান করো—আর কিছু না হোক, পেটের ভাতটাও জুটুক।

শ্রীমন্ত বলত, হাঁ—একটা কিছু করতে হবে বই কি, না করলে আর চলে কই?—কিন্তু ঐ বলা অবধিই, কাজের বেলায় যে-কে-সেই—বন্ধু বান্ধবদেরও পেছন-ফেরা, আর তারও রঙ্ আর তুলি নিয়ে বসা। এক কথায় ভূতে যেমন মানুষকে পেয়ে বসে, ছবিও তেমনি তাকে আঁকড়া করে পেয়ে বসেছিল।

সবাই তার আশা ছেড়ে দিলে, আশা ছাড়তে পারলে না, শুধু তার স্ত্রী হৈমবতী। সে ধৈর্য্য ধরে প্রতীক্ষা করে রইল; একটা কিছু ধরে থাকলে একদিন-না-একদিন সুরাহা না হয়ে যায় না, এই ছিল তার বিশ্বাস। স্বামীর সেবা নিয়ে সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মুখ বুজে পড়ে রইল। হয়তো বা জীবনের সবক'টা দিনও অমনি করে পড়ে থাকতে পারত; যদি না হঠাৎ একদিন তার মনে হত যে, সে নিরাশ্রয়; ভাত-কাপড়-তো কোনদিন জুটলই না, তার ওপর স্বামীর যে ভালবাসার ওপর নির্ভর করে, সে সংসারে মাথা গুঁজে পড়ে আছে, সে ভালবাসার ভর্সাটুকুও বুঝি আর তার থাকে না।

দশজনে স্বামীকে যেমন করে পায়, সে তো তেমন করে স্বামীকে কোনো দিনই পায় নি, তবু অন্ততঃ রাত্রে বিছানায় শুয়েও তার সঙ্গে দুটো সুখদুঃখের কথা হয়েছে, কিন্তু কিছুদিন ধরে যে সেও একদম বন্ধ! খাবার সময় ডাকাডাকি করে গলা না ভাঙলে ছবির কাছ থেকে উঠে আসে না। তারপর অনিচ্ছায় দুটো মুখে দিয়েই আবার—দে ছুট। রাত্রে উঠে আসে কখন?—যখন চোখ-ভরা ঘুম, আর দেহ-ভরা ক্লান্তি, বিছানায় এসে পড়তে-না-পড়তেই বেহুঁস—ঢাকঢোল পিটলেও আর তাকে জাগাবার জো থাকে না।

শ্রীমন্ত কি করছে-না-করছে, সে খোঁজ হৈম কোনো দিনই রাখত না। সে প্রতিদিন ভোরে স্বামী ঘুম থেকে ওঠবার আগে একবার করে ছবিগুলি নেড়ে চেড়ে বাইরের ঘরখানি ঝাঁট দিয়ে আসত। যেদিন কোনো গতিকে শ্রীমন্তর আগে হৈমর বিছানা থেকে ওঠা না হত, সেদিন তার

ওদিকে যাবার দরকারও হত না। কেন না, সে জানত, স্বামী একবার ছবি নিয়ে বস্‌লে কারো সাধ্য নেই যে তাকে এতটুকু নড়ে বসায়। এত দিন তার এ বিশ্বাসও ছিল যে, স্বামী আছে ছবি নিয়ে—নিজের খোশ-খেয়ালে, তার জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই। কিন্তু স্বামীর ভাবান্তর যেদিন বিশেষ করে তাকে সজাগ করে তুল্‌লে, সেদিন আর ঘরের কাজ নিয়ে সে নিশ্চিন্ত বসে থাকতে পার্‌লে না।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে চুপি চুপি স্বামীর খোঁজ নিতে লাগ্‌ল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জনমানব কেউ নেই তার কাছে; শুধু একখানি ছবি আর সে মুখোমুখী বসে! শ্রীমন্তের হাতে রঙের তুলি; আঁকা এখনো শেষ হয় নি; একবার তুলি দিয়ে লেখে, আর একবার ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে। কখনো তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, কখনো গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে, কখনো বা বিড়্‌বিড়্‌ করে কি যে বকে তার ঠিক নেই। যতবার হৈম খোঁজ নিলে, আর নূতন কিছু তার চোখে পড়ল না; সে শুধু দেখ্‌লে, স্বামীর চোখ ঐ ছবির মুখের দিকে—আর ছবির চোখ স্বামীর মুখের দিকে। ছবি—শুধুই ছবি—রক্তমাংসের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই, তবু তার জন্যে একটা মর্ম্মান্তিক ঈর্ষার ভাব তার প্রাণে জেগে উঠল, আর সে নিষ্ফল আক্রোশে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল!—নিশ্চল,নির্ব্বাক্, পটের আঁকা সামান্য একখানা ছবি, কেমন করে তার স্বামীর সমস্ত মন দখল করে আছে! আর এত সেবা এত যত্ন নিয়েও সে স্রোতের তৃণের মতো অকূলে ভেসে চল্‌ল কোথাও বস্‌বার এতটুকু ঠাঁই পেলে না!

পরদিন হৈম নিয়ম মতো শ্রীমন্তর ঘুম ভাঙ্‌বার আগেই বাইরের সেই ঘরখানি ঝাঁট দিচ্ছিল। ঝাঁট দেবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না; কিন্তু ছবির ওপর রাগ করে ঘরঝাঁট না-দেওয়াও যে বড্ড ছেলে-মানুষী। তাই সে না এসে থাক্‌তে পারে নি। কিন্তু কাজে তার তার মন ছিল না। রঙের একটি বাটি হঠাৎ হাতড়সুকে পড়ে গেল একখানি ছবির উপর। হৈম প্রথমটা আঁৎকে উঠ্‌লে, কিন্তু তারপরেই অবাক হয়ে দেখ্‌লে, এ সেই নূতন ছবি—যা নিয়ে শ্রীমন্ত কিছুকাল ধরে একেবারে উন্মত্ত হয়ে রয়েছে। ছবিখানা আলোর কাছে তুলে ধরতেই চোখে পড়ল, একটা মস্তবড় দাগ একটা অদ্ভুত বিকট আকার রাক্ষসের রূপ ধরে যেন ছবির মুখখানাকে গ্রাস করেছে। এতটুকু হাসির আভাসও কোনো যার থেকে দেখা যাচ্ছে না! হৈমর মুখখানি একটা অজ্ঞাত তৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মুখ তুলে চাইতেই সে চমকে আড়ষ্ট হয়ে গেল। শ্রীমন্ত তার মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে! তার ঐ স্তব্ধতার মধ্যে যে গভীর দুঃখ ও তিরস্কারের ব্যঞ্জনা ছিল, তার আঘাত হৈমকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুল্‌ল, কম্পিতহস্তে ছবিটি মাটিতে নামিয়ে রেখে সে বল্‌বার চেষ্টা করলে, হঠাৎ হয়ে গেছে—রঙের বাটি হাত থেকে পড়ে গিয়ে।

শ্রীমন্ত ছবির মুখে মাটিতে বসে পড়ে বল্‌লে, কি সর্ব্বনাশ যে তুমি আমার করেছ, সে তোমাকে আমি বলেও বোঝাতে পার্‌ব না।

মৃদু অথচ বিদ্রোহপূর্ণ কণ্ঠে হৈম বল্‌লে, সামান্য একখানা ছবি!

সামান্য!—ক্রোধে অভিমানে শ্রীমন্তের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সে বল্‌লে, তুমি যাকে বল্‌ছ সামান্য, সে আমার কাছে অমূল্য—এমন কি, প্রাণের চেয়েও বেশি দরদের জিনিস, তা জান?

একটু নরম হয়ে হৈম বল্‌লে, কিন্তু তুমি কি ইচ্ছা কর্‌লেই আর একখানা ছবি আঁকতে পারো না—ঠিক এমনি ধারা?

উত্তেজিতভাবে শ্রীমন্ত বল্‌লে, না—পারি নে।

এক একখানা ভাল ছবির জন্যে যে প্রাণের কতখানি রক্ত বার করে দিতে হয়, সে আমিই জানি। দ্যাখো, আজ থেকে তোমাকে আমি মানা করে দিচ্ছি—আমার ছবির ঘর ঝাঁট দিতে। দিতে হয় ঝাঁট—আমিই দিয়ে নোব—যখন হয়। ছবির ওপর যার এতটুকু মমতা-বোধ নেই, তাকে তো আমি আমার ছবির ঘরে ঢুকতে দিতে পারিনে।

মুহূর্ত্তে হৈমর মনটা লোহার মত শক্ত হয়ে গেল।—কোথায় থাকত এই ছবি, আর এই ছবির এত আদর সোহাগ! যদি সে নিজের হাতে শ্রীমন্তর সেবার ভার তুলে না নিত, যদি সংসারের সকল আলা নিজের বুক দিয়ে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করত না।—তার এই পুরস্কার! কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হৈম বল্‌লে, শুধু ছবির ঘর ঝাঁট দেওয়া নয়—আজ থেকে তোমার সেরস্তানীর কোনো কাজেই আর আমি হাত দিতে চাইনে। তোমার প্রাণের চেয়েও বড় দরদের যে ছবি, সেই ছবিই তোমাকে খাওয়াবে পরাবে—সব করবে। আজ থেকে তোমার আপদ বিদায়!—বলে হৈম পেছন ফিরলে।

শ্রীমন্ত বুঝ্‌লে, হৈম রাগ করে বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছে। ডেকে ফেরাবার চেষ্টা করলে যে তাকে সে ফেরাতে পারত, তা ঠিক। কিন্তু হৈমর কথা শুনে তার মনে হয়েছিল যে, ঘরের স্ত্রীও আজ আর তার স্ত্রী নয়—বাইরের স্নেহ-সহানুভূতিহীন দশ জনেরই এক জন। নইলে প্রাণের রক্ত দিয়ে যে ছবিকে সে সঞ্জীবিত করে তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, তার ওপর হৈম এমন করে বিরূপ হয়ে উঠ্‌ত না। তাই হাতে গড়া এই অসহনীয় দুঃখ দৈন্যের মধ্যে হৈমকে ধরে রাখ্‌বার অধিকার আজ আর শ্রীমন্তের নেই।

সে তুলি ধর্‌লে, একদিন—দুদিন—তিনদিন অনাহারে অনিদ্রায় তার তুলির লেখা চল্‌ল। নষ্ট ছবি উদ্ধার না করে আর অন্য কাজ নেই—এই ছিল তার পণ। দিন আর রাতের প্রভেদ সে বুঝ্‌ত, শুধু আলো আর অন্ধকারে। তাও আবার সব সময়ে নয়, কোনো কোনো দিন বেলা দেড় প্রহরে বাইরের দিকে চেয়ে তার হুঁশ হত যে, রাত নেই—আলোটা নিবিয়ে দেওয়া দরকার।

শ্রীমন্তের অদৃষ্টের অচল চক্রটা অবশেষে সত্যসত্যই সচল হয়ে উঠেছিল—সমস্ত দেশ একদিন তার গুণগানে মুখর হয়ে উঠ্‌ল। রাজা প্রজা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলে যে, এত বড় শিল্পী তাদের দেশে জন্মায় নি, আর কখনো জন্মাবে কি না সন্দেহ। তার হাতের সব চেয়ে যে নিরেস—ছবি, তার ভেতর থেকেও লোকেরা সব অদ্ভুত গুণপণার নিদর্শন বার করতে লাগ্‌ল।

এই রকম অসম্ভব সম্ভব হওয়ার সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে থাকে। কেউ কেউ বলে, শেষের যে ছবিখানা শিল্পী প্রাণের রক্ত দিয়ে এঁকেছিল, তাতেই তার নামে জয়-জয়কার পড়ে যায়; সকলেই তার গুণে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু বেশীরভাগ লোকই এই সঙ্গে একটি আশ্চর্য্য গল্পেরও উল্লেখ করে থাকে; সে গল্পটি হচ্ছে এই;—

শ্রীমন্ত যখন ছবি নিয়ে বড্ড মেতে উঠেছিল—বাহ্যজ্ঞান এক রকম হারা হয়েছিল বল্‌লেও চলে, তখন কে তাকে ডাক্‌লে,—শিল্পী! শিল্পী!

আধ ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ যেমন করে সাড়া দেয়, তেমনি করে শ্রীমন্ত সাড়া দিলে, কে—কে ও?

আগন্তুক বল্‌লে, রাজার পারিষদ্ আমি।

শ্রীমন্ত বিশ্বাস করতে পারলে না, দুনিয়ায় তাকে ঠাট্টা করবার লোকের অভাব ছিল না। বিকারের রোগীর মতো হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লে, কি মনে করে? মহারাজের পারিষদ্‌বর্গের

জন্যে কোনো যোগ্য লোকের দরকার হয়েছে কি?—বলে অভ্যর্থনার সম্বল একখানা ভাঙা চৌকি অগ্রসর করে দিয়ে মুখের দিকে চাইতেই শ্রীমন্ত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। এমন মূর্ত্তি চর্ম্মচক্ষে সে আর কখনো দেখেনি।

আগন্তুক স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, মহারাজ সত্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, শিল্পী! তোমার ছবি দেখে মন তার ভুলে গেছে।

হাত জোড় করে শ্রীমন্ত বললে, আপনার কথা আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু কোনো ক্ষুদ্র প্রজারও এ অধমের ছবিতে মন ভুলেছে, আমি শুনিনি।

আগন্তুক বললে, গুণীর গুণ গুণীই বুঝেন। মহারাজ আমাদের গুণী—গুণজ্ঞ তোমাকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। তুমি হবে তাঁর রাজসভার প্রধান চিত্রশিল্পী।

শ্রীমন্ত বিস্মিত হয়ে বললে, রাজসভার প্রধান চিত্রশিল্পী! সে কি কাজ! কতবড় কাজ!—আমি কিছুই জানিনে তো—সে কাজ আমি পারব কি দূত মহাশয়?

আগন্তুক বললে, খুব পারবে। মহারাজ তোমার ছবি দেখে বলেছেন, এর এক-একটা রঙার টানে রূপ-সাগরে তুফান জাগে, অরূপের আঁধার থেকে রূপের কমল ঝলকে ওঠে।

শ্রীমন্ত সবিনয়ে বললে, তবু কি কাজ আমায় করতে হবে, শুনতে পাইনে কি একটিবার?

আগন্তুক বললে, কাজ এই ছবি আঁকাই, তার বেশি আর কিছু নয়—তবে মহারাজ যেমন যেমন বলবেন, তেমনি।

শিউরে উঠে শ্রীমন্ত বললে, বাপরে হুকুমের ছবি! সে ছবি মানুষে কি করে আঁকে, আমি বলতে পারিনে।

অত্যন্ত হাল্কাভাবে আগন্তুক বললে, কেন পারবে না? যারা তোমার চেলারও যোগ্য নয়, তারাও যে এ কাজ হাসতে হাসতে করছে। হাজার হাজার টাকা এক একখানা ছবির পারিশ্রমিক—তা ছাড়া পুরস্কার।

কপালে হাত ঠেকিয়ে শ্রীমন্ত বললে, নমস্কার! নমস্কার! ও-সব পারিশ্রমিক আর পুরস্কার আমার ভাগ্যে নেই, আপনি অন্যত্র অন্য লোকের সন্ধান করুন!—বলে শ্রীমন্ত তার ছবির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলে! বসতেই চোখ তার ঝাপসে গেল—ছবি কই!—এ যে রঙের আগুন! জগতে যত রকম রঙ আছে—লাল, নীল, সবুজ আদি করে—সব যেন জ্বলে প্রদীপ্ত হয়ে উঠে রূপের একটা অকলঙ্ক শুভ্র শিখায় পরিণত হয়ে বলছে, আমি সিদ্ধি, আমি আনন্দরূপ, আমি অমৃত।

শ্রীমন্ত স্থির হয়ে থাকতে পারলে না—এতকাল ধরে তার অন্তরের যে আগুন, সৃষ্টির সহস্রদলে প্রকাশিত হবার জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি করছিল, সে যেন আজ ঐ রূপশিখায় আত্মাহুতি দেবার জন্যে সানন্দে বাহুবিস্তার করলে।

পরদিন দেখা গেল, শ্রীমন্ত তার পটের আঁকা ছবির তলায় পড়ে আছে—প্রাণহীন নিশ্চল, কিন্তু ছবি তার জীবন্ত।

মৃত্যুর দান

(শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন কবিরত্ন)

কালিন্দীর কাল জলে স্নান করি সন্ধ্যা-বধূ ধীরে
আগ্রার প্রাসাদদ্বারে মৃত্যুরে বন্দিছে নত শিরে।
মহান অতিথি দ্বারে, করে ল'য়ে মুক্তির কল্যাণ।
মুমূর্ষু সম্রাট-আঁখি পেয়ে কোন্ অমৃত-সন্ধান
অপলক বিস্ফারিত! দূরে অই প্রেমের মর্ম্মর—
তাজমহলের ছবি, ভরে দিছে বুঝিবা অন্তর
মৃত্যুস্পর্শে সুধারাশি; ভাঙি মৌন সমাধির ধ্যান
প্রেম-প্রতিমার কণ্ঠে ফুটে উঠে মিলনের গান;
মৌন হয়ে শুনে বুঝি মুগ্ধ আজ দুটী কর্ণ তার,
করুণ রোদন-ধ্বনি নাহি পশে দুখিনী কন্যার।
দুখ তপ্ত দেহখানি— জুড়াইতে ঝরি অশ্রুধার
পারেনি নিবাতে জ্বালা, ধ্যানে পেয়ে সুস্পর্শ কার।
তনু তাঁর নিরুক্ত শীতল, এ পারের প্রেমখেলা
দুঃস্বপন জীবনের ভেঙ্গে দিয়ে এই সন্ধ্যাবেলা
দূরযাত্রী, মৃত্যু দেয় পথ পরিচয়; জ্যোতি-লেখা
উজল করিছে পথ, ও পারেতে ঐ যায় দেখা
চিরমিলনের হাট, বিকায়না সেথা অবমান।
মৃত্যু আজ সাজাইনে কি অমৃত করিয়াছে দান।

"সেকেলে বঙ্কিম"

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

বঙ্কিম নাকি সেকেলে হয়ে পড়েছেন?

একেলেদের মুখে এমনি গুজব প্রায়ই শোনা যাচ্ছে।

'একেলে' ব'লে সেকালের বাগজে বঙ্কিমের ভারি বদনাম ছিল। আবার একেলেরা দেখছি 'সেকেলে' ব'লে বঙ্কিমকে রীতিমত নস্যাৎ ক'রে দিতে চান। বঙ্কিম তবে কোন্ কালের লোক?

'সেকেলে' মানে কি? যা অচল। সত্যিই কি বঙ্কিম অচল? এই প্রশ্নই আজ আমার মনে উঠছে।

মুরুব্বিরা বলছেন, এ-যুগের উপরে বঙ্কিমের আর কোনই প্রভাব নেই—না ভাষায়, না ভাবে!

কিন্তু সাহিত্যের আসরে এ-রকম একতরফা ডিক্রীজারি করলে তো চলবে না! কথাটার প্রমাণ চাই!···জনসাধারণের তরফ থেকে দেখা যাক্। সাধারণের মন পরখ করবার সব-চেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে, রঙ্গালয়। কিন্তু সেখানে গেলে দেখি, মাইকেল, দীনবন্ধু ও রাজকৃষ্ণ রায় প্রকৃতির অধিকাংশ বইই সেকেলে ব'লে অচল হয়ে পড়লেও বঙ্কিমের সমস্ত বইই এখনো খুব দেশীরকমই চলছে। তবে কি ক'রে বঙ্কিমকে সেকেলে বলি? পুস্তকালয়ে খবর নিলেও দেখ্‌বেন, অধিকাংশ বিখ্যাত 'একেলে'র মত এখনো বঙ্কিমের বই পোকার ফলারে পরিণত হয় নি।

তার পর ভাষা। আপাততঃ সব-চেয়ে একেলে নামজাদা ঔপন্যাসিক হচ্ছেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর ভাষার সঙ্গেই মিলিয়ে দেখা

যাক্, বঙ্কিমের ভাষার ক্ষেত্র ছাড়িয়ে তিনি কতখানি এগিয়ে আস্‌তে পেরেছেন। দু-চার পংক্তি নমুনা দিলেই কথাটা বেশ বোঝা যাবে।

"সীতারামে"র আরম্ভ :—

"পূর্ব্বকালে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম "ভূষ্‌ণো"।··· প্রায় এক শত আশী বৎসর পূর্ব্বে একদিন রাত্রি শেষে ভূষণা নগরের একটী সরু গলির ভিতর, পথের উপর একজন মুসলমান ফকির শুইয়াছিল। ফকির আড় হইয়া একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে" প্রভৃতি।

"চরিত্রহীনে"র আরম্ভ :—

"পশ্চিমের একটা বড় সহরে এই সময়টায় শীত পড়ি-পড়ি করিতেছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণের এক চেলা কি একটা সৎ-কর্ম্মের সাহায্য কল্পে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে এই সহরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারই বক্তৃতা-সভায় উপেন্দ্রকে সভাপতি হইতে হইবে এবং তৎপদ-মর্য্যাদানুসারে যাহা কর্ত্তব্য তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে" প্রভৃতি।

আপনারা বলুন, এই দুই ভাষার ভিতরে কত-টুকু ফাৎ আছে?

অতএব যাঁরা বঙ্কিমকে 'হেড ফ্যালে'র দলে ভর্ত্তি করতে চান, তাঁদের কথা হয় ভুল, নয় মিথ্যা।

সাহিত্যিক আসরে ও আলোচনা-সভায় এমন ঢের অপোগণ্ডকেও দেখেছি, যারা বঙ্কিমের প্রতিভার বিপুলতা সম্বন্ধেও সন্দিহান। আজকাল জাতি ও সমাজের ভিতরে অনেক নূতন সমস্যা মাথা-চাগাড় দিয়েছে, একালের ঢের চের বামন লেখকের লেখাতেও তার ছাপ পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্কিমের জীবন-কালে সে-সব সমস্যা ওঠে-নি, কাজে কাজেই তাঁর লেখাতেও সে-সবের ছাপ পাওয়া যায় না। সুতরাং একেলে লেখকরা বঙ্কিম যা বলেন নি, এমন অনেক নূতন ভাবের কথা বল্‌তে পারছেন। তাই ব'লে তাঁদের শক্তি বা প্রতিভাকে বঙ্কিমের চেয়ে বড় মনে করবার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। কেন না, একেলে লেখকদের এই নূতনত্বের জন্ম ব্যক্তিগত প্রতিভার জন্যে নয়—কেবলমাত্র পরিবর্ত্তিত যুগধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রভাবের জন্যে। বঙ্কিমও বেঁচে থাক্‌লে এখানে পিছিয়ে থাকতেন না—কারণ এগিয়ে যাওয়াই প্রতিভার স্বধর্ম্ম। বিলাতের বর্ত্তমান সমস্যার আলোচনা সেখানকার অনেক চুনোপুঁটি-জাতীয় লেখকেরও রচনায় দেখা যায়। কিন্তু সেক্সপিয়ার তা নিয়ে কিছু বলেন নি ব'লে তাঁকে কি ঐ চুনোপুঁটিদের চেয়েও নীচের ক্লাসে নামিয়ে দিতে হবে?

মোট কথা, এক যুগের প্রতিভাবানের সঙ্গে আর এক যুগের প্রতিভাবানের তুলনা করাই ভুল —কারণ, এমন তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবিচার হবারই সম্ভাবনা বেশী। তবে নানা যুগের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার দাম যাচাই হবে কি ক'রে? তারও আলাদা উপায় আছে।

ভিন্ন ভিন্ন যুগ-হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার বিচার। আলোচ্য প্রতিভাবান যে-যুগে জন্মেছেন, দেখ্‌তে হবে সেই যুগের সাধারণ গণ্ডী ছাড়িয়ে তিনি কতটা বেশী অগ্রসর হ'তে পেরেছেন? এ-ভাবে বিচার করলেই দেখ্‌বেন, বঙ্কিম তাঁর যুগের সাধারণ আবহাওয়া ছাড়িয়ে যতটা বেশী এগিয়ে গিয়েছেন, বাংলা দেশে সেই অগ্রগতির সম-যোগ্য দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত একমাত্র রবীন্দ্রনাথ!

কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের মত আর দ্বিতীয় প্রতিভার জন্ম এ-দেশে হয়-নি। তাঁর পরে রবীন্দ্র-নাথও বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ ও ভাব-প্রকাশের শক্তি অনেক বিচিত্র ক'রে তুলেছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু বঙ্কিমের দৌলতে রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে যেমন হাতের কাছে তৈরি অবস্থায় পেয়েছিলেন—বঙ্কিমের ভাগ্যে সে সুযোগ আসে নি, তাঁকে শুক্‌নো গাছকে

ছাঁচিয়ে ফলে-ফুলে-শ্যামলতায় অপূর্ব্ব ক'রে তুল্‌তে হয়েছিল

সংপ্রতি "নব্যভারতে" রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই ব'লেছেন যে, "বাল্যকাল আমাদের পার হয়ে গেল যেই, যৌবনের বার্ত্তাটি এসে পৌঁছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। তার আগে আমরা সকলে দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা ছিলুম ইস্কুলের ছেলে। বঙ্কিম বললেন, তোমরা ইস্কুলের ছেলে নও তোমাদের বয়স হয়েছে।·····দেশশুদ্ধ লোককে এই বলাটা এবং তাদের এইটেই আমার কাছে মনে হয় বঙ্কিমের সকলের চেয়ে বড় কীর্ত্তি। একেই বলে সোনার কাঠি ছোঁওয়ানো।" বাংলা ভাষায় এই জাগরণ যে কত বড় বিরাট ব্যাপার আমরাও তার কিছু কিছু ইঙ্গিত এখানে দিচ্ছি।

বঙ্কিমের কিছুকাল আগে বাংলা ভাষার আকার ছিল কি-রকম? তার দু-চারটে নমুনা।

"ওরে মূর্খ, কর্ম্মজড়, কূপমণ্ডূক, উড়ুঘর, মশক, অন্ধুপদেশ দুরাগ্রহ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিস্।" (প্রবোধ চন্দ্রিকা)

"মলয়াচলানিল উচ্ছলকরত্যুচ্ছনিঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

'জল না পাওনেতে বিব্রত জল অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল, এক রমাস্থল, কিন্তু জল নিকটের মধ্যে দেখেন না।" (লিপিমালা)

"পতিতেতা ছাত্র সমভিব্যাহৃত" প্রভৃতি। (কৃষ্ণ-চন্দ্র চরিত)

প্রতাপাদিত্য-চরিত, রাজাবলী ও হিতোপদেশ প্রভৃতির ভাষাও অল্পবিস্তর পরিমাণে ঐ-জাতীয়।

বঙ্কিম-গুরু ঈশ্বরগুপ্তের গদ্যের নমুনা :—

১। কেন না এই কালে নব নব নয়নরঞ্জন গন্ধ-মদরী-মণ্ডলমণ্ডিত নব নব সুচারু সুন্দর সুরভি-যুক্ত ফুলদল।

২। এই চিত্র চিত্র কোন্ চিত্রে কি চিত্র করিয়াছে? এ চিত্র, এ চিত্র, কি চিত্র! অতি বিচিত্র! যিনি ইহাঁর কারক তাঁহার কি আশ্চর্য্য চিত্রশক্তি!

৩। রে মন! পরম পুরুষের পবিত্র প্রেম-পুষ্পের আমোদের আঘ্রাণ একবার নে রে; এক-বার নে রে; ওরে মন! ভূতনাথকে একবার দেখ্ রে, একবার দেখ্ রে; মন রে মন রে শোন্ রে, শোন্ রে; ও মন!·····তাঁর প্রেমরস চাক রে চাক রে, চাক রে! (এ হচ্ছে বাল্য পাঠ্য পুস্তকের ভাষা।)

বঙ্কিমের সাহিত্য-শিক্ষা সুরু হয়েছিল, এমনি সব অপূর্ব্ব ভাষা থেকে। কিন্তু যে ভাষায় তিনি নিজে বাঙালীর সাহিত্যকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে গেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন অদেশের। কত-বড় প্রতিভা থাক্‌লে এ হেন ইন্দ্রজাল সম্ভব হয়, আপনারাই তা বিচার ক'রে দেখুন। সেকেলে ভাষার যে নমুনা আমরা তুলেছি, একালের পক্ষে তা পাগলের প্রলাপ। কিন্তু বঙ্কিমের ভাষা একে-বারে আজ-কালের ভাষা। বরং তাঁর ভাষা যতটা সোজা, যতটা ঘরোয়া, একালেরও অনেক নামজাদা লিখিয়ের ভাষা ততটা নয়। একটু নমুনা :—

"এই সংসারে একটি শব্দ সর্ব্বদা শুনিতে পাই —"অমুক বড় লোক—অমুক ছোট লোক।" এটি কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্যগুলি মনুষ্যমণ্ডলীর কার্য্যের একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড় লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই তাঁহাকে উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দ-রত্নগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া হার গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাও, কেন না, তিনি বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অনুগ্রহায় কণ্টকটি পথে পড়িয়া আছে, উহা যত্ন সহকারে সরাইয়া উঠাইয়া রাখ— ঐ বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি, যদি তাঁহার পায়ে ফুটে! এই জীবন-পথের ছায়া-স্নিগ্ধ পার্শ্ব ছাড়িয়া রৌদ্রে দাঁড়াও, বড় লোক যাইতেছেন। সংসারের আনন্দ-কুসুম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন

করিয়া শয্যা রচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি—তুমি বড় লোক নহ—তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর ভাল সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়, কেবল এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য—বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।"

আর এক টুক্‌রো নমুনা :—

"তুমি গ্রাহ্য কর না কর, তাই বলিয়া ত জড় প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রহে না! তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দাও না কেন,—জল-নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না,—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না—তারা তেমনি জ্বলে, তীরে বৃক্ষ তেমনই দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনই খেলে। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য! স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, সকল সময়েই আদর করিতে চায়।"

নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই মানতে হবে যে, এমন ভাষা একালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকের কলম থেকে বেরুলেও তা প্রশংসনীয় হ'ত। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার আর ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার গণ্ডী ছাড়িয়ে বঙ্কিম যতটা এগিয়ে গিয়েছেন, বঙ্কিমের ভাষার আওতা ছাড়িয়ে তাঁর পরযুগের কোন লেখকই ততটা এগুতে পারেন নি। আমরা "হচ্ছে যাচ্ছে" লিখে আর বানানে নূতনত্ব দেখিয়েও বঙ্কিমের নিজের হাতে-গড়া বাংলা ভাষাকে বিশেষ কিছু বদ্‌লে দিতে পারি নি। সামান্য যা প্রভেদ চোখে পড়ে, তা ব্যক্তিগত রচনা-ভঙ্গীর প্রভেদ মাত্র। বঙ্কিম যে নূতন কাঠামো গড়েছিলেন, তা এখনো তেম্‌নি আছে—নূতন কাঠামো গড়বার প্রতিভা আর কারুর ভিতরে দেখ্‌লুম না! এখন আমরা অনেকে চল্‌তি ভাষায় লেখবার জন্যে আন্দোলন করি বটে, কিন্তু এ আন্দোলনেও বঙ্কিম 'সেকেলে' হয়ে পড়েন নি। তাঁর মুখেই এ-সম্বন্ধে আমরা প্রথম উপদেশ পেয়েছি। তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন :—"অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেননা, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা, আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। "সে ভ্রাতৃ" বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; "ভাইরে" বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে।"—সুতরাং দেখাই যাচ্ছে, ভাষা নিয়েও বঙ্কিমের পরে আমরা বড় বেশী নূতন কিছু বল্‌তে পারি নি, বরং বেশীরভাগ লেখকই এখনো বঙ্কিমের ভাষাতেই লিখছেন। নীচের লাইন ক'টি বঙ্কিমের মত সোজা ভাষায় এ-যুগেরও অধিকাংশ লেখক লিখতে পারবেন না :—

"আমি রামধনের চৌকিদারে চৌকির উপর বসিয়াছিলাম—উঠানে একটা যেণ্ড কুকুর পড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারি নাই—সেইখান হইতেই রামধনের বংশাবলীর পরিচয় পাইতেছিলাম। রামধন একটি একটি করিয়া দেখাইল যে, তাহার চারিটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে, একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে বাকি আছে—পোদলজেতের ছেলের বিয়েতেও কড়ির খরচ, মেয়ের বিয়েতেও বটে, তবে কম" প্রভৃতি। এর পরেও কি কেউ বল্‌তে চাইবেন যে, বঙ্কিম 'সেকেলে'? সাহিত্যের মধ্যে ভাষাই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ এবং এইখানেই বঙ্কিম-প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। এখানে বঙ্কিমের প্রতিভা আর একলের প্রতিভাকে ছাড়িয়ে উঠেছে—কেন না যার বাড়া আর কথা নেই, তিনি আমাদের সেই ভাব ও ভাষা দিয়েছেন। আজ তাঁর ভাষাতেই লোক তাঁর প্রতিভাকে খেলো বল্‌তে চাইছে! এ হচ্ছে দাস-জাতির কৃতজ্ঞতা!

মৌলিকতা যে প্রতিভার সব-চেয়ে বড় লক্ষণ, এ নিয়ে আর দ্বিমত নেই। নব নব সৃষ্টিতেও বাঙ্গার গদ্য-সাহিত্যে বঙ্কিম এখনো অদ্বিতীয়, বঙ্কিমকে খাটো করবার আগে এ-কথাটা আমরা যেন ভুলে না যাই। কেবল ভাব-প্রকাশের উপযোগী ভাষা নয়, সেই সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় তিনিই সর্ব্বপ্রথমে নির্ব্বাচন ক'রে গেছেন। সমালোচনা, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, হাস্য-সাহিত্য, একেলে প্রণালীতে দর্শন ও শাস্ত্র আলোচনা—এমন দিক নেই যেখানে তাঁকে দেখ্‌তে পাই না। আধুনিক আদর্শের মাসিকপত্র "বঙ্গদর্শন"র আগে এদেশে ছিল না। বঙ্কিম যদি একখানি-মাত্র উপন্যাস না লিখতেন, তা হ'লেও বাংলা দেশে আজ তিনি মূল্যহীন হয়ে থাকতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন-সব সহজ সত্য কথাও বাঙালীকে মনে করিয়ে দিতে হয়। দেশে আরো বেশী ভালো লোকের দরকার, বাঙালীর স্মৃতিশক্তির অবস্থা বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছে!

তারপর তাঁর উপন্যাস—সাধারণের কাছে যে-রকে তিনি বেশীরকম পরিচিত। এ-বিষয়ে লম্বা-চওড়া আলোচনা না ক'রে সংক্ষেপে কিছু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে। বাংলা দেশে বঙ্কিম শুধু উপন্যাসের স্রষ্টা নন, প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের সমস্ত গুণই তাঁর ছিল। তাঁর উপন্যাসের 'প্লটে'র বাঁধুনি যে-রকম অপূর্ব্ব, একালের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নামে বিখ্যাত উপন্যাসে তা দেখ্‌তে পাই না। তার পর, যে শক্তি ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠত্বের সর্ব্বপ্রধান নাগকাটি, সেই চরিত্র-সৃষ্টির শক্তিও বঙ্কিমের অসাধারণ। তিনি অসংখ্য নর-নারীর চরিত্র সৃজন করেছেন, কিন্তু কোনটিকেই দেখলে অন্যটিকে মনে পড়ে না। তিলোত্তমা, আয়েষা, বিমলা, মনোরমা, বুদ্ধিমতী, গিরিজায়া, শ্রী, রমা, জয়ন্তী, নন্দা, মুখরা, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, পেশমন, প্রফুল্ল, সাগর, নয়ান-বৌ, নিশি, রজনী, লবঙ্গলতা, ভ্রমর, রোহিনী, হিরণ্ময়ী, সূর্য্যমুখী, কমলমণি, কুন্দনন্দিনী, প্রসন্ন গোয়ালিনী, শৈবলিনী, দলনী, দরিয়া, চঞ্চলকুমারী জোবেউন্নীসা, নির্ম্মলকুমারী, ইন্দিরা, সুভাষিণী, শান্তি প্রভৃতি এমনি আরো অনেক আছে, কত আর নাম করব? এদের একজনও চরিত্রে অন্যের সঙ্গে সমান নয়। পুরুষ চরিত্রেও এমনি বৈচিত্র্য, ফর্দ্দ দিয়ে আর পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই। বাংলা দেশের আর কোন ঔপন্যাসিক এত বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করেন নি। এটা কি বড় যে-সে কথা?

আজকাল 'সাইকলজি' ব'লে একটা কথা নিয়ে কাণের কাছে বড়-বেশী নাড়াচাড়া করা হয়। আমরা জাঁক ক'রে বলি, বঙ্কিম মনোবিজ্ঞান-মূলক উপন্যাস লিখতে পারেন নি, আধুনিক ঔপন্যাসিকরা এইখানেই বঙ্কিমের উপরে টেক্কা মেরেছেন। এ-কথার মানে কি, ভগবান জানেন। 'সাইকলজি' তো সকল শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরই প্রধান অবলম্বন, তা ছাড়া চরিত্র সৃষ্টি অসম্ভব। তবে উপন্যাস আছে দুই শ্রেণীর—ঘটনা-প্রধান ও বিশ্লেষণ-প্রধান। আজকাল দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসেরই চল হয়েছে বেশী। আর-কালকার লেখকরা ঘটনার উপরে তত-বেশী জোর না দিয়ে, ঘটনার মূল যে মন, তার দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়ছেন। প্রথম শ্রেণীর লেখকরা মনের কথা এত সংক্ষিপ্তভাবে বলেন না, তবে তাঁরা এমন কৌশলে ঘটনাবলী সাজান, পড়ুয়ারা যাতে-ক'রে খুব সহজেই ধরতে পারে, মনের কোন্ অবস্থায় মানুষের দ্বারা এ-রকম সব কাজ করা সম্ভব হয়। প্রথম শ্রেণীর বই পড়তে গেলে পড়ুয়াদের একটু মাথা ঘামাতে হয়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর বই পড়বার সময়ে তাঁরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, কারণ পাত্র-পাত্রীর মনের কথা কেতাবেই স্পষ্ট ক'রে লেখা থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তকে এদিকে সুবিধা থাকলেও অন্যদিকে তা অনেকটা একঘেয়ে ও কষ্ট-

পাঠ্য; কিন্তু ঘটনা-প্রধান উপন্যাস পড়তে বেশী ভালো লাগে।

বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস ঘটনা-প্রধান। কিন্তু বিশ্লেষণ-প্রধান উপন্যাস আধুনিক ব'লেই যে তা শ্রেষ্ঠ, এমন কথাই বা ভাবব কেন? তাহ'লে আর আর লেখকের কথা দূরে থাক্, স্বয়ং শরৎ পর্য্যন্ত কে পাবেন না যে! সত্য কথা হচ্ছে এই, লেখকের প্রতিভা থাকলে দুই শ্রেণীতেই উঁচু-দরের বই লেখা হ'তে পারে। পরন্তু 'সাইকলজি'র খেলাও দুই শ্রেণীতে দেখানো যায়,—তবে প্রথম শ্রেণীতে প্রচ্ছন্ন আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রকাশ্যভাবে, তফাৎ খালি এইটুকু।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর লেখক ব'লে বঙ্কিমকে যাঁরা খেলো বল্‌তে চান, আমি তাঁদের বুদ্ধিকে তারিফ করতে রাজি নই। বঙ্কিমেরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মনোবিজ্ঞানের মহিমা দেখানো। অবশ্য কোথাও যে তাঁর ভ্রম-প্রমাদ হয়-নি, একথা আমি বলি না। ভ্রম-প্রমাদ হয়েছে বৈকি! কিন্তু তেমন ভ্রম-প্রমাদ এখনকার বড় বড় বিশ্লেষণ-প্রধান বা মনোবিজ্ঞান-ঘেঁষা উপন্যাসেও ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যায়।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয় আলোচনা করতে চাই। প্রতিভাবান উপন্যাসিক ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত শ্রাবণের "বঙ্গবাণী"তে "আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ" নামে এক প্রবন্ধ লিখেছেন ও বঙ্কিমের সম্বন্ধে কতকগুলি মত প্রকাশ করেছেন। আমি এতক্ষণ যে দলের মতের বিরুদ্ধে আলোচনা করলুম, শরৎবাবু অবশ্য সে দলের লোক নন। বঙ্কিমকে তিনি অস্বীকার করেন না।

তবে বঙ্কিমের "চন্দ্রশেখর" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" নিয়ে শরৎবাবু যে-ভাবে আলোচনা করেছেন, তা খুব সঙ্গত ব'লে মনে হচ্ছে না। প্রতাপকে শৈবলিনী শিশু-বয়স থেকে ভালোবাসত—এ ভালোবাসা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই উঠেছিল—উপন্যাসের মধ্যেই তার ঢের প্রমাণ আছে। এমন প্রেমের টানে শৈবলিনীর কৌশলে গৃহত্যাগ ব্যাপারটা, কি স্বাভাবিকতা আর কি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কিছুমাত্র অশোভন হয় নি। "এত-বড় একটা অন্যায় করিবার পক্ষে সেই প্রেমের শক্তি যথেষ্ট" এবং দরকার হ'লে আমি তা বিস্তৃতভাবেই প্রমাণিত করতে পারি। তারপর শরৎবাবু বল্‌ছেন, "প্রতাপ অত-বড় একটা কাজ করিল, কিন্তু এখনকার দিনের পাঠক হয়ত অবলীলাক্রমে বলিয়া বসিবে—কি এমন আর সে করিয়াছে!"—এটা শরৎবাবুর নিজের আন্দাজ। "এখনকার দিনে"ও কৈ, এমন পাঠক তো আমি চোখে দেখি নি, প্রতাপের অপূর্ব্ব চরিত্র যাকে মুগ্ধ করে নি। তবে পাগ্‌লা গারদে আমি খোঁজ নিই নি বটে। হয়তো সেখানে এ রকম পাঠকের অভাব নেই।

আসল কথা কি, এমনধারা মন-গড়া ব্যাখ্যা সমালোচনা নাম পেতে পারে না। শরৎবাবু যা করেছেন তা সমালোচনা নয়, প্রায় 'ক্যারিকেচার' বল্‌লেই চলে। ঠিক এই ভাবে দেখালে শরৎবাবুরও যে-কোন উপন্যাসকে বিস্তুতিকিমারার ক'রে তোলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালও ঠিক এই পদ্ধতিতেই রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব রচনা "সোনার তরী"কে নগণ্য, 'সামান্য ও অর্থহীন প্রলাপ-উচ্ছ্বাস ব'লে প্রতিপন্ন ক'রেছিলেন।

শরৎবাবু "কৃষ্ণকান্তের উইল" নিয়েও এই উল্টো পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। রোহিণী চরিত্রকে তিনি যে ভাবে দেখিয়েছেন, তা কি ঠিক? রোহিণীর মত চরিত্র আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায়, বাস্তব জীবনে আমি অনেক দেখেছি। এ-শ্রেণীর নারীর প্রেম আসলে প্রেমই নয়—তা কাম মাত্র। এরা কিছু কালের জন্যে একজনকে প্রাণ-মন দিয়েই ভালোবাসতে পারে বটে, কিন্তু এদের ভালোবাসা অস্থায়ী। রোহিণীও এই দরের স্ত্রীলোক—

সে খালি গোবিন্দলালের জন্যে নয়, হরলালের লোভেও উইল চুরি ক'রেছিল—এবং এইখানেই কপট-প্রেমিকা রোহিণীর চরিত্রের রহস্য স্পষ্টরূপেই বোঝা যাচ্ছে। শরৎবাবুর মত লোককেও যে তা বোঝাতে হচ্ছে, এ আমার দুর্ভাগ্য। হরলালের পরে যখন গোবিন্দলাল, তখন তারপরেও আর একজনও হবে না কেন? "আধুনিক লেখক তাহাকে গ্রহণ করিতে" বাধ্য,—কারণ এইটেই যে পরম স্বাভাবিক! "প্রশিক্ষার পথে প্রভূত সাহায্য" করবার জন্যে বঙ্কিম রোহিণীকে এমন ভ্রমর-প্রকৃতি ক'রে আঁকেন নি, শরৎবাবুর মত মান্‌লে বঙ্কিমকে আধুনিক কালে বারংবার কথিত 'সাইকলজি'রই আশ্রয়াশ্রিত করতে হ'ত। বঙ্কিম যে সেকেলে নয়, এও আর তার একটা প্রমাণ।

আর গোবিন্দলালের দ্বারা রোহিণীর হত্যা?—শরৎবাবু কেনই বা ধ'রে নিচ্ছেন যে, বঙ্কিম এখানে পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় দেখাতে চেয়েছেন? খবরের কাগজে শরৎবাবুর এই রকম হত্যার কথা প্রতিদিনই দেখ্‌তে পাবেন। গোবিন্দলালের মত অবস্থায় পড়লে অনেকেই এমন খুন ক'রে থাকে। এখানেও বঙ্কিম স্বাভাবিকতার মুখরক্ষা করেছেন। "সেকালে ও একালে এইখানেই মস্ত বড় ব্যবধান!" এ শরৎবাবুর মস্তিষ্কের কাল্পনিক ব্যবধান! শরৎবাবু নিজেও যে রোহিণীর মত চরিত্রকে শেষে এই ভাবে দেখাতেন না, তারই বা প্রমাণ কি? আমাদের হাতে বরং একাধিক বিরুদ্ধ প্রমাণই রয়েছে। রোহিণীর হত্যা-সম্পর্কে শরৎবাবু ঠাট্টা ক'রে বলেছেন "এইরূপে তাহার পাপের শাস্তি না হইলে কাণা ও খোঁড়া হইয়া তাহাকে নিশ্চয়ই কাশীর পথে পথে 'একটি পয়সা দাও' বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত।" কিন্তু এ ঠাট্টা বঙ্কিমের গায়ে না লেগে তাঁর নিজেরই গায়ে লেগেছে! শরৎবাবু কি ভুলে গেছেন, তাঁর "চরিত্রহীনে"র কিরণময়ী শেষের দিকে পাগ্‌লী ও কুষ্ঠরোগী হ'য়ে সত্যি সত্যিই সহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল? আর তাঁর বিরাজ-বৌয়ের কথা? সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তারকেশ্বরে গিয়ে যক্ষ্মাক্রান্ত ও পঙ্গু হয়ে পথের উপরে মৃত্যুর অপেক্ষায় এমন শোচনীয় অবস্থায় প'ড়ে ছিল যে, তার স্বামী পর্য্যন্ত 'ভিক্ষুক' মনে ক'রে তাকে পয়সা দিতে গিয়েছিলেন! কিরণময়ী ও বিরাজ-বৌকে শরৎবাবু যে-ভাবে মেরেছেন, তার তুলনায় রোহিণীর মরণ তো সুখের মরণ! শরৎবাবু নিজে যা করেছেন, তারই জন্যে বঙ্কিমকে তিনি 'সেকেলে' ব'লে দোষ দিয়েছেন। ফলে এখানেও প্রমাণিত হচ্ছে, বঙ্কিম এখনো 'সেকেলে' হয়ে পড়েন নি। তাঁকে সেকেলে বলা হয় যুক্তির জোরে নয়, গায়ের জোরে; কারণ, তাঁর পদ্ধতি ও পরম-আধুনিক শরৎ বাবুর পদ্ধতিতে আশ্চর্য্যরকম মিল দেখা যাচ্ছে।

আমি এ-কথা মনে করি না যে, পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় দেখিয়ে নীতিশিক্ষা দেবার জন্যেই শরৎবাবু কিরণময়ী ও বিরাজ-বৌকে শাস্তির পথে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। শরৎবাবুর দৃষ্টি হয়তো স্বাভাবিক পরিণামের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। আবার, রোহিণীর পরিণামেও বঙ্কিম যে নীতিশিক্ষারই একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন, এমন মনে করা চলে না। কবি ও গুরুমশাই আমরা লোক, এই সব সত্য কথাটা আজ কালকার আবিষ্কার নয়। শরৎবাবুর বিশ্বাস, বঙ্কিম সেকেলে লোক, অতএব তাঁর পক্ষে এটা জানা অসম্ভব। এই ভুল-ধারণা নিয়েই তিনি বঙ্কিমকে নিজের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে, কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মুখে এই হাহাকার যোগ ক'রে দিয়েছেন:—"বঙ্কিম বাঁচিয়া নাই, মুগুর মারিবে কে? ঝুড়ি ঝুড়ি নাটক নভেল্ ও কবিতা বাহির হইতেছে, তাহাতে দুশিক্ষা নাই —তাহা নিছক দুর্নীতিপূর্ণ।"

কিন্তু বঙ্কিম যদি আজ বেঁচে থাকতেন ও "আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ" পড়তেন, তা'হলে

নিশ্চয়ই বল্‌তেন যে, "আমি যা অনেকদিন আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্র আজ তারই পুনরুক্তি করেছেন।

বঙ্কিম কি বলেছেন, শুনুন :—(কাব্যের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নের) "অনেকে উত্তর দিবেন যে, "নীতিশিক্ষা"। যদি তাহা সত্য হয়, তবে "হিতোপদেশ" রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘু বংশ হইতে নীতিবাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।.... কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে।"

বঙ্কিমের মত প্রতিভার বরপুত্রদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি এতটা প্রখর হয় যে, সহজে তাঁরা সেকেলে হয়ে পড়েন না। তাই এখনকার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্কিমের "বন্দেমাতরং" গানই হচ্ছে সারা ভারতের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় সঙ্গীত। "আনন্দ-মঠে" তিনি বর্ত্তমানের পূর্ব্বাভাস দিয়ে গিয়েছেন। এমন কি, এখনকার যা সব-চেয়ে আধুনিক সমস্যা,—কুলীন ও সাধারণের সজ্ঘর্ষ, জমিদার ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিবাদ—কৃষিয়ার যা নিয়ে এখন মস্ত একটা ওল্ট-পাল্ট হ'য়ে গেল, বঙ্কিম সে-সব বিষয় নিয়েও যে কত চিন্তা করেছেন, তাঁর "বঙ্গদেশের কৃষক" ও "সাম্য" প্রভৃতি সুদীর্ঘ প্রবন্ধগুলি পড়্‌লেই এটা বুঝ্‌তে আর দেরি লাগে না।

বঙ্কিমকে আমরা অকৃতজ্ঞের মত ভুল্‌তে বসেছি—তাই বাতি জ্বেলে আজ চাঁদের আলো দেখাতে হ'ল। শরৎবাবু তো পদে আছেন,—বঙ্কিমের ঘাড়ে কেবল মাত্র 'সেকেলে' অপবাদ চাপিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন,—কিন্তু সাহিত্যিক আসরে প্রায়ই এমন-সব নব্য লেখক-পুঙ্গবকে দেখা যায়, যারা চায় বঙ্কিমকে একেবারে তুড়ি দিয়ে নস্যাৎ ক'রে দিতে! এই-সব চুণোপুঁটি—না, কারা-চিংড়ীর আস্ফালন দেখি, আর মনে মনে হাসি। কিন্তু এদের ক্যাঁক্ ক'রে চেপে ধ'রে দুটো জেরা করলেই দেখ্‌বেন, বঙ্কিমের লেখার সম্বন্ধে এদের পরিচয় কতটা সামান্য! এক একবার সাধ যায় মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের ভাষা আবৃত্তি ক'রে এদেরও বলি —"ওরে মূর্খ, কর্ম্মজড়, কুপমণ্ডূক, উড়ুম্বর মশক, অসুদেশ দুরাগ্রহ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিস্।" কিন্তু তারপরেই এই ভেবে রসনা সংযত করি যে,—না, বঙ্কিম যখন নিজেই এ-রেচারাদের এমন ভয়ানক গালাগালির ভাষা থেকে রেহাই দিয়ে গিয়েছেন, তখন তাঁদের আর অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত ক'রে কাজ নেই!

চির প্রতীক্ষায়

(শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ, বি এল)

তোমায় দেখিনি বুঝি এ পৃথিবী মাঝে,
তবু পরিচিত তুমি। কোন শুভক্ষণে,
কতদূরে, কোন্ লোকে সেই পরিচয়—
সেই চোখে চোখে চিনে ফেলা! শ্রান্ত সাঁজে
বসেছিলে শুভ্র পানে চেয়ে অন্যমনে
কোন মন্দাকিনীকূলে? আজি মনে হয়
সেই তুমি, সেই আমি; পরিবর্ত্ত ময়
এই বিশ্বে আমাদের রূপান্তর নাই,
ওগো, যুগান্তর পরে নিমেষেই দেখে
তাই চিনিয়াছি। তরঙ্গিত বক্ষ তাই
মথিত করিয়া শত স্মৃতি উঠে জেগে
বিস্মৃত স্বপ্নের সম। যাই—তবে যাই।
আবার হইবে দেখা। রহিয়াছি জাগি।
যুগ যুগ সে অনন্ত মুহূর্ত্তের লাগি।

সেকালের কথা

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্, এ,)

রাজেন্দ্রলাল ও কিশোরীচাঁদ।

ভারত বিখ্যাত মনীষী ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি-আই-ই মহোদয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক ইংরাজী প্রবন্ধাবলী আজিও কি স্বদেশে কি বিদেশে পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা বিস্ময় আকৃষ্ট করিতেছে। কিন্তু এক কালে এই অসামান্য মনস্বী পুরুষের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্য যে কতদূর উপকৃত হইয়াছিল তাহা আমরা অনেকেই বিস্মৃত হইতে ছি। ইহার প্রধান কারণ এই যে, রাজেন্দ্রলালের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা নানা ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং কি প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারে, কি রাজনীতিক জটিল প্রশ্নাদির মীমাংসায়, কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সর্ব্বত্রই দেশবাসী তাঁহার প্রতিভার উপর দাবী করিয়াছিল। নতুবা যিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' রহস্য সন্দর্ভের ন্যায় সচিত্র বহুতথ্যপূর্ণ মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন ও সম্পাদন করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পদ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি, উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে, বঙ্গ সাহিত্য তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরনীয় করিবার জন্য বাঙ্গালী বোধ হয় এত উদাসীন থাকিত না। রাজেন্দ্রলালের অনন্যসাধারণ প্রতিভা কেবল মাত্র বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি কল্পে বিনিয়োজিত হইত তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্য যে আজ কতদূর সমৃদ্ধ হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর একবার একটি পরিষৎ স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। বাঙ্গলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও অন্যান্য উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান বিষয়ে সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্যের সহিত সেই সভার উদ্দেশ্যের অনৈক্য ছিল না। রাজেন্দ্র-

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

লাল উৎসাহের সহিত সেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন ও তাহার সভাপতিপদ স্বীকার করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

"লিখিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাসিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষায় প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। • •

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভ্য সাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম। • •

মানিকতলার বাগানে যেখানে কোট অব ওয়ার্ডস ছিল সেখানে আমি যখন তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম—দেখিতাম তিনি লেখা পড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্প বয়সের অবিবেচনা বশতই অসঙ্কোচ আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম, কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে মুহূর্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবা মাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন তিনি কানে কম শুনিতেন। এই জন্য পারতপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কানে একটা যন্ত্র প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশ

করিয়া ভাবিবার জিনিষ পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। বোধ করি তখন কার কালের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যে সব বই পাঠান হইত তিনি সেগুলি পেন্সিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক এক দিন সেই রূপ কোন একটা বই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে তিনি ভাল করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন। তখন যে বাংলা সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা চেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোন সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত তবে বর্ত্তমান সাহিত্যপরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তির দ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের অন্যতম নেতা, 'কলিকাতা রিভিউ' প্রভৃতি পত্রের অন্যতম লেখক, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির ইংরাজী জীবনচরিতচয়িতা, 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদক মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। উভয়েই ইংরাজিতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। উভয়েই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি রাজনীতিক সভায় এবং অন্যান্য প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদ্বারা এবং সংবাদপত্রে প্রতিভাপ্রোজ্জ্বল প্রবন্ধাদি দ্বারা সেকালে এদেশে লোক মত গঠিত করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। অমর কবি দীনবন্ধু কিশোরীচাঁদ সম্বন্ধে 'সুরধুনী কাব্যে' লিখিয়াছেন—

"সাহসী কিশোরীচাঁদ
যত্নে সম্পাদক,
লিখিতে বলিতে পটু
স্বদেশ পালক।"

কিশোরীচাঁদ স্বয়ং তাঁহার ভ্রাতা প্যারীচাঁদের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিবার অবসর না পাইলেও উহার উন্নতির জন্য যাঁহারা চেষ্টা পাইতেন তাঁহাদের প্রয়াসে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি তাঁহার নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্ সঙ্কলিত একটী পুরাতন পুস্তকের তালিকা দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, কিশোরীচাঁদ রামমোহন রায়ের সংগীতগুলি সংগ্রহ করিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহিত মধ্যে মধ্যে কিশোরীচাঁদের বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা হইত। যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গ-দর্শন' প্রকাশিত করেন সেই সময়ে একদিন

কিশোরীচাঁদ রাজেন্দ্রলালকে বঙ্গদর্শনের রচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। কিশোরীচাঁদের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র পুলনীয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে মহাশয় বলেন যে, তিনি সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল কাগজ-খানি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন ভাষাসম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় আরও একটু অবহিত হইলে ভাল হয়। একটী প্রবন্ধে দুই এক স্থানে ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং দুই একটী ইংরাজী শব্দের যথাযথ বঙ্গানুবাদ হয় নাই তাহা দেখাইয়া দিলেন। এস্থলে নবীন পাঠকগণকে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বিবিধার্থ সংগ্রহ এবং রহস্যসন্দর্ভ সম্পাদনকালে রাজেন্দ্রলাল পণ্ডিত সহকারীদিগের সহায়তায় ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষার্থ যথাসম্ভব প্রয়াস পাইতেন।

যিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তসমূহ যুক্তি তর্ক দ্বারা অনায়াসে খণ্ডন করিতেন তিনি যে পাশ্চাত্য বুধগণের অভিমত অপেক্ষা স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত সিদ্ধান্ত অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা করি-বেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। একবার কোন সাধারণ সভায় কোনও বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের সহিত কিশোরীচাঁদের মতান্তর হয়। কিশোরীচাঁদ তাঁর মতের সমর্থনে কোনও চিন্তাশীল বিদেশীয় লেখকের একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে তিনি তিন দিন ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। রাজেন্দ্র লাল সেই গ্রন্থকারের নাম শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন "যদি তাঁহার গ্রন্থ পাঠে বন্ধুর তিন দিন অতিবাহিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে দুঃখের সহিত বসিতে হইবে যে, বন্ধুর তাঁহার অমূল্য জীবনের তিন দিন বৃথা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।"

প্রাচীন হিন্দু দণ্ড-নীতি—প্রথমভাগ

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র)

প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি—প্রথম ভাগ—ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা, এম্ এ, বি এল, পি এচ্ ডি প্রণীত Studies in Ancient Hindu Polity পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। যে কয়খানি পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা ভারতীয় প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা ও আলোচনার সহিত পরিচিত হই, এখানি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া লাহা মহাশয় বিদ্বজ্জন-সমাজে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন—তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার ফল পাইয়া আমরা বিস্মিত ও উপকৃত হইয়াছি। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থশতকে ভারতে যে রাজা-শাসনপ্রণালী বিষয়ক এমন সুচারু দণ্ডনীতি ছিল তাহা আমরা কল্পনা করিতে পরিতাম না। মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটল্যের অর্থশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে।

অনেকের ধারণা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধারা কেবলমাত্র ধর্ম্ম ও দর্শনের অভিমুখীন ছিল। পার্থিব ব্যবহারিক জ্ঞান প্রাচীন ভারতীয়দের ছিল না। আধুনিক গবেষণার ফলে এ কলঙ্ক কালিমা আমাদের ঘুচিয়াছে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-লাভের উপায় গুলির সহিত প্রাচীন ভারত যে পরিচিত ছিল তাহার ভূয়ো নিদর্শন অধুনা জন-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

এই সুচিন্তিত পুস্তকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়াছেন, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও বার্ত্তাশাস্ত্রবিৎ ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। প্রথমেই তিনি যুক্তিবলে প্রমাণ করিয়াছেন, দণ্ডনীতি-প্রণেতা

চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য ও কৌটল্য একব্যক্তি। তৎপরে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন এখানি ভারতীয় অন্যান্য বহুগ্রন্থের ন্যায় কোন এক বিশেষ যুগের সঙ্কলন নয়—কৌটল্য স্বয়ং ইহার রচয়িতা। তবেএ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে অনেক-স্থলে প্রত্যক্ষদর্শী রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে অনেক উপাদান দিয়া সাহায্য করিয়াছে। চাণক্য সেগুলির সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়াছেন।

তৎপরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কয়টি শ্লোকে চন্দ্রগুপ্তের নাম গৌণ ও অপ্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ আছে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য প্রকাশ্যভাবে চন্দ্রগুপ্তের নাম পুস্তকে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও অর্থশাস্ত্রোক্ত শ্লোকের সাদৃশ্য দেখাইয়া তিনি ভূমিকা পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। এস্থলে ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—"রাজ্যের প্রধান রাজ-পুরুষগণের মধ্যে কাহারও কাহারও উপরে রাজারের, কাহারও কাহারও উপরে নগরের এবং অন্য কাহারও উপর সৈন্যের ভার ন্যস্ত আছে।" ইহার সহিত অর্থ-শাস্ত্র বর্ণিত 'সন্নিধাতা'র সাদৃশ্য আছে। এই 'সন্নিধাতা'র অধীন 'পণ্যাধ্যক্ষ' 'শুল্কাধ্যক্ষ' প্রভৃতি রাজপুরুষগণ দেশের বাণিজ্যাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। নাগরিকের অর্থাৎ নগরের শাসনকর্ত্তার উপরে নগরের স্বাস্থ্য প্রভৃতি রক্ষাও শান্তিরক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল এবং 'নাবধ্যক্ষ','পত্তাধ্যক্ষ,''সেনাপতি' প্রভৃতির উপর সামরিক কার্য্যাদির ভার ন্যস্ত ছিল। (২) "কোন কোন কর্ম্মচারী নদীর তত্ত্বাবধান করিতেন, জমী জরিপ করিতেন এবং যে সমস্ত পথ দিয়া বড় খালের জল ছোট ছোট খালে প্রবেশ করিত, সেই সমস্ত পরিদর্শন করিতেন।" কৌটল্য ও উল্লেখ করিয়াছেন, 'নাবধ্যক্ষের' অধীন বিভিন্ন কর্ম্মচারীরা ক্ষেত্রে জলসেচন-প্রণালীর, নদী ও অন্যান্য জল পথের তত্ত্বাবধান করিতেন। অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত 'গোপ' 'স্থানিক' প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ জমীর জরিপের কার্য্য করিতেন। (৩) "সেই কর্ম্মচারিগণই শিকা-রীদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন।" অর্থশাস্ত্রে শিকারী-দিগকে 'বিবীতাধ্যক্ষে'র (গোচরণ-ভূমির পরিদর্শক,) অধীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৪) "তাঁহারা কর আদায় করিতেন ও বিভিন্ন উপজীবিকার উপর দৃষ্টি রাখিতেন।" অর্থশাস্ত্রে রাজস্ব ও কর-সংগ্রহ বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর নাম ছিল 'সমাহর্ত্তা'। (৫) "তাঁহারা রাজপথ নির্ম্মাণ করাইতেন।" অর্থ শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, সমাহর্ত্তার কর্ত্তৃত্বে এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। (৬) "প্রথম বিভাগের কর্ম্মচারিগণ শিল্প-কার্য্যের সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেন।" এ কার্য্যভার যে সকল রাজকর্ম্মচারীদের উপর থাকিত তাহাও অর্থশাস্ত্রের ৪র্থভাগ, প্রথম অধ্যায় ৭৬ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। (৭) "কেবলমাত্র কর আদায়ের জন্য নহে, যাহাতে জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে রাজসরকার সমস্ত সংবাদ পাইতে পারেন, তাহার জন্য তৃতীয় বিভাগের কর্ম্মচারীগণ কখন্ কাহার জন্ম হইল এবং কখন্ কি ভাবে কাহার মৃত্যু হইল তাহার অনুসন্ধান করিতেন।" অর্থশাস্ত্রেও 'স্থানিক' ও 'গোপ' প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ আদমসুমারীর কার্য্য করিতেন বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। (৮) "৪র্থ বিভাগের কর্ম্মচারীগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। ইঁহারা দ্রব্যের ওজন ও পরিমাণাদির উপর দৃষ্টি রাখিতেন।" অর্থশাস্ত্রবর্ণিত 'সংস্থাধ্যক্ষ'কে কম ওজনের বাটখারা, কাঁটা, দাঁড়িপাল্লা ও কম মাপের রেক, কুন্কে প্রভৃতি দ্রব্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইত, যাহাতে মিশ্রিত (ভেজাল) দ্রব্য এবং অপেক্ষাকৃত মন্দ জিনিষ ভাল বলিয়া বিক্রীত না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত।"

আলোচ্য পুস্তকে প্রথম অধ্যায়ে খাল-খনন, জল-সেচন, আবহবিদ্যা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে গৃহপালিত পশু ও পশুচর ভূমি; তৃতীয় অধ্যায়ে গৃহপালিত পশু বিভাগ—মুন, অরণ্য ও অশ্ব ও ৪র্থ অধ্যায়ে

পশু পালন বিভাগ—হস্তী সম্বন্ধে আলোচনা দৃষ্ট হয়। তৎকালীন পণ্ডিতেরা পশুদিগের সম্বন্ধে যে সকল সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, সে সকল সত্য আজিও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। পঞ্চম অধ্যায়ে স্থলপথ ও যান সম্বন্ধে ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে লোক হিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানের কথা আলোচিত হইয়াছে। অর্থ শাস্ত্রে চারি প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায়—যথা চিকিৎসক বা ভিষজ্, বিষ-চিকিৎসক 'অঙ্গুলীবিৎ,' 'গর্ভব্যাধি সংস্থা' বা সূতিকা চিকিৎসক এবং শল্যবিদ্যা-নিপুণ সামরিক চিকিৎসক ও শুশ্রূষা কারিণী। তৎকালে চিকিৎসকের অনাবধানে বশতঃ কোন রোগীর মৃত্যু ঘটিয়াছে প্রমানিত হইলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইত। স্বাস্থ্যোন্নতিকর বিধান প্রবর্তন দ্বারা নগর ও জনাকীর্ণ স্থান সমূহের অধিবাসী দিগকে রোগমুক্ত করিবার ব্যবস্থা রাজ-সরকার হইতে হইত। মহামারী নিবারণের পন্থা অবলম্বিত হইত। অধুনা প্রচলিত মিউনিসিপ্যাল আইনের অনুরূপ বিধি ব্যবস্থা তখন ছিল। এমন কি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের বন্দোবস্তও তখন ছিল। সপ্তম অধ্যায়ে 'আদান সমাদ' বা 'গমাহারে' বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে ধর্ম্মাধিকরণের কথা বিবৃত হইয়াছে। তখন দুই শ্রেণীর বিচারালয় ছিল—"ধর্ম্মস্থীয়" বিচারালয়ে প্রজাদের নিজেদের মধ্যে যে সকল সামান্য বিবাদ বিসম্বাদ হইত, তাহার বিচার হইত। "রাজা বা রাজসরকারের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার অপরাধ জনসাধারণের অথবা বহু-লোক সম্পর্কিত কোনও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অনিষ্টকর কোনও অপরাধ অথবা নরহত্যা প্রভৃতি ভীষণ অপ-রাধের বিচার 'কণ্টক শোধন' বিচারালয়ে হইত। নবম অধ্যায়ে বিচার-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে, ধর্ম্ম, ব্যবহার প্রচলিত রীতি ও রাজ বিধান এই চারিটী মূল সূত্র অবলম্বনে বিচার কার্য্য সমাধা হইত। দশম অধ্যায়ে ব্যবহার বা চুক্তি সম্বন্ধে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে আধুনিক ভারতীয় চুক্তি আইনের মূল সূত্র গুলি অবিকৃতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত ব্যবহার নিম্নলিখিত কার্য্য উপলক্ষে সম্পাদিত হইত। (১) ঋণ দান (২) বিক্রয় (৩) নিক্ষেপ (প্রকাশ্যে গচ্ছিত রাখা) (৪) উপনিধি (সুরক্ষিত ও মুদ্রাঙ্কিত অবস্থায় কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখা) (৫) বন্ধক বা জামীন (৬) ভাড়া (৭) সমবায় (৮) কর্ম্ম নিয়োগ সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত (৯) অন্যান্য বিবিধ প্রকার চুক্তি। আধি (pledge), আদেশ বা হুণ্ডী, প্রভৃতির চুক্তির কথাও অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। Tender ও Right of pre-emption সম্বন্ধে আধুনিক মতের অনুরূপ মত ও এ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। "উপযুক্ত কারণ ব্যতীত উত্তমর্ণ যদি উপযুক্ত সময়ে তাহার প্রাপ্য টাকা অধমর্ণের নিকট হইতে গ্রহণ না করে, তবে তাহার দ্বাদশগুণ অর্থদণ্ড হইত। এরূপ অবস্থায় অধমর্ণ তাহার দেয় টাকা তৃতীয় পক্ষের কাহারও নিকট জমা রাখিতে পারে এবং যদি তাহা রাখে, তবে সেই দিন হইতে আর সুদ তাহাকে দিতে হইত না।"

ঋণশোধের ওয়াদার তারিখ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ঋণ আদায় না হইলে তাহা তামাদি হইত।

তখনকার দিনে বন্ধকী ঋণে সুদের হার বার্ষিক ১৫৲ মুদ্রা ছিল, অবন্ধকী ঋণের উচ্চতম সুদের হার শতকরা মাসিক পাঁচ মুদ্রা ছিল। ঋণ আদায় সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা এবং ঋণ দেওয়া অর্থ নষ্ট হইবার আশঙ্কার আধিক্যের অনুপাতেই সুদের হার বৃদ্ধি হইত। নির্দ্দিষ্ট উচ্চতম হারের অতিরিক্ত সুদ লইলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইত।

পুস্তক খানির অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন দাস গুপ্ত এম এ মহাশয়। অনুবাদ প্রাঞ্জল হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা কাগজ ভাল মূল্য ১৷৷০ টাকা। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে প্রুফ দেখার অনবধানের ফলে পুস্তকে বড় বেশী বর্ণাশুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে।

Printed by P. N, Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and Published by P. N. Pal, 26-3 Scott Lane, Calcutta.

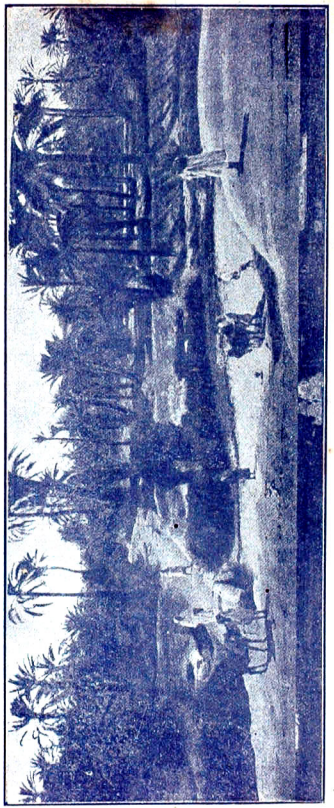

সাহারাণপুর মফস্বলস্থ কাশীর ছায়া স্বরূপ ঝরণার দৃশ্য। (সাহারাণপুরের মধ্যে ঝর্ণার ঝরণার ঠিক কাশীর ছায়া স্বরূপ আরও দুইটী গ্রাম আছে।)

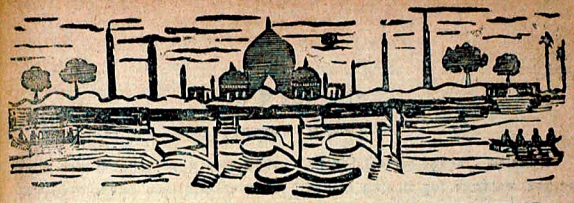

১৩শ বর্ষ, | অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ | ৮ম সংখ্যা

গান

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে
ডাইনে বাঁয়ে দুইহাতে।
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে
নিত্য নূতন সংঘাতে।
বাজে ফুলে, বাজে কাঁটায়,
আলো-ছায়ার জোয়ার ভাঁটায়,
জীবন জুড়ে উঠ্‌ল বেজে
দুঃখে সুখে শঙ্কাতে,
নিত্য নূতন সংঘাতে॥

তালে তালে সাঁঝ সকালে
রূপ সাগরে ঢেউ লাগে।
শাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ
ছন্দে নানান্ রং জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে,
কান্না-হাসির তান্ সেধে নে,
ডাক দিল ঐ মরণ বাঁচন
নাচন-সভার ডঙ্কাতে
নিত্য-নূতন সংঘাতে॥

২৪ আশ্বিন, ১৩৩০।

কলিকাতা লিথো ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী লিমিটেড
৪৫/এম্, চামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

পাহাড়ের কথা

(শ্রীনগেন্দ্র নাথ মজুমদার)

প্রবন্ধের নাম "পাহাড়ের কথা" বটে, কিন্তু খাস পাহাড়ের কথা বিশেষ কিছু না বলিয়া পাহাড়ের অধিবাসীদের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথার আলোচনা করিব।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি দার্জ্জিলংএর জলাপাহাড়ের অন্যূনাধিক বিশ মাইল দূরে এবং উচ্চতায় জলাপাহাড়েই প্রায় সমান্তরাল, জলাপাহাড়ের মত হিমালয়েরই অঙ্গীভূত, ডাউহিল নামক পাহাড়ে প্রায় দেড় বৎসর কাল বাস করিয়াছিলাম। দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ের পথিমধ্যস্থিত কারসিয়ং ষ্টেশনে নামিয়া ঐ ডাউহিল পাহাড়ে উঠিতে হয়। কারসিয়ং বেশ স্বাস্থ্যকর সহর। ডাউহিল এবং কারসিয়ং এই উভয়ের ব্যবধান দুই মাইল। সংযোজক পথটি নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়। অতিক্রম করিবার সময় পথিকের মনে হয় যেন আদি অন্তহীন বিরাট-বপু এক অজাগর সর্প আঁকিয়া বাঁকিয়া আর একঅসীম অনন্ত বিরাট্ বৃক্ষের উপর ঠিক যেন শান্ত গম্ভীর পিতার বিশাল বক্ষে অলস-নিদ্রিত ক্ষুদ্র শিশুটীর মত পড়িয়া আছে। ঐ পথটী কারসিয়ং ষ্টেশন হইতে ডাউহিল এবং অন্যান্য বিবিধ নামে আখ্যাত পাহাড় অবিচ্ছিন্নভাবে অতিক্রম করিয়া জলাপাহাড়ের উপর দিয়া দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত গিয়াছে, দৈর্ঘ্য তেইশ মাইল। ইহার ভিতর কারসিয়ং ষ্টেশন হইতে ডাউহিল স্কুল পর্য্যন্ত দুই মাইল পথের নাম ডাউহিল রোড। উহার পর হইতে ঐ পথের নাম ওল্ড মিলিটারি রোড। পাঁচ মাইলের মাথায় পাহাড় গাত্রে অনতি উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত একটী চিম্‌নি আছে সেই জন্য ঐ স্থানটির নাম চিম্‌নি। চিম্‌নি পর্য্যন্ত কোথাও পথের উপরে, কোথাও পথের নীচে কোথাও বা পথের ধারেই দুই এক ঘর বসতি আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর পথের ধারে আর কোথাও বসতি নাই, বরাবর নির্জ্জন নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ,—দৃশ্য যেমন মনোরম, তেমনি ভীষণ, একাকী সে পথ দিয়া যাতায়াত করা নিরাপদ্ নয়, কারণ নিম্ন বঙ্গের ন্যায় দস্যু তস্করের ভয় নাই বটে, কিন্তু বাঘ ভালুকের উপদ্রব আছে এবং বাঘ অপেক্ষা ভালুকের উপদ্রবটাই অধিক। প্রয়োজন অনুরোধে অনেক সময় পাহাড়ীদিগকে এ পথ দিয়া একাকী যাতায়াত করিতে হয় এবং তাহাদের বিপন্ন হওয়ার কথাও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে একটা কথা এই যে, পাহাড়ীরা নিম্ন বঙ্গের বাঙ্গালীদের মত নিতান্ত নিঃসহায় ও নিরস্ত্র নয়। আমরা যাহাকে ভোজালি বলি পাহাড়ীরা তাহাকে খুক্‌রি বলে। সহায় স্বরূপ একখানি খুক্‌রি প্রায় সকল সময় সকল পাহাড়ীর নিত্য সহচররূপে তাহাদের কোমরে বাঁধা থাকে। গুর্খা সৈন্যের যে খুক্‌রি ইউরোপীয় মহাসমরের সময় অকুতোভয় অমিত বিক্রমশালী জর্ম্মান সৈন্যের নির্ভীক হৃদয়েও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল সেই খুক্‌রি পাহাড়ীদের নিত্য সহচর। ডাউহিলে অবস্থিতিকালে দুই একজন যুদ্ধফেরৎ গুর্খার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। তাহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, যুদ্ধের সময় তাহাদের প্রতিপক্ষীয় সৈন্যগণ খুক্‌রির আঘাতকে যত ভয় করিত, অন্য কোনও অস্ত্রকে তত ভয় করিত না; কারণ গোলা, গুলি, তরবারি, বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের আঘাত জনিত ক্ষত আরোগ্য করা যেখানে সুখসাধ্য, খুক্‌রির আঘাত জনিত ক্ষত আরোগ্য করা সেখানে কষ্টসাধ্য। এ হেন খুক্‌রি পাহাড়ীদের নিত্য সহায় এবং সাধারণতঃ পাহাড়ীরা বেশ বলশালী সেই জন্য বাঘ বা ভালুকের দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহারা তাহাদের আততায়ীর সঙ্গে বিগ্রহ যেখানে অনিবার্য্য সেখানে বিগ্রহ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। তবে মনে রাখিতে হইবে সকল ক্ষত্রিয়ই ভীষ্মার্জ্জুন বা কর্ণ নয়, সকল কার্মুকই গাণ্ডীব নয়, সুতরাং যেখানে পাহাড়ী এবং খুক্‌রি উভয়ের অন্যতম হীনবীর্য্য সেখানে বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে।

এখন **ওল্ড মিলিটারি রোডের ইতিবৃত্ত** সংক্ষেপে বলিব। শিলিগুড় হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত একার মাইল পথ সরকারি বাঁধা রাস্তা। ইহার নাম কার্ট রোড। দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলপথ ঐ বাঁধা রাস্তারই পাশে পাশে গিয়াছে; কেবল প্রয়োজন ও সুবিধার অনুরোধে স্থানে স্থানে কোথাও বা নীচে কার্টরোড, উপরে রেলপথ আর কোথাও বা উপরে কার্টরোড নীচে রেলপথ, কোথাও বা বামে কার্টরোড দক্ষিণে রেলপথ কোথাও তাহার বিপরীত। উভয় পথই পরস্পর এমনই সংলগ্ন যে মনে হয় যেন একটী রাস্তাকে লম্বালম্বি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগের উপর রেল বসান হইয়াছে এবং গোশকট, অশ্বারোহী পথিকদিগের গমনাগমনের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে যখন ঐ রাস্তা হয় নাই তখন ইংরাজ সরকারের সৈন্যদিগের গতিবিধির জন্য শিলিগুড়ি হইতে আর একটী স্বতন্ত্র রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা শিলিগুড়ি হইতে পাখাবাড়ির ভিতর দিয়া কারসিয়ংএ (Eagles Crag) ঈগলস ক্রেগ নামক সুদ্ধাগ্র উচ্চ গিরি শৃঙ্গের পাদদেশ বেষ্টন করিয়া এখন যেখানে কারসিয়ং ষ্টেশন সেইখানে ডাউহিল রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে। সে পথ দিয়া অবশ্য সৈন্যদিগকে যাতায়াত করিতে হইত। রেলপথ হওয়ার পর হইতে সে উদ্দেশ্যে আর ঐ পথ ব্যবহার হয় না; তবে সৈন্য চালনার অভিপ্রায়ে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া (Military Road) মিলিটারি রোড নামে পরিচিত। দোকান পাট, হাট বাজার যাহা কিছু সমস্তই কারসিয়ং এ। ডাউহিলে যাহারা থাকেন তাঁহাদিগকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য কারসিয়ংএ আসিতে হয়। এখানে কেবল সাহেবদের একটী স্কুল থাকায় একটী স্বতন্ত্র ডাকঘর আছে। অন্যথা কারসিয়ং এ না আসিয়া ডাউহিলবাসীদের জীবন-যাত্রা চালান দুষ্কর। কারসিয়ং ছাড়া ডাউহিলের গত্যান্তর নাই; ডাউহিল বাসীকে সর্ব্বপ্রকারে কারসিয়ংএর পরিচয়ে পরিচিত হইতে হয়।

উপরে নেপাল, সিকিম ও ভোটান এবং নীচে জলপাইগুড়ি জেলা এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি দার্জ্জিলিং জেলার অন্তর্গত। দার্জ্জিলিং সহর এই জেলার সদর এবং কারসিয়ং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পং এই তিনটী সব্ ডিবিসন ও থানা। কমলালেবু এবং অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা জন্মায় বলিয়া দার্জ্জিলিংএর প্রসিদ্ধি আছে। অনেকের ধারণা যে খাস দার্জ্জিলিংএ লেবুর গাছ এবং চা-এর বাগান আছে। বস্তুতঃ সে ধারণাটি ভুল। খাস দার্জ্জিলিং সহরের সীমানা মধ্যে এই দুইটীর একটী জিনিষের ও চিহ্ন মাত্র নাই। চায়ের বাগান আছে শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত যে পাহাড় শ্রেণী আছে সেই সকল পাহাড়ের গায়ে এবং উপত্যকায়; আর দার্জ্জিলিং পাহাড়ের নীচে সিকিম ও কালিম্পং পর্য্যন্ত যে সকল পাহাড় ও উপত্যকা আছে সেই স্থানে কমলালেবুর বড় বড় বন আছে। দার্জ্জিলিংএর কমলালেবু বলিয়া যাহা কলিকাতায় আমদানি হয়, তাহা ঐ সকল বন হইতে আমদানি হয়। দার্জ্জিলিং জেলার উৎপন্ন সামগ্রী, সেই জন্য নামটা দার্জ্জিলিংএর চা এবং দার্জ্জিলিংএর নেবু।

কারসিয়ংকে কেন্দ্র করিয়া দার্জ্জিলিং জেলার অনেক স্থান ঘুরিয়াছি। তদুপলক্ষে পাহাড়ীদের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পাহাড়ী জাতি।—যাহারা পাহাড়ে বাস করে তাহারাই পাহাড়ী নামে অভিহিত হইবার কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। নেপাল, সিকিম ভুটান, তিব্বৎ এ সকল দেশ পাহাড়ের উপর হইলেও সেখানকার অধিবাসীদিগকে পাহাড়ী বলে না। নেপালের অধিবাসী নেপালী, ভুটানের অধিবাসী ভুটিয়া, তিব্বতী ইত্যাদি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ঐ সকল দেশের সীমানার বাহিরে যাহারা বাস করে তাহাদিগকেই পাহাড়ী বলে। যেমন আফ্রিদি, আগাবেল প্রভৃতি আফগান স্থানের সীমান্তবাসী জাতিগণ আফগানী নামে পরিচিত না হইয়া পাহাড়ী নামে পরিচিত হয়; ইহারাও সেইরূপ। ইহাদের পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার, সামাজিক রীতি নেপালী ভুটিয়া বা তিব্বতীয়দিগের রীতি নীতি হইতে স্বতন্ত্র। পাহাড়ী পুরুষদের পরিচ্ছদ অনেকটা সাহেবী পরিচ্ছদের অনুকরণ। এমন অনেক পাহাড়ী আছে যাহাদিগকে প্রথম দৃষ্টে সাহেব বলিয়া ভ্রম হয়। মেয়েরা কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাহাদের জাতীয় ভাব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলে। তাহারা যে কাপড় পরে সে কাপড় যত লম্বা হউক না কেন (অধিকাংশ স্থলে ইহা ১০ হইতে ১২।১৩ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে) কোমরের উপর অঙ্গে তাহা ব্যবহার করে না। কটি বেষ্টনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কোমরে জড়াইয়া অবশিষ্ট সমুদায় বস্ত্রখণ্ড কোঁচার মত করে এবং কটিবেষ্টনী অংশের খুঁটের সহিত সেই কোঁচা জড়াইয়া নিবির মত নাভির নীচে বাঁধিয়া ফেলে। কোঁচার অপর খুঁটটি বামাবর্ত্তে ঘুরাইয়া আনিয়া নাভির নীচে কোঁচার সঙ্গে মিলাইয়া গুঁজিয়া দেয়। এই কাপড়কে তাহারা "লুগা" বলে। তাহার পর অন্য ওসারের আর একখানি লম্বা কাপড় দুই তিন ফের জড়াইয়া কোমরে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলে। এই কাপড় খানির নাম "পটুকা"। ইহা কোমর বন্ধের কাজ করে; কাপড় সহজে খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। কোঁচার খুট বামাবর্ত্তে ঘুরাইয়া নাভির নীচে গুঁজিয়া দেওয়ার সার্থকতা এই যে যত বড় প্রবল বাতাস হউক না কেন, তাহাতে মানুষ উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু কাপড় উড়িয়া আবরু নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই। অবস্থা অনুকূল হইলে কেহ কেহ কাপড়ের নীচে একটী পেটকোট বা সায়া ব্যবহার করে। কোমর হইতে গলা পর্য্যন্ত এই অঙ্গ আবরণে। জন্য পাহাড়ী রমণীরা একটি বডিস্ বা জ্যাকেট ব্যবহার করে। তাহার নাম "চোলা।" দশ বৎসরের অধিক বয়স হইলেই সেই জ্যাকেটের উপর বগলের নীচে বুক পিঠ ঘিরিয়া শালের রুমালের আকারের আর একখানি কাপড় জড়াইয়া দেয় তাহাকে "হেম্বার" বলে। ঠিক ছাতি বন্ধেরই মত আর একখানি কাপড় মাথায় দেয় তাহার নাম "মুখাত্র"। জুতা মোজা ব্যবহারে তাহাদের আপত্তি নাই, তবে সেটা অর্থ-সচ্ছলতা সাপেক্ষ।

পাহাড়ী রমণীদের মধ্যে গহনা পরার পদ্ধতিও আছে এবং তাহারা পরিতেও ভালবাসে। আমাদের গরীবের মেয়েরা পূর্ব্বে পিত্তল কাঁসার গহনা পরিত। এখন যে সে প্রথা সর্ব্বত্র একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাহা নহে, তবে অনেক কমিয়া গিয়াছে। পাহাড়ীরা সেইরূপ অবস্থা বিশেষে পিতল কাঁসার গহনা হইতে হীরা মুক্তার গহনা পর্য্যন্ত পরিয়া থাকে। অল্প দামের বাজে সোণা তাহারা ব্যবহার করে না।

পাহাড়ীদের বিবাহ—পাহাড়ীদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই বলিলেই চলে। প্রদান-পত্য এবং গান্ধর্ব্ব এই দুই প্রকার বিবাহ প্রচলন আছে তবে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকার বিবাহের-রই সংখ্যা অধিক। পূর্ব্বানুরাগের অভিনয় শেষ হইয়া গেলে পাত্র, পাত্রীকে লইয়া একদিন পলাইয়া যায় এবং এমন সংগোপনে তাহাকে লুকাইয়া রাখে যে কেহ তাহার সন্ধান জানিতে পারে না। তিন দিন যদি এই রূপে লুকাইয়া রাখিতে পারে তাহা হইলে সেই পুরুষ সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার দাবী করিতে পারে এবং শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কন্যার অভিভাবকেরা বিবাহ দিব না বলিয়া আপত্তি করিতে পারে না। আপত্তি করিলে সে আপত্তি বাতিল ও না মঞ্জুর হয়। তখন একটা শুভ দিন ধার্য্য করিয়া অবস্থানুযায়ী উৎসবের সহিত বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। বরকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া অপরাধে বরকে কিছু অর্থদণ্ড দিতে হয়। তিন দিনের মধ্যে যদি গোপন রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পাত্রের আর সে কন্যাকে বিবাহ করিবার ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া থাকে না; তখন কন্যার অভিভাবকদের ইচ্ছার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়; তবে কন্যা যদি স্বয়ং সেই পাত্রকে বিবাহ করিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে অগত্যা বাধ্য হইয়া কন্যার অভিভাবকেরা সেই বিবাহে সম্মতি প্রদান করে।

পাহাড়ীদের বিবাহের আর একটী বেশ অভিনব প্রথা আছে। একদল পুরুষ এবং এক দল স্ত্রীলোক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়। তরজা লড়াইয়ের মত তাহাদের গানের লড়াই হয়। একজন পুরুষ গান গায় ও একজন স্ত্রীলোক গান গাহিয়া তাহার উত্তর ও চাপান দেয়। বহুগণ ধরিয়া এই লড়াই চলিতে থাকে। পুরুষের যদি পরাজয় হয়, তাহা হইলে সে লড়াই নিষ্ফল হয়; কিন্তু স্ত্রীলোক পরাজিতা হইলে পুরুষটী তাহাকে রমণী মণ্ডলী হইতে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে পারে ও করিয়া থাকে।

পাত্র যতই গুণ সম্পন্ন হউক না পাহাড়ীদের মধ্যে বর-পণের প্রথা নাই। বিবাহের সময় বধূকে যথাশক্তি সালঙ্কারা করিতে হয়, কিন্তু আমাদের দেশের মত কন্যার পিতামাতাকে সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করিতে হয় না। বর পক্ষকে নিজ ব্যয়ে অলঙ্কার পরাইয়া বধূকে ঘরে লইয়া যাইতে হয়। কন্যাপক্ষের ব্যয়ের মধ্যে বরযাত্রীদের ভোজন করান।

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুকের কন্যা অমুকের পুত্রকে দান করিলাম বলিয়া কন্যা সম্প্রদান প্রথা পাহাড়ীদের মধ্যে নাই। একটী হোমকুণ্ডের সম্মুখে বরকন্যাকে বসাইয়া ব্রাহ্মণেরা যখন হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন সেই সময় অন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ গীতা, ভাগবত প্রভৃতি পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন। পাঠ শেষ এবং হোমের পূর্ণাহুতি প্রদান হইয়া গেলেই বিবাহ হইয়া গেল। সম্প্রদান প্রথা না থাকার কারণ বোধ হয় এই যে, পাহাড়ীদের মধ্যে বিবাহের কোন বন্ধন নাই। বর এবং বধূ উভয়েই ইচ্ছামাত্র তাহাদের দাম্পত্য-সম্বন্ধ ঘুচাইয়া পত্নান্তর বা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। বিবাহের সময় অলঙ্কারাদি বাবদে প্রথম পতির যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, সেই টাকা পরিশোধ করিয়া যদি পত্নী অন্য পতিগ্রহণ করে তাহা হইলে প্রথম পতির আর কোন ওজর আপত্তি চলে না। পত্যন্তর-গ্রাহিণী পত্নীর তাহার প্রথম পতির ঔরসজাত সন্তানাদির উপর তাহাদের সামাজিক রীতি-সম্মত কোন দাবী দাওয়া চলে না; তবে সন্তানের জনক যদি আপত্তি না করে তাহা হইলে জননী সেই সন্তান লইয়া দ্বিতীয় পতির নিকট যাইতে পারে। এইরূপে একটীর পর একটি করিয়া একজন রমণী যতগুলি ইচ্ছা পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে তাহাতে তাহাদের সতী-ধর্ম্মের হানি হয় না। তবে এক পতির পতিত্বের মিয়াদ মধ্যে যদি অন্য পুরুষের সঙ্গ করে তাহা হইলে সে অসতী বলিয়া গণ্য হয়।

পাহাড়ী পুরুষদের মধ্যে এককালে বহুবিবাহের প্রচলন আছে, কিন্তু পাহাড়ী রমণীদের মধ্যে এক জনের একসময়ে বহু পতিগ্রহণ পদ্ধতি নাই।

এক পতির মৃত্যু হইলে অন্য পতি গ্রহণ করা বা না করা রমণীর ইচ্ছাধীন। রমণী যদি অন্য পতি গ্রহণ না করে তথাপি সে বিধবা বলিয়া গণ্য হয় না; কারণ তাহাদের সজীব এবং নির্জ্জীব এই দুই প্রকারে দুইটি পতির সঙ্গে বিবাহ হয়। নির্জ্জীব পতি একটি কাঁচা বেল; সজীব পতি একজন পুরুষ মানুষ। মানুষ

পতিটি স্থায়ী ও হইতে পারে অস্থায়ীও হইতে পারে; কিন্তু বেল পতিটা স্থায়ী— অন্ততঃ বহুদিনের জন্য স্থায়ী। স্থানীয় আচার ও পদ্ধতি অনুসারে হোম এবং শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া মানুষের সঙ্গে যেমন বিবাহ হয়,ঠিক সেই প্রক্রিয়া অনুসারেই বেলের সঙ্গেও বিবাহ হয়। সেই বেলটী তাহারা যত্ন পূর্ব্বক অতি সাবধানে রক্ষা করে এবং যতদিন সেই বেল বজায় থাকে ততদিন সে সধবা। আমাদের দেশের স্মৃতির ব্যবস্থা অনুসারে স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে যেমন দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা না করিয়া সে স্বামীর ঔদ্ধ ক্রিয়াও হয় না এবং তাহার পত্নীও ততদিন বিধবা বলিয়া গণ্য হয় না, পাহাড়ীদেরও তেমনি শ্রীফল স্বামী হারাইয়া গেলে তাহারা বিধবা হয় না,কিন্তু বেলটী যদি ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে সেটা তাহারা অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া মনে করে। কাহারও বা বেলের সঙ্গে আগে বিবাহ হয়, কাহারও বা মানুষের সঙ্গে আগে বিবাহ হয়, কিন্তু মানুষের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেলেও যতক্ষণ বেলের সঙ্গে বিবাহ না হয়, ততক্ষণ বিবাহ সিদ্ধ হয় না।

পাহাড়ী রমণীদের মধ্যে বিধবা নাই, সুতরাং বৈধব্য জ্ঞাপক বাহ্য চিহ্ন কিছু নাই। তবে বাহ্য চিহ্ন দেখিয়া কুমারী ও সধবা নির্ণয় করা খুব সহজ। তাহাদের নবীনা ও প্রবীনা সকলেই নানা রংএর পুঁতির মালা হার বা পাঁচনরির মত হার ব্যবহার করে; কিন্তু যাহার বিবাহ হইয়াছে সে ব্যতীত অন্য কেহ সবুজ রংএর পুঁতির মালা ধারণ করিতে পারে না। বিবাহের দিন তাহারা সবুজ মালা প্রথম ধারণ করে এবং সেই রংএর মালা আজীবন তাহাদের সঙ্গের সাথী হইয়া থাকে। যাহার গলায় সবুজ মালা আছে সে সধবা, যাহার নাই সে কুমারী।

পাহাড়ীদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। অবশ্য সেটা তাহারা নিজেরাই নিন্দনীয় বলিয়া মনে করে, কিন্তু সে জন্য তাহাদিগকে সমাজে পতিত হইতে হয় না। প্রাচীন কালের ন্যায় ব্রাহ্মণ গণ চতুর্ব্বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। ক্ষত্রিয়ের অধিকার সকল কন্যারই সমান, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে স্বামী ব্রাহ্মণ পত্নী ছাড়া অন্য পত্নীর প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ব্যবহার করেন না।

দূর পথ হইলে বর ঘোড়ায় চড়িয়া বিবাহ করিতে যায়। নিকট হইলে ডুলিতে যায়। তাহাদের দেশের ডুলি আমাদের দেশের মত নয়। তাহাদের দেশের ডুলিতে নড়ন চড়ন রহিত হইয়া পঙ্গুর মত বসিয়া থাকিতে হয়। একখানি বাঁশে বা কাঠে একখানি মোটা কাপড়, ঝোলার মত করিয়া বাঁধা থাকে। অনেকে হয়ত দেখিয়া থাকিবেন সেতুবন্ধ রামেশ্বর অঞ্চলের পুরুষ ও মেয়ে ভিখারীরা "আগর মাটীসে মিল যানা" এই গান গাহিয়া কলিকাতার পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহাদের সঙ্গে ছোট ছেলে থাকিলে, সেই ছোট ছেলেটিকে ঝোলায় বসাইয়া পিঠের দিকে ঝোলাইয়া রাখে। পাহাড়ীদের ডুলি ঠিক সেই ঝোলার মত কেবল আকারে একটু বড় এইমাত্র প্রভেদ। পায়ের উপর পা দিয়া সোজাভাবে বসিবার উপায় নাই। মাথা তুলিবার চেষ্টা করিলে মাথায় বাঁশ ঠেকিয়া যায়। পাহাড়ী ব্যতীত অন্য কোন জাতির লোক দেখিলে মনে করিতে পারে, বুঝি একজন মানুষের বুকে বাঁশ দিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। অথবা দূর হইতে দেখিলে মনে হইতে পারে যেন চারি পায়ে দড়ি বাঁধিয়া বংশ খণ্ড যোগে বাহকেরা কোন শ্বেত বর্ণের জীব বিশেষকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে। বেহারারা যখন মাটিতে নামায় তখন, আরোহীকে প্রথমে মাটিতে শুইয়া পড়িতে হয়;—তাহার পর সে উঠিয়া বসে।

বাঙ্গালীদের মত পাহাড়ীদেরও বর বরণের প্রথা আছে। তবে নিম্ন বাঙ্গলায় যেমন ও কাঞ্চীর মেয়েদেরই এক চেটিয়া অধিকার পাহাড়ীদের মধ্যে তাহা নয়; পুরুষেরাই ঐ কাজ করিয়া থাকে। ডুলি হইতে যেখানে বর প্রথমে নামে বরণডালা সেইখানেই

হয়। ডুলি হইতে নামিবার পূর্ব্বে চাউল কলার ডেলা পাকাইয়া বরের গায়ে ছুড়িয়া মারিবার একটা প্রথা আছে। বর পূর্ব্ব হইতে ছাতা আড়াল প্রভৃতি সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মরক্ষার যথেষ্ট আয়োজন করিয়া রাখিলেও অক্ষত দেহ নিষ্কৃতি পায় না, অন্ততঃ এক উপলক্ষে লেখকের হাত হইতে একটী বর নিষ্কৃতি পায় নাই। কন্যাপক্ষীয় সমাগত ব্যক্তি মাত্রেরই হাতে কন্যার আত্মীয়গণ এক ঠোঙ্গা চাউল, কলার ডেলা, বর পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দিয়া যান। অবশ্য অধিকাংশেরই সন্ধান ব্যর্থ হয়; কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে লেখকের সন্ধান ব্যর্থ হয় নাই। সে জন্য লগ্নগণের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠিয়াছিল। সে হাসি সন্ধানীর প্রশংসাসূচক অথবা বর বেচারার আত্মরক্ষায় অসমর্থতাপ্রযুক্ত উপহাস তাহা বলিতে পারি না। বিবাহের পর, বর কনে বিদায়কালীন নমস্কারও আশীর্ব্বাদের আদান ব্যাপার বাঙ্গালীদের মত। ইহাদের পাক স্পর্শ বা বৌভাতের অনুষ্ঠানও আছে। তাহাদের মধ্যে যখন অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে তখন বৌভাতের উদ্দেশ্য যে বিবাহ উৎসব উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনও বন্ধু বান্ধব দের আমোদ আহ্লাদ করা মাত্র। বাঙ্গালীদের সহিত এ প্রথা যে অভিন্ন এমন কথা বলা যায় না।

পাহাড়ীদের গর্ব্ব বিশ্বাস—সাধারণতঃ পাহাড়ীরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, অথচ হিন্দুর নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনের অগ্রণী। অন্ততঃ বিশ পঁচিশটা মুরগী বাড়ীতে নাই এমন পাহাড়ী পরিবার অতি বিরল। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির কুক্কুট মাংস ভোজনে বাধা নাই। ব্রাহ্মণগণও যতদিন উপনয়ন না হয়, ততদিন অবাধে কুক্কুট মাংস ভোজন করিতে পারে। বাঙ্গালীদের যেমন বার মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই আছে ইহাদেরও তাই। সকল পার্ব্বণ উপলক্ষেই ইহারা অন্ন বিস্তর উৎসব করিয়া থাকে, কিন্তু কোন প্রতিমা গড়াইয়া সেই প্রতিমার পূজা করা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। দুর্গা পূজা, কালী পূজা, পৌষ সংক্রান্তি, এবং রাম নবমীর উৎসব তাহারা খুব ধুম ধামের সহিত করিয়া থাকে; তন্মধ্যে দেওয়ালি বা "দেউসি" উৎসব সর্ব্বপ্রধান। দুর্গোৎসবের সময় সপ্তমী হইতে বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত উপার্জ্জনের জন্য কেহ সাধ্যপক্ষে কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করে না। দোকানদারের দোকান ছাড়া কাজ কর্ম্মের সাড়া শব্দ আর কোথাও পাওয়া যায় না। বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই যথাশক্তি নব নব পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পথে ঘাটে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়। সুবিধামত স্থানে বড় বড় দোলানা খাটাইয়া, সেই দোলনায় পুরুষ ও রমণী যুগলে যুগলে পরস্পর সম্মুখীনভাবে দোল খাইয়াই তাহারা খুব বেশী আমোদ পায়। এই সময় তাহারা স্ত্রী পুরুষ সকলেই মদ্যপানাসক্তিতে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয় এবং মদ্যপান-জনিত মত্ততার সহিত কামিনীর সংস্রব থাকাতে পরস্পরে পেটাপিটি, কাটাকাটিও করিয়া থাকে। তদুপলক্ষে খুন জখমও হইয়া থাকে।

সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন বলিদানের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। সে এক বীভৎস কাণ্ড। পথে ঘাটে, সর্ব্বত্রই রক্তের ছড়াছড়ি। ছাগ, মেষ, হাঁস, মুরগি কিছুই বাদ পড়ে না। বিজয়ার দিন তাহারা বাঙ্গালীদের মত নমস্কার-প্রতিনমস্কার, আলিঙ্গন-প্রত্যালিঙ্গন বিনিময় করে না, তৎপরিবর্ত্তে তাহারা তিলক ধারণ করে। তিলক ধারণ বলিতে কেহ ললাটে তিলক মৃত্তিকা ধারণ মনে করিবেন না। চন্দনের ফোঁটা এবং সেই ফোঁটার উপর আতপতণ্ডুল লেপন করিলে যাহা হয় তাহার নাম তিলক। পাহাড়ীদের তিলক দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের আশীর্ব্বাদের চিহ্ন স্বরূপ।

পাহাড়ীদের শ্যামাপূজার উৎসব তিনদিন ব্যাপী। অমাবস্যায় আরম্ভ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন শেষ। বড়দিনের সময় কলিকাতায় সাহেবেরা যেমন নানাবিধ পুষ্পপল্লব ও ধ্বজপতাকাদি দ্বারা নিজ নিজ

বাড়ী সুসজ্জিত করেন পাহাড়ীরা শ্রামাপূজার সময় তাহাই করে। সেই শোভা সজ্জার সঙ্গে দীপাবলী জ্বালাইয়া দেয়। রাত্রে পাহাড়গাত্রে চতুর্দ্দিকে আলোকমালা দেখিতে বড় সুন্দর। পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা দলবদ্ধ হইয়া ঐ দিন হইতে সকলের বাড়ী গিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করে। দল প্রত্যেকের স্বতন্ত্র, মেয়ের দলে পুরুষ থাকে না, পুরুষের দলে মেয়েরা থাকে না। এইরূপ দলে দলে তাহারা পাড়ায় পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাকে ভিক্ষা ঠিক বলা যায় না, অথচ গৃহস্থের নিকট কিছু না লইয়া দলের লোকেরা বাড়ীও ছাড়ে না, যতক্ষণ কিছু না পাইবে ততক্ষণ, চীৎকার করিয়া গৃহস্থকে এমন উত্যক্ত করিয়া তোলে যে, গৃহস্থ কিছু না দিয়া নিষ্কৃতি পায় না। শুভ বৈশাখের দিন নূতন খাতা উপলক্ষে কলিকাতার পথে ছেলেরা যেমন কালি ঝুলি মাখিয়া ছুকাটি বাজাইয়া "বাবুকো ছেলাম, বাবুকো ছেলাম" বলিয়া বিকট শব্দ করিতে করিতে দোকানদারকে অস্থির করিয়া তোলে, এও অনেকটা সেইরূপ; তবে প্রভেদ এই যে, তাহারা কালি মাখিয়া কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করে না, ভদ্রবেশে ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা এই কাজ করে। যে সকল বাঙ্গালী ব. হিন্দুস্থানী বাবুরা বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য সে দেশে বেড়াইতে যান, তদ্দেশীয় প্রথা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বশতঃ তাঁহাদের যাহা দেয়, তাহা হাতে হাতেই দেন এবং তাহারাও সন্তুষ্টচিত্তে লইয়া যায়; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেখানকার স্থানীয় প্রথা এই যে, প্রজ্বলিত দীপ সহ একখানি থালা বা সেইরূপ কোন পাত্রে কিঞ্চিৎ চাউল ও নগদ যাহা দেয় তাহা রাখিয়া গায়ক গায়িকা দলের সম্মুখে ধরিয়া দিতে হয়, তাহারা সেই পাত্র হইতে দত্ত বস্তু নিজেরা উঠাইয়া লয়। এইরূপে তিনদিন গান করিয়া যাহা সংগৃহীত হয়, সেই সংগৃহীত অর্থের অনুপাতে প্রত্যেক দল স্বতন্ত্র ভাবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর দিন ছোট বড় গোছের বনভোজনের ব্যবস্থা করে। যে গান গীত হয় তাহার নাম "দেউসি"। দেউসি শব্দের ব্যুৎপত্তি কি তাহা জানিবার জন্য অনেক পাহাড়ীকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কাহারও নিকট সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ই উৎসবের শেষ দিন। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা পাহাড়ীদের মধ্যে এই পর্ব্বটার মুখ্যতা কিছু অধিক। সেই দিন তিলকের আদানপ্রদান হয়। স্ত্রীপুরুষ সকলেই তিলক গ্রহণ করে। বাঙ্গালীরা যেমন ভগিনীর নিকট চন্দনের ফোঁটা কিম্বা মিষ্টান্ন ও স্থল বিশেষে বস্ত্রাদিও পাইয়া থাকে পাহাড়ীদের ফোঁটায় এ সকলের হাঙ্গামা নাই। তাহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই সকলকে তিলক দেয় এবং লয়।

পৌষ-সংক্রান্তিতে বাঙ্গালীদের মত পাহাড়ীরা পিটে পুলির উৎসব করে। বাঙ্গালীরা গঙ্গা স্নান করে, তাহারা ত্রিবেণীতে স্নান করিতে যায়। তিনটী পার্ব্বত্য নদী ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আসিয়া যেখানে মিলিত হয়, সেই সঙ্গম-স্থলকে ত্রিবেণী বলে। দার্জ্জিলিং জেলার মধ্যে এইরূপ দুইটী ত্রিবেণী আছে। একটী কারসিয়ং হইতে নীচে সাত আট মাইল নামিয়া নামমু নামক স্থানে; আর একটী দার্জ্জিলিং হইতে সিক্কিম ও কালিম্পিং যাইবার পথে মাজিটার নামক স্থানে। নামগুতে ঝুম্ নদীর মত ঝোরা (ঝরণাকে পাহাড়ীরা ঝোরা বলে) বালাসোন নামক নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। নামগু একটী উপত্যকা। এই উপত্যকায় নদীর অপর পার হইতে মিরিক পাহাড় উঠিয়াছে সেই পাহাড়ের পর আর একটী পর্ব্বত শৃঙ্গ উত্তীর্ণ হইলেই মেচি নদীর তীরে পৌঁছান যায়। মেচির অপর পারেই নেপাল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সীমান্ত রেখা। মাজিটারে যে ত্রিবেণী সেখানে রঙ্গিৎ, ত্রিস্রোতা এবং অপর একটী নদীর সঙ্গম স্থল। রঙ্গিতের উপর দোদুল্যমান কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু আছে ঐ সেতুর এক মুখ বৃটিশ সীমানায়, অপর মুখ সিকিম সীমানায়। ত্রিস্রোতা নদী তিব্বত হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিয়াছে। (ক্রমশঃ)

দুর্দ্দিনে

(শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি এ)

কাঙাল হ'লে কুটীর তলে, আরও হ'ব কাছাকাছি
সোনার মালা নাইবা থাকুক, থাক্‌বে ত ফুলমালা গাছি।
না পাই যদি পায়স পিঠে
শাকভাতই মোর লাগ্‌বে মিঠে
ভাবনা কিসের? আছে তোমার অধর পুটে সুধার চাঁচি।

দেহে যদি না রয় ওরূপ মনে ত তা' রবেই রবে;
প্রেম যদি রয়, পিঞ্জরে তার যৌবনেরেও রইতে হবে।
স্বাস্থ্য যদি না রয়, সাথী
পাব তোমায় দিবসরাতি
উঠ্‌ব বেঁচে তোমার প্রেমে যত্নে সেবায়, যদিই বাঁচি।

যশ যদি যায় সহস্রগুণ গাইবে তুমিই পুরাণো যশ
অন্ধ হলে, স্পর্শগোচর দ্বিগুণ হবে আমার বশ।
অটুট যদি থাকে এ প্রেম
যায় যাবে যাক্, রূপ যশ হেম
অদৃষ্টেরে চাবুক মেরে তেমনি রব যেমন আছি।

কান্ত কবি। *

(কুমার শ্রীরাধিকাভূষণ রায়)

আজ আমরা যাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য এখানে সমিলিত তাঁহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন—তাঁহার 'বাণী' "কল্যাণী"র গীতি-মালিকা আজ বাংলার ঘরে ঘরে সকলের কণ্ঠভূষণ হইয়া আছে, "আনন্দময়ী"ও "অভয়া" সাধকের আদরের বস্তু, "অমৃত আজ "বাল-ভামিত", "বিশ্রাম" বহু কর্ম্মক্লান্তের সহচর।

তাঁহার গানের সহজ সরল ভাষার মাধুর্য্যে গানগুলি অতি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। গানগুলি আবৃত্তি করিলেও পদলালিত্যে ও শব্দ ঝঙ্কারে শ্রোতার কর্ণকুহরে আনন্দবর্ষণ করে। কান্ত কবির পদাবলী বিদ্বেষী এক সমালোচক অন্য দোষ না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়াছেন, "কান্ত অতি শান্ত ছেলে,পালিস করেন তায়"। সমালোচনা অনেকে অনেক প্রকার করিতে পারেন, তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে কান্ত পদাবলীর মধ্যে আমরা একাধারে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র-

* পাবনায় কান্তকবির স্মৃতি সভার সভাপতির অভিভাষণ।

তালের সমাবেশ পাই, বৈষ্ণব কবি ও সাধকের তন্ময়তা পাই।

কান্ত কবির আধ্যাত্মিক পদাবলীর মধ্যে প্রকৃত ভক্তের সাধনার সুর বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই ভাব-প্রবণ। তাঁহার মধ্যে সাধকের যে মানবতা আছে তাহাতে কঠিন প্রাণেও তন্ময়তা আনিয়া দেয়, তাহাতে ভগবানের উপর ভক্তের সম্পূর্ণ নির্ভরতা অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি আপনার অহমিকাকে কি পরিমাণ জয় করিয়া সেই পরম করুণাময়ের চরণে আপনাকে কেমন ভাবে বিলাইয়াদিয়াছেন তাহা তাঁহার সাংসারিক জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা-স্থলে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে। পুত্র শোকাতুর পিতা তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর জন্য ভগবানকে দায়ী না করিয়া—যাহা আমাদের মত সাধারণ মায়িক জীব সাধারণতঃ করিয়া থাকে—সেই ভীষণ শোকের মধ্যে দিয়াও তাঁহার পরম করুণা, হৃদয়ে গভীর ভাবে অনুভব করিয়া, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন :—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।

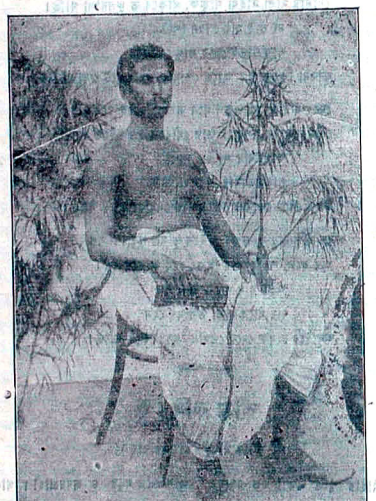

কান্তকবি রজনীকান্ত (যৌবনে)

আমি ত, তোমারি গো, তোমারি সকলি ত জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত-চিত, আমারি ব'লে কেন ভ্রান্তি হ'ল যেন ভাঙ্গ এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব।"

তিনি নিজে ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই পুত্র-শোকাতুর মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্রকে বুঝাইতে গিয়াছিলেন—

"বিশাল জগতীতলে প্রতিপলে অনুপলে
কীট হ'তে গ্রহরাজি জন্মে মরে কত যায়,
কোন্ বিধানে জন্মে, মরে বা সে কিনিয়ে
জানে বা কে, বোঝে বা কে সাধ্যকার।

মোহ-মুগ্ধ কর দৃষ্টি, তুমি, করনি সৃষ্টি,
যার ধন সেই লয় তবে কেন হাহাকার।

একা আসে যায় একা, পথে দুদিনের ব্যথা
ছায়াতে বস্তুর জ্ঞান এ নহে পুরুষকার॥"

যাহার মধ্যে যে জিনিষ জন্ম সংস্কার হেতু আসে, তাহার সৌন্দর্য্য ও বাস্তবতা প্রতি কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়। কান্ত-পদাবলী শ্রবণে আমাদের পাষাণ প্রাণেও রেখা অঙ্কিত করে, কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়! ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে তাঁহার প্রত্যেক গানের মধ্যেই তন্ময়তা আছে প্রত্যেক পদটীর ভাবই হৃদয়ে পূর্ণভাবে অনুভব করিয়া রচিত। এই অনুভূতিকেই Sincerity বলা যাইতে পারে। Carlyle এর মতে Sincere না হইলে Hero হওয়া যায় না। প্রাণে ভাব বা অনুভূতি না থাকিলে অন্যকে অভিভূত করা যায় না।

রজনীকান্ত সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার বলিয়াছেন যে, তিনি যেমন আলাপে, তেমনি প্রলাপে। কান্ত যাহা অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে অনুভব করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই—বড় সরল, সুন্দর তরঙ্গায়িত ছন্দে বলিয়া গিয়াছেন আমরা অনেক ক্ষেত্রে লেখকের বা বক্তার পদলালিত্যের আশায় অনেক প্রকার সদুপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য আওড়াইয়া থাকি কিন্তু সে গুলি নিজে হৃদয়ে অনুভব না করিয়া বলিলে বা লিখিলে, তাহা শ্রোতার মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না। রজনীকান্তের হাস্যরসের গানগুলির মধ্যেও প্রকৃত ব্যঙ্গরসের পরিচয়ই পাইয়া থাকি। কান্ত কবির গানগুলির মধ্যে কুত্রাপি ব্যক্তিগত আক্রমণ দেখা যায় না। সাধারণের মধ্যে ও সমাজে মধ্যে যে দোষগুলি বর্জ্জনীয় তাহারই সংশোধন কল্পে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, অন্যথায় যাহা কিছু তাহা ছাঁকা হাস্যরস মাত্র। ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা গুলি শিশুর দন্তের ন্যায় শুভ্র এবং শিশুর দংশনের ন্যায়ই আলাতর। উকীল, মোক্তার, হাকিম, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, সরকারী উকীল, ও আমার ন্যায় ভোট-প্রার্থী কেহই তাঁহার কাষাঘাত এড়াইতে পারেন নাই, এবং আমি ইহা স্বীকার করি যে ঐ ব্যাঙ্গোক্তি গুলি যতই তীব্র হোক কিন্তু বড়ই নির্ম্মম সত্য। ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়াও আমরা কবির মহানুভবতার পরিচয় পাইতেছি। যিনি একদিনের জন্যও তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন তিনিই তাঁহার স্বভাবসুলভ সরলতার পরিচয় তাঁহার গানে ও ব্যবহারে অনুভব করিয়াছেন।

আমরা সমাজে একটু গান গাহিতে জানিলে মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করি। বহু তোষামদ করিয়াও আমাদিগকে গান গাহিতে বাধ্য করা কঠিন হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে রজনীকান্ত কলিকাতায় আমাদের বাসায় একদিন থাকেন এবং প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্নান আহারের সময়টুকু মাত্র বাদ দিয়া, রাত্রিকাল পর্য্যন্ত অনবরত, কোনও প্রকার বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, প্রত্যেকের অনুরোধ মত গান গাহিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি সেই একদিন ভিন্ন আর এ জীবনে দেখার সৌভাগ্য ঘটে নাই; এখনও এ অযোগ্যের হৃদয়ে তাঁহার সেই সদানন্দ মুখখানি গাঁথা আছে। তাঁহার ব্যাধির সময় মনে মনে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, বালক বলিয়া সে ইচ্ছা পূরণের সুযোগ তখন আমার না থাকায় নিজ কর্ত্তব্য-ত্রুটীর জন্য সারা জীবন লজ্জিত থাকিতে হইবে। দেশত্র হইয়া এমন কবির এমন সময়ে কোনই উপকারে লাগিলাম না-এ আক্ষেপ আর রাখিবার রাখিবার স্থান নাই। আমরা গুণের আদর করিতে জানি না; চলতি কথায় বলে "দাঁত থাকতে দাঁতের আদর নেই," কিন্তু তাঁহারাও আমাদের চেয়ে ভাগ্যবান। যাঁহারা পরে দাঁতের অভাব অনুভব করিয়া কষ্ট পান এবং তাহা মোচনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা কবির মূল্য যদিও এখন মুখে মুখে অনেকেই অনুভব করিতেছি, কিন্তু কার্য্যে তাহার কোনই পরিচয় দিতে পারিয়াছি কি? "পারিয়াছি" বলিয়া কেহই বুকে হাত দিয়া সাহস করিয়া বলিতে পারিব না। কবির নিজ

হেলাতে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ যাঁহারা প্রধান উদ্যোগী, যাঁহাদের অকৃত্রিম চেষ্টায়ও যত্নে এখন আমরা এখানে সম্মিলিত, তাঁহাদিগকে অনেকেই বালক অর্ব্বাচীন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহি এবং এই উপেক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে কি ভাবে লড়াই করিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহা এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহারা জানেন না বলিয়া আমার মনে হয় না। ইঁহারা বসিয়াই বালক উপেক্ষনীয় নহেন; পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইঁহারাই সমস্ত বিষয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের আশা স্বরূপ,—সে জন্য কোথায় আমরা সর্ব্বতোভাবে ইঁহাদের এই সদ্ভাবতার পোষণ জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব না, সেই স্থলে নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের পুরস্কার—অবহেলা ও উপেক্ষা দেখাইতেছি!! আমাদের জাতীয়-জীবনের দুর্ব্বলতার ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া আমার মনে হয়। কোনও একটী সঙ্ঘশক্তি গড়িয়া তুলিতে হইলে সেই শক্তির প্রতি অঙ্গের পরস্পর সাহায্য প্রয়োজন ও অনিবার্য্য। তাই, আমার একান্ত অনুরোধ যে কবি রজনীকান্তের স্মৃতি-রক্ষার্থ এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু চেষ্টা ইঁহারা করিয়াছেন তাহার সফলতার জন্য আমাদের সকলেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কান্তকবির স্মৃতি-সভায় দাঁড়াইয়া আপনাদিগের নিকট এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমি জানাইতেছি।

স্বদেশীযুগের প্রথম জাগরণের দিনে যাঁহার সংজ সরল গীত "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" সকলের মুখেই শোনা যাইত, আজও সেই সঙ্গীতের ঝঙ্কার স্পষ্ট শুনা যাইতেছে, ইঁহার অনুস্থনের পরিসমাপ্তি কোথায় তাহা জানি না, বোধ হয় কেহই বলিতে পারেন না। তবে ইহা ধ্রুব সত্য যে দেশের জন্য যখনই লোকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে তখনই হৃদয়-তন্ত্রীতে কান্ত কবির স্বদেশী সঙ্গীতই প্রথমে বাজিয়া উঠিবে। যত দিন বাংলা দেশ আছে, ততদিন তাঁহার সঙ্গীত গৃহে গৃহে উন্মাদনা জাগাইয়া রাখিবে; যতদিন বাংলা ভাষা আছে ততদিন রজনীকান্ত অমর।

ভগবৎ প্রেমিককে এ সংসারে দুঃখ কষ্ট দিয়াই ভগবান পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, তিনি প্রকৃত সাধক ও ভগবৎভক্ত কি না। দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়া যিনি এক দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অবিচলিত থাকেন, ভগবান তাঁহাকে আপনার কোলে তুলিয়া লন। বৈষ্ণব কবি শ্রীভগবানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"যে করে আমার আশ
করি তার সর্ব্বনাশ
তাতেও যদি না ছাড়ে আশ
হই আমি তার দাসের দাস।"

আমাদের কবির ভগবানে গভীর বিশ্বাস কোনও অবস্থাতেই অবিচলিত হয় নাই। বাক্‌শূন্য, যন্ত্রণা-কাতর, চলৎশক্তি রহিত মরণ-পথ যাত্রী কবি ঈশ্বরে নির্ভরতা ত্যাগ করেন নাই—সে নির্ভরতা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হইয়াছেন।

মরণের তীরে দাঁড়াইয়াও তিনি রুদ্ধকণ্ঠে গায়িয়াছেন—

(আমায়) "সকল রকমে কাঙ্গাল ক'রেছ
গর্ব্ব করিতে চুর

• • •

ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার কবিতা ভাল বাসে দেশ
তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিলে মোরে
বেদনা দিলে প্রচুর।"

সাধন-মার্গের উচ্চগ্রামে না উঠিতে পারিলে কোন সাধকই যে এত বড় কথা বলিতে পারে, তাহা আমাদের ধারণাতে আসে না—তাই আমরা মুগ্ধদৃষ্টিতে সে মহত্বের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি; আর আমাদের মস্তক আপনা হইতেই সসম্ভ্রমে নত হইয়া আসে।

ইষ্টদেবী

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

আয় কবিতা, প্রাণের সাথী, ফুলের মালা দুলিয়ে আয়,
আয়রে আমার হাসির পাখী, ধরার ধুলো ভুলিয়ে আয়!
বাজুক্ তোমার ছন্দ-নূপুর, সন্ধ্যা-রাতি, সকাল-দুপুর,
সাম্‌নে আমার রূপ-স্বরগের বন্ধ দুয়ার খুলিয়ে আয়,
পুলক-দোলা দুলিয়ে আয়।

• • •

আল্‌সে কুঁড়ের খাম্‌খেয়ালে তোর সাথে মোর পরিচয়,
লক্ষ্মী-প্যাচার ডাক্ শুনি নি, চিত্ত তবু গরিব নয়!
ছেঁড়া কাঁথায় সোণার স্বপন, তোর প্রসাদে করচি বপন,
কাঙালে ভাই করলি রাজা, কুবের-পুরী তার আলয়—
ভাগ্যে হোলো পরিচয়!

• • •

সওদাগরির ধার ধারি না, রাজপথেরও নই পথিক,
পয়সা-টাকার কর্‌তে হিসেব যায় যে হয়ে সব বেঠিক!
মুখের খোঁটা ঢের সয়েছি, সবাই জানে ভূত হয়েচি,
রইব তবু জড়িয়ে তোমায়, যতই লোকে বল্‌বে ধিক্,
সোজা-পথের নই পথিক!

• • •

প্রেম তো আমার নয়কো তরল, মন জানে তা প্রাণ জানে,
বিশ্বলোকের দৃশ্যপটে মূর্ত্তি তোমার সযতনে।
মরুতে তুই শ্যামল আশা, বোবার মুখে তুই যে ভাষা,
ঝঞ্ঝামাঝে কাব্যগীতি উঠ্‌চে ফুটে তোর গানে
কেউ না জানুক্, প্রাণ জানে।

• • •

দখিন হাওয়ার গন্ধভরা মধুর মধুর শ্বাস যে তোর,
পাপ্‌ড়ি-ঠোঁটে জ্যোছ্না-হাসি তায় সরিয়ে আমার ঘোর!
উষার আলোয় নয়ন অমল, চরণ দুটি ল্যাক্ত কমল,
ঐ প্রতিমার সাধন ক'রে দুঃখ-শোকে দিচ্চি গোর—
গোলাম হয়ে রই বিভোর।

———

কপালীর মেয়ে

(গল্প)

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু বি, এ)

(১)

"বলি, হ্যাঁলা ঠাকুর ঝি, গতিক খানা কি? আজ কি রেঁধে বেড়ে কাউকে খাওয়াতে হবে না?" বলিতে বলিতে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে গোপালীর মা বিধুকে ঝঙ্কার দিয়া ডাক দিল। বিধু কাঁথাখানা গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া ধড়মড়িয়া ছেঁড়া চেটাইয়ের উপরে উঠিয়া বসিল, তখনও তাহার শ্রান্ত অবসন্ন চক্ষু হইতে তন্দ্রার আমেজ একবারে অপসারিত হয় নাই।

বিধু ভীত কম্পিত করুণ কণ্ঠে বলিল, আজ আর শরীর বইছে না, বউ। পোড়া জ্বরে ধরেছে, না যমে ধরেছে! তোমার দুটী পায়ে পড়ি বউ, যা হয় দুটো ডালে ভাতে চাপিয়ে দাও, আমি ওবেলা যেমনকার কাজ তেমনই করব।"

যেন সাপের লেজে পা পড়িল—গোপালীর মা ফোঁস করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "ওমা তাই বটে! উনিই একলা সংসারের কাজ করেন যত—আমরা দুটো চালডাল চড়াতেও জানিনি। আধিক্যেতা কত! তবু যদি শ্বশুরের ভিটে হ'ত! ঈচ্ছা করে না, দুবেলা হাঁসের পেটে ভেয়ের ভাত গিলতে?"

এই সময়ে বাটীর অঙ্গনে মাথার প্রকাণ্ড তরিতরকারির মোট নামাইয়া গামছায় হাওয়া খাইতে খাইতে মুটে কপালী ক্রোধ-মিশ্রিত গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, কারে বলছিস গোপালীর মা, ঐ মিটমিটে শকুনকে—

তাহার মুখের কথা সাঙ্গ হইতে না দিয়াই গোপালীর মা মুখঝাপটা দিয়া বলিল, আবার কাকে? লোকের বাড়ী চুলো নামাবার সময় হ'ল, রাজরাণী এখনও বিছেনা ছাড়েন নি। কেন বাপু! এমন আতুরী বোন্, মারবার সময় বুঝে মারতে পার না? কাল যখন কাঠের চেলা পিটবে বলে ঠিক করেছিলে, তখন আগে হতে খানিকট টাটকা মাখন এনে রাখতে পার নি?

পৈঠার উপর উপবেশন করিয়া মুটু বলিল, কেন, কি হয়েছে? এত বেলা হ'ল, এখনও কি রান্না চড়ে নি?

গোপালীর মা হাত মুখ নাড়িয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, তা আর চড়ে নি! বলে,—

ভাত বেড়ে রয়েছি বসে
গোপাল আমার ঘাবে এসে।

চক্ষ দেখে আর বাঁচি নি! যেমন ভাইটী, তেমনই বোনটী! ভাজা মাছটী উলটে খেতে জানেন না। বলি, নাবাপেট আজ ভরাবে কি দিয়ে, চুলোর পাঁশ দিয়ে?

বিধু আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, কাঁথা মুড়ি দিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহিরে আসিল। তাহার মাথা দারুণ যাতনায় ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। অতিকষ্টে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সে বলিল, এই যাচ্ছি বউ, যা পারি দুটো চড়িয়ে দিয়ে আসি।

কথা শেষ হইল না, বিধু দাওয়ায় নামিয়াই হঠাৎ সশব্দে পড়িয়া গেল। মুটু চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ও?

গোপালীর মা তখনও ব্যঙ্গের সুর ছাড়ে নাই, মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, ন্যাকরা করছে গো, ন্যাকরা করছে। বারোয়ারির যাত্রা দেখ নি, ঐ যে সীতে সতী অশোকবনে মুচ্ছো গেছলো না—

মুটু তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, দুই তিন লাফে দাওয়ার উপর উঠিতে উঠিতে বলিল, এই যে হারামজাদীর ন্যাকরা ভাঙছি। ময়নাগিরির জায়গা পাও নি আর?

মুটুর বলিষ্ঠ দেহ রাগে দশ হাত ফুলিয়া উঠিল, শিরাগ্রন্থিচয় দড়ার মত মোটা হইয়া, উঠিল। দাঁতে দাঁত ঘসিয়া চোখ দুটা জবাফুলের মত করিয়া সে বিধুর দীর্ঘ চুলের গোছা ধরিল; প্রহারের জন্য বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিল। তখন সৌভাগ্যক্রমে বিধুর জ্ঞান ছিল না, না হইলে তাহার শীর্ণ দুর্ব্বল দেহ এতক্ষণ কি যাতনা ভোগ করিত, তাহা কল্পনাও করা যায় না।

গোপালীর মা ধীর ভাবে এই কাণ্ড দেখিতেছিল। ছেলের মা সে, কিন্তু ইহাতে তাহার আপত্তি ছিল না। আজ হয় ত কপালীদের ঘরে একটা খুনোখুনি হইয়া যাইত, কিন্তু মুটু যখন বিধুকে প্রহারে হস্ত উদ্যত করিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ "হাঁ, হাঁ, কর কি," বলিতে বলিতে পঞ্চু ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত—তিনি কপালীদেরই বামুন, বাপের কাজ নূতন পাইয়াছেন, কপালীদের ঘরে বারব্রত পূজো আচ্ছা—সবই করেন।

মুটু বাধা পাইয়া বিধুকে ফেলিয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। পঞ্চুঠাকুর দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া বিধুর একখানা হাত তুলিয়া নাড়ী টিপিয়া বলিলেন,—ইস, জ্বরে কাঠ ফেটে যাচ্ছে, তার উপর মারধর!—মুটু, যাও যাও, কবরেজ ডেকে আন। আর গোপালীর মা, তুমি যাও, এক ঘটি জল নিয়ে এস, মুখে চোখে ঝাপটা দাও।

উহারা চলিয়া গেলে পঞ্চুঠাকুর সেই জ্ঞানরহিতা বিস্রস্তবসনা বিধুর দিকে নির্নিমেষ-নয়নে তাকাইয়া রহিলেন।

(২)

বিধু পাড়ায় পাড়ায় চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল। সে বাল-বিধবা, শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক তাহার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুচিয়াছে,—তখন সে সবে ৯ বৎসরের বালিকা। তাহার পর দশ বৎসর সে ভ্রাতার আশ্রয়ে রহিয়াছে। প্রথমে ভাই ভগিনীকে বড় যত্ন করিত; কিন্তু বিবাহের পর হইতে একখানা কাল মেঘ কোথা হইতে উদয় হইয়া তাহাদের নির্ম্মল স্নেহাকাশ আঁধার করিয়া দিল; বিশেষতঃ গোপালীর জন্মের পর হইতে গোপালীর মা মুটুর সমস্ত হৃদয়খানা জুড়িয়া বসিল, তথায় বিধুর এতটুকু স্থান রহিল না।

হিন্দুর ঘরের বিধবা—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থের পাড়ায় বাস,—কাজেই জাতিতে কপালী হইলেও বিধুকে কতকটা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইল। আর হিন্দুর ঘরে বিধবার স্কন্ধে যে সমস্ত ভার পড়ে, বিধুর উপর তাহার সবই পড়িল। রাঁধা বাড়া, ঘরনিকানো, গোসেবা, ধানসিদ্ধ করা, ইত্যাদি সকল কাজই তাহার ভাগে—গোপালী জন্মগ্রহণ করিলে পর তাহার পালন ভারটাও তাহার উপর পড়িয়াছিল। মুখটী বুজিয়া সে কাজ করিয়া যাইত বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহার নিস্তার ছিল না। গোপালীর মা বয়সে তাহার অপেক্ষা বড় না হইলেও সম্পর্কে বড়র দাবী করিত এবং সেই দাবীর বলে তাহার প্রতি যখন তখন যে ব্যবহার করিত, তাহাতে বিধুর অন্তরের ভিতরটা পুড়িয়া খাক হইয়া যাইত, অনেক সময়ে সে মৃত্যুকামনা করিত। বিধবা বোনের ভায়ের ভাত খাওয়া যে কতটা গর্হিত কার্য্য, তাহা গোপালীর মা তাহাকে কথায় কথায় বুঝাইয়া দিত।

মুটুর ব্যবহার দিন দিন মন্দ হইতে আরও মন্দ হইতে লাগিল। শেষে মুটুর মুখ হইতে হাত উঠিল। যেদিন প্রথম বিধু ভায়ের হাতে চড় খাইল, সেই দিন সে পুকুর ঘাটে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ঘোষেদের গিন্নী ঘাটে আসিয়া পড়ায় তাহার আর মরা হয় নাই। তাহার পর পাথরের উপর জল পড়িতে পড়িতে যেমন পাথর

ক্ষয় হইয়া যায়, তেমনই প্রত্যহ চড়টা কিলটা লাথিটা ঝেঁটাটা খাইতে খাইতে মার তাহার গা-সহা হইয়া গিয়াছিল—তাহার মরিবার সময় পাষাণের মত ক্ষয় হইয়া গেল।

যেদিন দারুণ জ্বরের উপরেও তাহার দাদা তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহারে উদ্যত হইয়াছিল, ঠিক তাহার পূর্ব্ব দিনে তাহার গুণধর দাদা তাহাকে সামান্য এক ক্রটি বিচ্যুতির জন্য চেলা কাঠ পিটিয়াছিল। সেই প্রহারের ফলেই বিধুর জ্বর হয়। জ্বর ছাড়িলেই সে যেদিন চলিতে সমর্থ হইল, সেই দিন তাহার জীবনে—বিশেষতঃ ভায়ের ভাতে ধিক্কার বোধ হইল। সে বাপের কাছে ভিটার একখানা ঘর ও কয়েক বিঘা জমী পাইয়াছিল। বৃদ্ধ কপালী বিধবা কন্যার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার পর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিল; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সে ভায়ের ভাত খাইত না। কিন্তু সে বিধবা, চিরদিন পরনির্ভরশীলা, সংসারানভিজ্ঞা, কাজেই মুটু তাহার ঘর ও জমী স্বয়ং উপভোগ করিলেও তাহাকে তাহা জানিতে দিত না।

বিধু বাড়ী বাড়ী ঘুরিল। চাটুর্য্যে গৃহিনী বলিলেন,—না বাপু, ছোট নোকের মেয়ে তুমি, তোমরা ত জলচল নও, তুমি কি কাজ করবে বাপু?

চক্কোত্তি গৃহিনী বলিলেন, ম্যা গো কপালী! ইত্তিক জাত? পালাও, পালাও বাছা, এখানে কিছু হবে না।

বোস গিন্নী বলিলেন, তাই ত—তা, কোথায় কাজ দিই বাছা? গোয়ালে ঢেঁকিশালে ত নোকের অভাব নেই; তুমি আর কোথাও খুঁজে দেখ গে বাছা।

বিধু কাকুতি মিনতি, কান্নাকাটি,—শেষে পায়ে ধরাধরি, কিছুই বাকি রাখিল না; কিন্তু সর্ব্বত্রই এক কথা, ইত্তিক জাত, জলচল নয়!

বিধু শেষে মুখুয্যেদের বাড়ী মাথা কুটিয়া বলিল, না হয় পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে দাও, ছেলে ধরতে দাও, যা হয় দাও। ওগো, আমি মাইনে চাই নি, কেবল দুটো ভাত!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—বিরাট হিন্দু-সমাজের বক্ষে তাহার চাকুরী মিলিল না, আশ্রয় মিলিল না, স্থান হইল না। সে হতাশ মনে ঘরে ফিরিতেছিল। তখন গোধূলী—আলো আঁধারে পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছিল।

বাঁড়ুয্যেদের আম বাগানের পার্শ্ব দিয়া যে সরু পথটা খাল ধারে গিয়াছে, সেই পথটা দিয়া বিধু বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। তাহার গতি মন্থর—সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলেও সে যেন বাড়ী ফিরিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিল না। হঠাৎ বেড়ার ওধার হইতে টুপ করিয়া একটা লেবু বিধুর পায়ের কাছে কে যেন ফেলিয়া দিল। বিধু 'মাগো' বলিয়া চমকিয়া উঠিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই একটা লোক বেড়া টপকাইয়া পথের মাঝে উপস্থিত হইল,—সে পঞ্চু ঠাকুর। বিধু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

পঞ্চুঠাকুর মিনতির সুরে তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিল, "বিধু, যা বললুম তার কি হ'ল? এমনই করে গোঁয়ারের হাতে মার খেয়ে কি জানটা খোয়াবে?" পঞ্চুঠাকুরের গলার স্বর কাঁপিতেছিল।

বিধু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল; সে ঈষৎ ক্রোধ-জড়িত স্বরে বলিল, "ঠাকুর, নেক্‌ণা কোরো না, পথ ছাড়। এমন করে পথে ঘাটে ত্যক্ত করলে ভাল হবে না বলছি।"

"ঐ ত, ঐ ত! ভাল করতে গেলে মন্দ হয়—ঘরে চোরের মার খেয়ে দু-মুঠো ভাত পাও, তার চেয়ে—"

"তার চেয়ে কি? তার চেয়ে ধর্ম্ম খুইয়ে তোমার সঙ্গে ঘরের বার হবো, কেমন,—এই ত?"

"আহা হা, কুলের বার কেন? ধর না—"

"না, না, ধরতে হবে না কিছু, তুমি সর। তুমি না বামুন?"

"বামুন তা কি? দেখ বিধু, তোমার ঐটী পায় পড়ি, বল ত চল তোমায় নিয়ে কল্‌কাতায় যাই। কেন এখানে পড়ে পড়ে মার খেয়ে—"

"তুমি সর, সর,—এমন নচ্ছার নোকত কোথাও দেখি নি। গেরস্থর মেয়ে, হলুমই বা ছোট নোক—ধর্ম্ম ভয় নেই? তুমি যখন তখন আমায় অমন কর কেন—নেখন দিচ্ছ, পত্তোর দিচ্ছ, আমরা মুকখু নোক, ও সবের কি ধার ধারি? যদি কত্তাদের নেখন দেখাই?"

পঞ্চুঠাকুর খেলোয়াড় ছেলে—তাহার জ্ঞান ছিল, "ঘরে গালি তবে জয়"। সে দ্রুতগতি বিধুর হাত ধরিতে গেল, বিধু চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে খালের দিক হইতে একটী লোক চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া মাত্র পঞ্চুঠাকুর এক লম্ফে বেড়া টপকাইয়া বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

লোকটী আর কেহ নহে, গ্রামের মৈমুদ্দীন শেখের পুত্র তাজিমুদ্দীন। সে বিধুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ও, পঞ্চুঠাকুর না? তা, ও কি তোমার উপর কোন জুলুম করছিল?

বিধু নীরবে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাজিম আবার বলিল, তা, তোমার দাদাকে বলে দাও না কেন? আমাদের ঘরে হ'লে শালার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলতুম—আমরা ও সব বামুন ফামুন মানিনি।

তাজিম এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। বিধু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ছুটিয়া গিয়া ডাকিল, শেখের পো?

তাজিম ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিধু অশ্রুসিক্ত মুখ উত্তোলন করিয়া বলিল, শেখের পো, তোমাদের বাড়ী একটা চাকুরী দিতে পার—না হয়, ধান ভানা, গোয়াল মুক্ত করা, যা হয়; তোমাদের ত ছোঁয়া লেপার বালাই নেই।

তাজিম বিস্মিত হইল, বলিল, সে কি, তুমি আমাদের বাড়ীর কাজ করবে?

বিধু ক্রোধাভিমানাহত সুরে বলিল, কেন করব না? হিঁদুর ঘরে যদি কাজ না পাই, তবে মুছলমানের বাড়ী ছোক আর যে বাড়ী হোক, কাজ এক জায়গাতে করতে হবেই ত। না খেয়ে ত মরতে পারি নি।

তাজিম উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন, তোমার দাদা?

"দাদার ভাত আর উল্‌তে চাইছে না",—এই কথা বলিয়া বিধু সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। তাজিম বিস্মিত ও চকিত হইয়া তাহার গতিহীন দেহের দিকে চাহিয়া রহিল।

(৩)

পাড়ায় ভয়ানক ঘোঁট পাঁচাল আরম্ভ হইয়াছে। মুটু কপালীর ভগিনী বিধবা বিধু বৃদ্ধ মৈমুদ্দীন শেখের বাড়ী চাকুরী লইয়াছে। মুটুর উপর ভয়ানক সামাজিক উৎপীড়ন হইবে বলিয়া কথা উঠিয়াছে। পাড়ার মোড়লরা প্রত্যহ বাঁধা বকুলতলায় সাঁঝে সকালে 'কমিট' বসাইতেছেন—কি উপায়ে মুটুকে সমাজচ্যুত করা হয়। এত বড় স্পর্দ্ধা! হিঁদুর ঘরের বিধবা, ভাই থাকিতে মুসলমানের ঘরে ধান ভানিতে যায়? বৃথা মুটু কাঁদা কাটা করিল,—সে বিস্তর ধমক ধামক করিয়াছে, চোখ রাঙ্গাইয়াছে, গালিমন্দ পাড়িয়াছে, এমন কি মারধরও করিয়াছে, কিন্তু বিধু নাছোড়-বান্দা। তাহার মুখে এক কথা, সে কাহারও গলগ্রহ হইবে না। সে নিজে রোজগার করে, নিজের পেটের ভাতের যোগাড় করে, নিজের কুঁড়ে ঘরে চাল ডাল ফুটাইয়া নিজে খায়—মুটুর

সহিত সে কোন সম্পর্ক রাখে না। এখন সে যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। আগে মুটুকে সে যমের মত ভয় করিত, ভয়ে মুখ তুলিয়া কথা কহিত না, পড়িয়া মার খাইত, তবু জবাব দিত না। কিন্তু এখন সে মুটুর কথার উত্তরে সমান ওজনে লৌকিক সম্পত্তির অংশ চায়। এমত অবস্থায় মুটু কি করিতে পারে? সমাজপতিরা বিধুকে একবার বুঝাইয়া দেখুন না কেন।

তাহাই হইল। একদিন সমাজপতি মোড়লরা দল বাঁধিয়া বিধুর কুটীরে দেখা দিলেন বিধু তখন রন্ধনের যোগাড় করিতেছিল। বিধু দাওয়ার উপর তাঁহাদের বসিতে চৌটাই পাতিয়া দিল। কিন্তু "থাক, থাক, আমরা এই উঠোনেই দাঁড়াচ্ছি" বলিয়া মোড়লরা বিধুর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া কোনরূপে কপালী-সংস্পর্শ হইতে জাতি রক্ষা করিলেন।

চাটুয্যে মশাই বলিলেন, "হাঁ বাছা এটা কি তোমার ভাল হচ্ছে?"

বিধু কপাটের আড়ালে অদৃশ্য থাকিয়া বলিল, "কোনটা?"

চাটুয্যে বলিলেন—এই মুছলমানের বাড়ী চাকুরী করা? এতে কি তোমার জাত যাচ্ছে না? এতে কি তোমার দাদাকে একঘরে হতে হবে না?

বিধুও গলাটা বেশ-জোর করিয়া বলিল, আর বামুনের ছেলে যদি কপালীর মেয়েকে কুলের বার করবার জন্যে পথে ঘাটে পা জড়িয়ে ধরে, পত্তোর নেখানিখি করে, তাতে জাত থাকে?

সহসা সেখানে যদি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় কেহ এত চমকিত হইতেন না। সকলে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। বিধু একখানা পত্র উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার বলিল, এই নেখা পড়ে দেখ আপনারা—এই নেখা পঞ্চুঠাকুর আমায় নিখেছে। আমরা মুকখু ছোটনোক, পড়তে জানি নি, তোমরা পড়ে বুঝিয়ে দাও।

মুখুয্যে মহাশয় একটু সপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—এ্যাঁ, এ্যাঁ, তাই বল, পঞ্চুঠাকুর —ও: কপালীর বামুন!

পঞ্চুর শ্বশুর শিবরাম ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গে রিরি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, কি হে মুখুয্যে, বলি ধাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, না? তা, যেতে যাও, বাকি কেউ যাবে না। বলি, চারু মুকুয্যে যে নিতি কাণ্ডরাণীর ঘরে হামেশা যাওয়া আসা করে—

চারিদিক হইতে মোড়লরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আহাহা, কর কি, কর কি!

শিবরাম বলিলেন, তবে আঁতে ঘা দিয়ে কথা কও কেন? কপালীর বামুন! না?

যোস্‌লা মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, আঃ ভাল আলা, যত অবান্তর কথা এনে ফেল্‌লে! বলি, হাঁগা বাছা তুমি হিঁদুর ঘরের বিধবা—তুমি কি বলে সমাজ ছেড়ে মুছলমানকে ধর্‌লে?

বিধু দৃঢ়স্বরে বলিল, সমাজ যদি আমারে ছাড়ে, তবে আমি সমাজকে আঁকড়ে ধরে বসে থক্‌লে কি হবে? তোমরা কুকুর বেড়ালকে ছুয়ঠো ভাত দাও, কপালীর মেয়েকে দাও না, কেন না জল ছুঁলে জাত যাবে। তোমরা যাও—তোমরা আমায় চাও না, আমিও তোমাদের চাই নি।

মোড়লরা একবারে হতভম্ব। তাঁহারা এমন কড়া কথা শুনিবেন আশা করিয়া আসেন নাই। এখন এই এক রত্তি মেয়ের কাছে এই কথা শুনিয়া জবাব খুঁজিয়া পাইলেন না।

শেষে অনন্তোপায় হইয়া মোড়লরা শাসাইয়া গেলেন, যদি সে মুছলমানের বাড়ী চাকুরী করে, তবে তাহাকে মুসলমানের ঘরে গিয়া বাস করিতে হইবে, এখানে তাহার স্থান হইবে না।

(৪)

গ্রামে আজ কয়দিন হইতে এক কৌতুক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লোকে বলে, সে না কি মুসলমানদিগকে হিন্দুর বিপক্ষে উত্তেজিত করিতেছে, বলিতেছে যে, হিন্দুরা তোমাদের মানুষের মত ব্যবহার করে না, তোমরাও হিন্দুদের কোন সংস্পর্শে থাকিও না।" একথা সত্য হউক বা না হউক, গ্রামে কিন্তু বেশ একটা অসম্ভব রকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। একদিন খেলারাম মুদীর দোকানের সম্মুখে বামুন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আহিরদীর ছেলে আমানতের খুব বচসা হইয়া গেল। আমানত দোকানে নূন খরিদ করিতে আসিয়াছিল, সঙ্গে হুঁকা ছিল। বকুলতলার ডোবায় হুঁকার জল ফিরাইয়া সে জল ঠিক করিতে করিতে দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভট্টাচার্য্যদের রমানাথ বলিল, ইস, একবারে যে নবাব বনে গেছিস। কেন, হুঁকোর জল ছড়াবার জায়গা পাস নি? মর!

আমানত হাসিয়া বলিল, মরব কি দুঃখে ঠাকুর মহাশয় ত বয়েস হয় নি। হুঁকোর জল ফেলিছি তা কি হয়েছে, জল কি তোমার গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি?

রমানাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ভারি লম্বা চৌড়া কথা কচ্ছিস যে! জল ছড়াচ্ছিস, গায়ে ছিটে লাগে না? আস্পর্দ্ধা দেখ!

আমানত বলিল, ছিটে লাগল ত জাত গেল না কি? এত যদি জাত যাবার ভয়, তবে ঘরের কোণে বসে থেকো, বাইরে বেরিও না।

রমানাথ ধমক দিয়া বলিল, তোর হুকুমে না কি? ভারি সংরে গিয়ে দুপাতা ইংরিজি পড়ে লাট হয়েছে আর কি!

আমানত জবাব দিল, আমি লাট না তুমি লাট? এদিকে মুখে বলা হয়—হিঁদু মুছলমান ভাই ভাই!

রমানাথ চোক পাকাইয়া বলিল, থাম নচ্ছার! বত বড় মুখ তত বড় কথা!

এইবার আমানতের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, সেও চড়া গলায় বলিল, দেখ ঠাকুর, তুই মুই কোরো না বলছি। জেতের বড়াই ঘরে গিয়ে কোরো, বাইরে না। গাল দিতে এসেছে—আমি যখন ফিরিয়ে গাল দোবো?

এই সময়ে আর দুই চারি জন গ্রামের বামুন কায়েতের ছেলে মধ্যস্থ হইয়া বলিল, আরে যেতে দাও রমানাথ। কি তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝগড়া করছ?

রমানাথ রাগে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া বলিল, তুচ্ছ কথা? যে বেটাদের জাত নেই, সে বেটারা জাতের কথা তুলে ঝগড়া করতে আসে কেন—

রমানাথের রাগে কথা বন্ধ হইয়া গেল, সে থর থর কাঁপিতে লাগিল। আমানতও ক্রুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিল, জেতের বড়াই আর কোরো না ঠাকুর—ও কলকাতায় গিয়ে সব বুঝকি ধরে এসেছি। জাতের পিটপিটুনি কর,—তা তোমাদের ঐ পরেশ ভটাচায্যি আর জীবন চক্কোত্তি—ওরা মেসে কার রান্না খায়, কার হাতের জল খায়, বাটনা বাটা খায়? গোসাঞি গিন্নীরা এসে ওদের করে দেয়, না? আর দেলখুসা ক্যাবিনে টিফিন মারে কারা? আমি যে একসাথে বসে কাবাব কে, গু মেরে এসেছি। জাত দেখাতে এসেছে? গাঁয়ে এসে বুজরুকি—আর কলকাতায়?

হরেন বোস বলিল, এ তোমার অন্যায় কথা আমানত। সংরে কি হয় না হয় এখানে তার কি?

আমানত অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, তাগবো তবে হাটে হাঁড়ি? ঢালীদের বাগানের চড়ুই ভাতিতে কে কে ছিল? কটা কুঁকড়ো তাতে জবাই হয়েছিল? আর ঐ যে সেদিন আশু মিত্তিরের মার নেমন্তন্নে সবার শেষে চিলের ছাতে বামুন পোলারা পোলাও কালিয়া মারলে—মার ধোনা মিত্তির নিজে পরিবেশন করলে, তার বেলা খুব জাত ছিল, না? বিধ নেই তার কুলোপানা চক্কর! আমাদেরই মত বাবুয়ানা করতি, আবার ঠ্যাং তুলে ধুলো দিবি? বা রে!

বিবাদ ক্রমশঃ পাকিয়া উঠিল। ক্রমে ছেলে হইতে বুড়োয় গিয়া বিবাদের ঢেউয়ের ধাক্কা পৌঁছিল,—গ্রামে হিন্দু মুসলমানে একটা বিষম অস্বস্তির ভাব উদয় হইল।

ঠিক এমনই সময় বজ্রাঘাতের মত একটা সংবাদ যামুন পাড়ায় পৌঁছিল। সংবাদটা বস্তুতঃই ভীষণ —মুটু কপালীর বিধবা ভগিনী বিধু নাকি শীঘ্রই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে! বামুনরা বসিয়া পড়িলেন। এ গ্রামে দুই তিন পুরুষের জ্ঞাতসারে যাহা কখনও হয় নাই, আজ তাহা হইতে চলিল! কোথায় ব্রহ্মণ্যতেজ! কোথায় শাস্ত্র! কোথায় দেব ভূদেব! রক্ষা কর—এ ঘোর সঙ্কটে হিন্দুর মান রক্ষা কর।

সেই দিন সন্ধ্যার পর গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্পন্ন ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ রামরাম চক্রবর্ত্তীর বাটীতে পঞ্চায়েৎ বসিল। পঞ্চায়েৎ বলিতে এখানে অবশ্য কেবল হিন্দু পঞ্চায়েৎ বুঝিতে হইবে, কেন না এ পঞ্চায়েতে কোনও মুসলমান মণ্ডল আমন্ত্রিত হন নাই। আকাশ মেদিনী কম্পিত করিয়া নানা বক্তৃতা হইল, শাস্ত্রের অশেষ গুণের ব্যাখ্যা হইল, বিধর্ম্মী রাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রের কদর নাই বলিয়া আক্ষেপ করা হইল, শেষে সাব্যস্ত হইল, যখন ঘোর কলি, তখন ইহার আর উপায় নাই, এখন শত্রুর অস্ত্রেই শত্রুকে মারিতে হইবে। প্রাতে মৈমুদ্দীন শেখকে তলব দিয়া পঞ্চায়েতে ডাকাইতে হইবে, এইরূপ স্থির হইল।

(৫)

শেখ মৈমুদ্দীনের বাহিরের আটচালায় আজ লোক ধরে না—গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আটচালা ভরিয়া গিয়াছে, অঙ্গনেও সারি সারি বসিয়া বিস্তর লোক, কেহ হুটু পাকাইতেছে, কেহ তামাক সাজিতেছে কেহ তামাক টানিতেছে, আবার কেহ কেহ গল্প গুজবে মগ্ন আছে। শেখ সাহেবের লোক জন সকলকে আদর আপ্যায়ন করিতেছে।

গ্রামের মোড়লরা পঞ্চায়েতের নামে শেখ সাহেবকে তলব দিলে শেখ সাহেব জবাব দিয়াছিলেন যে, যেহেতু পঞ্চায়েৎ কেবল হিন্দুর পঞ্চায়েৎ সেই হেতু তিনি সেই পঞ্চায়েতে হাজিরা দিতে বাধ্য নহেন। পঞ্চায়েতের আবশ্যক হইলে তাঁহার গৃহে আসিতে পারেন। শেখ সাহেবও গ্রামে কেও কেটা নহেন, তিনিও অবস্থাপন্ন ছোটখাটো জমিদার।

সকলে সভাস্থ হইলে পর শেখ সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, আজ আপনারা আমার ঘরে এসে আমায় কৃতার্থ করেছেন, বলুন আমি আপনাদের কি করতে পারি।

পঞ্চায়েতদিগের মধ্যে ক্ষণকাল কাণাঘুষা চলিল। শেষে চাটুয্যে মহাশয় অগ্রসর হইয়া বলিলেন, শেখ সাহেব, বাপপিতমোর আমল থেকে আমরা হিন্দু মুসলমান গাঁয়ে সদ্ভাবে বাস করে আস্‌ছি—আজ হঠাৎ আপনি সেই সদ্ভাব ভেঙ্গে দিচ্ছেন। গাঁয়ের মোড়লরা আমায় দিয়ে আপনাকে তাই জানাচ্ছেন, তাঁদের বিশ্বেস, আপনি সবটা শুনলেই এর একটা বিহিত হয়ে যাবে।

মৈমুদ্দীন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমি সদ্ভাব ভেঙ্গে দিচ্ছি? কি রকম?

চাটুয্যে বলিলেন, সব খুলে বলছি। মুটু কপালীর ভগিনী হিন্দুর ঘরের বিধবা, আপনার এখানে ধান ভানতে আসে, তাকে আপনি জোর করে মুসলমান করছেন।

মৈমুদ্দীন উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমি জোর করে হিন্দুর বিধবাকে মুসলমান করছি? মিথ্যে কথা!

চাটুয্যে বাড়ুয্যে বসু মিত্রের দল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "প্রমাণ আছে, প্রমাণ আছে।" সভায় খুব একটা গোলমাল উপস্থিত হইল।

মৈমুদ্দীন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গোলযোগ অবসান হইলে পর বলিলেন, আপনাদের কথা আগাগোড়া মিথ্যা, অন্ততঃ আপনারা ভুল শুনে আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। প্রথম কথা, কপালীর মেয়ে যেচে আমার এখানে চাকুরী নিয়েছে, আমি তাকে ডেকে চাকুরী দিতে যাই নি—তার প্রমাণ আমার ছেলে দেবে। দ্বিতীয় কথা, তাকে মুসলমান করবার কথা আমরা এক দিনও বলি নি—সে নিজেই বরং মুসলমান হবে বলে আমায় অনুরোধ করেছে—তাকে জোর করে মুসলমান করা ত দূরের কথা। হয় না হয়, তাকে এইখানে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন। যদি এখানে বিশ্বাস না হয়, আপনারা তাকে ঘরে নিয়ে যান, আমি ত ধরে রাখি নি।

মোড়লরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

শেখ মৈমুদ্দীন বলিলেন, বিশ্বাস হ'ল না? আচ্ছা আমিই ডাকাচ্ছি। ওরে, কে আছিস মুটুর বোনকে ডাকতো এখানে।

মৈমুদ্দীন পুনরপি বকিতে লাগিলেন, কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে মুসলমান করা আমি হারাম বলে মনে করি। আপনারা মনে স্থান দেবেন না যে, শেখ মৈমুদ্দীন কপালীর মেয়েকে এক মুহূর্ত্ত জোর করে ঘরে আট্‌ক রাখ্‌বে—তেমন বংশে আবার জন্ম নয়।

এই সময়ে বিধু সভাস্থলে আনীত হইল। সে অবনতমস্তকে ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মৈমুদ্দীন কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল ত মা, তুমি এখানে নিজের ইচ্ছায় চাকুরী করতে এসেছ, না তোমায় কেউ জোর করে নিয়ে এসেছে?

বিধুর প্রথমে অত লোকের সাক্ষাতে কথা

কহিতে লজ্জা করিতেছিল। কিন্তু শেখ সাহেব দুইবার প্রশ্ন করিবার পর তাহার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল, সে দৃঢ় স্বরে অবিকম্পিতকণ্ঠে জবাব দিয়া যাইতে লাগিল, বলিল, আমি নিজের ইচ্ছায় চাকুরী করতে এসেছি।

ভট্টাচার্য্য বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বসিলেন, কেন, চাকুরী কি আর কোথাও জোটে নি?

বিধুর ভিতরের রুদ্ধ রোষারি এইবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে পুরুষকণ্ঠে জবাব দিল, না, জোটেনি। তোমাদের মত দয়ালু বামুন কায়েতের বাড়ী কুকুর বিড়ালের অন্ন জোটে, তবু আমাদের মত হতিকে জাতের জোটে না। আমি পেটে না খেতে পেয়ে এদের পায় ধরে সেধে এখানে চাকুরী করতে এসেছি।

চাটুয্যে বলিলেন, কেন, তোমার ভাই ত ছিল।

বিধু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল, ভায়ের গলগ্রহ হয়ে আমি থাকতে চাই নি।

চক্কোত্তি ভয়ঙ্কর চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—না, তা পারবে কেন,—মুছলমানের ভাত মারতে পার!

বিধুও সমান ওজনে জবাব দিল, তা পারি। একবার না দুবার না, একশোবার পারি। তোমাদের মত বামুণ কায়েতের চেয়ে মুছলমান ঢের ভাল।

সভাস্থলে ভয়ঙ্কর একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। হিন্দুরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিধু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। সে বলিয়া যাইতে লাগিল—তাহার আজ মুখ খুলিয়া গিয়াছিল —"তোমরা এত কায়েত বামুন গাঁয়ে ছিলে, কৈ দুমুঠো ভাত দেবার কারও মুরদ হয় নি? এখন এসেছ কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে? চাকুরী দিলে জাত যাবে। যে জাতে থেকে পেটের ভাত জোটে না, যে জাতে থাকলে নাড়ি স্যাঁতা খেয়ে পেট ভরাতে হয়, সে জাতে নাই থাকলুম। বাঁচতে ত হবে। শুধু মুছলমানের ভাত খাওয়া নয়, আমি

ঠিক করেছি নিজে মুছলমান হব। আমি তোমাদের কেউ নই, তোমরা যাও।"

বিধুর চোখ ছাপাইয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, সে দ্রুতপদে অন্দরে চলিয়া গেল। মোড়লরা হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শেখ মৈমুদ্দীন বলিলেন, আপনারা সব শুন্‌লেন। এখন বিচার করুন, আমার কি অপরাধ। আমি এখনও বলছি, আপনারা ওকে নিয়ে যান, এখনও ঐ মেয়েটা আমার ভাত খায় নি, মুসলমানও হয় নি। আপনারা সাতদিনে পারেন, পনেরোদিনে পারেন, মাসেক ছমাসে পারেন, ওকে বুঝিয়ে হিন্দু রাখ্‌বার চেষ্টা করুন, আমার কোন আপত্তি নেই। কেবল এইটুকু দেখ্‌বেন, ওর উপর যেমন কোনও অত্যাচার না হয়।

মুখুয্যে দাঁত মুখ খিচাইয়া বলিলেন, অত্যাচার হবে না? ওর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ভিটে ছাড়া করব তবে ছাড়ব!

মৈমুদ্দীন এইবার মুখমণ্ডল গম্ভীর করিয়া বলিলেন, খবরদার, ঐটী ছাড়া আর সব সহ্য করা যাবে। আমি ওর উপর যেমন জুলুম করি নি, তোমরাও কোরো না। দেখ, ও নিজের ইচ্ছায় কি করে। কিন্তু তোমরা যদি এক চুল অত্যাচার কর, জুলুম কর, তাহলে আমিও নিজমূর্ত্তি ধরব, এটা মনে রেখো।

ভট্টাচার্য্য তথাপি ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, ওরে ভিটেছাড়া করবই।

মৈমুদ্দীন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, কে কাকে ভিটে ছাড়া করে, দেখ্‌তে চাই আমি—আমিও শেখের ছাওয়াল। ভাল চাও ত, ঠাকুর, নিজেদের চরকায় তেল দাওগে, ওসব জোরজুলুম ফলাতে এসো না। জোর দেখাও জোর পাবে, লাঠি দেখাও লাঠি পাবে। শেখের বাচ্ছা, তাতে পেছু পা নয়।

মোড়লদের চক্ষু কপালে উঠিল—কি জবাব দিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না।

শেখ মৈমুদ্দীন আর একবার মোড়লদের মুখপানে তাকাইয়া হাসিয়া অন্দরের জনগণকে তামাক দিতে হুকুম দিয়া অন্দরে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন, মোড়লরা ফেলফেল নেত্রে তাঁহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ছদ্মবেশ

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল)

আবরিয়া নিজমূর্ত্তি সমুজ্জ্বল সাজে,
সভ্যতা-রাক্ষসী আছে নগরের মাঝে
বিভাবরী আলোক তীব্র কৃত্রিম প্রখর,
ঝলসিয়া মানবের চক্ষু নিরন্তর
অসহ্য উত্তাপে; অন্তরে বিষম বিষ,
ভুবন ভুলানো হাসি মুখে অহর্নিশ।
সে মোহিনী মায়াবলে হারাইয়া জ্ঞান
অসন্ত অনল কুণ্ডে পতঙ্গ সমান
ঝাঁপায়ে পড়িছে নিত্য কত মুগ্ধ নর
মৃত্যু-হুতাশনে ভাবি' অমৃত নির্ঝর।
এ দারুণ সভ্যতার দুষ্ট আকর্ষণ
অনুক্ষণ ক্লিষ্ট করে মানবের মন;
বিলাসিতা বেশে দুঃখ শোভিছে নগরে,
সুখ আছে সাজোপনে অরণ্য ভিতরে।

পল্লী-কথা

(শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ)

আমি আজ পল্লীর যে চিত্রটা আঁকবো সেটা পল্লীর ভাল দিকের চিত্র নয়, তবে সেটা খাঁটি বাস্তব-চিত্র। পল্লীর সহজ সততার প্রাণটা যাতে করে নষ্ট হয়ে যায় সেই কথাটাই বল্‌বো।

সাধারণতঃ দেখা যায় একটী পল্লীর প্রায় পনের আনা চাষী; তার বেশীরভাগ নিরক্ষর; রকম এক আনা অংশ যে শ্রেষ্ঠ জীব আছেন তাঁরা হয় কেহ জমীদার, নয় মহাজন "নিজ বাসভূমে পরবাসী"। শিক্ষিত চাকুরিয়াদের এই আলোচনার মধ্যে ধরা হয় নি, যেহেতু পল্লীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক খুবই কম, কেহ বৎসরান্তে পূজার সময় একবার আসেন, কেহ বা ততটুকু কষ্ট স্বীকার করিতেও নারাজ।

এই জমিদার আর মহাজন শ্রেণীই যে পল্লীর মুরুব্বি একথা বোধ হয় এখন আর কাহাকেও খুলে না বল্লেও চলে—দেহের সঙ্গে যেমন আত্মার সম্পর্ক পল্লীবাসীর সঙ্গে এই জমীদার ও মহাজন শ্রেণীর সেই প্রকার সম্পর্ক। গলদ কিন্তু এইখানটায় আত্মা দেহ হ'তে বিভিন্ন হ'য়ে আছে; এই বিচ্ছিন্ন আত্মার যোগ-সাধন ঘটাবার মত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ছলা কলা কার আছে জানি নে?

জমীদার শ্রেণী ও মহাজন শ্রেণীর কাছে প্রজা সাধারণের কথা পাড়্‌লে কেন যে তারা আমাদের কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দেন, তার কারণ আর কিছুই নয়—দেশের মধ্যে তাঁরাও এক একজন বিদেশী মাত্র; সবাই business concernএ দেশে রয়ে গেছেন। সত্যিকার সম্পর্ক-বোধ-সত্যিকার মমত্ববোধ বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না! নিজের সহোদর ভেয়ের সঙ্গেও বোধ করি থাকে না। তাই তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাব সব আগে নজরে পড়ে—তেজারতীতে কে কত সম্পত্তি বাড়াতে পারলো। শুধু বাড়ানো বল্লেই সব বলা হয় না! ঐ 'বাড়ানে'র মধ্যে একটা মর্য্যাদার আসন আছে; যখন কারো ছেলে মেয়ের বিয়ে হবার কথা উঠ্‌বে, তখন সব চাইতে ভারি লোকটার ভারি একটা কদরের জায়গায় সম্মান মিল্‌বে এবং সেই অনুপাতে বরপণের দাবীটাও বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ কর্‌তে হবে।

বলতে গেলে মহাজন শ্রেণীর কথাই সব চাইতে কেন যে বেশী হয়ে পড়ে, তার কারণ কিছু খুঁজে পাইনে, মহাজন ছাড়া আরও অনেক শ্রেণী আছেন যাঁরা এই দেশের বুকের উপর জোঁকের মত চেপে বসে আছেন। জমিদার, ফড়ে, দালাল উকীলের টর্ণী ইত্যাদি অনেকের নাম করা যেতে পারে—কিন্তু দেশকে সর্ব্বনাশের পথে দাঁড় করাবার সত্যি সত্যি প্রত্যক্ষভাবে যদি কারো হাত থাকে তা মহাজনদেরই ছিল, জমিদারেরা ত অনেক স্থলে দরপত্তনীদার মাত্র এমন ধারা স্বত্ব নিংড়ে তাদের হাতে জমিদারী ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে, অনেকের শুধু খাজনার টাকা মিটিয়ে দিতেই নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়। লাভ যা কিছু তা জমিদারেরাই পান; কিন্তু দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জোগ তাঁদের কোন কালেই নাই।

আগেও এদেশে মহাজন ছিল। যাই হোক ধর্ম্ম ভবে হোক, কি উপায় ছিল না ভেবেই হোক তখনকার দিনে মহাজনগণ মহাযকে পরিণত হননি। তখন তাঁদের আদর্শছিল মহৎ হওয়ার দিকে—সুদের পরিমাণ এত সামান্য ছিল, গরীব সহসা তাতে মারা-ত্মক সর্ব্বনাশের পথে গিয়ে দাঁড়াত না—তখনকার দিনে টাকা অপেক্ষা ধানের দাদন বেশী চলত;

এবং তার সুদ ছিল বৎসরে মনকরা পাঁচসের মাত্র। এছিল মুসলমান আমলের কথা। তারপর ইংরাজ রাজত্বে এক রাত্রেই যখন আমরা আদিম বর্ব্বর দশা হ'তে সভ্যতার উচ্চ স্বর্গে পৌঁছে গেলাম অমি সেখানে সভ্য দেশের আইন কানুন জারী হ'য়ে গেল। গরীবের আয়ের সংস্থানের দিকে লক্ষ্য করা হলো না। তার ঋণ শোধের সত্যিই সামর্থ্য কতটুকু এ সব ভাবা হ'লো না—আইন জারী হ'লে, বে-ওয়োয়া—ফলে এই সুযোগে তুখোড়বুদ্ধি জীবের দল বেশ একচোট চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের সুদ কামিয়ে নিলে যে আইন ব্যবসাদার ধনীর পক্ষেও বোঝার মত সে আইনে রামশ্যাম কতক্ষণ টেঁকবে। ফলে একটী জাতিকে জাতি ধ্বংশের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, আমরাও স্তম্ভিত হ'য়ে বর্ত্তমান সভ্যতার মহাদান দেখে যেতে লাগলাম। সে একদিকে একজনকে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরেরর দিকে তুলে দিচ্চে, আর একদিকে সহস্র সহস্র গরীবকে দুর্গতির চরম সীমায় নির্ম্মমভাবে টেনে নিয়ে যাচ্চে। অভাবের পেষণে পড়ে অসহায়ের দল এক-দিকে ছটফট করতে লাগল, চুরী ডাকাতিও দেখা দিতে লাগল, পুলিশেরও কাজ বেড়ে গেল, আদালতের কাজও জোর চলতে লাগল। গবর্ণমেণ্ট দেখলেন এতক্ষণে রাজ্যের রথ ঠিকমত চলতে সুরু ক'রেছে।

ঋণের দায়ে সর্ব্বস্ব হারিয়ে ভিটে ছাড়া তাই লক্ষ লোক পাঁজর ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর্ত্তনাদ করতে লাগল, মহাজনের দল ইনকম ট্যাক্স গুনতে গুনতে হাসিমুখে গবর্ণমেণ্টকে অভয় দিতে লাগল মা ভৈঃ—ওটা মোটে হাহাকার নয়!—

অধম সম্প্রদায় তখন বুঝলো ঋণও তাদের করতে হবে এবং সর্ব্বনাশের মুখেও এগিয়ে যেতে হবে। এত বেশী চক্রবৃদ্ধির হারে সুদ দিতে পারবো না কথাটা মোটেই টিকলো না।

ছটফটানি দেখে মহাজন সম্প্রদায়ের মধ্যেও ও বিশেষ চেষ্টা চলতে লাগল; কিসে সাধারণকে ঋণ রূপ বৈতরণী জলে গাঁথা যেতে পারে—দালালদের খবরদেওয়া হবে না দালালরাও ঐ জন্ত গ্রামে আছে—তারা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আনাগোনা করে। নামে তারা নিরীহগ্রামবাসী মাত্র বটে, কিন্তু কার্য্য এ বলে আমায় ও বলে আমায় দেখ।—মিথ্যে সাক্ষী জোচ্চুরী এই তাদের পেষা। এককালে তাদের হয়ত অবস্থা ভালই ছিল, তারপর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে এই বৃত্তি গ্রহণ করেছে। কত রকম ফন্দি ফিকিরে লোককে যে, নির্য্যাতন করছে তা পাড়া গাঁয়ে যারা কিছুকাল বাস করেছে, তারাই একবাক্যে এদের বজ্জাতি বুদ্ধির তারিফ করবেন।

তাদের মধ্যে অহরহই চেষ্টা চলছে, কিসে লোক টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। একবার হ্যাণ্ডনোট কি তমসুক বাঁধতে পারলে আর রয় কোথায়? এটা একটা পরিক্ষীত সত্য যে টাকা যেখানেই কর্জ্জ পত্রের দ্বারা দেওয়া হয়েছে, সেখানেই শেষ পর্য্যন্ত নালিশ মকর্দ্দমা না করে উসুল হয় নি। ফলে উকীল মোক্তার শ্রেণীর পর্য্যন্ত ঐ দিকে একটা লোলুপ দৃষ্টি রইল। যারা চাষী তাদেরও ভরসা থাকুল, তারাও একদিন না একদিন কিছু পাবে। সবারই ভর। রইল—ভরসা রইল না কেবল যে বেচারী চাষী যে কজাদারে কি ফিতুমাতৃপায়ে কর্জ্জ করেছে।

তার ভরসা একমাত্র জমির ফসল, কিন্তু পুরুষানু-ক্রমে জমির উপরে দস্যুবৃত্তিতে জমিই আর কতটুকু ভরসা দেবে? তারও শস্যোৎপাদিকা শক্তি কমে গিয়েছে। উৎপাদিকা শক্তি থাকলেই তাই কি যথেষ্ট? উচ্চ ভূমির অধিকাংশ স্থানে শেষ পর্য্যন্ত হয় অনাবৃষ্টিতে ধান টিকলোনা কিংবা এক পশলা বৃষ্টির অভাবে তৈরী ফসল মারা গেল, ছেঁচবার যাদ-বিল যা ছিল তা ইতি মধ্যেই মজে গেছে, কিংবা জমিদার মহাজন শ্রেণী প্রবলের হাতে পড়ে পক্কো-

দার হয়ে সে জলাশয়ে ছেঁচ বন্ধ হয়ে গেল। দুর্ব্বল প্রজা প্রবলের সঙ্গে কতক্ষণ লড়বে? সে অদৃষ্ট ধেয়েই পড়ে রইল।

নিম্ন ভূমির দেশেও অনাবৃষ্টিতে যদি বা ফসল না হ'ল, প্লাবনে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কেউ চীৎকার করে যদি বলে রেল লাইনের বাঁধে এই সর্ব্বনাশ হ'ল, জল নিকাশের মোটেই রাস্তা পেল না, তা হ'লে কর্ত্তারদের এত ছোট কথা বিশেষ ছোট লোকের মুখে শোনবারই আবশ্যক বিবেচনা করলেন না; কারণ রেলের বাঁধ, কি রেল লাইনও হ'ল সুশাসনের পাকা সড়ক!

ফলে অজস্র প্রকার চোখের জলে বঙ্গসাগরের লোণা জল খানিকটা বৃদ্ধি করলো মাত্র। কাজে কিছুই হ'ল না। নেহাৎ ভগবানের কৃপায় যে বৎসর সুবর্ষা হ'ল, অমনি রাজা মহাজন সুদসমেত আদায় পাবার জন্ত চৌকাঠের উপর চেপে বসলো—

ডাক্তার, বদ্যি, কামার, কুমার তারাও বাদ গেল না। তিক্ত বিরক্ত হয়ে চাষী ধান খড় মাঠেই শোধ বোধ দিয়ে ঝাড়া হাত পায়ে ঘর চুকলো; আবার পরদিন হ'তে চেষ্টা চলবে কোথা দেনা মিলবে। পুরুষানুক্রমেক দাস সৃষ্ট হ'বার সুযোগ তৈরী হ'তে লাগলো।

এসব অগ্নি-পরীক্ষা বাদেও যদি কারও কিছু বাঁচলো—ঘরের শিরী বাহুনা ধরে বসলো আমার গহনা চাই। চাষী ব্যাচারীও দেখলে নেহাৎ বাঁদীর মত খাটিয়ে মারছি, হাতে কাচের চুড়ি ছাড়া নেই মরুকগে রূপোর চুড়ি গড়িয়ে দি; এই সঙ্গে স্যাকরা ভায়াও বাদ গেল না। এর পর আবার ছেলে মেয়ের বিবাহ আছে, আত্মীয় কুটুম্বিতা আছে, শ্রাদ্ধ শান্তি আছে গুরু পুরোহিতের হুমকী আছে।

শাসনের নাগপাশে বাঁধা চাষী নিরুপায় ধীরভাবে কোথা? গ্রামে মহাজন গলায় ফাঁসী দিয়ে রেখেছে, সমাজে ব্রহ্মণ্যদেব রোষনেত্রে তাকিয়ে আছেন। ঘরের ভিতরেও তার শান্তি নেই; অথচ মানুষের এমি স্বভাব তাকে বাঁচতেই হবে, বাঁচবার উপায় নেই, কিন্তু বাঁচে কি ক'রে? কেউ তাকে বলে ওরে মরণের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারিস তা হ'লে যদি বাঁচবার রাস্তাটা বেরিয়ে পড়ে। আসলে মাথার উপরে আজও যেমন প্রলয় রাত্রি কালও তেমি প্রলয় রাত্রি, দুর্য্যোগের আর শেষ নাই।

পথহারা

(গল্প)

[শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী বি, এ]

বায়ু-পরিবর্ত্তন উপলক্ষে কোন এক বন্ধু পরিবারের সহিত শিমুলতলায় যাই। ষ্টেশন হইতে কিছুদূরে একটা টিলার উপর আমাদের বাংলো-খানি অবস্থিত ছিল। প্রত্যহ অপরাহ্নে আমরা সদলে "ছাতি" ও "লাটি" পাহাড় ভ্রমণে বহির্গত হইতাম। একদিন সহরের প্রান্তবাহিনী নীলানদী দেখিতে যাওয়া স্থির হইল।

পরদিন যখন নীলার তীরে পৌঁছিলাম, তখনও সন্ধ্যার কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিবার দেরী ছিল। জায়গাটী খুবই নির্জ্জন। বালুকাময় সমতল ভূমির মধ্য দিয়া স্বচ্ছ শীতলা নীলা, মন্দ, মন্থরগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকে পাহাড়—পাহাড়ের পর পাহাড় এক রহস্যময় অভি-নব লোক সৃজন করিয়াছে। ঘন, শ্যামল তরু-

শ্রেণীর অজস্রপুষ্পশোভন অদূরবর্ত্তী ভীষণ-কান্ত পর্ব্বত মালার সহিত একত্র সমাবেশে উজ্জ্বলে মধুরে মিলিত হইয়া যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই নয়নাভিরাম।

প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব সুষমায় আকৃষ্ট হইয়া আমার বন্ধু ও মহিলারা মুগ্ধ পুলকিত চিত্তে নীলার নির্ম্মল তুষারকণ জলে বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই শ্রান্তি, ক্লান্তি, ভুলিয়া কি এক হরষ-কম্পন অনুভব করিলেন।

প্রকৃতির কোলে হাস্যোজ্জ্বল শিশুর মত সহজ, সরল উৎসারিত তাঁহাদের এই আনন্দরাশি অনুভব করিয়া আমি আননমনে মন্থরগতি নীলার ধার দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। অনেকক্ষণ পরে যখন চমক ভাঙ্গিল তখন ঘন আঁধিয়ার ঘনতর হইয়া আসিয়াছে। আশেপাশে উন্নত গাছগুলির দীর্ঘ প্রসারিত শাখা প্রশাখা যেন একটা বিরাট্ দৈত্যের প্রসারিত বাহুর মত দেখাইতেছিল। চঞ্চল বাতাসে দুস্থ তরুরাজি রহিয়া রহিয়া মর্ম্মরিয়া উঠিতেছিল।—সে যেন এক চিরবিরহের বুকফাটা আকুল দীর্ঘশ্বাস।

পথরেখা অনুসরণ করিতে না পারিয়া একদিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আকাশে ছড়ান টুক্‌রা মেঘগুলি মেশামিশি করিয়া ক্রমশঃ চারিদিকের আঁধার আরও বাড়াইয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের মাতামাতিও বাড়িয়া উঠিল। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে একটু দূরে একটী লোককে দেখিতে পাইলাম। একটু দ্রুত চলিয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া নিজের অসহায় অবস্থা জানাইলাম। তিনি একবার আমার দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে বলিলেন। আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার সহিত চলিলাম। একটু পরেই বৃষ্টি পড়িতেই আরম্ভ হইল। হাওয়ার জোরও পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া গেল।

আমার সঙ্গী প্রথম হইতেই মন্থরগতিতে চলিতেছিলেন। এক্ষণে আমি তাঁহাকে একটু দ্রুত চলিতে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু আমার এ অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। তিনি পূর্ব্বেরই মত মৃদুগতিতে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত ভাব দেখিয়া আমি আর কিছু বলিতে সাহসী না হইয়া, পথ হারাইবার ভয়ে তাঁহার সহিত চলিতে আরম্ভ করিলাম।

* * * * *

স্তিমিত তারার আলোকে একান্ত নীরবে দুজনে পাশাপাশি চলিয়াছি। আমার সঙ্গীটী কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন—অচল অটল মৌন সন্ন্যাসী আপনার ধ্যানে আপনি বিভোর। আমি লিপ্ত মানব, সঙ্গলাভ করিয়াও যে বিজনপথে এমন নির্ব্বাক হইয়া চলিতে পারে তাহা আমার পূর্ব্বে জানা ছিল না। তাঁহার এই ভাব আমার নিকট প্রহেলিকার মত বোধ হইল। ঘৃণা ভরে আমাকে উপেক্ষা করিয়াই কি তিনি আপন মনে চলিয়াছেন। চপলার চকিত চাহনি সাহায্যে মধ্যে মধ্যে তাঁহার আননের ভাব-রেখা দেখিয়াও তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার এই ভাব যেন মূর্ত্তিমান হইয়া আমায় নিদারুণ পীড়া দিতে লাগিল। কারণটা অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; হঠাৎ এই কথা আমার মনে জাগিয়া উঠিল যে, বোধ হয় কোন এক বিষণ্ণ সন্ধটময় সন্ধ্যার প্রসারিত অন্ধকারের মধ্যে যখন মেঘের গুরু গরজন বাদলের ধারা লইয়া নামিয়া আসিয়াছিল, তখন ইঁহার জীবনে হয়ত কোন এক চরম শোকাঘাত নাচি, তাণ্ডাকৃষ্ণ যবনিকা ক্ষেপন করিয়া তাঁহার জীবনকে মরুভূ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—হয়ত আজি এই বর্ষণ-মুখর ম্লান সন্ধ্যায় সে অতীত স্মৃতি আবার নূতন করিয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। একান্ত নীরবে এ সকল কথা ভাবিতেছি, এমন

সময় অস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন, "সেও এমনি দুর্য্যোগ রাত্রি। সেও এমনি পথ হারাইয়াছিল।"

কথাটা বাহির হইতে না হইতেই আমার সুপ্ত কৌতূহল প্রবৃত্তি আবার সজীব হইয়া উঠিল। সাহসে ভর করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এমন সময় পথ হারাইয়াছিল? সে কবে—কোথায়?" সেই সময়ে দামিনীর অট্টহাসি একবার ফুটিয়া উঠিল—সেইহাসির আলোয় তিনি আমার দিকে তাকাইলেন—অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন—তাঁহার সে দৃষ্টি আমার কঠিন অন্তঃস্থল ভেদ করিতে পারিয়াছিল কি না জানি না—জানি না তিনি আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়াছিলেন কি না—তবে একথা আমি সত্য করিয়া বলিতে পারি সে দৃষ্টি কি দীনতা—কি কাতরতা পূর্ণ!—বুঝিলাম একটা অন্তর্নিহিত সুকঠিন বিরাট বেদনা যেন বাহির হইতে না পারিয়া বিপুল বলে তিলে তিলে পলে পলে তাঁহাকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া তুলিতেছে।

বহুক্ষণ ধরিয়া আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া ও তাঁহাকে তদ্দৃষ্টে দেখিয়া পুনরায় সানুনয়ে তাঁহাকে এই পথ ভ্রান্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরব রহিয়া যেন মনকে কতকটা শান্ত, সমাহিত করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে আমায় বলিলেন, "ভাবিয়াছিলাম, আমার এ অশান্তির কথা হয়ত কোনদিন কাহাকেও বলিবার আবশ্যক হইবে না, কিন্তু আপনার আগ্রহ আমাকে বিচলিত করিয়াছে। আমার বিগত জীবনের যে বিষাদ, করুণ ইতিহাস তাহা সর্ব্বপ্রথম আপনাকেই বলিতেছি।"

"তখন সবে সংসার পথে অগ্রসর হইয়াছি। তরুণ যৌবনে শত আশা বসন্তের নবমঞ্জরীর মত মুকলিত হইয়া উঠিয়াছে। কত উৎসাহ, কত সজীবতা! ছেলেবেলায় মা আমাকে বাবার স্নেকোমল স্নেহনীড়ে সমর্পণ করিয়া কোন এক অজ্ঞাত লোকে চলিয়া যান। তারপর যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিতেছি, বাবা তখন আমাকে ফেলিয়া মার পথ অনুসরণ করিলেন, কিন্তু তিনি আমায় নিঃস্ব রাখিয়া যান নাই। জীবনযাত্রার পাথেয় স্বরূপ তিনি এমন অর্থ সম্বল আমায় দিয়া গিয়াছিলেন, যদ্দারা আমি আমার কর্ম্মময় জীবনকে অক্লেশে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছিলাম। আত্মীয়জনের পরামর্শে আমি নেপালের জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ চালান দিতে আরম্ভ করিলাম।

ভাগ্যলক্ষ্মী কখন, কোন শুভ মুহূর্ত্তে কাহার উপর তাঁহার কৃপাকণা বর্ষণ করেন, তাহা মানুষের গণনার বাহিরে। সে মাহেন্দ্রক্ষণ মানবজীবনে বহুবার আসে না। আমি এ পর্য্যন্ত যে কাষ্ঠ কিনিয়া চালান দিতাম, তাহাতে বড় লাভবান্ হইতে পারি নাই। সামর্থ্য ও সময়ের অনুপাতে লভ্যাংশ খুব সামান্যই হইত। আর্থিক উন্নতি বিষয়ে আমি ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িতেছিলাম। সহসা একদিন একটা জঙ্গলের সবটা ইজারা লইবার সুবিধা ঘটিয়া গেল। এই ইজারা লইবার পর হইতে আমার উন্নতির সূত্রপাত হইল। আমি ও অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীরূপে গণ্য হইতে লাগিলাম। মানুষের আশাও আকাঙ্ক্ষার সর্ব্ব প্রকার সার্থকতা যেন আমার মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিল।

আমি এতদিন অবিবাহিত ছিলাম। সংসারে আমার আপনার বলিতে কেহই ছিল না। অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মীয়বর্গের সংখ্যাও বাড়িয়া গেল। বহুদূর সম্পর্কীয়া এক মাতৃষসা তাঁহার বিধবা ননদের একমাত্র কন্যাকে পত্নীরূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য তাঁহার সমস্ত স্নেহরাশি দিয়া আমায় বারংবার অনুরোধ ও অনুনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে বৈশাখের এক মধুর সন্ধ্যায় আমি আমার গৃহলক্ষ্মীকে আনন্দ কোলাহলের মধ্যে বরণ করিয়া লইয়া আসিলাম। দরিদ্রগৃহের কন্যা বলিয়া কনকের বয়স একটু বেশী হইয়াছিল।

কনকের মত জীবনসঙ্গিনী লাভ বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তার স্নেহ, তার সেবা, তাহার গৃহিণীপনা সবই অতুলন ছিল। স্নিগ্ধ কোমল সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া সে যখন জ্যোৎস্নার ন্যায় নম্র মধুর পদক্ষেপে গৃহকর্ম্মে নিরত রহিত, তখন মনে হইত, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীশ্রী যেন আপন মঙ্গল করে ক্ষুদ্র আমার গৃহখানির সৌষ্ঠব সাধনে যত্নবতী। কর্ম্মক্লান্ত দিবাবসানে বিপদসঙ্কুল জঙ্গল হইতে যখন ফিরিতাম, সে তখন রক্তকোমল অধরপুটে উদ্ভাসিতরেখা ফুটাইয়া জননীরূপে প্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত কুলিদের আহার্য্য বিতরণ করিত। সে দৃশ্য দেখিয়া আমার সমস্ত শ্রান্তি, ক্লান্তির অবসান হইত, কি এক নবশক্তি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতাম। কি এক নূতন আখাসে, নূতন আলোকে আমার জীবন পুলকিত হইয়া উঠিত। নব-নব আনন্দের গান দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। হায়, সে কি সুখের দিন ছিল!—আর আজ এ কি নিরাশার কৃষ্ণচ্ছায়া! নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

* * * *

আমাদের এই অখণ্ড উদ্বেল প্রেমরাশিকে যেন পরিপূর্ণতা দান করিবার জন্য প্রেম-দেবতা, ফুলের মত নিষ্পাপ, আর জ্যোৎস্নার মত সুন্দর, একরাশ কালো, কোঁকড়া চুল মাথায় একটী স্বর্গীয় শিশুকে আমাদের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। এ সংসারে মানবের যাহা কামনার ধন তা সবই ভাগ্যদেবতা আমায় এক এক দিয়াছিলেন। তেমন দেওয়া বুঝি তিনি আর কাহাকেও দেন না। মধুময় যৌবন, অতুল অর্থ, অপরিমেয় সম্ভ্রম, রূপগুণযুতা প্রেমময়ী পত্নী আর এক অপূর্ব্ব দেবশিশু—জগতে কয়জন এ সকলের অধিকারী হইতে পারে? সংসারের বিচিত্র ব্যাপার তখন আমাদের নিকট রহস্যের মত অজ্ঞাত; কিন্তু কে জানিত তখন, এই সৌন্দর্য্য-সম্পদ মধ্যে এক বিরাট নৈরাশ্যের তীব্র যাতনা লুক্কায়িত ছিল।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যখন এই অনাবিল সুখের মুক্তপ্রবাহ নিয়ত স্নিগ্ধ শান্তিবহন করিয়া আনিতেছিল, তখন প্রিয়তমার একান্ত অনুরোধে জনবিজুক্ত নগরীর কলকোলাহল হইতে বহুদূরে এই লোক বিরল পল্লীমধ্যে শান্ত, সমাহিত চিত্তে অবসর যাপনের নিমিত্ত তাহারই মনোমত সুদৃশ্য একখানি বাংলো প্রস্তুত করিছিলাম। এসময়ে আমার একান্ত অনুগত এক দূর-সম্পর্কীয় বিশ্বস্ত ভ্রাতাকে ব্যবসায়ের সমগ্র ভার অর্পণ করিয়াছিলাম; সুতরাং বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এখানে বাস করিতাম। কেবল মাঝে মাঝে তত্ত্বাবধানের জন্য আমার জঙ্গলের বাংলোতে যাইতাম।

বাংলোখানির প্রতি কক্ষ কনকের সযত্ন রচিত পশমের বিচিত্র বর্ণময় ছবি, ফল, ফুলে সজ্জিত ছিল। কত না শ্রম সাধ্য কারুকার্য্যে সে প্রাচীর গাত্র সুশোভিত করিয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যায় দিবসের কার্য্যশেষে তাহার কক্ষ বাতায়ন তলে হারমোনিয়ম সহযোগে সে অশ্রান্ত পাপিয়ার মত সুধাময় সঙ্গীতে গগন পবন ছাইয়া ফেলিত, গার্হস্থ্য জীবনের কান্ত কোমল পরিস্ফুট এমন ছবি সংসারে অতি বিরল। কিন্তু সেদিন ত আর ফিরিয়া আসিবে না!

মানুষের ভাগ্য ঠিক নদীর স্রোতের মত। কোন বাধা না মানিয়া সে আপন-মনে ছুটিয়া যায়। যখন সে নামিয়া যাইতে চাহে, সহস্র আয়াসেও তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। পরিবর্ত্তন আসিবেই আসিবে, —তা সে বিদ্যুৎ বিদীর্ণ ঝড়ের তাণ্ডব নর্ত্তনেই আসুক, কিংবা সহজ, নিঃশব্দ পবন হিল্লোলের মধ্য দিয়াই আসুক।

সংবাদ আসিল বিশেষ জরুরী—আমাকে একবার ছচার দিনের জন্য জঙ্গল পরিদর্শনে যাইতে হইবে। কাল বিলম্ব না করিয়া আপনার পত্নী ও পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলাম। বাংলোয় পৌঁছিয়া প্রথমত রোজই জঙ্গল দেখিতে বাহির হইয়া সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসি। এমনি করিয়া তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় কনক

ফিরিয়া আসিবার প্রস্তাব করিত। আর আমি প্রত্যহই তাহাকে পরদিনের আশা দিয়া নিরস্ত করিতাম; কিন্তু প্রতি প্রভাতে এমন সব অভিযোগ আসিত যাহার সমাধান না করিয়া আসা আমার ব্যবসায়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। একদিন কনক আমায় বলিল, 'কালকেই যেতে হবে'? আমি তাহার কথার উত্তরে বলিলাম, "আজ আমার সব কাজ হোয়ে গেল, কাল বোধ হয় বেরুতে পারবে।"

কনক একটু দৃঢ়স্বরে বলিল, "আর বোধ হয় নয়, কাল যেতেই হবে।"

আমি বলিলাম, "কাল যদি সকালে আবার কোন কাজ আসে, তা হোলে আর কি করে হবে।"

কনক পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে বলিল "তা হোলে তুমি থেকো আমি চোলে যাব।" তাহার একথায় আমি হাসিয়া বলিলাম "আমায় ফেলে যেতে পারবে?" সে বলিল, "দেখে নিও, ঠিক পারবো।"

এ সব কথা যদিও জানি হাসি খেলার ছলে বলা হইল, তবুও আমার মন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। আমি তাহাকে হৃদয়ের কাছে টানিয়া লইয়া একটী সস্নেহ-চুম্বন দিয়া বলিলাম "কাল যদি নেহাৎ না হয়, তা হোলে পরশু নিশ্চয় যাবো জেনে রাখো—"

অকস্মাৎ দয়ের সঙ্গে সঙ্গে খবর আসিল জঙ্গলের সীমানা লইয়া একটা সাহেব কোম্পানীর সহিত আমাদের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। আমার একবার সেখানে যাওয়া বিশেষ আবশ্যক। খবর যে আনিয়াছিল তাহাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, ব্যাপারটী গুরুতর হইলেও আমার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মীমাংসা হইতে পারে। কনককে কোন সংবাদ না দিয়া আমি সত্বর প্রস্তুত হইয়া গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। হায়! তখন যদি জানিতাম নিয়তির কি কঠোর বজ্র আমার উপর নিক্ষেপিত হইবে।

গোধূলির স্বর্ণচ্ছায়া দিগন্তে মিলাইয়া গেলে যখন ক্লান্তচরণে অবসন্ন দেহে গৃহে ফিরিলাম সহসা তখন সমস্ত মর্ম্মকোষ ভেদ করিয়া কি এক অবিশ্রাম করুণ ক্রন্দন ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল। দ্রুতপদে বাংলোর সিঁড়ির সিকট যাইতেই কনকের রুদ্ধা পাহাড়ীয়া দাসী উন্মত্ত ক্রন্দনে বলিয়া উঠিল—"সব মিট গিয়া বাবুজী।"

কি মিট গিয়া রে! সংসারে তা সবে দুটি আমার বুকের নিধি! কাহার কি হইল? মাতালের মত টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ করিলাম। একরাশ অমল ধবল যুঁই ফুলের মত কনক, শুভ্র শয্যার উপর পত্রান্তরালচ্যুত জ্যোৎস্না-বিধৌত হইয়া স্থির নিস্পন্দভাবে পতিত রহিয়াছে। আকুল উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম, কনক—কনক—কনক। কিন্তু সাড়া কেহই দিল না। কেবল ঘন বন ও দূর-প্রসারিত প্রান্তরে প্রতিধ্বনি উঠিল, কনক—কনক—কনক। নিদারুণ বিসূচিকা কনককে আমার অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমার স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে; কনক—আমার অন্তরলক্ষ্মী—আমার শত-সাধনার ধন, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার সম্পূর্ণ অভাবে বৃন্তহীন কুসুমের মত অকালে ঝরিয়া পড়িল। সত্যই ত সে আমায় ফেলিয়া গেল! —বেদনার দারুণ পীড়নে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলাম।—

সঙ্গীটির এই করুণ কোমল কাহিনী প্রতি নিমিষে আমার হৃদয়ে কি ব্যথা—কি আকুলতা জাগাইয়া তুলিতেছিল তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। এমনই তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলাম যে,আমার মনে হইতেছিল—আমিই এই কথিত কাহিনীর নায়ক। সহসা তাঁহাকে নিস্তব্ধ হইতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম অতীতের শত স্মৃতি তাঁহার মনোরাজ্যে কি ভাব-বিপর্য্যয়ই না সংঘটিত করিয়াছে। কোমলকণ্ঠে বলিলাম, "আমি বুঝিতে পাচ্ছি, আপনার খুবই কষ্ট হোচ্ছে। এই অবধি থাক্, আর বোলে কাজ নেই।"

ভগ্নকণ্ঠে তিনি উত্তর করিলেন, "কষ্ট হোচ্ছে সত্তি, কিন্তু তার মাঝে ও আমি যেন একটা শান্তি পাচ্ছি।—আর তা' ছাড়া শেষটুকু আমার কাহিনীর আসল কথাই বলা হবে না।"

নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া তিনি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কনকের মৃত্যুর পর, একমাত্র সান্ত্বনাস্থল আমার শিশুপুত্রটীকে লইয়া আবার সেই পরিত্যক্ত পুরাতন পল্লীভবনে ফিরিয়া গেলাম। প্রতিবেশীর সহায়তা ও বন্ধুজনের স্নিগ্ধ সান্ত্বনায় একটু একটু করিয়া কনকের শোক ভুলিতে লাগিলাম; কিন্তু যখন কোন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আমাকে উপযুক্ত পাত্রজ্ঞানে বিবাহের কথা তুলিতেন, আমার মর্ম্মকোষ ভেদ করিয়া তখন যেন প্রবল রক্ত ধারা বহিয়া যাইত। কোন প্রকারে তাঁহার সবিশেষ অনুরোধ এড়াইয়া আমার নির্জ্জন গৃহতলে ছুটিয়া যাইতাম। শত চেষ্টাতেও আর আমার কাতর অশ্রুধারাকে রোধ করিতে পারিতাম না।

আমার হৃদয়ের ব্যথা কে বুঝিবে? স্বার্থপর সংসার শুধু আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত। কেমন করিয়া বুঝাইব—যাহাকে সকল-হৃদয় দিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম—বড় আপনার বলিয়া আদরে বরণ করিয়া বক্ষে টানিয়া লইয়াছিলাম, যে আমার শোক-হর্ষে সমভাগিনী ছিল, তাহার শত-স্মৃতি বিজড়িত আসনে কাহাকে বসাইব?

গভীর রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে যখন বিশ্ব ঘিরহের নিবিড় বেদনা আমাকে দারুণ পীড়া দিত, তখন কোন প্রকারে মন আর বাঁধিতে পারিতাম না। অতীতের অজস্র গোপন-কথা আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিত। মনে হইত আমি যেন এক চিরবিরহ লোকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রহিয়াছি। স্নিগ্ধ মধুর সান্ত্বনার বাণী শুনাইবার যেন কেহ আমার নাই।

কি একটা অবসাদ ধীরে ধীরে সমস্ত দেহকে ছাইয়া ফেলিত। আমি যেন সমস্ত আপনাকে হারাইয়া ফেলিতাম। সহসা আমার পুত্রের ক্রন্দনে আবার যেন আপনার মধ্যে আপনাকে ফিরাইয়া পাইতাম। তার ক্রন্দনও যেন আমার নিকট তখন কত মধুর বোধ হইত। মনে হইত—সরস নির্ঝর দেহ লইয়া সে নাই; কিন্তু স্নেহ—তাহার ত অভাব হইবে না। সে অক্ষয়দান তাহার, সে ত সব দিয়াই গেছে। শুধু তার যে টুকু অসত্য—সে টুকু ভঙ্গুর সেইটুকু নাই।

এমনই করিয়া ক্রমশঃ আমার মনকে দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিলাম। আমার পুত্রের বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমার সেই দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতার বিশেষ অনুরোধে পুনরায় জঙ্গলের বাংলোয় ফিরিয়া গেলাম। আবার একটু একটু করিয়া প্রতি দিবসের কার্য্যে যোগ দিতে লাগিলাম। একটি বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্যের নিকট পুত্রকে রাখিয়া অল্প সময়ের জন্য জঙ্গল পরিদর্শনে যাইতাম। বালক প্রতিদিনই আমার সহিত যাইবার জন্য জেদ করিত; কিন্তু দুর্গম জঙ্গল মধ্যে তাহাকে লইয়া যাইতে সাহস করিতাম না বলিয়া নানা প্রকারে ভুলাইয়া রাখিয়া আসিতাম।

সেদিন কার্য্যোপলক্ষে একটু বেশী দূর গিয়াছি। ফিরিবার সময় আকাশে মেঘ করিয়া আসিল। আমি ও কুলিরা যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন বাংলোর নিকট আসিলাম তখন প্রবল বেগে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বাংলোর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই খোকাকে ডাকিলাম; কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। আমি আসিবামাত্র যে ছুটিয়া আসিয়া আমার কোলে উঠিত, আজ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মেজের উপর ভৃত্যটি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। তাহাকে জাগাইয়া খোকার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। খোকা ঘুমাইতেছে দেখিয়া সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমার ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে সে ইহার অধিক কিছুই বলিতে পারিল না।

বিদ্যুতের মত সহসা আমার মনে আসিল, ভৃত্যটি ঘুমাইতেছে দেখিয়া খোকা হয়ত জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের উন্মাদ পবনেরই মত বাংলো হইতে ছুটিয়া বাহির হইলাম। অবিরল জলধারা তখন জঙ্গলের পথ-রেখাগুলিকে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে। সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিলাম। প্রতি বৃক্ষমূল ও গুল্মতৃণ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু কোথাও আমার হারানিধির সন্ধান মিলিল না। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিল—মনে হইল খোকা হয়ত এতক্ষণে বাংলোয় ফিরিয়া আসিয়াছে। বিবশ দেহে, সঞ্চলিত-চরণে পুনরায় বাংলো লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলাম। সিঁড়ি বাহিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠিয়া আবার নির্ব্বাপিত-প্রায় সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া ডাকিলাম "খোকা—" কোন উত্তর আসিল না, কেবল ভৃত্যটি ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। বুঝিলাম খোকা ফিরে নাই। জতশক্তি হইয়া দেওয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িলাম। ভৃত্যটি ও

কুলিরা আমার এই অবস্থা দেখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রভাতে অরুণ রেখা ফুটিবার সঙ্গেই আবার ছুটিয়া বাহির হইলাম। কিছুদূর গিয়া সহসা একটি গুল্মমূলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই আমার স্নেহ-দুলালকে দেখিতে পাইলাম।

আমার নয়নের মণি—জীবনের একমাত্র সম্বল—প্রিয়তমার শেষ স্মৃতি, যাহাকে শত স্নেহ-আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতাম, সে আজ সমস্ত নাড়ী কাটিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমার তাপদগ্ধ জীবনে স্নিগ্ধ মধুর বাণী শুনাইবার আর কেহ রহিল না। দুখানি পুষ্পপেলব বাহু দিয়া স্নেহবন্ধনে দিবস শেষের কর্ম্মময় জীবনের অবকাশে আর কেহ আমাকে মধুর সম্ভাষণে সম্বোধন করিবে না। আমার সকল দৈন্য, সকল বেদনা যে দূর করিত সে আর নাই—নাই—নাই। আমার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা বিরাট হাহাকার যেন শূন্যে মিলাইয়া গেল।"

নিতি-নব-উপচিত সৌন্দর্য্য লইয়া প্রভাত-কানন রূপ রস গীত-রাগে মুখরিত হইতে লাগিল আমি কেবল নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে কেবল ধ্বনিত হইতেছে নাই—নাই—নাই।

প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ।

(শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্ত বি, এল)

কবি হৃদয়ের সহিত যে বিশ্ব-প্রকৃতির একটা নিগূঢ় বিচিত্র ও রহস্যময় সম্পর্ক বিদ্যমান আছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রকৃতির সহিত এই রকম একটা জ্ঞাতিত্ব বোধ হয় মানুষ মাত্রেরই আছে, কিন্তু কবি জীবনেই আমরা এটা খুব স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিতে পারি। এই বিশ্ব প্রকৃতির দুটো দিক আছে, একটি, অন্তঃপ্রকৃতি আর একটা বহিঃপ্রকৃতি। অন্তঃপ্রকৃতির বিষয় হচ্ছে স্নেহ, প্রেম, দয়া, ঘৃণা, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি জীব-হৃদয়ের বৃত্তি সমূহ। আর বহিঃপ্রকৃতির বিষয় সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ—অভ্রভেদী ধবল তুষার মৌলী অচল পর্ব্বতমালা, ফোনল উর্ম্মি বিক্ষোভ-সচল নীল অম্বুরাশি, নীরেন্দ্র প্রতিম স্বচ্ছ আকাশ প্রভৃতি নিসর্গের বিভিন্ন মূর্ত্তি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের কাব্যের

শ্রেষ্ঠত্ব অনেকটা তাঁহাদের এই অন্ত ও বহিঃপ্রকৃতির সহিত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে। যিনি যত বড় কবি প্রকৃতির বিচিত্রতার সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা তত বেশী। প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করিয়া কেহ বড় হইতে পারে না। অবশ্য প্রকৃতির এই দুটো দিকেই যে সকলের কাব্যে সমানভাবে প্রতিফলিত হয় তাহা নয়। কাহারও কাব্যে বা প্রকৃতির বাহিরের দিকটাই বেশী ফুটিয়া উঠে, আবার কোনও কোনও কবির কাব্য অন্তঃপ্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই বিকশিত হইয়া উঠে। জগতের দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালিদাস প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবি, সেক্ষপীর শেষোক্ত শ্রেণীর কবি। তাই বলিয়া এমন বুঝায় না যে, কালিদাসের সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় ছিল না, কিংবা সেক্ষপীরের বহির্প্রকৃতির বিচিত্রতার পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল না; বরঞ্চ খুব বেশীই ছিল। এখানে কেবল তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে তুলনায় তারতম্যের কথা বলা হইতেছে। অন্তঃপ্রকৃতি আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। বহিঃপ্রকৃতির সহিত রবীন্দ্র নাথের কাব্যের সম্বন্ধ কিরূপ সেই সম্বন্ধেই গোটাকতক কথার এই স্থানে আলোচনা করিব।

অন্তঃপ্রকৃতিকে অশ্রয় না করিয়া যেমন কবি-হৃদয়ের অমৃত ধারা উৎসারিত হইতে পারে না, বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে বোধ হয় এ কথা খাটে না। অধিকাংশ সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্তঃপ্রকৃতিকে স্ফুট করিয়া তুলিবার জন্যই বহিঃপ্রকৃতি কাব্যের মধ্যে স্থান পায়। কখন কখন যে বহির্প্রকৃতি যে কেবল মাত্র নিজের জন্যও কাব্যের মধ্যে স্থান পায় না এমন নয়। প্রকৃতির দৃশ্যেরও সৌন্দর্য্যের অবিমিশ্র বর্ণনা ইহার উদাহরণ। এরূপ বর্ণনা কাব্যের শিল্প চিত্র হিসাবে যতই আদর থাক, কাব্য হিসাবে ইহাদের স্থান খুব উচ্চে নয়। অন্তঃপ্রকৃতির আলোকে যখন বাহ্য প্রকৃতির এই সমস্ত চিত্র রঙিন হইয়া উঠে, তখনই কেবল কাব্য হিসাবে তাহাদের শ্রেষ্ঠতা বাড়িয়া উঠে। আর এক প্রকারের প্রকৃতি বিষয়ক কাব্য আছে, যেখানে অন্তঃপ্রকৃতি কবির ব্যক্তিত্বের আঁচে গলিয়া বাহ্য প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। এই ভাবের প্রকৃতি-পরিচয় গীতি কবিতার মধ্যেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্র নাথের কাব্যে এই দুরকম প্রকৃতি চিত্রই বর্ত্তমান।

প্রকৃতির পূজারী রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির রূপের মধ্যে অনাদি অরূপের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার অন্তরের মধ্যে এক প্রাণময়ী শক্তিময়ী দেবী মূর্ত্তির সত্তা অনুভব করিয়া,—শুধু দেবীরূপে নয় আমাদের অনাদি কালের এক পরমাত্মীয় স্নেহময়ী জননীরূপে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছেন। তাঁহার একটা চিঠিতে আছে, "আমি বেশ মনে কর্ত্তে পারি বহুযুগ পূর্ব্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্র-স্নান থেকে সবেমাত্র মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা কর্চ্ছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হইতে পল্লবিত হয়ে উঠছিলাম, তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে—এবং অবোধ মাতার মত নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিতে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আস্ফালনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান কর্চ্ছিলাম, নব শিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নিলীথির তলে আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ছিলাম—এই আমার মাটীর মাতাকে এই আমার মস্তক শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান কর্চ্ছিলাম। একটা গূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নব পল্লব উদ্গত হ'ত।" * * * * তারপর নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।" প্রকৃতির সঙ্গে এই যে অনাদিকালের সম্বন্ধ; এই যে মাতাপুত্রের মধুর সম্পর্ক এটা অপর কোনও কবির কাব্যে দেখা যায় না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়

না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবান্ কবি বঙ্গের কাব্যভাণ্ডারকে উজ্জ্বল মণিরত্নে বিচিত্র সম্পদময় করিয়া তুলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কাব্যের কোথাও প্রকৃতির এই ভাবটী দেখা যায় না। কাহারও কাহারও কাব্যে প্রকৃতির গভীর পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা, প্রকৃতির বৈচিত্রে নিবিড় আনন্দ উপভোগ করা এবং কোথাও কোথাও তাহার দু-একটা অতি মনোরম বর্ণনার চিত্রও দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রাণময়ী, স্নেহময়ী জননীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনার কাব্যে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছেন তাহা আমার জানা নাই। প্রকৃতিকে প্রকৃতির জন্যই তাহাকে আমাদের পরমাত্মীয়া রূপে, শুধু বর্ণনার উপমা সংগ্রহ করিবার জন্য নহে, শুধু নীতি বা দার্শনিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্যও নহে, তাহার রূপও আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়াই যে ভালবাসা তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও কাব্যে দেখা যায় নাই।

বৈষ্ণব কবিদিগের স্থান বাঙ্গলার সাহিত্যের আসরে অনেক উচ্চ, সুতরাং তাঁহাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যের কথাটাই অগ্রে আলোচনা করিব। তাঁহাদের কাব্যে যে সকল প্রকৃতির মনোরম চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ছবিও শিল্প হিসাবে তাহারা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। স্থানে স্থানে তাঁহাদের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বেশ একটা আত্মহারা ভাষও পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন কেবল উপমা সংগ্রহ করিবার জন্য; তাঁহারা যে প্রকৃতির চিত্র আপনাদের কাব্যে অঙ্কিত করিয়াছেন সে কেবল মানুষেরই মনোভাব ও কার্য্যকলাপকে ব্যক্ত করিতে কতকটা সাহায্য করিতে; প্রকৃতির সহিত আমাদের একটা নাড়ীর টান আছে এরূপ অনুভব করিয়া তাঁহারা চিত্র অঙ্কিত করেন নাই।

"তুলে পুলকিত যে মাটীর ধরা
সুতায় আমার সামনে

সে আমারে ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে!

* * * *

এ সাত মহলা ভবনে আমার
চির জনমের ভিটাতে
জলে স্থলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে।"

এই যে জল স্থল আকাশের সহিত একাত্মবোধ, এটা বৈষ্ণব করিরা কোন কালেই অনুভব করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেখিয়াছেন প্রকৃতির বাহ্যরূপটুকু। নব জলধরের নীল নবীনতা, ক্ষণপ্রভার অস্ফুট হাস্য, "কুলিশ শত শত" "ঝঞ্ঝা ঘন" ময়ূরের নৃত্য, "জাতকী-কেতকী কুসুম" এই গুলিই তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। যাঁহার সহিত এই গুলির সাদৃশ্য আছে তাঁহাকে দেখিয়া তাই এই গুলির কথাই মনে পড়িয়াছে। তাই বিদ্যাপতির রাধা প্রিয়তমের রূপধ্যান করিতে "নীল নব ঘন সজ্জনদের" সহিতই তাহার সাদৃশ্যটুকুর বেশী করিয়া অনুভব করিয়াছেন—

"কি কহব সখি কানুক রূপ।
কো পাতিয়াব স্বপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥
ঝামর ঝামর কুটলহি কেশ
কিয়ে শশি মণ্ডল শিখণ্ডসবেশ॥"

কানুর সুন্দর দেহ অভিনব জলধরের ন্যায়, তাঁহার পীত বসন সৌদামিনীর ন্যায় এবং তাঁহার কুটিল কেশ মধ্যস্থ বদনমণ্ডল ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে; কিন্তু প্রকৃতির এর চেয়ে বড় আর একটা কাজও বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্যে

দেখিতে পাওয়া যায়, যেটা কেবল গীতি কাব্যেই সম্ভব,—যে জিনিষটা সকল দেশের বড় বড় কবিদিগের কাব্যেই কোনও না কোনও প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে। 'মেঘদূতে' যে জিনিষটা আমরা প্রচুর পরিমানে দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও সেই জিনিষটা অনেকস্থানে প্রকাশ পাইয়াছে—সেটা প্রকৃতির ভাব-বিপর্য্যয়ে মনুষ্য হৃদয়ের ভাব-বিপর্য্যয় সংঘটন। ইংরাজীতে যাহাকে Sympathetic treatment of nature বা প্রকৃতির সহানুভূতি সূচক বর্ণনা বলে। 'গ্রীষ্ম,' 'বর্ষা,' 'শরৎ,' 'হেমন্ত' 'শীত' 'বসন্ত' প্রভৃতি ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে মানব মনেরও একটা রহস্যময় অলক্ষ্য পরিবর্ত্তন হয়, সে জিনিষটা বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্যে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই এই ভরা বরষার দিনে বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকা আপনার শূন্য মন্দিরে বসিয়া কান্তবিরহে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন—

"সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া,
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

বরষার 'ঘন ঝঞ্ঝা' 'শত শত কুলিশপাত' 'ময়ূরের নৃত্য' ও 'ডাহুকীর ডাক' আকাঙ্ক্ষা ও বিরহানলের গাঢ়তাকে আরও প্রগাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। পিপাসাতুর নরনারীর ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে—মানব হৃদয়ের যত আকুল বাসনা ব্যাকুল হইয়া মেঘের মত চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কান্ত বিরহিনী আর একাকিনী শূন্য মন্দিরে থাকিতে পারে না। গোবিন্দ দাসেও ঠিক এই ভাবটি দেখা যায়—

"মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদ পাতি
নীরদ মুরতি নয়নে মন লাগয়ে
নিন্দয়ে ঝরয়ে দিনরাতি।"

কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে বৈষ্ণব কবিরা প্রকৃতিকে জড় ছাড়া আর কোনরূপেই ভাবিতে পারেন নাই। "পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস গন্ধ, সমস্ত নাড়া চাড়া আন্দোলন.....সমস্তকে জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্দ্ধপরিচিত প্রাণী নানা মূর্ত্তিতে" তাঁহাদিগকে 'সম্ভাষণ' করিতে পারে নাই। অবশ্য তাঁহারা যে সময় কাব্য লিখিয়াছেন সেই সময়ে শুধু বঙ্গদেশ নহে, শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত পৃথিবীর আর কোনও দেশের কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি দু একজন সঙ্কত কবির কাব্য ছাড়া আরও কোথাও প্রকৃতিকে তাঁহাদের অপেক্ষা নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করার পরিচয় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও বর্ষার বর্ণনা আছে। তাঁহারও কবিহৃদয় বর্ষার বিচিত্র সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া "শত বরষের ভাব উচ্ছ্বাস" কলাপের মত বিকাশ করিয়া "আকুল পরাণে উচ্ছ্বাসে" কাহারে যাচ্ঞা করিয়াছে বটে, বৈষ্ণবীয় মণি-খচিত ইন্দ্রধনু আঁকা আকাশ-তোরণের চিত্র ও কাশ কুরুবক শোভিত পুষ্পরাজের শোভা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তিনি শুধু প্রকৃতির রূপ দেখিয়াই মুগ্ধ হন নাই, তাঁহাকে শুধু আপনার ও অপরের ভাব-উদ্ভাসনের সহায়করূপে তাঁহার কাব্যে টানিয়া আনেন নাই। তিনি প্রকৃতিকে ইন্দ্রিয় বিশিষ্টা অনুভূতি শালিনী এক পরম রূপলাবণ্যময়ী নারীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ষা "গ্রামগম্ভীর সরসা" "নব যৌবনা"—

"আজি আসিয়াছে ভুবন ভরিয়া

গগনে জড়ায় এল চুল
চরণে জড়ায়ে বন ফুল!
* * * *
আকুল করেছে শ্যাম সমারোহে
হৃদয় সাগর উপকূল।"

কে এই সুন্দরী গগনে এল চুল জড়াইয়া, চরণে বনফুল ছড়াইয়া তাঁহার হৃদয় সাগর উপকূলকে শ্যাম-সমারোহে আকুল করিয়া তুলিতেছে, তিনি চিনিতে পারিতেছেন না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"ওগো প্রাসাদ শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে?
কবরী এলায়ে
ওগো নব ঘন নীল বাস খানি
বুকের উপরে কে দিয়েছে টানি?
তড়িৎ শিখায় চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে মেলায়ে?"

প্রকৃতিকে এই যে চিনিবার ইচ্ছা, প্রকৃতির প্রতি এই যে ব্যক্তিগত আসক্তি ও মনোভাব ইহা বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্যে কোথাও সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায় নাই।

আমাদের দেশের কবিগণের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদিগের পরই ভারত চন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারত চন্দ্রের কাব্যেও কিন্তু খুব উচ্চ অঙ্গের প্রকৃতির অনুভূতি কোথাও দেখা যায় না। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতির বর্ণনা অনেক স্থলে আছে বটে; কিন্তু তাহার অধিকাংশই উপমাচ্ছলে ব্যবহৃত এবং নিতান্ত মামুলী ধরণের। অধিকন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং প্রকৃতির বর্ণনার সহিত হৃদয়াবেগকে মিশাইয়া লইয়া একটা আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ভারতচন্দ্রের ছিল না বলিয়াই মনে হয়। কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের কাব্যেও স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর ঋতুর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারও সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বর্ণনার কাছে তাহা নিতান্ত নিষ্প্রভ। তাহাদিগের যে টুকু মূল্য তাহা কেবল বর্ণনা মাধুর্য্যের জন্য, যেমন,

"আহা মরি তরঙ্গিনী কিবা শোভা ধরেছে।
রজত রঞ্জিত সাটী অঙ্গ বেড়ি পরিছে॥
শুভ্রপরে শশধর, হেমছটা ফরিছে।
সুশীতল নিরমল কর দান করিছে॥"

বর্ণনা খুব স্বাভাবিক ও সুন্দর এবং প্রকৃতিকে ব্যক্তিত্বের ছাপ দিবার, (personify করিবার), একটা চেষ্টাও আছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতির যে সজীবতা ও লীলা-চাঞ্চল্য দেখা যায়, এই সকল কবিতায় তাহার আভাস ও পাওয়া যায় নাই। প্রকৃতির বাহিরের রূপটাকে চিত্রের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার যে আনন্দ তাহা হইতেও রবীন্দ্রনাথ আপনাকে বঞ্চিত করেন নাই। তাই তাঁহার কাব্যে শুধু ছবির জন্য যে ছবি তাহারও অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় যেমন;—

"নীলের কোলে শ্যামল যে দ্বীপ
প্রবাল দিয়া ঘেরা,
শৈল চূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর বিহঙ্গেরা।"

কিংবা— "দীঘির জলে ঝলক্ ঝলে
মাণিক হীরা,
সরষে ক্ষেতে উঠ্‌ছে মেতে
মৌমাছিরা।"

কিন্তু তিনি প্রকৃতির মধ্যে যে আর একটি জিনিষ অনুভব করিয়াছেন এবং আপনার কাব্যের মধ্য দিয়া তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা শুধু শুধু কবি কেন বাঙ্গালার আর কোনও কবির কাব্যেই দেখা যায় না। "শ্যামলা ধরণী" "ধবল যামিনী," "শশী দিনমণি আধার আধার" সকলেই তাঁহার আপনার জন,—

"আকাশের তারা ডাকিছে আমারে
সমীরণ ডাকে আয় আয় করে

কে জানে কে মোর প্রাণের ভিতরে
বসিছে সদাই সকলি তোমার।"

প্রকৃতির সহিত এইরূপ আত্মীয়তা, এই বিশ্বানুভূতি তাহার পূর্ব্বে আর কাহারও কাব্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ঈশ্বর গুপ্তের পর বঙ্গদেশে আর যে সকল কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন "মধুসূদন" "নবীনচন্দ্র" ও "হেমচন্দ্র" তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান। প্রকৃতি-চর্চ্চায় মধুসূদনকে খুব কমই ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। তাঁহার ছোট ছোট কবিতার মধ্যে বসন্ত, বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সম্বন্ধে একটু আধটু বর্ণনা দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ মনোহারিত্ব বা নবীনতা নাই। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ও তাঁহার প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের যে টুকু বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা, তাঁহার উপমাসংগ্রহের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আর্ণল্ডের (Arnold) ন্যায় তাঁহার উপমার মধ্যেও ছোট ছোট সুন্দর নিসর্গ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ ইংরাজ কবির ন্যায় তাঁহার এই সকল চিত্রও কেবল কৃত্রিমতা পূর্ণ ও অনুকরণজাত। এই সকল প্রকৃতির চিত্র, প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের ব্যক্তিগতভাবে পরিচয়ের ফলে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে তাঁহাদের প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি বা ভালবাসার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালের মহাকাব্যের কবিরাও, শুধু আমাদের দেশে নয়, গ্রীস, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং ইহুদীদের দেশের কবিরাও প্রকৃতির ক্রোড় হইতে তাঁহাদের কাব্যে উপমা সংগ্রহ করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের এই সকল প্রকৃতি-চিত্র কাহাদেরও অনুকরণ জাত নয়। প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের যে অভিজ্ঞতা তাহা তাঁহাদের পুস্তক লব্ধ অভিজ্ঞানের ফল নয়। তখনকার কালে এখনকার কালের ন্যায় মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে ফেলিয়া নিজের গড়া সৌন্দর্য্যকে এতটা আদর করিতে শিখে নাই; সুতরাং তাহাদের প্রকৃতি-প্রেমটা খুব সাদাসিধা ও মোটারকমের হইলেও সেটা খুব আন্তরিক ছিল। মধুসূদনের তাহা ছিলনা; সেইজন্য তাঁহার প্রকৃতি বিষয়ক কাব্যও উচুদরের হয় নাই। নবীন চন্দ্রের কাব্যে অনেক জম্‌কাল ও জোরাল রকমের প্রকৃতি বর্ণনা আছে, আর প্রকৃতিকে তিনি অন্তরের সহিত ভালও বাসিতেন সেইজন্য নবীনচন্দ্রের কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনার বাহুল্য মধুসূদন অপেক্ষা অনেক বেশী; কিন্তু নবীনচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঠিক তুলনা চলে না।

বাঙ্গলার প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে যদি কেহ একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন আনিয়া থাকেন তবে সে হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র নিজে যেমন ভাবুক ও প্রকৃতি-প্রিয় ছিলেন, ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় থাকাতে, তিনি এই বিষয়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, প্রভৃতি ইংরাজ কবিদিগের প্রভাবে অনেক খানি অভিভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজের প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা ও সহানুভূতি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তত নিবিড়ভাবে ছিল না বলিয়া তাঁহার প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা গুলিও খুব উচ্চাঙ্গের হইয়া উঠে নাই। তাঁহার প্রকৃতি বিষয়ক কাব্যগুলিতে একটু ইংরাজির ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়; তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, তিনি যে প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্য সম্বন্ধে বঙ্গ সাহিত্যে যে একটা নূতন ধারা ও অনুভূতি আনিয়া দিয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা গুলির মধ্যে অনেক স্থানেই একটা pessimistic note বা বিষাদের সুর শুনিতে পাওয়া যায়, যেটা রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের অনেক প্রেমের ও হৃদয়বৃত্তিমূলক কবিতায় থাকিলেও তাঁহার প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্যে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রের "হের ঐ তরুটার দশা," "যমুনা তটে" প্রভৃতি প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা গুলি এইরূপ বিষাদব্যঞ্জক। কৌমুদী

বিধৌত সুন্দর নিশীথে যমুনাতটে বসিয়া কবির মনে ক্ষণে ক্ষণে কত কথাই উদিত হইল,—"পাসস্ব" 'রাজত্ব', 'ধর্ম্ম', 'আত্মবন্ধুজন', 'জরামৃত্যু পরকাল', 'ঘমের তাড়ন', 'আশা', 'ভয়', 'সাধ', 'আহ্লাদ', বিষাদ আসিয়া তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিল,—

"হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদ এমন
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?"

এ যেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "Obstinate questionings of sense and outward things."

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ন্যায় হেমচন্দ্রের নিকটও,

"—the meanest flower
that breathes can give
Thoughts that lie too
deep for human tears.

তাই প্রকৃতির সামান্য বৃক্ষটীকে দেখিয়াও তিনি পার্থিব জীবনে নশ্বরতা অনুভব করিয়াছেন,—

"হের ঐ তরুটার কি দশা এখন
বিরাজিত বনমাঝে আগে সে কেমন
* * * * *
এখন আপনি হেলে পড়েছে ধরায়
স্বগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন
হের ঐ তরুটার কি দশা এখন।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রকৃতিকে এমন ভাবে দেখেন নাই; প্রকৃতির ক্ষুদ্রতা তুণ গুল্ম এমন কি অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গটীকে দেখিয়াই অমনি তাঁহার মনে শোক দুঃখ ও অনুতাপের সমুদ্র উথলিয়া উঠে নাই। তাঁহার নিকট প্রকৃতি অতি আপনার জন, তাহার একটা প্রাণ আছে, তাহার সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে। প্রকৃতি তাঁহার কবি হৃদয়কে সখার ন্যায় প্রণয় ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কবি নিজেই স্বীকার করিতেছেন, "প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব ক'রে। এই তৃণ গুল্ম লতা জলধারা, বায়ু-প্রবাহ, এই ছায়া লোকের আবর্ত্তন, জ্যোতিষ্ক দলের প্রবাহ পৃথিবীর অনন্ত প্রাণী পর্য্যায়, এই সমস্তরই সঙ্গে আমাদের নাড়ী চলাচলের একটা যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসান তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়ছে, যেখানে ঝঙ্কার উঠ ছে সেখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। জগতের সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণের আনন্দে অনন্ত দেশ কাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত—তা হলে কখনই এই বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হ'ত না। যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই বলেই আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি হয়ে উঠত।"—ইহা যে কবির অত্যুক্তি তাহা নয়—তাঁহার সমস্ত কাব্যের মধ্য দিয়ে এই কথাটাই অতি সুন্দর রূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এইস্থানে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী আরও কজন কবির সম্বন্ধে দু এক কথা বলা আবশ্যক মনে করি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা গুলির সহিত যদি আর কাহারও কবিতার কিছুমাত্র সাদৃশ্য থাকে, তবে তাহা বিহারীলালের সহিতই কতকটা আছে। এ কথাটী সার্থকতা বিহারী লালের "উষা" চিত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের "সন্ধ্যা" চিত্রের তুলনা করিলেই বেশ স্পষ্টবুঝা যায়। উষাকে বর্ণনা করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"স্বরের লহরী, কার আকাশে বেড়ায়!
উদয় অচলে আসি
শোনে উষা হাসি হাসি,
ঘুম ভেঙে ফুলরাণী চারিদিক পানে চায়।"

আর রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা',

"—নির্ব্বাক নীরব
* * * নয়ন-গরব
নত হ'য়ে ঢাকে তার নয়ন যুগল,—
অনন্ত আকাশ পূর্ণ অশ্রু ছল ছল
করিয়া গোপন।"

প্রকৃতির এই যে দুই মূর্ত্তি—একটী হাস্যময়ী, আনন্দময়ী মূর্ত্তি, আর একটী করুণাময়ী, বিষাদময়ী, বাষ্পাকুলা মূর্ত্তি—এ দুইটির মধ্যে যে একটা সজীবতা—যে একটা মানুষের গুরুতা (human actinty) আছে, সেটা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বঙ্গীয় আর কোনও কবির কাব্যে খুঁজিতে পাওয়া যায় না। বিহারীলালের কাব্যে আমরা প্রথম জানিতে পারি কেতকী-কুসুম হর্ষে উৎফুল্ল হইতে পারে, কদম্ব পুষ্পও মানুষের ন্যায় বুঝি রোমাঞ্চিত তনু হইয়া উঠে এবং কাশ পুষ্পগুলি সোহাগে পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়ে—

"সুরভি কেতকী-কুসুম, প্রফুল্ল চমকে পুলক,
সোণার কদম্ব সব ফুলে রোমাঞ্চিত কায়;
উল্লাসে মাঠের কোলে তৃণের তরঙ্গ দোলে
কাশের চামরগুলি সোহাগে গড়িয়ে যায়।"

মানুষের ন্যায় প্রকৃতির এই যে সুখ দুঃখানুভূতি, এই যে হর্ষে উৎফুল্ল, রসে রোমাঞ্চিত এবং সোহাগে গড়িয়া পড়ার ভাব রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বিহারীলাল ভিন্ন আর কাহারও কাব্যে দেখা যায় না; কিন্তু এই বিষয়ে উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ হয় ত এ বিষয়টা উত্তরাধিকার-সূত্রে বিহারীলালের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিহারীলালের সহিত রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে এত খানি সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য ও এত বেশী যে, প্রকৃত পক্ষে দুজনের তুলনাই হয় না। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে এমন কতক গুলি নূতন ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, যাহা আর কাহারও কাব্যে দেখা যায় না। প্রকৃতির মধ্যে—জল, বায়ু, আকাশ, বাতাস মৃত্তিকার মধ্যে কবির আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার, মিশাইয়া একাকার করিয়া দিবার যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়, বিহারীলালের কাব্যের কোথাও তাহা দেখা যায় না।

"—ওগো মা মৃন্ময়ি!
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিগ্‌দিগন্তে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত;"

আপনার বক্ষপঞ্জর মধ্যস্থ নিরানন্দ অন্ধকার কারাগারের সঙ্কীর্ণ পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া, প্রকৃতির মাঝে "যেথা হ'তে অহরহ অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ শতেক সহস্র রূপে" সেই স্থানে ফিরিয়া যাইবার আকুল বাসনা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বের পরিচায়ক।

এই পৃথিবীর মাটীর সঙ্গে তিনি যে একটা নাড়ীর টান অনুভব করিতেন, তাহা শুধু তাঁহার মুখের কথায় নয়, তাঁহার অনেক কবিতার মধ্য দিয়াই এই কথাটা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তিনি এই সমস্ত প্রকৃতির জগতের মধ্যে যে একটা মাতৃস্নেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা শুধু বিহারীলাল কেন, আর কোনও কবির কাব্যে দেখা যায় কি না সন্দেহ।

"হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশী ভাল লাগে
বেদনা কাতর মুখে সকরুণ হাসি
দেখে মোর মর্ম্ম মাঝে বড় ব্যথা জাগে।
আপনার বৃন্ত হতে রক্ত নিয়ে
প্রাণ টুকু দিয়েছিস সন্তানের দেহে—
অহর্নিশ মুখে তার আছিস তাকায়ে
অমৃত নারিষ দিতে প্রাণপণ স্নেহে।
কত যুগ হতে তুই বর্ণ গন্ধ গীতে
সৃজন করিতেছিস আনন্দ আবাস
আলো শেষ নাহি হ'ল দিবসে নিশীথে
স্বর্গ নাই কয়ে দিস স্বর্গের আভাস।"

এই যে প্রকৃতির "রূপ রস বর্ণ গন্ধ গীতে" স্বর্গের আভাস দেখিতে পাওয়া, ইহা রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব।

(ক্রমশঃ)

অজ্ঞানার বাণী

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

এক যে বাউল ডাক্ দিলে গো মেঘ-সীমানা হ'তে,
নিশুত্ রাতের বিজন সভায় চাঁদের আলোর স্রোতে।
শরৎ-হাওয়া হাত বুলিয়ে,
দিচ্ছে যখন চোখ ঢুলিয়ে,
জগৎ যখন ঘুমিয়ে আছে ধ্যানের মৌনব্রতে,
ডাক্ এল গো মেঘের ওপার হ'তে।

* * *

ফুলবাগানের গন্ধবিভোল ঘাস-বিছানা ভুঁয়ে,
একটি টেরে চুপ্‌টি ক'রে একলা আমি শুয়ে।
পুকুর-ঘাটের রাণায় রাণায়
জোছ্‌না হীরার ছুরি শাণায়,
কমল-বধূ শিউরে ওঠে ঝল্‌মলে জল ছুঁয়ে—
আর, এধারে একলা আমি শুয়ে।

* * *

রসের রাসে আকুল হলেম, চেয়ে চাঁদের পানে,
যেভাষায় মন কইচে কথা, হয়নাকো তার মানে!
নয়ন-চকোর মেল্‌চে ডানা,
উড়্‌বে কোথায়, নেই ঠিকানা,
হারিয়ে ফেলে সকল দিশা পূর্ণিমার এই বানে—
পলক-হারা চেয়ে চাঁদের পানে।

* * *

এমন সময় উঠ্‌ল বেজে আকাশ-পারের বাণী!
মেঘের ফাঁকে দেখ্‌চি যে কার সুরঙ্গী হাতছানি!
জাগ্‌চে যেথা শুকতারকা,—
কল্পলোকের প্রেম-ধারকা,
স্বপ্নদেবীর ওষ্ঠে কাঁপে রক্ত হাসিখানি,—
ডাক্‌চে সেথায় আকাশ-পারের বাণী!

* * *

বাউল, ওগো বাউল, তুমি ডাক্‌চ এ কোন্ সুরে!
তান-ভরা তোর গান শুনে ভাই, প্রাণ কেন মোর ঘুরে
যাই ভেসে যাই মনোরথে,
আলোক-পুরীর ছায়াপথে,
ধরার ছবি মায়ার মত মিলিয়ে যে যায় দূরে,—
অচিন বাউল, গাইচ এ কোন্ সুরে!

* * *

সদাশিবের দপ্তর

আত্মা।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্‌বি, এম্‌সি, লণ্ডন)

মাঝে মাঝে কখন কখন মনোবিজ্ঞান পড়িতে বসিতাম, কিন্তু মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝিতাম না, কোনও মতের সহিত নিজের মতের ঐক্য হইত না। বাল্যকাল হইতেই তর্ক করা অভ্যাসটা আছে; স্কুল-মাষ্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতাম স্ত্রীলোকের গোঁপদাড়ি নাই কেন? মাষ্টার রসনা বিশিষ্ট জড় বস্তু, সুতরাং "মারিব" বলিয়া বেত উঠাইতেন, আর আমায় নিরস্ত করিয়া রাখিতেন। বিজ্ঞানের যাহা ইচ্ছা প্রশ্নের উত্তর দিবার মত রসনা নাই, সুতরাং আমার যাহা ইচ্ছা তাই জিজ্ঞাসা করিয়া প্রশ্নের উত্তর পাইতাম না। তাই বলিয়া সদাশিব নিরস্ত হইবার লোক নয়; কাহারও নিকট উত্তর না পাইলে

সে আপনার মনোমধ্যে সেই কথার তোলাপাড়া করিয়া চিন্তা করিতে বসিত। কেহ কেহ সদাশিবকে বলিত যে "হে, তুমি কি ইংরাজি প্রবাদটা জান না যে—"greatest fool may ask more than the wisest man can answer." অতএব তাহাদিগের মতে সদাশিব একজন wise man of Gotham. কিন্তু কি করিয়া স্বদর্শ দোষে ভিন্নরুচি বিশিষ্ট সংসার ছাড়া বিষয়গুলির চিন্তাই সদাশিবের মনে সর্ব্বাগ্রেই আসে। কেন যে আসে তাহার কোন সদুত্তর দিতে পারে না।

বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় অন্ধকার গৃহে বাগানের পাশের জানালাটি খুলিয়া বসিলেই আমি সদাশিব আমার চিন্তা আসিত—কবির গিন্টি করা গহনার মত আমার চিন্তা ছিল না—উহা দৌখিন সূক্ষ্ম গহনা নয়, উহা মোটা মোটা শাঁখা, বড় বড় পৈঁছার মত গহনা। কবির ভাবের সূক্ষ্ম গহনা গুলির কাট ছাট দিলে আর কিছুই থাকে না—কিন্তু আমার চিন্তার গহনা গুলি কাটিলে গহনায় ডায়মণ্ড কাটা হয়, অর্থাৎ চিন্তিতব্য বিষয় আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, যেন ফুটিয়া বাহির হয়। ভাবিলাম বৃষ্টির উৎপত্তি কোথা হইতে? মেঘ। মেঘ কোথা হইতে আসে? বাষ্প। বাষ্প কোথা হইতে জন্মে? জল। অতএব যে জল হইতেছে তাহার উৎপত্তি, ঐ এক জলই হইতে, কিন্তু তাহা নানা হাত ফিরিয়া আবার ঐ জল হইতেছে। ঐ ত স্বভাবের বাহাদুরী। ফল হইতে গাছ হইল, সেই গাছে আবার ফল হইল, আবার সেই ফলে গাছ হইল। জন্ম মৃত্যু, বিবাহ এ তিনটি বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা জন্মটি আমার কাছে যেন ভোজবাজী। বিবাহ—রাসায়নিক যোগ। মৃত্যু—শরীরের পরিপোষক অংশকীয় বস্তুর অভাব। জন্মটি কিন্তু বড় রহস্যময়। সামান্য সর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের উৎপত্তির মত, সামান্য কয়েক ফোটা শুক্র হইতে মানুষের জন্ম। কেবল তাহাই নহে তাহাতে আবার পাঁচ ইন্দ্রিয়, ছয় রিপু, বুদ্ধি, মন, আত্মা প্রভৃতি অসংখ্য সংস্কারের সমাবেশ। জাতকের আকৃতি বিষয়ে সংশয় না থাকিতে পারে, কারণ সর্ষপের মধ্যে একটি অপরিস্ফুট বৃক্ষের সমুদয় উপকরণ যেমন সঞ্চিত থাকে, পিতৃশুক্রে সেইরূপ অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে তাহারই বিকাশ জাতকের দেহের বিকাশ হয়। জল বায়ুর গুণে যেমন বীজ, তেমনই বৃক্ষে পরিণত ও পরিবর্দ্ধিত হয়; পিতার ঔরসে সন্তানের উৎপত্তি হইল, কিন্তু পিতার আত্মা হইতে সন্তানের আত্মা পৃথক হয় কেন? অবশ্য উভয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য না থাকাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ উহা এক প্রদীপ হইতে আলান অন্য প্রদীপ ভিন্ন ত আর কিছু নয়। অনেক দার্শনিক কিন্তু এ কথাটায় কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা বলেন পুত্রের আত্মার সহিত পিতার আত্মার সংশ্রব নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা কতকগুলি আত্মা লইয়া বসিয়া আছেন, মানব জন্ম যেখানে যেখানে হইতেছে, সেই সেই স্থানেই ঐ সঞ্চিত আত্মার ভাণ্ডার হইতে একটা একটা বাহির করিয়া রওনা করিতেছেন। আত্মার আধার-যে মনুষ্য দেহ তাহার মৃত্যু আছে, কেন না সে জড় পদার্থ; কিন্তু আত্মা অজড়। মানুষ মরিলে সৃষ্টিকর্ত্তা আবার সেই আত্মা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেন, আবার কোথাও অনুলান পড়িলে পাঠাইয়া দেন। এই জন্যই দেবতারা বানররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বজন্মে রাম অবতার ছিলেন, রামচন্দ্র আবার নারায়ণের এক চতুর্থাংশ। পীথাগোরাস্ ৪২বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কাহারও কাহারও বা সংশ্রব জন্ম হইয়া থাকে। কে জানে কালিদাস মরিয়া সেক্‌সপীয়র হন নাই; কে জানে ন্যায়রত্নানন মরিয়া আমি জন্মাই নাই। আত্মা রেলের রিটর্ণ টিকিট নয় যে, তাহার গায়ে "not transferable" লেখা থাকিবে; সুতরাং একবার কার্য্য হইলে তাহাকে পুনরায় অপর কার্য্যে

লাগান আশ্চর্য্য নয়। এখন কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মা জিনিষটা কি? ঈশ্বর যেরূপ নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ অথচ আছেন, আত্মাও কি তদ্রূপ। তাহা হইলে আত্মার ভাণ্ডারে সকলগুলি আত্মা একত্র হইয়া যায় না কেন? বোধহয় রাখিবার কৌশল। আত্মা যদি ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে আপনার অংশ হইতে মনুষ্য শরীরে আত্মা পাঠাইতে হয়। ভাল, তাহা হইলে মনুষ্য সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারে না কেন? সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে না কেন? মনুষ্য যাহা পারে বোধহয় ঈশ্বরও ঐ পর্য্যন্ত পারেন? রামচন্দ্র ত ভগবানের অংশ, ঈশ্বর যাহা করিতে পারেন, তাহা রামচন্দ্রে বিদ্যমান। বিশ্বকর্ম্মার কারুকার্য্যের নমুনা তাহার দৃষ্ট জগন্নাথে বিদ্যমান। পরমহংসদিগের মতন যে তাঁহারই ঈশ্বর, বস্তুতঃ তাহা না হইবার বিশেষ কারণ ও দেখা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরে যে সমস্ত গুণ, যে সমস্ত ঐ ক্ষমতা আছে, তাহা অনেক পরমহংসে নাই, সুতরাং আত্মা ঈশ্বরের অংশ বলিব কি করিয়া। ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবার জন্য আত্মা উৎসুক তাহা জানি, কিন্তু তাই বলিয়া আত্মাকেও ঈশ্বরের অংশ মানিতে হইবে কেন? ঈশ্বরের অংশ হইলে তথিষয়ে আত্মার জিজ্ঞাসু হইবার প্রয়োজন থাকে না। আত্মা দেহ ভিন্ন অন্যত্র বাস করিতে সমর্থ নয়। দেহ জড় পদার্থ, সুতরাং আত্মা জড়ে বিদ্যমান, কিন্তু আত্মাতে যে সকল ক্ষমতা আছে, তাহা জড়ে নাই। দেহ সাধারণ জড়ের কয়েকটি সংলগ্ন ফল মাত্র। আমি যে একটা অজড়, আত্মা সেই একার না হইবার কারণ কি? যখন এত অংশ চুণ, এত অংশ কয়লার, এত অংশ অঙ্গার, এত অংশ উদ্ভজ্জান, এত অংশ অম্লজান, এত অংশ গন্ধক ইত্যাদির সংযোগে মনুষ্য দেহখানি উৎপন্ন হইল, তখনই ও তাহাতে আত্মার সঞ্চার হইল; সেই আত্মা ক্রমে পুষ্ট ও সম্পূর্ণ বলশালী হইল, পরে শরীরের সহিত তাহার ধ্বংশ হয় না কেন? তবে এক আত্মা দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিল কি প্রকারে বলা যায়? যদি স্বীকার করা যায় যে, মনুষ্য শরীরের ভৌতিক পদার্থ সকল মৃত্যু হইলে পুনরায় ভৌতিক-রূপে পরিণত হয়, এবং সেই ভৌতিক পদার্থ সকল পুনরায় কোন মনুষ্য শরীর গঠিত করে, তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব শরীর হইতে উৎপন্ন আত্মা সম্পূর্ণরূপে নূতন না হইলেও কিয়দংশে এই নূতন শরীরে আসিতে পারে। তবেই সেই শরীর হইতে যে আত্মার উৎপত্তি হইল, তাহাই পূর্ব্বজন্মের আত্মা হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বজন্মের সমুদায় গুণ ও সংস্কার যে থাকিবে, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়; এবং সে আত্মার যে পূর্ব্ব-স্মৃতি পুনরায় জাগরূক হইতে পারে তাহা ও সহজে বিশ্বাস করা যায় না; তাঁহাকে নূতন আত্মা বলিয়া অঙ্গীকার করা উচিত। প্রাচীন মিশরবাসীদিগের ইহাই ধারণা ছিল যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা যতদিন না শরীর ধ্বংস হইয়া যাইত ততদিন তাহার কাছে কাছে বেড়াইত। Hamlet-এর পিতা ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে তাহার নিজ মৃত্যু-বিবরণ বলিয়াছিল!

এক্ষণে কথা এই যে মনুষ্যের মৃত্যু হইলে আত্মা কোথায় যায়? অনেকের এই মত যে এ জগতে যে যেমন কর্ম্ম করে সেই অনুসারে তাহার আত্মা স্বর্গে বা নরকে বাস করে। আবার কাহারও কাহারও মতে আত্মা পুনরায় ভিন্ন শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। শেষোক্ত মত লইয়া পূর্ব্বেই দুচারি কথা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বের মতটা ঠিক প্রাণে লাগে না। যাহারা ঐ মতের পক্ষপাতী তাহারাও আত্মাকে অজড় বলেন, আমিও তাহাই বলি; কিন্তু দুইটার ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মতের অনৈক্য; তাহাদিগের মতে আত্মা অমর। কিন্তু যে আত্মা শরীর-গত, শরীর ভিন্ন চৌষটি ভৌতিক পদার্থের একের

মধ্যেও থাকিবার যাহার ক্ষমতা নাই, সে অবশ্য শরীরের সহিত ধ্বংস হইবে; তবে ধ্বংসও রূপান্তরিত হইয়া মনুষ্য শরীরে যে পূর্ব্বজাত অংশ প্রবেশ করে তাহা হইতে আত্মার সংশ্লিষ্ট অংশের উৎপন্নের সম্ভাবনা এবং উহাই একেবারে ধ্বংস হয় না। কিন্তু পূর্ব্বে কি ছিল, কোন্ মনুষ্যের শরীরে ছিল তাহা কোন্ আত্মা সাক্ষ্য দিতে পারে? আত্মার এমনই স্বভাব যে মানব দেহের যদি কোন পদার্থের অভাব হইল, তবে আর তাহাতে তিনি তিষ্ঠিতে পারেন না, আর এই অভাবের নামই মৃত্যু; মৃত্যু হইলে আত্মার সহিত দেহের অবশ্য বিচ্ছেদ ঘটিবে। উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইলে শরীরে বায়ুর অভাব হয়, সুতরাং মৃত্যু বা আত্মার বিয়োগ হয়। অস্ত্র ধারে রুধির স্রাব হইলে, শরীরপোষক রুধিরের অভাব হয়, সুতরাং মৃত্যু হইয়া দেহের সহিত আত্মার আর কোন সংস্রব থাকে না।

কেহ কেহ তর্ক করেন যে জড় পদার্থ চিন্তাশীল নয়, কিন্তু আত্মা চিন্তাশীল; সুতরাং আত্মা অজড় এবং যাহা অজড় তাহা অমর। কিন্তু এই চিন্তাশীলতা কতদিন। না যতদিন শরীর। শরীর হইতে পৃথক হইলে তাহার যে সে ক্ষমতা থাকে তাহার প্রমাণ কি? যখন আমরা কেহই মরিয়া দেখি নাই তখন প্রমাণাভাব। প্রমাণাভাবে উহা সত্য বলিয়া কিরূপে গ্রাহ্য হইবে?

যাহারা জন্তুদিগের পরকাল আছে বলিয়া স্বীকার করেন না তাহারা এই বলেন যে, জন্তুরা চিন্তাশীল নয়। যাহারা চিন্তাশীল তাহারাই অমর, জন্তুরা অমর নয়। তাহারা যে চিন্তাশীল নহে তাহার সমুচিত প্রমাণ কোথায়? আমরা তাহাদের আত্মার কথা কিরূপে বলিতে পারি। পশু পক্ষী যে চিন্তাশীল নয় তাহা আমি বলি না। আমরা জ্ঞান (reason) দ্বারা চিন্তা করি, আর তাহারা সহজাত বুদ্ধি (instinct) বলে চিন্তা করে। যদি ঈশ্বর থাকেন এবং তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্য তিনি তাহাদিগকে চিন্তাশক্তি দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে সুখ দুঃখ দিয়াছেন, আর চিন্তাশক্তি দেন নাই এ কি রকম কথা,—তবে বেশী আর কম। বিবর জন্তুর নৈপুণ্য, শৃগালের ধূর্ত্ততা, পক্ষীর কৌশল, বানরের বুদ্ধিমত্তা এ সকল চিন্তার সামগ্রী নয় কি? যে পশু-বুদ্ধিতে কেবল আহার বিহার করিতে বলে, ঐ সকল কৌশল, নৈপুণ্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও প্রবঞ্চনা কি তাহার ফল। তাহাই যদি সত্য হয়, না জানি সে পশু বুদ্ধি কেমন? অনেক মনুষ্যের জ্ঞান প্রদীপ নিবাইয়া ঐরূপ পশু বুদ্ধির বাতি জ্বালিতে ইচ্ছা করে। তুমি আমি যে বুদ্ধির গুণে বিষয় কর্ম্ম করি, বাড়ীঘর তৈয়ারী করি, ইহাও তাহার ফল—এই আমার বিশ্বাস। যে কারণে মনুষ্যে আত্মার চিন্তাশীলতা যায়, ইহাদিগেরও ঠিক সেই কারণে যাইয়া থাকে। মনুষ্য যে কারণে মরণশীল; ইহারাও ঠিক সেই কারণেই মরণশীল।

পশু পক্ষী মরিয়া পঞ্চে পঞ্চ মিশাইয়া যায়, আবার সেই পঞ্চে পশু পক্ষীও মনুষ্য দেহ ধারণ করে। দেহই আত্মার আবাস ও চিন্তার হেতু। সুতরাং অনেক দেহে পশু আত্মা আসিয়া জুটে। বোধ হয় এই জন্যই আমাদিগের স্কুলের ছাত্র রামটী নিতান্ত গুর্দ্দান্ত, আবার পোষা গরুটাকে পুরোহিত মহাশয়কে দান করাতে সে কাঁদিয়াছিল। চলনা পক্ষীটা মায়ার শোকে মারা গেল, "ভুলো" কুকুরটী তার প্রভু দুলো বাব্দী মরাতে না খাইয়া মারা গেল। যদি তোমাতে গরুর আত্মা বা গাধার আত্মা প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা, হইলে তুমিও আমার এই অলৌকিক বিজ্ঞানের অর্থ বুঝিবে না।

পণ্ডিতেরা আত্মাকে অমরত্ব দিয়াছেন তাহার কারণ অতি সরল। আত্মা অমর হইলেই পরকাল রহিল, সেখানে আত্মার পরীক্ষা হইবে। তাহার পর দোষের জন্য দণ্ড পাইবে, অর্থাৎ কি না অত্যন্ত দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবে আর নির্দ্দোষী হইলে সম্পদশালীর গৃহে জন্ম লইবে। এটি বেশ কথা; বড় ভাল নিয়ম। চাষা ও মূর্খ বুঝাইতে আমাদিগের দেশের পণ্ডিতেরা যেরূপ পটু, এমন আর কোথাও নাই। নবমীর দিনে অনাবৃ ভক্ষণ করিলে গোমাংস ভক্ষণের পাপ স্পর্শে; শয়নের পর কলমীশাক বা পটোল ভক্ষণে পাপ হইবে। বস্তুতঃ এ সকল নিষেধ বাক্যের মর্ম্ম কে বুঝিবে, কেই বা মানিবে! এত গোলযোগে কাজ নাই—অমুক কর্ম্ম করিতে নাই করিলে অমুক পাপ হইবে অমনি তৎসঙ্গে অমুক প্রায়শ্চিত্ত কেমন বেশ ব্যবস্থা নয়? আত্মাও এই হেতুতে অমর। পরে দণ্ড পাইবে এই ভয় না থাকিলে, সংসার বোধ হয় চলিত না। তুমি আমার সামগ্রী চুরি করিবে জানিলে আমি পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিতাম না, কেননা মনে জানি চুরি করিলে ক্ষতি নাই। জগত তাহা হইলে কিন্তুত কিমাকার হইয়া পড়িত। সৎকর্ম্মের পুরস্কার আছে, আমার বিপদ সময়ে উপকার করিলে, সাধারণের উপকারের জন্য পুষ্করিণী খনন করাইলে কেহ খাইতে পায় না তাহাকে অন্ন দিলে ইত্যাদি, এ সকলের পুরস্কার মৃত্যুর পর আত্মা ভোগ করিবে। কিন্তু আত্মাকে জলবুদ্বুদ বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে কয় জন লোক আপন বয়স্কানির অর্দ্ধাংশ দিয়া তোমাকে পুষ্করিণী হইতে জল তুলিতে দিত! বস্তুতঃ আত্মাকে অমরত্ব দিবার কারণ আর কিছুই দেখা যায় না, কেবল পরোপকারের প্রবৃত্তিকে সজাগ করিয়া রাখিবার চেষ্টা মাত্র, তীর্থ পর্য্যটন, অন্নছত্র, দোল দুর্গোৎসব শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কার্য্যের আসক্তির অন্যতম কারণ, একদিন না একদিন—এ জন্মে না হয় পরজন্মে, সৎকার্য্যের পুরস্কার পাইবই পাইব, কারণ আত্মা যে অমর। চৌর্য্য দস্যুতা, পরদ্রব্যহরণ, প্রস্তুত অন্নে ধূলি নিক্ষেপ ইত্যাদি অসৎকর্ম্মের মানুষে যে ভয় পায়, তাহার আত্মা অমর বলিয়া, কারণ মানুষের বিশ্বাস পাপের সাজা লইতেই হইবে। পৃথিবীতে নীতি ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য বোধ হয় পণ্ডিতেরা আত্মার অমরত্ব দিয়াছেন, আর এটা কিছু মৎ দোষের কার্য্য নয়, কারণ সব দেশের শাস্ত্রেই বলে পরোপকার পরম ধর্ম্ম।

জীবন আশা

(গান)

[শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল]

ওগো, সারা জীবনের তুমি শুধু আশা,
মম মানস রাগিণী নন্দিত ভাষা।
আমি, শুনিয়া তোমারি নাম,
রচেছি মুরতি কাম,
ওগো, তুমি বারি ধারা, আমি যে পিয়াসা।

জীবন-পথে তুমি মম সাথী,
সংসার রণে, তুমি মম রথী,
তরঙ্গ মাঝারে ভেলা তব ভালবাসা।
তুমি কত মহান্ উচ্চ,
আমি কত দীন হীন তুচ্ছ,
তবে কেন মম উন্মাদ-দুরাশা?

রক্তের টান

(গল্প)

[শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী]

সংস্কারবশে কি না জানি না, রামময় বাবু কেশ বিরল মস্তকে বারেক চিরুণীখানি ঠেকাইয়া, উড়ানীটি স্কন্ধোপরি দুলাইয়া মুখে দুর্গানাম করিতে করিতে যেমন সদর-অন্দরের সন্ধিস্থলে পদার্পণ করিলেন, সেই সময়ে বধূমাতার কক্ষ হইতে উপর্য্যুপরি চপেটাঘাতের শব্দে, তিনি বুঝিলেন বাল্মী সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য ত্বরিতপদে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই রামময়—হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয় পৌত্র গোপাল অষ্টম বর্ষীয়া আপন ছোট ভগ্নীটির উপর বর্ষার বারিধারার ন্যায় অবিরাম প্রহার করিতেছে। প্রভাও যথাসাধ্য দাদাকে তাহা ফিরাইয়া যে না দিতেছে তাহা নহে।

আকস্মিক দৈব প্রেরিতের ন্যায় ভস্মীভূত বৃদ্ধ পিতামহের শুভাগমনে মহাসমর সাময়িক সন্ধিতে পরিণত হইল।

বহু সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও রামময় যখন উপস্থিত সমরের কারণ পৌত্রের নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন না, তখন পৌত্রী প্রভার দিকে চাহিলেন।

প্রভা তখন যঃ পলায়তিঃ সঃ জীবতি নীতির অনুসরণ করিয়া পলায়নের উপক্রম করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে রামময় রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভা কি হয়েছে বলত ?"

প্রভা কোন রকমে ভাঙ্গা গলায় আরম্ভ করিল, "এই এই, আমি দাদার বাক্স থেকে ছবি দেখেছি, আঁ দাদা তাই মারলে, আমি বল্লুম তোমায় বলে দেব, তাই আরও মারতে লাগল।"

"কই কি দেখি ছবি" বলিয়া রামময়, ভূলুণ্ঠিত ছবিখানি তুলিয়া মর্ম্মাহত জীবের আর্ত্তনাদের ন্যায়—অব্যক্ত, অস্ফুট ধ্বনি করিয়া পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

চিত্রখানি তাঁহার আদরিণী কন্যা শুভার। মরীচিকা মুগ্ধা হরিণীর মত, কাহার মোহন টানে সে যে অনেকদিন হইল অনন্তের পথে চলিয়া গিয়াছে।

* * * * *

আজ কয়েকদিন হইল কুসুম একটি শিশুর জননী হইয়াছে। নন্দনের গন্ধ ঘেরা, স্বর্গীয় হাসিতে ভরা সন্ধ্যায় ফোটা যুথিকার মত নিরমল এই ক্ষুদ্র শিশুটি কুসুমের জীবন পথে একটা স্রোতের ধারা আনিয়া দিয়াছে। কুসুম ধরি ধরি করিয়াও তাহা ধরিতে পারিতেছে না। শিশুর প্রতি তাহার এই আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হয়, স্বরগের স্নেহ মন্দাকিনী কুসুমের মরুময় বুকের মাঝে পূত উচ্ছ্বাসে নামিয়া আসিয়াছে।

জলস্রোতের ন্যায় জলস্রোত অবিরাম রাজপথ বহিয়া চলিতেছিল।

এই রাজপথ খানির উপর কুসুমের দিশে হারা আঁখি তারা দুটি যখন পড়িয়াছিল; সেই অবসরে তাহার মনটা অজ্ঞাতে স্বপ্নময় অতীত স্মৃতির জীর্ণ পুঁথিখানি লইয়া একবার নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতেছিল। মনে পড়িতেছিল, তাহার গৃহ, তাহার আত্মীয় স্বজন, আর ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই সরল হাসিতে ভরা দাদাটার মুখখানি। কুসুমের একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

সহসা একটা বিকট কোলাহল কুসুমকে সজাগ করিল। ব্যাপারখানা কি তাহা দেখিবার জন্য

কুসুমের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সেই দিকে পড়িতে তাহার মুখখানি বিজলীর মত নিমেষে উদ্ভাসিত হইয়াই নিবিড় তমসায় ঢাকিয়া গেল।

পথের ঘটনা, একটি বালক ও একটি বৃদ্ধ অসাবধানতায় মোটরকার-চাপা পড়িতে পড়িতে অদৃষ্টের জোরে এবং সোফারের গুণে বাঁচিয়া গিয়াছে।

* * *

দর্শনীটা দিবার সময়ে "রোগীণীর অবস্থা কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু ?" জিজ্ঞাসা করিয়া উৎকণ্ঠিত কুসুমের 'মনের কথা' দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর করিলেন,—"এখন কিছু বলা যায় না। হাই ফিবার; মাথার গোলমাল। "একপদ অগ্রসর হইয়া ডাক্তার বাবু আবার বলিলেন, "দেখুন উনি ডিলিরিয়মে বাঁদের নাম কচ্ছেন তাঁদের খবর দিলে হয় না।"

ঈষৎ হাসিয়া কুসুমের মনের কথা জবাব দিল, "আমি ত তাঁদের চিনি না। আর চিনলেই বা কি হ'ত। আপনি যদি দয়া করে একজন নার্স পাঠিয়ে দেন, যা খরচ পড়বে আমরা দিতে রাজী আছি।"

"আচ্ছা দেখ্‌ব—" বলিয়া ডাক্তার বাবু বিদায় লইলেন।

মনের কথা ফিরিয়া রোগীনীর শিয়রে আসিয়া বসিল। প্রলাপের ঘোরে কুসুম তখনও বকিতেছিল "এর কি দোষ বাবা ?"

ভর্ৎসনা করিয়া 'মনের কথা' বলিল, "কেন বলত ? কি হয়েছে ? অত বকছ কেন ?"

রক্ত চক্ষু মেলিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কুসুম কহিল, "খোকা কোথায় ?" খোকা!"

'মনের কথা' জবাব দিল—"ও ঘরে ঝিয়ের কাছে ঘুমুচ্ছে।

"বেঁচে আছে ?"

ধমকাইয়া উত্তরে বলিল, "যাট—যাট, বেচে থাক, মানুষ হোক।"

"ও; মানুষ হবে।"

"না মানুষের পেটে গরু জন্মাবে।"

কুসুম আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া বলিয়া চলিল "যেদিন ফুটে উঠবে সেদিন আমারই পাপের আগুনে গুমে গুমে জলতে থাকবে।"

* * *

নার্সও 'মনের কথা'র প্রাণপাত পরিশ্রমে ও যত্নে প্রায় ছয়মাস পরে কুসুম পথ্য পাইল।

রোগ শয্যায় কুসুম যখন উঠিয়া বসিতে পারিত, তখন সে কি ভাবিয়া চিন্তিয়া গোপনে পিতাকে একখানি পত্র :—লিখিয়াছিল। বারেকের ভুলে পঙ্কিল বাপী তটে হতভাগিনীর পদস্খলিত হইয়াছিল। নারকীয় কীট দংশনে জর্জ্জরীভূত হইয়া সে এখন পিতার ক্ষমা প্রার্থীনী। স্নেহময় জনক যদি দয়া করিয়া সন্তানকে চরণ দর্শন দিয়া শান্তিতে মরিতে দেন ?"

কুসুম ভাবে পত্রের জবাব আজ আসিবে; কখনও ভাবে আসিবে না। তবুও নিত্যই দুরাশার প্রতীক্ষায় পত্র পেটিকাটি খুলাইয়া দেখিতে ভুলিত না।

সে কুসুম কোরক শিশুর পানে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে এই নন্দন পারিজাতকে কোন্ সামর্থ্যে সে দেবতার নির্ম্মাল্য করিয়া রাখিতে পারিবে। তবে কি সে মা হইয়া যাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহারই সহিত শুধু শঠতা সাধিতে থাকিবে।

* * *

"কার চিটিরে গোপাল ? কে লিখেছে ?"

"জানি না দাদু তোমার নামে এসেছে।"

"দেখি" বলিয়া রামময় হস্ত প্রসারিত করিলেন। লেফাফা খানি ছিঁড়িয়া হস্তাক্ষরের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র যেন তড়িৎ স্পর্শে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

স্খলিত পত্রখানি গোপাল মাটি হইতে তুলিয়া পড়িতে গিয়া তাহার সদা প্রফুল্ল মুখখানির উপর যেন জলভরা মেঘের কাল ছায়া আসিয়া পড়িল।

প্রকৃতিস্থ হইয়া রামময় পত্রখানি লইলেন। চশমা মুছিয়া দুবোধ্য অক্ষরমালা হইতে আসল মর্ম্ম গ্রহণ

করিয়া যখন গৌরের পানে ফিরিয়া চাহিলেন, তখন হৃদয়ের কি যে অব্যক্ত যন্ত্রণা তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল, বালক গোপাল তাহা দেখিতে পাইল। পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিল—"দাদু পিসিমা ভাল আছে?"

আর্দ্রস্বরে রামময় কহিলেন—"ওরে নারে সেখানে কি কেউ ভাল থাকে! যে না বুঝে পা ফেল্‌বে সে ত পথের ছঃখ পাবেই।"

বালক আগ্রহ ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদু পিসিমা আস্‌বে না?"

—"না।"

—"দাদু তুমি কি পিসিমাকে ভাল বাস না?"

রামময় কোনই উত্তর করিল না। কেবল অর্থহীন দৃষ্টিতে শূন্যমার্গে চাহিয়া রহিল।

হায়রে পিতার প্রাণ! আপন সন্তানকে কে না ভালবাসে। কিন্তু অদৃষ্ট যে আত্ম এবং তাঁহার আত্মজার মধ্যে ছর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে! রামময়ের মনে হইল, কই, যে তিনটি কন্যাকে যমের হাতে তুলিয়া দিয়াছি এত জ্বালা ত তাহাতে পাই নাই। কি কঠিন বিধান! যাহাকে আমিই ইহজগতে আনিয়াছি; শৈশবে মাতৃহারা হইয়া যে আমার বক্ষে নাচিয়া গায়িয়া আলো হাসি দেখিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই কন্যা আজ নরকের অন্ধকূপ হইতে তাহার জনককে সকাতরে আবাহন করিতেছে—সান্ত্বনার জন্য, মুক্তির জন্য। যত বড়ই দোষ সে করুক না কেন, সন্তান বলিয়াই সে যে আজ মার্জ্জনীয়। আজ মরীচিকা মুগ্ধ হরিণীর মত মরণের কোলে সে যে, চলিয়া পড়িয়াছে।

রামময়ের বুকের মাঝে স্নেহ নির্ঝরিণী আজ শুধু ক্ষমার গানই গায়িতেছিল। কিন্তু তাঁহার অবাধ্য চরণ অগ্রসর হইতে একেবারেই নারাজ।

* * * *

তরুণ উষার অরুণ রাগে রঞ্জিত নীল নিলীমাতলে পক্ষীগণ বিশ্বের জাগরণ আনয়ন করিতেছিল। কর্ম্মচঞ্চল মানব যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া দিনের ডাকে কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময় রামময় মিত্রের ছোট বাটীর মধ্যে একটি অবগুণ্ঠনাবৃতা নারী আঙ্গন্ন পরিচিত প্রাঙ্গন প্রান্তে দাঁড়াইয়া যেন পথ হারার মত এদিক ওদিক চাহিতেছিল। রামময়, সেই স্থানে আসিয়া সম্মুখে দুঃস্বপনের মত নারী মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

সেই শিহরণ দেখিয়া ঝরা ফুলের মত পতনোন্মুখী রমণী কোন মতে আপনাকে সামলাইয়া একান্ত মিনতি ভরা কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

তাহার পুত্র বয়স্কাদ্বিত ঘুমন্ত শিশুটিকে পিতার পদপ্রান্তে রাখিয়া, তাঁহার চরণ ছুইটি নিজের অরা কম্পিত বাহুতে জড়াইয়া, অবিরল অশ্রুধারায় চরণ ধূলি বিধৌত করিয়া, রুদ্ধ নিঃশ্বাস কহিল,—"বাবা, পাপিনীর এই নিষ্পাপকে"—বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

মুহ্যমান রামময়ের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল আর একটি দিনের চিত্র শুভার জননী যে দিন শুভাকে তাঁহার চরণে সঁপিয়া চিরবিদায় লইয়া ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দিন আসিয়া দাঁড়াইল, যে দিন এই রকম একটা প্রভাতে তিনি বজ্রাঘাতের মত শুনিয়াছিলেন, তাঁহার শুভা কুলত্যাগীনী।

আর আজ এই প্রভাতে সেই শুভা অনুতপ্ত হইয়া পাদমূলে অশ্রুজলে ভাসিতেছে; মা হইয়া সন্তানকে রক্ষার জন্যে আশ্রয়হীনা আপন পিতৃপদতলে আসিয়া পড়িয়াছে।

ধরণীর শীতলতা সংস্পর্শে শিশু কাঁদিয়া উঠিল। রামময়ের কঠোর প্রতিজ্ঞা সে কল্পনায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার সেই ব্যাকুল বাহু চঞ্চল ভাবে প্রসারিত হইয়া শিশুকে তাঁহার স্পন্দিত বক্ষে তুলিয়া ধরিল।

বেহিসাবীর দল

(শ্রীলীলা দেবী)

আমরা যে ভাই বেহিসাবীর দল,
নাইকো মোদের গোণাগুণি,
চুকিয়ে নেবার ছল।
আমরা চলি' উড়িয়ে শুধু
দু'হাত দিয়ে দিয়েই বঁধু,
পাওয়ার চেয়ে দেওয়ার মধু
মাতায় মরমতল।
নিজের কথা রয় না মনে,
সবার মাঝেই সকল ক্ষণে,
নিজের ছবি দেখ্‌তে যে পাই
অভেদ অবিকল।
পাগল ব'লে উড়ায় হেসে
কাঙ্গাল ব'লে যাচ্ছে যে সে
যায়না তা'তে কিছুই এসে,
আনন্দেতেই চল্—
বিলিয়ে দিয়ে আপনাকে—নে
জগৎ জোড়া বল
আমরা যে ভাই বেহিসাবীর দল!

শোক-সংবাদ

৺অশ্বিনীকুমার দত্ত

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের পাঞ্চভৌতিক দেহের অবসান গত ২২শে কার্ত্তিক হইয়াছে—এখন তিনি অনন্ত পথের যাত্রী। বরিশালের ক্ষুদ্র সীমানা তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই—তিনি সারা বাঙ্গালার—সমগ্র ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। কর্ম্মী অশ্বিনীকুমার জ্ঞানী অশ্বিনীকুমার—ভক্ত অশ্বিনীকুমার দেশ মাতৃকার সেবায় দশের জন্য কর্ম্ম করিয়াছেন, জ্ঞান বিলাইয়াছেন, মুমুক্ষুকে মুক্তির পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানভক্তি কর্ম্মের অপূর্ব্ব ধারার সংযোগে সে নব-প্রয়াগের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পবিত্র বারি লইয়া অনেকেই ধন্য হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। এই ত্রিধাশক্তি ছুটিয়াছিল ধর্ম্মের দিকে, মহাত্মার লক্ষ্য ছিল ধর্ম্মের দিকে। ধর্ম্মগত প্রাণ অশ্বিনীকুমার দেশের লোকের প্রাণে স্বদেশ প্রীতির-প্রেরণা জাগাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। বিপথগামীকে প্রকৃত পথে আনিবার জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যগ্র ছিল। নরনারায়ণের সেবায় জাতিটাকে উদ্বুদ্ধ করিবার

জন্য তিনি সতত চেষ্টা করিতেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমের অনুরাগ তাঁহার 'ভক্তিযোগ' ও 'কর্ম্মযোগে' দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক বাঙ্গালী আবার কর্ম্মে অনু-

প্রাণিত ও ভক্তিপথের পথিক হউক। আবার বাঙ্গালী মানুষ হউক। তিনি হিমালয়ের ন্যায় মহান্ বিরাট্ আদর্শ জীবন আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা কি তাঁহার পদানুসরণ করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবে না?

৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৯শে কার্ত্তিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সুবিখ্যাত লেখক ও সম্পাদক মনীষী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় রসজ্ঞসিক, সুধী, বাগ্মী সাহিত্যিককে অকালে হারাইয়া বঙ্গভাষাভাষী মাত্রেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সাময়িক সংবাদ-পত্রের যে কতটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে তাহা পাঁচকড়ি বাবু দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ-শক্তি অসামান্য ছিল। রঙ্গ ও কৌতুক রচনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। চিরজীবন তিনি ছাত্রের ন্যায় সাহিত্যালোচনা করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত তিনি সম্যক্ পরিচিত ছিলেন। পুরাতন "সাহিত্য" পত্রিকায় 'সহযোগী সাহিত্য' বিষয়ক প্রবন্ধগুলি অবহিতঅবে পাঠ করিলে এ কথার যথার্থ্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার প্রবন্ধগুলি ইংরাজী মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ বিশেষের অনুবাদ নয়, এ গুলিতে তাঁহার চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলার পুরাতন সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী প্রীতি ছিল। প্রাচীন সাহিত্যের তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। অনেক সময় তাঁহার সহিত প্রাচীন শব্দ ও তাহার অর্থের আলোচনা করিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতাম তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া—প্রাদেশিক কয়েকটি ভাষায় তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ ছিল। ভাষাতত্ত্বের নূতন নূতন সূত্রগুলির সহিত তিনি যে সম্যক্ পরিচিত ছিলেন তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতাম। এ বিষয়ে বহুদিন তাঁহাকে একখানি পুস্তক রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহার সোদরোপম বন্ধু পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যখন আমাদের প্রকাশিত 'বাণী' পত্রিকায় কয়েকটি 'ভণ্ড' শব্দের আলোচনা করেন, তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ভায়া, এবার তোমার কথাটা রাখ্‌বো, অতুলের প্রবন্ধটা পড়ে কলম ধর্‌তে ইচ্ছে যাচ্ছে,—আমরা কজন মায়া গেলে প্রাচীন সাহিত্যের উপর কথা বল্‌বার লোকও চলে যাবে।' গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যেও এ বিষয়ে লিখিত এক বর্ণও তাঁহার নিকট হইতে ভাষা-জননী পান নাই। প্রাচীন হিন্দুর সমাজ তত্ত্বের আলোচনা তিনি বহুদিন যাবৎ করিয়াছেন। অধুনা-বিলুপ্ত 'বিজয়া' পত্রিকা ও 'বঙ্গবাণী'তেও এ সম্বন্ধের প্রবন্ধগুলি তাঁহার জ্ঞান-গরিমা ও অনুসন্ধিৎসার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অভাবের তাড়নায় অনেক সময় তিনি যে তাঁর শক্তির অপচয় করেন নাই, তাহা অস্বীকার করি না। বিদ্রূপ ও রঙ্গরসের পাঁচকড়ি যে সুষ্ঠু সাহিত্যের পাঁচকড়ি একথা ভুলিতে পারিলে সকলেরই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইবেই হইবে। তিনি সৎসাহিত্যের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তাঁহার বৃদ্ধা মাতাপিতা এখনও জীবিত। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and
Published by P. N. Pal. 2C-3 Scott Lane, Calcutta.

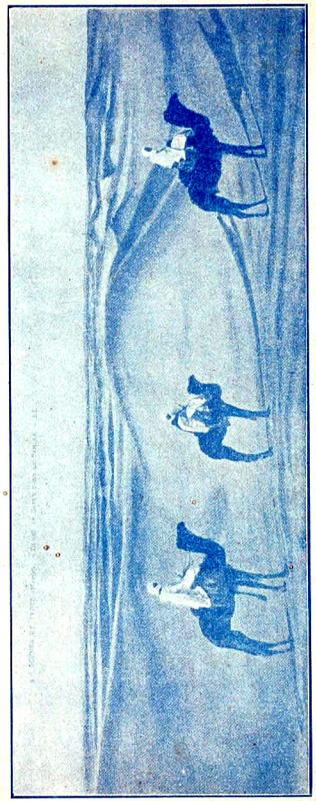

সাহারা মরুভূমির দৃশ্য।

(গত মাসের প্রবাসীতে বিস্তারিত চিত্র, শিল্পীর নিপুণ মানুষকারি দ্রষ্টব্য)

POPULAR PRESS CALCUTTA.

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

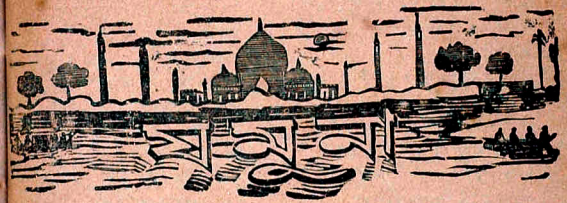

১৩শ বর্ষ, { পৌষ, ১৩৩০ { ৯ম সংখ্যা

বঙ্গ জননী

(শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত)

ষড়ৈশ্বর্য্যময়ি দেবি, হে বঙ্গ জননী !
জন্মি ধন্য তব কোলে, নেহারি যখনি
অতুল সুষমা ভরা মুরতি তোমার,
অনু হ'তে অনু হ'য়ে বিলাতে আমার,
সাধ যায় সেইক্ষণে ; নদনদী সাথে
প্রতি জলকণা মাঝে ছুটি দিবা রাতে,
শস্যে তটভূমি করি শ্যামলা সুন্দরী
বহি যাই মহানন্দে ; ইচ্ছা পল্লী গড়ি
বিরাট শান্তির রাজ্য, ধন রত্নে ভরি
বহি আনি' বুকে ধরি, বাণিজ্যের তরী।
যবে তব তপ্ত বুক নিদাঘ জ্বালায়,
মেঘমালা ঘেরি উঠি সলিল ধারায়
শীতল করিয়া দেয়, ইচ্ছা ছুটি যাই
প্রতি বারি বিন্দু সাথে, ও বক্ষে লুটাই।
হেরি ইন্দ্রচাপলেখা, নব মেঘদূত,
রচিবে নবীন কবি কাব্যরসে পূত,
দিবে ভাষা মন্দাক্রান্তা আকুল ঝঙ্কারে,
প্রবাসী বাঙ্গালীকণ্ঠে প্রথম আষাঢ়ে।
শীতের জড়তা যবে, আপনার বলে
ছিড়ে পর্ণ বৃক্ষলতা ফল ফুলে দলে,
করুণ শিশির কণা, তোমার নয়নে
ঝরে পড়ে উৎসরূপে ; মোরে সেইক্ষণে
ডেকে লও দয়াময়ি, তব পদতলে,
ঢেলে দিব মুক্তাপাতি শ্যাম দুর্ব্বাদলে।
শীতশ্রান্ত অবসন্ন তব দেহ' পরে,
ছুটিব মলয়া সাথে ক্লান্তি দূর করে।
ফল ফুলে পর্ণে ভরি তোমার উদ্যান
সাজাব নূতন করি ; কোকিলের গান

জননি, প্রাঙ্গনে তব উঠিবে ভরিয়া'
স্নিগ্ধ পুষ্প গন্ধ লয়ে, স্নিগ্ধরূপ ছুটিয়া।
কত অচেতন বুকে, জাগাব চেতনা,
কত বিরহীরে দিব, ব্যাকুল বেদনা।
তোমার বাসন্তী রাতে হইব জোছনা;
দিগবধূ মিলনের শুভ আলিপনা
আঁকিবে কল্যাণ করে। গতি সোহাগিনী,
হ'ব আমি বসন্তের পূর্ণিমা যামিনী।
আবির কুঙ্কুম খেলা মিলি ভক্তদলে,
লোটাব রক্তিম কান্তি প্রভু পদতলে,
মেঘমুক্ত আকাশের শারদী জোছনা,
হ'তে মোর হৃদে জাগে ব্যাকুল বাসনা।
আপনারে বিছাইয়ে কুমুদের পাশে
দেখিবারে সাধ যায় কেন অলি আশে?
কত ভাষা আছে তার শুধুই ওগুনে!
কি যে এত কথা নিত্য হয় সংগোপনে;
নীরব কুমুদ একি নাহি তার ভাসা,
কহে না একটি কথা মিটাতে পিপাসা!
নির্ভয় সঙ্কোচহীন, তোমার আঁধার,
সেও মোর লাগে ভালো; অসংখ্য তারার
অনিমেষ স্নিগ্ধ-দৃষ্টি, মেঘে ভরা রাতি
চমকি উজলি উঠি বিদ্যুতের ভাতি।
কত লুকোচুরি খেলা খেলি বার বার
সৃষ্টিভেদ্য আঁধারের বাড়াবে আঁধার।
কভু হ্রস্ব কভু দীর্ঘ বৃক্ষ পাদমূলে
ইচ্ছা থাকি ছায়া হয়ে, তটিনীর কূলে;
নিদাঘ মধ্যাহ্নে যবে বটের ছায়ায়,
ক্ষুধাতুর নৌকা-যাত্রী ভোজন আশয়
রন্ধন ব্যাপারে রত, অতিথি সেবায়
লভিব অক্ষয় পুণ্য; বিশ্রাম কারণ
আসিবে যখন পান্থ, মোর বুক পাতি
নিব তারে, স্নেহভরে হ'য়ে তার সাথী।
দয়াময়ি হে জননী বিন্দু বিন্দু দিয়া,
স্নেহরসে পদ্মহস্তে তুলিলে গড়িয়া
অধম সন্তানে তব। তাই তোমা তরে,
যেখানে থাকিনা কেন অশ্রু পড়ে ঝরে।
এ নহে প্রয়াগতীর্থ ত্রিবেণী-সঙ্গম,
নহে পুরী, জগন্নাথ মূর্ত্তি মনোরম,
এ নহে মথুরা পুরী বৃন্দাবন ধাম,
ভক্তের বাঞ্ছিত যথা রাধা ঘনশ্যাম।
বহেনা বরুণা হেথা, কভু নহে অসী,
গড়েনি শিবের পুরী তীর্থ বারাণসী।
এ নহে সে বিষ্ণুপাদপীঠ গয়াধাম।
মুক্তি দিতে পণ্য পিতৃ-পুরুষের নাম,
নহে উচ্চারিত হেথা; তবুও আমার
তুমি প্রিয় হতে প্রিয় সর্ব্বতীর্থ সার।

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র

(শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত)

সাহিত্য-পরিষৎ অনুষ্ঠিত শোক-স্মৃতি-সভায় সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যানুরাগীগণের সম্মুখে আজ আমি সবিনয়ে প্রথমেই নিবেদন করিতেছি, অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সাহিত্য-সেবকের রূপ ছাড়া আর একটা রূপ ছিল, যেরূপ দেখিয়া বাঙ্গালার অমর কবি দীনবন্ধু তাঁহাকে "পুত্র" সম্বোধনে গৌরবান্বিত করেন, যেরূপ দেখিয়া বাঙ্গালার হেম-নবীন-গিরীশ-শিশির তাঁহাকে অতি নিকট আত্মীয় জ্ঞান করিতেন, আর নগণ্য আমি তাঁহার যে স্নেহময় রূপ দেখিয়া তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা

করিতাম—তাঁহার সেই সহৃদয় স্নেহ-ভক্তি-প্রবণ আদর্শ হিন্দু গৃহীর অম্লান রূপ তাঁহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছিল। দেবদ্বিজের প্রতি ভক্তিতে তাহা পূত, শাস্ত্রবিশ্বাসে তাহা মহান্, আত্মীয়বান্ধবঅতিথি-অভ্যাগতের সেবায় তাহা সমুজ্জ্বল, পীড়িত-ব্যথিতের শুশ্রূষায় তাহা মণ্ডিত। সোহাগা-সংস্পর্শে স্বর্ণের যেমন ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়, এই গুণরাজি ও সাহিত্য-সেবার সম্মিলনে তাঁহার আদর্শ চরিত্রের অপরাজেয় মাধুর্য্য তেমনই অপূর্ব্বভাবে বিকশিত হইয়াছিল।

এই বিকাশের মূলে একজনের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন নিহিত ছিল—পিতা গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের আদর্শ সম্মুখে পাইয়া এবং তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া অক্ষয়চন্দ্র এই সমস্ত সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা বলিয়াই না জাহ্নবী পতিতোদ্ধারিণী? গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় একজন আদর্শ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, দেবদ্বিজভক্তিপরায়ণ এবং অকপট সাহিত্য-সেবক ছিলেন। পিতৃগৌরবে অক্ষয়চন্দ্র মহা গৌরবান্বিত এবং তাঁহার গুণরাজির উপযুক্ত অধিকারী ছিলেন। গঙ্গাচরণ বাবু যেবার সাবজজের কার্য্য হইতে পেন্সন্ লইয়া ঢাকা পরিত্যাগ করেন, তখন একটি বিদায়-সভার মুখপাত্ররূপে বান্ধবের কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রশংসাকল্পে বলেন যে, গঙ্গাচরণ বাবু গুরুতর রাজকর্ম্মের ভার লইয়াও বঙ্গসাহিত্য-সেবা হইতে কখনও বিরত থাকেন নাই, প্রত্যুত যত্ন পূর্ব্বক বঙ্গ-সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে গঙ্গাচরণ বাবু যাহা বলেন, তাহা অপূর্ব্ব, পাঠ করিলে হর্ষোৎফুল্ল—মুগ্ধ, হইতে হয়—"বঙ্গ সাহিত্য-সেবার জন্য আমার যে প্রশংসা হইয়াছে, তাহাতে আমি স্মিয়মান। মাতৃসেবা না করিলে অধর্ম্ম আছে; সেবা করিলে যে কিছু বাহাদুরী বা প্রশংসা আছে এ কথা আমি জানি নাও মানি না।" ইহাই যথার্থ ও অকপট মাতৃভক্তি—সঙ্গীত-সাহিত্য-মাতা ভাক্-ভাষা-জননী ভারতীর প্রতি এই যে অহৈতুকী ভক্তি, ইহা গঙ্গাচরণ হইতে অক্ষয়চন্দ্রে বর্ত্তিয়াছিল। তাহারই ফলে আমরা অক্ষয়চন্দ্রকেও বলিতে শুনিয়াছি—"অতি শিশুকাল হইতে জননী বঙ্গভাষা আমার কাছে অতি আদরের সামগ্রী; এখন তু পূজনীয়া দেবতা! মায়ের অঙ্গে আঁচড় দেখিলে আমার চক্ষে জল আসে, বক্ষ বিদীর্ণ হয়। কপালে করাঘাত করিতে প্রবৃত্তি হয়। বঙ্গভাষার সেবা আমার সখের সামগ্রী নহে, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান নহে, আমি প্রাণের টানে, হয়ত রক্তের টানে ভাষার সেবক।" কেমন করিয়া পিতৃ-সাহচর্য্যে তিনি 'ভাষার সেবক' হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার বেশ সংক্ষিপ্ত ও পরিস্ফুট ইতিহাস 'পিতাপুত্রে' পাওয়া যায়—"আমার মনে পড়ে যেদিন তারাশঙ্করের কাদম্বরীর প্রথম পাঠ আরম্ভ হইল। শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় আসিতেছেন, পথিমধ্যে বাল্মীকি সগৌরবে অপেক্ষা করিতেছেন। যৌবনে তাহা পাঠ করিয়াছিলাম, সে গৌরবও বোধ হয় ভুলিতে পারি। প্রৌঢ়ে রসিকদাস কীর্ত্তনিয়া মহা গৌরবে, মহা আড়ম্বরে জয়দেবের 'বদসি' গানের অবতারণা করিয়াছিল, তাহাও হয়ত ভুলিয়া যাইব, কিন্তু বাল্যে সেই যে পিতৃদেব কর্ত্তৃক কাদম্বরী-পাঠ, তাহার গৌরব, তাহার মর্য্যাদা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না। সেই যে শ্রোতৃবর্গ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তামাকু টানিতে ভুলিয়া গিয়া, হুক্কা হস্তে, বিস্ফারিত নয়নে, একমনে, এক ধ্যানে পিতৃদেবের মুখপানে চাহিয়া আছেন, আর যেন সর্ব্বাঙ্গে কাণ পাতিয়া সেই কাদম্বরী সুধা পান করিতেছেন, সাহিত্য-সেবার সেরূপ জাঁকপশার, সেরূপ তন্ময়তা, একাগ্রতা কখনও ভুলিতে পারিব না। * * * বাবার সেই গলাভরা আওয়াজ, প্রাণভরা উৎসাহ, আনন্দপূর্ণ চক্ষু আর শ্রোতাদের সেই ঐকান্তিক আগ্রহ, সকলই মনে পড়িতেছে। তখনকার সাহিত্যসেবা যেন দেবতার পূজা। * *

• • তখনকার সেই কাদম্বরী-পাঠ যেন বিশ্বেশ্বরের আরতি। সাহিত্য তখন উপভোগের সামগ্রী, আরাধনার বস্তু। কত আয়োজনে, কত যত্নে, কত পরিশ্রমে, তখন সাহিত্য-সেবা হইত। সাহিত্য-সেবায় লোক ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হইত, আনন্দে অশ্রু-পরিপ্লাবিত হইত। ভক্তি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস এই সকল লইয়া তখন সাহিত্য-সেবা, সাহিত্যচর্চ্চা, সাহিত্য-পূজা।" গঙ্গাচরণ বাবু অক্ষয়চন্দ্রকে শয়নে-ভোজনে সভায়-আলোচনায় সঙ্গী করিতেন, খেলার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত খেলা করিতেন। পিতার এই রূপ সাহচর্য্য লাভ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিলেন।

"দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা "তত্ত্ববোধিনী", তৎপার্শ্বে উপবীত বক্ষে গণেশমূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূর-চূড়া, টেরি-কাটা কার্ত্তিকস্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহা-দেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরূপী মদনমোহন—সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার উপাসক।" এই ছয় দেবতার আশীর্ব্বাদে অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা সিদ্ধ ও সফলকাম হইয়াছিল।

ইংরাজী ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২০ বৎসর বয়সে তিনি বহরমপুরে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন; তখন গঙ্গাচরণ বাবু বহরমপুরে মুন্সেফ্। বহরমপুরে তখন চাঁদের হাট—ডাক্তার রামদাস সেন, রাম-গতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির একত্র সম্মেলন। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্রও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বহরমপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১২৭৯ সালে, ইং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়চন্দ্র ওকালতী ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। সেই বৎসরের বৈশাখ মাসে কাঁটালপাড়া হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকতায় শুভক্ষণে "বঙ্গদর্শন" বাহির হইল। অক্ষয়চন্দ্র প্রধান সহায়করূপে বঙ্কিম চন্দ্রের পাশে দাঁড়াইলেন—প্রথম বর্ষের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই উভয় সংখ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের "উদ্দীপনা"—এবং আষাঢ় সংখ্যায় "গ্রাম্য" বাহির হইল। প্রথম বর্ষে প্রাপ্ত পুস্তকনিচয়ের সমালোচনাও অক্ষয়চন্দ্র করিলেন। ২য় বর্ষের বঙ্গদর্শনে বাহির হইল—জন ষ্টুয়ার্ট মিল, তুলনায় সমালোচনা এবং দশমহাবিদ্যা।

এই "দশমহাবিদ্যা" প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র লিখিলেন, —"ভারতের দশ দশাই দশমহাবিদ্যা। এক্ষণে ভারতের সপ্তমী দশা চলিতেছে, সেই দশার প্রতিমূর্ত্তি ধূমাবতী মূর্ত্তি।" পূর্ব্ব ছয় মহাবিদ্যার সহিত ভারতের অতীত ছয় দশার সামঞ্জস্য দেখাইয়া, তিনি বর্ত্তমান সপ্তমী দশার বর্ণনা করিতেছেন—

"ভারতমাতা এক্ষণে—
বিমুক্ত কুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরল দ্বিজা।
কাকধ্বজ রথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা॥
সূর্প্প হস্তাতি রুক্ষাক্ষা ধৃত হস্ত বরান্বিতা।
প্রস্বেদ্যোগাতু ভৃশং কুটিলেক্ষণা॥

বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, রুক্ষ কেশা, রুক্ষাক্ষা; দন্ত বিরল হইয়াছে; শোকে তাপে দৃষ্টি কুটিল হইয়াছে, যেন সকল আশ্রয় বিচ্যুতা হইয়া পুরাতন ভগ্নযান রথে আশ্রয় লইয়াছেন, হায়! সেই রথের উপরি কাক আবার বসিতেছে! যত কুলক্ষণ, তাহে ভারত কাঁপিতেছেন, কাঁপিতে কাঁপিতে সেই কম্পিত হস্তে ভঙ্গী করিয়া বলিতেছেন, "আমায় রক্ষা কর, আমি দেবী এক্ষণে অনাথা, রক্ষা কর—তোমার মঙ্গল হইবে।"

কিন্তু ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি-সম্পন্ন মনীষী এইখানেই নিরাশ হইয়া পড়েন নাই; ভবিষ্যতের দূর যবনিকা উত্তোলন করিয়া বলিতেছেন,—"এখনও আমার জাগ্রত স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নাই, আমার এখনও আশা হইতেছে যে, ভারতমাতা আবার বগলা মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন। ইংরাজ অনুকম্পায় ভারতের বৈরিপক্ষ ভারতের করকবলিত হইবে; ভারতমাতা আবার রত্নগৃহে রত্ন সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন, ভারতমাতা আবার সুভূষণে ভূষিতা হইবেন।

ইহার পরেই ভারতের মাতঙ্গী মূর্ত্তি। ভারত-মাতা আপনার চির-পরিচিত দয়ার বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই কর-কবলিত শত্রুকে বিমুক্ত করিয়াছেন; আত্মরক্ষার্থে খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন; শাসনার্থ পাশাঙ্কুশ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন; রত্ন পদ্মাসনে রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ভারতমাতা বহুকাল এভাব ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি ইহার পরেই মহালক্ষ্মীরূপে ভবে দেখা দিবেন;—

"সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরা ভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্ন ঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥

ভারতমাতার যুগ যুগান্তরের মলরাশি শ্বেত হস্তি অমৃতবারি সিঞ্চনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারতমাতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মা-সনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয় দান করিতে-ছেন। আহা কি শুভদিন! শরীর রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার আনন্দ জয়ধ্বনি কর।

ভারতমাতার অভিষেক হইতেছে। মাতা, যোগিনী মূর্ত্তি, রাজ্ঞী মূর্ত্তি এমন যে ভুবনে অতুলা ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি মাতা তাহা গ্রহণ করেন নাই; মা এখন মহালক্ষ্মীভাবে শোভা পাইতেছেন; সকলে জয়ধ্বনি কর।

* * * * * *

তাহাতেই বলিতেছিলাম, আমার বুঝি মতিভ্রম হইয়াছে। ভারতমাতা মহালক্ষ্মীমূর্ত্তি কতশত বৎসর পরে ধারণ করিবেন, আমি এখনই জয়ধ্বনি করিতে বসিলাম।" •

অক্ষয়চন্দ্রের এই দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধে সাহিত্য-সমাজে একটা প্রবল উদ্দীপনা স্রোত বহিয়া গেল।

তাঁহার প্রতিভাকিরণপাতে বঙ্গ-সাহিত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ভারতী-জননী কৃতী ভক্তপুত্রের হস্তে মঙ্গল শঙ্খ তুলিয়া দিলেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের দেড় মাস পরে সাধারণের সেবা ও উপকারার্থে অক্ষয়চন্দ্র "সাধারণী" বাহির করিলেন।

১২৮০ সালের ১৭ই কার্ত্তিক সাপ্তাহিক "সাধারণী" জন্মগ্রহণ করিল।

ভূমিকায় অক্ষয়চন্দ্র লিখিলেন—"সাধারণের হিতসাধনই সাধারণীর ঐকান্তিকী বাসনা।
* * * এই স্থানে ইহা স্পষ্টতই বলিয়া রাখি যে, "সাধারণী" সাধারণের হিতসাধনের চেষ্টা করিবে, কিন্তু সাধারণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিবে না।

সাধারণী হিন্দুজাতির পক্ষপাতিনী। বাঙ্গালীর পক্ষপাতিনী। সাধারণী বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, সাধারণের হিতকামনা করে, প্রজার মঙ্গল হয়—ইহাই ইহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা।"

৫০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি নির্ভীকভাবে স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া এ কথা বলিতে পারিয়াছিলেন দেখিয়া, বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়া যাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বলি দিয়া—বিবেকের বাণীকে পদদলিত করিয়া অশিক্ষিত সাধারণে, আপাত মনোরম যাহা চায় তাহার সমর্থন করিয়া, তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে তিনি চান নাই। সাধারণের হিতসাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। জ্ঞান ও বুদ্ধি বলে ও ভগবৎ প্রেরণায় যাহা তিনি সাধারণের মঙ্গলজনক বলিয়া বুঝিতেন, তাহারই সাধনায় ব্যগ্র ছিলেন। তাঁহার সহিত সর্ব্ব বিষয়েই যে সকলে একমত হইবেন না, ইহাও তিনি বুঝিতেন।

রস রচনায় তিনি একজন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেকালের রুচিবিকারগ্রস্ত লোকেরাও তাঁহার রস-রচনা পড়িয়া আনন্দলাভ করিত। দেশে তখন স্ফূর্ত্তি ছিল—প্রাণের স্পন্দন ছিল, রসসাহিত্যের বিমল ধারা

• বঙ্গদর্শন ২য় বর্ষ ১২৮০ সাল ২৫৭-২৫৮ পৃষ্ঠা

ও তখন সাহিত্যকে সজীব করিত। বাঙ্গালীসমাজের দোষগুলি লক্ষ্য করিয়া তিনি বিদ্রূপ-বাণ ছাড়িতেন—কিন্তু ব্যক্তি বিশেষকে কখনও আক্রমণ করেন নাই।

সদালাপী অক্ষয়চন্দ্র মুখে যেরূপ রহস্য করিতে পারিতেন, কাগজে কলমেও তাহা প্রকাশ করিয়া সকলকে সেইরূপ আনন্দদান করিতেন। এ ক্ষমতা অনেক রস-রসিকের নাই। রসের কথা ছাপার অক্ষরে বাহির হইলে অনেক সময় তরল হইয়া পড়ে; কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের রস-রচনা কখনই এ দোষে দুষ্ট নয়। তাঁহার রহস্যের ভিতর আনন্দ ও শিক্ষা যুগপৎ পাওয়া যায়। তাঁহার 'তুলনায় সমালোচনা', 'ভাই হাততালি' 'চণকচূর্ণ' প্রভৃতি রহস্যাত্মক প্রবন্ধ হইতে আমার যে শিক্ষালাভ করি তাহা অমূল্য। তিনি অযুনয় করিয়া হাততালিকে বলিয়াছেন,—'ভাই হাততালি! তোমার দুটী হাতে ধরি, তুমি ভাই একবার ক্ষান্ত হও,—তোমার চট্ চট্ গর্জ্জনে একবার বিরাম দাও। যে বিধির বিড়ম্বনায় অগাধ জলে পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা দিয়া ডুবাইয়া দিলে আর কি পুরুষার্থ আছে? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই হাততালি। আর আমাদিগকে ডুবাইয়া দিবার জন্য তোমার এত আড়ম্বর কেন?' এরূপ করিয়া বলিবার কারণ, হাততালির কুহকে মজিয়া মানুষ, মানুষকে অতি 'মানুষ বলিয়া পূজা করে।' 'হাততালির চাটুপটু রসনা ধ্বনিতে নরনারায়ণ অর্জ্জুন বিচলিত হইয়াছিলেন, দুর্জ্জন বঙ্গ সন্তান যে, বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?' "নব রঙ্গের রঙ্গী' হাততালি বাঙ্গালীর যে ক্ষতি করিয়াছে—কত শূর বীরকে যে পতনের পথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিয়াছে—কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে?

অক্ষয়চন্দ্রের রহস্যের ভিতর বিদ্রূপের ছায়া পর্য্যন্ত থাকিত না। নির্ম্মল হাস্যরসোদ্ভাসিত রহস্য ও রূপকের ভিতর দিয়া তিনি বাঙ্গালীকে অনেকগুলি সনাতন সত্যের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। স্থানাভাবে আমরা সকলগুলি উদ্ধৃত করিতেপারিলাম না। আমরা ১২৯৪ সালের মাঘ মাসের 'নবজীবনের' প্রকাশিত 'শুধুই রহস্য' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব অক্ষয়চন্দ্রের রহস্য যেমন শ্লীল, তেমনই শিক্ষা-প্রদ।

"পরলোকগত ডাক্তার রামদাস সেন 'ঐতিহাসিক রহস্য' 'রঙ্গ রহস্য' লেখেন, ইহলোকস্থিত শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু 'বিজ্ঞান রহস্য', 'লোক রহস্য' লিখিয়াছেন। ঐহিক পারত্রিক বড় লোকদের দেখাদেখি আমারও কিঞ্চিৎ রহস্য লিখিত সাধ হইয়াছে। কিন্তু গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত। ইতিহাসে আমার হাসি আসে, রঙ্গ আমি চিনিতে পারিব না; বিজ্ঞানে অজ্ঞান; লোক বুঝিবার আলোক আমাতে নাই কাজেই আমাকে শুধুই রহস্য লিখিতে হইল।

সুতরাং আপনাদিগকেও অগত্যা "শুধুই রহস্য পড়িতে হইতেছে।"

শুধুই রহস্য এই যে,—
যে লেখে সে শেখেনা,
যে শেখে সে লেখে না।

সর্ব্ব কালের শুধুই রহস্য এই যে,—
যে জানে, সে বলে না,
যে বলে, সে জানে না,
যারে চাই, তারে পাই না,
যারে পাই, তারে চাই না।

একালের সংবাদপত্র তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—গরীবের তেল নুনের উপর বাট চড়ানই রাজনীতি।

একালের রাজ পুরুষেরা উত্তরছলে বলিলেন, আর শুধুই রহস্য এই যে,—রাজার রাগ বাড়ানই প্রজানীতি।

একালের সাময়িক পত্র সকল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—বস্তুপরে যে মূল্য পাওয়া যায়, বা তাও যায় না, তাহার নাম অগ্রিম মূল্য।

একালের গ্রাহকেরা শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি

রাগ করিয়া বলিলেন, "শুধুই রহস্য এই যে,—সময়ে যাহা কখনও বাহির হয় না, তাহার নাম সাময়িক পত্র।"

অক্ষয়চন্দ্রের উদ্ভাবিত 'পিত্ত নাশক উপমা' প্রভৃতি রসাত্মক বাক্য তখনকার দিনে আবাল বৃদ্ধের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত।

"সাধারণী" প্রায় ১৭।১৮ বৎসর কাল চলিয়াছিল —তৎপরে 'নববিভাকরে'র সহিত মিলিত হইয়া "নববিভাকর ও সাধারণী" নাম ধারণ করিয়া কিছু-কাল চলিয়াছিল।

"সাধারণীতে" অক্ষয়চন্দ্র বিশেষ ও নির্ভীকভাবে রাজনীতির আলোচনা করেন। বার্দ্ধক্যে "পিতা-পুত্র" লিখিবার সময় অক্ষয়চন্দ্র লিখিলেন—"যৌবনে সাধারণীতে যেরূপ তথা কথিত রাজনীতির চর্চ্চা করিয়াছিলাম, সেরূপ ভাবে সেরূপ কথার যদি এখন পুনরাবৃত্তি করি তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে শ্রীঘর বাসের বিবরণ আবার ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে। অক্ষয়চন্দ্র যে কি ভাবে সাধারণীতে রাজনীতির আলোচনা করিতেন, তাঁহার এই উক্তি হইতেই কতকটা আভাস আপনারা পাইলেন।

১২৮১ সালে চুঁচুড়া কদমতলায় "সাধারণী"র নিজ প্রেস সংস্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে উহা কাঁটাল পাড়ায় বঙ্গদর্শন-যন্ত্রে ছাপা হইত।

প্রেস হইবার পরেই অর্থাৎ ১২৮৯ সালের পৌষ-মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গ-দর্শনের প্রথম বর্ষে প্রকাশিত "উদ্দীপনা" ও "আত্ম" নামক প্রবন্ধ দুইটী "সমাজ সমালোচন" নাম দিয়া পুস্তিকাকারে বাহির করেন। শুনিতে পাই—ইহার পূর্ব্বে 'বঙ্গ বিলাস সমজ্‌দার' এই ছদ্মনামে তাঁহার "হাতে হাতে ফল" নামক এক পুস্তক বাহির হইয়া-ছিল।

১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ম্যালেরিয়ার উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি প্রেস ও পত্রিকা লইয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। এইখান হইতে উক্ত ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে তিনি মাসিক "নব-জীবন" বাহির করেন। "নবজীবন" পাঁচ বৎসর কাল চলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের তিরো-ভাবের পর "নবজীবন"ই বাঙ্গলা সাহিত্যে নবজীবন আনয়ন করিয়াছিল।

নবজীবন ও সাধারণী সম্পাদন ব্যতীত তাঁহার জীবদ্দশায়—

(১) সনাতনী (২) কবিকুহেমচন্দ্র (৩) সমাজ সমালোচন (৪) হাতে হাতে ফল (৫) গোচারণের মাঠ (৬) প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ও গোবিন্দ দাসের পদাবলী (৭) সত্যনারায়ণের কথা, (৮) কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, (৯) সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, (১০) শিক্ষানবিশের পন্থ— এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে "মোতিকুমারী" বাহির হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু সারগর্ভ সন্দর্ভ বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

মায়ের ছেলে সকলেই; কিন্তু মাকে ভাল-বাসিতে, ভক্তি করিতে, প্রাণভরা ডাকে—মাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে কয়জনে পারে? কয়জনই বা মায়ের প্রকৃত রূপ দেখিতে পায়?

বহু ভাগ্যে, বহু সাধনার ফলে মাতৃনিষ্ঠ সন্তান অক্ষয়চন্দ্র ভারতী মাতার প্রকৃতরূপ দেখিয়া প্রাণভরা ডাকে তাঁহাকে চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনের বোধন-বাসরে সম্বোধিত করিয়াছিলেন,—

"এস মা সঙ্গীত-সাহিত্য-মাতা, ভাব-ভাষা-জননী ভারতী"—মা সেদিন কমলাসন ছাড়িয়া—চুঁচুড়ার সাহিত্য-মণ্ডপে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার স্নেহের দুলালের কণ্ঠে বসিয়াছিলে। তাই তাঁহার সেদিন-কার মূর্ত্তি দেখিয়া সম্মিলন-প্রত্যাগত সাহিত্য-সেবকেরা লিখিয়াছিলেন,—"চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মেলন যজ্ঞে ধৌম্য তপোধনের আবির্ভাব দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়া আসিয়াছি।"

সাহিত্য পরিষদ্‌কে তিনি ভালবাসিতেন। তাঁহার এ ভালবাসা মৌখিক বা লোক দেখান ছিল না; ইহার গৌরবে যেমন তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইতেন, তেমনই ইহার সাহিত্য-সেবার উপাদান সংগ্রহে অবহেলার অভিযোগ, শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতেন। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলন-মণ্ডপে বাঙ্গলার সাহিত্য-সেবকবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া যখন তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন—তখন সেই বিদ্বৎসঙ্ঘের কাছে জানাইলেন—"সাহিত্য-পরিষৎ সৎসাহিত্যের প্রচারে ব্রতী হইয়াও ব্রত পালনে শিথিলযত্ন হওয়াতে, আমি ম্রিয়মাণ। আজি দশ বৎসর (১৩১৮ সালে) হইল, যখন সাহিত্য-পরিষৎ সৎসাহিত্য প্রচারের ঘোষণা দিলেন, তখন আমি রোগে-শোকে মুহ্যমান; তবু আমি যখনই মোহ কাটাইয়া চারিদিকে কর্ণপাত করিতাম তখনই পরিষদের ঘোষণায় মহা আনন্দিত হইতাম। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের আঠার বৎসর বয়সেও যখন আমরা কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস প্রভৃতি কোন শিক্ষাদাতার কাব্য পাইলাম না, তখন সেই হর্ষে এখন আমার নিয়ত্তই বিষাদ আসিতেছে।" কিন্তু তিনি বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া ভগ্নোৎসাহ হন নাই, ভবিষ্যৎ আশায় মন বাঁধিয়া তিনি সকলের কাছে বিনীত আবেদন করিলেন,—"এই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী ও ইহার জননী চিরস্থায়িনী সাহিত্য-পরিষৎকে অপেক্ষাকৃত সংযত এবং অধিকতর কার্য্যকরী করিতে হইবে।" আপনারা "এই দুই দিনের মধ্যে একটি সময় স্থির করুন, সেই সময়ে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করুন—কিসে আমরা সাহিত্য পরিষদকে অধিকতর কার্য্যকরী করিতে পারি। উহা আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রস্তাব।"

"মনে মনে স্থির করুন যে, যিনি যখন কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন, কোন, কার্য্য থাকুক, বা না থাকুক, তিনি একবার সাহিত্য-পরিষদে প্রবেশ করিবেনই করিবেন। সাহিত্য-পরিষৎ প্রভাত হইতে খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হউক। *

* * সাহিত্য পরিষৎ এখন কলিকাতার চাকুরীজীবী লইয়া চলিতেছে। তাহাতে যাহা কার্য্য হইয়াছে, তাহা বিপুল। কিন্তু আরও অধিকতর কার্য্য না হইলে মান থাকিবে না, মুখ থাকিবে না। থাকুক মান, থাকুক মুখ—প্রকৃত কার্য্য করিতে হইবে। পল্লীবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইবে; সাহিত্য-পরিষদকে সত্বরে জিনিষ করিয়া রাখিলে চলিবে না।" বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য—বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য—পরিষদ-হিতকামী বাঙ্গালার প্রবীন সাহিত্যাচার্য্যের এই আবেদন ব্যর্থ ও বিফল হইল।

আজ তাঁহারই স্মৃতি-সভায় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে তাঁহারই বন্ধুবান্ধব ও সাহিত্য-সেবকবৃন্দের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার বহুদিনকার বিনীত আবেদনের পুনরাবৃত্তি করিলাম। যদি কেহ অক্ষয়-চন্দ্রের প্রকৃত ভক্ত—প্রকৃত অনুরাগী থাকেন, যদি কেহ তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রকৃত সম্বর্দ্ধনা-প্রয়াসী হন, তবে আসুন, এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া—ব্রতধারী হইয়া—বাঙ্গালীর বড় সাধের সারস্বত-নিকেতন—এই সাহিত্য-পরিষদের সেবায়-ইহার মঙ্গল সাধনে আপনারা যত্নবান হউন। সমগ্র দেশ আপনার যশোগানে মুখরিত হইবে, জাতি আপনার অস্তিত্বে গৌরবান্বিত ভব করিবে, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আপনার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া দেশের সাহিত্য-সেবায় নিজজীবন উৎসর্গ করিবে—আর লোকোত্তরে বসিয়া আপনাদেরই বড় শ্রদ্ধার, বড় আদরের সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র আনন্দাশ্রুর সহিত আপনার অক্ষয় মঙ্গলকামনা করিবেন। *

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

অমরী

(শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি, এ)

হয়ত আমার নাম হারাবে, আমার গীতি যত
তোমার মহিমাতেই হ'বে নিখিলে সন্তত।
খালি করে' আমার এ বুক,
তোমায় দিয়ে অমৃতটুক,
নরদেহের মরণ মোর হুগু হবে স্বতঃ।

তোমায় অমর করবে আমার গোত্রহারা গীতি,
সেই গরবেই তোমার কথা শুনছি আমি নিতি।
কবি বধূর নাম না রবে,
গীতিময়ি, অমর হবে
কথকহারা উপকথার রাজকন্যের মত।

পাহাড়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদার]

বঙ্কিম বাবু তাঁহার দেবী চৌধুরাণীতে যে ত্রিস্রোতার উল্লেখ করিয়াছেন সে এই নদী। একদিন এই নদী নেপাল এবং ভুটানের মধ্যবর্ত্তী সীমান্ত রেখা ছিল। ত্রিস্রোতা নদীর উপরেও একটী দোদুল্যমান সেতু আছে; উহা পার হইয়া কালিম্পং যাইতে হয় এবং এই পথ দিয়া সিকিমেও যাওয়া যায়।

রাম নবমীর দিন পাহাড়ীরা কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখে। কারসিয়াংএর নিকট একটী রাম সীতার মন্দির আছে; দলে দলে সেইদিন সেই মন্দিরে পূজা দিতে যায়। বলা বাহুল্য সে মন্দিরের সেবাইত এবং পুরোহিত সকলেই নেপালী ব্রাহ্মণ; পাহাড়ী নয়। সত্যনারায়ণের পূজা পাহাড়ীদের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে।

পাহাড়ীদের মধ্যে কুসংস্কার ও যথেষ্ট আছে। পাহাড়ীরা পাহাড়ে পাথরের উপর বাস করে, পাথর আলিয়া, পাথর কাটিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে, পাথরের উপর মলমূত্র ত্যাগ করে, পাথর ও পাহাড় দিয়া রাত্রি পদদলিত করে অথচ বড় পাথর মাত্রেই তাহাদের দেবতা।

পাহাড়ীরা যেরূপ মদ্য এবং মাংস প্রিয় তাহাতে তাহাদিগকে তান্ত্রিক শাক্ত বলিতে হয়। আবার যেখানে দেবতার মন্দির আছে সেইখানেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। সে হিসাবে তাহারা শৈব। আজকাল কিন্তু পাহাড়ীদের মধ্যে একদল কবীর পন্থী বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ী বলিয়া যে জাতির উল্লেখ করা গেল, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট উপাসনা প্রণালী কিছু নাই। তবে তিব্বতী এবং ভুটিয়া লামারা এক প্রকার চক্র ব্যবহার করে সেই চক্র তাহাদের উপাসনা যন্ত্র। সাহেবরা উহাকে (Prayer wheel) 'প্রেয়ার হুইল' বলে। পূজার পদ্ম পাত্রের আকারের একটী ধাতুময় শূন্যগর্ভ সূক্ষ্মাগ্র দীর্ঘক কোটা একটী

ধাতু নির্ম্মিত ডাঁটির উপর এমন ভাবে বসান থাকে যে, ঘোরান হাত পাখার মত সেই ডাঁটিট মুঠার মধ্যে ধরিয়া সঞ্চালন করিলেই চক্রটী ঘুরিতে থাকে। চক্রের গায়ে চারি পাশে চারি গাছি সরু সরু পিত্তলের শিকল ঝোলান থাকে। চক্রের শূন্য গর্ত্তে উপসনার বীজ মন্ত্র লেখা থাকে। উপাসক বা উপাসিকাকে মুখে কিছু উচ্চারণ করিতে হয় না, মনে মনে ও কিছু স্মরণ করিতে হয় না। তাহাদের বিশ্বাস চক্র যতবার ঘুরিবে, ততবার মন্ত্র জপ করা হইবে।

মৃতদেহের সৎকার—পাহাড়ীরা মৃতদেহের অগ্নি সৎকার ও করে কবর ও দেয়। তাহাদের বিশ্বাস সৎকারের পর মৃতদেহ ভূত হয় এবং সেই ভূত ইচ্ছা করিলে তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপদ্রব করিতেও পারে। সেই জন্য সৎকার করিয়া ফিরিবার সময় শ্মশানক্ষেত্র হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত যে পথ, সেই পথের মাঝে মাঝে কাঁটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া এড়োএড়ি ভাবে একখানি পাথর চাপা দিয়া রাখিয়া আসে। ডাল রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, পায়ে কাঁটা ফুটিবার ভয়ে ভূত সে পথ দিয়া আসিবে না। পাথর চাপা দিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাতাসে ডালটী উড়িয়া যাইবে না।

কবর বা স্মৃতিস্তম্ভের নিকট পাহাড়ীরা একটা লম্বা কাঠের রলা প্রোথিত করে। সেই কাঠের গায়ে আট দশ হাত লম্বা এবং প্রায় এক হাত চওড়া একখানি সাদা রংএর কাপড় ধ্বজার মত করিয়া উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দেয়। নামাবলির মত সেই কাপড়ে নানারূপ স্তোত্র, মন্ত্র ছাপান থাকে। তাহাদের বিশ্বাস সেই পতাকা বাতাসে যেমন বেগে উড়িবে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-গণের পারলৌকিক মঙ্গল-প্রার্থনা ভগবানের কর্ণে তেমনই বেগে প্রবেশ করিবে।

রোগ চিকিৎসা—রোগ হইলে পাহাড়ীর ডাক্তার বৈদ্যের আশ্রয় প্রায়ই লয় না, ওঝা ডাকে। তাহারা কিরূপ শাস্তি পায় তাহা জানি না; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, রোগ অপেক্ষা রোগীর চিকিৎসা অধিকতর ক্লেশদায়ক। বৃহদাকারের খঞ্জনীর মত একটী বাজনা লইয়া ওঝা রোগীর নিকট বসিয়া একটী বক্সাকার কাটি লইয়া খুব জোরে বাজাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে নানারূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে। মাথার কাছে সমস্ত রাত্রি এই বীভৎস চিকিৎসাভিনয় কেমন আরামপ্রদ তাহা ভুক্তভোগী না হইলে উপলব্ধি করা কঠিন; কিন্তু অনুমান করা তত শক্ত নয়। এই চিকিৎসার নাম "ঝাঁকড়ি"; বাজনার নাম "ডেংড়ো" চিকিৎসা কার্য্য রাত্রে হয়, দিবাভাগে হয় না। তাহা-দের বিশ্বাস রোগ মাত্রেই ভৌতিক উপসর্গ, সুতরাং রোগের চিকিৎসাও ভূতের ওঝার দ্বারা করাইতে হয়। অবশ্য আজকাল পাহাড়ীদের মধ্যে কিছু শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে এবং যাহারা শিক্ষিত তাহারা রোগ হইলে ডাক্তার কবিরাজের দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাও করাইতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু সাধারণের পক্ষে ঝাঁকড়িই সম্বল—ঝাঁকড়িই ভরসা।

পাহাড়ীদের অর্থোপার্জ্জন—অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের ও পাহাড়ীদের ধারণার পার্থক্য যথেষ্ট। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা ধনীর সন্তান, অথবা আভিজাত্যাভিমানী জমিদারের বংশধর তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে বড় একটা চান না। শ্রমলব্ধ অর্থের ভোগজনিত আনন্দ ও তৃপ্তির আস্বাদন বিষয়ে তাঁহারা এতই উদাসীন যে, দেশ শুদ্ধ লোক পরিহাস ছলে তাঁহা-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকেন, "বাবা কি কলই বানিয়ে গেছেন, সই ক'রলেই টাকা।" সেই ঔদাসীন্যের পরিণাম এই যে, পিতামহ বা পিতার আমলে যিনি লক্ষ টাকার মালিক বলিয়া গর্ব্ব করি-তেন, বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চটক মাংস শতভাগে

বিভক্ত হওয়ার কল্যাণে, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ মাত্র হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিকানি স্বত্বের দাবি করিতে পারেন কি না তাহাও সন্দেহ। পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের মূল সম্পত্তির হ্রাস বৈ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না। অথচ লক্ষ টাকার মালিক রূপে যে চালে চলিয়াছেন, সে চালের এত টুকু এদিক ওদিক হইবার যো নাই। এই চাল রাখিতে গিয়া রক্ষণশীল অনেক বনিয়াদি বাঙ্গালী গৃহস্থ উৎসন্ন গিয়াছেন এবং যাইতেছেন। এ সম্বন্ধে পাহাড়ীদের মতি ও প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পাহাড়ীরা বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই শ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে। এ বিষয়ে তাহাদের কোনরূপ অভিমান নাই। তাহাদের বিশ্বাস এই যে যে, অন্নের সংস্থানকল্পে তাহারা নিজে সংযতা করে না, তাহা ভোজন করা লজ্জার কথা। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা মনে করে দেহের অবস্থা সকল সময় একরূপ থাকে না, দেহী মাত্রেরই রোগ আছে। রোগের সময় উপার্জ্জন করা চলে না; সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ উপার্জ্জন করিলে সেই আপদকালে একের উপার্জ্জনে কোনরূপে, কায়ক্লেশেও উভয়ের দিনপাত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, সকলেরই ত আর স্ত্রী-পুরুষ দুইটী মাত্র লইয়া ক্ষুদ্র সংসার নয়। বৃহৎ সংসারে যদি একটী মাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ থাকে, সেই পুরুষের উপার্জ্জনের উপরেই যদি সমগ্র পরি-বারকে নির্ভর করিতে হয় এবং দৈবক্রমে সেই উপার্জ্জী পুরুষের উপার্জ্জন বন্ধ অথবা অন্য প্রকারে তাহার অর্থ প্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা হইলে পরিবারস্থ সকলকেই একেবারে অসহায়ভাবে দুঃখাগ্রস্ত হইতে হয় না। চতুর্থতঃ ভাগ্যক্রমে গৃহে পূর্ব্বসঞ্চিত বা পিতৃদত্ত অর্থের সংস্থান থাকিলেও সেই সঞ্চিত অর্থের বৃদ্ধি সাধন না করিয়া নিশ্চেষ্ট ও অলসভাবে সেই অর্থে উদর পূর্ত্তি করা তাহাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস মতে পাপান্ন ভোজনের তুল্য। এ কারণে তাহাদের মধ্যে যাহার যত টুকু সাধ্য সেই অনুসারে সকলেই শ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে। তাহাদের মধ্যে আজ হয় ত একজন চাকুরী করিয়া অথবা ঠিকাদারি আদি কর্ম্ম করিয়া বেশ মোটা পয়সা রোজগার করিয়া স্বজাতি-সমাজে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি, মান সম্ভ্রম যথেষ্ট পাইল, হঠাৎ তাহার চাকুরি গেল অথবা ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় কারবার উঠাইয়া দিতে হইল, তখন তাহার পক্ষে আবার একটা চাকুরী জুটাইয়া লওয়া বা অন্য কোন কারবার খোলা অসম্ভব; তখন তাহারা বাঙ্গালীদের মত ছোট কাজ করিব না বলিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থ কে না, "যখন যেমন তখন তেমন" নীতি অনুসারে ছেনি এবং মার্ত্তুল (হাতুড়ি) বগলে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়ে—পাথর ভাঙ্গা, পাথর কাটা কাজ ত ছুটিবেই ছুটিবে। মিথ্যা মান সম্ভ্রমের আশায় বুক বাঁধিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত প্রতিষ্ঠা ও পদ-গৌর-বকে ক্ষুণ্ণ করিতে তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। স্বামী যেখানে একজন উচ্চদরের মিস্ত্রি বা ফিটার, স্ত্রী পুত্র ও কন্যা হয় ত সেই কারখানাতে তাঁহারই সঙ্গে সাধারণ মাটী কাটা বা মাটী বহা কুলির কাজ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের কাহারও অমর্য্যাদা বোধ বা অভিমান নাই। ইঞ্জিনিয়ার, এষ্টিমেটর হইতে মাটি কাটা পর্য্যন্ত সকল কাজেই তাহারা দক্ষ; কেবল তিনটী কাজ তাহারা করে না। তাহারা ধোবা, নাপিত এবং মেথরের কাজের জন্য পশ্চিম দেশীয় লোকের আমদানি করিয়া থাকে; এই তিনটী কাজ তাহারা কখনও করে না। অন্যান্য স্থানে সাহেবদের যে কাজ মান্দ্রাজী আয়ারা করে, পাহাড় অঞ্চলে সেই কাজ পাহাড়ী রমণীদের এক চেটিয়া, তবে তাহারা মান্দ্রাজিদের মত ইংরাজী ভাষা বলিতে বা বুঝিতে পারে না,—হিন্দীতে কাজ সারিয়া লয়।

পাহাড়ী মজুরও মিস্ত্রিরা রবিবারে কাজ করে না। প্রতি রবিবার তাহাদের হাট বসে। শনিবার পর্য্যন্ত

যে কাজ করে, রবিবার তাহার বেতন লইয়া সেই পরদিন সপ্তাহের মত প্রয়োজনীয় সওদা করিয়া আবার সোমবার হইতে কাজে লাগে। নিয়োগ-কর্ত্তার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে হয় ত দুই একজন রবিবারে কাজে লাগিতেও পারে। সে জন্য তাহারা অতিরিক্ত বেতন লয় না, কিন্তু কাজে লাগা বা না লাগা তাহাদের ইচ্ছাধীন।

পাহাড়ীদের ভার-বহন ক্ষমতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদের একজন স্ত্রীলোক যে বোঝা বহিতে পারে, অন্য কোন দেশে বলিষ্ঠ পুরুষ তাহা বহিতে পারে কি না সন্দেহ। তবে তাহারা মাথায় বা কাঁধে করিয়া মোট বহিতে পারে না, পিঠে করিয়া বয়। যত বড় ভারি বোঝা হউক না, দুই চারিজনে টানিয়া একবার তাহাদের পিঠে তুলিয়া দিতে পারিলেই হইল। সেখকের নিজের একটী আড়াই মণ বোঝা একজন স্ত্রীলোক প্রায় দেড় মাইল পথ চড়াই রাস্তায় লইয়া গিয়াছিল; এটা প্রত্যক্ষ দেখা সত্য এবং শোনা যায় যে কিছুদিন পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি জনৈক সম্ভ্রান্ত ঠিকাদারের একটা সাড়ে তিন মণ বোঝা বহিয়া তাহার চুক্তি করা নির্দ্দিষ্ট মজুরির অতিরিক্ত এক টাকা বখ্‌সিস্ পাইয়াছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে বলিয়া অত বড় ভারি ভারি বোঝা পিঠে বসাইয়াও অপেক্ষাকৃত অল্প চড়াই সুগম বাঁধা রাস্তায় তাহারা চলে না,প্রায় লম্ব রেখার মত খাড়া উচ্চ দুর্গম পাকদণ্ডি (short cut) দিয়া যাতায়াত করে। যে সকল পথ দিয়া তাহারা যাতায়াত করে, পাহাড়ী ব্যতীত অন্যের পক্ষে সে পথ দিয়া খালি হাতে যাওয়াও দুরূহ ব্যাপার; সুতরাং বোঝার যিনি মালিক তিনি কুলির সঙ্গে যান না, যাইতে পারেন না, যাইবার প্রয়োজন ও হয় না। পাহাড়ী কুলিরা খুব বিশ্বাসী লোক। কলিকাতার কুলিদের মত চক্ষের আড়াল হইলেই চক্ষুদান দেওয়ার অভ্যাস তাহাদের নাই। যেরূপে হউক যথা সময়ে তাহারা মালিকের বাড়ীতে মাল পৌঁছাইয়া দিবে। যদি বাড়ী ঠিক করিতে না পারে, তাহা হইলে ফিরিয়া গিয়া সেইখানে অপেক্ষা করিবে, অথবা কোন বিশ্বস্ত লোকের হাতে সমর্পণ করিয়া দিবে; কোন ক্রমে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না।

নিম্ন বাঙলার কুলিরা যে ঝাঁকা বা ঝুড়ি মোট বহিবার জন্য ব্যবহার করে পাহাড়ীরা সেরূপ ঝাঁকা বা ঝুড়ি ব্যবহার করে না। তাহাদের ঝাঁকার আকার অনেকটা ফুল গাছের টবের মত, মাথার দিক চওড়া নীচের দিকটা অপেক্ষাকৃত সরু। তবে প্রভেদ এই যে, ইহাদের টুকরি উপর নীচে দুই দিকেই চতুষ্কোণ। পাহাড়ী ভাষায় সে টুকরির নাম "ডোকো।" পাহাড়ীরা দৃঢ় আঁসযুক্ত এক প্রকার গাছের ছাল দিয়া মেয়েদের চুলের বেণীর মত বিনাইয়া এক প্রকার খুব মজবুত রজ্জু তৈয়ার করে, তাহার মধ্যস্থল চওড়া, দুই প্রান্ত বেণীর অগ্রভাগের মত সরু। সেই সূক্ষ্ম দুই প্রান্তে দুই গাছি শক্ত রজ্জু বাঁধিয়া সেই দুই রজ্জুর অপর দুই প্রান্ত একটী গাইট বাঁধিয়া একত্র জুড়িয়া দেয়। সেই গাইট বাঁধা অংশ ডোকোর পৃষ্ঠদেশে এমন ভাবে আটকাইয়া দেয় যে ডোকো পিঠ হইতে উল্টাইয়া বা খসিয়া পড়িতে পারে না। তাহার পর বেণীর মত বিনান রজ্জুর চওড়া ভাগটা ললাটের ঠিক উপরে আটকাইয়া দেয়। ফলে ডোকোবাহী কুলিরা ঠিক সোজা হইয়া চলিতে পারে না, তাহাদের দৃষ্টিটা পায়ের দিকে থাকে, মাথা একটু হেঁট করিয়া এবং সাম্‌নের দিকে একটু ঝুঁকিয়া চলে। ডোকো বহিবার জন্য যে রজ্জু গাছটী ব্যবহার করে তাহার নাম "নাম্‌লো।"

মাথায় বা কাঁধে যেমন পাহাড়ীরা মোট বহিতে পারে না, বাঙ্গালীর মেয়েদের মত কাঁখে করিয়া জলের কলসী ও তাহারা তেমনই বহিতে পারে না। তাহারা জলের কলসী ডোকের মধ্যে বসাইয়া লইয়া যায়। যে ছেলে হাঁটিতে বা হামা দিতে শেখে নাই, এমন ছেলে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ী রমণীরা

কাজ করিতে যায়। তাহারা ছেলেকেও সামলায় আবার কাজেও কামাই দেয় না। সাহেবরা তাহাদের খুচরা কাগজ পত্র রাখিবার জন্য কর্ম্মস্থানে টেবিলের উপর একটী বেতের টুকরি রাখেন, (যাহাকে লেটার বাস্‌কেট্ বলে) সেই টুকরির আকারের একটী টুকরির উপর ছেলেকে বসাইয়া বা শোয়াইয়া ডোকোর মত পিঠে করিয়া লইয়া যায়। কর্ম্ম স্থানে গিয়া তাহাদের এক স্থানে বসিয়া কাজ করাও চলে, আবার টুকরি সহ পিঠের উপর ঝুলাইয়া ঘোরা ফেরার কাজ করাও চলে। ছেলে কাঁদিলে কাজ করিতে করিতেই কনুইয়ের গুঁতা দিয়া টুকরি নাড়াইতে থাকে। সেই গুঁতা পিঠ চাপড়ানর কাজ করে। তাহাতেই ছেলে শান্ত হয়। যদি ডোকো বহিবার বা পাথর বহিবার কাজ করিতে হয়,তাহা হইলে টুকরির উপর শায়িত ছেলেকে এক স্থানে নামাইয়া রাখে এবং প্রয়োজন ও অবকাশ মত তাহাকে স্তন্য পান করায়। সেই টুকরির নাম "কোরোঙা।" বিছানার বাণ্ডিল, বাক্স, তোরঙ্গ ইত্যাদির মোট বহিবার সময় ছেলেকে টুকরি সহ সেই মোটের উপর বসাইয়া লইয়া যায়। সে দৃশ্য দেখিতে বড় সুন্দর।

পাহাড়ী মজুরদের কাজের নির্দ্দিষ্ট সময় সকল বস্তুতেই প্রাতে ৮টা হইতে বৈকালে ৫টা পর্য্যন্ত। মধ্যে বেলা ১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত জল খাবারের ছুটী। পাহাড়ী ভাষায় জল খাবারের নাম "খাজা।" যাহা কিছু খাওয়া যায় তাহারই নাম খাজা। কর্ম্মস্থান যদি বড় হয়, এবং সেখানে যদি অনেক মজুরের সমাগম হয়, তাহা হইলে দোকানীরা সেইখানে খাবারের দোকান বসায়। তাহাদের প্রধান খাবার চিঁড়ে এবং ভুট্টা ভাজা ও ছাতু। আনুসঙ্গিক পান এবং সিগারেট জলের পরিবর্ত্তে তাহারা চা খায়। চা এবং সিগারেট এই দুইটী জিনিষ তাহাদের বড়ই প্রিয়। কাজে বাহির হইবার সময় পাঁচ বছরের ছেলে মেয়েটী পর্য্যন্ত এক প্যাকেট সিগারেট এবং এক বাক্স দিয়াশলাই পকেটে লইয়া বাহির হয়। কেহ কেহ বাড়ী হইতেই চিঁড়া, ভুট্টা বা কিঞ্চিৎ ভাত (যাহার যেমন সুবিধা) ও বোতলে পুরিয়া এক বোতল তৈয়ারি চা লইয়া আসে। চা ঠাণ্ডা হউক, তাহাতে দুধ মিশান না থাকুক কিছু আপত্তি নাই; চা সিদ্ধ করা জল হইলেই হইল। সেই চা তাহাদের পানীয় জলের কাজ করে। কর্ম্ম স্থানের অনতিদূরে যাহাদের বাড়ী তাহারা অবকাশ কালের মধ্যে বাড়ী হইতেই "খাজা" খাইয়া আসে।

যে কুলি মাটি বহিবে সে তাহার ডোকো পিঠে বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, পিছন দিক হইতে অপর একজন কুলি বেলচার (shovel) সাহায্যে মাটী বোঝাই করিয়া দেয়। ডোকের নীচে একগাছি দড়ি বাঁধা থাকে। যেখানে মাটি ফেলিতে হইবে সেইখানে দড়ি গাছটি এক হাতে ধরে এবং প্রয়োজন অনুসারে বামে বা দক্ষিণে কিঞ্চিৎ হেলিয়া মাটি ঢালিয়া দেয়। মৌরসী বন্দোবস্তের মত ডোকো তাহার পিঠেই থাকিয়া যায়; বোঝাই বা খালাসের জন্য পিঠ হইতে একবারও নামাইতে হয় না।

পাহাড়ীদের ঋণ— সাধারণতঃ পাহাড়ীরা মাথায় বা কাঁধে ভার বহিতে পারে না; কিন্তু একটী ভার কাঁধে বহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সে ভারটীর নাম ডাণ্ডি। পাহাড়ের সহর অঞ্চলে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য প্রধানতঃ দুইটী যান প্রচলিত আছে—ঘোড়া এবং রিক্‌স্। যাঁহাদের পায়ে হাঁটিবার ক্ষমতা নাই, ঘোড়ায় চড়িতেও পারেন না এবং গন্তব্য স্থানের পথ যদি রিক্‌স চালাইবার উপযোগী না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ডাণ্ডির সাহায্য লইতে হয়। রিক্‌স গাড়ীর চাকা দুইটী খুলিয়া তাহাকে কাঁধে বহিবার উপযোগী করিবার জন্য পাল্কীর বাঁটের মত অগ্র পশ্চাতে দুইখানি লম্বা কাঠ যুড়িয়া ডাণ্ডি প্রস্তুত হয়। সেই লম্বা বাঁটের অগ্রভাগে আড়াআড়ি ভাবে দুই খানি কাঠ যোড়া থাকে। সেই কাঠে কাঁধ দিয়া

চারিজন বেহারা উহা বহিয়া লইয়া যায়। পথের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ কোন স্থানে পাশাপাশি দুইজন বেহারা যাহাতে প্রয়োজন মত কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ বহিতে পারে সে জন্য এড়ো কাঠ দুইখানিতে একটা করিয়া লোহার খিল দিয়া আঁটা থাকে। পাহাড়ীরা কাঁধে বহিতে পারে না—অথচ ডাণ্ডি কাঁধে বহিবার যান; সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে ডাণ্ডির বেহারারা সর্ব্বত্রই ভুটিয়া। ভুটিয়ারা কাঁধে বহিতে পারে।

আর একটি জিনিষ পাহাড়ীরা কাঁধে ও মাথায় বহিয়া থাকে। ভুটিয়া লামাদিগের ধর্ম্ম মন্দিরের নাম "গুম্বা" (Cemetery)। ভুটিয়াদের ধর্ম্ম পুস্তকগুলি গুম্বায় রক্ষিত হয়। সময় সময় তাহারা ধ্বজপতাকা ও বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া বহু সংখ্যক মোটা মোটা ভারি ভারি ধর্ম্মপুস্তক এক গুম্বা হইতে অন্য গুম্বায় লইয়া যায়। সেই সময়ে সে গুলিকে পাহাড়ীরা কাঁধে বা মাথায় করিয়া বহিয়া লইয়া যায়। এক গুম্বা হইতে অপর গুম্বা, হয়ত একদিন বা দুই দিনের পথ দূরে। বাহক বাহিকারা যতই শ্রান্ত ক্লান্ত হউক না, পথের মাঝে কোথাও ধর্ম্মপুস্তকের ভার নামাইতে পারে না। তবে পরলোকগত স্মরণীয় ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভ যেখানে আছে, সেখানে তাহারা পবিত্র স্থান বলিয়া এই গুলিকে নামাইতে পারে। পাহাড়ী ভাষায় স্মৃতি স্তম্ভের নাম "মানে"। মানের আকার ঠিক স্তম্ভের মত নয়; কতকটা বাঙ্গালা বা অন্যান্য প্রদেশের দেব মন্দির সদৃশ মন্দির চূড়ার মত, তাহার মাথায় কলস শূলাদি বসান থাকে। গুম্বা যাইবার পথের ধারে কোথাও মানে দেখিতে পাইলে, সেই মানের নিকট গ্রন্থ নামাইয়া তাহাদের প্রক্রিয়া অনুসারে মানে এবং গ্রন্থ উভয়কেই পূজা করে এবং পূজার প্রসাদ নিজেরা গ্রহণ করিয়া এবং সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে বিতরণ করিয়া পুনরায় গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পূজার উপচার ঘোলের মত দেখিতে এক প্রকার মদ্য বিশেষ। মদ্য উচ্চারণ করিয়া সেই উপচার বৃক্ষপল্লব দ্বারা মন্দির গাত্রে এবং গ্রন্থের গাত্রে ছিটাইয়া দেওয়াই পূজার প্রক্রিয়া। চর্ম্ম পাদুকা পরিহিত হইয়া পূজারী পূজা করিয়া থাকে; তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি হয় নাই।

কৃষি—কৃষিজাত সামাগ্রী পাহাড়ীদের স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের প্রধান পণ্য। কৃষিকার্য্য তাহাদের অনেকেই করিয়া থাকে। অনেকেরই বড় বড় জমার জোৎ আছে; তাহাতে আলু, কপি, মটর শুটি, শালগাম, গাজোর, শশা, বিলাতী কুমড়া, কোয়াস, ভুট্টা প্রভৃতি নানা জাতীয় সব্জি উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন প্রায় অধিকাংশ গৃহস্থেরই বসতবাটীর সংলগ্ন অল্প বিস্তর খালি জমী আছে। সাধ্য পক্ষে তাহারা সেই সকল খালি জমীর সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টার ত্রুটী করে না। অসমতল প্রস্তরময় ভূমিতে লাঙ্গল চালান সুবিধা জনক নয় বলিয়া একমাত্র কোদালই তাহরা কৃষি যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে—কোদালই তাহাদের সহায় সম্পত্তি। কালিম্পং যাইবার পথে দুই এক স্থানে অল্প বিস্তর মৃত্তিকা বহুল সমতল ভূমি আছে সেখানে একদিন একখানি লাঙ্গল চলিতে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু দার্জ্জিলিং ও কারসিয়ংএর নিকটবর্ত্তী স্থানে কোথাও কোন দিন লাঙ্গল চলিতে দেখি নাই। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়া পাহাড়ীরা কৃষি কার্য্য করে এবং কোদাল চালাইতে উভয়েই বেশ দক্ষ।

পাহাড়ীদের চাষের জমী দূর হইতে দেখিতে বড় সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে জমী; সুতরাং বরাবর ঢালু। ঢালু জমীতে জল দাঁড়ায় না, আবার জল না জমিলে ফসল ভাল হয় না। অগত্যা যাহাতে জল জমে এরূপ সমতল ভাবে কাটিয়া আইল দিয়া বাঁধ বাঁধিতে হয়। উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত এইরূপ এক বিঘা জমী যদি সমতল করিতে হয়, তাহা হইলে বোধ হয় গড় পড়তা অন্ততঃ বার ফুট গভীর মাটী না কাটিলে চলে না। এক মাত্র কোদাল সম্বল করিয়া পাহাড়ের উপর বার ফুট গভীর মাটী কাটা দরিদ্র কৃষকের পক্ষে অসাধ্য সাধন বলিলেও বলা যায়। নীচে কত ক্ষুদ্র পাহাড় বিশেষ বিরাট্-কায় দৈত্য দানবের মত পাথর বাহির হইয়া কার্য্যে বাধা দিবে তাহার স্থিরতা নাই। সেই পাথর তাড়িতে হইবে; তাহাতে ও নিস্তার নাই! পাহাড়ে দেশের আইন অনুসারে মাপ করিয়া সেই পাথরের মূল্য পাহাড়ের মালিককে দিতে হইবে। তাহার উপর আর এক বিপদ আছে। মাথার দিকে থাকে প্রায় ১২ ফুট গভীর করিতে হয়। সেই দিকে পাথরের দেওয়াল গাঁথিয়া বাঁধাইয়া না দিলে বর্ষার জলের ঢল নামিয়া উপরের পাহাড় ধসিয়া পড়িতে পারে। কাজে কাজেই চাষীরা সমগ্র জমী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ও ধাপে ধাপে কাটিয়া প্রত্যেক খণ্ডে বা ধাপে একটী করিয়া আইল দেয়। দূর হইতে সেই জমী দেখিতে ঠিক যেন কলিকাতার লাট সাহেবের বাড়ীর সোপানাবলীর মত (Grand Stair Case)

দার্জ্জিলিং জেলার মটর শুটি আজকাল কলিকাতার বাজারে প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মটর অপেক্ষা সে মটরের শুটি এবং দানা দুইই বড়। এক একটা শুটি যেন সিমের মত মোটা ও লম্বা। আমাদের দেশের চাষীরা যে মটর বোনে, সে মটরের গাছ জমীতেই পড়িয়া থাকে। পাহাড়ীরা সেরূপ মাটীতে পড়িয়া থাকিতে দেয় না। তাহারা প্রত্যেক গাছের গোড়ার একটী করিয়া লম্বা কাঠি পুতিয়া দেয়, সেই কাঠির গা জড়াইয়া গাছ ঊর্দ্ধমুখে উঠে। গাছ যত লম্বা হয় শুটির সংখ্যাও তত অধিক হয়। এই কারণে বোধ হয়, তাহাদের দেশে এক কাঠা জমীতে যে পরিমাণ মটর হয়, আমাদের দেশে পাঁচ কাঠা জমীতেও সে পরিমাণ হয় কি না সন্দেহ।

শিল্প—মেষ-লোম-জাত তন্তু শিল্প পাহাড়ীদের আর একটী উপজীবিকা। মেষ লোমের কম্বল, সোয়েটার গেঞ্জি, মোজা, গলাবন্ধ, টুপি সে দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। লোমের তন্তু তাহারা টেকোর সাহায্যে প্রস্তুত করে;—তাঁতের চরকা ব্যবহার করে না। কখন হাতে বোনে, সূক্ষ্ম শিল্পের জন্য সূচ এবং লোহার কাঠি ব্যবহার করে। স্থূল সূক্ষ্ম উভয় বিধ শিল্প কার্য্যই মেয়েরা করে। পথে ঘাটে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় পাহাড়ী রমণীরা দল বাঁধিয়া বিচরণ করিতেছে, তাহাদের গল্প গুজব চলিতেছে; গান গাহিয়া তাহারা স্ফূর্ত্তি করিতেছে, এদিকে হাতেরও কামাই নাই। বুনাবুনির কাজ অবিরাম গতিতে চলিয়াছে।

কার্পাস শিল্পেও পাহাড়ীদের বিলক্ষণ নিপুণতা দেখিতে পাওয়া যায়। লেপ্ তাহারা বেশ ভাল রকমই বুনিতে পারে। কালিম্পংএ একটী অনাথাশ্রম আছে, গ্রেহাম সাহেবের "হোম" বলিয়া তাহা সাধারণের নিকট পরিচিত। সাহেবদের অনাথ বালকবালিকাদিগকে সেই "হোম"এ রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐ হোমের সংশ্লিষ্ট আর একটী বিদ্যালয় আছে, সেখানে পাহাড়ী ছেলে মেয়েরা দিবাভাগে বাড়ী হইতে আসিয়া লেখাপড়া শিখিয়া যায় এবং একটী কারখানা আছে সেখানে খুব ভাল ভাল লেপ্ এবং কার্পেট প্রস্তুত হয়। সে সকল কাজ পাহাড়ীরাই করে, সেজন্য তাহাদিগকে মাসিক হিসাবে কিছু বেতন দেওয়া হয় না। সপ্তাহের মধ্যে যে যত খানি কাজ করে সেই কাজের পরিমাণ ও গুণ বিচার করিয়া তদনুসারে তাহাকে সেই কাজের পরিমিত বাজার চলন হারে মূল্য দিয়া তাহাদের নিকট হইতে তাহা কিনিয়া লওয়া হয়। কাজের মূল্য তাহাদিগকে প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হয় এবং তাহাদের হাতের প্রস্তুত মাল বাহিরে চালান দিয়া বিক্রয় লব্ধ টাকা "হোমের" অর্থ-ভাণ্ডারে যায়। ইহা দ্বারা পাহাড়ীদেরও জীবিকার্জ্জন হয় এবং এই ব্যবসায় চালাইয়া "হোম" এরও বিলক্ষণ অর্থাগম হয়। দার্জ্জিলিংএর বাজারে যে সকল কার্পেট ও

লেস্ বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই কালিম্পং এ পাহাড়ীদের হাতে প্রস্তুত। সে সকল মাল কলিকাতাতেও চালান আসে। কালিম্পংএ পাহাড়ীদের হাতে প্রস্তুত জিনিষ এত সুন্দর যে, প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া প্রদর্শক পারিতোষিক লাভ করিয়া থাকে।

পাহাড়ীদের আরও কয়েকটি পণ্য-দ্রব্য আছে। বড় এলাইচ, রিটা ফল এবং কমলা লেবু। নিজেরা বিদেশে চালান দিয়া ব্যবসা করিতে পারিলে এই কয়েকটী জিনিষের বড় বড় ব্যবসায়ী তাহারা হইতে পারিত; কিন্তু তাহা না করিয়া স্থানীয় হাটে তাহারা পণ্যদ্রব্যগুলি বিক্রয় করে এবং মাড়োয়ারীরা তাহা খরিদ করিয়া দেশ বিদেশে চালান দেয়।

দার্জ্জিলিং জেলায় বিস্তর চা বাগান আছে। সেই সকল বাগানে কুলির কাজ করিয়া অনেক পাহাড়ী জীবিকার্জ্জন করে। আজকাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়া কেহ কেহ কেরাণী গিরি এবং ডাক্তারিও করিতেছে।

ধান বা গম পাহাড়ীদের দেশে জন্মায় না, সুতরাং ভুট্টাই তাহাদের প্রধান খাদ্য। তবে আজ কাল মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের কল্যাণে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে চাউল এবং মদ্দা আমদানি হওয়াতে ভাত এবং রুটি খাওয়ার প্রচলন তাহাদের মধ্যে হইয়াছে।

অন্যান্য দেশের রমণীরা কেহ কেহ পেটের জ্বালায় দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। পাহাড়ীদের মধ্যে তাহা নাই বলিলেও চলে। পাহাড়ী রমণীরা স্বলবি-শয়ে পুরুষকে দেহ ভোগ করিতে দেয় বটে; কিন্তু মূল্য লইয়া দেহ বিক্রয় করে না। এই ব্যাপার অবশ্য কন্যার কুমারী অবস্থায় সঙ্গোপনে হইয়া থাকে; কিন্তু জানাজানি হইয়া গেলে, জাতীয় পঞ্চায়েৎ, পুরুষকে ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করে। অনুরোধ রক্ষিত হইলে, কোন কথাই নাই; অন্যথা তাহার প্রতি অর্থদণ্ড বিহিত হয়। অর্থদণ্ড দিলেই পুরুষ নিষ্কৃতি পায় এবং কন্যার পিতা মাতাও অভিভাবকেরা তাহাদের কন্যাকে যথাপূর্ব্ব গৃহে রাখিবার অনুমতি লাভ করিয়া থাকে। এই রূপ করিতে গিয়া সেই অনেক প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখ পুড়িয়াছে। অয়ি সাক্ষী করিয়া, দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া বিধি-বিহিত আচারানুযায়ী যাহাকে ধর্ম্মপত্নী রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মপত্নীর সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া অসহধর্ম্মিণী তথাকথিত পত্নী পাহাড়িনী লইয়া সংসার পাতাইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে পুরুষের সঙ্গে ভ্রষ্টাচার করিবে সেই পুরুষকে বিবাহ করিয়া পতি পত্নীর মত থাকিয়া সংসার করিতে হইবে ইহাই পাহাড়ীদের সামাজিক নিয়ম। এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে সমাজের নিকট দণ্ডনীয় হইতে হইবে; এই কারণে পাহাড়ীদের মধ্যে দেহ-বিক্রয়ের ব্যবসায় নাই এবং বারাঙ্গনা নামে অভিহিত যে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর রমণী অন্যান্য দেশে আছে পাহাড়ীদের মধ্যে তাহাও নাই।

জ্বালানি কাঠ এবং কাঠ কয়লা বিক্রয় করিয়াও পাহাড়ীদের জীবিকার্জ্জন হয়। প্রকৃত পক্ষে পাহাড়ীদের বাস অসীম অনন্ত জঙ্গলের মধ্যে। কিন্তু সে সকল জঙ্গল সরকারি বন্ বিভাগের খাস মহল। বিনা পয়সায় একটী গাছের পাতা, একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত ছিঁড়িবার সাধ্য কাহারও নাই—এমন কি বনে গরু চরাইবার অধিকার পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। সরকারি আপীসে অগ্রিম মূল্য জমা দিয়া ঘাস কিনিয়া গরু বাছুরকে খাড়ীতে বসাইয়া খাওয়াইতে হয়। নিত্য এক টুকরি ঘাসের মূল্য মাসিক চারি আনা। নিত্য এক বোঝা বাঁশ পাতার মূল্য মাসিক আট আনা। গাছের গায়ে অস্ত্রাঘাত না করিয়া এক জন ব্যক্তি পিঠে বহিয়া আনিতে পারে এই পরিমাণ কাঠের মূল্য মাসিক এক টাকা। এক আটি বাঁশ পাতার মূল্য এক পয়সা। অন্ততঃ সেরূপ চারি আটি না হইলে একটা ঘোড়ার খোরাক হয় না; সে হিসাবে যাহারা বাঁশ পাতা আনে তাহারা যেমন বোঝা

বহিতে পারে, তাহার অনুপাতে প্রত্যহ আট আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে। প্রায় সাত আট মাইল দূর হইতে সেই পাতা ভাঙ্গিয়া আনিতে হয়। তাহারা প্রাতে পাতা ভাঙ্গিতে বাহির হয়, সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিয়া আসে। কাঠ ঘরের জ্বালানিতেও ব্যবহৃত হয়, আবার বিক্রয় করিয়া কিছু উপার্জ্জনও হয়। ইহা ভিন্ন সরকার বাহাদুর প্রতি বৎসর সেই বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট জঙ্গলের একাংশে কতকগুলি গাছ সময় থাকিতে ইস্তাহার দিয়া নিলামে বিক্রয় করেন। খরিদদারেরা সেই গাছ কাটিয়া কতক জ্বালানি কাঠ করিয়া ও কতক পোড়াইয়া কয়লা করিয়া বিক্রয় করে।

দুধ এবং মাখন বিক্রয় করিয়াও তাহাদের অনেকের জীবিকা চলে। দুধের দর টাকায় পাঁচ সের হইতে সাত সের পর্য্যন্ত। এই দরের পার্থক্য দুধের গুণ বিচার অনুসারে হয় না, সহর এবং সহর হইতে বস্তির দূরত্ব অনুসারে হয়। পাহাড়ীরা দুধে জল মিশ্রিত করে না বটে, কিন্তু তাহারা এখন দুধের মাঠা তুলিয়া লইয়া দুধ বিক্রয় করিতে শিখিয়াছে। মাখনের দর সের প্রতি আঠার আনা হইতে সাত সিকা, দুই টাকা পর্য্যন্ত। পাহাড়ীদের মাখন আমাদের দেশের মাখনের ন্যায় পাকের মত ঘন গুণে নয়, এটের মাটির মত কোমলও বটে কঠিনও বটে। টিপিলে আঙ্গুল বসিয়া যায়, আবার ভাঙ্গিলে খোয়া ক্ষীরের ডেলার মত মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। আধ সের ওজনের এক একটী ডেলা খোয়া ক্ষীরের মত চেপ্টা আকারের করিয়া তাহারা হাটের দিন হাটে বিক্রয় করিতে আসে। বোধ হয় এ মাখন প্রস্তুত করিবার প্রণালী স্বতন্ত্র। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া যে ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইয়া যায় এমন কথা বলা যায় না, কারণ পাঁকের মত ঘন গুণে মাখনও সেখানে পাওয়া যায়।

এক প্রকার জমান ঘৃত পাহাড়ীদের বাজারে বিক্রয় হয়, পাহাড়ীদের ছেলেমেয়েরা খুব আদর করিয়া ঘী ক্রয় করে। ঐরূপ ভাবে জমানর প্রক্রিয়া পাহাড়ীদের জানা নাই। জানা থাকিলে বোধ হয় তাহার এত আদর হইত না। পাহাড়ীরা বলে যে, তিব্বতে দেশীয় চমরী গাভীর ঘৃত জমাইয়া ছোট ছোট বরফির আকারে কাটিয়া উহা তৈয়ারী হয়; উহা তিব্বতের আমদানি। পাথরের মত কঠিন, যতদিন ইচ্ছা ঘরে রাখিলেও তাহা কোনরূপে বিকৃত হয় না। ল্যাবেঞ্চুষের মত মুখে দিয়া চুষিলে লালার সংযোগে তাহার রস নিঃসৃত হয়, সেইজন্য ল্যাবেঞ্চুষ-প্রিয় বালক বালিকাদের বড় আদরের জিনিষ।

(ক্রমশঃ)

রাতের ছেলে

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

দিনের বেলায় লোকের ভিড়ে, মনের কুঁড়ি যায় গো ছিঁড়ে,
দারুণ রবির আগুণ-বাণে ঝুরে কাঁদে বুকের তলা,
হাজার চোখের চাউনি দেখে প্রাণের কথা হয় না বলা।

উঠ্‌চে টাকার ঝন্‌ঝনানি, হিসেবীদের ভন্‌ভনানি,
কাজের ঘানি মর্‌চে টেনে দল বেঁধে সব মূর্খ গরু,
ওরা জানে সংসারেতে টাকাই কেবল কল্পতরু।

উড়্‌চে ধূলো বাজ্‌ছে গাড়ী, জ্ঞান-বুড়োরা নাড়্‌চে দাড়ী,
কেউ বা উকিল, কেউ কেরাণী, কেউ ধনী আর কেউ বা মুটে,—
যে যার নিজের স্বার্থ নিয়ে হাঁস্‌ফাসিয়ে চল্‌চে ছুটে!

শান্তি কোথায়, শান্তি কোথায়, শান্তি কোথাও পাইনে গো হায়,
এত আলো, এত মানুষ, এত রকম কথার ধারায়—
আমার আশা, আমার ভাষা তার ভেতরে তলিয়ে হারায়

* * * *

কোথায় ওগো নিশীথ রাতি, হব আমি তোমার সাথী,
পালিয়ে যাব—পালিয়ে যাব গভীর তোমার বুকের মাঝে—
ঐ যেখানে তারার তানে স্বপন-বীণা মধুর বাজে।

ঐ যেখানে গিরির তলে, মিলিয়ে-যাওয়া ঝর্ণা জলে,
আঁধার কহে আধার সনে অতীত-কালের মনের কথা,
বিজনতার প্রাণের তারে উপ্‌চে পড়ে বুকের ব্যথা।

ঐ যেখানে পথের শেষে, গহন-বনের মর্ম্ম-দেশে,
বাতাস বলে কোন্ বারতা হঠাৎ-যেন-মনে-পড়া,
শ্যামাট্ ছায়া চুপ্‌টি ক'রে—নেইকো তাহার নড়া-চড়া।

ঐ যেখানে গগন-কোলে, রহস্যেরি পর্দ্দা দোলে,
অদেখা কোন্ মৌন যোগীর অতল ধ্যানের গোপন পুরে,
ধরার দরদ উঠ্‌চে জেগে চাতক-পাখীর উতল সুরে।

* * * *

আমার পূজা লও রজনী, তুমি আমার হও স্বজনী,
নাও গো টেনে, নাও গো টেনে ক্লান্ত তোমার শান্ত বুকে,
দাও গো তোমার স্নেহের চুমো শ্রান্ত আমার ক্লান্ত বুকে!

এস দিনের আলো নেশে' ভাগ্যহীনে ভালোবেসে,
বিছিয়ে ছায়া মলিনতার সকল জারিজুরি ঢেকে,
এস তুমি কোন্ স্বরূপের অচিন্ মায়াপুরী থেকে।

শিউরে ওঠে গায়ের রোঁয়া, পেয়ে তোমার গায়ের ছোঁয়া,
অন্ধকারের সল্‌তে জেলে দেখাও তোমার তিমির-বাতি।
দিনের তৃষা হরণ ক'রে এস আমার নিবিড় রাতি!

ঝুমুর ঝুমুর-ঝুমুর-ঝুমুর! বাজিয়ে এস ঝিঁঝির ঘুঙুর,
ঝিমিয়ে-পড়া প্রাণকে আবার চান্‌কে তোলো—চান্‌কে তোলো—
তোমার যত গোপন কথা আমার দুটি কাণকে বোলো!

* * * *

আবার যখন আসো ধরায়, খুলে দিয়ে জ্যোছ্‌না-ঝরায়'
শ্যাম-ধরণীর সব সরণীর হয় গো পথিক অফুট আলো,
তখন সে রূপ যায় লুকিয়ে, যে রূপ তোমার অটুট কালো!

তোমার কথা গায় পাপিয়া, ফুল-সুরভি যায় মাতিয়া,
দূর-কাননে, উধাও মাঠে আঁকো তুমি রূপের ছবি,
ছন্দ-তালে কাব্য পড়ে নদীর তীরে জলের কবি।

মুখ্‌টি রেখে সখীর বুকে, আমি তখন অধীর সুখে—
তাহার হৃদয়-তালে শুনি তোমার মৃদু চরণ-ধ্বনি,
দিনের ব্যথা ভুলে ভাবি—রাত্রি, তুমি চিরন্তনী!

তখন তোমার চন্দ্রালোকে, ঘনিয়ে আসে তন্দ্রা চোকে,
তোমার পানে চেয়ে চেয়ে এলিয়ে পড়ে আঁখির পাতা,—
রাত্রি, তুমি আমার দেবী,—রাত্রি, তুমি আমার মাতা!

প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্ত বি, এল]

আমাদের দেশের প্রধান প্রধান কবিদিগের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার সহিত, রবীন্দ্রনাথের ঐ বিষয়ের কবিতাগুলির প্রকৃত বিশেষত্বের কোনও মিল না দেখিয়া, অনেকে মনে করেন যে পাশ্চাত্য কবিদিগের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই বোধ হয় তিনি এরূপ প্রকৃতি-প্রেমিক হইয়াছেন; কিন্তু সেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীটস্, বায়রণ, টেনিসন প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবিদিগের সহিত যথেষ্ট পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, এমন কি স্থানে স্থানে তাঁহাদের সহিত একটা ভাব-সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহার প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা যে অনুকরণ-জাত নয়—ইহা যে তাহার অন্তরের নিজস্ব জিনিস,—একটা মূল সূত্রের ন্যায় ইহা যে তাঁহার সমস্ত কাব্যের মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে এবং তাঁহার কবিত্ব শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে ইহাও ধীরে ধীরে বিকশিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—এ কথা প্রমাণ করিবার বোধ হয় আবশ্যকতা নাই। তাঁহার এই প্রকৃতি-প্রেম তাঁহার ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিশিষ্টতাকে আশ্রয় করিয়াই বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং এই জন্য প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ইংরাজ

কবিদিগের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ বায়রণের Child Harold's Pilgrimage এ সমুদ্রের প্রতি যে উক্তি আছে তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের "সমুদ্রের প্রতি" কবিতাটির তুলনা করা যাইতে পারে। সমুদ্র দেখিয়া বায়রণের মনে হইল মানুষের ক্ষমতার তুচ্ছতার কথা—কত রাজ্য উঠিয়াছে, গড়িয়াছে, একেবারে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু সমুদ্র, সৃষ্টির সেই আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত অটুট অপরিবর্ত্তনীয়,—একই ভাবে বিরাজ করিতেছে। সমুদ্র দেখিয়া এই সত্যই (moral) তাঁহার মনে পড়িল তাই তিনি বজ্র নির্ঘোষে বলিলেন—

Roll on, thou deep and dark blue
Ocean,—roll!
Ten thousand fleets sweep over
thee in vain;
Man marks the earth with ruin—
his control
Stops with the shore,—ইত্যাদি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রকে দেখিয়া তাহার ধ্বংসকারী সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসী মূর্ত্তিটিকে মনে পড়িল না, তিনি সমুদ্রের মধ্যে স্নেহময়ী জননী মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন—

"হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা সদা আশা,
সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদনম্ন সম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অন্তরে মহেন্দ্র মন্দির পানে
অন্তরে অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গান
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরি'
তরঙ্গ বন্ধনে বাঁধ, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেড়িয়া ধরি সন্তর্পনে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এত্রি সুগম্ভীর স্নেহ খেলা
অধুনিধি, ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরে ধীরে পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে,
ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি ফিরিয়া আসি' কল্লোল ঝাঁপায়ে পড় বুকে
রাশি রাশি শুভ্র হাস্য, অশ্রুজলে, স্নেহ গর্ব্ব সুখে
আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে।"——

এ কবিতার তুলনা আমাদের সাহিত্যেও আর নাই—পাশ্চত্য সাহিত্যেও নাই। জড়ের মধ্যে কবি মাতৃ-হৃদয়ের যে স্নেহ, মায়া, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ—তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে আর কোনও কবি এরূপ পারিয়াছেন কি না জানি না। ইহার প্রতি শব্দে বাঙ্গালীর হিন্দুর জন্ম-জন্মান্তর-গত সংস্কার জড়িত রহিয়াছে। একমাত্র কন্যার জন্য মাতার চক্ষে আর তন্দ্রা নাই, সর্ব্বদাই বক্ষ জুড়িয়া আশা ও আশঙ্কার আন্দোলন চলিতেছে—"মহেন্দ্র মন্দির মানে অনন্ত প্রার্থনা" "ঘুমন্ত পৃথ্বীরে অসংখ্য চুম্বন" এ সব কথা শুধু রায়রণ কেন কোন পাশ্চাত্য কবিরই মনে জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এমন সুন্দর পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতাও রায়রণের নাই, প্রকৃতির অন্তরে তিনি শুধু ভাসা ভাসা ভাবে উপরি উপরি প্রকৃতির রূপই দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, —তাঁহার মর্ম্মস্থল বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই। "ছল করি' দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে"—এমন সুন্দর ভাব-ব্যঞ্জক শব্দচিত্রও আমরা তাঁহার কাব্যে দেখিতে পাই না।

কীটসের সহিতও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলির কতকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, প্রকৃতিকে মূর্ত্তরূপে প্রকাশ করিবার উভয়েরই একটা আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা আছে। তাঁহারা উভয়েই শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেন না, তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যেন প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য সজাগ ও উন্মুখ থাকিত। কীটস্ কিন্তু

শুধু প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য্যেই বিভোর ছিলেন—সেই সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে যে আর একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। "পৃথিবীর পাখীর গানে গানের অতীত আর একটি গান শুনা যায়; প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আর একটি আলোক" যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার খোঁজ তিনি রাখিতেন না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় রূপের মধ্যে অরূপের লীলা-চাঞ্চল্য অনুভব করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার Ode to Autumn নামক কবিতায় তিনি প্রকৃতিকে যে মূর্ত্তরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' বর্ণনার অনেকটা মিল আছে বটে, কিন্তু পার্থক্য ও যথেষ্ট আছে। কীটস্ এই personify করিবার রীতি—বাক্তিত্বের আরোপ Greek দিগের নিকট হইতে পাইয়াছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ'মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে, অন্য কোনও দেশে কোনও কবির বর্ণনার ছায়া মাত্রও ইহাতে নাই। ইহা একেবারে বাঙ্গলার দেশ-মাতৃকার পেলব মোহিনী মূর্ত্তি। কীটস্ এর,—

"—Setting careless on a granary
floor,
Thy hair soft-lifted by the winnowing wind
Or on a half-reaped furrow sound
asleep
Drowsed with fame of poppies,
while they loop
Spares the next swath and its twired
flowers,
And sometimes like a gleamer thou
dost keep
Steady thy laden head across a brook
Or by a Cider-press, with a patient
look,
Then watchest the last oozing
hours by hours."

অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের,

"মাতার কণ্ঠে শেফালী মাল্য
গন্ধে ভরিছে অঙ্গনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক কিরণে
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে
কুসুম ভূষণ জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।"

এ চিত্র কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেই, বরং ইহার মধ্যে প্রকৃতির যে একটা মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তির পরিকল্পনা আছে তাহা, এ চিত্রকে বিশেষ করিয়া একটা সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে, যাহা কবি কীটস্ এর কবিতায় নাই। কীটস্ এর ন্যায় টেনিসন ও শুধু প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ন্যায় তিনি জড় প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে সজীবতা—যে প্রাণ—আছে তাহা অনুভব করেন নাই; সুতরাং তাঁহার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য খুব বেশী। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব তীক্ষ্ণ ও নিখুঁত হইলেও টেনিসনের কাব্যে যেমন প্রকৃতির খুঁটিনাটি চিত্রের বিশদ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা দেখা যায় না। যেমন টেনিসনের—

"Her hair,
In glass hue the chestnut,
when the shell
Divides three-fold to show the fruit
within."

"In spring a fuller crimson
comes upon the robins breast
In the spring the wanton lapwing
gets himself another crest,"

প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, মনোরমভাবে বর্ণনা করার হিসাবে এই চিত্রগুলি অতুলনীয়। দু একটি শব্দের দ্বারা প্রকৃতির একখানি মনোরম চিত্র আঁকিবার ক্ষমতাও রবীন্দ্র নাথের অসীম, যেমন "জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র যেন সে নবনী" এরূপ শিল্প কৌশল তিনি কীটস্ কিংবা টেনিসনের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন কি না তাহা বলা যায় না; তবে এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রণালীর সহিত যে রবীন্দ্রনাথের প্রণালীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের সহিত ঠিক রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে না, যদিও দুজনেরই প্রকৃতির মধ্যে একটা আত্মহারা ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থে

Lines Written above Tinten Abbeyto

কবি বলিতেছেন "The sounding cataract
Haunted me like a passion;
the tall rock,
The mountain and the deep and gloomy wood
Their colours and their forms were then to me
An appetite—a feeling and a love
That had no need of a remoter charm
By thought supplied, not any interest
Unborrowed from the eye."

এই কয়েকটী ছত্রে কবির প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যে একটি মুগ্ধ বিভোর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক স্থানেই তাহা দেখা যায়, যেমন—

"শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে আছি আমি মুগ্ধ নয়ানে
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখি জল;
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহুদিবসের সুখে দুঃখে আঁকা
লক্ষ যুগের সঙ্গীত মাখা
সুন্দর ধরাতল।"

এই যে "বহু মানবের ঢাকা" "বহুদিবসের সুখে আঁকা" "লক্ষ যুগের সঙ্গীত মাখা" "সুন্দর ধরাতলকে" অকারণে ভালবাসা, এই শ্যামলা বিপুলা ধরার পানে চেয়ে থাকতে থাকতে যে সমস্ত প্রাণ আঁখি জলে ভরে আসা ইহার কাছে "haunted me like a passion" "an appetite—a feeling and a love," যে অনেক নিম্নস্তরের ভাবের ছোতক তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী হৃদয়ের যে টুকু বিশেষত্ব, যাহার জন্য বৈষ্ণব কবিরা আজ বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে অমর, সে ভাবপ্রবণতার চিত্র অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

আর এক বিষয়েও ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের সহিত রবীন্দ্র নাথের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ প্রকৃতিকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির মধ্য হইতে নীতি সংগ্রহ করিবার জন্য প্রকৃতির নশ্বরতা দেখিয়া মনুষ্য জীবনের নশ্বরতা অনুভব করিয়াছেন—

There is not a rock within this solemn Pass
But were an apt confessional for one
Taught by his summer spant, his autumn gone
That life is but of morning grass
Withered at eve, From scenes of art which chase
That thought away, turn and with watchful eyes
Feed it'mid Natures old felicities
Rocks rivers, and smooth lakes more dear than glass."

কবি ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের নিকট "life is but a late of morning grass."

জীবন সকাল বেলার ঘাসের মত। নিশীথের শিশির-সম্পাতে সকাল বেলার তৃণগুলি যেমন সবুজও সতেজ দেখায়, আর সেই শিশির কণাগুলির উপর প্রভাতের বালার্করশ্মি প্রতিফলিত হইয়া সেগুলি বিচিত্রোজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিয়া উঠে; অথচ স্থায়ী শিশির বিন্দুগুলিকে সুনির্ম্মল মুক্তা পংক্তি বসিয়া ভ্রম হয়, আমাদের জীবনের প্রাহ্ন ভাগটাও ঠিক সেই রকম দেখায়। আবার সায়ংকালে ঐগুলি যেমন সৌন্দর্য্য হারাইয়া বিগত-শ্রী হইয়া পড়ে, মানব জীবনের অপরাহ্ন ভাগটাও ঠিক সেই রকম। এই কথাটা মানুষ যাহাতে ভুলিয়া না যায়, তাই কবি মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম শিল্প ও সৌন্দর্য্য হইতে নয়ন ফিরাইয়া লইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মধ্যে সর্ব্বদাই আপনাকে নিমগ্ন রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন; কারণ তাঁহার মতে কৃত্রিম শিল্প চিরস্থায়ী; আর প্রকৃতি আমাদেরই জীবনের মত নিত্য পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর। আবার আর্নল্ডের মতে প্রকৃতি অবিনশ্বর অপরিবর্ত্তনশীল;—মনুষ্য জীবনই পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর। তাঁহার মতে—

"Race after race, man after man
Have thought that my secret was theirs
Have dreamt that I lived for them
That they were my glory and joy
They are dust they are changed, they are gone
I remain."

কিন্তু এরূপ কোনও চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে কোন দিন জাগে নাই, বরঞ্চ এই অনাদি প্রকৃতির সঙ্গে যে আমাদের একটা যুগ যুগান্তরের নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে,—যাহা আমাদের এই জন্ম মৃত্যুতে কিছু মাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার কথাই মনে করিয়া তিনি আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন।

একস্থলে কিন্তু প্রকৃতির এই দুইটী প্রিয় সন্তানের বেশ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা উভয়েই প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের-আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ সমস্ত প্রকৃতিকে অখণ্ড বস্তুরূপে দেখিয়াছেন, আর এই অখণ্ড অনন্ত প্রকৃতির আত্মার সত্তা অনুভব করিয়াছেন।

"A motion and a sprit that impels
All thinking things all object of all thought
And rolls through all things—"

প্রকৃতিকে এইরূপ অখণ্ড রূপে পরিকল্পনা করিয়া তাহার আত্মার সত্তা রবীন্দ্রনাথও অনুভব করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি প্রকৃতির এই আত্মাকে বিরাট্ পরমাত্মার ছায়া রূপে দেখিয়াছেন। যেমন—

"কি ডাক্ ডাকে বনের পাতাগুলি
কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি
প্রাণেশ আমার লীলা ভরে
মেলেন প্রাণের খেলা ঘরে
পাখীর মুখে এই যে খবর পেনু।"

ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের কাব্যে যাহা নাই, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রকৃতিকে অখণ্ড অনন্ত রূপে দেখিয়াছেন, আবার তেমনই তাহাকে খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তিতেও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং সেই সকল মূর্ত্তির মধ্যে পৃথক পৃথক প্রাণের সত্তাও অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার "বর্ষা" "নব-যৌবনা" "শ্যামগম্ভীরা", তাঁহার "শরৎ" "পরেছে কিরীট কনক কিরণে", তাঁহার "সন্ধ্যা" "নির্ব্বাক নীরব" "অনন্ত আকাশপূর্ণ অঙ্গ ছল ছল করিয়া গোপন", তাঁহার বৈশাখ "দীপ্ত চক্ষু" "শীর্ণ সন্ন্যাসী" বসি "পদ্মাসনে" "রক্ত নেত্র তুলে", তাঁহার "পূর্ণিমা" "সুন্দরী" "প্রেয়সী" "অনন্তের অনন্তর শায়িনী।" এ বিষয় বোধ হয় ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ অপেক্ষা শেলীর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের মিল বেশী। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শেলীও প্রকৃতিকে দুইটী দিক্ হইতেই দেখিয়াছেন। তিনি অনেক স্থলে এই জাঁক জমকপূর্ণ বিচিত্র দৃশ্যমান জগতের অন্তরে

যে এক অখণ্ড শক্তিমান আত্মা আছেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—তাঁহাকেই পরমাত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট ঈশ্বর বলিয়া আর কেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রকৃতির আত্মাকে পরমাত্মার আভাস মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শেলীর এই তত্ত্বকে ইংরাজীতে Pantheisim বলা হয়। তাহার Promethens Unbound এ Hymn to Asia, এবং "Life of life thy lips enkindle" প্রভৃতি কবিতা গুলিতে প্রকৃতির এই ভাবটাই প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু তাঁহার অনেক কাব্যে আবার প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তিতে খণ্ড খণ্ড আত্মার অনুভব করার যে ক্ষমতা সেটাও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেমন বর্ষা শরৎ, বৈশাখ, পূর্ণিমা প্রভৃতি প্রকৃতির বৈচিত্র গুলি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ও প্রাণবন্ত বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে, শেলীও তেমনই প্রকৃতির এই সমস্ত বিভিন্ন শক্তিগুলিকে বিভিন্ন প্রাণময় পদার্থরূপে কল্পনা করিবার প্রয়াসে একটা কল্প লোকের (mythএর) সৃষ্টি করিয়াছেন। আধুনিক কবিদিগের কাব্যে এরূপ myth সৃষ্টি করিবার চেষ্টা খুব কমই দেখা যায়; যেখানে বা চেষ্টার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস দেখা যায়, সেখানেও কবিকে সাফল্য লাভ করিতে প্রায়ই দেখা যায় না, তাহার কারণ বোধহয় বর্ত্তমান কাল এরূপ ভাব বিকাশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। প্রাচীনকালে যে সকল দেশে ও যে সকল জাতির মধ্যে অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তির পরিকল্পনা দেখা যায়, তাহার মূলে প্রকৃতির বিচিত্রশক্তি গুলার একটা প্রাণময় মূর্ত্ত শক্তির বিকাশই দেখিতে পাওয়া যায়। মেঘের মধ্যে, বজ্রের মধ্যে যে একটা শক্তি আছে, তাহার মধ্যে যে একটা বিরাট্ মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যের আভাস আছে সেটাকে আমরা কেবল রাজার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। সেই জিনিষটাকে প্রাণময় করিয়া দেখিতে দেখিতেই দেবরাজ ইন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। নিখিল জলরাশির মধ্যে যে একটা অসীম শক্তি বর্ত্তমান আছে তিনি হচ্ছেন জল দেবতা Neptune বা বরুণ, দিবাকরের প্রচণ্ড তেজরাশির মধ্যে যে শক্তি আছে, তিনি হচ্ছেন সূর্য্য বা এপোলো, তেমনই আগুণের মধ্যে যে শক্তি আছে তিনি হচ্ছেন অগ্নিদেবতা বহ্নি। জল, বায়ু, আকাশ, গাছপালা, প্রভৃতি বিশ্বপ্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু গুলিকে পর্য্যন্ত একটা খণ্ড খণ্ড প্রাণময় পদার্থ রূপে দেখিবার ক্ষমতা যে আধুনিক যুগের কবিদিগের অপেক্ষা প্রাচীনকালের কবিদিগের মধ্যে বেশী ছিল তাহা, যে কোন ও দেশের কবিদিগের কাব্য আলোচনা করিলেই জানিতে পারা যায়। সেই নিমিত্ত রামায়ণেও রামচন্দ্র সীতার বিরহে কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছেন—

"হে বনজ তরুলতা হে বিহঙ্গকুল
আমি রাম, সীতা শোকে হয়েছি আকুল
হে দেব চন্দ্র সূর্য্য হে দেব পবন
জান কি এ পথে সীতা করেছে গমন ?"

রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকে 'নব যৌবনা' রমণীরূপে কল্পনা, কিম্বা বৈশাখকে দীপ্ত নয়ন শীর্ণকায় সন্ন্যাসীরূপে পরিকল্পনা ঠিক ঐ রকমেরই একটা প্রয়াস হইতে যে উৎপন্ন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার দিনে জগতের এই দুইজন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য যে প্রকৃতির শক্তিকে লইয়া একটা কল্পনার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা দেখা যায়, ইহা বড় কম আশ্চর্য্যের কথা নয়। অবশ্য জগতের শৈশব কালের সৃষ্ট myth হইতে ইহাদিগের সৃষ্ট mythএর যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান আছে।

রবীন্দ্রনাথের শেলীর সহিত অপর এক বিষয়ে বেশ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় কবিই প্রকৃতিতত্ত্বের মধ্য দিয়া একটা মস্ত বড় বিপ্লববাদের প্রচার করিয়াছেন। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, দুই জন কবি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে একটা

অবস্থার সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উভয়ের হৃদয়বৃত্তির সমতাবশে তাঁহাদের প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্যগুলিতে বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দেখা যায়। শেলীর মতে মানুষের একমাত্র প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া আর কাহারও নিয়ম মানিয়া চলিবার আবশ্যকতা নাই। মানুষ যে মানুষের উপর আপনার প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সে কেবল তাহার অত্যাচারপ্রিয়তারই লক্ষণ। মানুষের এই দুষ্প্রবৃত্তিকে ঘৃণা করিয়া তিনি তাঁহার Dirge নামক কবিতাটিতে এই ভাবটা প্রকাশ করিয়াছেন। বায়ু, মেঘ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমুদয় প্রকৃতি সভ্যযুগের মানবকৃত মানবের প্রতি অত্যাচার ও অবিচারে ব্যথিত হইয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

"Rough wind, that moanest loud
Grief too sad for song,
Wild wind, when sullen cloud
Knells all the night long ;
Sad storms whose tears are vain
Bare woods whose branches stain
Deep caves and dreary main,—
Wail for the world's wrong."

মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম আইন কানুন ও বাধা বিঘ্নের অচলায়তনের বিরুদ্ধে, এই যে বিদ্রোহ-ঘোষণা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কাব্যেও যথেষ্ট আছে। তাঁহার "নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ" কবিতায় এ ভাব মূর্ত্ত হইয়াছে। এতদিন এই অচলায়তন, অত্যাচারের অন্ধকার স্বাধীনতার আলোককে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আজ প্রাণী জাগিয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রের জল উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ মহা উল্লাসে ভূধরের হৃদয় ভেদ করিয়া পাগল হইয়া জগতের মাঝে হৃদয় লুটিতে চায়, আজ তাহাকে রুধিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই। তাই আজ সে লহরের পরে লহর তুলিয়া, আঘাতের পর আঘাত করিয়া বাঁধন ভাঙ্গিতে উদ্যত—

"মাতিয়া সকল উঠেছে পরাণ
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ভয় ?"

আজ সে মহা সাগরের গানের মধ্যে স্বাধীনতার গানগুলি শুনিতে পাইয়াছে, আর কি সে স্থির থাকিতে পারে; তাহাকে আজ সকল বাধা বিঘ্ন বাঁধন কাটিয়া বাহির হইতে হইবে—

"কি জানি কি হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসিন্ধুর গান !
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে
যেন !
আজি চারি দিকে মোর কেন কারাগারে হেন।
ঐ যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়,
কে আসিবি কে আসিবি কে তোরা
আসিবি আয় !
পাষাণ বাঁধন টুটি ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারা প্রাণ ঢালি দিয়া জুড়ায়ে জগৎ হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবে আয় তোরা।"

শেলী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বিপ্লব ঘোষণা করিলেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট আছে। শেলীর মধ্যে একটা নৈরাশ্য-সূচক বিষাদের (optimistic) সুর আছে; রবীন্দ্রনাথে তাহা নাই। শেলী শুধু বিদ্রোহই ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু আর একটা শক্তির রাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাহা পারিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি মানুষের দুঃখে শুধুই নিষ্ফল রোদন করে না, তাহার কাজ পাষাণ-বাঁধন টুটিয়া, কঠিন ধরাকে ভিজাইয়া, বক্ষকে শ্যামল করিয়া ফুলকে ফুটাইয়া, সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া জগতের হৃদয় জুড়ান। তাহার মধ্যে যে একটা আশার বাণী (optimisteসুর) আছে,—সাফল্যের বিপুল আয়োজন বহিয়া যাইতেছে, যাহাতে সে 'কেশ এলা-

ইয়া', 'ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া,' রবির কিরণে পাখা ছড়াইয়া সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া আকাশে গায়িয়া চলিয়াছে,—

"আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া,
আকুল পাষাণ পারা।—"

এই জিনিষটা শেলীর কাব্যে আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আর এক হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের সহিত শেলীর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শেলী প্রকৃতিকে ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু শেলীর কাব্যে প্রকৃতির চিত্র দুই এক স্থান ব্যতীত তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। চিত্র-শিল্পী হিসাবে প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্যে শেলী অপেক্ষাও রবীন্দ্রনাথের স্থান অনেক উচ্চে। শেলী শুধু প্রকৃতির তত্ত্ব লইয়াই ব্যস্ত—মানুষের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ, তাহার অনুসন্ধানেই নিয়োজিত। বাহির হইতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিবার অবসর তাঁহার খুব কমই। টারসীরের চিত্রগুলিতে যেমন শেলীর কাব্যেও তেমনই প্রকৃতির স্থিতিশীল অংশটাকে বাদ দিয়া তাহার চঞ্চল, পরিবর্ত্তন শীল অংশকেই ধরিয়া রাখিবার একটা প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য তাহার প্রকৃতি বিষয়ক কাব্যগুলি এত জটিল, এত অস্পষ্ট। তিনি একবারেই একটা তত্ত্ব লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ধর্ম্ম বা তত্ত্ব লইয়া আরম্ভ করেন নাই—আরম্ভ করিয়াছেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহার প্রতি যে ভালবাসা,তাহার সঙ্গে যে আত্মীয়তা-বোধ, তাহার চিত্র আঁকিয়া। ইহা হইতেই তাহার প্রকৃতি-প্রণয়ের সূচনা, দেখিতে পাওয়া যায়; এবং ইহাই পরিণামে পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়া তাঁহার তত্ত্ব ও ধর্ম্মকে সজীব করিয়াছে—আকার দান করিয়াছে। তাঁহার হৃদয়-শতদলের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, প্রকৃতির প্রেমের ভিতর দিয়া ধর্ম্মভাব ধীরে ধীরে পরিণত ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

"তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এইত সবই সোজাসুজি,
হৃদয় কুসুম আপনি ফোটে
জীবন আমার ভরে ওঠে;
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি।"

এই হাতের কাছের পুঁজি লইয়াই তাহার প্রকৃতি-পূজার সূচনা, আর ইহার অবসান হইয়াছে পরম পুরুষের আলোচনায়। তিনি প্রকৃতির মধ্য দিয়া যে সাধনার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া, সকল সৌন্দর্য্যের আধার সত্যমঙ্গলের আরাধনার উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছেন।

এজন্য বলিতে পারা যায় অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের প্রকৃতি-পূজার প্রণালীর সহিত তাঁহার প্রকৃতি পূজার প্রণালীর কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহার এই প্রকৃতি-উপাসনা তাঁহারই অন্তরের নিজস্ব জিনিস, ইহার মধ্যে তাঁহার একটা ব্যক্তিগত, জাতিগত বিশিষ্টতা বর্ত্তমান আছে। আমরা দেখিতে পাই যে তিনি প্রকৃতিকে তাহার দুইরকম মূর্ত্তিতেই দেখিয়াছেন—একটা তাহার অনন্ত মূর্ত্তি, আর একটা শান্তখণ্ড মূর্ত্তি। তিনি প্রকৃতির রূপের মধ্যে মহান্ বিরাট্ অরূপের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আবার তিনি প্রকৃতির মধ্যে একটা সজীবতা, প্রাণ, অনুভব করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে তত্ত্ব বা নীতি আহরণের জন্য কোনদিনই ব্যস্ত হন নাই; আবার তিনি প্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্য্যকেও উপেক্ষা করেন নাই।

প্রপর্ণা

(উপন্যাস)

[শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ]

সন্ধ্যাবেলা—নম্বর মেসে বারান্দার কোণে রেলিং এর উপর বসিয়া সোমেন্দ্র সতীর্থ শশীশেখরের চরণে চরণে নিবদ্ধ করিয়া দোলাইতেছিল।

রাস্তায় তখন গ্যাসের আলো জলিতেছে, সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ, তাহার সূচিক্কণ পল্লবের ছায়ার সঙ্গে তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গের ছায়া দেওয়ালের গায়ে পড়িয়া চিত্রের মত দেখাইতেছিল।

তখন গ্রীষ্মের ছুটি হইয়াছে, মেস খালি। সারি সারি সব ঘরে তালা পড়িয়াছে, শুধু কোণের দিকে সোমেন্দ্রের ঘরটি খোলা। সেখানেও বাতি জ্বালা হয় নাই, নবোদিত চন্দ্রের অবিকশিত জ্যোৎস্না প্রথম-প্রণয়-ভীরু বধূর মত ঢৌকাঠের কাছ হইতে উঁকি মারিতেছিল।

এই শুষ্ক মেসে সঙ্গীহীন সোমেন্দ্রের দিন যাপনের কি কারণ ছিল,তাহা কেহই বলিতে পারিত না; কিন্তু সোমেন্দ্র ছুটির অব্যবহিত পরেই যে বাড়ী যাইত না, মৃত দেহের প্রাণ পুরুষের মত শূন্য মেসের অন্ধকার রুদ্ধদ্বার ঘরগুলির কাছে ঘুরিয়া বেড়াইত, এটি ছিল অবধারিত সত্য। বাড়ী হইতে তাগিদ পত্র আসিতে আরম্ভ করিলে সোমেন্দ্র অনির্দ্দেশ্য কার্য্যারের অসম্পূর্ণতার দোহাই দিয়া এবং নৈকট্য-বোধক 'আজকালের' অস্থির আশ্বাস দিয়া প্রায়ই মাস কাটাইয়া দিত।

শশীশেখরের সহিত সোমেন্দ্রের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে পিতামহ ও পিতামহীর সহিত কলিকাতায় বাস করিত। এখানকার তাহারা বাসিন্দা। সে থাকিত এই মেসেরই খুব কাছে, উঠিতে বসিতে সেই বাড়ীতে আসা যাওয়া চলিত। শশীশেখর রোজই এক একবার বলিত, কি হে সোম বাড়ী যাচ্ছ কবে?

সোমেন্দ্র অম্লান বদনে কহিত, "কাল"।

কিন্তু শশীশেখর ঠিক জানিত সোমেন্দ্রের এই কাল তাহার রাঙ্গা ঠান্‌দির 'পরশুর' মত অনাদ্যন্ত; সুতরাং সে পরদিন আসিয়া যথারীতি সোমেন্দ্রের ঘরের দরজায় মুষ্টি প্রয়োগ করিতে বিরত হইত না।

মেসে সকলে সোমেন্দ্রকে"ঠান্‌দি"বলিয়া ডাকিত। সোমেন্দ্রের এই অপরূপ আখ্যা লাভ করিবার কারণ সোমেন্দ্রের স্ত্রীজনোচিত কর্ম্মে অসাধারণ পটুত্ব। রন্ধনকলায় তাহার পরম নৈপুণ্য ছিল। মেঘ ডম্বর বাজাইয়া বর্ষা যখন রুদ্রের সঙ্গিনী বেশে কলিকাতার ধূম কৃষ্ণ গগনে দেখা দিত এবং জন-বিরল পথের উপর দিয়া ট্রাম গাড়ী অর্ণবযানের মত চলিতে থাকিত, সৌমেন্দ্রের চিত্ত তখন শুধু ময়ূরের মত নাচিয়া উঠিয়াই ক্ষান্ত হইত না, ষ্টোভে করিয়া সে এমন উপাদেয় খেচরান্ন প্রস্তুত করিত, যে প্রবাসের শুষ্ক জীবন যাত্রার উপর দিয়া সুদূর গৃহের স্নেহ মেদুর বাতাস বহিয়া যাইত। আবার যখন সরস্বতী পূজা আসিত, তখন সোমেন্দ্র, ভর্জ্জিত তিল ও চিপিটকের লড্ডুক বানাইয়া পূজার অঙ্গহীনতা দূর করিত। রোগে সোমেন্দ্র পথ্য প্রস্তুত করিত, সেবা করিত, রাত্রি জাগিত, আরাম বিরাম ভুলিয়া রোগীর পার্শ্বে দিন কাটাইত। মেসে সর্ব্বশুদ্ধ বারটী ছেলে ছিল। তাহাদের গম্ভীর প্রকৃতি, সৌম্য মূর্ত্তি বিরলভাষী এই সঙ্গীটি—তরুণ বয়সে যে প্রতি বিষয়েই শ্রদ্ধেয় প্রবীণের পরিপক্ক বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিত, তাহাকে তাহারা শুধু এই একটি দিক্ দিয়া

তাহাদের বিস্তৃত ব্যবধানের ভিতর ও নাগাল পাইত। সুতরাং তাহারা সোমেন্দ্রের একটা নাম করিয়া তাহাদের হাস্য পরিহাসের আসরে তাহাকে একটি স্থায়ী স্থান দান করিয়াছিল। সোমেন্দ্রের ভাবক বলিয়া ও একটা নাম ছিল। মেসের মধ্যে সেই ছিল মস্ত "অথরিটি"। যে যাহা কিছু পারিত না, অথবা বুঝিত না, সোমেন্দ্র তাহাকে সে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিত, সমস্যা ভঞ্জন করিতে তাহার মত দ্বিতীয়টি কেহ ছিল না। স্মরণ শক্তির প্রাখর্য্য বশতঃ কোটেশনগুলির বইএর অভাব ঘটিলেও বলিয়া দিত। কাব্য কলাতেও সে একজন বিশেষ সমঝদার ছিল। নববিবাহিত তাহার যে সব বন্ধুরা কমল পত্রে লিখন লিখিয়া প্রিয়া বিরহ দুঃখ খণ্ডন করিত, সোমেন্দ্রের রচনা তাহাদের উৎস মুখে ধারা যোগাইত।

শশীশেখর আজ একটা বিশেষ বার্ত্তা লইয়া সোমেন্দ্রের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা কিছুতেই ব্যক্ত করিতে দিল না। তাহার হৃদয় চক্র মধ্যে অস্থির বেগে ভ্রাম্যমাণ সেই রহস্যটিকে তাহার অনুমানের তীর দিয়া বিঁধিতে চেষ্টা করিয়া কেবলই ব্যর্থকাম হইতেছিল। শশীশেখর কহিল, "আচ্ছা বল ত, এমন দিনে এমন সময়ে কি আশা করা যায়।"

স্তবকাভিনয় কেশভার বৃহৎ মস্তক নাড়িয়া সোমেন্দ্র কহিল, "প্রশ্নটা কিছু গুরুতর হোল, মানুষের আশা জিনিষটা অনন্তরূপী। আকাশের মত তার অপরিমেয় প্রসারের ভিতর অবিরাম সৌর-লীলা চলেছে; আকাঙ্ক্ষা নীহারিকার মত সংখ্যাতীত পৃথিবী সৃষ্টি করছে, ধ্বংস করছে"—"ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি" বলিয়া শশীশেখর সোমেন্দ্রের মুখ চাপিয়া ধরিল। "বাস্ রে! লম্বা চওড়া কথা ছাড়া আর তোমার বুলি বেরোয় না বুঝি! ছোট খাট লোক-দের জন্য একবার একটা ছোটখাট আঁচ কর না!" "বহুৎ আচ্ছা অত্যন্ত ছোট একটি কথা বলব তবে! আমাদের এই গোলদীঘির ধারের একটি বাড়ীতে একটি ছোট প্রজাপতি এই ফরফরে দক্ষিণ হাওয়ায় উড়ে এসেছে।"

প্রত্যুত্তরে শশীশেখর সোমেন্দ্রকে অর্দ্ধচন্দ্র দানে দশ হস্ত দূরে প্রেরণ করিল।

সোমেন্দ্র পুনরায় আপন স্থান অধিকার করিয়া কহিল, "অসহ্য, অসহ্য এ বেয়াদবি! ভদ্রলোকের মত দিব্যি শুনে আছি, তার মধ্যে অকস্মাৎ এ হেন আচরণ অত্যন্ত অসহ্য।"

শশীশেখর কহিল, "যাও, তোমার মত লোকের কর্ম্ম নয় কিছু আঁচ করা। শোন তবে বলছি—কাল আমরা জলযাত্রা করব।"

"সত্য"?

"খাঁটি সত্য।"

"আমরা, অর্থাৎ—?"

"অর্থাৎ আমি এবং সোমেন্দ্রকৃষ্ণ বসু"

"আজ্ঞে, এ ব্যাপারে সোমেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতামত কি একবার নেওয়া হয়েছিল?"

"নিত্যসিদ্ধ জিনিসের সম্বন্ধে প্রশ্ন অনাবশ্যক।"

"বটে? তবে কথাটা হচ্ছে কি, রাজধানীর দালান কোঠার উষ্ণ শাসনে যে হাওয়াটি মৃদু সমীর রূপে মৃদু সম্ভাষে আগমন কর্চ্ছে, নদীর উপর খোলা মাঠে ছাড়া পেয়ে তিনি একেবারে ঝঞ্ঝের রূপে অবতীর্ণ হবেন, এই ও নিত্যসিদ্ধ। এহেন স্থলে এবং এহেন সময়ে এহেন জলবিহার সঙ্গত হবে কি?"

অসহিষ্ণু ভাবে শশীশেখর পুনরায় তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া কহিল, "খুব হবে, খুব হবে! ঠান্‌দি তোমায় আর বেশী কিছু ভাবতে হবে না, সুবোধ সুশীল বালকের মত এখন যাত্রার আয়োজনটা করে ফেল!"

"আরে, এ কি পাগল নিয়ে পড়লুম! বলে কি এ! সত্যি যাবে না কি।"

"বিলক্ষণ! বাবুর বিশ্বাসই হচ্ছে না!"

মাথা নাড়িয়া সোমেন্দ্র কহিল "না হে ভায়া, সন্দেহটা মেহাৎ-ই যাচ্ছে না। এ হেন সময়ে

ঠাকুরমা তোমায় নদীপথে নৌকাযোগে প্রবাসে প্রেরণ কচ্ছেন—কথাটা ঠিক—এই যাকে বলে কি না প্রামাণ্য—তা মনে হচ্ছে না।"

"চল তবে ঠাকুরমার কাছে, ওঠ!"

"হ্যাঁ, মোকাবিলাটা হোক্ আগে।"

সোমেন্দ্র অন্ধকারে হাতড়িয়া সাট গায় দিতে দিতে গান ধরিল, "নয়নের মণি সে যে নীলমণি, কেমনে গো তারে ছেড়ে দিব।"

(২)

সোমেন্দ্রের ঘনিষ্ঠতাটা সকলের চেয়ে শশী-শেখরের সঙ্গেই বেশী ছিল। শশীশেখরের পিতা অথবা মাতা কেহই বর্ত্তমান ছিল না, সন্ততিপ্রিয় পিতামহের সে একমাত্র পৌত্র। তার গৃহের সযত্ন-পালিত পুষ্পতরুর মত শোক-মুক্ত স্নেহের সৌকুমার্য্যের ভিতর সে পালিত হইয়াছিল; তাহার নিজের কিছুই করা অভ্যাস ছিল না; অতিরিক্ত আদরে লালিত হইয়া অসহায় শিশুর মতন সে পর-নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছিল। কঠোরতার আওতা ছাড়া তাহার মনুষ্যত্ব, তেজ, বঞ্চিত অপক্ক ফলের মত অপরিণত রহিয়া গিয়াছিল। ঘরে ঠাকুরমা ও ঠাকুরদা নহিলে তাহার কোন ও কাজ হইত না; আর বাহিরের যত কিছু ভার, সব ছিল সোমেন্দ্রের উপর। আত্মরক্ষণে অক্ষম এই সহধ্যায়ীটির যাহা কিছু করিবার দরকার হইত, সোমেন্দ্র তাহা করিয়া দিত, মন্ত্রণা দিত, বুদ্ধি যোগাইত। এই সূত্রে সোমেন্দ্র ঠাকুরমা ও ঠাকুরদার বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছিল।

ঠাকুরমা ঠাকুর্দার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, শশীশেখর তাঁহার জীবনাধিক ধন ছিল। বন্ধ্যা নারীর পুঞ্জ-বঞ্চিত অবরুদ্ধ স্নেহধারা মাতৃপরিত্যক্ত এই বালকের দিকে তিনি উৎসারিত করিয়া দিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের অভিশাপ মোচন করিয়াছিলেন। শশীশেখরের এক জ্যেষ্ঠা সহোদরা ছিলেন, শশীশেখরের ঠাকুরমা যখন পতিগৃহে আগমন করিলেন, তখন তাহার বিবাহ হইয়াছে। মাতৃহীন শিশুর মাতৃত্বের পদ যত সহজে ও যত শীঘ্র তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, এই বন্ধ্যাধিকা, বিদগ্ধ বুদ্ধিপরাধণা বিমুখচিত্ত তরুণীকে তত সহজে আপনার স্নেহের অধিকারের ভিতর আনয়ন করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্নেহের যত কিছু মন্ত্র তন্ত্র ছিল, তাহা এই কোপন স্বভাবার কুটিলমতি অবি-শ্বাসের বিষাঘাতে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইত। বয়োপ্রাপ্তির পরে শশীশেখর তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ভগিনীর নিকট যথেষ্ট ভৎর্সিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার স্থূল মস্তকে বুদ্ধি সঞ্চার হয় নাই। ইতিমধ্যে শ্বশুর মৃত্যুতে টলমলায়-মান স্বামীর সংসার তরণীর কর্ণধার হইয়া তিনি কাশীতে সুপ্রতিষ্ঠিতা হইলেন, কলিকাতার বাড়ীতে বসন্তের সুবাতাস বহিল।

ছাদের উপর ঠাকুরমার রান্নাঘর, উনানে একটা কড়াতে এক কড় ছানা চড়াইয়া ঠাকুরমা ঘন ঘন তাহাতে কাঠের তাড় সঞ্চালন করিতেছিলেন। পরণে একখানা লাল কস্তা পেড়ে সাড়ী, সিন্দুরলিপ্ত সীমন্ত, বর্ণ শ্যাম, নাতিদীর্ঘ স্নিগ্ধ চেহারা। মুখে যেন এখনও একটা তারুণ্যের আভা লাগিয়া আছে।

সোমেন্দ্র চৌকাঠে পা দিয়াই কহিল, "এই যে ঠাকুরমা সন্দেশ বানাচ্ছেন! সময়েই এসেছি যা হোক্!"

"আমি তোমার কথাই যে মনে মনে ভাব্‌ছিলুম। সন্দেশ বানিয়ে বুঝি তোমায় ফেলে আমি খেতুম!"

বলা বাহুল্য ঠাকুরমার রন্ধনশালায় সোমেন্দ্র আহুত, রবাহুত, অনাহুত ত্রিবিধ ভোক্তার পদ অধিকার করিয়াছিল। তাহার দিদিমা অতি শৈশবে তাহাকে সদুপদেশ দিয়াছিলেন,—"দেখ্‌বে শুনবে বলবে না, ভক্ষণ দ্রব্য ছাড়বে না"। তদবধি সোমেন্দ্র এই নীতি-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে

এক কখনও ইহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া সেই স্বর্গগতা পুজনীয়ার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করে নাই। সম্প্রতি উদ্ভগ্ন ঘুমোদ্দীরশীল সন্দেশ হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সোমেন্দ্র কহিল, "ঠাকুমা, আপনার নাতি বল্‌ছে কি ?"

"কি বল্‌ছে ?"

"এই ছুটিতে ইনি নাকি নৌকা বিহারে বহির্গত হ'বেন !"

"ও পাগলের কথা রেখে দাও"

"আপনি বিশ্বাস ক'র্চ্ছেন না ? শশী যে আমাকে এখন যাওয়ার আয়োজন করার জন্য টেনে নিয়ে এল !"

সন্দেশের কড়া বারকোষের উপর রাখিয়া ঠাকুরমা কহিলেন, "পরশু দিন আমায় বল্‌ছিল বটে যে একবার নৌকায় করিয়া মুর্শিদাবাদ যাবে, তা আমি কি জানি সত্য সত্যই যাবে !"

শশীশেখর কহিল, "ঐ জন্যই ত বলে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি নাই।"

সোমেন্দ্র কহিল, "আমার সাম্‌নে আপনার অপমান ! হুকুম দিন আপনি আমি ওকে শাস্তি দি।"

"আর বাবা শাস্তি ! ও যে আমাকে কত শাস্তি কর্‌ছে তার অন্ত নেই ! মুর্শিদাবাদ যাবি, তা জাহাজে ট্রেণে যা না ; না তাতে তাঁর হবে না। উনি যাবেন নৌকায়। আমি আর কি বল্‌ব !

"আমি ত বরাবরই বল্‌ছি, আপনার এই নাতিটির কিঞ্চিৎ মস্তিষ্কের দোষ আছে, ওকে কিছু দিন বিষ্ণু-তেল ব্যবস্থা করুন ! ওর না আছে বুদ্ধি না আছে—"

"যাও, যাও আর মোসাহেবী কর্ত্তে হবে না" বলিয়া, শশীশেখর তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "রেল জাহাজ কদিন হোল হয়েছে, থাক্‌তেন এখন ঠাকুরদাদা এইখানে, শুনিয়ে দিতে পার্‌তুম। প্রাচীনকালের লোক কি করে বিদেশ যেত! একমাস ছমাস তিনমাস—নৌকা চলেছে ত চলেছেই! এখন যদি ছদিনের জন্য নৌকার প্রস্তাব করা হয়, তবে বাবুদের মাথা ঘুরে যায়। আর সোমের মস্ত মাথাটা দেখে ঠাকুরমা মনে কর যে ছুমিয়ার যত বুদ্ধি ভগবান এর ভিতরেই—ভরে দিয়েছেন ; কিন্তু ওর ফাঁকিটা ত তুমি ধর্‌তে পার না—ওর মাথার একরাশ ঝাঁকড়া চুল, কাল প্রসন্ন নাপিতকে দিয়ে মুড়িয়ে দিয়ো, দেখো ঐ মাথাটা এই মাথাটির চেয়ে এক ইঞ্চিও বেশী নয়" বলিয়া, শশীশেখর হস্ত দ্বারা স্বমস্তকের কল্পিত একটা পরিমাণ নিতে লাগিল।

সোমেন্দ্র তাহার হাত দুইটা পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিবার মত করিয়া বলিল, "বরা পড়ে এখন আবার চালাকি হচ্ছে !" "ঠাকুরমা, ও কিন্তু আপনাকে ফাঁকি দিচ্ছে, বেঁধে রাখুন ওকে এইবেলা ! কখনও ছাড়বেন না !"

"বাঁধবার মানুষ আসুবে যখন, তখন বাঁধ্‌বে ভাই। ভামার কি সে সাধ্য আছে" বলিয়া ঠাকুরমা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"আর যা খুসী তা কর, বোহাই তোমার এইটি কোরো না" বলিয়া শশীশেখর ঠাকুরমার কাছে হাত যোড় করিল।

সোমেন্দ্র কহিল, "পঞ্জিকাটা আনুন দেখি তবে, দিনটা দেখা যাক্‌"

শশীশেখর সোমেন্দ্রকে চোখ ঠারিয়া কহিল, তোমার মত আমি অকর্ম্মণ্য কুঁড়ে কি না ! দিন দেখা বুদ্ধি এখনও বাকি আছে ! কাল সকালে দশটায় দিন।"

ঠাকুরমা কহিলেন, "সত্যি যাবি নাকি ? শশীশেখর হাসিতে হাসিতে কহিল, "দিন দেখা হয়ে গেছে তবু জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ সত্যি যাবে কি না"

"না বাপু, তোর সঙ্গে পেরে ওঠা ভার" বলিয়া আবার সন্দেশে প্রবল বেগে তাড়ু নাড়িতে লাগিলেন, শশীশেখর হাসিয়া কহিল "ঐ কথাটা যে

তোমার সব সময় মনে থাকে না, এই ত দুঃখ !"

ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা এইরূপ আরও কিছুক্ষণ চলিল, অবশেষে সোমেন্দ্র মাঝখানে পড়িয়া মীমাংসা করিয়া দিল এবং সে যখন নিজে শশীশেখরের পার্শ্বচর থাকিবে, তখন যে সে বাড়ীতে থাকার মতই নিরাপদ ও নিরুদ্বেগ থাকিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব ঠাকুরমা প্রসন্নচিত্তে তাঁহার পৌত্রকে বিদায় দিতে পারেন ; কিন্তু শশীশেখর, সোমেন্দ্রের এবম্প্রকার উক্তিতে বহু আপত্তি প্রকাশ করিয়া ভুকুটি ভঙ্গ করিয়া ঠাকুরমাকে জানাইল যে, তাহাকে এরূপ বালকবৎ আপনার ভার বহনে অসমর্থ বিবেচনা করা এবং স্ত্রীজাতিবৎ পরহস্তে সমর্পণ করা রীতিমত মানহানিকর, সুতরাং সে আদালতে তাহার নামে নালিশ রুজু করিতে পারে। সে যে কিছুতেই কৌশল-লব্ধ-যশ সোমেন্দ্রের অসমকক্ষ নয়, তাহা বুঝাইবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ সেইখানে সোমেন্দ্রের সহিত একবার মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিল। কিন্তু তাহার আপীল সে দিনকার মত ঠাকুরমার কোর্টে গ্রাহ্য হইল না।

(৩)

যাওয়ার সময় ঠাকুরমা বলিলেন, "রাধু ঠাকুরকে সঙ্গে নিতে হ'বে।" ঠাকুরদাও এই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন। কিন্তু শশীশেখর, (যদিও সে চিরকাল রাধু ঠাকুরের রান্নার তারিফ করিয়া আসিয়াছে)তাহার নাম লইতে বিষম অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কহিল, "নৌকায় যদি তাহার রাধু ঠাকুরের রান্না খাইতে হয় তবে আর সে বাঁচবে না "

ঠাকুরমা কহিলেন "শুন্‌লে কথা ? রাধুঠাকুরের রান্নার সে দিন ও কত প্রশংসা হয়েছে, আর আজ্‌কে সিদ্ধান্ত হোল যে রাধু ঠাকুরের রান্না খেলে বাঁচবে না "

"ওঃ ! সে দিন রান্নাটা হঠাৎ ভাল হ'য়ে গেছিল। "আর কোনও দিন ভাল হয় না ?"

শশীশেখর হাসিয়া কহিল, "রোস, অত জজ সাহেবের মত কটমটিয়ে চেয়ো না, তাহলে উত্তরই দিতে পার্‌বো না !"

ঠাকুরমা হাসিয়া সোমেন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ব্যাপারটা কি হে ?"

"আজ্ঞে বেশী কিছু না, স্বাবলম্বনের এক অধ্যায়।"

ঠাকুরদা নাকে নস্য গুঁজিয়া কহিলেন, "এডলিউশন ?"

"নেহাৎই"

"মধ্যস্থের সাহায্যে !"

"মানুষের অভিব্যক্তি কি না, উড়ুদরের ব্যাপার !"

"ঠিক্‌-ঠিক !" বলিয়া ঠাকুরদা নাকে আবার নস্য গুঁজিলেন। শশীশেখর ফিরিয়া সোমেন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখছে সোমেন্দ্র কৃষ্ণ, তুমি যে বরাবর পিছনে থেকে রাধুর মত আমার যশঃসূর্য্য মলিন কর্চ্ছে, এ অতি অন্যায় !"

ঠাকুরদা তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, "কুছ পরোওয়া নেই দাদা, রাধুর সাধ্য কি, তোমা হেন সূর্য্যকে মলিন করে।"

ঠাকুরমা কহিলেন "নাও, আর আদর কর্ত্তে হবে না, ঐ করেই ত তুমি ওকে মাটি কর্‌লে ! একটা ধমক দাও ত দেখি একবার !"

ঠাকুরদা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "সেটা ত আমার দেওয়া অভ্যেস নেই, বরদাস্ত করাই অভ্যেস। তুমি একটু দেখিয়ে দিলে একবার চেষ্টা করিতে পারি।"

সকলের উচ্চ হাস্যের ভিতর ঠাকুরমা পরাভব স্বীকার করিলেন।

রাধু ঠাকুরের পরিবর্ত্তে একটা ষ্টোভস্ ২।৩ খানা পাক প্রণালী সঙ্গে গেল। একখানা ইংরাজী "কুকারি বুক" ও গেল। শশীশেখর ফিরিয়া আসিয়া তাহার দুর্ঘটনা পিতামহীকে সেই সব রসনা-

রসায়ন খাদ্যাদি রন্ধনপূর্ব্বক ভোজন করাইবে ইত্যাকার আশ্বাস প্রদানান্তর শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া যাত্রা করিবে। তবে—কি না—ঠাকুরমার সঙ্গে সোমেন্দ্রের একটা গোপন সন্ধি রহিল যে, সে তাহাকে কিছুতেই মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত যাইতে দিবে না, রাণাঘাট পর্য্যন্ত গিয়া একটী কিছু ছুতা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিবে। ঠাকুরমার সঙ্গে সোমেন্দ্রের এরূপ গোপন সন্ধি প্রায়ই হইত, কিন্তু সোমেন্দ্র তজ্জন্য বিবেকের গ্লানি আদৌ ভোগ করিত না, এবং শিশু সমাজে তাহার সুশীলতা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠিবার আশঙ্কা রাখিত না। ঠাকুরমার হাতের বিশেষ রকমের একটি পিষ্টক এক থালা পাওয়ার কথা স্থির হইলে পর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

(ক্রমশঃ)

অভাবে।

(শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত)

মূঢ় তাঁহারি মানিয়ে জন্ম
ন পড়িত হোয়
দীপক কী রবিকে উদৈ
বাত ন বুলে কোয়।
—তুলসীদাস

দীপ বটে পায় শোভা
অবনী মাঝারে।
পণ্ডিত বিহীন দেশে
জনগণ হায়,
চন্দ্রমার অভাবেতে
পূজে মূর্খে সমাদরে,
গভীর আঁধারে
না দেখি উপায়।

মানসিক বৃত্তি।

(শ্রীআশুতোষ ঘোষ, বি, এল্)

হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা; অপর পক্ষে অনুরাগ, প্রীতি, প্রেম মানসিক বৃত্তি উভয়পক্ষের বৃত্তিগুলি কিন্তু বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী; এই সকল বৃত্তি সমকালে চিত্তে অবস্থিতি লাভ করিতে পারে না। বিদ্বেষাদি বৃত্তি তমোগুণ জাত এবং প্রেমাদি বৃত্তি সত্ত্বগুণ সম্ভূত। সাধনা দ্বারা নির্ম্মল চিত্ত লাভ হয়। চিত্ত নির্ম্মল তখনি হয়, যখন সত্ত্বগুণ অতিশয় প্রবল, তমোগুণ সাতিশয় ক্ষীণ ও রজোগুণ ক্রিয়াশীল থাকে; সত্ত্ব ও রজোর ক্ষীণতায় তমোগুণের আধিক্য হয়। কোন অবস্থায় চিত্তে পূর্ণভাবে কোনও গুণের ঐকান্তিক লয় হয় না। চিত্তের এমন অবস্থা আসিতে পারে, যখন কোন কোন গুণের প্রাবল্য স্থায়ীভাবে বর্ত্তমান থাকে। একথা ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে যেমন খাটে, জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটে। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকাবাসীও ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে রজোগুণের ও আফ্রিকা ও আসিয়াবাসীদের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য

প্রথমোক্ত দেশবাসীগণ অপর দেশের লোকদিগকে অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তমোগুণকে রজোগুণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সত্ত্বগুণাশ্রয় অর্জ্জন করিতে হয়। জ্ঞান সত্ত্বগুণ সম্ভূত; কিন্তু যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বা বিজ্ঞান কহে, উহা গুণাতীত অবস্থায় উদ্ভূত হয়। প্রেম ও জ্ঞান উভয় ই সত্ত্বগুণ সম্ভূত, উভয়ে সমকালে মানব চিত্তাধিকার করিতে পারে; কিন্তু তাহাদের শক্তির তারতম্য থাকে। উভয়ে সমভাবে থাকিতে পারে না। চিত্তে জ্ঞানোন্মেষ হইলে বিদ্বেষাদি কলুষতা দূর হয়। বিবেক দ্বারা বৈরাগ্য ও জ্ঞানলাভ হয়। জ্ঞান লাভের সহিত চিত্ত কলুষতাশূন্য হয়, কারণ আলো ও আঁধার সমকালে অবস্থিতি করিতে পারে না। জ্ঞানলাভ হইলেও প্রেম সঞ্চারিত না হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানলাভের সহিত সমদৃষ্টি আসে। সমদৃষ্টির বিকাশে সর্ব্বভূতে অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগ ভগবৎ প্রেমের ফল। হৃদয়ে অনুরাগ জন্মিলে বিদ্বেষাদির স্থান হৃদয়ে আদৌ থাকে না।

প্রারব্ধ সুকৃতির বলে কখন কখন প্রেমের বাণ আসিয়া বিনা সাধনায় ভক্তের চিত্তকে ভাসাইয়া দিতে পারে। কিন্তু সচরাচর মানবকে স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, পরে জ্ঞানাঞ্জন হইয়া থাকে। জ্ঞানের সহিত ভগবদ্ভক্তি স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ভক্তি ক্রমশঃ ভাবে পরিণত হয় এবং ভাব ঘনীভূত হইলে ভগবৎ প্রেম লাভ হয়। এইরূপ উত্তরোত্তর স্তরে স্তরে উঠিয়া সাধনা করিতে হয়। মধ্যের স্তর ছাড়িয়া উচ্চতর অবস্থা পাওয়া এক রকম অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। তবে ব্যক্তি বিশেষের যাঁহারা জগতে অবতার নামে খ্যাত, সম্বন্ধে এ সব কথা খাটে না; কারণ তাঁহারা কোন নিয়মের অধীন নহেন। এ কথা সাধারণ লোকের, বিশেষতঃ প্রবর্ত্তকগণের অবতার বা মহাপুরুষ বিশেষের কার্য্য কলাপ দেখিয়া, তাঁহাদিগকে ঈশ্বর কৃপার প্রেমের স্রোত আপনা আপনি আসিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবে এই ভ্রমাত্মক প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকা বড় বিপদ জনক। ক্রমোন্নতিও লীলাময়ের লীলা; আর যত দিন এই লীলার স্রোত প্রবাহিত থাকিবে, তত দিন তাহার মধ্য দিয়া সন্তরণ দ্বারা অপর পারে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া, বিনা আয়াসে স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে চলিবে কেন? এরূপ করিলে, লীলার প্রবাহে কেবল অন্তরায় মাত্র হইতে হয় এবং শীঘ্র নিম্নগ হইবার আশঙ্কা থাকে। ভগবানের কৃপা, সদ্গুরুর সাহায্য ও নিজের চেষ্টা—এই তিনটি ধরিতে হইবে। কেবলমাত্র নিজের উপর নির্ভর করিলে ঠকিতে হয়। দৈব ও পুরুষাকার উভয়ই থাকা দরকার।

সান্ত্বনা।

(চিত্র)

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

…ইস্! কে অমন করে বিষাদের ঘন-কালিমা ঢেলে দিলে ওর চিরহাসি স্নিগ্ধ মুখখানার ওপর?… ব্যথা পেয়েছ বন্ধু?…কিন্তু কেন? কিসের জন্য আজ তোমার চির প্রশান্ত—না থাক্ বুঝেছি আজ এমন এক আঘাত তুমি তোমার কোমল হৃদয়ে পেয়েছ—যার ঘাতনায় তুমি অধীর হ'য়ে পড়েছ… কিন্তু শোন বন্ধু! ও নিমিষের ব্যথা তোমার এক নিমিষেই মিলিয়ে যাবে। কিন্তু, হাঁ কি বল্‌ছিলুম?……

ওই একজন কে ওর কাছে এল, না? হাঁ, হাঁ,

তাইত! ঐত দুজনে মুখোমুখী হয়ে পরস্পর কি বলাবলি কোরছে যাক্……

ওকি হঠাৎ ওর মুখের সব কালিমা, বিষণ্ণতা নিমিষেই উড়ে গেল, না? হাঁ, তাইত, তাই ভীষণ ঝড়ের তীব্র আঘাতে নির্ম্মল আকাশের বুক থেকে যেমন কাল-মেঘগুলা পালিয়ে যায়, এরাওত ঠিক তেম্‌নিভাবে পালিয়ে গেল?…

……হাঁ বুঝেছি বন্ধু! আজ তুমি তোমার মনের মত সাথী পেয়েছ! তুমি যেমনটি আঘাত পেয়েছ, তোমার ওই বন্ধুও ঠিক তেমন তীব্র আঘাতে জর্জ্জরিত!……তাই তোমার এ আনন্দ, তাই আজ গভীর সান্ত্বনা!……*

চিরন্তন

(শ্রীবালা দেবী)

এ হৃদয় হ'ত যদি আকাশ অসীম
তুমি যদি হ'তে পূর্ণ চাঁদ,
কত কল্প কোটি যুগ বুকেতে ধরিয়া
তবু কি মিটিত মোর সাধ?
এই বক্ষ হ'ত যদি ধরণী অশেষ;—
তুমি হ'তে নব দূর্ব্বাদল,
প্রতি লোমকূপে মোর থাকিতে ভরিয়া
পরিতৃপ্ত হ'ত হিয়াতল!
এ নয়ন হ'ত যদি চির অপলক
অনিমেষ চেয়ে মুখপানে
তোমারে দেখার সাধ মিটিত কি তবু?
পুলকে নূতন তুমি প্রাণে!
এই দেহ হ'ত যদি জলধি অপার,
তুমি তার ঢেউ অগণন,
শ্রান্ত কি হ'তাম তবু ব্যাকুল বেষ্টনে
পুরাতন হ'ত আলিঙ্গন?
এ অধর হ'ত যদি অমরার মধু,
তুমি হ'তে চির-বাঞ্ছধর
ফুরাতো না দিবানিশি চুমিয়া চুমিয়া
ভালবাসা পিপাসা অমর!

অপরিচিতা

(চিত্র)

[শ্রীঅজয়কুমার সেন]

(ক)

জীর্ণ দেহটাকে সবল কোরে তুল্‌বার জন্য পশ্চিমের কোন একটা পাহাড়িয়া দেশে আসিয়া পড়িলাম। যেখানে আমাদের বাংলো স্থির করা হোয়েছিল, সামনেই পর্ব্বতমালা দুর্গপ্রাকারের ন্যায় দণ্ডায়মান। এই পর্ব্বতনিকরের বিরাট্ উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য রাশি চোখের সাম্‌নে দিন রাত জল্ জল্ কোরে ফুটে উঠ্‌ত। আমি তাহাদের সেই মহান্ সৌন্দর্য্যে আবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। মানুষ বশ কিবার পাহাড়ের কি শক্তি!

সারাদিন বিছানায় চুপ্‌টি করিয়া পড়িয়া থাকা আমার ধাতে সহ্য হোত না; সেইজন্য আমি সাঁওতাল-দের মতন নির্ভীকভাবে পাহাড়ের কোলে কোলে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতাম; আর তাহাদের সহিত কতকালের পরিচিত জনের মত বসে বসে সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনিতাম।

* ইংরাজী ভাব অবলম্বনে লিখিত।

এই রকম করিয়া তাহাদের মধ্যে আমার একটা গাঢ় বন্ধন সুদৃঢ়রূপে বাঁধিয়া গেল। তারা যেন আমার কত কালের আপনার জন।

সেদিন কি বার তা' ঠিক মনে নেই—তবে গল্পে আমরা এত তন্ময় হইয়াছিলাম যে, আকাশে ঘন মেঘে ভরে গিয়েছিল, এ খেয়াল আমাদের মধ্যে কাহারও ছিল না।

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ঘেরিয়া ঝড়ের মাদল ভীষণ রবে বাজিয়া উঠিল। তখন আমাদের নজর গেল আকাশের দিকে। সেই স্থান হইতে কিছু দূরে যাইবামাত্র সহসা দেখিতে পাইলাম, এক ষোড়শী তরুণী আলুথালু বেশে, আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া সোঁহাইয়া আসিতেছে। তরুণীকে নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে ঐ রকম অবস্থায় দেখিয়া, আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমাকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া তরুণী আকুল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি এই ঝড়ের মধ্যে আমার সঙ্গীদিগকে হারিয়ে ফেলেছি—তাদের এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না।"

আমি তাঁহাকে অভয় দিয়ে বল্‌লাম, "আপনার কোন ভয় নেই—ঝড় থেম্‌লে গেলে, আমি আপনাকে আপনাদের বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আস্‌ব।"

এ কথায় তরুণী একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

কিছুকাল কাটিয়া যাইবার পর, আমি মৌনতা ভাঙ্গিয়া বলিলাম, "আপনারা বুঝি এখানে বেড়াতে এসেছেন?"

আমার মুখের দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টি মেলিয়া তরুণী কমনীয় কণ্ঠে বলিল, "আমরা আজ দুইদিন হোল এখানে এসেছি। আমার দাদার শরীর খারাপ—সেই জন্য……"

"তা, বেশ, এ যায়গাটার জলবায়ু চমৎকার। আপনার দাদা অচিরেই সেরে উঠ্‌বেন।"

এই বলিয়া আমি নীরব হইলে, তরুণী আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আপনি এখানে……"

মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "আমি ও এসেছি শরীর সারাতে।"

এই কথা বলিতেই তরুণী আমার দেহের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিয়া বলিল, "এখানে আপনার…"

তরুণীর মনের কথা বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "আমি ও এক চাকর ছাড়া আমার এখানে কেহই নাই।"

মৃদু হাসিয়া তরুণী কহিল, "তবে আপনি একলা!"

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তরুণী বলিতে লাগিল, "আমাদের যেখানে বাংলো, তার আশপাশে কোন ভদ্রলোকের বসতি নেই যে, দু'দণ্ড গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলি। ভাগ্যিস—এই বিজন পাহাড়ের মধ্যে আপনাকে বের কোরে ফেল্‌লুম, তবুত কিছুদিন কথা বলা যাবে?" কথাটা বলিয়া ফেলিয়া, কিন্তু তার মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

* * * *

দেখিতে দেখিতে চারিদিকে বেশ ফর্সা হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া পাহাড়ের মধ্যে আঁকা বাঁকা পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি হওয়াতে চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। কোনটা ডিঙ্গাইয়া, কোনটাকে বা এধার ওধার দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিলাম। এক একটি নদী এই রকম করিয়া পার হইতে লাগিলাম, আর তরুণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সেই স্থানটিকে মুখর করিয়া তুলিতে লাগিল।

এই ভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই হঠাৎ, দেখিতে পাইলাম, একজন সাঁওতালের সঙ্গে একটি ভদ্রলোক ব্যাকুলভাবে এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে আসিতেছেন। ভদ্রলোকটিকে দেখিতে পাইয়া, আমি তরুণীকে সোৎসাহে বলিলাম, "দেখুন ঐ ওঁরা হয় ত আপনার খোঁজে আস্‌ছেন।"

সেইদিকে চাহিয়া সলজ্জকণ্ঠে তরুণী উত্তর দিল, "ওঁর নাম ইন্দুবাবু, দাদার বন্ধু। উনি ও আমাদের সঙ্গে এখানে এসেছেন।"

দূর হইতে তরুণীকে দেখিতে পাইয়া, ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া, সেই ভদ্রলোকটি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "প্রীতি, তোমাকে খুঁজে না পেয়ে আমরা বড় চঞ্চল হোয়ে পোড়েছি।"

কথা কয়টী বলিয়া সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

প্রীতি গম্ভীর হইয়া কহিল, "আপনারাই বা কি রকমের মানুষ, আমাকে ফেলে রেখে, যে যার চলে গেলেন!"

প্রীতির কথায় লজ্জিত হইয়া ইন্দুবাবু আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিলেন, "তুমি ত জান প্রীতি, কি রকমের ঝড় উঠেছিল!"

"তাই বোলে কি এই নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে ফেলে যেতে হয়—ভাগ্যিস্, এঁকে হঠাৎ দেখতে পেলাম, তাই রক্ষে নচেৎ···"এই বলিয়া প্রীতি প্রফুল্ল-নয়নে আমার দিকে তাকাইল।

প্রীতির কৃপায় ইন্দুবাবুকে অত্যাধিক লজ্জিত হইতে দেখিয়া, আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়া বলিলাম, "আমি আসি—আপনি ইন্দুবাবুর সঙ্গে···"

আমার কথাটী শুনিয়া তরুণী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সে কি হয়—আপনাকে যে আমাদের বাসায় যেতেই হবে; নইলে মনে বড় দুঃখ পাব।"

হঠাৎ তাহার মুখে বিষণ্ণভাব দেখিয়া আমি বলিলাম, "আজ না হয় থাক—অন্যদিন যাব।"

তরুণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "সে হয় না, আজই যেতে হবে।"

ইত্যবসরে ইন্দুবাবু বলিলেন, "চলুন না, প্রীতি যখন বোলছে।"

তরুণীর একান্ত অনুরোধ ঠেলিতে পারিলাম না। অগত্যা তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিলাম।

ইন্দুবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলাম—তাহার চোখ দুটা জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর সে দুটা যেন আমার অন্তঃস্থল ভেদ করে দেখতে চায় আমার মনের ভিতরে কি ভাব রইছে। সে বিকট চাহনি দেখে আমার প্রাণের মধ্যে কেমন যেন কর্‌তে লাগ্‌লো। সমস্ত শরীরটায় যেন একটা বিষম ঝাঁকুনি পেলুম।

নানা পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন তাহাদের বাংলোর নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছি, দূর হইতে দেখিতে পাইলাম—বারান্দায় একটি ইজিচেয়ারের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কে যেন কাহার ব্যাকুল প্রতীক্ষায় পথের দিকে তাকাইয়া আছে।

আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া সেই ভদ্রলোকটি কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "প্রীতি প্রীতি, তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি?"

অনুমানে বুঝিতে পারিলাম—উনিই হোচ্ছেন—তরুণীর দাদা—রুণী।

দাদার ডাক শুনিয়া প্রীতি দৌড়িয়া গিয়া, তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি উঠনা—উঠনা। ইন্দুবাবুর সঙ্গে যিনি আস্‌ছেন—তিনিই আমাকে আজ বাঁচিয়েছেন।"

দেখিতে পাইলাম আনন্দে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমরা বারান্দায় উঠিতেই, তাহার দাদা চেয়ার হইতে উঠিয়া আমাকে গাঢ় ভাবে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ঈশ্বর আপনার অনেষ মঙ্গল কোর্‌বেন।" এই বলিয়া তিনি যোড়করে শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

তরুণীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "প্রীতি, কাপড় ছেড়ে এস আর ভিজে কাপড়ে থেক না!"

প্রীতি আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি ও কাপড় ছাড়ুন, আমি কাপড় এনে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তরুণী ঘরের মধ্যে লম্ফদ বিক্ষেপে চলিয়া গেল!

নিমেষের মধ্যে একটি ধোঁয়া খদ্দরের কাপড়,

খদ্দরের একটি চিলা হাতা পাঞ্জাবী ও খদ্দরের একটি গেঞ্জি আনিয়া প্রীতি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এই কাপড় নিন, সব ছেড়ে ফেলুন; বেহারা এসে নিয়ে যাবে'খন।"

তরুণীর এইরূপ ব্যবহারে আমি বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম।

আমি তাহাকে বলিলাম, "আপনি কেন নিজে নিয়ে এলেন—অন্য কাউকে দিয়ে, পাঠিয়ে দিলেই ত পার্ত্তেন।" কই—আপনি ত এখন ও কাপড় ছাড়েন নি—যান্, যান্, কাপড় ছেড়ে আসুন; অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টিতে ভিজেছেন?"

মৃদু হাসিয়া প্রীতি কহিল, "আপনি ও বুঝি কম!" এই বলিয়া বেহারাকে চা আনিবার জন্য আদেশ দিয়া পাশের দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

তরুণী চলিয়া গেলে, ইন্দুবাবু বলিলেন, "আপনি বুঝি এখানে বেড়াতে এসেছেন।"

"শরীরকে চাঙ্গা করা এবং বেড়ান, এই উভয় উদ্দেশ্যেই এখানে আসা।"

নিমেষের মধ্যে প্রীতির দাদা বলিয়া উঠিলেন, "তবে আপনিও দেখ্‌ছি অসুস্থ। তবে ত আপনার ও বড় কষ্ট হোয়েছে। প্রীতি, শীঘ্র কোরে গরম গরম চা পাঠিয়ে দাও না!"

কিছুকাল পরে বেহারার হাতে গরম গরম তিন কাপ্ চা পাঠাইয়া দিয়া, প্রীতি খদ্দরের শাড়ীতে নিপুণভাবে নিজেকে সজ্জিত করিয়া তিনখানি রেকাব ভরিয়া সুস্বাদু ফল লইয়া আমাদের সাম্‌নে প্রীতি-প্রফুল্ল মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দুবাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহার হাত হইতে একটি রেকাবী লইয়া আমাকে দিতেই; প্রীতি ব্যগ্র-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওটা ওঁর নয়—ওটা আপনার; ওঁরটা আমি এই দিচ্ছি।"

এই কথাতে আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া কি জানি কেন কাঁপিয়া উঠিল।

প্রীতি তখন নিজে আমার দিকে ঘুরিয়া আসিয়া, সাম্‌নে রেকাবীটা রাখিয়া দিয়া বলিল, "চা-টা গরম গরম খেয়ে ফেলুন—ঠাণ্ডা হোয়ে গেলে কোন উপকারই পাবেন না।"

সরল বাবু, আমাদের চা খাওয়ার আমেজটুকু ভাঙ্গিয়া, বলিলেন, "সলিলবাবু, আজ রাত্রে এখানেই প্রীতির রান্না খেয়ে যান—কি বল প্রীতি?"

প্রীতির ইহাতে সম্পূর্ণ মত ছিল। সে কেবল ঐ কথাটি বলিবার জন্য নানা ছুতা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ দাদার মুখ হইতে যখন ঐ কথাটিই ব্যক্ত হইয়া পড়িল, তখন প্রীতি মনের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নিজেকে একটু হাল্কা করিয়া লইল।

ইন্দুবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সলিলবাবু, এই কয়দিন এসে অবধি ছুটো কথা বল্‌বার কোন মানুষ খুঁজে পাই নে। ভাগ্যিস্, প্রীতি আজ আপনাকে খুঁজে বার কোরে আন্‌লে, তাই মনে হচ্ছে আমাদিগকে আর মূকের মতন নির্ব্বাক অবস্থায় এ উহার দিকে চাহিয়াই কাটাইতে হইবে না। মাঝে মাঝে আপনার দেখা পাব।"

প্রীতি অবশিষ্ট নিজের চায়ের কাপটা আমার দিকে আগাইয়া দিতেই, ইন্দুবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, "প্রীতি, তুমি চা খেলে না—ওটা যে তোমার!"

উত্তরে প্রীতি বলিল, "আমি পরে খাবো; আপনাদের আগে হোয়ে যাক্!"

"না, না, তা কি হয়—তুমি ত আর কম ভেজনি আমাদের চেয়ে—তুমি ঐ কাপটা গরম গরম খেয়ে ফেল না কেন?" এই বলিয়া ইন্দুবাবু কাপটা তাহার দিকে সরাইয়া দিলেন।

ইন্দুবাবুকে এই রকমের জেদাজেদি করিতে দেখিয়া অতি অপ্রসন্নচিত্তেই প্রীতি আর অধিককাল না দাঁড়াইয়া অন্য দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমার রাগ

হইল ইন্দুবাবুর উপর। নিশ্চয়ই তাহার কোন একটা অভিপ্রায় ছিল। যাক্, আমি সুযোগ বুঝিয়া সরলবাবুকে বলিলাম, "আজ তবে আসি—অন্য আর একদিন আস্‌বো; নিমন্ত্রণটা আজ রাখ্‌তে পারলুম না, ক্ষমা কর্‌বেন।"

"বলেন কি—বলেন কি, আপনি আজ আমাদের যে উপকারটা কোরেছেন—তা জীবনে—"

"ও কথা যদি বলেন; তবে আর…"

"আচ্ছা ও সব কথা যাক্, এখন আপনি আবার কবে আস্‌ছেন তাই বলুন?"

"একদিন সুবিধা পেলেই আস্‌ব।" এই বলিয়া আমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম।

পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলাম—প্রীতি যে ইন্দুবাবুকে ভাল চক্ষে দেখে না, তার প্রমাণ ত আজি পেলাম সুস্পষ্ট ভাবে।

যাক্, সরলবাবুর নিকটে ইন্দুবাবুর পরিচয়টা নিতে হবে।

* * *

পাঁচ দিন পরে হঠাৎ এক বেহারা আসিয়া আমার বাংলোয় উপস্থিত! বেহারাটিকে যে কে পাঠিয়েছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। এই কয়দিন যাই নাই বলিয়া হয়ত সরলবাবু অনুযোগ করিয়া পত্র দিয়াছেন।

এইরূপ ভাবিয়া বেহারার নিকট হইতে খামটি লইয়া দেখিলাম—অতি নিপুণভাবে আমার নামটি খামের উপর লেখা। কে যে লিখিয়াছেন—তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তবুও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এই চিঠি দিয়েছেন।"

বেহারা বলিল, "দিদিমণি।"

"আচ্ছা, তুমি যাও।" এই বলিয়া যেমন ঘরের মধ্যে ঢুকিতে যাইব, অমনি সে বলিয়া উঠিল, "দিদিমণি শীঘ্রই জবাব চেয়েছেন।"

"বোস, এখনি দিচ্ছি।"

চিঠিখানি খুলিতেই দেখিলাম,—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সলিলবাবু,

আপনি বেশ লোক ত—আমাকে না বলে ফাঁকি দিয়ে চলে এলেন। আমি এসে দেখ্‌লাম—আপনি চলে গেছেন; আপনার শূন্য পরিত্যক্ত আসন পড়িয়া আছে।

এই কয়দিন আসেন নি কেন—আমি সেদিন আপনাকে খুব কষ্ট দিয়েছি বলেই বোধ হয় আস্‌তে বিরক্ত বোধ করেন। কবে আসেছেন - আজ কিন্তু আসা চাই নিশ্চয়ই; চা প্রস্তুত থাক্‌বে।"

বিনীতা, আপনার,

প্রীতি,

তাহার লিখিত পত্রের শেষে 'আপনার' কথাটি পড়িয়া প্রাণের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি পেলাম। চিঠির উত্তর যে কি দিব, তা ভুলিয়া গেলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—এই কয়দিনের মধ্যে একদিনও না যাইয়া কি অন্যায় করিয়াছি।

হঠাৎ বেহারা বলিয়া উঠিল, "বাবু, চিঠি।"

বেহারার কথায় চমক ভাঙ্গিলে তাড়াতাড়ি টেবিলের নিকটে গিয়ে দুই ছত্র যাহা মনে আসিল তাহাই লিখিয়া দিলাম এবং চিঠির শেষে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলাম—

"আজ আমি বৈকালে নিশ্চয়ই যাব, এবং আশা করি আপনার দেখা পাব।"

বৈকাল আর কিছুতেই হয় না। বাংলোর চারিধার ঘুরিয়া ঘুরিয়া পা যখন অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন একটা চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। টেবিলের উপর তেমনি খোলা অবস্থায় প্রীতির চিঠি-খানি পড়িয়া আছে। চোখের সামনে কেবল 'নিশ্চয়ই' কথাটা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

চাকর আসিয়া বলিল, "বাবু, চা কি এখন নিয়ে আস্‌বো?"

ধমক দিয়া তাহাকে বলিলাম, "ঠিক দুপুরে চা কিরে—তুই কি পাগল হোলি নাকি?"

আমার কথা শুনিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া জড়িতস্বরে বলিল, "বাবু, পাঁচটা ত অনেকক্ষণ বেজে গেছে।"

"অ্যাঁ, বলিস্ কিরে পাঁচটা বেজে গেছে—তবে আমাকে বলিস্‌নি কেন—দূর বোকা হাবা।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

ব্যথিত মুখে পুনরায় সে বলিল, "বাবু, চা কি আন্‌বো?"

"এখন আর চা খাবার সময় নেই। আমি এখনই বেরুচ্ছি, যদি কেউ আসে খুঁজ্‌তে, তবে বলিস, আমি বেরিয়েছি।" এই বলিয়া, আমি হন্‌হন্ করিয়া বাংলো হইতে রাস্তায় পড়িয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে ভাবিলাম—প্রীতি আমাকে কি মনে করিবে?

বাংলোয় পৌঁছিয়া শুনিলাম, প্রীতি ইন্দুবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে চলিয়া গিয়াছে। এই কথাতে মনটা অত্যন্ত দমিয়া গেল। এতটা পথ আসা সবই নিষ্ফল হইয়া গেল। ইন্দুবাবু হয়ত জোর করিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে বাগানের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এমন সময় বেহারা ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বাঁবু আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

সবিস্ময়ে বলিলাম, "কোন বাবুরে!"

বেহারা বলিল, "বড়বাবু।"

আমি বলিলাম, "বড়বাবু কে?"

বেহারা বলিল, "সরলবাবু।"

"তিনি কি বাসায় একলা আছেন?"

"হ্যাঁ, তিনি একলাই আছেন।"

সরলবাবুর নিকটে উপস্থিত হইতেই, তিনি আমার হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, "আমাকে না ডাক দিয়া আপনি যে বড় চলে যাচ্ছিলেন?"

"বেহারার মুখে শুনলাম আপনারা কেউ নেই—সেইজন্য ফিরে যাচ্ছিলাম।"

"বসুন—বসুন, ওরে—বাবুর জন্যে চা নিয়ে আয়।" এই বলিয়া তিনি নিজেই চা আনিবার জন্য ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে এক রেকাবী জলখাবার ও গরম গরম এক পেয়ালা চা আনিয়া আমার সাম্‌নে রাখিয়া দিতেই, বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চা কি এখন তৈয়ার ছোল।"

বেহারা বলিল, "না বাবু, দিদিমণি বেড়াতে যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন, আপনি যদি আসেন; তবে ঐ সব দিতে।"

ইতিমধ্যে সরলবাবু আসিয়া বলিলেন, "সলিল বাবু; চা-টা আগে খেয়ে ফেলুন—বোধহয় এতক্ষণ ঠাণ্ডা হোয়ে গিয়েছে।"

বেহারার নিকটে নিশ্চয়ই সরলবাবু সব কথা শুনিয়া থাকিবেন। এই সব ভাবিয়া আমি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। ছিঃ সরলবাবু আমাকে কি মনে করিলেন!

এই সব কথা একমনে ভাবিতেছি, হঠাৎ সরল বাবু বলিয়া উঠিলেন, "এই বাণীর আগে, ইন্দু প্রীতিকে লইয়া একটু এধার ওধার বেড়াইতে গেল। হঠাৎ আবার সে দিনকার মতন কোন কাণ্ড না হয়—এই আমার বড় ভয়। ভাগ্যিস সেদিন আপনি ছিলেন? না হ'লে কি কাণ্ডটাই না হোত! দেখুন আপনাকে আজ উপযুক্তভাবে অভ্যর্থনা কোরতে না পেরে, বড়ই লজ্জিত হোয়ে পড়েছি সলিলবাবু?"

সরলবাবুর কথাতে আমি নিজেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।

আমার অবস্থা তার চোখে পড়ে যেতে, তিনি বলিতে লাগিলেন, "ইন্দুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে। সেই থেকেই আমাদের বন্ধুত্বের প্রথম সূচনা। তারপর আমরা এক সঙ্গেই এম, এ পাশ করি একই বছরে।

আমাদের পিতামাতা যখন মারা যান, প্রীতির বয়সে তখন দশ বৎসর। মা মারা যাবার সময় বলিয়া গেলেন, "ইন্দুর সঙ্গে যেন প্রীতির বিবাহ হয়।

আমুন এতদিন লক্ষ্য কোরে আস্‌ছি, ইন্দু প্রীতিকে স্নেহের চক্ষেই দেখে। প্রীতি ও যে ইন্দুর প্রতি আকৃষ্টা হয় নাই, এমন নয়। তবে যেদিন আমি তাহাদের দুইজনের অন্তঃকরণের গোপন কথাটা জান্‌তে পার্‌লো, সেইদিন তাদের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব তুল্‌বো। আশা করি—এটা শীঘ্রই জান্‌তে পার্‌বো। কিন্তু……"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সরলবাবু নীরব হইলেন। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মনের মধ্যে সংসা কে যেন বলিয়া উঠিল,—প্রীতিকে পাইবার যে আকাঙ্ক্ষাটা তুমি এতদিন ধরিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছ, তাহা বৃথা—বৃথা—বৃথা !!!

যখন আমরা দুইজনে সেই নির্জ্জন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া যে যাহার গভীর চিন্তায় মগ্ন আছি, এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে চকিতে প্রীতি বলিয়া উঠিল, "আপনি কতক্ষণ হোল এসেছেন ?"

মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখি প্রীতি। তাহার মুখমণ্ডল লজ্জায় ও বিষাদের ঘনরেখায় আচ্ছন্ন।

চেয়ার হইতে উঠিয়া বসিলাম, "এসেছি অনেকক্ষণ ; কি করি সরল বাবুর সঙ্গে গল্প কোর্‌ছি।"

ইতিমধ্যে সরলবাবু বলিয়া উঠিলেন, "প্রীতি, সলিলবাবুকে তোমার রাখা চা ও খাবার দিয়েছি।"

ছোট করিয়া একটি 'হুঁ' বলিয়া প্রীতি চলিয়া গেল।

আমি সুযোগ বুঝিয়া সরলবাবুকে বলিলাম, "আজ আমার একটু কাজ আছে—আমি চল্লুম, অন্য দিন আবার আস্‌ব।"

বিনীত-কণ্ঠে সরলবাবু বলিলেন, "তা হোলে কবে আস্‌ছেন ?"

"আর একদিন আস্‌বো।" এই বলিয়া প্রীতির অগোচরেই বাংলো পরিত্যাগ করিলাম।

বাংলোয় আসিয়া সটান বিছানায় শুইয়া ভাবিতে চেষ্টা করিলাম প্রীতি আমার অলক্ষ্যে আমার মনটা কতখানি অপহরণ করিয়াছে ? ভেবে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারিলাম না ; কিন্তু মন যে আর আমার অধিকারে নাই, বেদখল হয়ে গেছে ; এটা ধ্রুব সত্য।

অধিক আর চিন্তা করিতে পারিলাম না—সব যেন কেমন এলো মেলো হইয়া যাইতে লাগিল।

সে রাত্রে কিছু না খাইয়াই শুইয়া পড়িলাম।

* * *

এক সপ্তাহ কোথা দিয়ে কি রকমে যে কেটে গেল, তা' আর বোল্‌তে পারি না। তবে যে প্রীতির স্মৃতি মনের ভিতর গভীর দাগ রেখে গিয়েছিল, এ কথা ঠিক।

একদিন সকাল বেলায় বারান্দায় বসিয়া প্রাতিক চা খাইতেছি এবং অন্যমনস্কভাবে কোন একটা পুরাতন মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা পর পর উল্‌টাইয়া যাইতেছি ; হঠাৎ 'বাবু' সম্বোধনে মুখ তুলিয়া দেখি—সেই বেহারা আবার আসিয়াছে।

সবিস্ময়ে বলিলাম, "কি খবর লছমি চাঁদ ?"

"দিদিমনি এই চিঠি দিয়েছেন।" এই বলিয়া সে আমার হাতে চিঠিখানা দিল।

ফিপ্রগতিতে লেফাফাখানি ছিঁড়িয়া পড়িলাম,

সলিলবাবু,

আজ দুদিন হোল আপনি পালিয়ে আস্‌ছেন—কেন আমি কি বাঘ যে আপনাকে খেয়ে ফেল্‌বো আপনার সঙ্গে যে আপনার সঙ্গে যে দু'দণ্ড কথা বোলে প্রাণে একটু শান্তি পাব, সে সৌভাগ্যটুকু দিতেও কি আপনি নিতান্ত নারাজ ! ইহাই কি স্নেহের প্রতিদান ? জানেন, আপনি এলে আমি……

থাক্, আপনি কবে আস্‌ছেন। আপনার বাংলো আমাদের বাংলোর কি বেশী দূরে—আর তা হ'লে কি একবার ও আস্‌তে পারেন না ? এবার এলে আর বিরক্ত কোর্‌বো না—একবারটি আস্‌বেন না—আজ কিন্তু আপনার আসা চাই।

বিনীতা—আপনার প্রীতি।

"আজ যাব" এই কথা টুকু লিখিয়া, লছমি-চাঁদের হাতে দিলাম।

সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে হঠাৎ মনের মধ্যে এক খট্‌কা লাগিল। যদি গিয়া দেখি—প্রীতি সেবারকার মতন ইন্দুবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছে। তখন কোন্ প্রাণে আবার বাংলোয় ফিরিয়া আসিব ?

এই কয়দিন আমি ইন্দুবাবুকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, যখনই আমি কোন কথা প্রীতিকে বলি না কেন—তখনই তাঁহার কৌতূহলী কর্ণ আমাদের দিকে প্রসারিত থাকে। এই ভাব দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, ইন্দুবাবু আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন।

আমি কেন ইন্দুবাবুর পথের অন্তরায় হই। আমি কে—আমাকে জানেই বা কে ? তবে প্রীতি যে একটু স্নেহের চক্ষে দেখে—এই টাই আমার লাভ।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, আর প্রীতির সহিত সাক্ষাৎ করা হইবে না।

শেষকালে মনে মনে ঠিক করিলাম, প্রীতির সঙ্গে কোন এক সময়ে গিয়া শেষ দেখাটা করিয়া আসিব। শেষ বিদায় কথাটিই বা কি করিয়া তাহাকে মুখ ফুটিয়া বলিব। সে ও যে এক বিষম দায় !

* * * *

অনেকদিন পরে হঠাৎ প্রাণের মধ্যে যেন কি রকম করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া সরলবাবুর বাংলোর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে-লাগিলাম, হঠাৎ প্রীতির সঙ্গে দেখা হইলে, পাছে আমার সঙ্গে কথা কহিতে হয় এই ভয়ে সে যদি মুখখানি ভার করিয়া আমায় পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় ; না হয় ত গিয়া দেখিব—প্রীতি কাহার ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে ; হয় ত গিয়া দেখিতে পাইবে, প্রীতি ইন্দু বাবুর সহিত হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছে। এই সব রঙীন কল্পনা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলাম। দুই একটি যে হোঁচট্ খাই নাই এমন নহে।

কিছুদূর হইতে বাংলোর চেহারাটা যেন কি রকম, কি রকম বোলে বোধ হ'তে লাগিল, উহা যেন প্রাণহীন অবস্থায় নির্জ্জীবের মত দাঁড়িয়া আছে।

মাতালের মতন টলিতে টলিতে কোন রকমে বাংলোর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি,—সব নীরব নিথর নিস্তব্ধ। বাংলোর মধ্যে যে জনপ্রাণী আছে—তাহা ত বোধই হইল না।

বাগান পার হইয়া বারান্দায় উঠিয়া দেখিলাম, সামনের দরজায় তালা দেওয়া।

আমার শরীর অবশ হইয়া পড়িল—চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। আমি বারান্দায় বসিয়া পড়িলাম।

চারিদিকের ব্যাকুল বায়ু পাগলের মতন হু হু করিয়া বহিয়া গেল।

মাতা ও বিমাতা

(শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, বি এল)

মাতৃহারা শিশু যথা বিমাতার কাছে
অশন-বসন পেয়ে পুষ্ট করে দেহ,
চিত্তে তার কি যে ক্ষুধা নিত্য জেগে আছে
মা-জননী ছাড়া আর বুঝিবে কি কেহ ?
বয়স ত বাড়ে তার বরষ বরষ,
তবু সে অমূল-তরু এমর-সংসারে,
পরশ-মণির হায়, না পেয়ে পরশ
লোহা তার কোন কালে সোনা হ'ল না রে।
মা-হারা সন্তান যদি পায় সিংহাসন,
রাজ্য বিনিময়ে চায় মা'র কোল তবু,
রাজত্ব ভঙ্গুর যেন বিমাতার মন,
তোমার নিজের দান মা'র প্রাণ প্রভু ;
—অরণ্যে গৃহীর চিত্ত হর্ষে তাই দোলে,
বিমাতাকে ছেড়ে সে যে আসে মা'র কোলে।

পল্লী-বৈচিত্র্য

(রসানুভূত)

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র]

রস-রসিক প্রসিদ্ধ চিত্রকর দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের আলেখ্যগুলি পল্লীবাসীদের জীবনের সুখ-দুঃখের নিখুঁৎ চিত্র। সুনিপুণ চিত্রশিল্পীর এই সকল বাস্তব চিত্র অতীব মনোরম।

শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় ভূমিকায় সত্যই লিখিয়াছেন,—'পল্লীচিত্র পল্লীবাসিগণের দৈনন্দিন জীবনের আলেখ্য ; কিন্তু পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে এই পল্লীজীবনে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস, যে অপূর্ব্ব উন্মাদনা, যে যে বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা বড়ই উপভোগ্য, তাহাই পল্লী জীবনের বৈচিত্র্য।' তারপর গভীর দুঃখের সহিত তিনি লিখিয়াছেন,—'পল্লীজীবনের এই সরল সুমধুর বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে, কিছুদিন পরে হয়ত ইহার অস্তিত্বই লুপ্ত হইবে। যাদুঘরে রক্ষিত লুপ্ত জীবের দেহাবশেষ দেখিয়া আমরা অতীতের কতকটা অনুমান করিতে পারি। পরিবর্ত্তনের প্রবল প্রবাহে বাঙ্গালীর সবই ভাসিয়া যাইতেছে,—দীনেন্দ্র বাবুর 'পল্লীবৈচিত্র্য' ও যে কিছুদিনের মধ্যে পল্লীর চিত্রশালায় পরিণত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে ?" কিন্তু আমরা কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গলার ভাবী কল্যাণকামী যুবকদের ভিতর পল্লীশ্রী রক্ষা করিবার চেষ্টা ও পল্লীজীবনের সমস্যা গুলি পূরণ করিবার অদম্য আগ্রহ দেখিয়া, সর্ব্বোপরি ম্যালেরিয়া কালা-আজর প্রভৃতি রোগের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তলন করিয়া যুদ্ধ করিতে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া, বুঝিতে পারিতেছি যে, তাহারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন যে পল্লীর উন্নতির সহিত সারা বাঙ্গালাদেশের উন্নতি—বাঙ্গালী জাতির উন্নতি—এক অবিচ্ছেদ্য

সূত্রে গ্রথিত। তাই আশার ক্ষীণ আলোক রেখা দেখিয়া আমরা উৎফুল্ল হইয়াছি।

মণীষী জন ব্রাইট্ সত্যই বলিয়া গিয়াছেন, পল্লী-কুটীরের ভিতর জাতীয় অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। জাতীয়-জীবন পুনর্গঠনের দিনে বাঙ্গলার প্রাণটা কোথায় কি ভাবে অবস্থিত, তাহা বুঝিতে হইবে এবং এই চিত্রগুলি তাহা বুঝাইয়া দিবার পক্ষে সহায়ক। লেখক মহাশয় নিবেদনে ১৩১২ সালে লিখিয়াছিলেন, —'বঙ্গে আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ে নূতন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, আজ যেন হঠাৎ বাঙ্গালীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, আজ আপনার জননীকে আমরা চিনিয়াছি ; জননীর যাহা আপনার তাহার আদর করিতেছি, তাহা গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতেছি। * * * কিন্তু আমরা কোটী কোটী বাঙ্গালী সকলেই কি নগরবাসী ? সাতকোটী বাঙ্গালীর কয়জন নগরে বাস করেন ? কয়দিনের জন্য বাস করেন ? অধিকাংশ বাঙ্গালীই পল্লীবাসী।' ইহাদের সুখ দুঃখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া জাতীয়-জীবন গঠনের জন্য দীনেন্দ্র বাবু যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা একবাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। লেখক মহাশয়ের পল্লীচিত্র সমালোচনা কালে এ সম্বন্ধে যে কয়টী কথা বলিয়াছিলাম, তাহা উদ্ধৃত করিয়াদিলে অশোভন হইবেনা ভাবিয়া তুলিয়া দিতেছি :—'বাঙ্গালীর প্রাণটা কোথায় কি ভাবে আছে তাহা খুজিয়া বাহির করিতে হইবে ; এই অন্বেষণ-ব্যাপারে লিপ্ত হইলে পল্লীগ্রামের দিকে ফিরিয়া চাহিতেই হইবে। পল্লীবাসীদের জীবন কি ভাবে চালিত হইতেছে তাহা দেখিতে হইবে। সহরের নূতনত্বের মাদকতা এখনও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য জগতের রীতিনীতি, হাবভাব এখনও তথায় আপনাদের মহিমার ধ্বজা সম্পূর্ণভাবে তুলিতে পারে নাই—এখনও চেষ্টা করিয়া দেখিলে প্রাণের ধারা অবিকৃত ভাবে পল্লীগ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়। * * * এখনও সেখান বাঙ্গালী আপনার জাতীয় বিশেষত্বকে হারাইয়া ফেলে নাই।' আর আমার বোধ এই কারণেই মণীষী জন ব্রাইটও প্রাগুক্ত কথা বলিয়াছেন।

জাতীয় বৈচিত্র্যের—জাতীয় বিশেষত্বের—নিদর্শন গুলি দেখিয়া যদি আনন্দ অনুভব করিতে চান ও যদি জাতীয়-চরিত্র গঠন করিবার আবশ্যকতা কোনওদিন হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এচিত্র গুলি পাঠকরা অবশ্য কর্ত্তব্য। সমাজ সংস্কারকদিগের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, সংস্কার করিবার পূর্ব্বে সমাজের অবস্থা কিরূপ ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা তাহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আর আলোচ্য গ্রন্থ যে, সে বিষয়ে সহায়তা করিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

আলোচ্য গ্রন্থ পল্লীচিত্রের উত্তরখণ্ড। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত যে সমস্ত উৎসব পল্লীর অঙ্কে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের চিত্র, এ বৈচিত্র্যে স্থান পাইয়াছে—কালী পূজা, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, কার্ত্তিকের লড়াই, নবান্ন, পৌষলা পৌষ সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ মেলা, শ্রীপঞ্চমী, শীতল ষষ্ঠী, দোলযাত্রা, চড়ক। পল্লীচিত্রের চিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাই আমার প্রাণের কথা—এক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য। 'এই সকল চিত্র দীনেন্দ্র বাবু আন্তরিকতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। ফটোগ্রাফ যন্ত্রসাহায্যে এ সকল চিত্র তুলিতে পারা যায় না। চিত্রগুলি পাঠ করিতে করিতে আমাদের সর্ব্বদাই মনে হইয়াছে যে দীনেন্দ্র বাবুর চক্ষু ফটোগ্রাফ যন্ত্র অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়, বরং সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়াছেন, মানসপট চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইয়াছেন, তারপর কলকুশলীর সুন্দর তুলিকার প্রাণবন্ত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।

রসজ্ঞ পাঠকদের পরিতৃপ্তির জন্য দু একটী চিত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়াদিলাম :—'প্রভাতের রৌদ্র বকুল গাছের নিবিড় পল্লবের ফাঁক দিয়া মজুমদারদের চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। নব মুকুলিত সজিনা গাছের একটা উচ্চ শাখায় বসিয়া

একটা চাল রোদ্র, পোয়াইতেছে। কয়েকটী নিষ্কর্ম্মা ভদ্রলোক মোটা মার্কিনের চাদর গায়ে জড়াইয়া সত-রঞ্চির উপর বসিয়া সশব্দে তামাক টানিতেছে,—সেকালের উৎসবানন্দের গল্প চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। প্রথম শীতের এই মধুর প্রভাতে যেন কাহার ও কোন কর্ম্ম নাই! কেবল কয়েকখানি খালি গরুর গাড়ী হট্ হট্ শব্দ করিতে করিতে সম্মুখের পাকা রাস্তা দিয়া কি কাজে যাইতেছে—আর পাঁচ সাত জন 'মেটে' মজুর কোদাল ও ঝুড়ি সহ বাঁক ঘাড়ে লইয়া গল্প করিতে করিতে কাহার ও বাড়ীতে মাটীর প্রাচীর গাঁথিতে চলিয়াছে।' (নবান্ন—৭৭ পৃঃ)

নবান্ন বিতরিত হইলে,—'তখন ছেলেরা কলা-পাতে অন্ন পরিমাণ নবান্ন লইয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিল। কেহ ছাদের উপর কাক শালিক প্রভৃতি পাখীর জন্য তাহা রাখিয়া আসিল; কেহ ঢেঁকির ঘরে গিয়া ইঁদুরের গর্ত্তে খানিক ঢালিয়া দিল; মাছকে নবান্ন খাওয়াইতে একটী ছেলে নদীতে চলিল; একটি ছেলে খানিকটে নবান্ন গরু বাছুরের জন্য গোয়াল ঘরে লইয়া গেল; কেহ শৃগালের জন্য চাড়ি চাউল, খান দুই শাঁকালু ও এক টুকরা পাকা কলা লইয়া বাগানে কিংবা আঙ্গাওড়ার জঙ্গলে ফেলিয়া আসিল। সকল প্রাণীর জন্য নবান্ন বিত-রিত হইলে গৃহস্থ পরিবারবর্গ একত্র সমবেত হইয়া নবান্ন খাইতে আরম্ভ করিল।' সর্ব্বজীবে দয়ার এমন সুন্দর চিত্র আত্মসর্ব্বস্ব সহরে লোকের ভিতর পাওয়া সহজ নয়। আর পল্লীর এই ভাব বাঙ্গালীর নিজস্ব। আর একটী চিত্র উদ্ধৃত করিব,—"পল্লী অঞ্চলে শ্রীগণেশের অপরাহ্নে 'কাচ কাক' (নীল কণ্ঠ) দেখিতে মাঠে যাইবার প্রথা আছে। ইহা রাজপুত জাতির আহেরিয়ার মত। আহেরিয়ার দিন অরণ্যে বরাহ শিকার করিতে পারিলে তাহা যেমন রাজপুত-দের সারা বৎসরের শুভ সূচনা করে, সেইরূপ পল্লী বালকগণ, এমন কি বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত এই দিন মাঠে গিয়া 'কাচ কাক' দেখিলে সংবৎসর শুভদায়ক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

সুতরাং বেলা শেষ না হইতেই বালকেরা, যুবা ও বৃদ্ধেরা শীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া, দলে দলে মাঠের দিকে ধাবিত হইতেছে। প্রান্তরস্থ প্রত্যেক বৃক্ষে, দূর আকাশের দিকে তাহাদের দৃষ্টি ঘুরিতেছে, যদি দৈবাৎ একটা 'কাচ কাক' তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মাঘ শেষে নব বসন্ত সমাগত শীতের তীব্রতা অপগত প্রায়, অস্তমান সান্ধ্য তপনের পীত রশ্মি-জাল বাসন্তী লক্ষ্মীর হেমাঙ্গ লাবণ্যের ন্যায় শোভাময়, রবি শস্যসমাকুল প্রশান্ত প্রান্তর বক্ষে বিচিত্র বর্ণচ্ছটার বিকাশ করিতেছে; এমন সময়ে সহসা নব বসন্তের প্রণয়ানুরাগগুণ্ঠিত আবেগ-চঞ্চল নিশ্বা-সের মত ঈষদ্গুষ্ণ বায়ু প্রবাহ আম্র মুকুলের সৌরভ ও তরু শাখাসীন বিহঙ্গম সকলের মধুর হর্ষ কাকলি বহিয়া আনিয়া দূক ধরণীর সুপ্তবক্ষে নবাগত যৌ-বনের আহ্বান ঘোষণা করিয়া গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ, শান্ত, স্থির। তপনের কনক কান্তি পশ্চিম দিগন্তে বিলীন হইল। আকাশের অতি উর্দ্ধে দুই একটী পক্ষী তখনও ধরাতলে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাসমান। অদূরবর্ত্তী শাল্মলীর পত্রহীন শাখায় বিকশিত লোহিত পুষ্পস্তবকের অন্তরাল হইতে একটা কোকিল স্তব্ধ, উদার, ধূসর সন্ধ্যায় তাহার ব্যাকুল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কুহুস্বরে ব্যক্ত করিয়া চতুর্দ্দিক ধ্বনিত করিয়া তুলিল। ক্রমে শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রকলা ঊর্দ্ধাকাশ হইতে অনতি উজ্জ্বল রজত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া মুক্ত প্রান্তর ধৌত করিতে লাগিল।" (১৬৮—১৬৬ পৃষ্ঠা)।

আলোচ্য গ্রন্থে ঠাকুরদা, গ্রাম্য পুরোহিত জনার্দ্দন সার্ব্বভৌম, বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়, দারোগা গামেজুদ্দিন, বামা, কৈলাস প্রভৃতির চরিত্র চির ব্যস্তব ও উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রচলিত পাল-পার্ব্বণ ও ব্রত পূজাদির কাহিনী গুলি যথাযথ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

আমি রাঢ়বাসী। আমাদের অঞ্চলের পাল-পার্ব্বণ ও ব্রত পূজাদির সহিত অনেক স্থলে অনৈক্য দেখিতে পাইলাম। আমাদের রাঢ়ের কোনও ত্রুটি লেখক মহাশয় কি রাঢ়-প্রচলিত পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়া সাহিত্য-ভাণ্ডারে উপহার দিবেন না।

একটা দৃষ্টান্ত দেখুন, সরস্বতী পূজার দিন ইলিশ-মাছ ভক্ষণ পল্লীগ্রামের অনেকেই একটা সুলক্ষণের কাজ বলিয়া মনে করেন। গিন্নী সেই ইলিশমাছের কপালে তেল সিন্দুর দিয়া নূতন কস্তাপেড়ে কাপড় পরিয়া শুদ্ধাচারে রৌদ্রতপ্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া তাহা কুটিতে আরম্ভ করিলেন—"ইত্যাদি। রাঢ়ে এই দিনে মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ভাদ্রমাসে অরন্ধনের পূর্ব্বদিন কোথাও কোথাও গৃহিনীরা ঐরূপ করিয়া ইলিশমৎস্য কুটেন, আবার কখও কখনও বাড়ীতে প্রথম ঐ মৎস্য আসিলে ঐরূপ করিয়া থাকেন।

পৌষ-সংক্রান্তির দিনে সুমিষ্ট রসনাতৃপ্তিকর পিঠে ও সিদ্ধপুলি ইত্যাদির বর্ণনা পাঠ করিয়া এই প্রৌঢ় বয়সে যে রসনাকণ্ডুয়তি হয় নাই তাহা বলিতে পারি না—অন্ততঃ 'তিল জাউ' খাইবার লোভে মেহেরপুরে লেখক মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ - তাহা রবাহুত বা অনাহুত যে ভাবেই বলুন—করিতে বাসনা রহিল।

আশা করি এই চিত্র, রসজ্ঞ বাঙ্গালীকে আনন্দ দান করিবে—সহুরে যুবককে পল্লীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিবে ও তাহাকে পল্লীপ্রাঙ্গণে লইয়া যাইতে পারিবে। তখনই সহর ও পল্লীর ভিতর ভাবের বিনিময় হইবে। পল্লীর শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যুবকেরা কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারিবে; কারণ পল্লী শ্রী ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে, বাঙ্গালার স্বাস্থ্য অটুট থাকিতে পারে না। মস্তক রূপী সহরের শোভা ও শ্রী বর্দ্ধিত হইলেও অন্যান্য অঙ্গরূপী বাঙ্গালা দেশের পল্লীগুলি যদি বিগত শ্রী দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশ কখনও সুস্থ ও সবল হইবে না।

পুস্তকের শেষভাগে গ্রাম্য শব্দগুলির অর্থ বর্ণানু-ক্রমে লিখিত হইয়া অর্থবোধের সহায়তা করিয়াছে।

বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ; পত্রাসংখ্যা ২০৪+১৬ +৷৵ মূল্য ২৷৷০ টাকা। প্রকাশক শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী। রায় এণ্ড চৌধুরী। ২৬নং কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, (দোতলা)।

সমালোচনা

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদার)

"অগ্নিকঙ্কন"—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত —২০০ পৃষ্ঠা। এখানি পারিবারিক উপন্যাস। মূল্য দেড় টাকা।

এই গ্রন্থ রচনায় ফণীন্দ্রবাবু বিশেষ যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। চরিত্রের অঙ্কনে যে কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক শ্রেষ্ঠত্বা-ভিমানী কোন কোন ঔপন্যাসিকের অপেক্ষাও সুন্দর। নির্দ্দিশেষে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অযথা অনুরাগ বা বিদ্বেষ পোষণ ও প্রদর্শন-দোষ আলোচ্য উপন্যাসে নাই। সকল জিনিষেরই ভাল মন্দ দুইটী দিক আছে। একদেশদর্শী চিত্রকরের ন্যায় তিনি কেবলমাত্র একদিক দেখান নাই; দুই দিকই দেখাইয়াছেন এবং যে দিকটা দেখাইয়াছেন তাহা এমনি স্বাভাবিক বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন যে, কোনরূপে অপ্রাকৃত বা কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়না। এগ্রন্থে বিমল ও অপূর্ব্ব বাল্যে পরস্পর প্রতিযোগী সহপাঠী ছিল; আবার যৌবনে একই নায়িকার প্রতিযোগী নায়ক। গুণে জ্ঞানে অপূর্ব্ব অপেক্ষা

বিমল শ্রেষ্ঠ। অপূর্ব্ব তাহা বুঝিত এবং সেই জন্য মনে মনে বিমলের প্রতি একটা দারুণ হিংসা বহুদিন যাবৎ পোষণ করিয়া অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইত। হিংসাকারীর স্বভাব-সুলভ আক্রোশ বশে, কারণে অকারণে বিমলকে অপদস্থ করিবার জন্য মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিত না। হিংসার সুন্দর চিত্রটী দেখিয়া, চিত্রকরের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। যে দুর্ব্বল সে হিংসা করে, যে সবল সে কোনরূপে বিচলিত না হইয়া হিংসুককে উপেক্ষা করিয়া ক্ষমা করে। বিমলের উপেক্ষা ও ক্ষমার চিত্র ও বেশ মনোরম হইয়াছে। তেজস্বী পুরুষের স্বাভাবিক নির্ভীক সত্যবাদিতার পরিচয় ও বিমল চরিত্রে যথেষ্ট পাওয়া যায়। উদার ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের চরিত্রেও যে সংকীর্ণতা থাকে, বিজয়মাধব বাবুর চরিত্রে তাহার ইঙ্গিত আছে এবং একথা যে তিনি ব্রাহ্ম সাধারণের প্রতি অথথা বিদ্বেষ-বশে বলিয়াছেন তাহা নয়, কারণ তাহারই অঙ্কিত পরমেশ বাবুর মাতুল দীননাথের চরিত্র ঔদার্য্য গুণে মধুর; পক্ষান্তরে হিন্দু নরনারী মাত্রেই সংকীর্ণচেতা বলিয়া যাহারা অনুযোগ করিয়া থাকেন, তাহাদের সে অনুযোগেও যে ভিত্তিহীন তাহা উদারচেতা ব্রাহ্ম দীননাথের মুখে বিমলের মহীয়সী জননীর ভূয়সী প্রশংসা হইতেই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। চরিত্রের দুর্ব্বলতা সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া হইতে পারেনা।

দুর্ব্বল মানুষের দুর্ব্বলতা আছে ও চিরকাল থাকিবে। দ্বিতীয় গ্রন্থে ভবেশ নায়ক এবং মনোহর পণ্ডিতের কন্যা মানদা ও পরমেশ বাবুর কন্যা ব্রাহ্ম বালিকা ঊর্ম্মিলা এই দুই নায়িকা। ভবেশ হিন্দু এবং হিন্দু কন্যা মানদাকে বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু রূপের মোহে ভুলিল ভবেশ এবং অর্থের মোহে ভুলিল ঊর্ম্মিলার পিতা পরমেশ বাবু। ফলে ঊর্ম্মিলার সহিত ভবেশের ব্রাহ্ম মতে বিবাহ হইল। অর্থের লোভে ঊর্ম্মিলার পিতা ভবেশ সম্বন্ধে কোন তথ্যের অনুসন্ধান লইলেন না। বলা বাহুল্য এ বিবাহের পরিণাম উভয় পক্ষেরই অসুখের কারণ হইয়াছিল। সঙ্গোপনে অবিবাহিত যুবক যুবতীর পূর্ব্বানুরাগ অভিনয় কতদূর কুফলপ্রসূ হইতে পারে, ঊর্ম্মিলার সহিত ভবেশের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া তাহার একটী বেশ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

বিমলের চরিত্র যেমন সুন্দর, লতিকার চরিত্রও তেমনই সুন্দর। লতিকা ব্রাহ্ম বিজয়মাধব বাবুর কন্যা। বিমল যেমন তেজস্বী পুরুষ, লতিকা তেমনই তেজস্বিনী রমণী। সত্যের খাতিরে সে পিতামাতার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াও গৃহত্যাগ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। লতিকার পাণিগ্রহণের জন্য বিমল ও অপূর্ব্ব দুই প্রতিযোগী নায়ক। প্রতিযোগিতার বিগ্রহে অপূর্ব্ব অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিল হিংসা ও কুটিলতা, বিমল ব্যবহার করিয়াছিল ক্ষমা ও ঔদার্য্য। হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া অপূর্ব্ব, বিমলের নামে একটা মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়াছিল। কলঙ্ক সত্য হইলে সে কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইতে বিমলের কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু মিথ্যাকে সে ঘৃণা করে। অপূর্ব্বর মিথ্যা কথিত অপরাধের দণ্ড দিতে গিয়া, বিমল দেখিল অপূর্ব্ব বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়াছে। তখন সে দণ্ডের কথা ভুলিয়া গেল নিঃসহায় আর্ত্তের প্রতি দণ্ডবিধান করা কাপুরুষোচিত কার্য্য। তাই সে তখন বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রাণকে বিপন্ন করিয়াও সুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিল। এই সূত্রে বৃদ্ধ ব্রাহ্ম দীননাথেরও মহৎ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বিমলের এই ঔদার্য্য দেখিয়া অপূর্ব্বকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। লতিকাকে লাভ করিবার জন্য সে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল; এখন সেই আবার স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া বিমলের সঙ্গে লতিকার বিবাহ দেওয়াইল এবং ব্রাহ্ম দীননাথ

বাবুর অনুমোদনে হিন্দু মতানুসারে সেই বিবাহ হইল। এখানেও দীননাথের উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিমলের সহিত লতিকার বিবাহ সত্যই মণিকাঞ্চন যোগ। এ বিবাহে গ্রন্থের "মণিকাঞ্চন" নাম সার্থক হইয়াছে।

পুস্তকের ভাষা সহজ ও সরল। ছাপা কাগজ বাঁধাই সুন্দর।

"ঝড়ের যাত্রী":—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়। এখানি সামাজিক উপন্যাস। পত্র সংখ্যা ২৫৯, মূল্য ২৷৷০ টাকা। একটা উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যারম্ভ হয়। উদ্দেশ্যহীনতা কার্য্যের সফলতা নাই, সেই জন্যই হিন্দুদিগের সকল কার্য্যের পূর্ব্বে সঙ্কল্পের ব্যবস্থা। কি উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, গ্রন্থ পাঠ করিয়া অধিকাংশ স্থলেই পাঠককে তাহা নির্ণয় করিয়া লইতে হয়; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার স্বয়ং পাঠককে সে দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই "বক্তব্যে" তিনি তাহা কতকটা বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি হিন্দু, কিন্তু জাতিভেদের বিরোধী। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই যে হিন্দুজাতির আসল বিশেষত্ব আমি তা মানি না। আমি জানি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আমাদের জাতীয়তাকে পঙ্গু ক'রে ফেলেছে, আমাদের ঐক্যের বাঁধন আল্‌গা ক'রে দিচ্ছে। জাতিভেদের কাঁটা জঙ্গলে ভারতের' মুচ্ছিত আত্মা ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে উঠেছে—এই 'মহামানবের সাগর তীরে' উদারতার অনাহত ভেরী না বাজলে সে মূর্চ্ছা আর ভাঙবে না। ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের মূলীভূত কারণ—জাতিভেদ। এই জাতিভেদ সমস্যার উপরেই 'ঝড়ের যাত্রীর' কাঠামো দাঁড় করান হয়েছে।" উদ্দেশ্যের কথা গ্রন্থকার নিজেই অংশত বলিয়া দিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ কতদূর হইয়াছে তাহার বিচার করিতেই হইবে।

জাতিভেদ সমস্যা বড় কঠিন সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য নয় এবং সেই সমস্যার আলোচনা বৃথা, করাও এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই যে হিন্দুজাতির আসল বিশেষত্ব এ কথা গ্রন্থকার মানেন না, অথচ আসল বিশেষত্ব কি সে সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। "আসল বিশেষত্ব" শব্দের ব্যবহার করিয়া হিন্দুজাতির একটা যে কিছু বিশেষত্ব আছে, এ কথা তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু কি উপায়ে সেই বিশেষত্বের অনুশীলন হইতে পারে তাহার উল্লেখ করিয়া যদি তাহারই উপর "ঝড়ের যাত্রীর" কাঠামো দাঁড় করাইতেন, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে হয়ত বা কতকদূর অগ্রসর হইতে পারিতেন। তাহা না করায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, এ কথা বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

জাতিভেদে প্রথার অপব্যবহার বশতঃ হিন্দুর পল্লীসমাজে সময় সময় কিরূপ নিদারুণ অত্যাচারের স্রোত বহিয়া থাকে এবং পল্লীগ্রামের তথাকথিত শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা নীচ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া অশিক্ষিত দরিদ্র সম্প্রদায়কে কিরূপ নির্ম্মমভাবে নির্য্যাতিত করিয়াথাকেন, গ্রন্থকার মহাশয় উপাখ্যান ছলে আলোচ্য গ্রন্থে তাহারই কতকগুলি নিদর্শন দেখাইয়াছেন। গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা এই :—

কুসুমপুর গ্রামের প্রতাপশালী ব্রাহ্মণ জমীদার ভুবন চৌধুরী তাঁহার একমাত্র কন্যা মাধবীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর মাধবী কলিকাতায় মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকে। মাতুল "নব্য হিন্দু"দলের লোক। তাঁহার চেষ্টায় মাধবী বেথুন কলেজে পড়িয়া বি,এ, পাশ করে। চৌধুরীদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় জয়দেব মজুমদার, ষ্টেটের নায়েবের কর্ম্ম করিতেন। মাধবীদের অনুপস্থিতিকালে তিনিই প্রকৃত জমীদার এই ভাবে—জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন। সাবালিকা হইয়া মাধবী দেশে আসিয়া যখন জমীদারীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন,

তখন নায়েব মহাশয়ের প্রভুত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল; সেই কারণে এবং ইংরাজী শিক্ষিতা মাধবী জমীদারী চালাইতে উদার-নীতি অবলম্বন করায় নায়েব গোমস্তাদিগের যথেচ্ছাচারিতায় এবং নীচ স্বার্থান্ধতাজনিত অবাধ উৎপীড়নের ব্যাঘাত ঘটায় নায়েব মহাশয় মনে মনে কুপিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এই মাধবী উপাখ্যানের প্রধান নায়িকা।

উক্ত কুসুমপুর নিবাসী ললিত নামক জনৈক নমশূদ্র যুবক বাল্যাবধি কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিল। বিদ্যাবিদ্যালয়ের উপাধিগুলি নিঃশেষে করায়ত্ত করিয়া স্বীয় পল্লী আবাসে ফিরিয়া আসিল এবং পল্লী-সমাজের উন্নতি বিধানের পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিল। নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর পল্লীবাসীদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য ললিত পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয় স্থাপন করিল ও তাহাদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতে লাগিল। জনসাধারণ ললিতের উদার ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাহার ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া পড়িল। মাধবী যখন কলিকাতায় থাকিত, তখন ললিত ও তাহাদের বাড়ীর নিকটেই অন্য একটা বাড়ীতে থাকিত। একদিন পথে মাধবীর জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে ললিত নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও মাধবীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। সেই সূত্রে মাধবীর সঙ্গে ললিতের প্রথম সাক্ষাৎ। তখন কিন্তু উভয়ের মধ্যে পরিচয় ছিল না। এই ললিতা উপাখ্যানের প্রধান নায়িকা।

দেশে ললিতের কার্য্যকলাপ দেখিয়া এবং ললিতের প্রতি গ্রামের জনসাধারণের অচলা শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া, জয়দেবপ্রমুখ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার প্রতিষ্ঠার নিজেদের অযথা প্রতিপত্তির হানি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কিসে তাহার উচ্ছেদ সাধন হয় তাহার মতলব আঁটিতে লাগিলেন। ষড়যন্ত্র করিয়া একটা মিথ্যা রাজদ্রোহিতার মামলা বাধাইয়া তাহাকে মিয়াদ খাটাইবার জন্য তাঁহারা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এই সময়ের একটা ঘটনা উপলক্ষে ললিতের সঙ্গে মাধবীর পরিচয় হইল এবং ললিতের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাহার সকল কার্য্যেই মাধবী সহায়তা করিতে লাগিল এবং তাহাদের উভয়ের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় গিয়া দাঁড়াইল।

জয়দেবের গুণ অসীম। সে যেমন কুটিল কুচক্রী তেমনই চরিত্রহীন। মাধবীকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার নিকট এ'দিন প্রস্তাব করিয়াছিল; কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া, হয় ছলে বলে কৌশলে তাহাকে বিবাহ করিবে, না হয় তাহাকে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টকে তাহার জমীদারির ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে। এই মানসে সে একদিন গোপনে একাকিনী ও অসহায়া অবস্থায় পাইয়া মাধবীকে হরণ করিয়া লইয়া যায় এবং জন-সমাগম-বিহীন জঙ্গলের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ীতে তাহাকে আটক করিয়া রাখে। ললিত জানিতে পারিলে পাছে সে মাধবীকে উদ্ধার করিয়া গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দেয় এই জন্য কৌশল পূর্ব্বক তাহাকেও অসহায় অবস্থায় গ্রেপ্তার করিয়া সেই বাড়ীতেই আটক রাখে। মাধবীর নিরুদ্দেশ হওয়ার বার্ত্তা যখন অপ্রকাশ রহিল না, তখন ছদ্মবেশ জয়দেব রাষ্ট্র করিল যে ললিত মাধবীকে লইয়া পলাইয়াছে। রাত্রিযোগে ললিত কতক বাহুবলে, কতক বুদ্ধি কৌশলে মাধবীকে উদ্ধার করিল এবং পরদিন প্রাতে যখন মাধবীদের বাড়ীতে বসিয়া মাধবীকে লইয়া ললিতের পলায়ন কথার আলোচনা হইতেছিল, এমন সময় স্বয়ং ললিত মাধবীকে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল এবং জয়দেবের সকল কথাই প্রকাশ করিয়া দিল। ললিতের গুণের পরিচয় পাইয়া মাধবীর মাতুল মাধবীর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন। মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে যাচাই করিলে বলিতে হইবে, যোগ্য পাত্রেই মাধবী ন্যস্ত হইল। প্রাণভয়ে ভীত জয়দেব ক্ষমা

প্রার্থনা করিল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে সেই গ্রামের সধবা নারী একটী কুলকন্যাকে প্রলোভন দেখাইয়া ফুলত্যাগ করায়। পরে নিজের পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলে, তাহাকে পাপের পথে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসে। কয়েকদিন পূর্ব্বে এই কথা মাধবীর কর্ণগোচর হইয়াছিল। লাবণ্যকে বিবাহ করিবে এই অঙ্গীকার করাইয়া জয়দেবকে ক্ষমা করা হইল।

ক্ষমার বাড়া গুণ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অত বড় পাষণ্ডকে অত সহজে ক্ষমা করা ভাল হয় নাই।

সামাজিক উপন্যাস বলিয়া স্বভাবতই ইহাতে প্রণয়ের উচ্ছ্বাস, বিরহের হা হুতাশ, মিলনের স্বর্গবাস এ সকলের কিছু না থাকিবারই কথা; তবে যাহা আছে তাহা মামলী ধরণের নয় এবং পড়িতে ও কষ্ট হয় না। নানা জাতীয় বিবিধ ঘটনা পরম্পরার বিচিত্র বৈচিত্র্যের অভাবে চরিত্র অঙ্কনের কৌশল দেখাইবার সুযোগ প্রতিতথ্যঃ গ্রন্থকার পান নাই বলিয়া মনে হয়।

পুস্তকের ভাষার সচ্ছন্দ গতি ও লিখন ভঙ্গী মনোরম। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

"ফিরে পাওয়া"—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত;—পত্র সংখ্যা ১৯৮ এ খানির ছাপা, কাগজ বাঁধাই সুন্দর। ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সমাজ-সংস্কার। এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া এবং যে সকল বারবনিতার কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই ভদ্রকুলের আশ্রয়ে সুস্থ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেইনে লালিতা পালিতা ও শিক্ষিতা হইয়াছে, তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করা। এ প্রস্তাবের সম্মতি বা অসম্মতি সমালোচনার বিষয়ীভূত নয়, কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া তিনি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যে সফল করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিতে পারিয়াছেন কি না তাহাই বিচার্য্য। আমাদের বিবেচনায় তিনি বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। প্রস্তাবিত সংস্কার-সাধনের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ যথেষ্ট করিয়াছেন; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলা অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু যে ইমারত প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তি স্থাপনাও করিতে পারেন নাই; সংগৃহীত মাল মসলা সমস্তই বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। উপন্যাসের উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত সারাংশ এই:— সুশীলা ও নির্ম্মলা দুই ভগিনী। দুই জনই বিধবা। বিমান নামক এক যুবক সুশীলাকে বিবাহ করিবে, এই আশ্বাস দিয়া তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে সুযোগ বুঝিয়া নির্ম্মলার ও বিবাহ দিবে বলে। এই আশা ও বিশ্বাসে ভর করিয়া সুশীলা তাহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যুবকের সহিত বাস করিতে যায়। পিতার অসন্তোষের পাত্র এবং বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়ে বিমান সুশীলাকে যথারীতি বিবাহ করিল না; অপিচ তাহাকে একটী শিশু কন্যার মাতৃত্ব প্রদান করিয়া তাহাদের দুই ভগিনীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গেল এবং পিতাকে জানাইল যে, সে বিধবাকে বিবাহ করে নাই; স্ত্রীপুরুষের ন্যায় কিছু দিন উভয়ে একত্রে সংসার ধর্ম্ম করিয়াছে মাত্র। বিমানের পিতা বিমানের বিবাহ দিলেন। অভাবের তাড়নায় সুশীলা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। সরোজিনী নাম্নী এক দয়াবতী রমণী কালিঘাটে আসিয়া ভিখারিণী সুশীলা ও তাহার বিধবা ভগিনীকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন, কিন্তু তাহাদের জীবনের প্রকৃত তথ্য তাঁহার অজ্ঞাত রহিল। তিনি জানিলেন সুশীলার স্বামী বর্ত্তমান এবং নির্ম্মলা কুমারী। দয়া-প্রণোদি হইয়া সরোজিনী, সুশীলাকে গৃহে রাখিয়া নিজের পালিতা কন্যার মত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং নির্ম্মলাকে কুমারী জানিয়াই উপযুক্ত পাত্র পাইলে তাহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। সুশীলা, নির্ম্মলার রহস্য কিছুমাত্র প্রকাশ করিলনা। সরোজিনী নিজে একজন বাল-বিধবা।

বিধবা অবস্থায় নরেনবাবু তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একথা কিন্তু নরেশবাবু এবং সরোজিনী ছাড়া আর কেহ জানে না। সরোজিনীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়, পুত্রের নাম যোগেশ, কন্যার নাম সুহাসিনী। এই সুহাসিনীর সঙ্গে বিমানের বিবাহ হয়। বিমানের পিতা কিন্তু বিধবার কন্যা জানিয়া তাহাকে পুত্রবধূ করেন নাই। সরোজিনীর আর একটী পালিতা কন্যা ছিল তাহার নাম বিভা। সে বেহ্যার গর্ভজাতা। সুহাসিনীর দেবর বিজনের সহিত বিভার বিবাহের কথা সুহাসিনী একরূপ ঠিক করিল কিন্তু সে যে বেহ্যা কন্যা সরোজিনী তাহা জানিতেন, জানিয়া শুনিয়া তিনি কন্যার কুল কলঙ্কিত করেন কেমন করিয়া, সুতরাং সে জ্ঞানকৃত পাপে লিপ্ত হইতে তিনি সম্মত হইলেন না। যোগেশের সঙ্গে নির্ম্মলার বিবাহ হইবে স্থির হইল। যোগেশ কিন্তু বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নয়। সে যখন জানিতে পারিল নির্ম্মলা বিধবা, তখন বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিল। সেই সময় একদিন সরোজিনী যোগেশের মতি পরিবর্ত্তনের অভিপ্রায়ে গোপনে তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াদিল যে সে নিজেই বিধবার পুত্র। নির্ম্মলার সঙ্গে যোগেশের বিবাহ হইল কি না গ্রন্থে তাহা প্রকাশ নাই। গ্রন্থকার মহাশয় বিধবা এবং বেহ্যা কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত এই প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী পাত্র পর্য্যন্তও সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ বিবাহ একটীও দিতে পারেন নাই; বোধ হয় তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। জাতকের উপর জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীর প্রভাব থাকে কি না এবং থাকিলেও কতটুকু থাকে—বংশপ্রভাব উত্তরাধিকার সূত্রে, জাতকে কতখানি বর্ত্তাইতে পারে এবং থাকিলে বা বর্ত্তাইলে সেই প্রভাবের হস্ত হইতে জাতক, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখিতে পারে কি না সে বিষয়ে পাশ্চাত্য মনীষী মধ্যে মতভেদ আছে। এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিত তাহা জোর করিয়া বলাও সহজ নয়। যাহা হউক বিবাহ দিবেন এই স্তোক বাক্যে প্রলুব্ধ করিয়া একটী বিধবাকে কুলটা করিয়াছেন, আর তাহার গর্ভে একটী জারজ কন্যার উৎপত্তি করিয়া স্রোতের কুটার মত তাহাকে সংসার-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছেন। অগত্যা বলিতে হয় যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সুহাসিনী মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে আসিত, সেই উপলক্ষে সুশীলার সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। সে জানিত না যে সুশীলা তাহারই উপসপত্নী। মাতার অনুমতি লইয়া সে সুশীলাকে তাহার নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাখে এবং সেইখানে তাহার নিরুদ্দিষ্ট তথা-কথিত স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। গ্রন্থের "ফিরে পাওয়া" নামের সার্থকতা এইখানে।

ফণীন্দ্রবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক; কিন্তু সামাজিক উপন্যাস লেখার চেষ্টা তাঁহার এই প্রথম। প্রথম উদ্যমে ত্রুটী বিচ্যুতি হওয়া খুব স্বাভাবিক। আশা করি তাহার মত কৃতী লেখক দ্বিতীয় উদ্যমে এ ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইবেন। কাজ না দেখাইতে পারিলে কেবল কথার কোন মূল্য নাই। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি যাহা বলিবেন, কাজে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। কথার উপদেশ অপেক্ষা কাজের দৃষ্টান্ত অধিক মূল্যবান।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane, and
Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

যমুনা

শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন।

Mohila Press, Cal,

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

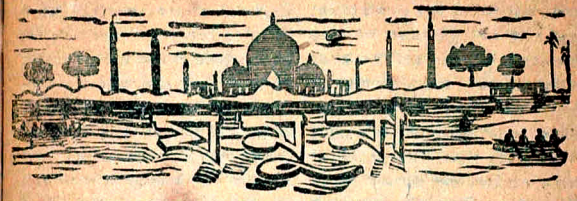

১৩শ বর্ষ, } মাঘ, ১৩৩০ { ১০ম সংখ্যা

আত্মা

(শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

(১)

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বলেন, আত্মা মানুষেরই আছে, ইতর প্রাণীদের নাই। তাঁহাদের মতে ইহার কারণ—বিবেক বলিয়া যাহা, তাহা মানুষেরই আছে, মনুষ্যেতর জীবের বিবেক নাই; সকল জীবেরই প্রাণ আছে, কিন্তু একমাত্র বিবেক মনুষ্যজাতিকে প্রাণিরাজ্যে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। মানুষের মধ্যে যে বস্তুর বিনাশ নাই এবং জড়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই তাহাই আত্মা। কেহ কেহ আবার শরীর, প্রাণ, মন এবং আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে আবার শরীর হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন এবং মন হইতে আত্মার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু আত্মা যে বস্তুতঃ কি তাহা অতি অল্প লোকই স্থির করিতে পারিয়াছেন। অধিকাংশ দার্শনিকের মতে মানুষের মধ্যে যাহা চিন্তা এবং বিচার করে তাহাই আত্মা। কিন্তু আত্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে খুবই মতভেদ। আমাদের দেশে দার্শনিকেরা আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন আত্মা অজ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা প্রায়ই এ মত সমর্থন করিতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন আত্মার বিনাশ নাই বটে, কিন্তু আত্মার উৎপত্তি আছে। যে বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে তাহা যে কেমন করিয়া অবিনাশী হইতে পারে ইঁহাদের অনেকে তাহা ধারণায় আনিতে পারেন না। সেইজন্য অনেকে আত্মাকে উৎপন্ন ও বিনাশশীল মনে করেন। আবার এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন জড়াতিরিক্ত অস্তিত্ব যাঁহাদের ধারণার বাহিরে। তাঁহারা বলেন, এই জড় জগতের যে উপাদান, আত্মারও সেই উপাদান। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির মূলীভূত কারণ জড়তত্ত্ব, এবং আত্মা, মন, প্রাণ ও শরীর জড়তত্ত্বেরই

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিকাশ মাত্র। সকল দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, প্রধানতঃ তিন প্রকার মতই প্রবল; এক প্রকার মত এই যে জড়তত্ত্বই জগতের মূলীভূত কারণ; দ্বিতীয় প্রকার মতে, আত্মা ও জড় পরস্পর স্বতন্ত্র, আত্মাতে জড়ত্ব এবং জড়ে চৈতন্যের কিছুই সম্পর্ক নাই; তৃতীয় প্রকার মত এই যে, আত্মাই সকলের মূলে, আত্মা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব এবং পরকাল সম্বন্ধে কোন কথাই বলে না। দেখা যায় কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্বও মানেন না। কারণ, তাঁহারা ইহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পান না। কাহারও কাহারও অনুমান এই যে, জীবন, জড়েরই একটী ক্রিয়া বিশেষ (a mere function of matter) এবং মনোবৃত্তি আর কিছুই নহে, মস্তিষ্কের একটী নির্য্যাস বিশেষ (a secretion of the brain)—পিত্ত যেমন যকৃতের নির্য্যাস, সেইরূপ। কেহ কেহ আবার জীবনকে পুঞ্জীভূত সংবিৎ এবং অনুভূতির সন্তাবনা-নিচয় ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। জড়বাদীরা আত্মা এবং আধ্যাত্মবাদীরা ভৌতিক বা জড়পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। জড়বাদী এবং আধ্যাত্মবাদীদিগের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে।

যদি ঈশ্বর এবং জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস না করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম সম্ভব হয় না। ঈশ্বর এবং জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাসের উপরেই ধর্ম্মের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

আত্মার অস্তিত্বে ও অমরত্বে বিশ্বাস, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মানুষেরই চিরকাল বাঁচিতে ইচ্ছা, মরিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। ইহাতে কি বুঝায়? অমরত্ব যে আত্মার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, ইহাতে কি ইহাই সূচনা করে না? ম্যাক্সমূলর, তাঁহার "Life and Religion" নামক পুস্তকে (১৭৫ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন, মানুষের অন্তরে জীবনের আত্ম-রক্ষার এক দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। জীবনে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিতে, জীবনের শেষে, মুমূর্ষু অবস্থায় অমরত্বের আশায় ইহা প্রকাশ পায়। আমাদের মানস-ক্ষেত্রে এই ইচ্ছালতা রোপিত হইল কেন? যদি অমরত্ব কথার কথা হয়, তবে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা মানবাত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম কেন? আমরা দেখি, প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মাত্রেরই মূলে উদ্দেশ্য আছে। অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা যখন মানবাত্মার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, তখন মানবাত্মার বিনাশ কখনই হইতে পারে না। আত্মা যে মরণশীল নহে, মানবাত্মার যে পরকাল বলিয়া কিছু আছে, এই বিশ্বাস মানব জাতির প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। কিন্তু মানবাত্মার পরকালটী যে কিরূপ, এসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধারণা। বর্ত্তমান পার্থিব জীবনের অবসানে, জন্মান্তর দ্বারা যে মানবাত্মার নবজীবনের পুনঃ সূত্রপাত হয়, এই ধারণায় হিন্দুজাতির একটী বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। এই ধারণার বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে এখন অনেক স্থলে অনেক প্রকার আলোচনা হইতেছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কেহ কেহ ক্রমশঃ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, একমাত্র জন্মান্তরবাদের দ্বারাই সুকঠিন জীবন-সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে।

হিন্দুর ধারণা এই যে, আত্মা শরীর নহে, শরীরের অধিকারী। আত্মা জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত পরম্পরায় দেহ হইতে দেহান্তরে বিচরণ করে। বৌদ্ধ, জৈন, সাঙ্খ্য, অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী প্রভৃতি সকলেরই এই মত। আধুনিক ইয়ুরোপের মত এখন অন্যরূপ, কিন্তু প্রাচীন ইয়ুরোপে এই মত অবিদিত ছিল না। জন্মান্তর-বাদের আপত্তি-কারীদিগের মধ্যে জন্মান্তর-বাদ সম্বন্ধে আপত্তির প্রধান কারণ এই যে, প্রত্যেক জীব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে, জীবন যাপন করিয়াছে, অথচ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জীবনের ঘটনা, তাহাদের সকলের স্মরণ থাকে না। মানবাত্মা যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে জীবন যাপন করিয়া থাকে, তবে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জীবনের ঘটনা, তাহার মনে থাকে না কেন? এই প্রশ্নের সমীচীন উত্তর এই যে, মনে যে থাকিতেই হইবে, তাহার কোন মানে নাই। আমাদের বর্ত্তমান জীবনেরই বা কয়টী কথা মনে থাকে? অতীত জীবনের কিছুই যে আমাদের মনে থাকে না, তাহাও প্রমাণ করা যায় না। আমাদের অতীত জীবনের স্মৃতি যদি একেবারে বিলুপ্ত হইত, আমাদের বর্ত্তমান জীবন অসম্ভব হইয়া পড়িত। অতীত এবং বর্ত্তমান যে এক সূত্রে গাঁথা, তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। অতীত আর কিছুই নহে, বর্ত্তমানেরই জনক; বর্ত্তমান আর কিছুই নহে, অতীতেরই সন্তান। অতীতের স্মৃতি ব্যতীত, বর্ত্তমান সম্ভব হইতে না। যদি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখা যায়, দেখা যায়, আমাদের বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতেই আমরা আমাদের অতীত জীবনের স্মৃতির পরিচয় দিতেছি। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর হাস্য, ক্রন্দন, স্তন-দুগ্ধ পানের জন্য তাহার মুখ-ব্যাদান, তাহার অজ্ঞাত ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতি, কি, তাহার অতীত জীবনের স্মৃতির পরিচয় দেয় না? শিশু যখন কথা কহিতে শেখে, তখন লক্ষ্য করিলে, তাহার অতীত জীবনের স্মৃতির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কথা কহিবার যন্ত্র তাহার বেশ সম্পূর্ণভাবে আছে, স্বীকার করিতে হয় বটে, কিন্তু, কি ভাবে, কেমন করিয়া, কোন্ দিক্ দিয়া, তাহা পরিচালিত করিতে হয়, তাহা তাহার অভ্যাস না থাকিলে, সে কেমন করিয়া, কেবলমাত্র শুনিয়া শুনিয়া, অনায়াসে কথা বলিতে শিক্ষা করে? যে সাঁতার কাটিতে জানে, সে জলে নামিলেই, কেমন করিয়া, কোন্ প্রণালীতে, সাঁতার কাটিতে হয়, সব তাহার মনে আসে, কিন্তু অন্য সময়, সন্তরণ-পটু সকল ব্যক্তি, অপরকে বুঝাইবার সময় ইহা বুঝাইয়া বলিতে পারে না, কারণ তখন, সে, সব ভুলিয়া গিয়াছে। আমাদের অভ্যাস বলিয়া জিনিসটা স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

হিন্দুরা সকলেই জন্মান্তরে বিশ্বাসী। সকলেই কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ মানিয়া থাকে; আত্মার অমরত্বে সকলেই বিশ্বাসী। কিন্তু আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দ্বৈত অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে বিশেষ মত-পার্থক্য আছে।

অদ্বৈতবাদী জীবাত্মার পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহার কাছে জীবত্ব একটী ক্ষণিক বিকাশ মাত্র। অদ্বৈত-মতে জীবের বস্তুগত বা পরিমাণগত সত্তা নাই। অদ্বৈতবাদীর সহিত শ্রীরামানুজ এবং শ্রীমদ্বের মতের প্রধান অনৈক্য এই বিষয়ে।

শঙ্করাচার্য্যের আত্মা বিশ্বব্যাপী, কিন্তু রামানুজ এবং মধ্বের মতে আত্মা অণুপরিমাণ। ব্রহ্মসূত্রের কতকগুলি সূত্রে জীবাত্মার অণুপরিমাণত্ব সূচনা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করের ভাষ্য এই যে, ইহা পূর্ব্ব পক্ষের মত। তাহা খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে, ইহা স্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য ভাষ্যকারেরা ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, বাদরায়ণ, তাঁহার নিজের সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন—জীবাত্মা যে অণুপরিমাণ, ইহা স্বয়ং বাদরায়ণেরই সিদ্ধান্ত। ডক্টর থিবো বেদান্তের উপক্রমণিকায় এ সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ়মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত সূত্রগুলির অর্থ শঙ্কর যাহা করিয়াছেন তাহা অতি কষ্ট কল্পনায় করা হইয়াছে, কারণ সূত্র-গুলির পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শঙ্করের ব্যাখ্যা কষ্ট কল্পনায় করা হইয়াছে বলিয়া প্রতি-পন্ন হয়।

আত্মাসকল যদি যথার্থ সত্তাবিশিষ্ট এবং অণু-পরিমাণ হয়, তাহা হইলে, কাজে কাজেই তাহারা যে অসংখ্য তাহাও স্বীকার করিতে হয়। শ্রীমদ্ধ বলেন, এই বিশ্বমধ্যে এমন কোন স্থান নাই বা পদার্থ নাই, যাহাতে জীব নাই। এই অসংখ্য চৈতন্যময় জীব পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট,

এবং জগতের জড়োপাদানের প্রকৃতি হইতে ইহাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আত্মাসকল শুধু যে জগতের জড়োপাদান হইতে পৃথক্ ও বিভিন্ন, তাহা নয়, ইহারা পরস্পর হইতেও পৃথক্ ও বিভিন্ন। কি খনিগর্ভ, কি উদ্ভিদ্‌রাজ্য, কি জীবরাজ্য, জীবের অসদ্ভাব কোন স্থানেই নাই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই জীব। সকল স্থান, সকল পদার্থই জীবময়।

মধ্বাচার্য্যের মতে পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষে যে কোন পদার্থই আছে, সে সমস্তই জীব শরীর ছাড়া আর কিছুই নহে। মধ্বাচার্য্য তাঁহার তত্ত্ব-নির্ণয়ে বলিয়াছেন, 'পরমাণুপ্রদেশেষনন্তাঃ প্রাণিনাশয়ঃ'; "এক অণুপরিমাণ স্থানে অনন্ত সংখ্যক জীব বাস করে।" তাঁহার 'অণুব্যাখ্যান' নামক পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন :—

গীতাংপুষ্পফলাবাপ্তিঃ স্পর্শাৎ কাশ্যং রসাৎ স্থিতিঃ।
অপি বৃক্ষস্য দৃশ্যন্তে ইতি নানাত্মতা ভবেৎ॥

"ফুল সকল এবং ফল সকল সঙ্গীতের সাড়া পাইয়া বিকসিত হয়; এমন অনেক গাছ আছে স্পর্শের দ্বারা সঙ্কুচিত হয়, কতক গুলি বা স্পর্শ করিলে সাড়া দেয়। সুতরাং এমন কোন জিনিস নাই যাহার আত্মা নাই।"

বৈজ্ঞানিক প্রবর ফ্রান্‌সিস্ ডারউইন, বৃক্ষতারও যে মস্তিষ্ক আছে, তাহার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কাপ্তেন মাস্‌গ্রেভ (Musgrave) একটী মাংসাশী গাছ দেখিয়াছিলেন; তিনি বলেন, গাছটীর মস্তিষ্ক ছিল, স্নায়ু (nervous system) এবং পাকাশয় (digestive organs) ছিল। আচার্য্য বসুর "Response in the living and non-living" নামক পুস্তক পাঠ করিলে, শ্রীমদ্ভের উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। আচার্য্য বসু মত প্রকাশ করিয়াছেন, জড় পদার্থ, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর বা কাষ্ঠের টুকরা প্রকৃতি যেগুলিকে পূর্ব্বে অচেতন বলিয়া ধরা হইত, তাহাদের কিছুই অচেতন নহে, সবই চৈতন্যময়, জীবনময়।

জীব-সংবিতের সাড়া সকল পদার্থ হইতেই পাওয়া যায়। তিনি অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র সহকারে প্রমাণ করিয়াছেন যে একটী লৌহদণ্ডে একটী জীব-শরীরের সমস্ত জীবন-কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। লৌহদণ্ডেরও নিদ্রা আছে, জাগরণ আছে, কার্য্য আছে এবং বিশ্রাম আছে; ইহা ঠিক যেন একটী জীব। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাকে আঘাত করিয়া মূর্চ্ছিত, বিষদ্বারা অভিভূত, এমন কি মৃত করাও যাইতে পারে। তিনি লণ্ডনের বৈজ্ঞানিক সভায়, ইহার বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং লর্ড কেল্‌ভিন্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদিগের সমক্ষে প্রমাণ করিয়াছেন।

আত্মার সম্বন্ধে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য মতের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রাচ্যেরা আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের আবশ্যকতাই বিবেচনা করেন না। পাশ্চাত্যেরা কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা তাঁহাদের দর্শনের মূল বিষয় বলিয়া মনে করেন। আত্মা না থাকিলে নীতি, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রভৃতির কিছুই মূল্য থাকে না। সুতরাং এই আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস অত্যন্ত ভীষণ ফলপ্রদ হওয়াই সম্ভব। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিয়াও নাস্তিক নামের কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু আত্মাতে বিশ্বাস না করিলে, কিছুতেই নিরাপদ নাই। যে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করে, সে প্রকারান্তরে কিছুই মানে না।

মানুষমাত্রেই আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, মানুষের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস কিছু নূতন ব্যাপারও নহে। মানুষের যে দিন মানবত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, সেই দিন হইতেই মানুষ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। যাহার সত্তা আছে তাহা কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না; আর যাহার সত্তা নাই, তাহার আবির্ভাব হইতে পারে না। একেবারে কিছুরই যে সত্তা নাই, ইহা ধারণায় আনিতে পারা যায় না। কিছু আছে এই ধারণার অপরিহার্য্যতা আত্মার

অস্তিত্ব প্রতিপাদনের সহায়তা করে। হিন্দুদিগের পক্ষে ইহা বুঝিয়া উঠা বিশেষ কঠিন নহে। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা জড় লইয়া এত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন যে জড়ের আকারে আত্মাকে দেখিতে না পাইলে তাঁহাদের তৃপ্তি হইতে পারে না। পাশ্চাত্যকে যদি আত্মার অস্তিত্ব মানিতে হয়, তাহা হইলে, আত্মা কোথায় থাকে, এবং কতটুকু স্থান অধিকার করে, ইহা তাঁহাকে বুঝিতে হয়। আত্মা যে দেশ এবং কালের অতীত, ইহা বোধগম্য না হইলে আত্মার সম্বন্ধে সকল ধারণা জড়াকারিত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ, অভ্যাস। কিন্তু জড়বদ্ধ বলিলে কি বুঝি? প্রকৃত দার্শনিক ভাবে দেখিতে গেলে ইহা মনের অনুভূতি উদ্রেকের কারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ জড় বলিতে যাহা ভাবা যায়, এমন কিছুর অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। আমরা সচরাচর জড় পদার্থ এবং মানস পদার্থের মধ্যে যে অনতিক্রম্য ব্যবধান বুঝিয়া থাকি তাহা আমাদের একান্ত ভ্রান্ত ধারণা।

যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে জড়জগৎ সম্বন্ধে কোনও প্রকার জ্ঞান অসম্ভব হইত। জড়জগত যে আমাদের জ্ঞানগম্য হয়, ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, পরস্পর অনতিক্রম্য ব্যবধানের একদিকে চৈতন্য এবং আর একদিকে জড়ত্ব-স্বরূপ দুই পৃথক্ জাতীয় পদার্থ থাকিতে পারে না। সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে হয় আত্মা, না হয় জড়, একটীই বিদ্যমান আছে। যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। পক্ষান্তরে যদি জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, অনুভূতি, জ্ঞান এবং স্মৃতির কেন্দ্র-স্বরূপ যে আত্মা, তাহা যে জড়পদার্থ-সম্ভূত, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান এবং স্মৃতি ত দূরের কথা, সাধারণ অনুভূতিও যে জড়সম্ভূত হইতে পারে না, পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। অনুভূতি ও জ্ঞান যে জড়সম্ভূত তাহা আজ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিতেও পারেন নাই। বিবর্ত্তনবাদীরা জল হইতে সর্ব্ব-প্রথম প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু প্রাণ মাত্রই যদি অনুভূতিসম্পন্ন বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে জল হইতে প্রাণের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আজকাল বৈজ্ঞানিক জগতে শক্তিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেই উপলক্ষে স্যর অলিভার লজ (Sir Oliver Lodge) প্রভৃতি মনীষিগণ আশা করিতেছেন যে বৈজ্ঞানিক রাজ্যেও জড়ত্বের প্রতিপত্তি আর বেশী দিন থাকিতেছে না; জড়শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তিকে অনেক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক এক পর্য্যায়ভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

জড়ত্বের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে, আত্মতত্ত্বের ঠিক মীমাংসা হইতে পারে না।

এখন দেখা যাক, আধুনিক মনস্তত্ত্ব কি প্রকারে কতটা জড়ত্বের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপক্রম করিয়াছে।

আমরা পদার্থ সকলকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকি। এক শ্রেণীর পদার্থ জীবন্ত, আর এক শ্রেণীর পদার্থ জড়। জড়পদার্থের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, তাহা গতিশীল বা ক্রিয়াশীল নহে। যে পদার্থ গতিশীল, তাহাকে সহজেই আমরা জীবন্ত মনে করি। যাহা চালাইয়া দিলে চলে, থামাইয়া দিলে থামে, তাহাই জড়। কিন্তু জড়জগতের প্রত্যেক পরমাণুর চাঞ্চল্য আছে। আমরা জড়ের চাঞ্চল্যের কারণ যখন জানিতে পারি না, তখন জড়কেও আমাদের চেতন বলিয়া মনে হয়। মানবত্বের শৈশবাবস্থায় মানব নদীর চাঞ্চল্য দেখিয়া নদীকে জীবন্ত বলিয়া মনে করিত, বায়ুর চাঞ্চল্য দেখিয়া বায়ুকেও চেতন বলিয়া মনে করিত। তখন মানুষের কাছে প্রকৃতি

চৈতন্যময়ী ছিল। ক্রমে যখন মানুষের মনে হইল, নদীকে কেহ চালাইতেছে, বায়ুকে কেহ বহাইতেছে, তখন নদীর দেবতা, বায়ুর দেবতার সম্বন্ধে মানুষেরই ধারণা হইল। আবার যখন মানুষের মনে হইল, একজন কেহই, সমগ্র জড়জগতের মূলে চৈতন্যময় আছেন বলিয়া জড়জগতের ক্রিয়া ও চাঞ্চল্য সম্পাদিত হইতেছে, তখন এক ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা মানব মনে উদিত হইল। মোটের উপর কথা এই যে, আমরা জড়ের গতি ও চাঞ্চল্য ধারণায় আনিতে পারি না। তখনও আনিতে পারিতাম না, এখনও যে আনিতে পারি তাহা নয়। বিজ্ঞানও শক্তির কল্পনা করিতে বাধ্য হয়। জগতে শক্তিরই কার্য্য চলিতেছে। জড়ের কোন কার্য্য থাকিতে পারে না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার 'Three Essays on Religion' নামক পুস্তকে বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের আপনার মধ্যে শক্তি আছে বলিয়াই, তাহার শক্তি সম্বন্ধে ধারণা হইয়াছে। মানুষের যদি আপনার মধ্যে শক্তি না থাকিত তাহা হইলে মানুষের শক্তির সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারিত না। প্লেটোর (Plato) মতে, আপনা আপনি গতি ও ক্রিয়াশীল যাহা তাহাই আত্মা (a self moving activity). প্লেটো ত্রিবিধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (১) মানুষের ভিতর এক প্রকার আত্মা আছে যাহার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। প্লেটো ইহাকে appetitive soue নামে অভিহিত করিয়াছেন; (২) আর এক প্রকার আত্মা আছে, তাহা ক্রোধন আত্মা, মানুষ তাহার প্রভাবে যুদ্ধ-প্রবৃত্ত হয়; (৩) মানুষের তৃতীয় প্রকার আত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মা; জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনাই তাহার কার্য্য। প্লেটোর মতে, শেষোক্ত এই শ্রেষ্ঠ আত্মাই অমর। ইতর জন্তুদিগের ভিতরে, এই তৃতীয় প্রকারের আত্মার অস্তিত্ব নাই, একমাত্র মানুষই ইহার অধিকারী।

পাশ্চাত্যদিগের ধারণা এই যে, একমাত্র মানুষই আত্মবান্। হিন্দুর মতে যে আত্মা মানুষের আছে, সেই আত্মাই সর্ব্বভূতে বিদ্যমান; পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, কেহই আত্মার অধিকার হইতে বঞ্চিত নয়। জড়জগতের মূলেও আত্মা আছে বলিয়াই জড়জগৎ প্রাণময়।

আত্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুর মাথা ঘামাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ হিন্দুর বিশ্বাস আত্মা অনাদি এবং আত্মাই বিশ্বের মূলীভূত কারণ। পাশ্চাত্যেরা কিন্তু আত্মার উৎপত্তিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকেন। জড়জগতের আলোচনাই পাশ্চাত্যদিগের প্রধান আলোচনা এবং জড়ত্বের ধারণা পাশ্চাত্যেরা কিছুতেই এড়াইতে পারে না।

মানুষের শরীরযন্ত্রের সমুদয় কার্য্যই মানুষের অজ্ঞাতসারে হইতেছে। মানুষ ইচ্ছা করিয়া, মতলব করিয়া তাহার কিছুই করে না। সুতরাং অনেকের মত এই যে, শরীর-যন্ত্রের কার্য্যের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা কোন এক organic principle এর দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। যদি এ organic principle এক জিনিস হয়, আর চিন্তা মনন ও বুদ্ধির কেন্দ্রস্বরূপ আত্মা আর এক জিনিস হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর জীবদিগের একেবারেই আত্মা না থাকা সম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর জীবদিগের ভিতরেও অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। বুঝলতারও যে অনুভূতি আছে, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। Organic principle ইতর প্রাণিশরীরের মত, মানব-শরীরেও কার্য্য করে। আবার অনুভূতি যেমন মানুষেরও আছে, ইতর প্রাণীদিগেরও তেমনি আছে। অনুভূতির মূলে, আমি অনুভব করিতেছি, এই জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বা self-consciousness বলে। আত্মজ্ঞান বা self-consciousness-বিরহিত জ্ঞানটা যে কি, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। যদি সেরূপ কোন জ্ঞান থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত জ্ঞানের নিম্নভূমিতে অবস্থিত বলিতে হইবে। বাক্-শক্তিসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে যেমন জীবজগতে মানবের মানবত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, তেমনই আত্মজ্ঞান বিকসিত হইবার পূর্ব্বে অনুভূতি বা জ্ঞানের যে অবস্থা ছিল, তাহাকে প্রকৃত অনুভূতি বা জ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু মানব যেমন মানবত্বের নিম্নভূমি হইতেই উত্থিত হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞান বা অনুভূতিও জ্ঞান বা অনুভূতির নিম্নভূমি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, অনেক বার্শনিক এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন।

জ্ঞানের নিম্নভূমি হইতে যদি জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলে জ্ঞান যে অজ্ঞানজাত ইহা স্বীকার করিতে হয়। হয়ত Organic principle-এর কার্য্য জ্ঞানের নিম্নভূমিস্থিত কোন principle এর কার্য্য। হয়ত এক সময়ে সমগ্র জীব জগতে এই Organic principee-এরই কার্য্য ছিল। Organic principle এর স্ফূর্ত্তির(development) কোনক্রমে অনুভূতির স্বরূপাত হয়, এবং অনুভূতির স্ফূর্ত্তির চরম অবস্থা মানবমন। প্রাচীন জড়বাদীরা জড়পদার্থসম্ভূত আত্মা স্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে যে জড়পরমাণুর সমবায়ে আত্মা গঠিত হইত তাহা সাধারণ জড়পরমাণু হইতে পৃথক। তাঁহাদের মতে যে সকল জড়পরমাণু দ্বারা আত্মা গঠিত হইত, তাহারা সাধারণ জড়মাণু হইতে সূক্ষ্মতর। এই সূক্ষ্মতর জড়পরমাণুপুঞ্জ মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া শরীরের ভিতর দিয়া বহির্জগতের যে সকল ঘাত প্রতিঘাত (impressions) মস্তিষ্ক মধ্যে সঞ্চালিত হইত, সেই সকল ঘাতপ্রতিঘাতে, দ্রুত স্পন্দন দ্বারা সাড়া দিত। জড়বাদীরা এখন আর সে মত পোষণ করেন না। এখনকার জড়বাদীরা আত্মাকে জড়-পরমাণুদ্বারা গঠিত বলিয়া মনে করেন না। এখনকার মত এই যে, মনঃ জিনিসটা, মস্তিষ্ক এবং সমগ্র দেহযন্ত্রের সমবেত কার্য্যের পারণামসম্ভূত।

একটা organic principle নিশ্চয়ই আছে। এই organic principle জড় শক্তিরই একটা আকার বিশেষ। সাধারণ জড়শক্তি কেমন করিয়া এই বিশেষ আকারে পরিণত হয় তাহা বলা যায় না। এই organic principle এর কার্য্য সমগ্র জীব-জগতের উপর। জীব-শরীর organic principle দ্বারা গঠিত হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং ইহা দ্বারা সমগ্র দেহযন্ত্রের যে কার্য্য হয়, সেই কার্য্যের পরিমাণের কোনও ক্রমে অনুভূতি সৃজাত হয়।

Conservation of energyর নিয়ম অনুসারে, এক প্রকার জড়শক্তি, প্রকারান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে। মস্তিষ্ক মধ্যে যে জড়শক্তির কার্য্য হয়, সেই জড়শক্তি কি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া অনুভূতিতে পরিণত হয়? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ শক্তির রূপান্তর গতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কোন মনস্তত্ত্ববিৎ অনুভূতিকে গতিক্রিয়া মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, আমাদের মনেরই অনুভূতি ঘনীভূত হইয়া বাহ্য-জগতে পরিণত হয়। বাহ্য জগতের যে মন হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাহার কোনও প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। জড়বাদীরা তাঁহাদের মনেরই অনুভূতিসঞ্জাত বাহ্যজগৎকে, তাঁহাদের মন হইতে যে স্বতন্ত্র কিছু বলিয়া মনে করেন, তাহাও তাঁহাদের মনের কার্য্য। মস্তিষ্ক ইউক আর সমগ্র শরীরই ইউক, সকলই মনের অনুভূতিজাত। মন হইতে কিছুতেই ইহাদিগকে পৃথক্ করা যায় না। আমাদের মনেরই অনুভূতি দ্বারা যাহা গঠিত, তাহা দ্বারা আমাদের মনের গঠন বিবেচনা করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যদি আমাদের মন না থাকিত, তাহা হইলে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারিত না। বাহ্যজগৎ অনুভূত না হইলে, তাহা আছে কি না তাহা কে জানিত? আমাদের

মনের দ্বারা বাহ্যজগৎ প্রতিষ্ঠিত, বাহ্যজগতের দ্বারা আমাদের মন প্রতিষ্ঠিত নহে।

বাহ্যজগৎ আছে, ইহা আমরা কেমন করিয়া জানি? আমাদের অনুভব হয় বলিয়াই জানি। তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের অনুভূতির কারণ যাহা, তাহাই বাহ্য জগৎ। বাহ্যজগৎ যে আছে, এই ধারণা, আমরা ইচ্ছা করি আর নাই করি, আমাদের হয়। যদি আমরা ইচ্ছা করিয়া বাহ্যজগতের ধারণায় উপনীত হইতাম, তাহা হইলে বাহ্যজগতের যে অংশটা দুঃখপ্রদ, তাহা কখনই আমাদের ধারণায় আনিতাম না। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে ধারণায় আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক উপনীত হই না, বরং বাধ্য হইয়াই উপনীত হই। সুতরাং মানিতে হইবে যে আমাদের মন ছাড়া আরও কিছু আছে। আমাদের মনের অতীত নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে, যাহা আমাদিগকে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধীয় ধারণায় উপনীত হইতে বাধ্য করে। সে যাহাই হউক, বাহ্যজগৎটা আমাদের মনের অনুভূতি-সঞ্জাত, তবে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধীয় আমাদের মনের অনুভূতি-সঞ্জাত হইবার কোন কারণ আছে। আমাদের বুঝিতে বাধ্য হইতে হয় যে, আমাদের মনের বাহিরে এমন কোন শক্তি আছে, যাহা আমাদিগকে কোন না কোন প্রকার অনুভব করিতে বাধ্য করে। কিন্তু যে শক্তির দ্বারা আমাদের অনুভূতিসঞ্জাত হয়, তাহা যে জড়শক্তি, এরূপ কল্পনা করিবার কারণ কি? যখন আমি বুঝিতেছি যে, এমন কোন শক্তি আছে যাহা আমাকে অনুভব করিতে বাধ্য করিতেছে, তখন সেই শক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে, আমিও আছি, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমি আছি বলিয়াই, আমি অনুভব করিতেছি, এবং আমি আছি বলিয়াই আমার অনুভূতি-সঞ্জাত করিবার শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করিতেছি। আমার বাহিরে যে কোন শক্তি আছে, ইহা আমার মনেরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমার একথা বলিবার কোনই অধিকার নাই যে, আমি নাই, অথচ সেই শক্তি আছে। আমি না থাকিলে, অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব আমার নিকট সপ্রমাণিত হইতে পারে না। যদি বলা যায়, আমা হইতে অতিরিক্ত যে শক্তি আমার মনের অনুভূতির কারণ রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস, সেই শক্তি আমারও উৎপত্তির কারণ। তাহা হইলে তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে, তাহা হইতে পারে, কিন্তু তাহা বুঝিবার বা তাহা আমার নিকট সপ্রাণিত হইবার কোন উপায় নাই। যাহা আমার বুঝিবার বা আমার নিকট সপ্রমাণিত হইবার কোন উপায় নাই, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া ধরা যায় না। অধিকন্তু তাহা কল্পনামাত্র, কোন যুক্তি নহে। আমরা কোন সত্য বুঝিবার জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করি, সে সকল যুক্তি আমাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার সহায় ছাড়া আর কিছুই নহে। সত্যের সহিত আমার মনের বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে যুক্তি মানব মনে কোন সত্য সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে না, তাহা যুক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সত্যের সহিত মনের বিশ্বাসের সম্বন্ধ আছে। যেখানে বিশ্বাস সঞ্জাত হয়, তাহাই আত্মা।

জড়বাদীদিগের বিশ্বাস যে জড়পদার্থ আছে। তাহাদের মনে জড়পদার্থ সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপন্ন না হইলে, তাঁহারা কখনই জড়ের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারিতেন না। জড়পদার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস উৎপাদনের সহায়রূপ, বিশেষ প্রকার যুক্তির সহায়তায়, তাঁহারা সেই বিশ্বাসে উপনীত হন, অথচ তাঁহাদের সেই বিশ্বাসের আশ্রয়-স্বরূপ তাঁহাদের যে মন, সেই মনের পারমার্থিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান। তাঁহারা যাহার সাহায্যে এবং যাহার ভিত্তির উপর জড়জগতের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহারই অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন না। সুতরাং তাঁহারা যে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন, সেই যুক্তির কোনও মূল্য নাই।

আধুনিক পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপক্রম করিতেছে, আমাদের উপনিষদের ঋষিরা বহুকাল পূর্ব্বে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। উপনিষদের ঋষিরা বলেন যে, আত্মার দ্বারাই সব প্রতিষ্ঠিত হয়, আত্মা অন্য কোন কিছুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহেন। আত্মাই যে, সকলের মূল, আত্মার মূলে যে আর কিছুই নাই, ইহাই মনস্তত্ত্বের চরম গবেষণার ফল।

পাহাড়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদার]

পাহাড়ীদের খেলাধূলা।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পাহাড়ীদের মেয়ে পুরুষে, ছেলে বুড়ায় সকলেই উপার্জ্জনের জন্য শ্রমসাধ্য কার্য্য করে, সুতরাং কেবল অলস আমোদ আহ্লাদের জন্য কোনরূপ খেলা ধূলায় কালক্ষেপ করিবার অবকাশ তাহাদের নাই। তবে যদি কখন অবকাশ পায়, তাহা হইলে ছোট ছেলেরা দুই এক রকম ক্রীড়া কৌতুক করে। শারীরিক ব্যায়ামের জন্য নোনাকোট, কুস্তি, জিমনাষ্টিক প্রভৃতির ন্যায় কোনরূপ খেলা তাহাদের নাই। কুস্তির জন্য ভাল নিষ্কর মাটী এবং খালি গা এই দুইটী জিনিষ অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে প্রথমটী তাহাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্দ্দান্ত শীতের উপদ্রবে দ্বিতীয়টী অসম্ভব; সুতরাং সে সকল খেলার সৃষ্টিও তাহাদের দেশে হয় নাই এবং এ সকল খেলা তাহারা খেলেও না। তাহারা বলে যে ব্যায়াম হিসাবে তাহাদের স্বতন্ত্র খেলার প্রয়োজন নাই, 'চোঙ্গা'ই তাহাদের ব্যায়াম। সে দেশে পাথরের নাম 'চোঙ্গা'। চোঙ্গা ভাঙ্গিতে, চোঙ্গা বহিতে সমস্ত দিন যে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম হয়, ব্যায়ামের জন্য তাহাই যথেষ্ট এবং সেই পরিশ্রমের পর আর ব্যায়াম করিতে ভালও লাগে না। যে দেশে নদী বা পুষ্করিণী নাই সে দেশের লোকের পক্ষে সন্তরণ কল্পনার সামগ্রী, সুতরাং পাহাড়ীদের জল ক্রীড়াও নাই। কোন কোন স্থানে লাঠি খেলা আছে বটে, কিন্তু সে খেলা ছেলেখেলার মত। তাহার নাম 'ডাণ্ডি বিওথ'। লাঠি খেলার আখড়া নাই, ওস্তাদ শিক্ষক নাই, অগত্যা নিম্ন বঙ্গের হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালীদের মত লাঠিয়াল বা খেলোয়াড় পাহাড়ীদের মধ্যে নাই। পঞ্জাব ও রাজপুতানার অধিবাসীদের যেমন তরবারি নিত্য সহচর, পাহাড়ীদের তেমনই নিত্য সহচর খুক্‌রি; কিন্তু পাঞ্জাবীও রাজপুতগণ তরবারির নানারূপ খেলা ও সঞ্চালন কৌশল শিক্ষা করে। সে শিক্ষা ও অভ্যাস তাহাদের একটা খেলার মধ্যে গণ্য। পাহাড়ীদের মধ্যে সে খেলাও নাই। এটা অবশ্য যে তাহাদের লজ্জা ও কলঙ্কের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ, নাই। কপাটি খেলা কোন কোন স্থানে আছে তাহার নাম "হাই গুড় গুটি।"

কারসিয়েং খৃষ্টান মিসনারিদিগের দ্বারা পরিচালিত একটী প্রাইমারি স্কুল আছে, ঐ স্কুলের সম্মুখে রেল রাস্তার পার্শ্বেই একজোড়া প্যারালেল বার পোতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা দার্জ্জিলিং গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ সে বার লক্ষ্য করিয়াছেন কি না জানি না। বর্ত্তমান শিক্ষা বিভাগের আইন কানুন অনুসারে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ওটা একটা অঙ্গ বিশেষ। সেই আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বার জোড়াটীকে নামে মাত্র সাক্ষীগোপাল স্বরূপ খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে কি না তাহাও ঠিক বলা যায় না, কারণ আমার সুদীর্ঘ প্রবাস কালের মধ্যে আমি কতদিন কত সময় সেই স্থান দিয়া যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু কোনদিন কাহাকেও সেই বারের সদ্ব্যবহার করিতে দেখি নাই। সম্ভবতঃ সময় বিশেষে ছাত্রদিগকে বারের খেলা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু সে খেলা তাহাদের জাতীয় খেলার মধ্যে গণ্য হইতে পারে

না। ভদ্ভিন্ন পাহাড় অঞ্চলের অন্য কোন স্থানে জিমনাষ্টিকের সরঞ্জাম দেখি নাই অথবা জিমনাষ্টিকের নামটী পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনি নাই।

নব্য সম্প্রদায়ের পাহাড়ীরা অনেকেই আজকাল ফুটবল এবং হকি খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। খেলার কৌশল যত না শিখুক লাথির বহরটা ফুটবল খেলার সময় খুব জমকাল রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা প্রতিযোগিতায় তাহাদের সঙ্গে সাধ্যপক্ষে খেলিতে সম্মত হয় না। পাহাড়ীদের এই ফুটবল এবং হকি খেলা, বাঙ্গালীদের মত সাহেবদের অনুকরণের ফল। ইহা তাহাদের জাতীয় খেলা নয়।

মার্ব্বেল লইয়া পাহাড়ী বালকদিগকে গুলি খেলিতে দেখা যায়। সে খেলাটা তাহাদের মধ্যে কতদিন প্রবেশ করিয়াছে ঠিক করিয়া বলা যায় না।

গুলি খেলারই মত আর একটী খেলা আছে; সে খেলার নিয়ম মার্ব্বেল খেলারই মত, তবে মার্ব্বেল তাহার ক্রীড়নক নহে। ছোট ছোট লোহার চাক্তি লইয়া সে খেলা হইয়া থাকে। দুই বা ততোধিক বালক একত্র হইয়া এক সঙ্গে সে খেলা খেলিতে পারে। মার্ব্বেল খেলার মত এ খেলাতেও একটী গাবু কাটিতে হয়। গাবু লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেকেই এক একখানি চাক্তি নিক্ষেপ করে। যাহার চাক্তি গাবুর খুব নিকটে পড়ে সে আগে মারিবে। একখানি অপেক্ষাকৃত বড় চাক্তি লইয়া অপর পক্ষ যে চাক্তিখানি দেখাইয়া দিবে গাবুর কিঞ্চিৎ দূরে একটা চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া সেইখানিকে খেলোয়াড়কে মারিতে হইবে। মারিতে পারিলে সমুদায় চাক্তিগুলি সে জিতিয়া লইবে। কলিকাতা সহরের পথে ঘাটেও এ খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় ইহার নাম কি জানিনা; পাহাড়ীরা ইহাকে 'জুয়া' খেলা বলে। অর্থঘটিত লাভ লোকসান প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও যাহা লইয়া খেলা করে, তাহার লাভ লোকসান আছে এই জন্য এ খেলার নাম 'জুয়া' এবং এই হিসাবে কখনও কখন তাহারা পয়সা, কড়ি এবং মার্ব্বেল লইয়া ও জুয়া খেলে। গিলে লইয়া বিচ্ছু খেলাও পাহাড়ীদের মধ্যে আছে; তাহার নাম 'আঙ্গল কুট।'

এ সকল খেলা অন্য দেশে ও আছে; সুতরাং পাহাড়ী খেলা বলিয়া তাহাদের বিশেষত্ব কিছু নাই। তবে একটী খেলা তাহারা খেলে, যাহা অন্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তাহাকে খাঁটি পাহাড়ী খেলা বলা যাইতে পারে। একটী বৃহদাকারের গাঁদা ফুল উপর দিকে ছুড়িয়া দেয়। পড়িবার সময় মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই পায়ের চাটুর তলদেশ দিয়া এমন জোরে আঘাত করে যে, সেই ফুল আবার উপরে উঠিয়া যায়। লক্ষ্য ভ্রংশ হইয়া সেই ফুল যতক্ষণ মাটিতে না পড়ে, ততক্ষণ পদাঘাতে ফুলের উত্থান ও পতন অবিরাম গতিতে শূন্য মার্গেই চলিতে থাকে। ফুল মাটিতে পড়িয়া গেলে অপর এক জন সেই ফুলটীকে লইয়া সেই ভাবে ক্রীড়া করে। কতক্ষণ খেলা হইবে তাহার কিছু বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই, খেলা ভাঙ্গিবার সময় পর্য্যন্ত ঐ নিয়মে ফুলে যে গণনায় অধিকবার পদাঘাত করিয়াছে তাহার জয়, অন্তের পরাজয় ধার্য্য হয়। পাহাড়ী ভাষায় ঐ খেলার নাম 'থৈবি।'

মেয়েদের খেলা স্বতন্ত্র। বাঙ্গালী মেয়েদের মত পাহাড়ীরা ঘুটিম খেলে। সে খেলার নাম 'গড্ডা।'

পাহাড়ী মেয়েরা বাঙ্গালী মেয়েদের মত 'বৌ বাটি' খেলা করে। পার্থক্য এই যে বাঙ্গালীর মেয়েরা কেহ বর, কেহ বৌ, কেহ শাশুড়ী, কেহ রাঁধুনি, কেহ বা বি সাজিয়া কোন এক গৃহস্থ অন্তঃপুরের দৈনন্দিন গৃহস্থালি ব্যাপারের অভিনয় করে। পাহাড়ীরা দম্পতি যুগল সাজিয়া সাহেবদের বিবাহ-বাসর 'হনিমুনের' মত যুগলে যুগলে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঘুরিতে ফিরিতে যায়। একজন পাচিকা সাজিয়া ঘরেই থাকে। সে ঘাস, পাতা, কাঁকর, কাদা, ধুলা মাটী ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া খেলা ঘরের উপযোগি বিবিধ প্রকারের চর্ব্বা, চুষ্য, লেহ্য, পেয় সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। দম্পতী যুগলেরা প্রত্যাবর্ত্তনান্তে পরিতোষ সহকারে সেই সকল আয়োজনের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া খেলা সাঙ্গ করে। এই খেলার নাম 'বিয়া খেলা।'

পাহাড়ী মেয়েদের আর একটী খেলার নাম 'খেযে রাণী।' বাল্যকালে পল্লীগ্রামে আমরাও সে খেলা খেলিয়াছি। আমাদের খেলার নাম ছিল 'চোরবন্দী'। এই খেলায় অনেকগুলি বালক বালিকা একত্রে পরস্পর হাত ধরা ধরি করিয়া বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া থাকে। একজনকে সেই বৃত্তাকার বেষ্টনীর মধ্যে রাখা হয়। সে যেন চোর তাহাকে বন্দীশালায় আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। প্রহরীরা সুদৃঢ় বেষ্টনে তাহাকে আটক করিয়াছে। বন্দী সেই কারাগারের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া বলপূর্ব্বক মুক্ত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। পাশা পাশি দুইজনের দুই হস্তের অঙ্গুলির পরস্পর দৃঢ় সংবদ্ধ সন্ধিস্থল যেন কারাগারের এক একটী দরজা বা জানালা। বন্দী ভিতর দিক হইতে প্রত্যেক সন্ধিতে করাঘাত করিয়া মুখে বলে "এই দুয়ারটা কাট্‌ব," প্রহরীরা একযোগে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলে, "ঝাঁটা ফেলে মারব"। দ্বিতীয় দরজায় গিয়া পুনরায় বলে "এই দুয়ারটা কাট্‌ব," প্রহরীরা পূর্ব্ববৎ বলে, "কাদা ফেলে মার্‌ব," ইত্যাদি ক্রমে বন্দী একে একে সকল দরজায় তাহার বলের পরীক্ষা করিয়া যদি কোনটী ভাঙ্গিতে না পারে, তখন ছলে কেটেলে যেরূপে হউক পলায়ন করে। বন্দী পলায়ন করিলেই খেলার সে পালা সাঙ্গ হয়। পাহাড়ীদের খেলার রকম ঐ একই; তবে ভাবটা স্বতন্ত্র। তাহাদের বন্দী পলায়নের চেষ্টায় বলপ্রয়োগ থাকে; না বন্দীরা মিনতি সহকারে প্রহরীদের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। তাহাদের বন্দীর বুলি "এত্তে পানি" প্রহরীদের বুলি "যে যে রাণী।"

দরজার নিকট গিয়া বন্দী বলে, "দৈনা কব্বো", প্রহরী বলে "রাজা কো"। বন্দী, "রাজা কাঁহা", প্রহরী "মাটো ভয়ো"। বন্দী,—"মাটো ফোঁহা,; প্রহরী,—"আস্‌মান্ ভয়ো"। বন্দী,—"আসমান্ কাঁহা" ; প্রহরী,—"ছে ই-ই-না"। দ্বিতীয় দরজায় গিয়া পুনরায় বলে, "বৈলা কব্বো" ; "বিরালুকো" ; "বিরালু কাঁহা" ; "মাটো ভয়ো"। "মাটো কাঁহা" ; "আস্‌মান্ ভয়ো"। "আস্‌মান্ কাঁহা" ; "ছে ই-ই-না"। ইত্যাদি ক্রমে সকল দরজা গুয়িয়া যখন প্রার্থনা নিষ্ফল হয়, তখন ছলে কৌশলে পলায়ন করিলে পালা সাঙ্গ হয়।

আর এক খেলার নাম 'চোর চোর' খেলা। এ খেলায় একজন বুড়ি হয়, একজন চোর হয়। অবশিষ্ট বালক বালিকারা কেহ বা লুকাইয়া থাকে, কেহ বা খেলা দিয়া বেড়ায়। বুড়ীকে ছুঁইবার পূর্ব্বে চোর যাহার গাত্র স্পর্শ করিবে তাহাকে পুনরায় চোর হইতে হইবে। এ খেলায় খেলার প্রারম্ভে এক জনকে চোর বলিয়া নির্ব্বাচিত করা হয়। তাহার পর চোর যাহাকে ছুঁইবে সেই চোর। বাঙ্গালীদের "আঙ্গুল মটকা ঝিঙ্গের ফুল" খেলার মত এই খেলা।

দ্বিতীয় প্রকার 'চোর চোর' খেলায় চোর নির্ব্বাচিত হয় না। খেলওয়াড়িদিগকে সারি গাঁথিয়া দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের সংখ্যা দ্বাদশের অধিক হইলে চলিবে না; ন্যূন হইলে ক্ষতি নাই। তাহাদের মধ্যে একজন বলে,—অম্বল, ডম্বল, খৈরে, পা, দশ, শাল, কুটি, মহাদেব, কুকুর, কাটি, রাজা, ডুম্। ইহার এক একটি কথা পর পর বলে এবং পর পর এক এক জনের বুকে হাত দিয়া যায়। ডুম্ এই শেষ কথাটী উচ্চারণের সময় যাহার বুকে হাত পড়িবে সেই হইবে চোর এবং যে গণনা করিল সে হইবে বুড়ি। এই চোর খেলার নাম 'অম্বল ডম্বল'।

ইহাদের আর এক রকম খেলা আছে তাহার নাম 'টুরি' খেলা। দুইটী বালক বা বালিকা পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আর কতকগুলি বালক বালিকা সমুখস্থিত খেলুড়ির পিছন দিকে কোমরের কাপড় ধরিয়া পর পর সারি দিয়া দাঁড়ায়। যেন এক

খানি রেল গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। যাহারা রেল গাড়ী হইয়াছে তাহারা মুখে বলে—

এক মানা তেলকো দুই মানা তেল।
দুই মানা তেলকো শয়ে শেল॥
বগম পাতি টুরি খেল।
শিলগুড়িমে নেহি রেল—হট্টো॥

এই বলিয়া যে দুইজন পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহাদিগকে ধাক্কা মারিয়া পথ খোলসা করিয়া চলিয়া যায়।

আর একটি খেলার নাম 'বসুন্দারি বৈরি' খেলা। অনেকগুলি বালক বালিকা সারি গাঁথিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। একজন তাহাদের প্রত্যেককে একে একে কাঁধে হাত দিয়া বসাইয়া দেয়। বসাইবার বুলি এই :—

বসো বসো দে বসুন্দারি বৈরি
ঘিউ খানে ডারু ডারু খানে
পঞ্চারাণী পাপী খেলে
খেলো বসি জংলা

সকলে বসিলে পর আবার তাহাদিগকে একে একে উঠাইয়া দাঁড় করান হয়। দাঁড় করানর বুলি এই :—

উঠে দে উঠ দে উঠন্দারি বৈরি
ঘিউ খানে ডারু ডারু খানে
পঞ্চারাণী পাপী খেলে
খেলো উঠ জংলা

উঠিবার পর যে খেলা আরম্ভ হয়, সে খেলা "ঘে ঘে রাণীর" রূপান্তর মাত্র।

সাহেবদের মেয়েরা যেমন এক গাছি দড়ি লইয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া একটু লাফাইয়া পায়ের তলা দিয়া লইয়া যায় এবং যে খেলাকে তাহারা Rope dancing বা Skipping বলে, পাহাড়ী মেয়েরা সে খেলাও খেলে। এ খেলার নাম 'চিবে নিবে'। সম্ভবতঃ এটা সাহেবদেরই অনুকরণ।

তাস লুডো প্রভৃতি আধুনিক খেলা এবং হারমনিয়ম প্রভৃতি বাজনা বাজান পাহাড়ীরা শিখিয়াছে।

নাচ গান :—পাহাড়ী মেয়েরা নাচ গানের বড় প্রিয়। তিন চারিটী মেয়ে একত্র হইলেই পথে ঘাটে যেখানে সুবিধা পায়, সেই খানেই নাচ গান আরম্ভ করিয়া দেয়। মোট বহিতে বহিতে পথের মাঝে মোট নামাইয়া হাঁপ জিরানর জন্য কিছুকাল নাচ গান করিয়া লয়। পাহাড়ী ভাষা যে জানে না, সে গানের অর্থ বোধ করিতে পারে না বটে, কিন্তু গানের সুরে তাহাকে মোহিত হইতে হয়। একা একা গায়িলে সে গানের ততটা মাধুর্য্য থাকে না। কিন্তু সকলে সমস্বরে গায়িলে বড়ই মধুর লাগে।

পাহাড়ীদের স্নান :—স্নান করার দিক দিয়া দেখিতে গেলে পাহাড়ীদিগকে জগন্নাথ দেবের এক একটী অবতার বলিলেও চলে। অবশ্য সে জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া চলে না; কারণ দুর্দ্দান্ত শীতের দেশে পাহাড়ীরা যে বাঙ্গালা দেশের লোকের মত স্নান করিবে না তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। স্নানের অনুতার কারণ একমাত্র জলাভাব নয়। কতকটা কারণ শীতের প্রকোপ, কতকটা কারণ সময়াভাব এবং স্নানান্তে ভিজা কাপড় শুকাইবার রৌদ্রাভাব। সূর্য্যদেবকে সে দেশে এক প্রকার অস্পৃশ্যরূপ বলিলেও বলা চলে। পাহাড়ী রমণীরা অন্তঃপুরচারিণী নয়, কিন্তু তাহাদের দেশের তপন দেব প্রায়ই অন্তঃপুরে থাকেন।

বাঙ্গালীর মত পাহাড়ীরা তেল মাখে না, সাবান ব্যবহার করে। গায়ের কাপড় না খুলিয়া যে যে অঙ্গের স্নান হওয়া সম্ভব, সেই সেই অঙ্গের স্নান হয়। মেয়েরা বরং স্নান করে, পুরুষেরা স্নান খুব কমই করে।

অধিকাংশ পাহাড়ী এক সপ্তাহ অন্তর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে। সেই এক সপ্তাহ তাহারা এক পরিচ্ছদেই থাকে। প্রতি রবিবার সাবান দিয়া কাপড় কাচে, সেইদিন পরিচ্ছদ বদলায়। রজকের সঙ্গে তাহারা

কোন সম্বন্ধ প্রায় রাখে না। কাপড় সাবান মাখাইয়া সে কাপড় তুলিয়া আছাড় মারে না। ছাদ পেটান পিটনার মত কাঠের ছোট ছোট পিটনা দ্বারা সেই কাপড়ে আঘাত করে।

দুগ্ধ ভাণ্ড—দুধের জন্য পাহাড়ীরা 'কেঁড়ে' বা কলসী ব্যবহার করে না। বড় বড় বাঁশের বা টানের চোঙ্গায় রাখিয়া দুধ বহন করে। বাঁশের চোঙ্গা এক একটা এত লম্বা এবং এত মোটা হয় যে, একটা চোঙ্গায় আধমণ পর্য্যন্ত দুধ ধরিতে পারে। দূর পথে দুধ লইয়া যাইতে হইলে সেই রূপ দুইটী চোঙ্গা দড়ি বাঁধিয়া কাঁধের উপর দিয়া দুই দিকে ঝুলাইয়া লইয়া যায়। অধিক দূরে অধিক পরিমাণ দুধ লইয়া যাইতে হইলে ঘোড়ার পিঠে ছালার মত চাপাইয়া লইয়া যায়। ঐ চোঙ্গার নাম 'বোঙ্গা' কোন কোন স্থানে 'বোঙ্গা' জল পাত্রের কার্য্যও করে। একজন এ দেশীয় ভারি এক ভারে দুই কলসীতে যে পরিমাণ জল বহন করে, পাহাড়ীরা একটা বোঙ্গায় সেই পরিমাণ জল লইয়া পাহাড়ের উপর উঠে।

(ক্রমশঃ)

তুমি ও আমি

(গান)

[শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এল]

তুমি আপন হ'য়ে, কেন কর্‌ছ মোরে পর ?
ওহে হৃদয় রাজ, প্রভু প্রেমিক বর !
তব স্নেহ পুরিত,
মম হৃদয় শোণিত ;
তব অনিল সলিল, মম জীবন পালন-পর।
তব আলোক দীপ্ত,
মম নয়ন সুপ্ত,
দূর করে দাও আঁধির জড়তা হে রাজরাজেশ্বর।

ভুলের মূল্য

(গল্প)

(শ্রীআশুতোষ সান্যাল)

সে দিন রবিবার। আমাদের সাহিত্য সভার মাসিক অধিবেশনে আমার ছিল প্রবন্ধ পড়বার পালা। ছুটীর দিন, বাড়ীতে বিশেষ কাজ কর্ম্ম না থাকায়, সকালে উঠেই বন্ধুবর ফণী রায়ের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেম। বন্ধুবরের চায়ের মজলিস তখন ভরপুর। বেলা বারটা পর্য্যন্ত সেখানে দেশ-বিদেশের আবশ্যক, অনাবশ্যক নানা বিষয়ের আলোচনা এবং বাটী কয়েক চায়ের সদ্ব্যবহার করে, বাড়ী ফিরে খাওয়া দাওয়া সার্‌তে ছুটো বেজে গেল।

সন্ধ্যা ৭টায় সভা। দুপুরে ঘুমব না স্থির করে, দাদার ছেলেটাকে, আর খবরের কাগজখানা নিয়ে

বৈঠকখানার ফরাসের ওপর কাত হলাম। খোকা তার দার্শনিক নানা প্রশ্নে খানিকক্ষণ আমাকে ব্যস্ত রাখ্‌ল বটে, কিন্তু শীঘ্রই কাপুরুষের মত রণে ভঙ্গ দিয়া সে নিদ্রাদেবীর আশ্রয় নিল। খোকাকে পরাজিত করে সংবাদপত্র নিয়ে পড়লাম। কিন্তু ছাপার হরপগুলো আমার চোখে ক্ষুদ্রতর হয়ে এসে, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা ঠিক বল্‌তে পারি না—জেগে দেখলাম ছটা বাজে। সর্ব্বনাশ! সাতটায় মিটিং। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। বড় রাস্তার মোড়ে এসে দেখলাম ঘড়ীতে সাড়ে ছটা। ট্রামের জন্য উৎসুক হয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছি, পাশ থেকে একটা লোক আমার গায়ের ওপর পড়বার মত উপক্রম দেখে বললাম "কি হে, ঘাড়ের ওপর পড়্‌বে না কি? দেখ্‌তে পাচ্ছনা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে!" লোকটা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, আর্ত্ত করুণস্বরে বল্‌ল—"দেখতে যদি পাব দাদা, তবে আর মানুষের ঘাড়েই বা পড়্‌ব কেন! ভগবান মেরেছেন কি করব। মাপ কর দাদা!" অন্ধ লোকটাকে রূঢ় কথা বল্‌লাম ভেবে, কোমল স্বরে বল্‌লাম, "না না, তোমার কোন্ দোষ নেই—আমি বুঝতে পারিনি মাপ কর। কিন্তু—দেখ্‌তে পাওনা, একলা এমন সময় রাস্তায় বেরিয়েছ কেন?"

"দুধের জোগান আছে দাদা—দিতে গিয়ে ছিলাম! ফির্‌তে দেরী হয়ে গেল, বর্ষার দিন বড় শীগ্‌গীর আঁধার হয়ে পড়েছে।"

"দিনে কি দেখ্‌তে পাও।"

"হাঁ তা পাই। সন্ধ্যের পর একেবারে দৃষ্টি থাকে না—কিছুই দেখ্‌তে পাই না। আন্দাজ করতে করতে আস্‌ছি।"

লোকটা গোয়ালা হাতে একটা খালি দুধের ঘড়া ছিল। সমবেদনায় মনটা বড়ই ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। জিজ্ঞাসা করলাম, "কতদূর যাবে?"

"আর এসে পড়েছি, এটা ত' হেদোর মোড়, ঐ মোড়টায় যাব। মাণিকতলার গলিতে আমাদের বাড়ী। যদি—দয়া করে মাণিকতলার মোড়টায় পৌঁছে দেন বড়—উপকার করেন।"

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, সাতটা বাজতে মিনিট দশবার দেরী। কিন্তু অনুরোধ এড়াতে পার্‌লাম না, হাত ধরে তাকে মাণিকতলার মোড় পর্য্যন্ত এনে বললাম, "এখন যেতে পারবে?"

মোড়ের বাড়ীটার গায়ে হাত দিয়ে সে বল্‌ল "হাঁ—আর ভয় নেই,—এ পথে গাড়ী ঘোড়া বড় একটা আসে না—ঠিক যেতে পার্‌ব। আর দশ পা গেলেই—আমাদের গলি, এই বলরাম দের ষ্টীট্‌টা পেরুলেই—বাড়ী গেলাম। বড় উপকার কর্‌লে দাদা, দয়া—ভগবান তোমার ভাল করবেন।

বিনা খরচে একটা লোকের উপকার কর্‌তে পেরে আমারও মনটা যে প্রফুল্ল না হয়েছিল তা নয়। তবে মিটিংয়ের সময় হয়ে গিয়েছে, প্রথম ট্রামখানায় যেতে পারলে তবু হয় ত পৌঁছুতে পারব। কাজেই আর বিলম্ব কর্‌তে পার্‌লাম না। মুখের কথা একবার বল্‌লাম, "দেখে, যেতে পার্‌বে ত'—নইলে তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত না হয় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না-না বাবু। আর কষ্ট করতে হবে না। এ পথে আমি জন্মে অবধি চল্‌ছি। ঠিক যেতে পার্‌ব।"

বেশী অনুরোধ বা উপকার কর্‌বার তখন সময় ছিল না—দূরে ট্রাম আস্‌ছিল। লোকটার হাত ছেড়ে দিয়ে, রাস্তার অপর দিকে অগ্রসর হ'লাম। রাস্তার মাঝামাঝি এসেছি। হঠাৎ পেছনে; "ভোঁ—ভোঁ—হট্‌যাও—গেল, গেল—হায় হায়" প্রভৃতির একটা মিলিত কলরব শুনে পেছন ফিরে দেখ্‌লাম, একটা লোক মোটর চাপা পড়েছে, তারই চারিদিকে লোক জমে গিয়েছে, এবং তারা মোটর চালক এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধনী—বড় মানুষ মনিবদের গাল দিচ্ছে। আমার তখন আর ফিরে দেখ্‌বার সময় ছিল না,

বিশেষ মোটর চাপা আজকাল কল্‌কাতার দৈনন্দিন ব্যাপার। ট্রাম আস্‌ছে দেখে তাড়াতাড়ি ছুপা যেতেই আমার মনে হ'ল,—সেই রাতকাণা লোকটা চাপা পড়ল না ত'—আহা! আর এগুতে পার্‌লাম না। দ্রুত পদে ঘটনাস্থলে এসে যা দেখ্‌লাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল। সেই হতভাগ্যই মোটরের ধাক্কায়, অচেতন হয়ে রক্তাক্ত দেহে রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে। আর চারিদিকের লোকেরা 'আহা' 'আহা' কর্‌ছে। তাড়াতাড়ি তাকে মোটরে তুলে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার পরীক্ষা করে বল্‌লেন—'মাথায় লেগেছে। কেশ খারাপ!' কথাটা শুনে আমার প্রাণটা অব্যক্ত বেদনায় টন্ টন্ করে উঠ্‌ল। মনে হল, আমারই অবহেলায় বেচারা—প্রাণ হারাতে বসেছে। জেনে শুনে পাঁচ মিনিটের জন্য লোকটাকে আমি অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে কি ভুলই করেছি। যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে, অনুশোচনার তীব্র বেদনা বুকে করে মিটিংয়ে গিয়ে দেখ্‌লাম, সভা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমার বিলম্ব দেখে, সম্পাদক মহাশয় আমার আশা ত্যাগ করে সুরু করে দিয়েছেন। আমাকে একটু অভিমানের সুরে তিরস্কার করে তিনি বল্‌তে ছাড়্‌লেন না, যে—সভা সমিতির কাজে সময়ের ঠিক রেখে চলাটা শিক্ষা করা আবশ্যক।

কোন কথারই উত্তর দিতে পার্‌লাম না। মনের অবস্থা তখন সেরূপ ছিল না। অপরাধীর মত এক পাশে চুপ করে বসে রহিলাম।

সভাভঙ্গে বলরামদের ষ্ট্রীটে লোকটার বাড়ী খোঁজ করে সংবাদ দিয়ে বাড়ী গেলাম।

সমস্ত রাত্রি অনুতাপের পাহাড় বুকে করে কাটিয়ে দিলাম। সারারাত কেবলই সেই হতভাগ্যের রক্তাক্ত দেহ আমার চোখের সুমুখে ভেসে উঠ্‌তে লাগল—একটুও ঘুম হল না।

সকালে শয্যাত্যাগ করেই, জামা কাপড় ছেড়ে মেডিকেল কলেজে গেলাম। ওয়ার্ডে ঢুকে একজন নার্সকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে, সে বল্‌ল, "ওঃ! রাত্রের সেই মোটর কেস্‌টা। আহা—বেচারী এই সকালে মারা গিয়েছে। ব্রেইনে লেগেছিল—সারারাত্রের ভেতর জ্ঞান হ'ল না। বিকারের ঝোঁকে কেবলই বলেছিল—"বড় উপকার করেছ দাদা, ভগবান তোমার ভাল করুণ। আহা।"

নার্স চলে গেল। আমি পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম। একবার ইচ্ছা হ'ল, মৃতদেহের কাছে—মার্জ্জনা ভিক্ষা করে আসি, কি উপকার তার করেছি, একবার বলে আসি—কিন্তু সাহস করে তার মৃতদেহের কাছেও যেতে পার্‌লাম না। যে ভুল করেছি, তার মূল্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অনুতাপের বেদনায় শোধ করতে পারব না!

পাষাণে খোদা অক্ষরের মত—হতভাগ্যের শেষ কথা কটা হৃদয়ে অঙ্কিত করে ভিজে চোখে বাড়ী ফিরে গেলাম।

সদাশিবের দপ্তর

সুখ কোথায়?

[শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম বি, এ সি (লণ্ডন)]

এ সংসারে সুন্দর সামগ্রী কি? রমণী, কুসুম, পক্ষী, সর্প, নদী ইহার মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর? একদিন এই বিষয় লইয়া ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে শ্রীবৎস রাজা করনা করিলাম, কিন্তু কাহাকেই স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতে পারিলাম না। একবার মনে করিলাম রমণীই গরীয়সী

আবার ভাবিলাম তাহার নিজের সৌন্দর্য্য কোথায়? রূপস্থায়ীরূপ ও অলঙ্কারই তাহার সর্ব্বস্ব ধন। তারগুণের সৌন্দর্য্যে কয়জনই বা মুগ্ধ হয়, আর কয়জন পুরুষেরই বা তাহা উপলব্ধি করিবার অনুভূতি আছে। প্রায়ই মনুষ্য-পতঙ্গ রূপের অনলের দিকে ছুটিয়া থাকে। তবে কুসুম শ্রেষ্ঠ। না তাহা নয়—গন্ধ নাই বলিয়াই ত পলাশের আদর নাই। ধুতুরার ফুলের মতন পবিত্র হৃদয়া যোগিনী আর কে আছে? কিন্তু কৈ কে তাহাকে যত্ন করে। যাহাতে মধু নাই তাহাকে কেহ যত্ন করে না। মধু আছে বলিয়াই বকুলের যত্ন; গোলাপ সুন্দরী ফুলের রাণী। কুসুম আবার বার মাস সমান ভাবে ফুটে না। কেহ বা জলে, কেহ বা স্থলে, কেহ বা কাঁটার ঝোপে ফুটিয়া থাকে। অতএব কুসুম সিংহাসন প্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইল না। পক্ষীর পক্ষ ছেদন করিলে তাহার আর কি থাকে। তাহারাও অন্তের গুণে গুণময়ী—রূপলাবণ্যবতী। রমণীর ন্যায় পক্ষীও রসাল গান করিয়া মন ভুলাইতে পটু। আবার উহারা সময় পাইলেই শৃঙ্খল কাটিতে কেহই ত্রুটি করে না। রমণী মায়ায় শৃঙ্খল কাটিয়া সোণার সংসার ছাড়িয়া—স্নেহের পুত্তলী দুলাল দুলালীও পতী-গত প্রাণ স্বামীকে ছাড়িয়া আত্মীয় স্বজনকে ভুলিয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া যায় তার পর আর ফিরিয়া আসে না। পাখীকে আবার ধরিতে পারিলেও, পোষ মানান বড়শক্ত, সদাই উড়ু উড়ু করে, কেবলই পিঞ্জরের ভগ্নস্থান ও দুর্ব্বল জায়গার অনুসন্ধান করে, অবসর পাইলেই, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ছাড়ে না। কিন্তু পরশুলতা রমণীকে ধরিবার উপায়ই থাকে না। আমাদের সমাজ তাহাকে লয় না। সর্প সুন্দর বটে; কিন্তু বিষে ভরা; দুগ্ধ দাও কলা দাও তথাপি দংশন করিতে ছাড়িবে না; তৈল দাও সিন্দুর দাও "ভবী" ভুলিবার নয়। সুন্দর বলিয়া তাহাকে আদর করিতে যাও সে অমনি দংশন করিবে।

মনুষ্য চিরদিনই রূপের কাঙ্গাল। যাহা সুন্দর মনুষ্য তাহারই ভিক্ষুক। ইংরাজ কবি Keats গায়িয়াছেন "A thing of beauty is a Tyfor ever"

আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিও গাহিয়াছেন,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল"—

শিশু দর্পণে নিজ প্রতি মূর্ত্তি দেখিয়া রোদন সম্বরণ করে; সে সর্পের সহিত খেলা করিতে যায়, কুসুমের সহিত তার বড়ই সৌহার্দ্দ্য। ভাল কাপড় খানি ভাল জুতা জোড়াটি, ভাল গহনা খানি কে না ভালবাসে। সুন্দরী দেখিয়া লোকে বিবাহ করে, সুন্দর দেখাইবার জন্য লোকের বেশভূষা। কিন্তু এ পোড়া চেহারাকে কেহ ত কোনও দিন সুন্দর বলিয়া দেখিল না। একবার চকিতের মত বিদ্যুৎ খেলিতে দেখিয়াছিলাম—একটি সুন্দর সামগ্রী দেখিয়াছিলাম; সুধু দেখি নাই মজিয়াওছিলাম কিন্তু দেখিলাম ত আর দেখিবার অবসর পাইলাম না কেন? যাহাকে সুন্দর বলিয়া দেখিলাম সে আমাকে সুন্দর বলিয়া দেখিল না কেন? যদি দেখিয়া থাকে ত অন্তর্যামী কেহ থাকেন ত তিনিই জানেন—তবে সেও ত আমাকে চাহিল না কেন? যদি চাহিয়া থাকে ত পাইল না কেন। আমিই বা পাইলাম না কেন? লোকে বলে যে যাহাকে চায় সে তাঁহাকে পায়। এ কথাটা আদৌ সত্য নয়। সত্য হইলে আমি পাইতাম। প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহের একণ নির্ম্মম পেষণ কেহ কি দেখিয়াছেন?

নদীকে কতদিন সুন্দরী মনে করিয়াছি; বোধ হয় নদীও আমাকে মনে করিয়াছে। যখন তটিনীর তটে গিয়াছি সুমধুর বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়াছে, বৃক্ষ পত্রাদি মস্তক সঞ্চালন করিয়া আহ্বান করিয়াছে, পক্ষী মধুর স্বরে গায়িয়াছে, কুসুম সুগন্ধ বিতরণ করিয়াছে, আর স্রোতস্বতী তরঙ্গমালায় সুশোভিত হইয়া হাসিতে হাসিতে

মনের উল্লাসে ললিত লাস্যে গমন করিয়াছে, তখন স্রোতের বেগ যেন অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে গন্তব্য স্থান দেখাইয়া দিয়াছে। কতবার তাহার বক্ষে সন্তরণ করিয়া তাহার কথা শুনিয়াছি। পূর্ণিমার রাত্রে নির্জ্জনে বসিয়া কথা শুনিব বলিয়া কতদিন গিয়াছি,আর সেই গালভরা হাসি দেখিয়াছি; কিন্তু মনের কথা কই একদিনও ত সে বলে নাই। মৌনে সম্মতি? হইতে পারে। তবে এতদিন তাহাকে পাইলাম না কেন? যে যাহাকে চায়, সে তাহাকে পায় কৈ? সে তাহাকে পায় না। যার জন্য মন পুড়ে তাহাকে পায় না যদি, তবে এমন চাহিতে, এমন পুড়িতে কে শিখাইয়াছিল। যে শেষ রাখিতে পারে না, সে আরম্ভে হাত দেয় কেন? বারবার নিরাশ হইলে মানুষের মন তিক্ত হইয়া যায়। তখন অপ্রাপ্ত দ্রাক্ষা ফলকে অম্ল বলিয়াই মানুষের ধারণা হয়।

নদীকে পাইলে সুখী হই কি না জানি না, পরদুঃখপীড়িতা পর্ব্বতকুমারীর সহবাসে সুখ আছে কি না জানি না, কিন্তু শান্তি আছে তাহা জানি। আমি সুখের অনুসন্ধানে ফিরিতেছি—শান্তির জন্য কি দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হয়? নদী সহবাসে সুখ নাই,—সুখ নাই, কিন্তু আশা কি ত্যাগ করা যায়? আশা ত্যাগ করিয়া কি লইয়া থাকিব? আশা যে ত্যাগ করিবার জিনিসই নয়। এ যে প্যাণ্ডোরার কৌটা হইতে আসিয়াছে; ভগবান-দত্ত সামগ্রী। এতদিন গিয়াছে তবু কি তাহার আশা ত্যাগ করিতে পারিয়াছি? কালস্রোতে রূপ যৌবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সাবেক বড় মানুষীর কেবল ঠাঁইখানা বজায় আছে তবু কেন এ পাগল মন তাহাকে চায়? মানুষকে ভিখারী করিয়া কে সৃজন করিল? মানুষ রূপের ভিখারী, সুখের ভিখারী, সৌন্দর্য্যের ভিখারী। "আয় আয় চাঁদ আয়" বলিলে অজ্ঞান শিশুও তাহার দিকে চাহিয়া দেখে, ছোট ছোট অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া চাঁদকে ডাকে, চাঁদ না আসিলে অন্তের দ্বারা ডাকিতে বলে আর শেষে কাঁদিয়া ফেলে। ছোট শিশুটি পর্য্যন্ত ভিখারী—কি ভিখারীর দলই জন্মিয়াছে। যত দাও না কেন তথাপি ভিখারী, কারণ যে যত পায় সে তত চায়। ধনী ধন চায়, মানী আরও মান চায়। চাওয়ার শেষ নাই, চাওয়াতেওতৃপ্তি নাই। কলিতে সুখেরও শেষ নাই। কিন্তু শান্তি কেহ চায় না। শিশু তাহা চায় না, সে "আয় আয় চাঁদ আয়" শান্তির জন্য বলে না। এমন কি সংসারাবদ্ধ বৃদ্ধকে যদি কেহ মোক্ষের—শান্তির—পথের সন্ধান দিতে চায়, তাহা হইলে সে কথায় সে কর্ণপাত করে না। পদ্ম পত্রের জলের মত তাহার জীবনটা যে টলমল করিতেছে তাহা সে ভুলিয়া যায়। এ সংসার যে একদিন ছাড়িতেই হইবে তাহা সে স্বীকার করিতে চায় না। শান্তির কথায় সে অরিশর্ম্মা হইয়া উঠে।

নিজের সুখে ত সকলেই সুখী; কিন্তু অন্তের সুখে যে সুখী সেই প্রকৃত সুখী। আমি হাসিতেছি আমি সুখী, কিন্তু তুমি হাসিলে যখন আমি হাসি তখনই আমার সুখ প্রকৃত সুখ। চন্দ্র লক্ষ যোজন দূরে থাকিয়া হাসে, আমি গৃহের ক্ষুদ্র জানালাটি খুলিয়া দেখি, আর হাসি। তাহার নিকটে কিছু পাইবার আশা রাখি, তাহা নয়, তবু হাসি। সে নিজে হাসে তাই তার হাসি দেখে হাসি। চাঁদের হাসি বড় মিষ্ট হাসি, আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু সে প্রত্যহ সমান ভাবে হাসে না, আবার কখনও বা মোটেই হাসে না, এজন্য যা একটু রাগ করি, যা একটু অভিমান করি, নহিলে আমি তাকে বড় ভালবাসি। চন্দ্রোদয় হইলে আর গৃহের ভিতর থাকিতে ভাল লাগে না, উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই কত দিন ছাদের উপর মাদুর বালিশ লইয়া বসিয়া থাকি। এমন সুন্দর ভাবে কেহ হাসিতে পারে না। চাঁদের হাসি একেবারে মনপ্রাণকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে সুখে, সে আনন্দে আমি আপনাকে ভুলিয়া যাই। সে অবস্থার কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।

যাহারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা কবি। কিন্তু আমার মনে হয় সে হাসির গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ে ধারণ করিলেও করিতে পারা যায়; কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। কবিরা আপনাদের মনোভাব কতকটা ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন মাত্র। কিন্তু মনে রাখা উচিৎ যে সামান্য দুঃখ বা আনন্দ হইলেই মুখ ছুটে, কিন্তু গভীর দুঃখে বা আনন্দে মুখ ফুটে না—হৃদয় কেবল গুরুগুরু করে; হৃদয় তাহাতে সন্তাড়িত হয়, সে বেগ শীতল না হইলে মুখে তাহা ফুটে না। নবদম্পতীর প্রথম মিলনে প্রেমিকার মুখে কথা ফুটে না, কেবল বুকের ভিতর গুরু গুরু করে, গলা শুষ্ক হইয়া আ'সে বুকের কথা খালি চক্ষে ফুটে। সে আনন্দ, সে সুখ কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়? তবে কেমন করিয়া সে আনন্দ, সে হাসির অর্থ বুঝাইব? হইল না, পারিলাম না। সে হাসি দেখিলে হৃদয় ছুটাছুটি করিতে থাকে, নাচিতে ইচ্ছা করে, পাঁচজনকে সে হাসি দেখাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তার যে কি অর্থ তাহা জানি না। কেহ জানে কি না তাহাও বলিতে পারি না।

এমন সুন্দর হাসি জগৎসংসারে নাই; বোধ হয় এই হাসিটুকুর জন্যই আমার কমলাকান্ত দাদা ইংরাজী মতে চন্দ্রকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ কালবিজয়ী, ঐ সর্ব্বস্বান্তকারী হাসির সহিত যে না হাসিল তাহার জন্ম বৃথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় ও হাসির অর্থ কেহ ভাল করিয়া বুঝে না। শশি! তুমি যে আনন্দে হাসিতেছ, মনুষ্যের সে আনন্দ কোথায়? তুমি এই আছ, এই নাই। এই পলে এখানে জনমনহারী রূপের ছটায় লোকের মন মজাইতেছ, পর পলেই অস্ত পাড়ায়। মনুষ্যও আজি আছে কাল নাই, আজি এখানে কাল গোবিন্দপুরে; কিন্তু আজিকে যদি তোমার এক কলার ক্ষয় হয়, কল্য তাহার বৃদ্ধি হইবে; আজকে যদি অঙ্গে ছাইমাখ কল্য আবার তোমার সোণার বরণ হইবে। তুমি না হাসিলে কে হাসিবে। তোমার দুই স্বামী, দুই জনেরই তুমি মনোমহোনী। তোমার পালার কম বেশী নাই। বৎসরের মধ্যে উভয়ের কাছেই দ্বাদশ পক্ষ ধরিয়া তুমি সমান ভাবে হাজির থাক। তুমি কিন্তু জান না যে, তোমার অনুপস্থিত কালে জগত কি লইয়া প্রাণ ধারণ করে। জানিলে হাজির না, থাকিয়া থাকিতে পারিতে না। তবে তোমার উভয় প্রাণবল্লভই সমান, উভয়েরই মন রাখা আবশ্যক।

যারা দু নৌকায় পা দেয় তাহাদিগকে ধিক্ তোমাকেও ধিক্। তোমার উভয় জগতার্দ্ধ স্বামীদ্বয়কেও ধিক্। তুমি একা অবলা; তোমারও বিষম দায়, তা'দেরও মহাকষ্ট। আর তা'তে তোমারই বা দোষ কি? পোড়া মানুষের চিরকালই মন্দ কপাল। পৃথিবীটা বোধহয় ঈশ্বরের দুয়োরাণীর ছেলে, তাই সকল সুখ সস্তোগেই বিমুখ। বৃহস্পতির অন্ততঃ পাঁচটি চন্দ্র, উরেনসের ছয়টি চন্দ্র, শনির আটটি চন্দ্র, মঙ্গলের ও দুইটি চন্দ্র; এ পোড়া পৃথিবীর কিন্তু মোটে একটি মাত্র চন্দ্র। কিন্তু আমরা এতেই সন্তুষ্ট হয়ে বলে থাকি, 'এক চন্দ্রেই জগত আলো।' তুমি যাহাকে বিমলরশ্মি প্রদান কর, সে আর না হাসিয়া থাকিতে পারে না, সে আনন্দে গলিয়া যায়। ইহাই তোমার ব্রত, পরচিত্তবিনোদনই তোমার ধর্ম্ম। আমি পরের হাসি দেখিয়া হাসিতে বড় ভালবাসি; এই জন্যই সমানধর্ম্মী তোমার সঙ্গে আমার বড় ভাব—তাই তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি। কিন্তু শশি! তোমাতে না কি কলঙ্ক আছে, লোকে তোমায় কলঙ্কী বলে? তুমি এত সুন্দর হইয়া পরের জন্য হাসিতে শিখিয়াও কি পাপে কলঙ্ক ধারণ কর? তোমার ও সোণার হৃদয়েও দারুণ ক্ষত আছে। জানিতাম পরের সুখে যে সুখী, তার বিন্দুমাত্র দুঃখ সম্ভবে না, কিন্তু আজ দেখিতেছি এটা বিষম ভ্রম। এ মিছার সংসারে এমন কোনও পদার্থ নাই যাহা হৃদণ্ড দেখিলে তৃপ্তি জন্মে—একমাত্র

তুমি ছিলে, কিন্তু তোমার হৃদয়েও যন্ত্রণার নদী, শুভ্র ফেণনিভ চাদরে এক কলঙ্ক মশী ঢালা রহিয়াছে। কমলের দলে সর্পের বাস, গোলাপে কণ্টক, মধুচক্রে আহরণ করিতে গেলে মক্ষিকার দংশন, চক্ষে পলক, রমণী হৃদয়েও লজ্জার কপাট—এসব কোন্ নির্দ্দয়ের সৃষ্টি। সে কি কোনও সামগ্রীই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; কিংবা ঐরূপ করা তাঁর শক্তির বাহিরে। যে বিধাতা কিংশুকে মধু দেয় নাই, ইক্ষুতে ফল দেয় নাই, প্রণয়ের আকৃতি দেয় নাই, সেই সকলের স্রষ্টা! জানি না কমলে কণ্টক, রমণীতে ব্যভিচার, আর তোমাতে কলঙ্ক দিয়া সে কি ইষ্টলাভ করিয়াছে। কিন্তু এততেও মানুষ সহজে নিবৃত্ত হয় না। রমণী ব্যভিচার করিলেও তার সেই সুকোমল মুখ দেখিয়া মানুষ গলে পড়ে; আর যদি না পড়িত, তাহা হইলে জগতে রূপজীবিনীর দল থাকিত না। তোমার কলঙ্ক সত্বেও যখন সেই সুন্দর গগনমার্গ হইতে তুমি শ্বেত সুবর্ণ শুভ্রবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘের আড়ালে দাঁড়াইয়া অপাঙ্গ দৃষ্টিতে দেখ, তখন কোন্ পাষণ্ড না গলিয়া গিয়া তোমার সুকোমল রশ্মি প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করে? এটি অবশ্য মনুষ্যের মহত্ব বলিতে হইবে। তুমি দোষ করিলে আমি ক্ষমা করিলাম; আর আপনা ভুলিয়া তোমায় আলিঙ্গন করিলাম। কিন্তু এ পোড়া অদৃষ্টে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করা হইল না। তাই বলি তোমা ছাড়া সুখের সন্ধান ত কোথাও মিলিল না। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

বরণ

(শোকের পুরীতে)

[শ্রীকালিদাস রায় বি এ, কবিশেখর]

হলো তোমার বরণ প্রিয়ে মরণ নদীর ধারে,
বোধন হলো রোদন রোলে আকুল হাহাকারে।
কোথায় প্রমোদ কোথায় হাসি?
বাজ্‌ল নাক সানাই বাঁশী,
হো হো ধ্বনি উঠ্‌ল শুধু শোকের পারাবারে।

আসনিক পূর্ণিমাতে পুষ্পশোভন রথে;
তোমার সাথে প্রথম দেখা অশ্রু পিছল পথে,
শ্মশান মাঝেই জীবন সাথী,
জ্বল্‌ল চিতায় বাসর বাতি,
বাসর রাতি ভর্‌ল অকাল আমার আঁধিয়ারে।

আসনি সই হতে আমার সুখের সহচরী,
শোকের রাতেই দিলদরদী আস্‌লে দয়া করি,
সেই হ'তে ঐ আঁচল টি যে
অশ্রুতে মোর রইল ভিজে,
সেই হ'তে সই বর্‌লে আমায় সকল বেদনারে।

দশ্‌টী বছর ঘনীভূত দুইটী দিনের পুটে,
দুইদিনে প্রেম দশটী বছর আগিয়ে গেল ছুটে,
সুখের দিনের প্রথম মিলন,
দুখের রাতে শিথিল বাঁধন,
অশ্রুজলের মিলন অটুট এপারে ওপারে।

রাঙ্গা মা

(গল্প)

[শ্রীকিরীটেশ্বর ঘোষ]

১

গঙ্গা স্নান করিয়া নীহার যখন বাড়ী ফিরিবার যোগাড় করিতেছিল, তখন দূরে একটী ফুটফুটে বছর সাতেকের ছেলেকে দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিয়া আর একটী ছোট মুখ তাহার মনে পড়িল। সেও এতদিনে ঠিক এমনটী হইত।

ধীরে ধীরে বালকের কাছে আসিয়া নীহার ডাকিল—খোকা!

বালক তাহার দিকে তাকাইল।

তোমার নাম কি খোকা!

ভুলু!

হাঁ তাই ত! সেই চোখ, সেই চেহারা!

কোথায় থাক তুমি!

বালক অবাক হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া কহিল,—কেন আমার বাড়ীতে।

কোথায় তোমাদের বাড়ী?

ভুলু হাসিয়া কহিল—জাননা বুঝি। ঐ যে একটা লাল রঙের বাড়ী দেখা যাচ্ছে ওটা আমাদের বাড়ী।

ভুলুর কথায় নীহার একবার সেদিকে তাকাইল। দূরে একটা লাল রঙ্গের দোতালা বাড়ী তাহার চোখে পড়িল। বাড়ীটা দেখিয়া অনেক দিনের একটা পুরাণ স্মৃতি তাহার মনে পড়িল! হাঁ ঠিক ত! ওটা সেই বাড়ী!—ওটা সেই বাড়ী।

ভুলু এতক্ষণ নীহারকে দেখিতেছিল। নীহারের তাতলা ছিপ্ ছিপে দেহটা, হরিণের মত চোখ দু'টা তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল। তারপর হঠাৎ সে বলিল—'তোমার নাম কি বললে না ত।'

রমণী হাসিয়া বলিল—নীহার। আমাকে তোমার মনে থাকবে?

বা রে! ভুলবো কি করে, বেশ মনে থাকবে। আচ্ছা তোমার বাড়ী কোথায় বললে না যে!

আমার বাড়ী অনেক দূরে।

কত দূরে?

অনেক দূরে—তুমি একদিন যাবে?

হাঁ যাবো! কিন্তু মা যদি যেতে না দেয়!

তাহ'লে আর যাবে কি করে?

না তা হবে না। একদিন লুকিয়ে আমি তোমাদের ওখানে যাবো!

তোমার মা জান্‌তে পারলে মার্‌বে না?

জান্‌তে পার্‌লে ত? আমি যাবো আর আস্‌বো! ঐ যে মা আসছে যাই!

কাল আস্‌বে ত?

'হাঁ' বলিয়া বালক চলিয়া গেল।

নীহার সেইখানে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল!

২

এমনই করিয়া তাহাদের দেখা হইত। ভুলু ইতি মধ্যে নীহারের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়েছে। এখন তাহাকে রাঙা-মা বলিয়া ডাকে; কেন না নীহার দেখিতে বড় সুন্দর।

মাস দুই পরে একদিন স্নানের ঘাটে নীহারকে দেখিতে না পাইয়া, ব্যথিত অন্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া আসিল। সারাদিনটা সে বিমর্ষ হইয়া রহিল। সন্ধ্যার ভুলুর পিতা সময় অরুণকুমার, তাহাকে বিমর্ষ দেখিয়া অসুখ করিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে ভুলু শুষ্ক মুখে শুধু 'না' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অরুণকুমার কিছু বুঝিতে না পারিয়া, আস্তে আস্তে ভুলুর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে, বলিলেন, '—খোকা! কি হয়েছে বল না'

ভুলু কোন উত্তর দিল না।

অরুণকুমার বুঝিলেন কিছু হইয়াছে, কিন্তু কি হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

৩

বাবা, বাবা, ছবিটা কার? কোথায় পেলে? ও যে রাঙা-মার ছবি!

দিন দশেক পরে অরুণকুমার বৈঠকখানায় বসিয়া একটি ছবি লইয়া নিবিষ্টমনে দেখিতেছিলেন। পুত্রের কথায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাঙা-মা কের?'

ভুলু মুরুব্বির মত বলিল—'সে অনেক কথা, তুমি চিন্‌বে না।'

'তোর রাঙা-মাকে দেখাতে পারিস্।'

'পারি কিন্তু আজকাল ত মার দেখা পাই না। বোধ হয় অসুখ করেছে। বাবা আমায় রাঙা-মার কাছে নিয়ে চল না।'

'কোথায় তাদের বাড়ী জানিস্?'

'হাঁ। তুমি যাবে?'

'হাঁ চল।'

* * * * *

অরুণকুমারের মনে একটা পুরাণ স্মৃতি জাগিয়া বড় ব্যথা দিতেছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা, অরুণকুমার তখন যুবক—সেই সময় রূপের মোহে পড়িয়া পিতার অজ্ঞাতসারে নীহারকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তারপর ঘটনাচক্রে পড়িয়া পিতার মনোনীত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর নীহারের অনেক খোঁজ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন সংবাদই পান নাই।

৪

ভুলু যখন পিতাকে সঙ্গে লইয়া নীহারদের বাড়ী পৌঁছাইল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। জানালার ফাঁক দিয়া চাঁদের কিরণ ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

ঘরের কাছে গিয়া ভুলু একলাফ দিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—'রাঙা-মা!'

ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল—'কে ভুলু? এসেছিস—আয় বাবা আয়!'

ভুলু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল,—'একি শুয়ে আছ যে! অসুখ করেছে না কি? ইস্ বড্ডো রোগা হয়ে গেছ যে!'

নীহার মৃদু হাসিয়া কহিল—'একা এলি কি করে?'

ভুলু হাসিয়া কহিল—'একা আস্‌তে যাব কেন? —বাবা এসেছে।'

নীহার কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা কমিল,—'কে?'

ভুলু পুনরায় কহিল—'বাবা! বাবাকে চেন না বুঝি? কিন্তু বাবা তোমাকে চেনে। বাবার হাতে আজ তোমার একখানা ছবি দেখ্‌লাম!'

ভুলুর কথা নীহার একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিল। কথা শেষ হইলে ভুলুর দিকে তাকাইতেই, অরুণকুমারকে ঘরে ঢুকিতে দেখিতে পাইল।

ভুলু পিতাকে আসিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—'এই যে বাবা আস্‌ছে।'

অরুণ ঢুকিয়া কহিল—'নীহার ক্ষমা কর।—অনেক অপরাধ করেছি।'

নীহারের দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছিল। উত্তরে কহিল,—'এতদিন পরে মনে পড়েছে। বোস। তোমাকে আর বেশী দিন জ্বালাতন কর্‌ব না।'

অরুণকুমার নীহারের শীর্ণ হাত দুটী কোলের উপর লইয়া কহিল—'তোমাকে ভুলে ছিলাম তা মনে করো না—তোমাকে অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাই নাই। ভুলুর কাছে আজ তোমার সন্ধান পেলাম মাত্র।'

নীহার ভুলুকে বুকের মধ্যে টানিয়া সস্নেহে চুম্বন করিল। ভুলু কহিল—'রাঙা-মা এবার আমাদের বাড়ী চল।'

মহারণ্যে

(শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি, এল)

হেথা যে বিহান আছে মায়ের আঁচল,
তাই এই মহারণ্যে শান্তি নিরমল
ভূমানন্দে রাজে নিত্য; চিত্তের বিক্ষোভ
নাহি হেথা, নাহি হিংসা কাম-ক্রোধ-লোভ;
স্বার্থে স্বার্থে নাহি বাজে ঘাত প্রতিঘাত
অন্ধকার করে যায় প্রদীপ্ত প্রভাত;
ঈর্ষা ঘৃণা জিঘাংসার কলঙ্ক আঁধারে,
ক্ষুধিত রাহুর মত, জ্ঞান-সবিতারে
গ্রাসিতে উদ্যত যাহা, করি তিলে তিলে
মানবের খর্ব্ব-ক্ষুদ্র, এ বিশ্ব-নিখিলে
দানবের স্পর্দ্ধা গর্ব্ব দম্ভ অধিকার
বিধাতার প্রেম রাজ্যে করে গো বিস্তার;
নাই হেথা সেই স্বার্থ অনর্থ-নিদান
আত্ম-বলিদানে তাহা লভেছে নির্ব্বাণ।

প্রপর্ণা

(উপন্যাস)

[শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ]

(৪)

নৌকায় উঠিয়া সকাল বেলা বিগত মাসে অভিনীত সমুদয় থিয়েটারের একত্রে অভিনয় ও দ্বিপ্রহরে দীর্ঘ নিদ্রান্তে বিকাল বেলা শশীশেখরের নৃত্য কলার উপর সবিশেষ অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া গেল, ও ছত্রিশ রাগ ও চৌষটি রাগিণীর উদ্বোধন আরম্ভ হইয়া গেল। মাঝি আসিয়া সোমেন্দ্রের কাছে অভিযোগ করিল যে, অতঃপর নৌকা জলতলগামী হইলে তাহার কোন ও দোষ নাই। শশীশেখর তখন সুগমনে কলালক্ষ্মীকে বিদায় দিয়া তাস লইয়া ছাদের উপর বসিল। কিন্তু তাহাতেও বিঘ্ন ঘটল, খেলার নাম লইতেই সোমেন্দ্র তাহাকে জীব বিশেষের নামে অভিহিত করিয়া কহিল যে, এই কবিজন সুকীর্ত্তিত সুভগ সুখদ নিদাঘ দিনান্তের সময় যে তাস খেলিতে চায় তাহার মনুষ্য জন্ম ধারণ করা বৃথা। উত্তরে শশীশেখর তাহাকে কবীশ্বর কাবরাজ ইত্যাদি বহু সম্মান ব্যঞ্জক উপাধি প্রদান করিল। সোমেন্দ্র তাহাতে কোনও আপত্তি করিল না।

হারিয়া গিয়া শশীশেখর নীচে পরম মনোযোগ সহকারে সন্দেশ ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল, সোমেন্দ্র শ্যেনপক্ষীবৎ এক বৃহৎ থাবা মারিয়া যথাসম্ভব কবলিত করিয়া কহিল, "এটা কি রকম ভদ্রতা হচ্ছে?"

শশীশেখর কহিল, "কবি মানুষ তুমি এ হেন পরম রমণীয় নিদাঘ-সায়াহ্নে স্বর্ণচেলাঞ্চলা তটিনীর—"

সোমেন্দ্র তাহার বর্ণনা শেষ করিতে না দিয়া বলপূর্ব্বক সন্দেশের হাঁড়ি কাড়িয়া লইয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল, "জোর যার মুলুক তার।"

নৌকা এখন তীরের কোল ঘেঁষিয়া চলিতেছিল, অদূরে ফেণোদ্ধিত তটে ধাবনশীল শিশুদলের মত তরঙ্গ শ্রেণী ধাইয়া আসিয়া আবার পরক্ষণেই নামিয়া যাইতেছিল।

সোমেন্দ্র কহিল, "ওহে দেখ্‌তে পাচ্ছো কিছু?"

শশীশেখর এদিক ওদিক্ চাহিয়া কহিল, "কি?"

"একটা মড়া"

"কোথায়?"

"ঐ যে খেজুর গাছটা পড়ে আছে, তার কাছে কাশবনের ধারে"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি এখন"

"একটি মেয়ের মড়া."

চাহিয়া চাহিয়া শশীশেখর বলিল, "মড়া ভাসিয়া দেওয়া ভারী খারাপ।"

নৌকা তখন কথিত শবের আরও নিকটবর্ত্তী হইল, সোমেন্দ্র অভিনিবেশ সহকারে শবদেহ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "দেখ শশী, আমার মনে হচ্ছে যেন শবে জীবনের লক্ষণ আছে। মড়া মানুষের বর্ণ এ রকম হয় না।"

শশীশেখর বলিল "হ'তে পারে তা, পরীক্ষা করে দেখ্‌ব না কি?"

সোমেন্দ্র মাঝিকে ডাকিয়া নৌকা খেজুর গাছের নীচে ভিড়াইতে বলিল। ঢালু তটের উপর সফেন জল তরঙ্গাভিঘাতে উছলিয়া উঠিতে লাগিল, চারিদিক হইতে তটাভিহত জলের কল্লোল মৃদু ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মত শোনা যাইতে লাগিল।

লাফাইয়া তীরে উঠিয়া সোমেন্দ্র মৃতদেহের নিকট গেল।

সুকুমারী তরুণী বালা, শৈবালাচ্ছাদিত পুষ্পের মত তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত কর্দ্দমে অবলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বালিকা উত্তান ভাবে শায়িত, তরঙ্গ-তাড়িত জল তাহার অর্দ্ধাঙ্গে ফেণ দাম রাখিয়া যাইতেছে, তাহার মুক্ত কেশরাশি তরঙ্গে একবার ভাসিতেছে, একবার তট-মৃত্তিকা-লীন হইয়া যাইতেছে। সোমেন্দ্র তাহার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

শশীশেখর তীরে উঠিয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

সোমেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, "বিষয়টা জটিল বোধ হচ্ছে"

"কি রকম?"

"হয়ত এ আত্ম হত্যা করেছে, নয় ত কেউ ডুবিয়ে মেরেছে"

"বল কি!"

দেখ্‌ছ না পায়ের কাপড়ে গাঁঠ বাঁধা।"

"হ'তে পারে। আত্মহত্যাই হয়ত করেছে।"

"খুব সম্ভব। এই অসংখ্য প্রাণীগুলির মুক্তির এই একটা সোজা রাস্তা কি না, তাই যাত্রীর অসদ্ভাব এপথেকখনও ঘটে না"—

"দেখ্‌ না বেঁচে আছে কি না।"

সোমেন্দ্র বালিকার মৃত্তিকালিপ্ত হাতখানি উঠাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল।

খানিক পরে শশীশেখর জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌লে?"

"ঠিক মরেছে বল্‌তে পারি না। একবার ভাল করে দেখ্‌তে হচ্ছে।"

সোমেন্দ্র গায়ের সার্ট খুলিয়া শশীশেখরের হাতে দিয়া মালকোচা আটিয়া কাপড় পরিয়া বালিকার মৃতবৎ নিষ্পন্দ দেহ পাখালি করিয়া উঠাইল। তাহার পদচাপে আর্দ্র তটস্থ মৃত্তিকা বসিয়া যাইতে লাগিল।

কতকগুলি গলিত গাছের পাতা, ঘাসের চাপড়া খড় কুটা বালিকার গ্রীবার মূলে লগ্ন হইয়াছিল। সোমেন্দ্র অর্দ্ধেক জলে নামিয়া ঢেউ দিয়া অপসারিত করিল। মুক্ত আকাশ হইতে সহস্র ধারে গলিত সাহাহ্ন সূর্য্যের স্বর্ণধারা শৈবালদলমুক্ত নলিনীবৎ তরঙ্গ-বিধৌত বালিকার প্রতি অঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়া দিল।

সোমেন্দ্র ডাকিল, "শশী।"

নৌকার গলুইএ দাঁড়াইয়া শশীশেখর কহিল, "কি কর্ত্তে হবে?"

"তোয়ালে দিয়ে গায়ের কাদা মাটি, বালি তুলে দিতে হবে, ঢেউএ গেল না।

শশীশেখর লাফাইয়া জলে নামিল ও যথাদিষ্ট কার্য্য সমধা করিল।

সোমেন্দ্র কহিল, "এখন নৌকায় তুমি আগে ওঠ, তুল্‌বার সময় ধর্‌তে হ'বে।"

শশীশেখর নৌকায় উঠিয়া দাঁড়াইল, সোমেন্দ্র সতর্ক পদক্ষেপে নৌকায় উঠিতে লাগিল। বালিকার শিথিল মস্তক তাহার স্কন্ধের উপর লুটাইয়া পড়িল, তাহার কেশরাশি তাহার অংশ ও পৃষ্ঠ আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

সোমেন্দ্রের মনে হইল যেন, তাহার বক্ষলগ্ন জীবন-লক্ষণ-বর্জ্জিত শবদেহে চেতনাভাষ স্পন্দন সে অনুভব করিল। একটা অনমুভূত পুলক সহসা তাহার বক্ষের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া তরঙ্গায়িত সমুদ্র-কল্লোলেরমত বহিয়া গেল।

গলুইএর উপর দাঁড়াইয়া শশীশেখর কহিল, "সোম, তোমাকে সতীদেহ স্কন্ধে ধৃত শিবের মত দেখাচ্ছে।"

সোমেন্দ্র কহিল, "কবিত্ব রাখ্ এখন, ধর্‌তে পার্‌বে কি না ঠিক্ করে দেখ।"

"বলে দাও কি রকম করে ধর্‌তে হবে।"

"বগলের নীচে ধর, আমি তুলে ধর্‌ছি। দেখো, ঠিক্ করে ধোরো ছেড়ো না, আস্তে এখন পাটাতনের উপর শুইয়ে দাও।"

নৌকার ধারে বসিয়া জলে পায়ের কাদা ধুইয়া সোমেন্দ্র কহিল, "কই, কাপড় চোপড় রাখ নি?"

"বাঃ। তা কি বলেছিলে!"

"তা ও আবার বলে দিতে হবে? কি বুদ্ধি তোমার!"

"প্রৈটইত্তে তোমার বেয়াড়াপানা! আমার রীতি-মত সার্টিফিকেট পাওয়া বুদ্ধি, তার উপর তোমার সন্দেহ প্রকাশ করা ঘোরতর অন্যায়! কি চাই বল, এনে দিচ্ছি এখনি।"

"হয়েছে! তোমায় আর দিতে হবে না!" বলিয়া সোমেন্দ্র কাপড়ের জল নিঙ্গড়াইয়া ভিতর হইতে আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি লইয়া আসিল।

শশীশেখর কহিল, "যে বিষম চুল, এর জল মুছাতে ত এক ঘণ্টা যাবে।"

"আচ্ছা, তা তোমায় ভাব্‌তে হবে না, তুমি একটা বিছানা তৈরী কর ত গিয়ে।"

শশীশেখর বিছানা করিতে গিয়া, বিছানা কিরূপে করিবে তৎসম্বন্ধে সোমেন্দ্রকে শতাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, অবশেষে সোমেন্দ্র তাহাকে বিজাতীয় ভাষায় ষ্টুপিড্ এবং অন্যান্য বিশেষণে অভিহিত করিয়া শুধু তোষকের উপরে বালিকাকে আনিয়া শোয়াইল, শশীশেখর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, চাদরটা যে শয়ন করিবার আগে পাতিতে হয় তাহা তাহার খেয়াল ছিল না।

(৫)

সোমেন্দ্র ডাকিল "শশী।"

শশী গিয়া কাছে দাঁড়াইল।

"নাড়ী ত পাওয়া যাচ্ছে এখন।"

"বেঁচে আছে তা হ'লে?"

"তাই ত বোধ হচ্ছে।"

নাকের কাছে আঙ্গুল ধরিয়া সোমেন্দ্র কহিল, "নিঃশ্বাস বহিতে আরম্ভ করেছে যেন।"

শশীশেখরও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

মৃদুস্বরে শশীশেখর কহিল, "সোম, তার পর?"

"তাই ত ভাব্‌ছি। বাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে।"

"বাড়ী?"

একথা ভাবিয়া সোমেন্দ্র কহিল, "বাড়ী আপাততঃ থাক্। এখনও ত আমাদের মেসের তেতালার ঘরটা খালি পড়ে আছে, সেখানে নেওয়া যাবে। দেখা যাক্ কি দাঁড়ায়।"

সোমেন্দ্র উঠিয়া বালিকার মুখে চামচে করিয়া ঔষধ ঢালিয়া দিল।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিঃশেষোন্মুখ দীপ এক কোণে টিপ্ টিপ্ করিয়া ম্লান-ভাবে জ্বলিতেছিল। তাহার চঞ্চল ছায়া এক একবার বৃহদাকার হইয়া আবার দূরে সরিয়া যাইতেছিল।

নদীর বাতাসে নিশাবসানের শীতলতা বহিয়া আসিতেছে। সোমেন্দ্র তখনও অক্লান্ত দেহে জাগিয়া পরিচর্য্যা করিতেছে। শশীশেখর তাহার পার্শ্বে বাহু উপাধান করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সহসা বালিকা চাহিল, তিমিরাবলুপ্ত আকাশ হইতে স্ফুরোজ্যোতি নক্ষত্রের দীপ্ত আলোকপাতের মত সে চাহনি, সোমেন্দ্রের সুপ্ত অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিল, সোমেন্দ্রের মনে হইল যেন সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্য সেই দৃষ্টির প্রকাশে প্রাণলাভ করিল।

বালিকা কিছু যেন বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। সোমেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল "থাক্ আপনি এখন কথা কইবার চেষ্টা করিবেন না, আপনার এখানে কোনও ভয় নেই। আপনি অসুস্থ; আমরা সাধ্যমত আপনার শুশ্রূষা করিব। আপনি একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করুন।"

বালিকা চারিদিকে চাহিয়া চক্ষু মুদিল। দীর্ঘ নিদ্রার পর বালিকা আবার যখন জাগিল, তখন বাহিরে রৌদ্র দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, লীলায়িত তরঙ্গের উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইতেছে। ঝুপ্‌ঝাপ্ জলে দাঁড় পড়িতেছে, তীরস্থ তরুগুলির পাতার মর্ম্মর ধ্বনি জল কল্লোলের সহিত মিলিতেছে।

সোমেন্দ্রের হাতের পাখা শিথিল অঙ্গুলির ভিতর হইতে পতনের অপেক্ষা করিতেছিল; তাহার চক্ষু প্রায় মুদিত হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এখন কোথায়?"

সোমেন্দ্র কহিল, "আমরা কলকাতায় যাচ্ছি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বালিকা "জানালাটা" বলিয়া চুপ করিল।

সোমেন্দ্র উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিল। অর্দ্ধান্ধকার নৌকার কক্ষে প্রভাতের নব সূর্য্যালোক জীবনের আনন্দময় বার্ত্তা লইয়া প্রবেশ করিল।

বালিকা বলিল,—"আপনারা আমাকে বাঁচিয়েছেন?"

"ভগবান বাঁচিয়েছেন, আমরা নিমিত্ত মাত্র। আপনার পরিচয় পেলে আমরা আপনাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারি।" কাঁপিতে কাঁপিতে বালিকা কহিল "আমার বাড়ী নাই।"

সোমেন্দ্র ও শশীশেখর পরস্পরের দিকে চাহিল, কেহ কোন ও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। বালিকা বলিল, "আমাকে যেখান থেকে এনেছেন সেইখানে রেখে আসুন।"

নৌকার ভিতরে অনেকক্ষণ কেহ কোনও কথা কহিল না। খানিক পর বালিকা ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, "শুন্‌বেন আমার কাহিনী? আমার নাম রাধারাণী। শৈশবে আমায় ফেলে মা চলে যান, তদবধি বাবাই আমাকে পালন করে-ছিলেন। আমি তাঁর অত্যন্ত আদরের মেয়ে ছিলাম। পৃথিবীতে আমরা দুটি প্রাণী ছিলাম, আমাদের আর কেউ ছিল না। এর ভিতর হঠাৎ বাবা ও চলে গেলেন, দিদিমা এক পোষ্যপুত্র রেখে গিয়েছিলেন; আশ্রয় অভাবে আমি তাঁহার স্কন্ধে পড়্‌লাম। মামা মামী দুই আমার উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠ্‌লেন, অযথা যে আমি তাঁদের অন্নধ্বংশ কর্ত্তে উপস্থিত হলাম, এটা তাঁদের নেহাৎ অসহ্য বোধ হতে লাগ্‌ল। মামী বল্লেন, "এত বড় ধিঙ্গী মেয়ে ঘরে পুষ্‌বার দরকারটাই বা কি, কোনও মতে পার করে দিয়ে আপদ চুকিয়ে দেওয়া যাক্। ঘটক এলেন, রফা হোল দু হাজার টাকা। মামা মামী কি বন্দোবস্ত করেছিলেন জানি না, গয়নায় তামা পিতল ধরা পড়্‌ল, যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সভা থেকে উঠে চলে গেলেন। মামী আমাকে দড়ি কলসী নিয়ে গঙ্গায় যেতে বলেন।"

অবসন্ন হইয়া মেয়েটি চুপ করিল, তাহার দেহে মূর্চ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল, সোমেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার মুখে একটা ওষুধ ঢালিয়া দিয়া মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সোমেন্দ্র

ঠাকুরমার হাতের তৈরি সেই বিশেষ রকম পিঠের পরম পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিল, এবং সেই সঙ্গে লম্বা চৌড়া এক প্রতিষ্ঠাপত্র এবং ততোধিক লম্বা চৌড়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিল।

মেসের তেতালার উপর একখানা ঘর ছিল; সোমেন্দ্র আপাততঃ সেই ঘরে রাধারাণীর থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। সঙ্গে থাকিবার জন্য একজন ঝী রহিল

রাধারাণীর পথেই জ্বর হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা না কমিয়া বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। সোমেন্দ্র পড়া ছাড়িয়া তাহার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিল, শশীশেখর গৃহ ছাড়িয়া তাহার বন্ধুর সাহায্য করিতে লাগিল। আর্থিক ভার সে-ই গ্রহণ করিল। এ সম্বন্ধে সোমেন্দ্রের কিছু করিবার শক্তি ছিল না, কারণ তাহার উপরে কমলার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল না, তাহার নিজের পড়ার খরচই সে অত্যন্ত টানা-টানি করিয়া নির্ব্বাহ করিত। প্রতিপদেই তাহাকে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া চলিতে হইত; তাহার নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতা তাহার একমাত্র সহায় ছিল।

(৬)

একদিন সোমেন্দ্র কহিল, "যা হ'ক আসল রোগটা এখন সেরেচে কিন্তু—"

শশীশেখর বাধা দিয়া কহিল, "তবে আর কিন্তু কিসের জন্যে?"

সোমেন্দ্র কহিল, "এখানে একলাটি চুপ করে পড়ে থাকে—কথা কইবার ত লোক নেই, এখন কি করা যায়?"

"তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাও না কেন!"

"বাড়ীতে? এখনি?"

"ক্ষতি কি!"

"রোগ থেকে উঠেছে, চেহারাটা একটু শোধরাক্!"

"ইস্! নইলে বাবুর চোখে ধরবে না না কি?"

"আমার নয় র‍্যাখেল ঠাকুমার। তাঁর যদি অপছন্দ হয়, তবে কাজ হাঁসিল হবে না। তবে তোমার ভাব করে নেওয়া দরকার, দেয়ালের সঙ্গে পরিচয় করে কাঁহাতক দিন কাটে!"

"আমি ত অতিথির মত আসি, তুমি ত এ বাড়ীতে আছ তোমার এতদিন ভাবটা করে ফেলা উচিত ছিল।"

"তাত ছিল, কিন্তু কথাটা কি জান, উত্তমাদের সঙ্গে আলাপটা অনভ্যস্ত ব্যাপার। দস্তর উত্তর মোটেই জানা নেই, বোকা বনে যাই আর কি শেষে!"

শশীশেখর হাসিয়া কহিল, "ঐ ত গোল! চল না এখন একবার কুশল জিজ্ঞাসা করে আসা যাক্।"

অতি উত্তম বলিয়া সোমেন্দ্র সার্ট গায় দিল।

রাধারাণী বিছানায় শুইয়া ছিল, বিষাদক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখচ্ছবি। তিন চারিদিনের বাঁধা খোঁপা বিস্রস্ত ও শিথিল হইয়া গ্রীবার উপর লুণ্ঠিত হইতেছে; স্বেদার্দ্র চূর্ণ কুন্তল নির্ম্মল ললাটে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

সহসা পায়ের শব্দ পাইয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া বসিল। সোমেন্দ্র কহিল, "কেমন আছেন আজ?"

"ভালই।"

"আর জ্বর হয়নি ত?"

"না।"

"শরীর বেশ সুস্থ লাগছে?"

রাধারাণী মাথা হেলাইল।

তাহার রুক্ষ অযত্নসম্বদ্ধ কবরীর দিকে চাহিয়া সোমেন্দ্র কহিল "স্নান কর্ত্তে ইচ্ছে হয়?"

রাধারাণী সম্মতি প্রকাশ করিল।

সোমেন্দ্র কহিল, "তবে কাল একবার নাইতে পারেন। গরমজলে নাইবেন কিন্তু।"

পরে ঝীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, "দরজা জানালা বন্ধ করে, বেশ সাবধানে কাল স্নানটা করিয়ে দিয়ো। দেখো বেশীক্ষণ জল গায়ে থাকে না যেন, পার্শ্বে ত?"

ঝী তাহাদের অভয় দিয়া বলিল, "যে সে রোগীর শুশ্রূষা বিশেষরূপে অবগত আছে এবং এ সব বিষয়ে তাহাকে কোন ও উপদেশ দিবার আবশ্যকতা নাই।"

যে বাড়ী ছাড়িয়া সে এখানে কাজে লাগিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক ছেলেটিই তাহার হস্তে প্রতিপালিত হইয়াছে।"

সোমেন্দ্র রাধারাণীর দিকে চাহিয়া কহিল, 'একলা আপনার খুব খারাপ লাগে বোধ হয়। বইটই পড়তে ইচ্ছে হলে এনে দেওয়া যেতে পারে।"

রাধারাণী কিছু উত্তর দিল না, কেবলমাত্র মাথা হেঁট করিয়া অঙ্গুলির নখাগ্র খুঁটিতে লাগিল। সোমেন্দ্র ঝীকে তাহার পুনঃপুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া নীচে নামিয়া গেল। রাধারাণী নীরবে খোলা দরজার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল ইহারা কারা! তাহার জীবনে ইহাদের কি স্বার্থ। কেন তাহারা তাহার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার ও এত অর্থ ব্যয় স্বীকার করিতেছে! সহসা এক অজানা কিসের ভাবী চিত্র মানসপটে উদিত হইয়া রাধারাণী শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সোমেন্দ্রের সৌম্য শ্রী করুণা-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি তাহার নয়ন পথে ভাসিয়া উঠিল, তাহার স্নেহ-কোমল দৃষ্টিপাতে তাহার বুকে আশার সঞ্চার হইল, ভয়রা মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল

(৭)

শশীশেখর বলিল "না হয়, চল খেলা যাক্—"

"কি বল্লেন?" বলিয়া সোমেন্দ্র কানটা শশীশেখরের মুখের কাছে আনিল।

—সহানুভূতির বস্তাটা ত তোমার প্রাণেই ডেকেছে। আমি না হয় তার উপর বলেছি যে তবে তবে একটু খেলাই যাক্!"

"হারিলে ঐ হার নিব, জিতিলে মুকুলী দিব," প্রতিজ্ঞাটাও করে নেও সঙ্গে সঙ্গে।"

"মন্দ কি, ধর প্রতিজ্ঞা না হয় কল্লাম। হারলেও জিৎ কি না!

"নিশ্চয়ই! তবে কি না বাসর ঘরের পালাটা আগে ভাগে সাঙ্গ কল্লে আমরা দর্শকেরা ফাঁকতালে পড়ব শেষে।"

"আচ্ছা ফক্কড় ত!"

'বাঃ, ও কি কথা হোল! উভয় পক্ষে বাক্য অথবা ভাব বিনিময় না হলে পূর্ব্বরাগ কি কখনও এক তরফায় নিবিড় হয়!

শশীশেখর তখন তাহার কর্ণাকর্ষণপূর্ব্বক তাহার কবিত্বের পুরস্কার প্রদান করিল। সোমেন্দ্র কাণে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "এতটা অহঙ্কার ভাল নয়, আচ্ছা চল কোথায় যাবে চল!"

"খেলার কথা, কিন্তু আমি পাড়তে পারব না, সেটা তোমায় পাড়তে হবে।

"অর্থাৎ কি না মুখপত্র হয়ে আমায় সূচনা করে দিতে হবে। বাবুর বধূ সম্ভাষণেও সাহস কুলাচ্ছে না। বিয়ের সময় মালাটা গলায় দিতে না হয় আমায় ডেকো, তাতে বরঞ্চ এক আধটুকু লাভের সম্ভাবনা থাকবে।"

"লাভ চাও না কি, তা হ'লে পুরোই ছেড়ে দিতে পারি।"

"দাও যদি সয়।"

"আরে না, ঠাট্টা রাখ, গিয়ে কি বলা যাবে বল দেখি।"

"তার জন্য আবার ভাবনা? বলব—

"রিম্ ঝিম্ ঘনয়ে ঘন বরিষে—

গগনে ঘনঘটা শিহরে উঠে তরু লতা—"

"মধুর কাটিবে দিন পাশা কিম্বা তাসে—"

শশীশেখর রাগ করিয়া কহিল, "ফের্?"

রাস্তার দিকে জানালা খুলিয়া রাধারাণী দাঁড়াইয়া ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন আকাশের বারিবর্ষণ দেখিতেছিল। ঘরে পায়ের শব্দ পাইয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, ঝী রুটি দিতে দিতে তাহার ভূতপূর্ব্ব মনিবের বাড়ীর গল্প করিতেছিল, ঝীটা রাখিয়া সে তাহাদের বসিতে দিল।

সোমেন্দ্র বলিল, "কেমন আছেন এখন?"

রাধারাণী কহিল "ভাল আছি।"

"একলা আপনার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে।"

স্মিতমুখে রাধারাণী তাহা অস্বীকার করিল।

সোমেন্দ্র কহিল, "আঃ বৃষ্টিটা হয়ে বাঁচিয়েছে! কি ঠাণ্ডা হাওয়াটা আস্‌ছে! আপনি ঠাণ্ডা লাগাবেন না কিন্তু। শরীর এখনও দুর্ব্বল, আবার ব্যারামে পড়্‌বেন।"

রাধারাণী জানালার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল।

এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া সোমেন্দ্র কহিল, "বৃষ্টির মধ্যে আজ আর কিছু ভাল লাগ্‌ছে না! আসুন না একটু তাস খেলা যাক্।"

রাধারাণী হাঁ কি না কিছুই বলিল না। সোমেন্দ্র 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং'ধরিয়া নিয়া শশীশেখরকে কহিল, "শশীশেখর দেখ না এক জোড়া তাস পাও কি না।"

বলাবাহুল্য তাস শশীশেখরের পকেটেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সে দিব্য ভাল মানুষ সাজিয়া নীচে গিয়া, পাইচারী করিয়া আসিয়া তাস বাহির করিল।

খেলিতে বসিয়া রাধারাণীর প্রথম বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। জীবনের যে অদৃষ্টপূর্ব্ব অধ্যায়ে সে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার দিকে সে কেবলি বিস্ময়োদ্যতনেত্রে চাহিতেছিল, কোথায় যে ইহার সমাপ্তি, কোথায় যে ইহার সঙ্গতি, তাহা সে কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

খেলায় যে রাধারাণী বিশেষ পরিপক্ক ছিল, তাহা নয়, সোমেন্দ্র ও শশীশেখর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হারিয়া ও কাঁচা খেলিয়া জয়গর্ব্ব তাহাকে প্রদান করিল। সোমেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "আপনি মনে কচ্ছেন এ দুটো কি গাধা!"

প্রতিবাদ করিয়া রাধারাণী বলিল, "বাঃ, আমি বুঝি নিজেই জিতেছি! দৈবে জিত হয়ে গেছে, আমি খেলা জানি না।"

সোমেন্দ্র কহিল, "ওটা ত শিষ্টাচারের কথা।"

রাধারাণী জোর করিয়া বলিল, "কখ্‌খনো না।" আর একবার খেল্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন বিদ্যা কত।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, মেঘাচ্ছকার দিবসের মলিনমূর্ত্তি নভঃপট হইতে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া সোমেন্দ্র কহিল "আজ্‌কে আর নয়, কাল্‌কের জন্য সেটা মুলতুবী রইল।"

সিঁড়ী দিয়া নামিতে নামিতে শশীশেখর সোমেন্দ্রকে কহিল, "বাহাদুর ছেলে তুমি!"

সোমেন্দ্র কহিল, "তাই না কি? জান্‌তুম না সেটা, ধন্যবাদ যে জানিয়ে দিলে!"

"তোমার পুরাণ পরিচয়ের চালটাতে বাস্তবিকই আমায় আবাক্ করে দিয়েছিল। এমন ভাবে কথা কইছিলে যেন তুমি শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত না হয়ে ওঁদেরই গাঁয়ের শ্রীমতী স্বর্ণলতা অথবা চম্পকলতা।"

"তুমি ত তা বল্‌বেই, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর। বেচারাকে কয়েদ করে রেখেছ,—সেই অস্বাভাবিকতাটা ঢাকা দিতে পারে, তার অসঙ্গতিটা খণ্ডন করতে তোমার আয়োজন যে বৃহৎ হওয়া চাই, সেটা কি একবারও ভেবেছ, নইলে তোমার যত্ন অত্যাচারে দাঁড়াবে, তোমার সেবা পীড়নের রূপ ধারণ কর্ব্বে। অপরিচিতের কাছে মানুষের যে কুণ্ঠা দ্বিধা সংশয়—তার ভিতর মানুষ বাস করতে পারে না, তার চেয়ে কয়েদীর ঘর ভাল। সঙ্কোচ কাঁটার মত খচ্‌মচ্ করে বেঁধে।"

"হয়েছে বাবা! রক্ষা কর, আর নয়! এমন মূল্যবান সহানুভূতিটা অসাক্ষাতে প্রকাশ কর্‌লে যে মাঠে মারা গেল। তা তুমি ওখানে কিছু বল্লে ত পার্‌তে! আমাকে দিয়ে ত এ সব হবে টবে না। আমার কথা কইতেই বাধে!

"তোমার মত আমার মনে ত আর রাজা টোপরের স্মৃতি জাগে না।"

শশীশেখর মনে মনে সোমেন্দ্রের সত্যানুভব শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিল।

(ক্রমশঃ)

পতিভক্তি

(শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী)

প্রজাপতি নারীকে পিতৃকুল হইতে মুক্ত করিয়া যে স্বামীকুলে অধিষ্ঠিত করেন; ভগ, অর্য্যমা এবং সবিতা গৃহকর্ম্ম সম্পাদন-কল্পে নারীকে যে পুরুষের সহিত পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন; জনক-জননী স্নেহময়ী দুহিতাকে যাহার হস্তে সমর্পন করেন; কুশণ্ডিকাকালে নারায়ণ ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া নারী যাহার সহধর্ম্মচারিণী হন; যাহার সহিত রমণীর জীবনে মরণে, আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ; সেই পাতব্রতা ভগবানে ভক্তি, পতিব্রতার পূর্ণ নিদর্শন।

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, যে রমণী পুরুষ অপেক্ষা স্বভাবতঃই কোমল-স্বভাবা ও ভক্তিপরায়ণা। বৃন্দাবনের গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম, সেই কোমলাঙ্গীগণের স্বভাবজাত ভক্তির পরিচায়ক। ভক্তি ত্যাগেই পরিস্ফুট। ত্যাগ ব্যতীত ভক্তি হয় না—আবার ভক্তি ব্যতীত ত্যাগও সম্ভবপর নয়।

ভক্তি প্রেমের নামান্তর। প্রেম-ভগবানে, পতি পত্নীতেও মাতৃত্বে পূর্ণ প্রকাশিত। প্রেম পাদপ শাখায় মঞ্জুর্য্যব, সভ্যতাও সমাজ ফলরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রেম আকাশ হইতে বৃষ্টি অথবা তুষারের ন্যায় পৃথিবী-বক্ষে নামিয়া আসে নাই—পৃথিবীতেই ইহার জন্ম।

জগতের যতগুলি জীব বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার শত সহস্র গুণ জন্মগ্রহণ করে এবং এক গ্রাস খাদ্যের মধ্যে শতাধিক দাবীকারী উপস্থিত হয় বলিয়া, জীবের পক্ষে জীবন একটা বিষাদপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস। এই অসম্পূর্ণ সত্যকে অবলম্বন করিয়াই কবি বোধ হয়, প্রকৃতিকে রক্তদশনরূপিনী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতির সমস্তটা যদি স্বার্থের সংগ্রাম বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে অবিচার করা হইবে। পরিণামে একটা স্বার্থপরতা আছে—উহা প্রেমের বিবরণ। প্রত্যেক জীবের জীবনে এই স্বার্থের সংগ্রাম ও পরার্থে জীবনোৎসর্গ করিবার ইচ্ছা লক্ষিত হয়। একটি স্বার্থাভিমুখী, সঙ্কীর্ণ, অপরটী পরার্থ প্রয়াসী, বিশাল; একটী মর্ত্ত্য, ভৌতিপূর্ণ, অপরটী স্বর্গীয় প্রীতিপূর্ণ; একটী ব্যক্তিগত, ক্ষণস্থায়ী, অপরটী বিশ্বগত, চিরস্থায়ী। একটী রূপণ অপরটি বদান্য; একটী আয়াসপূর্ণ সংগ্রহপরায়ণ, অপরটী ত্যাগী; একটী মলীমলিন, অপরটী দ্যুলোক দীপ্তি বিমণ্ডিত। এই উভয় প্রকার তত্ত্বতে জীবনের বয়ন সাধিত হয়। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির অপেক্ষা উজ্জ্বল। প্রেম পর-জীবনার্থে জীবনের সর্ব্বস্বদান করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়ে।

সিন্ধুনদী যেমন নিজের প্রভূত বারি-বর্ষণে সমস্ত নদীর উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করে, সেইরূপ আমাদের সাবিত্রী রূপিণী জগজ্জননীগণ শ্বশুর-কুলে সমাজ শিক্ষয়িত্রী জননীরূপে, স্বামীশক্তি বিধায়িনী সহধর্ম্মিণীরূপে, সৌভাগ্যদায়িনী মহালক্ষ্মীরূপে, জ্ঞানময়ী গায়িত্রীরূপে, অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণারূপে এবং সংসারোজ্জ্বলা শান্তিময়ী দেবী রূপে আত্মপ্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকেন।

জনম দুঃখিনী সীতা পতি কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াও একদিনের জন্য ও স্বামীর পাদুকা পূজায় বিরত হন নাই। সতী সাধ্বী সাবিত্রী সতীত্ব বলে কঠোর তপস্যা ফলে, স্বামী সত্যবানের জীবন লাভও পিতৃ-মাতৃ কুল উদ্ধার করিয়া সতীত্বের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। দক্ষসুতা দাক্ষায়িণী দক্ষালয়ে পতিনিন্দা শ্রবণে আপন অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বেহুলা পতির পূতিগন্ধময় মৃতদেহ লইয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে চিরভাস্বর জগতে অমরত্বের আভায় দেদীপ্যমান। পতিভক্তি বলে সতীলক্ষ্মী চূড়ালা দেবী মোক্ষকে করতলগত করিয়া অজ্ঞানাবৃত শিখি-ধ্বজকে মোক্ষমার্গে আনিতে পারিয়াছিলেন। কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত গলিত পঙ্গু পতির মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে সতীসাধ্বী স্বামীকে বেশ্যা লক্ষ-হীরার ভবনে লইয়া গিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের জয়ধ্বজা তুলিয়া গিয়াছেন। সতী শিরোমণি শৈব্যা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দক্ষিণাদায় হইতে পতি হরিশ্চন্দ্রকে উদ্ধার করিয়া পতি-প্রেমের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত জগৎ সমক্ষে দেখাইয়া গিয়াছেন। পদ্মাবতী স্নেহের দুলাল বৃষ-কেতুর মাংস ব্রাহ্মণ বেশী ভগবানকে খাওয়াইয়া, পতির দাতাকর্ণ নামে কলঙ্ক লেপন করিতে দেন নাই। পতিব্রতা পতিব্রতা ব্রাহ্মণ দুহিতার কুষ্ঠরোগা-ক্রান্ত স্বামী কৌষিকের স্পর্শে মাণ্ডব্য মুনি রাগান্বিত হইয়া, কৌষিকের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মৃত্যু হইবে বলিয়া শাপ দিলে, সতীসাধ্বী পাতিব্রত্যবলে সূর্য্যকে অস্তমিত হইতে দেন নাই। পরে ব্রহ্মার বরে প্রাণ পাইলে, সতীবাক্যে আবার সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইয়া, সতী মহিমোজ্জ্বল কিরণ বিকীরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শতশত উদাহরণে পতিভক্তি পরাকাষ্ঠার পুণ্যপ্রবাহের নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

হিন্দু সংসারে, পতি, পত্নীর রক্ষক ও প্রতিপালক, পত্নী, পতির সহধর্ম্মিণীও জীবন মরণের সাঙ্গিনী; পত্নীর যাগ যজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠানের সহকারী, সুখদুঃখ পারাবারের একমাত্র তরণীও ইহপরকালের দেবতা, পত্নী পতির বশীভূতা প্রিয়বাদিনী, গৃহকার্য্যে নিপুণা, সদাচার-যুক্তা লক্ষ্মীস্বরূপা ও সংসারাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পতি গুরু, পত্নী শিষ্যা, পতি দাস, পত্নী দাসী; পতি সখা, পত্নী সখী; পতি কায়া, পত্নী ছায়া। পতির দাসত্ব শৃঙ্খল ভার, পত্নীর ত্যাগ স্বীকার—উভয়ের প্রকাশে সৃষ্টির প্রবাহ রক্ষা করে। জানিনা; জগতের আর কোথাও পতিপত্নী এই ভাবে সংসার সুশোভিত করিয়া থাকেন কি না?

পতিভক্তি শুধু যে, স্বামীর জীবদ্দশায় দেখিতে পাওয়া যায়, এমন নয়। পতির মৃত্যুতেও পত্নীর হৃদয়ে ইহা সমভাবে জাগরুক থাকে। আহারে, বিহারে, শয়নে স্বপনে, বিপদে সম্পদে, আনন্দে বিষাদে, সুখে দুঃখে যাঁহার মধুময় স্মৃতি বিজড়িত; যাঁহার তির-স্কার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ, বাক্যমধু স্বরূপ, উপদেশ অমৃত স্বরূপ, আজ্ঞা বেদবাক্য; যাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য অলঙ্কারের সৃষ্টি, আমোদ আয়োজন, বেশভূষার পরিপাঠ্য; যাঁহার সহিত ইহ পরকালের সম্বন্ধ, হিন্দু বিধবা পতির সেই মধুময় স্মৃতি বক্ষে করিয়া সেই প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতিচ্ছবি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া আজীবন বিলাস বাসনা বিসর্জ্জনে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বনে, বৈধব্য মহাযজ্ঞে পতিকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। পতির সেবায়, পতির ধ্যানে সতীর যে সুখ, যে আনন্দ, যে তৃপ্তি, তাহার আর তুলনা আছে কি? রাজার রাজসুখ ও বোধ হয়, তাহার তুলনায় তুচ্ছ।

অনন্তরূপিনী প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে নারী মহিমা নানারূপে বিকসিত। কিন্তু ভারতে পতিভক্তির মহিমাই অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে বীর নারীর অভাব নাই, বিদুষী ও নিতান্ত বিরল নয়; কিন্তু পতিব্রতা ধর্ম্মই ভারত রমণীর অনন্যসাধারণ ধর্ম্ম—অসাধারণ নিদর্শন। যমালয় অপেক্ষাও ভীষণ রক্ষোপুরীতে, অশোক কানন-তলে সতীর পতিপদ সাধনার ক্ষেত্র। ক্ষীরোদ-

সাগরে সহস্রফণ অনন্তদেব ফণা-শয়ান, নারায়ণের পাদমূলে কমলা, কৈলাসে যোগেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গ রূপে সতী। আর উর্দ্ধে অনন্ত আকাশপটে সিন্দোজ্জ্বল সপ্তর্ষি মণ্ডল মধ্যে অরুন্ধতী দেবী চির দীপ্তিময়ী প্রতিভক্তির জলন্ত ছবি। স্বর্গে মর্ত্ত্যে চির-ভাস্বর জগতে পবিত্র নারী মহিমার অবিনশ্বর আদর্শ।

আবেদন

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

ছুঁয়েনে আজ একটা ফুল! বনের দোলায় সবুজ দোলে,
একটা-দুটো গানের পাখী আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে!
চুটকী-পরা পায়ের তলায়,
দুর্ব্বাদলের ঘুম ভেঙে যায়,—
থাকলে তোমার গোপন কথা আমার কাণে আজ্‌কে বোলো,
তার আগে ভাই এক মিনতি—ঘোম্‌টা খোলো, ঘোম্‌টা খোলো!

*

নদীর বুকে আজ বসেচে জলপরীদের গানের সভা,
দুই তীরে তার ফুলের আসর—জুঁই, চামেলী, গাঁরুল, জবা।
তোমার বুকের অঞ্চলেতে,
বাতাস যে চায় মূর্চ্ছা যেতে,
নই আমিও ভালো মানুষ—এই টুকু সই সমঝে চোলো,
আর তো আমার সঁইটে না তর্—ঘোম্‌টা খোলো, ঘোম্‌টা খোলো!

*

জ্যোৎস্না-রঙে ডুবিয়ে তুলি চন্দ্র কি আজ নক্‌সা করে,
পূর্ণিমা শোন্ বাজায় বীণা মনের ভেতর স্বপ্ন-স্বরে!
হোয়োনা ভাই জ্যান্ত পাষাণ,
অশ্রুজলে প্রেমের ভাষান্
আজ দিওনা! আজ্‌কে খালি চোখের ভাষায় মাতিয়ে তোলো!
ওগো আমার ভালোবাসা!—ঘোম্‌টা খোলো, ঘোম্‌টা খোলো!

হতভাগ্য

(চিত্র)

[শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ]

আমার নামটা তোমাদের বলব না, আর জেনেই বা কার কি লাভ হবে? দুঃখের কথাটা শুনাব -না শুনিয়া আর থাকতে পারছি না। এত দিনে কাউকে বলি নি -শুম্‌রে শুম্‌রে পাগল, হবার জোগাড় হয়েছি। তাই আজ বলব। আমার বাপ মা আমায় একলা ফেলে যখন নতুন দেশে সংসার পাততে চলে গেছলেন, তখন আমার বয়স তিন বছর মাত্র। আমায় মানুষ করতে বাবার পুরাতন চাকর,—তাঁকে আমি 'শিবু কাকা' বলতুম। শিবুকাকা আমায় খুবই ভাল বাসতেন। কিন্তু তার ভালবাসা আমাকে বেশী দিন ভোগ করতে হয় নি। হঠাৎ একদিন হতভাগা যমদূত এসে তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল। আমি তখন সবে বার বৎসরে পড়েছি ;—

সংসারে আমি একা—আমাদের একটা কুঁড়ে ঘরে পড়ে' থাকতাম। কুঁড়ে হ'লেও সে'টা পৈতৃক ভিটে, বড়ই আদরের, বড়ই গর্ব্বের। কুঁড়ের চারধারে মনসা-কাঁটার বেড়া, পিছনে একটা ছোট বাগান ;—আর ছিল বাবার বড় আদরের গরু লক্ষ্মী। লক্ষ্মী—সত্যই লক্ষ্মী,—আমায় খুবই ভালবাসত, আর আমার দিকে চেয়ে তা'রও চোখ বেয়ে জল পড়ত! কাকা যখন যাবার সময় লক্ষ্মীটিকে দিয়ে গেলেন, আমি তা'কে পেয়ে খুব আমোদ আহ্লাদ করতুম,—কখনও তা'র ল্যাজ ধরে টানতুম, কখনও বা শিং ধরে' আমোদ করতুম। লক্ষ্মী কিন্তু তা'তে আদৌ রাগ করত না। আর বাঁটে হাত না দিতেই ক্ষীরধারের মত দুধ ঢেলে দিত। তাই খেয়েই আমি এক রকম কাটিয়ে দিতেম।

কিন্তু হায়! লক্ষ্মীকেও আমি রাখতে পারলুম না। পাড়ার লোকেরা আমার দুঃখে সহানুভূতি করা দূরে থাকুক,—আমার লক্ষ্মীটিকে নিয়ে গেল। আমি তা'কে রাখবার জন্যে কত তা'দের কাছে কাকুতি মিনতি করলুম,—বল্লুম "ওগো, আমার আর কেউ নেই ;—আমার লক্ষ্মীটিকে নিয়ো না। এ'কে দাও,—ছেড়ে দাও। তোমরা ঘর বাড়ী নাও, জিনিষ পত্তর নাও, সব নাও, কিন্তু আমার লক্ষ্মীটিকে নিয়োনা।" অবুঝ লোকেরা কেউই আমার কথায় কাণ দিলে না। দু' একজন বরং আমাকে ধমক দিয়ে বল্লে "চুপ্, কর্ ছোঁড়া, তোর কাকা আমাদের কাছে দেনা করেছিল, তা'র শোধ করবে কে?" আমি অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। লক্ষ্মীকে তা'রা কেড়ে নিয়ে গেল। আমার বড় আদরের লক্ষ্মী ও—এ' বাড়ী ছেড়ে এক পা'ও যাবে না স্থির করে ঢের বাঁধা দিয়েছিল ; কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলে না। তা'রা জোর করে নিয়ে গেল। আমি সে' বিদায় দৃশ্য দেখতে পারলুম না। ঘরের ভিতরে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লাম।

এই রকম ক'রে কতক্ষণ যে আমার সময় গেছল আমি বুঝতে পারি নি। তখন ঘরে ঘরে শাঁখের ধ্বনিতে গ্রামখানা মুখরিত হচ্ছিল, এমন সময় কা'র যেন গলার স্বর শুনতে পেলুম। মাথা তুলে দেখ্‌লুম—একটি ছোট্ট মেয়ে ; তা'র কালো কালো চোখ আমার দিকে পড়ে রয়েছে। চোখের পাতা গুলা ভিজে যাওয়ায় তা'কে আমি ভাল রকম দেখতে পেলুম না। সে আমার দিকে খানিকটা তাকিয়ে বল্লে, "দাদা ওঠ।" স্বরটা যেন চেনা—চেনা, তবুও ভাল করে ধরতে পারলুম না। মেয়েটি আবার

বল্লে "ওঠ, দাদা, সন্ধ্যে হ'ল। একটু মিষ্টি মুখ কর।"

হ্যাঁ, এইবার আমি তা'কে চিনতে পেরেছি। সে যে আমার পাড়ারই মেয়ে—বিনুদা'র বোন। আহা বেচারির মা নাই ;—ভাই ও নিরুদ্দেশ। মাতৃহারা বালিকার আছে, "শুভাকাঙ্ক্ষিণী" সং'মা ; বাপ তার কথায় উঠেন বসেন। করুণা কেমন করে' এখানে এল?

আমার একটু রাগ হয়েছিল, বল্লুম, "তোমার বাবা আমার লক্ষ্মীকে কেড়ে নিয়ে গেছেন, আমি উঠবও না, মিষ্টি খাবও না। করুণার রাঙা ঠোঁট দু'খানি অভিমানে ভরে কেঁপে উঠ্‌ল। আমার দিকে সজল চোখ চেয়ে যখন সে বল্‌লে, "খাও দাদা, ওঠ,—আমিই যে তোমার লক্ষ্মী, তখন আমার মনে যে কি এক মধুর ভাবের উদয় হয়েছিল তা' আমি ভাষায় বলতে পারব না। আমি উঠে বস্‌লুম। চোখে মুখে জল দিয়ে বল্লুম, "আজ, থেকে তুমি আমার কাছে করুণা নও,—লক্ষ্মী—দাও তোমার মিষ্টি খাচ্ছি। করুণা যে খুবই খুসী হইয়াছিল, তা, তার লাল মুখ খানা দেখে বেশ বুঝা গেল। করুণা বল্‌লে "দাদা, শুধু দুটো মিষ্টি খেলে ত পেট ভর্‌বে না। আমি বাড়ী থেকে খাবার এনে দিই।" আমি বল্লুম "তুমি কোথা হ'তে খাবার দেবে, করুণা?, থাক্, আজ আর কিছু খাব না।" করুণা ফিক্ করে হেঁসে বল্‌লে, "হ্যাঁ, দু'টো মুড়কী বাতাসা খেলে খুবই পেট ভরে! তুমি একটু বস, আমি এই এলুম ব'লে।" আমি তা'কে বাধা দিয়ে বল্লুম, "না না, আমার পেট ভরে' গেছে ;—তোমাকে আর গিন্নীপণা করতে হবে না। যখন দরকার হবে, করো।" কথাটা বোধ হয় তা'র কাণে ভাল রকম পৌঁছেনি, সে বল্‌লে, "তোমাকে খেতেই হবে, দাদা। যদি না খাও ত' আমার···।" বাধা দিয়ে আমি বল্লুম, "আচ্ছা, আচ্ছা, খাব। আজ থেকে তোমায় কিন্তু লক্ষ্মী বলব, করুণা বলব না।" কথাটা শুনে তা'র মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল। ছোট হাতের আঙুলগুলি নেড়ে বল্‌লে, "বেশ, তুমি যা' খুসী তা' বলো, কিন্তু একটা কথা,—আমায় তুমি কখনও 'তুমি' বল্‌তে পারবে না ;—'তুই' বলো।" আমি হেসে বল্লুম, "বেশ, বেশ, তাই বলব। তুমি—না, না, তুই—কাল তা' হ'লে এস—যা, আবার ভুলে বল্লুম—আসিস্ কেমন?" দুষ্টুমীর হাসি হেসে বল্‌লে, "আস্‌ব বৈকি দাদা, কিন্তু আজকের মত যা' বল্লুম তা' মান্‌বে কি না বল?" আমি গম্ভীর ভাবে বল্লুম, "কাজে কাজেই ;—কি আর করি বল? তোর সঙ্গে পেরে ওঠা আমার মত লোকের কর্ম্ম নয়।"

"আচ্ছা চল্লুম এখন" বলে' সে হঠাৎ কোথায় যে চলে গেল, আমি আর দেখ্‌তে পেলুম না।

লক্ষ্মী এমনি ধারা রোজ আসে, আর আমার খাওয়া দাওয়ার খুবই সাহায্য করে। সে তা'র বাপ মা'র অজ্ঞাতে যে আস্‌ত এটা আমি বেশ বুঝতে পারতাম। আট বছরের মেয়ে কেমন করে সে ভাতের হাঁড়ী নিয়ে নাড়াচাড়া করে, এটা আমি ভেবেও ঠিক করতে পারি নি, বাগান থেকে আলু, বেগুণ, শাকশব্জী রোজই সে আমার জন্য আন্‌ত। কিন্তু এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে চলাও আর বেশীদিন চলিল না। একদিন তা'র সৎমার নজরে পড়ে' গেল। তা'র পর যে তা'র কি হ'ল সে'কথা আমি এখানে বল্‌ব না। আমি বল্লুম, "লক্ষ্মী! তুমি কেন তোমার সৎমা'র কাছে থাকবে? আমার কাছে থাক, তা' হ'লে তোমার কোনও কষ্ট হবে না।" বোধ হয় তখন তা'র মনে মাতৃত্বটি জেগে উঠেছিল। কাল চোখ দুটিতে কোত্থেকে করুণ অশ্রু এসে তা'র চাহনি ঝাপ্‌সা করে দিয়ে গেল। চোখ দুটি কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে লক্ষ্মী বল্‌লে, "তা' হ'লে বাবার কি হবে, দাদা?" হায় রে সরলা মেয়ে! এমনি তোর পিতৃভক্তি! আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে এসেছিল; বেশী কথা কহিতে পারলুম না।

প্রায় দু'সপ্তাহ কেমন করে' কেটে গেল বুঝতে পারলুম না। লক্ষ্মী আর আমাদের বাড়ীতে আসে না। হয়ত' তা'র বাপমা তা'কে আসতে বারণ করেছে, না হয় তা'র অসুখ করেছে। মনটা বড়ই, অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। কিছুই ভাল লাগ্‌ত না;—খেয়ে দেয়ে চুপ করে হয় শুয়ে থাকতুম; না হয় আম-গাছটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাক্‌তুম। সেদিন ভোর বেলা ঘরের দরজা খুলে সবে বাহিরে পা দেব, এমন সময় দেখি লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে। আমি অবাক হয়ে গেলুম; বল্লুম,—"কেমন করে এখানে এলি, লক্ষ্মি? তোর কি হয়েছিল যে আসিস্ নি?" লক্ষ্মী আবার আগেকার মত দুষ্টমীর হাসি হেসে বল্লে, "আস্‌তে নিষেধ;—তাই আসি নি। আজ একটা মিছে ছল করে' তবে তোমার দোরে পা মাড়াতে পেরেছি, দাদা।" আমি একটু গম্ভীর অথচ রাগত ভাবে বল্লুম, "কাজটা কি ভাল হ'ল, লক্ষ্মী? সকাল বেলা উঠেই একটা মিছে কথা।" লক্ষ্মী তা'র ঘাড় বাঁকিয়ে অভিমান ভরে' বল্লে, "তা' হ'লে তুমি আমায় ভাল-বাস না, কেমন? আমি যে তোমায় না দেখে থাকতে পারি না, দাদা!" আবার সেই মধুর স্নিগ্ধ চোখ দু'টি আমার দিকে পড়্‌ল। আনন্দে আমার শরীর কাঁপ্‌ছিল হঠাৎ ভাবের আবেগে তা'কে বুকের ভিতর জড়িয়ে নিয়ে বল্লুম, "বেশ করেছিস্ দিদি আমার, তুই একবার কেন, একশ'বার আস্‌বি। এ বাড়ীও যে তোর।" কথাটা শুনে কিন্তু তার রাঙা মুখখানি লজ্জায় আরও রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। লাজ-মাখান মুখের আভায় ভোরের আলো পড়ে' একটী দিব্য ছবি দেখ্‌তে হয়েছিল। আমি তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লুম—অনেকক্ষণের মধ্যে সে, লজ্জামুখী, আমার কবল থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

* * * *

তা'র পর অনেক বছর কেটে গেছে। আমিও গ্রাম ছেড়ে দূরে চলে গেছি। যাবার সময় লক্ষ্মীকে দেখ্‌বার কোনও সুবিধে পাই নি। দেশে তখন দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা সুরু হয়েছে। লোকের কষ্টের সীমে নেই। আমিও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের একজন হয়ে পড়্‌লুম। কাজের অন্ত নেই;—সবাই প্রাণ দিয়ে খাট্‌ছে। একদিন কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় আমাদের দলের নেতা আমাকে ডেকে বল্লেন। "তোমার নামে একটা জরুরী তার এসেছে, তোমায় দেশে ফির্‌তে হবে।" আমার তখন টেলিগ্রাম পড়্‌বার সময় ছিল না; বল্লুম, "কি কথা লেখা আছে?" তিনি বল্লেন, "তোমার কে দীনুদা' দেশে ফিরেছেন,—তিনি লিখ্‌ছেন বাড়ীতে অসুখ, শীঘ্র এস।" মনটা আবার ঘর পানে ছুটে গেল;—অসুখের কথাটা শুনে প্রাণও কেঁপে উঠ্‌ল। কা'র অসুখ? লক্ষ্মীর কি? ভাব্‌তে ভাব্‌তে ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালুম। কাজ ছাড়তে আবার ইচ্ছে হ'ল না, কিন্তু কাজে যে মন বস্‌বে না, এ'ও খুবই জান্‌তুম। গাড়ী এসে পড়্‌ল।

সমস্ত পথ কি রকম ভাবে চলে গেল তা' অন্তর্যামীই জানেন! ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট ষ্টেশনে গাড়ী থামতে চট্ করে নেমে দৌড়তে লাগ্‌লুম। পথের লোকে বোধ হয় আমাকে পাগল, বলেই ধরে নিয়ে ছিল। আমার স্বদেশে, আমার প্রিয় জন্মভূমিতে আসিয়া সেই গ্রাম খানিতে পৌঁছিতে বেশীক্ষণ লাগ্‌ল না। তবে কা'র অসুখ?—ও! লক্ষ্মীর বোধ হয়! আবার তাদের বাড়ীর দিকে ছুটলুম! কিন্তু একি! দীনুদা মাথায় হাত দিয়ে বসে কেন? হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে বল্লুম, "দীনুদা—দীনুদা—এই যে আমি,—আমি এসেছি। কি হয়েছে বল?" দীনুদা মুখ তুলে' আমার দিকে চাহিলেন, কোনও কথা না বলে' ঘরের ভিতর যেতে ইঙ্গিত করেন। আমি ছুটে ভিতরে গেলুম, ঘরে গিয়ে দেখি,—আমার সেই লক্ষ্মী দিদি নতুন বেশে নতুন রাজ্যে চলে গেছে। তখনও তা'র মুখের সেই হাসি, সেই রক্তিমাভ, অবিকৃতভাবে ফুটে রয়েছে। চোখের জল ফেল্‌তে পড়ে রইল তার দীনুদা, আর এই হতভাগা।

ক্ষুদ্র

(শ্রীগিরিজাকুমার বসু)

বাক্য রবে চিরদিনই সাক্ষ্য কি এই বাঙ্গালীর
উপোস ক'রে হৃদয়-বধূ রইবে প্রণয়-কাঙালীর;
দরাজ প্রাণের মানুষ কজন? স্বরাজ হেথায় ক'র্‌বে কে
প্রেমের তরে ছাড়্‌বে সবি, হেলায় বল ম'র্‌বে কে?

যন্তরে তার চ'ল্‌বে জীবন? অন্তরে যার তৃপ্তি নেই;
শুকিয়ে গেছে বুকের সুধা চক্ষে যাহার দীপ্তি নেই;
লক্ষ্মী যাহার বেড়ী-পরা, ধর্ম্ম যাহার মর্ম্মহীন;
কণ্ঠ যাহার দম্ভ-ভরা, নিত্য যাহার কর্ম্ম ক্ষীণ।

তুচ্ছ তাদের উচ্চ আসন প্রেম্‌টা যাদের লক্ষ্য নয়
চাইনা কো কেউ হোক্ গে তাদের দিনে দিনেই পক্ষ ক্ষয়;
আমি তাদের ক্ষুদ্র বলি, রাজা কিম্বা বাদ্‌সা হন
পড়ুন তাঁরা গীতা কিম্বা পড়ুন তাঁরা বাৎস্যায়ন।

চিত্ত যাহার রসে কোমল, বিত্তে যেজন লুব্ধ নয়,
আত্মজনের অপমানে, আত্মা যাহার ক্ষুব্ধ হয়
তেমন মানুষ তৈরী কর', দশটা যদি হয় তো বাস্
শুচি-বা'য়ের পাথর ঠেলে, বা'স গো তোরা ভালোবাস্।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

(উপন্যাসের আর্ট)

[শ্রীশিবপ্রসাদ রায়, বি এল]

বাঙ্গালার সাহিত্যগগনে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। এই দুইটি সাহিত্য-সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অনেক গ্রহ উপ-গ্রহেরা আপন আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকেরই নিজস্ব কোনও ঔজ্জ্বল্য নাই; এই দুইটি সাহিত্য-সূর্য্যের আলোকেই তাহারা দীপ্তি-মান। এই দইজন সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্গসাহিত্যে দুইটী বিভিন্ন যুগেরও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সাহিত্যিক আদর্শও প্রণালীর মধ্যেও যে একটা স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইহাদের উপন্যাসের আর্টের বিশেষত্ব এবং কি উপায়ে তাঁহারা তাঁহাদের 'আর্ট'কে স্ব স্ব কাব্যে প্রকটিত করিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এখন দেখা যাউক্ 'আর্ট' কি? সাধারণতঃ 'আর্ট' বলিতে কৌশল,—শিল্পকলা কৌশল বুঝায়। প্রত্যেক শিল্পেরই উদ্দেশ্য কেবল প্রকৃতি কে হুবহু নকল করা নয়। এরূপ করার অবশ্য যে প্রয়োজন আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করেন না; ইহা ছাড়া শিল্পী তাহার শিল্পে একটা নিজস্বের ছাপ দেন, যাহা স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জিনিষটাই হচ্ছে 'আর্ট'। ইহা ছাড়া শিল্পীর শিল্পই কল্পনা করিবার উপায় নাই। উপন্যাস শিল্পের অঙ্গীভূত; সুতরাং ইহাকেও সম্পূর্ণ আর্টের উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। মনীষীরা এই আর্টকে বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায় অভিহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুপণ্ডিত W. B, Worsfield সাহেব বলেন, "Art is the presentation of the real in its mental aspect."

অর্থাৎ প্রকৃতকে কল্পনার তুলিকায় অঙ্কিত করিবার যে উপায় তাহাকেই 'আর্ট' বলা যায়। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত রুষ সাহিত্যিক Count Tolstoy তাঁহার "What is Art" নামক গ্রন্থে 'আর্টের' নিম্ন লিখিত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছে,—

Art is a human activity consisting in this that one man consciously or unconsciously by means of certain external signs, hands on to others feelings he has lived through and other people are infected by those feelings and also experience them." অর্থাৎ পাঠকের মনে স্রষ্টার অনুভূতির সঞ্চালনের যে উপায় তাহাকেই 'আর্ট' বলা যাইতে পারে। প্রকৃতির হুবহু ফটো লইলে এইরূপ অনুভূতির সঞ্চালন হয় না; তাই তাহার মধ্যে কোনও 'আর্ট' থাকে না। ইহা সত্ত্বেও আমরা যে, 'আর্টের স্বাভাবিকতা' ও 'আর্টের' অস্বাভাবিকতার কথা বলি, তাহার অর্থ এই যে, যে টুকু অংশ সহজে এবং সরল ভাবে আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে তাহাকেই আমরা আর্টের স্বাভাবিকতা বলি এবং যাহা সহজে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে চাহে না, তাহাই আর্টের অস্বাভাবিতা।

প্রতিদিন আমরা যে সহস্র সহস্র প্রাকৃতিক দৃশ্যও সাংসারিক ঘটনা দেখি এবং প্রতি নিয়ত আমরা যে সকল কথা বার্ত্তা শ্রবণ করি, তদ্বারা আমাদের মনের যে একটা স্থায়ী প্রভাব সৃষ্ট হয় তাহা বলিতে পারি না। তাহার কারণ আমরা যাহাকে প্রকৃত আর্ট বলি ইহার মধ্যে তাহার অভাব দৃষ্ট হয়। একজন ব্যক্তি বা পরিবারের জীবনে প্রতিদিন যাহা ঘটে তাহার হুবহু বর্ণনায় একটা উপন্যাস বা একখানি কাব্য তৈয়ারী হইতে পারে না। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যেরূপ ভাবে কথাবর্ত্তা কহি, তাহার অবিকল অনুকরণ ও কাব্য বা উপন্যাসে স্থান পাইতে পারেনা। কতকটা ছাঁটিয়া কাটিয়া, কতকটা কল্পনার রঙ্গে রঞ্জাইয়া চিত্রিত করিতে পারিলে, তবেই তাহা কাব্যের উপযোগী হয়।

সুতরাং কবি বা আর্টিষ্টের কাজ শুধু প্রকৃতির অনুকরণ করা নয়;—কিছু নূতন জিনিষ সৃষ্টি করা। এক কথায় বলিতে গেলে সৌন্দর্য্য ও রস সৃষ্টি করা উহাদের কাজ। কবি যাহাকে Artistic interpretation of life দিয়া আপনার কাব্যে প্রতিফলিত করিতে পারেন, তাহাই সহজে আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই, যে রস ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার যে কৌশল—যাহাকে আমরা 'আর্ট' বলি, তাহার মূলে আছে কবির সেই কল্পনা টুকু যাহা ছাড়া কবিও শিল্পের শিল্পই কল্পনা করা যায় না।

এখন দেখা যাক্ কি করিয়া উপন্যাসে এই রসও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করা যায়। উপন্যাসকে জীবনের অভিব্যক্তি বলা চলে; সুতরাং উপন্যাসের মধ্য দিয়া জীবনকে সুচারুরূপে, সঙ্গতও সর্ব্বাঙ্গীন বা আংশিক ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার যে কৌশল তাহাকেই উপন্যাসের আর্ট বলা যাইতে পারে। কিন্তু জীবনটাত একটা সরল কিছু নয়—ইহাকে আমরা যতই ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে নানা বিচিত্রতা ও নানা জটিলতা রহিয়াছে। আবার এ গুলির মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা ও ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটা জটিল জিনিষ প্রকাশ করিতে হইলে, সকলেই যে এক রকম পন্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা ত মনে হয় না; কারণ সকলেই যে এই জটিল জীবন-সংগ্রামের সবদিক্ ঠিক একরকম ভাবে দেখিবেন, এরূপ আশা করিতে পারা যায় না; অধিকন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকাশের প্রণালীও লিখন-ভঙ্গীর গুণে পার্থক্য দৃষ্ট হইবেই হইবে। বিভিন্ন আর্টিষ্টের আর্টের মধ্যে তাই তারতম্য দৃষ্ট হয়।

চিত্রকর যেমন রেখা ও রঙ্গের সাহায্যে চিত্রের মধ্যে জীবনকে ফুটাইয়া তুলে, ভাস্কর যেমন পাথর কুঁদিয়া একখণ্ড নির্জীব প্রস্তরে জীবন দান করে, ঔপন্যাসিকও তেমনই কথার ইন্দ্রজাল বুনিয়া প্রকৃতির প্রতিচ্ছবিতে জীবনের অনুভূতি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া ইংরাজী করিয়া যাহাকে artistic interpretation of life বলেন তাহা দিয়া বিচিত্র রস ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন। সুতরাং চিত্রকারের আর্ট, রেখা ও রঙ্গের উপযুক্ত সমাবেশে বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টিতে, ভাস্করের আর্ট পলতুলিয়া ও কুঁদিয়া বিচিত্র ভঙ্গী বাহির করাতে, আর ঔপন্যাসিকের আর্ট কথা সাজাইয়া বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের সৃষ্টিতে দেখা যায়। উপন্যাসে গল্পাংশে (plot) আর চরিত্র সৃষ্টিতে জীবনকে ফুটাইয়া তুলা যায়।

বিভিন্ন চিত্রকরের মধ্যে যেমন রেখা ও রঙ্গের প্রয়োগ প্রণালীর অনেকটা পার্থক্য লক্ষিত হয়, বিভিন্ন ঔপন্যাসিক দিগের মধ্যেও তেমনই চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনা-বিন্যাস প্রণালীর যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই পার্থক্যের কারণ কতকটা যুগধর্ম্ম ও কতকটা ঔপন্যাসিকদিগের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব। জীবনের অভিজ্ঞতা ও উচ্চাদর্শের ধারণা, ভাবপ্রকাশ করিবার লিখনভঙ্গী, স্বাভাবিক ক্ষমতার উপরই এরূপ বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গসাহিত্যের এই দুইজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের শিল্পচাতুর্য্যের হিসাব নিকাশ করিতে হইলে, আমাদিগকে এখন তাঁহাদিগের উপাদান ও প্রকৃতির প্রত্যেক খুঁটিনাটির বিচার করিতে হইবে। বিষয়-নির্ব্বাচন ও ঘটনা-বিন্যাসের তাঁহাদের কিরূপ প্রণালী, চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার তাঁহাদিগের কি রকম কৌশল, রস সঞ্চারের তাঁহাদিগের কি কি উপায়, জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কি রকম ধারণা এবং কোন বিশেষ দিক হইতে তাঁহারা জীবনকে পর্য্যালোচনা করিতেছেন তাহা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

উপন্যাসের উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, সর্ব্বপ্রথমে আখ্যায়িকার বর্ণিতব্য বিষয়ের কথাই আমাদের মনে পড়ে। উপন্যাসের গল্পাংশকে (plot) একটা মনোরম শিল্পহর্ম্ম্যে পরিণত করিবার কৃতিত্ব অনেকটা বিষয় নির্ব্বাচনের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে। শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টরা অবশ্য উপন্যাসের এই বিষয় একেবারে জীবন হইতে সংগ্রহ করেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এগুলি যে জীবনের কত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কিরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর ঘটনার উপরে যে তাঁহাদের ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' 'রাজসিংহ' 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষ' এবং 'চোখের বালি' 'নৌকাডুবি' 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' পাঠ করিলে আমরা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'নৌকাডুবি' 'আনন্দমঠ' হইতে 'গোরা' এবং 'বিষবৃক্ষ' হইতে 'ঘরেবাইরে'র পার্থক্য যে কেবল তাহাদের গল্পাংশের পার্থক্যের জন্য তাহা নয়। এই বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তকের বর্ণিতব্য বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই দুই শ্রেণীর পুস্তকের একখানা ছাড়িয়া আর একখানা পাঠ করিবার সময় আমাদের যেন মনে হয় আমরা যে শুধু একরকম

গল্প ছাড়িয়া, আর একরকম গল্প পড়িতেছি তাহা নয়, আমরা একটা জগৎ ছাড়িয়া আর একটা জগতে প্রবেশ করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের কল্পনার রাজ্য ও শিল্পকলা প্রণালীর যথেষ্ট পার্থক্য থাকা স্বত্তেও, একটা বিষয়ে তাঁহাদের খুবই ঐক্য আছে। সেটা হইতেছে দুজনের গল্পের মূলে কোন একটা সত্যের প্রতিষ্ঠা—একটা মানবীয় সার্থকতা, যেটা শুধু বাহিরের তুচ্ছ এবং নিত্যপরিবর্ত্তনশীল অবস্থার গতিতে আবদ্ধ নয়। তাহাদের কারবার হইতেছে মানবজীবনের সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যা ও হৃদয়বৃত্তি গুলিকে লইয়া। এইখানেই আর্টের সার্থকতা এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগের বিশেষত্ব। এইখানে।

তাহারা বাইরের স্থূল আকারটাকে লইয়া আপনাদের 'আর্ট' ফলান না, অন্তরের সূক্ষ্ম ভাবরাজির মধ্য দিয়াই তাঁহারা আপনাদের শিল্পকলার বিকাশ দেখান। আর যাঁহারা এই ভিতরের সামঞ্জস্য রাখিয়া আপনার শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহাদের হাতেই আর্টের চরমোৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা নিপুণ শিল্পী তাঁহারা জানেন যে, একখানা উপন্যাস বা নাটকের জন্ম নিছক জীবন থেকে হয়। সুতরাং ভাল একখানা উপন্যাসের আর্ট ঠিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়। এ তত্বটা রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই বুঝিয়াছিলেন; তাই বঙ্কিমচন্দ্র যে সব পুস্তকের প্রধান অবলম্বনই বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের বৈচিত্র্য সেখানেও তিনি নিগূঢ়তম মনোবৃত্তি ও মানবীয় সমস্যার আলোচনা করিতে বিস্মৃত হন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে জীবনের আলোচনাই উপন্যাসের মুখ্য অবলম্বন—ঘটনার শুরুত্ব নয়। ঘটনার শুরুত্বও বৈচিত্র্য যে উপন্যাসকে সৌষ্ঠব ও রমণীয়তা দান করে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু উপন্যাসকে সার্থক করিয়া তুলে জীবনের আলোচনা। এই নিমিত্ত যেখানে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়, সেইখানেই উপন্যাসকের উপাদান পাওয়া যায়। রাজসিংহ ঔরঙ্গজেব, কতলু খাঁ, ও হেমচন্দ্রের জীবনে যে পরিমাণে উপন্যাসের উপাদান ও আর্টের প্রসার আছে, গোরা বিনোদিনী ও কাবুলিওয়ালার জীবনে তাহা অপেক্ষা যে একটুও কম নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। শুধু যে রাজারাজড়ার কাণ্ডকারখানা লইয়াই উপন্যাস গড়িতে পারা যায়, আর সাধারণ ও অতি সামান্য লোকের জীবন সংগ্রামের অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও artistic interpretation দিয়া উপন্যাসের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান করিয়া লওয়া যায় না এরূপ ধারণা ভুল। বঙ্কিমচন্দ্রও ইহা জানিতেন; তাই তিনি শুধু 'রাজসিংহ' 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'সীতারাম' লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি 'ভ্রমর', 'কুন্দ' ও 'রজনী'র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রবিন্দ্রনাথের কাব্যেও উচ্চ ঘরোয়ানা ঘরের কথা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষিতে' যা একটু আধটু আছে, সেখানেও সেগুলি এমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, ভাবের বিশ্বজনীনতায় সেগুলি শুধু রাজরাজড়ার ঘরেই আবদ্ধ নয়। গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি নক্ষত্র রায়ের ঈর্ষা এবং তাহার প্রতিদানে অজস্র স্নেহধারা প্রাপ্তি, শুধু গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্র রায়েরই পর্য্যবসিত নয়, বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে এরূপ ঘটনা অজস্র ঘটিয়া থাকে। বৌঠাকুরাণীর দুঃখ কেবল বৌঠাকুরাণীর নয়, বঙ্গসতী মাত্রেই তাহার অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু পশুপতির ধ্বংস, সীতারামের পতন, চন্দ্রকুমারীর বিপদ, মোবারকের সুখ ও দুঃখ ও ওস্মান আয়েষার ব্যর্থতার কথা পাঠ করিয়া আমরা যতই আনন্দ লাভ করি না কেন আমাদের প্রাণের প্রতিধ্বনি ঠিক তেমনি ভাব সেখানে পাওয়া যায় না, যেমনটি পাই গোবিন্দলালের অধঃপতনে, ভ্রমরের অভিমানে, শশীভূষণের জীবন সংগ্রামে (মেঘ ও রৌদ্র), বিনোদিনীর প্রত্যুত্তর সংগ্রামে, গোরার স্বজাতিত্বের

স্বধর্ম্মানুভূতিতে এবং সন্দীপের লালসা ও আড়ম্বরে পাওয়া যায়। অথচ জীবনের এই দুটাদিকই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের উন্যাসের উপাদান হইবার যোগ্য।

জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বা শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক দিগের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি বিচার করিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীবনের বিয়োগান্ত করুণ দিক (tragic phase) অবলম্বন করিয়াই সে গুলি রচিত। যেমন সেক্সপীয়ারের Macbeth, Hamlet, Othelo, Lear, Gacths এর Faust, Victor Hugo'র Lesm'serable, এবং Scott এর Kenilworth প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রও এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়; কারণ তাঁহার 'দুর্গেশ নন্দিনী', 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতি পুস্তক কতকটা মিলনান্ত হইলেও তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে যেখানে তাঁহার 'আর্ট' চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'কপাল কুণ্ডলা' 'চন্দ্রশেখর' 'সীতারাম' প্রভৃতি পুস্তকে করুণ বিষাদের চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আর্ট যেখানে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই 'চোখের বালি' ও 'গোরা' প্রভৃতি পুস্তকে বরাবর একটা করুণ সুরের আভাস থাকিলেও উহাদিগকে আমরা ঠিক বিয়োগান্তের (tragedy'র) পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের ঐ দিকটাই দেখিয়াছেন বেশী, তাই তাঁহার বেশীর ভাগ পুস্তকই বিয়োগান্ত। রবিবাবু কিন্তু যে সব স্থানে করুণ রসের অবতারণা করিয়াছেন, সে সব স্থানে বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্রকেও পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের ছত্রে ছত্রে করুণরস জমাট হইয়া উঠিয়াছে, 'মৃণালিনী', 'বিষ বৃক্ষ' ও 'কপালকুণ্ডলা'তেও ঐ রসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষিতে' যে করুণ রস গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে তাহার বুঝি কোথাও তুলনা নাই। করুণ রসের স্ফুরণে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না আজ কাল শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু বৌঠাকুরাণীর হাটে ও রাজর্ষিতে যে একটা কোমল মাধুর্য্য মণ্ডিত বিষাদ আছে, শ্রীকান্তে তাহার কতকটা থাকিলেও দেবদাসে তাহা পরিলক্ষিত হয় না। দেবাসের pathos অতি মর্ম্মন্তুদ, নীরসও রুক্ষ। তা ছাড়া বঙ্কিমবাবুর pathos প্রায় বিয়োগান্ত দৃশ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মিলনের মধ্যেও যথেষ্ট pathos থাকিতে পারে, এবং যাহা বৈষ্ণব কবিরা খুব সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও অনেক স্থানে মিলনের মধ্যে অতি মর্ম্মস্পর্শী করুণ রসের অবতারণা করিয়াছেন; 'কাবুলীওয়ালা' 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রভৃতি ছোট গল্প তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' প্রভৃতি গল্প গুলির মধ্যে এইরূপ মিলনের মধ্য দিয়া একটা pathes ফুট হইয়াছে। আবার রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক ছোট গল্প আছে যাহার ভিতর করুণ রসের লেশ মাত্রও নাই, অথচ আর্টের সার্থকতা হিসাবে উহারা এক এক টুকরা হীরার মত। সুতরাং আর্টকে পরিণতি দিবার জন্য যে কেবল জীবনের অশ্রুময় অংশটারই সার্থকতা আছে, আর হাস্য-কিরণ সম্পৃক্ত আনন্দময় দিকটারই কোনই সার্থকতা নাই, এমন কথা বলা যায় না। আর্টকে ফুটাইয়া তুলিবার উপলক্ষ্য ও প্রণালী ভেদেই এরূপ প্রয়োজনীয়তার পার্থক্য হয়। মূলে মানবের জীবন-সংগ্রাম—তাহার সুখ ও দুঃখ এই দুইটাকে উপলক্ষ্য করিয়াই উপন্যাসের আর্ট বিকশিত হইতে পারে।

ঔপন্যাসিক আপনার কাব্যে জীবনের যে অংশটা কলাকৌশলে ফুটাইয়া তুলিতে চান, সে'টার সঙ্গে তাঁহার খুব ভাল রকম পরিচয় থাকা আবশ্যক; তিনি তাঁহার অনন্যসাধারণ কল্পনার দ্বারাই হউক, আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারাই হউক, তাহাকে ফুটাইয়া তুলুন তাহাতে আসিয়া যায় না। উপন্যাস, উপন্যাসই, ইহার সঙ্গে সত্যের কোনও সম্বন্ধ নাই একথা মনে করিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর

করিয়া উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগের উপন্যাস কখনই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই এই সত্যের অপলাপ কোথাও করেন নাই। অবশ্য যেখানে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে ইতিহাসের সাক্ষ্য ও চলিত আখ্যানের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনও গতি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিজ্ঞতা এত বেশী যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত ও চমকৃত হইতে হয়। 'রাজসিংহ', 'দুর্গেশ নন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' 'মৃণালিনী, প্রভৃতি গ্রন্থে বাদশাহ নবাব ও রাজপুত রাজারাজড়ার ঘরের অতি খুঁটিনাটি কথা হইতে 'কৃষ্ণকান্ত' 'রজনী' 'বিষবৃক্ষ' ও 'কপালকুণ্ডলা'য় বাঙ্গালী ঘরের নরনারীর চিত্র ও অকুণ্ঠ সমাজ-বিচ্ছিন্না বনবালিকা যুবতীর হৃদয়ের অলি-গলির খবর তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। জীবনের বিচিত্র স্তরের বিভিন্ন নরনারীর, বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন অবস্থার এরূপ অভিজ্ঞতার সমাবেশ বাঙ্গালা দেশে অপর কাব্যে প্রায় দেখাই যায় না। ইংরাজী সাহিত্যেও খুব বিরল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় এই যে, সে সমস্ত চিত্র বা চরিত্র এমন কি যাহাদের অনুরূপ চিত্রও তিনি কখন চোখে দেখেন নাই, যে সকল চরিত্র তিনি কেবল পুস্তকেই পাঠ করিয়াছেন, এবং যে সকল ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হইবার তাঁহার কোনরূপ সম্ভাবনাই ছিল না, যে সকল চরিত্র অঙ্কনেও ঘটনাসন্নিবেশে তিনি তাঁহার অসাধারণ কল্পনা শক্তির প্রভাবে—ইংরাজীতে যাহাকে realistic imagination বলে —অতুলনীয় করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সমস্ত রাজারাজড়ার কথা পাঠ করিতে করিতে আমাদের একবারও মনে হয় না যে, তাঁহারা সত্য সত্যই রাজা নহেন বা আমরা সচক্ষে তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিতেছি না। ইহা কবির পক্ষে কম শিল্পদক্ষতা ও ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। কিন্তু যথেষ্ট নিপুণতা সত্ত্বেও এরূপ কল্পনার উপর নির্ভর করার যাহা দোষ, ঘটের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্যই তাঁহার কাব্যের দু এক জায়গায় অসামঞ্জস্য ও অস্বাভাবিকতা দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। একটা উদাহরণ দিই, তিলোত্তমা ও বিমলা সায়ংকালে শৈলেশ্বরের পূজা করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু সন্ধ্যা সময়ে শিব পূজা করিতে যাওয়া আমাদের দেশে রীতি নাই; আর থাকিলেও বাহকেরা যে ঝড় বৃষ্টির জন্য দুইটী সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোককে ফেলিয়া পলাইল, অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত ফিরিল না, ইহাও বেশ সঙ্গত হয় নাই। মৃণালিনীতে আছে "কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে"; কিন্তু মৃণালে কণ্টক থাকে না। রবিন্দ্র-নাথের অভিজ্ঞতার সীমা অনেক কম সত্য, কিন্তু তাহার ফলে তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া-ছেন সেগুলি সুস্পষ্ট ও সঠিক হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অসামঞ্জস্যের হাত হইতে তিনি অনেকটা রক্ষা পাইয়াছেন। তিনি অধিকাংশ স্থলেই আপনার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন বাস্তব হইতে,—আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হইতে। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন আনন্দমঠখানিকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, একটা আদর্শের ভিত্তির উপর। তিনি একটা Utopean scheme কল্পনা করিয়া বইখানি লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'গোরা' বইখানি রচনা করিবার সময় ঠিক তাহার বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। গোরা কেবল মাত্র একটা Utopean scheme এর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আধুনিক কালের সর্ব্বচেয়ে বড় যে সমস্যাটা, শুধু কবির মনে নয়, সমস্ত দেশবাসীর মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, স্বদেশ সমাজ ও স্বধর্ম্মকে একটা পরিপূর্ণ ভাবের দ্বারা অনুভব করিয়া, তাহাদের বিপরীত দিকগুলা না দেখিয়া আপনার অখণ্ড ভাবের দ্বারা ঐ গুলাকে মহৎ ও বিরাট করিয়া দেখিবার যে প্রয়াস—তাহাদিগকে প্রাণপণ আঁকড়াইয়া ধরিয়া

থাকার যে একটা প্রবল ইচ্ছা—সমস্ত দেশবাসীর মনঃকুড়িয়া প্রবাহিত হইতে ছিল তাহার Artisti interpretation দিবার জন্যই গোরার উৎপত্তি। গোরাতে রবীন্দ্রনাথ তখনকার একটা অবস্থার প্রতি ঝোঁক দেখিতে পাই। আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 'আনন্দমঠের' ব্যাপারটা গোরার চেয়ে, আরও অধিক বিরাট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু গোরাতে ভাবের সঙ্গে বাস্তবের যে বিচিত্র সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়, সেইটুকুর কারুকার্য্যে রবীন্দ্রনাথ যে সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন তাহাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

এইবার গল্পাংশের রচনা কৌশল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁহার উপন্যাসের বিষয় নির্ব্বাচনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তাঁহার প্লটকে গড়িয়া তুলিতেও নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ঘোরাল প্লটের উপর বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে নানাবিধ নাটকীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সন্নিবেশে মনে সংশয় উৎপাদন এবং আখ্যান ভাগের পরিসমাপ্তি করিতে গিয়া ধীরে ধীরে আবার নাটকের মত পট পরিবর্ত্তন করা প্লটের লিখনভঙ্গীর বিশেষত্ব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও সেই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ আনন্দমঠের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার উপক্রমনিকার ঘটনা প্রারম্ভেই এক রহস্যা-ভাসের সৃষ্টি করিয়া পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করিয়া ছেন। তাহার পর কল্যাণীর দস্যু কর্ত্তৃক আক্রমণ ও তাহার পলায়ন সময়ে অন্তরীক্ষে গান, শুভ্রকেশ শুভ্রবেশ, ঋষি মূর্ত্তির আবির্ভাব, মহেন্দ্র ও ভবানন্দের বন্ধন ও তাঁহাদের আশ্চর্য্যভাবে মুক্তি, কল্যাণীর স্বপ্ন, শান্তির পুরুষের ছদ্মবেশে সত্যানন্দের সহিত কথোপ কথন ও কল্যাণীর জীবন প্রাপ্তি প্রভৃতি ব্যাপার অতীব বিস্ময়কর, রহস্যময় ও সুন্দর; অথচ এগুলি অস্বাভাবিকও নয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার উপন্যাসে ঘটনা-বৈচিত্রের প্রয়োজনীয়তার উপর আদৌ লক্ষ্য রাখেন নাই। প্লটকে ঘোরাল করিয়া তুলিবার তিনি আদৌ চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের উপ-ন্যাসে বিশ্লেষণ বা মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যাই প্রতিপাদ্য। বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ঘটনার জালে গল্প-টাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বেশ করিয়া গুটাইয়া তুলিবার জন্য এবং সেই জন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি ও তৈয়ারী করিয়াছেন তাহার উপযোগী করিয়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে সামান্য প্লট টুকু আছে, সেটা কেবল তাহার সৃষ্ট চরিত্র গুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝা-ইবার জন্য। এখানে চরিত্র গুলিই হচ্ছে মুখ্য—প্লটটা গৌণ। উদাহরণ স্বরূপ 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' বই দুইখানার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'গোরাতে' গোরাকে লইয়াই ঘটনা সমূহ বিকাশ লাভ করিয়াছে, আর ঘরে বাইরেতে সন্দীপ ও বিমলাকে আশ্রয় করিয়াই সমস্ত বইখানা ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'র গল্পাংশ অতি সামান্য, যেটুকু আছে তাহারও বিশেষ কোন ঐক্য দেখা যায় না—বাইরের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নাই বলিলেও চলে। তথাপি এই পুস্তক দুইখানি পাঠ করিতে 'রাজসিংহ' 'দুর্গেশনন্দিনী' অথবা 'দেবী চৌধুরাণী' অপেক্ষা কোনও অংশে কম ঔৎসুক্য পাঠকের মনে জাগে না। মানব হৃদয়ের বেগঘাত ঘাত-প্রতিঘাত, কিংবা কল্পনা ও অনুভূতির ক্রমবিকাশ ও জটিল মনস্তত্ত্বের দ্বারোদ্ঘাটন পাঠকের হৃদয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে সংশয় ও দ্বিধা (Moments of suspense) উৎপন্ন করে; বাহিরের ঘটনা বুজের বিচিত্র ও অভিনব সমাবেশে তাহা ততটা করিতে পারে না। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'জনীতে' Psychological element বা মনোবিজ্ঞান সম্মত চরিত্র বিশ্লেষণ যথেষ্টই আছে; তথাপি এই সকল স্থানে প্লটের উৎকর্ষ (In erest),আছে; human interestকে, চরিত্রের ভাববিশ্লেষণের উৎকর্ষকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে

কিন্তু সকল স্থলেই মানবের অনুভূতিকে (Human interestকে) কেন্দ্র করিয়া প্লট পাপড়ির মত বিকশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসিতে তিনিই প্রথম শিখাইয়াছেন। সমাজের অতি নিম্নস্তরে যাহাদের স্থান, যাহারা লোক চক্ষুতে ও সমাজ চক্ষুতে হেয়, ঘৃণিত, ও অবজ্ঞাত ছিল সাহিত্যে স্থানলাভ করিবার অধিকার তাঁহার কাছ হইতেই তাঁহারা প্রথম পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে তাঁহার ছোট গল্পে তাহাদিগকে নায়ক নায়িকা করিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায়, 'খোকাবাবু' গল্পে ভৃত্য মাইচরণ, 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে কাবুলিওয়ালা এবং 'অতিথি' গল্পে যাত্রার দলের ছোকরা। এরূপ আরও শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আর আমাদের বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার কাব্যে plot interest, human interest কে চাপা দিতে পারে নাই। কিন্তু ইহার আর একটা কারণও থাকিতে পারে; বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের গল্প বলিবার ক্ষমতা কিছু কম ছিল বোধ হয়। Scotcবা Dumaর ন্যায় বেশ রসাল করিয়া গল্প বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ পটু। রবীন্দ্রনাথের বড় উপন্যাসে কিন্তু এই ক্ষমতার তত পরিচয় পাওয়া যায় না। Georg: Eliot, Balzac অথবা Tols oiএর মত যদিও তাঁহার উপন্যাসে টানাবুনীর ভাব তত দেখা যায় না বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে যে তাঁহার গতি প্রতিহত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 'রাজর্ষি' উপন্যাসখানি তিনি যেমন সুন্দরভাবে আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক তেমনভাবে শেষ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার ছোট গল্পগুলিতে এরূপ ত্রুটি আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। 'মেঘ ও রৌদ্র', 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'মধ্যবর্ত্তিনী' প্রভৃতি গল্পগুলি ছোট হইলেও স্বচ্ছ স্বাভাবিক, তরতর। বর্ণনভঙ্গীর গুণেও সর্ব্বোপরি তাহাদের human interestএর জন্যে গল্পগুলির ছত্রে ছত্রে রস জমিয়া উঠিয়াছে। এইখানে প্লটের সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ প্লটই জটিল (ইংরাজীতে যাহাকে compound plot বলে)। অর্থাৎ একাধিক গল্প এমন ভাবে সংশ্লিষ্ট যে তাহাদের সমষ্টি একটা জটিল গল্পাংশে পরিণত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য plot এর interestকে গাঢ় ও রহস্যময় করিয়া তুলিবার জন্য এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যেমন আনন্দ ম'ঠের প্রধান গল্পের অন্তর্গত আরও দুইটা গল্প আছে; একটা 'মহেন্দ্র কল্যাণীর' গল্প, আর একটা জীবনন্দ শান্তির গল্প 'মৃণালিনীতে' দুইটা প্রধান গল্প আছে; একটা 'হেমচন্দ্র' 'মৃণালিনীর' গল্প আর একটা 'গজপতি' 'মানারমার' গল্প; রজনীতে দুইটা গল্প আছে, একটা 'রজনী শচীন্দ্রের' আর, একটা 'অমর, লবঙ্গলতার গল্প, 'চন্দ্রশেখর' দুইটা গল্প আছে,একটা'প্রতাপ' 'শৈবলিনীর, গল্প আর একটা 'দলনী বেগমের' গল্প, 'রাজসিংহে' দুইটা গল্প আছে; একটা চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের গল্প, আর একটা 'মোবরক দরিয়া' বিবির গল্প। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কিন্তু এরকম প্লটের double interest খুব কমই আছে, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে plot inb:ttr এর দিকে রবীন্দ্রনাথ মোটেই ঝোঁক দেন নাই। 'গোরা' উপন্যাসে অবশ্য এই রকমের একটা double interest সৃষ্টি করিবার প্রয়াস দেখা যায়; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল গল্পের কথা উল্লেখ করা গেল, সে গুলিকে যেমন বেশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় 'গোরা সুচরিতার' 'বিনয়—ললিতার' গল্পকে ঠিক তেমনভাবে দেখা অসম্ভব। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সমালোচনা

ন্যায়ঃ তত্ত্বের নিষ্পত্তি—শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পত্রসংখ্যা ২৮২। কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৷৷০

আলোচ্য উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। প্রবীণ সাহিত্যিকের উপন্যাস রচনায় ইহা প্রথম চেষ্টা হইলেও, ইহাতে তিনি যে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্বের অবসান কালের একটী চিত্র—চরিত্র চিত্র। ভূমিকা-লেখক স্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের কথায় বলি,—'গ্রন্থকার মহাশয় সেই সময়ের একজন নিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত, পরোপকারী, নিঃস্বার্থপর, তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন। ন্যায়রত্নের চরিত্র আদর্শ চরিত্র।' * * 'তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ঈশ্বরভক্তি, সত্যানুরাগ, তাঁহার সংযম ও অপূর্ব্ব জ্ঞেয়বিতার পবিত্র কাহিনী আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহার শোচনীয় নিধনের কথা ভাবিয়া পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে আমাদের চক্ষু পুনঃপুনঃ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে; এবং কতবার মনে হইয়াছে,—এই রোগকাতর, জীর্ণদেহ, দুর্ব্বল, দরিদ্র ব্রাহ্মণের হৃদয়ে যে শক্তি, যে তেজ, যে বিরাট মনুষ্যত্ব তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত মহিমায় বিরাজিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র যদি আমাদের এই বিশাল সমাজ-দেহে আজ বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচণ্ড প্রভাবেও আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড এত শিথিল হইত না।' এই হিমালয়ের ন্যায় উন্নতমস্তক মহনীয় ভগবানের কার্য্য-কারণ পরম্পরায় একান্ত বিশ্বাসী, ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ-চরিত্র অঙ্কনে তিনি যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। কলাকুশলী লেখক মহাশয় অন্যান্য চরিত্রগুলিও বেশ সুন্দর ভাবে অল্পপরিসরের মধ্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। করুণ রসাত্মক এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া বাস্তবিকই অশ্রু সংবরণ করা যায় না। দীনেন্দ্র বাবুর কথায় সত্যই বলিতে পারা যায় লেখক মহাশয়, 'নব্যতন্ত্রের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবিৎ উপন্যাস-লেখকগণের প্রবর্ত্তিত কলার অনুসরণে মনস্তত্ত্বের মনোরম বিশ্লেষণ দ্বারা 'আর্টে'র নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচারের সুরঞ্জিত চিত্র, অঙ্কিত করেন নাই'। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

সংসারী—ডাক্তার এন্, সি, ব্যানার্জ্জী প্রণীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পুস্তক, ৪র্থ সংস্করণ। পত্র সংখ্যা ২৯৮। মূল্য ১৷৷০ টাকা। সংসারী লোকের পক্ষে রোগ, পথ্য ও ঔষধ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার দরকার, তাহা পুস্তকখানিতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। বেশ বিচক্ষণতার সহিত এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিকে আমরা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় দেখিতে চাই, কারণ মোটামুটি রোগ ও তাহার প্রতিবিধেয় উপায়গুলি বেশ সোজা কথায় ইহাতে লেখা আছে। পল্লীগ্রামে বিচক্ষণ ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া বড় সোজা নয়, অন্ততঃ অনেকস্থানেই বহুদূর হইতে তাহাদিগকে আনিতে হয়। এই পুস্তক-বর্ণিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া চিকিৎসক অনিবার সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করিতে পারা যাইবেই, এরূপ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

মণিমোহন-জীবনী—যোগিকুল-বরেণ্য মণিমোহন নাথের জীবন-কাহিনী। তাঁহার পুত্র রামকুমার নাথ কতকটা পিতার জীবন-চরিত্র সঙ্কলন করিয়াছেন, আর কতকটা তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। মূল্য ১৲ টাকা।

যোগি-সমাজের উন্নতিকল্পে মণিমোহন যাহা করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। জাতি-

তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই পুস্তকের সমালোচনার প্রকৃত অধিকারী; আমরা এ সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে পারি না। ২৪।৩০ বৎসর পূর্ব্বে যোগীদের ভিতর কেহ কেহ উপনয়ন গ্রহণ করায় সমাজে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে তাহাদিগের উপর যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, আমাদের যৌবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যথিত হইয়াছিলাম। সমাজের কল্যাণ কামনায় যাঁহারা আত্মপ্রাণ নিয়োজিত করেন তাঁহাদের দুর্দ্দশা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। উপনয়ন গ্রহণের তাঁহারা অধিকারী কি না তাহাও আমরা বিচার করিতে চাহি না—বাঙ্গলা সমাজের সকল মানবই যাহাতে আত্মসম্মান লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হয় আমরা তাহাই দেখিতে চাই।

'জীবনী' শব্দ জীবনচরিত অর্থে ব্যবহার করা উচিত নয়। 'জীবনী' শব্দের অর্থে সেই শক্তিকে বুঝায় যাহা প্রাণীকে জীবিত রাখে (Vitality)।

প্রজাপতির কৌতুক শ্রীমান্ অজয় কুমার সেন প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অন্যতম গ্রন্থ।

এখানি ছোট গল্পের পুস্তক। প্রথম গল্পের নামানুসারে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। গল্পটী ছোট নয়—বেশ বড়। অন্য ১২টী গল্পের প্রত্যেক গল্পটী ছোট এবং গল্পও বেঁটে। শ্রীমানের লেখার সহিত যমুনার পাঠক পাঠিকারা সম্পূর্ণ পরিচিত। ১৩টী গল্পের ভিতর ৯টী আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাকীগুলি অন্যান্য সাময়িক পত্রে বাহির হইয়াছে। গল্পগুলি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। শ্রীমান্ সাহিত্যরসিক আমাদের শ্রদ্ধেয় জলধর দাদার পুত্র। পিতার নিকট হইতে তিনি যে করুণরস উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ভগবান্ শ্রীমানের সাহিত্য-সাধনা জয়যুক্ত করুন।

ভাগের পূজা—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত, মূল্য দুই টাকা। পত্র সখ্যা ২৪২ ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই সুন্দর। পুস্তকখানি ধারাবাহিক ভাবে আমাদের পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচনা করা শোভন নয় বলিয়া আমরা এ কার্য্য হইতে বিরত রহিলাম। পুস্তক খানির বৈশিষ্ট্য এই যে একজন পূজারিণী ও একজন পূজারী এই সাহিত্যিক ভাগের পূজায় পর্য্যায়ক্রমে যোগদান করিয়াছেন। অথচ বলিয়া না দিলে ধরিবার উপায় নাই যে ইহা ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক সাধক ও সাধিকার লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে। তাঁহাদের নাম—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার, শ্রীমতী সরসীবালা বসু, শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রীমতী চারুবালা বসু, শ্রীযুক্ত অজয়কুমার সেন, শ্রীমতী লীলা দেবী, শ্রীযুক্তজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, শ্রীযুক্তশৈলজা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী গিরিবালা দেবী, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীমতী মেহশীলা বসু চৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত। কথা-সাহিত্যের পাঠকদিগের নিকট ইঁহারা সকলেই পরিচিত। উপন্যাসখানি সামাজিক। আলোচ্য উপন্যাসে পল্লীসমাজের যে হৃদ্যকারজনক বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহার সংস্কার যে একান্ত আবশ্যক তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পল্লীবাসীদিগকে অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে এ চিত্র বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে।

নূতন পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহলবৃত্তি নিবারণ করিবার জন্য সংক্ষেপে উপন্যাসের সারাংশ বিবৃত করিতেছি :—

প্রসাদের মা, প্রসাদ ও তাহার মাতুল নির্ম্মল গ্রামের একটি গৃহস্থ পরিবার। অসহযোগ-নীতি অনুসারে প্রসাদ ও নির্ম্মল কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে। কলিকাতায় স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইয়া পিকেটিং করে, মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামের বাড়ীতে আসে। পল্লীবাসীদিগের কল্যাণসাধন তাহাদের ব্রত

হইয়াছে। কমল যুবাপুরুষ, পিতৃমাতৃহীন, অর্থশালী জমীদারের পুত্র, সেই গ্রামেরই জমীদার, সেই গ্রামেই নিবাস। খুড়ো মহাশয় কমলের যৌবন, ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্বের সুযোগ পাইয়া নিজের নীচ স্বার্থ উদ্ধেশ্যে কমলকে উচ্ছৃঙ্খল ও বিপথগামী করিল এবং তাহার কাঁঠাল তাহারই ঘাড়ে ভাঙ্গিয়া নিজে তাহারই রসাস্বাদনের সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। গয়লা বৌ যুবতী বিধবা। তাহাকে এবং গ্রামের অনেক যুবতী গৃহস্থ কন্যাকে কৌশলপূর্ব্বক কমলের নিকট তাহাদের দেহ বিক্রয় করাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা এই খুড়ো মহাশয় চেষ্টান্বিত। গয়লা বৌ প্রসাদের মার অনুগৃহিতা ও অনুগতা। তাহার খুড়ো মহাশয়ের চেষ্টা বিফল করিবার প্রয়াস উপলক্ষে প্রসাদ-পরিবারের সহিত খুড়ো মহাশয়ের বিবাদ হয়। সেই বিবাদের সময় কমল উপস্থিত ছিল। প্রসাদের ধর্ম্মপ্রচেষ্টা, তেজস্বিনী মার দু একটি কথায় হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্র-বলে, কমলের প্রকৃতির অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল। খুড়ো মহাশয় প্রথম উদ্যমে বিফলপ্রযত্ন হইলেও তাহার পর একদিন গয়লা বৌকে অপহরণ করিয়া কমলের এক বাগান বাড়ীতে কয়েকদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নিজের দৃঢ়তায় এবং প্রসাদের সহায়তায় সে অকলঙ্কিত দেহে মুক্ত হইয়া আসিল বটে, কিন্তু সে কলঙ্কিনী হইয়াছে এই অপবাদের অজুহাতে নিজের গৃহে আর স্থান পাইল না। প্রসাদের মা, গয়লা বৌকে অকলঙ্কী এবং বিনা অপরাধে তাহার আত্মীয়-গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা জানিয়া গ্রামের লোকের বিবিধ অসহনীয় বিদ্রূপ বাক্য এবং ভীতিপ্রদর্শন সহ করিয়াও তাহাকে তাঁহার নিজের গৃহে প্রতিপালা-রূপে স্থান দিয়াছিলেন। কালক্রমে অনুগ্রাহক প্রসাদ ও অনুগৃহীতা গয়লা বৌ পরস্পরের অনুরাগী ও অনুরাগিণী হইয়া পড়িল। অসবর্ণা হইলেও প্রসাদ মালতীকে বিবাহ করিবে এরূপ ইচ্ছা মার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল এবং কমল ও নির্ম্মল তাঁহার সম্মতি দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ পর্য্যন্ত করিয়াছিল। প্রসাদের মা কিন্তু কোনক্রমে সম্মত হন নাই;

ঘটনাক্রমে প্রসাদের অন্যত্র বিবাহ হইল। প্রথমে প্রসাদ সে বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। যাহাকে ভালবাসি না অথবা ভালবাসিব কি না তাহার স্থিরতা নাই, তাহাকে বিবাহ করিলে সে বিবাহ সুখকর হয় না ইহাই তাহার আপত্তির কারণ। প্রসাদের ভাবী শ্বশুর মহাশয় এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বাবাজী আগে জলে নাম্‌তে হয় তারপর সাঁতার শিখ্‌তে হয়। সাঁতার শিখে তবে জলে নাম্‌ব একথা পাগলের কথা। আগে ফুল ফোটে, পরে ফল ধরে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। বিবাহ ফুল, ভালবাসা তাহার ফল। যাহাকে বিবাহ করিব সম্বন্ধের গুণে তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে। সে ভালবাসার চাষ করিতে হয় না, তাহার জন্য তদ্বির করিতে হয় না—সে সহজ। আগে ভালবাসিয়া পরে বিবাহ ইহা পাশ্চাত্য রীতি। যতদিন রূপের মোহ ততদিন ভালবাসা, তাহার পরই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ। অধিকাংশ পাশ্চাত্য বিবাহের ইহাই পরিণাম। পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে বিবাহিতা স্ত্রী ভোগবিলাসের যন্ত্রী রমণী হইতে পারে, কিন্তু জীবনসঙ্গিনী হয় না, মোহিনী হইতে পারে, কিন্তু সহধর্ম্মিনী হয় না, কামিনী হইতে পারে, কিন্তু অর্দ্ধাঙ্গিনী হয় না। এই মর্ম্মের যুক্তিতে পরাভূত হইয়া অথবা যে কারণে হউক মার অনুমতি ও অনুমোদনে সেই শ্বশুরের কন্যার সহিত প্রসাদের বিবাহ হইল। ভগ্নহৃদয়া মালতী হতাশ হইয়া মনের দুঃখে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল।

আলোচ্য উপন্যাসে প্রসাদের মাতা, ও তাহার সমবয়স্ক মাতুল নির্ম্মলচন্দ্রের দুষ্টের দমন করিবার চেষ্টা ও গ্রামের কল্যাণ-সাধনের অদম্য চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা না করিলে প্রত্যবায় থাকিয়া যায় বলিয়া কথাটা বলিলাম।

মূল্য শয্যা—সুকবি বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। পত্র সংখ্যা ১৫৭।

শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথের উপন্যাস ক্ষেত্রে এই প্রথম রচনা। উপন্যাসে রোমান্স আনিয়া তিনি পাঠকদিগের কৌতূহল তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এ বিষয়ে যে সম্যক কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে হইবে। গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত কৌতূহল সমান ভাবে উদ্রেক করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন। আজ কাল কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য এ প্রথার অনুসরণ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য কোনও কোন ইংরাজী কথা-সাহিত্যিক এ প্রথা এখনও চালাইতেছেন—বিশেষতঃ যে গুলিতে ডিটক্‌টিভের কাহিনী বর্ণিত হয়, সে গুলিতে রোমান্সের ভাব অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। চরিত্র-বিশ্লেষণ ও মানবের অনুভূতির বিকাশ দেখানই আধুনিক কথা-সাহিত্যের লক্ষ্য। এ বিষয়ে তিনি অবহিত হন নাই। ঘটনার সমাবেশের দিকে তিনি অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন। যে শিক্ষিত সমাজের চিত্র গ্রন্থকার অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও স্বাভাবিক হয় নাই। বোধ হয় পুস্তকখানি কোন ইংরাজী উপন্যাসের ভাবাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। বর্ণিতব্য বিষয় ও ঘটনা তাহাদের সমাজের পক্ষে অধিকতর শোভন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অনেক স্থলে তাহার লেখা ইংরাজীয় অনুবাদ বলিয়াই আমাদের মনে হইয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন; 'দিনের পর দিন তাহাকে দ্বিবিধ জীবন (?) যাপন করিতে হইতেছে'; (১৫৪) 'তাঁর বদান্যতার উপর দোষারোপ করাটা, (?) তোমার মুখে বোধ হয় ভাল শুনায় না।' (১২৪ পৃঃ) 'অমরের মনে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা চিত্র ছায়াচিত্রের মত ভাসিয়া গেল' 'ক্রুদ্ধ বেদনায় (?) নীহারের দিকে চাহিতেই সেই অনুতপ্ত করুণ মূর্ত্তি (?) দেখিয়া তাহার কঠোর হৃদয় গলিয়া গেল; তাহার মর্ম্মাহত ভালোবাসা (?) সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়া প্রেমাস্পদের কপালে স্নেহ চুম্বন (?) দিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।" (১৫৭ পৃঃ)

শয়তান দেবেন্দ্রের চরিত্র সুন্দর বাস্তব চিত্র। নায়িকা নীহারের চরিত্র পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে অঙ্কিত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের নামে যেরূপ আজ কাল চরিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে, ইহা ঠিক সেইরূপ না হইলেও কতকটা সেই শ্রেণীর। কোন রকমে গ্রন্থকার তাহার দৈহিক সতীত্ব বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু সে দেবেন্দ্রের নিকট হইতে চুম্বন বহুবার উপহার পাইয়া মদালসা হইয়া পড়িয়াছিল। মন যে তাহার কলুষিত হইয়াছিল, তাহা জোরের সহিত বলিতে পারা যায়, তথাপি শ্রীমান্ আধুনিক সাহিত্যরথের পদানুসরণ করিয়া নায়িকার মুখ দিয়া স্বামীকে বলাইয়াছেন,—'তোমার মহত্বের মর্য্যাদা আমি কখনও ক্ষুণ্ণ করি নাই, আমার নারীত্বের সম্মান আমি কখনও হারাই নাই, নারী জীবনের চরম কলঙ্ক আমি কখনও গায়ে মাখি নাই।'

ডাঃ অমরনাথের চরিত্র রক্ত মাংস বিশিষ্ট মানুষের চরিত্র হয় নাই, কতকটা আদর্শ চরিত্র হইয়াছে।

পরিশেষে আমরা গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি, এরূপ উপন্যাস না লিখিয়া আমাদের সামাজিক বিষয় লইয়া উপন্যাস লিখিতে তিনি চেষ্টা করুন। তাঁহার মত শক্তিশালী লোক যে সাধনা করিলে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। আলোচ্য উপান্যাসখানি, উপন্যাসপাঠক দিগের ভাল লাগিবে। কিন্তু তাহাকে আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহা তাহার শক্তির অপব্যয় হইয়াছে দেখিয়াই বলিলাম—এরূপ অনুরোধ বা ভাব লইয়া উপন্যাস লিখিবার আবশ্যকতা কি?

পুস্তক খানির ভাষা ভাল, কিন্তু কতকগুলি শব্দের অপ প্রয়োগ ও নূতন বিশেষণ রচনা করিবার চেষ্টা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। দু একটী উদাহরণ দিতেছি :—আরক্ত লালিমা, অপেক্ষী মন (১৪ পৃঃ), লালসা অলস (২০ পৃঃ), কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া আগেকার জীবন ভাবিতেই তাহার করিতেছিল;— সব চেয়ে বেশী ভয় হইতেছিল দেবেনকে।' (৫৮ পৃ) 'কমাইন ক্রোধ' ৫৩ পৃঃ) দেবেনের কামনা চতুর (?) তর্ক গুলি (৬৫ পৃঃ) অধৈর্য্য-চঞ্চল (?) স্বর (৮০ পৃঃ); সেই নির্ব্বাক (?) ভালবাসা (৯০ পৃঃ) সমস্ত ঘটনা তাহার কাছে ধূসর স্বপ্নাচ্ছন্ন (?) (১১৩ পৃঃ) প্রতিটি (?) শব্দ গিলিতে লাগিল। (১৩৪ পৃঃ) তাহার চোখে এমন "সীমাহীন ক্রোধ (?) জ্বলিয়া উঠিল (১৪২ পৃঃ)।

হেমচন্দ্র—তৃতীয়খণ্ড (১৮৮২—১৯০৩) শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম এ, এফ্ এস এস, এফ আর, ই, এস প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সম্বলিত। পত্র সংখ্যা ৪১৩। ইহাতে ৩২ খানি চিত্র আছে—চিত্রগুলি কবিবরের আত্মীয়, স্বজন বন্ধু ও ভক্তদিগের প্রতিকৃতি।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে কবিবরের জীবনের শেষ অধ্যায় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের পূর্ব্ব দুই খণ্ডের অর্জ্জিত যশঃ যে ইহাতে অক্ষুণ্ণ আছে তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সুবিখ্যাত মানসী ও মর্ম্মবাণী মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে যখন কবিবরের জীবনী আলোচিত হইয়াছিল, তখনই আমরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া তৃপ্তি, আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিয়াছি—অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। এখন পুস্তকাকারে আবার পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। মনীষীদের চরিত-কথা যত অধিক আলোচিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল, কারণ তাহারাই তাভাবের অগ্রদূত। নূতন ভাবের পরিচয় করাইয়া গিয়া অথবা নূতন আলোক সম্পাতে পুরাতন ভাব গুলিকে উজ্জ্বল করাইয়া তাহারা জাতির নিকট যাহা, সৎ, যাহা সুন্দর ও যাহা কল্যাণের আকর তাহাই ধরিয়া থাকেন। আদর্শ স্থাপিত করিয়া জাতিকে সত্যের পথে ধ্রুবের পথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহারা আহ্বান করিয়া থাকেন। আমাদের জাতীয় কবি হেমচন্দ্র এইরূপ স্বদেশ হিতৈষণার এইরূপ উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া জাতির লক্ষ্যটা স্থির করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী যখন নীরবকে মনুষ্যত্ব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, তখন রঙ্গলালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হেমচন্দ্র বজ্র নির্ঘোষে জাতীয়-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ওজস্বিনী কবিতায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। মনীষীদের জীবন-কথা যতই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা যায়, ততই তাঁহাদের আদর্শকে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা প্রাণে জাগিয়া উঠে। অন্তরের সহিত চেষ্টা করিলে সফল হইতে পারা যায়। তাই বলিতেছিলাম এরূপ চরিত-কথার আলোচনা করিলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।

পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসা ও যত্নের বহুল নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এরূপ জীবন চরিত লিখিয়া তিনি স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছেন।

রসরচনায় হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব 'বাঙ্গীমৎ' 'নেভার নেভার' প্রভৃতি কবিতায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু অধুনা প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার গানে', 'নাকেখৎ' প্রহসনে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। আলোচ্য খণ্ডে প্রত্যেক কবিতা কখন, কি অবস্থায় লিখিত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

পুস্তকের ভাষা সুন্দর। বর্ণন-ভঙ্গী চমৎকার। লেখক মহাশয়ের নিকট আমাদের একটা অনুযোগ এই যে যেন তিনি ভবিষ্যৎ সংস্করণে জীবিত সমালোচকদিগের মত অত বেশী করিয়া উদ্ধৃত না করিয়া দেন, কারণ অনেক স্থলেই যে সকল কথা তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন, তাঁহারাও সেই সকল কথাই বলিয়াছেন। পুনরুক্তি দোষটা একটু বেশী হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। দু এক স্থলে ব্যাকরণের

দিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন নাই। অবশ্য এতগুলি অসাবধানতার ফল ইচ্ছাকৃত যে নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন:—'যদিও উদার-হৃদয় রিপণ ইল্বার্ট শাসন-সংস্কারাদি সাধিত (?=সাধন) করিতে সমর্থ হন নাই।' *** অনেকে মনে করেন যে ইলবার্ট বিলের সময়ে যে জাতি বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, রিপণের প্রতি দেশবাসীর এইরূপ গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকিলে সেই অনলরাশি বহুদূর বিস্তৃত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর ফল উৎপাদিত (?) (=উৎপন্ন) করিত।' (৩১ পৃঃ) 'যে প্রোজ্জ্বল প্রতিভা কি গীতি-কাব্য রচনায়, কি মহাকাব্য প্রণয়নে, কি রহস্য কবিতার সৃজনে, কি আধ্যাত্মিক কাব্য সৃষ্টিতে, কাব্যজগতের সমস্ত দিকেই পূর্ণ আলোক বিকীরিত (?) (=বিকীর্ণ) করিয়াছিল' (৮৭ পৃঃ); 'এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক (?) বর্ণিত' (১৭৬ পৃঃ) কর্ত্তৃকের আবশ্যকতা কিছুই নাই। 'মাইকেল যখন নিতান্ত স্বর্থপরের ন্যায় আপনার সুখের জন্য নানা প্রকার বিলাসিতায় অজস্র অর্থ ব্যয়িত (?) (=ব্যয়) করিতেন' (২৭৬পৃঃ)

আর একটা কথা বলিয়া এই আলোচনার শেষ করিব। কথাটা যে একটু অপ্রিয় হইবে তাহা প্রথমেই বলিয়া রাখি। বঙ্গ-সাহিত্যে হেমচন্দ্রের স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া সুপণ্ডিত গ্রন্থকার মহাশয়বেশ বিচক্ষণতার সহিত তুলনায় সমালোচনা করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সহিত হেমচন্দ্রের তুলনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—'বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ যত জটিল ও সূক্ষ্মভাব লইয়া নীতি কাব্য রচনা করিয়াছেন হেমেন্দ্র ততকরেন নাই। হেমচন্দ্র যে সকল ভাব তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অতি সরল, অতি সনাতন। কিন্তু তিনি যে গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা সংখ্যায় অল্প হইলেও, তাহার মধ্যে এমন একটু বিশেষত্ব আছে যাহা রবীন্দ্রনাথেও নাই। কোন কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।' এরূপ ফাঁকা কথা আমরা গ্রন্থকারের নিকট হইতে আশা করি না। গীতিকবিতার বিশেষত্ব কি তাহা তাঁহার বিশদভাবে বর্ণনা করা উচিত ছিল। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশ হইতে তাঁহার কোনরূপ সাহায্য হয় নাই। এই দুইজন কবির ভিতর তুলনা হইতে পারে গীতি-কবিতা লইয়া। আর গ্রন্থকার মহাশয় তাহা না করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে লেখকমহাশয় আর একস্থানে একটা ফাঁকা কথা লিখিয়াছেন, 'হেমচন্দ্র প্রধানতঃ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সঙ্গীত-কার ৪০১ পৃঃ। কথাটা কোনরূপ যুক্তি দিয়া তিনি বলেন নাই। তিনি কবির কি সংজ্ঞা দেন তাহা জানিতে না পারিলে কথাটা কিছু বুঝিতে পারা যায় না। কথাটা নূতনও বটে; বিশ্বংবরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ কি কবির আসন পাইবার উপযুক্ত নন? পর পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সঙ্গীতে সুর বড় বেশী আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। 'কেহ কেহ এইরূপ অনুযোগ করিয়া থাকেন।' কাহারও কাহারও এই অনুযোগের মূলে সত্য আছে কি না তাহা আলোচনা করিতে চাহি না, আমরা এই কথা বলিতে চাই, 'ধান্ ভান্‌তে শিবের গীতের' প্রয়োজন কি? হেমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিতে ইহার কোনরূপ আবশ্যকতা নাই।

এই অপ্রিয় কথা কয়টা বলিবার কারণ, লেখক মহাশয়কে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, তাঁহার লেখনী হইতে ফাঁকা কথা আমরা দেখিতে চাহি না, তাই তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাঁহার বক্তব্য যুক্তিসহ বলেন, কিংবা এই অংশ টুকু নূতন করিয়া লেখেন।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane and Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

যমুনা

মোহিনী।

Mahila Press, Cal.

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

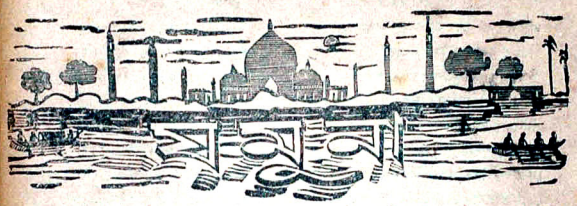

১৩শ বর্ষ, } ফাল্গুন, ১৩৩০ { ১১শ সংখ্যা

মধু-শতাব্দী *

(শ্রীনরেন্দ্র দেব)

উদিয়া আদিত্য যথা উদয় অচলে
বিস্তারি কনক-রশ্মি নাশে অবহেলে
নিশীথের পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকার
আলোক প্রপাত-পাতে,—অথবা যেমতি
চন্দ্রচূড় জটাজাল বিচ্যুতা জাহ্নবী
সহস্র তরঙ্গ ভঙ্গে বঙ্গের অঙ্গনে
বিতরি অমৃত ধারা মধু কলস্বরে
দানে সুধা ফলে ফুলে নীরে ক্ষীরস্বাদ,
শ্যাম স্নিগ্ধ শস্যশীর্ষে সুবর্ণ কিরীট !
তেমতি হে তুমি কবি শ্রীমধুসূদন
দীর্ঘশত বর্ষপূর্ব্বে কোন্ শুভক্ষণে
লভি জন্ম এই শ্যামা জন্মদের ক্রোড়ে
নবীন আলোকে তারে করেছ' আরতি
বহায়েছ' নব ধারা ভাবরস স্রোতে।

প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্য গ্রাসে যবে রাহু
মার্ত্তণ্ড ময়ূখদ্যুতি হারায় ক্ষণেক,
অথবা জলদ জালে বেড়িলে চন্দ্রমা
মলিন নিমেষমাত্র রহে যথা বিধু,
সুদূর সাগর পারে প্রবাসে তেমতি
জ্ঞানরত্নাকর লোভে—প্রতিভা তোমার
পথহারা ঘুরেছিল মরীচিকা মাঝে
কেলিতে শৈবলে ভুলি কমল কানন !
তারপরে একদিন লভিয়া সন্ধান
মাতৃভাষা রূপে খনি, পূর্ণমণিজালে !
উদ্ভাবি নূতন ছন্দ, সৃজি নব ভাব
গড়িলে নবীন মূর্ত্তি ভাষা জননীর !
বিমুক্ত নীরদ পুঞ্জ চন্দ্রমা যেমতি
হাসে পুনঃ নীলাকাশে নবীন গৌরবে !

* সাহিত্য-পরিষৎ-অনুষ্ঠিত কবিবরের শতবার্ষিক জন্মোৎসবে পঠিত।

তোমার যৌবন স্বর্গ তিলোত্তমা আজ
শত চিত্ত মত্ত করে মর্ত্ত্যলোকে মরি!
কবি গুরু বাল্মীকির বীণা তব করে
গাহিল নূতন সুরে নাশিল কেমনে
লক্ষণ সুমিত্রা-পুত্র অন্যায় সমরে
রক্ষঃকুল বঙ্কমণি লঙ্কেশ আত্মজে!
কল্পনা মুরলী তব কাব্য কুঞ্জবনে
শুনায়েছে ব্রজাঙ্গনা বিরহ কূজন;
প্রেমনিষ্ঠ শর্ম্মিষ্ঠার অনুরাগী কবি
দেখায়েছে' দৈত্যগুরু দুহিতার গ্লানি।
তোমার ভাষার ভেরী ভৈরব নির্ঘোষে
ঘোষিয়াছে বীরাঙ্গনা চরিত্র মহিমা!
কৃষ্ণকুমারীর কীর্ত্তি অমর কাহিনী
পদ্মাবতী পদ্মরাগ চিত্র অতুলন!

শতবর্ষ গত আজ—কপোতাক্ষী তীরে
আবির্ভূত হ'য়েছিলে তুমি মহাকবি।
সন্তাষিয়া জন্মদাতার কাতরে একদা
অমরতা মহাবর চেয়েছিলে দীন!
শতবর্ষ পরে আজ মুক্ত আত্মা তব
স্বর্গধাম হতে সবিস্ময়ে দেখিবে কি চাহি
সফল হয়েছে সেই প্রার্থনা তোমার,
অর্জ্জিয়াছ অমরতা অক্ষয় সুনাম!
তুমি ধন্য নরকুলে ভোলে নাই কেহ
যারে আজ, নিত্যপূজে মনের মন্দিরে!
ফুটে আছ স্মৃতি জলে মানসে হে যথা
মধুময় তামরস ফলে চিরদিন!
রচিয়াছ মধুচক্র গৌড়জন যাহে,
আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি!

মধুসূদন।

(শ্রীগিরিজাকুমার বসু)

কবিবর মধুসূদনের জন্মের পর একশ বছর কেটে গেল। বাঙালী সভাসমিতি ক'রে তার জন্যে উৎসব ক'রে।

মধুসূদন কিন্তু বাঙলার কি ক'রে গেছেন, তা হয় ত ঠিক্ আমরা উপলব্ধি করি নি। তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখে ছিলেন, চতুর্দ্দশপদী রচনা ক'রেছিলেন এ খুব বড় কথা। সব চেয়ে বড় কথা কিন্তু তা নয়।

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃজন কর্ত্তার শক্তিতে, তাঁর তীক্ষ্ণ প্রতিভায়, তাঁর গতানুগতির অনুসরণ না কর্ত্তার প্রতিজ্ঞাতে। দেশের কবিতাও যখন মামুলী আইনের শিকল প'রে পঙ্গু হ'য়ে উঠেছিল, বাঙ্গলা যখন সংস্কৃত ভাষার কোটরে ব'সে নির্জ্জীব, দীন, অসহায় হ'য়েছিল, তখন এসেছিলেন মধুসূদন। তিনি প্রথম ব'ল্লেন, না, বেড়ী-পরা পায়ে বাঙ্গলা ভাষা আর চল্‌বে না, সংস্কৃতের পাথারে সে ডুবে মর্‌বে না, সে নিজের পায়ে ভর ক'রে দাঁড়াবে, তার শক্তি সে প্রচার ক'র্ব্বে। তাঁর নিজের কথা "It is my intention to throw off the fettes forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit." তা ছাড়া তিনি সনাতন আখ্যান-বস্তুর ও পরিবর্ত্তন করেছেন। কবি ত কল নয়, যে এক ভাবেই চল্‌বে। এই যে বিদ্রোহ, এই যে আপনার কল্পনাকে প্রচলিত ধারার বিমুখে চালিত কর্ত্তার সাহস, এর গোড়া মধুসূদন। আমি মনে করি সব চেয়ে বড়

ব্যাপার এই। তাঁর রচনা, তাঁর ভাষা, তাঁর চরিত্র সৃষ্টি এত সুন্দর যে পাঠক একবারও মনে করে না যে সে গল্প প'ড়ছে,—না সে শ্রোতা ভাবে গল্প শুনছে। সকলেই যেন বর্ণিত স্থলে উপস্থিত হয়, বর্ণিত ঘটনার ভেতর নিজেরা কাজ ক'র্‌ছে ব'লে মনে করে।

যেমন ছিল তাঁর অগাধ ভাষা-সমূহের জ্ঞান, তেমনই ছিল তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিশক্তি। তাঁর যাদু স্পর্শ যেখানেই প্রকাশিত হয়েছে, সেখানেই কাব্য, সৌন্দর্য্য, করুণা অভিনব রসে মনকে আকুল ক'রেছে। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র যথার্থই বলেছিলেন, Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape,

জানি না কজন বাঙালী কজন আজও মধুসূদনের কাব্য আলোচনা করেন। এদেশে কবিতার খাতির কত কম তা বাঙালার মাসিক পত্র পত্রিকা গুললেই বোঝা যায়। অথচ চিরদিন এই কাব্যেই বাঙালা দেশের বিশেষত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের উদ্দেশে বলেছিলেন, "যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।"

দেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের কিন্তু আমরা আজ প্রাপ্য যশ দিই না—অসম্মান ক'রে নয়, অজ্ঞানতা, অনুরাগ, অনধ্যয়ন বশতঃ। বাঙালা কি উন্নতির পথ থেকে অপেণে যাচ্ছে?

আর একজন যাঁহাতে ভাষার, ভাবের, কল্পনার সনাতন কালের প্রতি বিদ্রোহ চরম পরিণতি লাভ ক'রেছে, মধুসূদনের পর যিনি সমগ্র জগতে বাঙালীর দেশকে ও ভাষাকে ধন্য ক'রেছেন, তিনি ব'লেছেন, 'মধুসূদনের ছন্দে শুধু পরিবর্ত্তন প্রচারিত হয় নি, কাব্যের অভ্যন্তরেও তার প্রকাশ।' রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে দিবার লোভ সংবরণ করলুম না—করা উচিত নয়। মধুসূদনের সম্বন্ধে বল্‌বার শ্রেষ্ঠতর অধিকারী আর কে?

"মেঘনাদবধ কাব্যে ছন্দোবন্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্ত্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ী ভাঙ্গিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনের মধ্যে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিত বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্ম্মভীরুতা সর্ব্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভাল ও কতটুকু মন্দ, তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দ বোধ করিয়াছেন।"

মধুসূদন মানুষও ছিলেন বিরাট্। তাঁর প্রকৃতি ছিল কোমল, কিন্তু আনন্দ-রসে প্রগাঢ়। জীবনের সৌন্দর্য্যকে পুরামাত্রায় ভোগ কর্ত্তার উপযোগী মানস তিনি লাভ ক'রেছিলেন। ক্ষুদ্র, তুচ্ছ কিছু তাঁর কাছে ছিল না, সবই মানব মনের রসবস্তুতে তিনি পরিণত কত্তেন। যে রসিক নয়, সে জীবনের দুঃখ ত্রুটির মধ্যেও পরমানন্দ স্পর্শে মসৃণ হ'য়ে যায় না সে কবিই হইতে পারে না। বিশ্বের হৃদয়ের স্পন্দন যার প্রাণকে চঞ্চল করে নি, সে মানুষ নয়। সে স্পন্দন মধুসূদনকে কত জোরে নাড়া দিয়েছিল তা তাঁর জীবনের প্রতি কার্য্যেই ফুটে উঠেছে।

কৃষ্ণকুমারী, শর্ম্মিষ্ঠার কথাই ধরি, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রভৃতির কথাই ধরি, বা তাঁর কাব্যসমূহের কথাই ধরি, তিনি যে প্রত্যেক বিভাগেই নূতন সৃজন ক'রতে চেয়েছেন, তিনি যে বাঁধকে বার বার অতিক্রম কর্ত্তার জন্যে তাঁর প্রতিভার প্রচণ্ড শক্তিতে নিয়োজিত ক'রেছেন, নাটকে, প্রহসনে কবিতায় তার ছাপ গভীর ভাবে মুদ্রিত হ'য়েছে। আমরা মধুসূদনের পরে এসেছি,

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এসেছি, রবীন্দ্রনাথের পরে এসেছি ব'লে অনেক জিনিস আমাদের সরল ব'লে মনে হ'চ্ছে, অনেক জিনিস আমরা বিনা আয়াসেই লাভ করছি, অনেক জিনিস আমরা তৈরী পেয়ে উপভোগ করছি। কিন্তু যাদের প্রথমে কাঁটা বনে ফুল ফোটাতে হ'য়েছিল, যাদের বড় বড় পাথর সরিয়ে চলার পথ তৈরী ক'রতে হ'য়েছিল, দেশের সঙ্গে দশের, মনের সঙ্গে মনের, বিশ্বের সঙ্গে আত্মার সংযোগের জন্য তাদের বাধাবিঘ্ন, তাদের প্রতি শত্রুতা, তাদের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক কি প্রবল ছিল, এ কথা প্রতিক্ষণ স্মরণ ক'রতে হবে। তবেই উপলব্ধি করতে পারব তাঁদের প্রতিভার দীপ্ত কিরণে যে তিমিরপুঞ্জ অপসৃত হয়েছে তা কি ঘন, কি নিরবচ্ছিন্ন ছিল।

নিজের শক্তিতে বিশ্বাস ছিল মধুসূদনের।

স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনাদত্ত

শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন এই আত্মশক্তিজ্ঞান। তুমি বাঙলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ গড়তে পারবে? হাঁ, নিশ্চয়ই পারব। শুধু যে পারব তা' নয়।

বিরচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি!

কত বড় স্পর্দ্ধার কথা! আর নিজের প্রতি কতটা বিশ্বাস থাকলে মানুষ এ কথা বলতে পারে। আর কত বড় সেবক সে বাণীর, যার এ গর্ব্বোক্তি সফল হয়।

অপূর্ব্ব ইতিহাস তাঁর জীবনের, গল্পের চেয়ে মনোরম, উপন্যাসের চেয়ে বিস্ময়কর। প্রতীচ্যভাবে অনুপ্রাণিত, প্রতীচ্য ভাষাসমূহে বিদগ্ধ, এই কাব্যানুরাগী রসলোলুপ-মানুষ বাঙলার কাব্য বা ভাষানুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন না। কোন্ স্পর্শমণির সংযোগে তাঁর "সোণা হ'য়ে গেল সকল ভাবনা," যে বাঙালীর হিজ্র, পার্শী, তেলেগু মগজে গজ্‌গজ্ করত, সে মাতৃভাষাকে ঐশ্বর্য্যময়ী, শক্তিময়ী, মধুময়ী, প্রাণের পুলকে চাঞ্চল্যময়ী কেমন ক'রে করলে তা যারা জানে তাদের স্মরণীয়, যারা না জানে তারা দুর্ভাগ্য।

মহামানবদের মধ্যেই মধুসূদনের প্রীতি বিনিময় ছিল—তাঁর মত মহামানবের যোগ্য মণ্ডলীর মধ্যেই তাঁর শিক্ষালাভ হয়েছিল। হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সতীর্থ ছিলেন, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বঙ্গমাতার এই রত্নখনিতে মধুসূদন প্রোজ্জ্বল ছিলেন। মধুসূদনের সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "তাঁর বর্ণ কাল হইলেও তিনি দেখিতে বেশ সুশ্রী। শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল।"

কবি যতরকমে ভাষাকে শ্রীমতী করতে পারেন, মধুসূদন তার সবগুলিই অবলম্বন ক'রেছিলেন। যুগপ্রবর্ত্তক সকল কবিদের ন্যায়ই মধুসূদন মৃত কথাকে প্রাণ দিয়ে, নূতন কথা তৈরী করে, কথার রূপান্তর ক'রে, কথার অর্থ পরিবর্ত্তন ক'রে, অপ্রচলিত কথাকে প্রচলিত ক'রে বঙ্গবাণীকে সমৃদ্ধিশালিনী ক'রেছেন। তাঁর হৃদয়ের প্রেমের সঙ্গে তাঁর বাণী—অনুরাগ এক হ'য়ে যে সুধাসাগর সৃজন করেছিল তার পার নেই, পরিমাণ নেই। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, "মধুসূদন বীণাপাণির প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন", এ কথা যার পর নাই সত্য। যে প্রেমিক নয় সে কবি নয়।

আজ আমরা ভক্তিপুত চিত্তে মধুসূদনের মধুময়ী স্মৃতির পূজা করি। মধুসূদনের উদ্ভাবনী শক্তির, মনের শক্তির, কল্পনার শক্তির, রচনায় সেই প্রকাণ্ড শক্তির প্রকাশের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা ব'লেছেন তারই উল্লেখ করে এই প্রবন্ধ শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন, "এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য; ইহার হর্ম্মচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্বে গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহার স্পর্দ্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র-পৌত্র আত্মীয় স্বজনেরা এক একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে; তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না,—কবি সেই ধর্ম্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্দ্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিধায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ)

পূর্ণ শতবর্ষ আজি, বঙ্গপল্লীভূমে,
দত্তজ কায়স্থকুল করিতে প্রোজ্জ্বল—
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
বঙ্গবাণী শুভাশীষ বহি শিরোপর
লভিলা জনম বঙ্গকবি-পুরন্দর
শ্রীমধুসূদন। রচিলা যে মধুচক্র
প্রাচ্যও প্রতীচ্য দুই ভাবসমন্বয়ে,
প্লাবিয়া ভারতভূমি অমৃত হিল্লোলে
মরণে দানিল তাঁরে অনন্ত জীবন।
সতীর্থ ভূদেব সহ উন্মত্ত পুলকে
সাহিত্যে বিজ্ঞানে ভেদ কৈলা সমাধান।
ভুলিলা বিজাতি-দ্বেষ, ধর্ম্মের আক্রোশ,
দুই মহা বিরাটের করিলা মিলন।
নবযুগ নবধারা করিলা প্রচার,
প্রবাহিলা নবশক্তি ভাষার জীবনে!
সম্পদে ভরিয়া দিলা বাণীর মন্দির,
শব্দন্যাস ছন্দোবন্দ নব প্রকরণ।
মরতে নরকদৃশ্য দক্ষ তুলিকায়
করিলা চিত্রিত সুধী—লোক-অগোচর।
দেখাইলা রক্ষসতী প্রমীলা সুন্দরী,
নৃমুণ্ডমালিনী সখী চামুণ্ডা রূপিণী,
মহাবলী মেঘনাদ, যজ্ঞ নিকুম্ভিলা,
সৌমিত্রি-কেশরী শূর লক্ষণ সুমতি!
পূজিলা অপূর্ব্বমূর্ত্তি মহিলা শর্ম্মিষ্ঠা,
আদর্শ প্রতিমা ভবে শ্রীকৃষ্ণকুমারী।
শুনাইলা ব্রজাঙ্গনা মধুর ভারতী,
ওজস্বিনী বীরাঙ্গনা গাথা নিরুপমা।
নাটকের পরিব্যাপ্তি করিলা সাধিত
প্রহসনে পূর্ণাহুতি অপূর্ব্ব বিধানে।
স্মৃতির ফলক লিপি আপনার তরে
আপনি লিখিয়া দিলা সংক্ষিপ্ত ভাষায়।
পিতা, মাতা, জন্মভূমি, করি পরিচয়
আপনার গৌরবেতে বিশ্বে গৌরবিলা।
অতীত শতাব্দ; পুণ্যকথা বঙ্গে আজি
শ্রীমধুসূদন নাম। সুপবিত্র গাথা
তাঁর সুললিত ভাষা। সাহিত্য-উদ্যানে
মধুর মধুরে করে অমর স্মরণ।
বিপদে মানব স্মরে শ্রীমধুসূদন।
সম্পদে সাহিত্য সেবী স্মরয়ে তেমতি
শ্রীমধুসূদন কবি জগতে বিশ্রুত।

স্বপ্ন

(গল্প)

(পরদেশী)

কৃষ্ণপক্ষের গভীর রজনী!

ধরণী সুষুপ্তা—শুধু আমার চোখে নিদ্রা নাই। বাহিরের অন্ধকারের ন্যায় আমার হৃদয়-গগনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রকৃতির নিস্তব্ধ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া অতীতের কত কথাই ভাবিতেছিলাম। সুখময় গৃহ, স্নেহময় জননী, বাল্যের সুহৃদ্ একে একে সব মনে পড়িতেছিল। অকস্মাৎ দূরাগত সঙ্গীত-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করায় আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। ক্রমে সেই মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল।—

"বাসনা যখন বিপুল ধূলায়
অন্ধ করিয়া অবোধ ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিন্দ্র,
রুদ্র আলোকে এসো॥"

* * * * *

আমি ধীরে ধীরে বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম, আমার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন—এক শুভ্রবেশ—সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী। আমি কোন কথা স্মরণ করিতে পারিলাম না। ব্রহ্মচারীর পদধূলি গ্রহণের নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিলাম; কিন্তু পারিলাম না। কপোল বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

তিনি সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস! এ সংসার কেবল মাত্র পরীক্ষা ক্ষেত্র—এত অল্পে বিচলিত হইও না, শ্রীহরির পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণের চেষ্টা কর। তিনি প্রাণে শান্তি দিবেন।"

"প্রভো! তবে কি আপনি সব জানেন?"

"হাঁ বৎস! মানবের ক্ষুদ্র-শক্তিতে যতটুকু জানা সম্ভবপর হইতে পারে, আমি তাহাই জানি। ইহার অধিক নহে।"

"আমি বড় অসহায়, বড় একা—এ ঘোর অন্ধকারে আমাকে পথ দেখাইয়া দিন্।"

"আমি পথ দেখাইবার কে? পথ দেখাইবার যিনি, তাঁহাকে ডাক।"

"তাঁহাকে ত কত ডাকিয়াছি—তিনি ত কখনও আমার ডাকে সাড়া দেন নাই!"

"ভাবিয়া দেখ—কায়মনোবাক্যে কখনও কি ডাকিতে পারিয়াছ?"

"যেদিন মৃত্যুর দূত আমার স্নেহের পুত্তলি, নয়নের আনন্দ, জনক জননীর শেষ-স্মৃতি ভাইটিকে অকালে বৃন্তচ্যুত করিয়া লইয়া গেল, সেদিন তাঁহার চরণে কত কাতর মিনতি জানাইয়াছিলাম; কিন্তু কই, আমার কাতর প্রার্থনায় তাঁহার আসন ত একবারও টলে নাই।"

"বিশ্বাস হারাইও না—একদিন ভ্রাতার সন্ধান মিলিবে।"

* * * * *

চাহিয়া দেখিলাম কেহ কোথাও নাই। জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর আরও কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি ডেরাডুনে কাজ লইয়া আসিয়াছি। এখনও স্বপ্নের ন্যায় "সেদিনটার" কথা মনে পড়ে। একবার মনে হয়, তবে কি ব্রহ্মচারী আমাকে প্রতারণা করিয়াছেন? না—তাহা কখনই হইতে পারে না। আবার আমার হৃদয়ে নূতন আশায় জ্যোতি ফুটিয়া উঠে।

সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে ভীষণ দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতির রুদ্র লীলা পাষাণের বুকে বিভীষিকার উন্মাদ শিহরণ জাগাইয়া দিতেছে—মেঘের কোলে বিজলীর খেলা—ঘরের বাহির হয় কাহার

সাধ্য। আমি 'ডুইং রুমে' চিকিৎসা সংক্রান্ত একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে একজন আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। আশ্চর্য্য! এই দুর্য্যোগেও মানুষের কাজ থাকিতে পারে! তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবার আদেশ দিয়া পুনর্ব্বার পুস্তকে মনঃসংযোগ করিলাম।

কয়েক মিনিট পরে ভৃত্যের আহ্বানে চাহিয়া দেখিলাম, দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা অবগুণ্ঠনবতী এক বাঙ্গালী রমণীকে দেখিতে পাইয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম।

তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলে, তিনি অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আজ আমি বড়ই বিপন্না; আমার একমাত্র সন্তান মৃত্যু শয্যায়—আমার অর্থবল, লোকবল কিছুই নাই। আপনার সাহায্য ব্যতীত তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারি সে ভরসা নাই।"

রমণীর ব্যথা-ভরা পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলাম, "মা, আপনার পুত্রের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। আপনি বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত হইবেন না।"

কৃতজ্ঞতায় তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি অল্পকাল মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া রমণীর গৃহে গমন করিলাম। গৃহমধ্যে একটি সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয় বালক জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার শিয়রে একটা প্রদীপ ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছে। আমার মনে হইল যেন মৃত্যুর দূত গোপন চরণে সুযোগের অপেক্ষায় ফিরিতেছে। বহুদিনের একটী বিস্মৃত অধ্যায় মনে পড়িয়া গেল। * *

বালকের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, যদি উহার গতি মৃদু, তথাপি উপযুক্ত চিকিৎসা এবং যত্ন করিলে এযাত্রা রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে।

আজ আমার মনটা কিছু প্রফুল্ল—তৃতীয় দিবসে বালকের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। জীবনের সকল আশঙ্কা কাটিয়া গেল। দুঃখিনী জননীর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

এগার দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রাম লাভ করিয়া আজ কেমন একটা অবসাদ আসিয়াছিল। শ্রান্ত দিনমণি পশ্চিম গগন হইতে বিদায় গ্রহণের সঙ্গে আমিও শয্যায় এলাইয়া পড়িলাম। কখন যে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম, কিছুই জানি না।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মচারী আমার মস্তকে হস্ত-প্রদান-পূর্ব্বক কহিতেছেন, "বৎস! একবার চাহিয়া দেখ, আমি মিথ্যা বলি নাই—প্রতারণাও করি নাই। এতদিনে তোমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। তুমি প্রাণান্ত যত্নে একটী দরিদ্র বালকের জীবন রক্ষা করিয়াছ। তোমার কার্য্যে দেবতা প্রীত হইয়াছেন।"

চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এতকাল যাহার দর্শনের আশায় কাটাইতেছি, তিনি আজ নিকটে দাঁড়াইয়া মধুর হাস্য করিতেছে। আমি আত্ম-সংবরণে অসমর্থ হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিলাম।

আবার ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তুমি বাতুল—অশরীরী জীবকে কি কেহ স্পর্শ করিতে পারে? আজ হইতে প্রতি দরিদ্র বালকের মধ্যে তোমার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। দরিদ্র, নারায়ণের অংশ—তাহাদিগের সেবার ভার গ্রহণ করিবে।"

ব্রহ্মচারীর বাক্য শেষ হইতে না হইতে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কোথাও কিছু নাই; শুধু নবোদিত সূর্য্যের অরুণ কিরণ শয্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বাঁধন

(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি এ)

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কল ভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে ;
দীপ মিটি মিটি, শেষ হয় রাত,
পাখী আর শিশু আনিছে প্রভাত,
বড় হাতখানি কণ্ঠে জড়ায়,
ছোট হাত মোর
বুকে আসে—
পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কল ভাষে।

নিশাশেষে আজ একি সুমধুর
জাগরণ!
—একি আঁখি-সুখ আহরণ!
কচি অধরের হাসির কাকলি
কোন্ প্রাণ মোর তুলিছে আকুলি'!
রমণীর মুখে নূতন মহিমা
নিমেষে ফুটিল
আবরণ!
নিশা শেষে আজ একি সুমধুর
জাগরণ!

ঘুম-ভাঙা আঁখি হেরিছে স্বপন
অনিমেষে!
—স্বরগ-সুধার রসাবেশে!
প্রিয়া চেয়ে আছে শিশুর বয়ানে,
—শিথিল বেণীটি লুটায় শিথানে,
ঝল্‌মল্ করে হারখানি তার
পয়োধর মূলে
সরে' এসে!—
মোর আঁখি আজ হেরিছে স্বপন
অনিমেষে!

বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা—
রাধা ও ম্যাডনা একা কারা!
অধরে মদিরা, নয়নে নবনী,—
একি অপরূপ রূপের লাবণি!
সুন্দর! তব একি ভোগবতী
মরম-পরশী
রসধারা!
—বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা!

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে ;
জনমে জনমে ওই বাহুপাশ,
শিশু কণ্ঠের ওই কলভাষ
বাঁধিয়াছে, জানি, গাঁটছড়াখানি
দ্বিগুণ করিয়া
দৃঢ় ফাঁসে!
—তাই ধরা পড়ি এই ধরণীর
বাহুপাশে

পাহাড়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদার]

সংখ্যা গণনা—সংখ্যা গণনা সম্বন্ধে পাহাড়ীদের বিশেষত্ব কিছু নাই, তাহারা আমাদের মত সকল সংখ্যাই গণনা করিতে পারে। তবে কেহ আঙ্গুলের পর্ব্ব গনা করিয়া কুড়ি পর্য্যন্ত সংখ্যা রাখে। সেই গণনায় তাহারা একটি ছড়া বলে, সে ছড়াটি এই :—

একান্ দোকান তিনৈ চা'র
ভোলি পরশি মঙ্গলো বার
কাঠকো ঘোড়া রূপা সে
তেরো বাব্ চুপা সে
ঠাক্ ঠুক্ উনৈশ বিশ।

প্রবচন—বাঙ্গলায় এবং উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে যেমন নানারূপ প্রবচনের ব্যবহার আছে, পাহাড়ীদের মধ্যেও সেই সেই অর্থবোধক বিবিধ প্রবচনের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহারই কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি :—

(১) এক যোয়ি কি পোই
রাজা সমান হৈ।
দুই যোয়ি কি পোই
কুণা পশি রই।
তিন যোয়ি কি পোই
কুকুর সমান হৈ।

পশ্চিমাঞ্চলের একটী প্রবচন আছে,—

পহিলা কুত্তা কুত্তা বোলে
দোস্রা কুত্তা কুত্তা সাথ চলে
তিস্রা কুত্তা বহিন্ ঘর ভাই
চৌথা কুত্তা ঘর জামাই।

ইহাতে ভগিনীপতির গৃহে থাকিয়া তাহার অন্নপালিত শ্যালক এবং শ্বশুরের গৃহে থাকিয়া শ্বশুরের অন্নে পালিত জামাই এই উভয়ের জীবন ঘৃণিত ও নিন্দনীয় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। পাহাড়ীদের প্রবচনের ভাবার্থ এই যে, এক পত্নীর স্বামী হইলে তাহার সুখের সীমা থাকে না। যে দুই পত্নীর স্বামী তাহার জীবন শোচনীয়। পরন্তু যে তিন পত্নীর স্বামী সে কুকুরের ন্যায় ঘৃণিত জীবন-ভার বহন করে।

(২) আরকোলে তফাঁই ভনস্ ওয়া ন ভনস্
আকৈঁ মফাঁই হুনে।
পাঠান্তর
আরকোলে তফাঁই ভনস্ ন ভনস্
আকৈঁ মফাঁই ভাকো।
সংক্ষেপে
আকৈঁ মফাঁই ভাকো।

ইহার অর্থ আমাদের "গাঁধে মানে না আপনি মোড়ল"।

(৩) বাঙ্গলার "গাধলে কাঁঠাল খায় না সেকে ভুতুড়ি ধাঁয়না" এখানে, দিদান খানে রাতি উটি কোল চাটনে, দাঁড়াইয়াছে।

(৪) গাঁওকো মুখিয়া ন ঘাট্কো ঘাটোয়ারে।

ঠিক এ অর্থবোধক "ধোবিকা কুত্তা না ঘরকা না ঘাট্কা" প্রবচন আমাদের দেশে প্রচলিত।

(৫) আঙ্গু ভনে ছার মা খুঁটা ভনে ভার মা।

আমাদের দেশে প্রচলিত ইহার অনুরূপ প্রবচন এই :—

"ঘরে ভাত নাই লথা কোঁচা"।
"উদ্ খেতে ক্ষুদ্ মেলে না মাথায় ফুলেন তেল"।
"থ্যাদা পুতের নাম পদ্মলোচন"।

"ঘুঁটে কুড়ুনির ব্যাটা পোটা চন্দন"।
"দামু মোদের ব্যাটা শিশুপাল" ইত্যাদি।

(৬) সিং উঘাই ঘৈলা ভরণু।

আমাদের "রাই কুড়িয়ে বেল"।

(৭) হগি পনি সকিয়ে বাট পনি দেখিও।

আমাদের দেশে প্রচলিত ইহার অনুরূপ প্রবচন এই :—

"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে"।

(৮) মহি মাঙনু ডুংরো লুকাউনু।

আমাদের দেশের
"পেটে আধখানা মুখে আধখানা"।
"ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়" ইত্যাদির মত।

(৯) দুধ গুণো বুদ্ধি হাড় গুণো বল।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে ছেলের বুদ্ধি এবং বল ও গর্ভমায়ু যথাক্রমে মায়ের দুধ এবং বাপের বল অনুযায়ী হইয়া থাকে।

ঘুম পাড়ান ছড়া—আমাদের দেশের মেয়েরা তাহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে ঘুম পাড়াইবার জন্য কতকগুলি ছড়া ব্যবহার করে। সে ছড়ার কোন অর্থ নাই, পূর্ব্বের সহিত পরবর্ত্তী চরণের কোন সংস্রব বা সামঞ্জস্য নাই। এগুলি কেবল কতক-গুলি শব্দের যোজনা মাত্র। সে সকল শব্দের এমন কোন শক্তি নাই যে, শিশুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র নিদ্রা কোথা হইতে অলক্ষিতভাবে আসিয়া নিঃশব্দে তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিবে। কিন্তু যে সুরে সেই ছড়াগুলি গাওয়া হয়, সে সুর এবং তাহার সঙ্গে তালে তালে গা চাপড়ান এই উভয়ে মিলিত হইয়া ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া দেয়। পাহাড়ীদেরও সেইরূপ ঘুম পাড়ানি ছড়া আছে। আমি পাহাড়ীদের নিকট এই ছড়া সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সকলেই বলিয়াছিল যে তাহাদের ছড়া নাই ; কিন্তু যে দেশে মা আছে সে দেশে ঘুম পাড়ানি ছড়া নাই এ কথা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব এই কথা বলিয়া না-ছোড়-বান্দা হওয়াতে অবশেষে একটী পাহাড়ী স্ত্রীলোক আমাকে নিম্ন লিখিত কয়েকটী ছড়া বলিয়া দিয়াছিল :—

(১) উড়ি যাউ ভনে, ম পক্ষি হৈনা,
বসনু লাই মন ছেই না।
উভো লাই হের, ইয়ো কালি লেখা,
উধো লাই বন ছেই না।

অর্থাৎ :—
থাকুতে হেথায়, মন সরে না,
কেমন ক'রে যাই।
পাখী হ'তাম, উড়ে যেতাম,
পারি যা কই তাই।
বন জঙ্গল, নাইক নীচে,
লাগে না তাই ভাল।
উপর দিকে দেখ্‌ছি কেমন
পাহাড় কাল কাল।

যদিও আমাদের সুরের সঙ্গে পাহাড়ীদের সুরের মিল নাই, তথাপি আমাদের "ও পারেতে জন্তি গাছটী জন্তি ঝুর্ ঝুর্ করে" এই সুরে পাহাড়ীদের উপরোক্ত ছড়াটী আবৃত্তি করা যায়।

(২) শিল গুড়ি বাট, মাল গাড়ি আয়ো'
চার পায়া বিয়িরি।
মুণ্ডাকো হারি বিল পাটকো শাড়ী
ঝুমকে শাল ফিরিরি।

অনুবাদ

শিলগুড়ি হ'তে ঐ এল মালের গাড়ি।
গড় গড় ক'রে চা'র চাকায় দিয়ে পাড়ি॥
মখ্‌মলের শাড়ী পরা গলায় সোণার দানা।
মাথার রুমাল ফুরফুরিয়ে উড়্‌তেছে দেখ না॥

(৩) হিমালয় চুলি তিয়োপরি বাট
উড়ি আয়ো ছুরেলি।
বারি মা সাপ ছ রুমু মান লাগছ
ন বাজাউ মুরেলি॥

অনুবাদ

হিমালয়ের শিখরেতে কত পাখী আছে।
সেথা হ'তে ঝোঁটন পাখী উড়ে এসেছে॥
বাগানেতে সাপ আছে ফোঁস্ ফোঁস করে।
বাঁশী বাজায়ো না তুমি বাগানের ধারে॥

(৪) রাণী বনকো ঝিঁজে দাওরা
ফুল ভায়ো ঝরাণি।
এতিকো বেলা কে গরদাই হোলা
হিতেকো পরাণী॥

অনুবাদ

রাণী বনের শুক্‌নো সরু আলানি কাঠগুলি।
ছাই হ'য়ে উড়ে গেল বনে আগুন জ্বলি॥
বেলা গেল সন্ধ্যা এল অস্ত দিনমণি।
না জানি কি করে এখন হিতের পরাণি॥

(৫) হাতে র মেরো কট্‌কটি খায়ো
বাঘ মুখে চুড়াইলে।
দিন দিনৈ জেঠী বিরাম্থ ভয়ো
আরকো কো কুরাইলে॥

অনুবাদ

মকর মুখো কলি প'রে হাত টন্ টন্ করে।
পরের কথা শুনে জেঠীর নিতুই বিরাগ বাড়ে॥

পাহাড়ীকর গান—ছড়ার মত পাহাড়ীদের গানেরও আগাগোড়া মিল নাই; অর্থাৎ এক অংশের সহিত অপর অংশের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বপর সামঞ্জস্য থাকা ত দূরের কথা, এমন কি প্রথম অংশের কোন সার্থকতাই নাই। অধিকাংশ গানেরই দুইটী করিয়া চরণ। শেষ চরণটী গানের ভাব বা অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করে, প্রথম চরণটী অর্থহীন, উদ্দেশ্য হীন। কয়েকটী শব্দ মাত্র এমন ভাবে যোজনা করা হয় যেন তাহার শেষ বর্ণটী দ্বিতীয় চরণের অন্ত্য বর্ণের সহিত পয়ার ছন্দের নিয়মানুসারে মিলিয়া গেলেই হইল।

গীত

রাণী বনাইমা সম্‌জো মনাই মা।
একলা ছোড়ি না যাও জেঠি পানকো দোকান মা॥

গানের অভিপ্রায় বক্তা ইহার শেষ চরণে। ইহার অর্থ আমাকে পানের দোকানে একলা রাখিয়া যাইও না। কিন্তু ধর্‌তা না থাকিলে গান হয়না, সেই ধর্‌তার খাতিরে প্রথম চরণটী বসান হইয়াছে এবং দ্বিতীয় চরণের "দোকান মা" শব্দের সহিত কোনরূপ কায়ক্লেশে মিল রাখিবার জন্য পাগলের ছাই ভস্ম প্রলাপোক্তির মত "মনাইমা" শব্দটী ইহাতে যোজিত করা হইয়াছে। ইহার অর্থ, মনে জানিও রাণী বনে আছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—

হিমালয় চুলি তে-পরি বাট
ভোটেকো গুধা ছ।
হাতেমা সমাই তিন ফন্‌কা ঘুমাই
গালেমা চুম্বাছ॥

এ গানটীর প্রথম চরণের অর্থ এই যে, হিমালয় শিখরে পথের ধারে ভুটিয়াদের গুধা আছে। আর দ্বিতীয় চরণের অর্থ এই যে, হাত ধরিয়া তিন পাক ঘুরাইয়া গালে চুম্বন দাও। বলা বাহুল্য যে দ্বিতীয় চরণের সহিত প্রথম চরণের অর্থ সম্বন্ধ কিছুই নাই। কথা মাত্র দাও আমার গালে একটী "চুম্বা"। এই ধান ভানিবার জন্য ভুটিয়ার "গুধা" এই শিবের গীত গাওয়া হইয়াছে। অন্তর্থা ভুটিয়ার গুধা থাকুক বা না থাকুক তাহাতে চুম্বার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত—

তিনধারে যান্‌কো তিনধারা পানি
তিয়ো থৈলা ভরদৈনা।
গালাকো মাস্থ গালামা শুকিয়ো
তৈ মায়া মরদৈনা॥
ঘুমাউদে লায়ো কাঁহি
তিম্রো মায়ালে ম লাই।

প্রথম চরণের অর্থ এই :—তিন ধারিয়ার যাইবার পথে তিন ধারায় বারি প্রবাহিত হইতেছে তাহাতেও সেই জলের কলসী পূর্ণ হইল না।

দ্বিতীয় চরণের অর্থ এই :—গালের মাংস গালে শুকাইয়া গেল, অর্থাৎ দেহ আমার জীর্ণ শীর্ণ ও মৃতকল্প হইল, অথচ তোমার প্রতি আমার যে মায়া ছিল তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ও হ্রাস হয় নাই। কাহি লো তোমার সেই মায়া আমাকে আবার এখানে ঘুরাইতে ঘুরাইতে আনিয়াছে।

যে মায়ার বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া আছি সে বন্ধন অচ্ছেদ্য। প্রাণ বাহির হইতে বসিয়াছে তথাপি মায়ার টান ঘুচিতেছে না। সেই টান আমাকে তোমার কাছে টানিয়া আনিয়াছে। বেশ সরল কথা, কোন্ রূপ জটিলতা নাই। কিন্তু ইহার সহিত, কলসীতে জল ভরেনা, এই কথার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে কবির কল্পনাকে ও পরাভব স্বীকার করিতে হয় না কি?

যুবতী, রাসকা পাহাড়ী কন্যারা দুই চারি জন একত্র হইলেই, সকলে সমস্বরে গান গাহিবার ইচ্ছাটা যেন স্বতঃই তাহাদের প্রাণের মধ্যে আগুণে চড়ান দুধের প্রথম ঝলকের মত উথলিয়া উঠে। ঐরূপ ঐকতান গীত পথে ঘাটে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। গানের বহর এক চরণ, বড় জোর দুই চরণ। গান এক নিশ্বাসে শেষ হইয়া যায়, অথচ গায়িবার পিপাসা মেটেনা। তখন তাহারা এক গানের পর আর এক গান এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিন চারি বা আরও বেশী গান এক টানে গায়িয়া যায়। অধিকাংশ গীতই প্রণয়-সঙ্গীত। যে গীতটী তাহাদের মর্ম্মের ব্যথা, প্রাণের কথা সেইটী হয় তাহাদের ধর্‌তা, তাহার ভাব হয়ত পূর্ব্বরাগ। তাহার পর সঙ্গে সঙ্গে সেই গানের অন্তরা করিয়া আর একটী গান ধরে, তাহার ভাব হয়ত বিরহ। ধর্‌তার পুনরাবৃত্তি করিয়া আবার তৃতীয় গান ধরে; সেটী হয়ত দেহতত্ত্ব বিষয়ে এইরূপে বহুবিধ ভাবের জগা খিচুড়ী পাকাইয়া তাহারা গান গায়। ভাবের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের দিকে তাহাদের লক্ষ্য থাকেনা, লক্ষ্য থাকে কেবল সুরের দিকে। যথা,—

ধর্‌তা

হে দিল্‌কো পিয়ারি কল্লাই না ভন্‌দু ম তিম্রো হুনেছু।

পদ্য অনুবাদ

হে প্রাণের প্রিয়তম শুন অঙ্গীকার মম
তোমারি হইব আমি অন্য কারো হবনা।
সন্ধোপনে রেখ কথা কারো কাছে বলনা॥

এই ধর্‌তার অন্তরা যদি বিরহ-সঙ্গীত হয় এবং পর পর কলি যদি বিপরীত ভাবাপন্ন হয় তাহা হইলে সুরে গীত গায়িয়া ভাবের আদ্য শ্রাদ্ধ করা হয় না কি?

চতুর্থ দৃষ্টান্ত—

গীতের আদ্য অংশ

গালা ছ মেরো লালে বর্ণে
আঁখা ছ মেরো মরকৌণে
কপাল ছ মেরো চন্দ্রমা দায়িনো
কুরকুচা লট্‌কিনে।

মধ্য অংশ

ঘুম পাহাড় যান্‌কো পানিকো হিট
তিয়ো মাথি টাইগার হিল
কি লেই যাউ মলাই পিয়ারিকো সাথেমা
কি ঝিক্ দেও প্রেমকো খিল।

অন্ত্য অংশ

শেতো লাই রুমাল রাতো লাই রুমাল
দু-রুমাল গাঁসি দেও
কি লেই যাঁউ পিয়ারি আফুকো আখেমা
কি গলেমা ফাঁসি দেও।

এ গীতের প্রথম অংশ রূপ বর্ণনা।

দ্বিতীয় অংশে নাগরীর নাগরের প্রতি নিবেদন এই যে, হয় তাহাকে সহচরী করিয়া তাহার মনোনীত স্থানে লইয়া যাওয়া হউক, না হয় তাহাদের প্রেমে চির-বিচ্ছেদ ঘটুক। তৃতীয় অংশের বক্তব্য—হয় আমাকে সঙ্গিনী কর, নতুবা আমার প্রাণ বধ কর।

পাহাড়ীদের গান বলিলেই বুঝিতে হইবে প্রণয়-সঙ্গীত বা টপ্পা। টপ্পা ব্যতীত অন্য গান ও তাহাদের আছে, সে গানের নাম গান নহে, ভজন। শ্রীরাম নবমী, দোল যাত্রা, রাসলীলা, সত্যনারায়ণের পূজা ও দেউসি পর্ব্ব উপলক্ষে তাহার গাহনা হয়।

ভাবের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, পাহাড়ীদের অপেক্ষা ভুটিয়াদের গান অনেক পরিমাণে ভাল। কারসিংং প্রবাসী জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া একটী ভুটিয়া গান অনুবাদ সহ আমাকে দিয়াছিলেন সে গানটী এই :—

লেপে লেপে ওয়ই
যেই লেপে ওয়ই ছা
ওয়ই আ।
লেপে চোলে ওয়ই সুখে
যেই গে……

অনুবাদ

সবই ভাল আজ, সবই ভাল,
চারি ধারে শুধু পুলক তাই।
মঙ্গলের দিকে চলেছি মোরা,
যা' কিছু শুভ তাই শুধু চাই। (ক্রমশঃ)

মুক্তি

(শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি এ)

প্রিয়ার বাহুলতার পাশেই আমার পরামুক্তি,
আমার হৃদয় মুক্তা হেথায়, প্রিয়ার হৃদয় শুক্তি।
এইখানে নেই কোন শিকল,
হেথায় শাস্ত্র যন্ত্র বিকল,
হেথায় লভে সার্থকতা প্রেমগীতার উক্তি,
প্রেমের অগাধ হ্রদে হেথায় অবাধ আমার মুক্তি।

নিয়ম নীতির বাইরে হেথায় আমার পরম মোক্ষ
সভায় হাটে তীর্থে মঠে বাধা নিষেধ লক্ষ।
আইন কানুন গণ্ডী বাঁধন
প্রথারীতির চণ্ড শাসন
সকল ঠাঁইয়েই, ঠিক রাখা চাই আপন আপন কক্ষ।
এইখানে নেই বল্গা কশা, এই খানে পাই মোক্ষ।

সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব বিহীন এইখানে কৈবল্য,
নাইক হেথায় হিসাব খতেন, নেইক অঙ্ক কল্য।
হিতাহিতের লাভালাভের
কোন বিচার পাইনাক টের।
কথায় কথায় বেঁধে নাক ভব্যতা-বিষশল্য।
কেবল আমার এইখানেতেই বাঞ্ছিত কৈবল্য।

সমগ্রতায় এই খানেতেই পাই যে অপবর্গ,
সকল ঠাঁয়েই মর্ত্ত নরক, হেথায় মিলে স্বর্গ।
চাল্লাটি ফলই পূর্ণ গড়ি,
সকল ঠাঁয়েই অংশ সবি,
খণ্ডমতে ভাগ করেছে সমাজ বিধির খড়্গ,
এইখানে পাই চারটি ফলেই পূর্ণ অপবর্গ।

সৃষ্টি ও প্রলয়

(শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি এল)

ত্যাগে সৃষ্টির উৎপত্তি। যখন ব্রহ্ম বহুহন নাই, তখন সৃষ্টি ছিল না; যখন তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি বহু হইবেন, তখন হইতে সৃষ্টি আরম্ভ, এবং সেই ইচ্ছা অনন্ত প্রবাহ রূপে নিরন্তর চলিতেছে; তিনি বহু হইয়াছেন, আবার সেই বহুরও সিসৃক্ষার বিরাম নাই। এই বহু হইবার ইচ্ছা যখন সন্দীভূত হইতে

থাকে, তখন প্রলয়ের আরম্ভ হয় এবং উহা যখন সম্পূর্ণ অন্তহিত হয় তখন প্রলয় ঘটিয়া থাকে। জীবগণ ব্রহ্মেরই বহুরূপ। প্রস্তর মৃত্তিকা হইতে, বৃক্ষ, লতা, অণ্ডজ, কীট, পতঙ্গ, স্বেচর, পশু পক্ষী মানবে সেই এক ব্রহ্ম সত্বা বিদ্যমান; সুতরাং মূলতঃ সকলই জীব অর্থাৎ সত্বা বিশিষ্ট; সেই সত্বার ধর্ম্ম সিসৃক্ষা বা নিজকে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা (tendency towards projection), উচ্চ শ্রেণীর জীব, পশু পক্ষী মানবের মধ্যে এই সিসৃক্ষা বা স্থূল দেহ ধারণ ইচ্ছার নাম মৈথুন বা জননেচ্ছা; উহাদের স্থূল দেহ ধারণের জন্য মৈথুন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। যেমন স্থূলদেহ পুষ্টি ও রক্ষার জন্য আহার ও নিদ্রা স্বাভাবিক, সেইরূপ বহু হইবার ইচ্ছা হইতে মৈথুন বৃত্তি (Sexual appetite) স্বাভাবিক। তবে অপব্যবহারে স্বাভাবিক বৃত্তিরও কুফল হইয়া থাকে। সংযত থাকিয়া জননেচ্ছা পূর্ণ করিলে সুফল ঘটিয়া থাকে। মানবের তথাকথিত মৃত্যুর পর, তাহার আত্মা বিদেহী, অর্থাৎ স্থূল দেহ মুক্ত; কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ ধারী জীবাত্মা যে, প্রেত লোক বা নরক, দেবলোক বা স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠাদিতে গমনের কথা শুনা যায়, প্রকৃতপক্ষে ঐ সব লোকের কোনও স্থান বা দেশ (Locality) নাই, উহা সূক্ষ্ম দেহ বা মনেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। যেমন পঞ্চভূত দ্বারা স্থূল (বা অন্নময় ও প্রাণময় কোষ) দৈহ নির্ম্মিত, সেই রূপ বাসনা দ্বারা সূক্ষ্ম (বা মনোময় কোষ) দেহ নির্ম্মিত। স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর সূক্ষ্ম বা বাসনাময় দেহ বর্ত্তমান থাকে; যদি বাসনাময় দেহের লয় হয়, তবেই আত্মা, ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠে গমন করে অর্থাৎ সে সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা ছিল, সেই অবস্থায় অবস্থিতি করে, তাহার উপর মায়ানির্ম্মিত স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের অন্তর্ধান হয় এবং স্বরূপে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই নাম কৈবল্য মুক্তি; দেহধারী আত্মা ও জীবরূপ ব্যষ্টি আত্মা (Individual Soul) তখন সমষ্টি আত্মায় (universal soul) লীন হয়। যখন সমস্ত জীবের এইরূপ পরমাত্মায় লয় হয়, তখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়।

মানব স্থূলদেহের সাহায্যে কামনাময় বা সূক্ষ্ম দেহের বৃত্তির ভোগ করে; স্থূল দেহের প্রতি কর্ম্ম দ্বারা আমরা, সূক্ষ্মদেহের বা মনের বাসনা ভোগ করি। এই ভোগ আবার কেবল মন দ্বারাও সংঘটিত হইতে পারে। চিন্তাদ্বারা মনের ক্রীয়াশীলতা বৃদ্ধি হয়। আহার যেমন শরীর পোষণ করে, চিন্তাও সেইরূপ মনের পোষাক আহার। সচ্চিন্তা মনের সাত্বিক আহার; অসচ্চিন্তা তামসিক আহার। স্থূল শরীরেও এইরূপ সাত্বিক ও তামসিক আহার আছে। আহারের অভাবে স্থূল সূক্ষ্ম উভয় শরীরের ক্ষয় হইতে পারে। মনের লয় না হইলে, ব্রহ্ম দর্শন হয় না অর্থাৎ আত্মা স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন না।

আমাদের চরিত্র, চিন্তা, বাসনা ও কর্ম্মের দ্বারা গঠিত হয়। মৃত্যুর সময় আমরা সেই সংস্কার-তন্তী (cluster of impresions) বা চরিত্র লইয়া দেহ ত্যাগ করি। দয়া, দাক্ষিণ্য, কবিত্ব, উচ্চ চিন্তা দ্বারা গঠিত মন, স্বর্গ বা দেবলোকে গমন করে ও সুখভোগ করে। প্রবল রিপু—কাম, ক্রোধ, হিংসা বিদ্বেষ, বিষয়াসক্তি দ্বারা গঠিত চরিত্র প্রেতলোক বা নরকে গমন করে এবং স্থূল বা ভোগদেহরূপ যন্ত্র (instrument) না থাকায় দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু এই সকল সুখ ও দুঃখ ভোগেরও সীমা আছে। তাহার অন্তে মন বা সূক্ষ্ম দেহ পুনরায় ভোগদেহ ধারণ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্র হয়, সেই অবস্থায় তাহার পিতৃলোকে স্থিতি বলা যাইতে পারে। সে সমধর্ম্মাক্রান্ত পিতামাতার অন্বেষণে ভ্রমণ করে। পিতামাতার পুত্রোৎপাদন সময়ে মনের ইচ্ছার সহিত, বিদেহীজীবের ইচ্ছার সহিত মিল থাকিলে, পিতার ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া, তাহার শুক্রের (spermatoza) সাহায্যে মাতৃ-শোণিতে প্রবিষ্ট হইয়া, স্থূলদেহ ধারণ করে। মৈথুনে জীবোৎপত্তির ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে;

কিন্তু প্রত্যেক মৈথুনে অন্য নৈসর্গিক কারণে সন্তানোৎপত্তি না হইতেও পারে। তবে এই মৈথুনেচ্ছার আদিতে (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) জীবোৎপত্তির ইচ্ছা বা "অহং বহুস্যামঃ" ভাব আছে।

অস্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা মৈথুনে জীবোৎপত্তির রোধ বর্ত্তমান সভ্যসমাজে প্রচলিত থাকিলেও, উহা যে ভগবানের নিয়ম বিরুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবের (individual soul) বিদেহ হওয়া বা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে মুক্তি লাভ তাহার পক্ষে প্রলয় বা মুক্তি অর্থাৎ তাহার তখন ব্রহ্মে প্রকৃষ্টরূপে লীন (merged) হইয়া স্ব-স্বরূপে স্থিতি হয়। সে তখন সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাই হইয়া যায়। বিশ্বেরও এইরূপ লীন হওয়া তাহার পক্ষে মহাপ্রলয়। তখন ভগবানের সৃষ্টিরূপ লীলার শেষ হয়, কিন্তু সেই আদি সিসৃক্ষা ব্রহ্মে বীজরূপে লীন থাকে, তাহা নির্ম্মূল হইয়া অন্তর্হিত হইলে, পুনর্ব্বার সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত না। এই লীলা, লীলাময় অনন্তকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন এবং ভবিষ্যতে তাহার যে কখন শেষ হইবে তাহা তিনিই জানেন।

প্রপর্ণা

(উপন্যাস)

[শ্রীমতি আমোদিনী ঘোষ]

(৮)

সেদিনও সন্ধ্যার অন্ধকারে বারান্দার কোণে রেলিংএর উপর বসিয়া সোমেন্দ্রের সঙ্গে শশীশেখর তাহার পরিণয়রূপ জটিল সমস্যার সমাধান করিতেছিল শশীশেখর কহিল, "তোমায় কিন্তু কন্যাকর্ত্তা হ'তে হবে।"

সোমেন্দ্রের পকেট হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া কি মাটিতে পড়িয়া গেল। সোমেন্দ্র তাহা কুড়াইতে কুড়াইতে কহিল, "সে বেশ ত'। ঠাকুরমাকে বলা হয়েছে সব ?"

"ঐখানেই ত মুস্কিল ? রোজই ভাবি বল্‌ব, কিন্তু হয়ে উঠ্‌ছে না সে টা ?"

"সরমে না সরে বাণী—এইরূপ অবস্থা !"

"যা বলেছে।"

"আমায় যখন কন্যাকর্ত্তা করছ, তখন আমার আর ঘটকালী করবার পথ নাই। ঠাকুরমা মনে কর্ব্বেন এই হতচ্ছাড়া ছোঁড়া সুবিধা পেয়ে আমার সোণার চাঁদ নাতিটীকে এই বাপ মা মরা পথে কুড়ান মেয়েটা গছিয়ে দিতে এসেছ। নাতি আমার শ্বশুর বাড়ী যাবে, শালা আস্‌বে, শ্বশুর আস্‌বে, গাড়ী ঘোড়া লোক লস্কর আস্‌বে, সওগাদে সওগাদে বাড়ী ভরে যাবে, পাড়া পড়শী সব চেয়ে থাক্‌বে—তা না কোত্থেকে একটা তিন কুলে আপন বল্‌তে কেউ নেই ঘর বাড়ী ঠিকানা নেই, গোত্তিগোত্তের খবর নেই, এমন একটা লক্ষীছাড়া হতভাগা মেয়ে এনে আমার সব সাধে জলাঞ্জলি দিতে এল।"

"তা ঘটকালীটা তুমি কর্‌তে পার না বটে।"

"একটা কাজ কর না, কাল সকালে একখানা বিদ্যাপতি কিনে আন।"

"তাতে কি হবে ?"

"তাতে বস্তু হবে। বিরহের লক্ষণগুলো তার থেকে মিলিয়ে নিও—বদন্যতাবশে বিনামূল্যে তোমায় তার কিঞ্চিৎ জ্ঞান বিতরণ করছি। যথা—আহারে অরুচি (ভয় নেই তাতে তোমার কিছু

আমি সেখানে তোমার আহারের বন্দোবস্ত রাখ্‌ব), সর্ব্বদা উন্মনস্ক ভাব, নির্জ্জনে বাস, বিষণ্ণমুখ, নিশীথে পাদচারণা, প্রমোদে বিরতি ইত্যাদি—বাস্, কিস্তিমাৎ। তোমায় তখন আর কিছু কইতেও হ'বে না, করতেও হবে না,—সে যদি ভিখারীর মেয়েও হয়, কোনও পক্ষ কোনও উচ্চবাচ্য করবে না, ঠাকুরমা আপনি যেচে তোমায় এ কন্যা দান করাবেন।"

শশীশেখর হাসিয়া বলিল,—"তা এটা একটা ঠাউরেছ বটে !"

"প্লানটা কাজে লাগিয়ে দেখ না, শেষে ধন্যবাদ দিতে কথা খুঁজে পাবে না। মেয়েদের কাছে জিতিবার ইহা অতি চমৎকার পলিসি।"

দীর্ঘ মন্ত্রণার পরে শশীশেখর বাড়ী ফিরিয়া গেল। সোমেন্দ্র অনেকক্ষণ রেলিংএর উপর বসিয়া রহিল ; ক্ষীণায় চন্দ্র তখন কৃষ্ণচূড়ার মাথার উপর হইতে উঁকি মারিয়া নামিয়া গেল, সপ্তর্ষিমণ্ডল ঘুরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চাহিয়া চাহিয়া সোমেন্দ্রের শুধু মনে হইতেছিল, এই অস্তমিত চন্দ্র নিরুচ্ছ্বাস তিমিরময়ী শর্ব্বরীর ভিতর তাহার সমস্ত চেতনা যেন মিশিয়া যাইতেছে ; এই শব্দহীন, চাঞ্চল্যহীন, প্রকম্পলেশ স্তব্ধতা মহাসাগরের জলস্রোতের মত সুদূর নভঃপ্রান্ত হইতে নিঃশব্দ ধারায় যেন তাহারই অন্তরে প্রবেশ করিতেছে ! তাহার হৃদয়ের তলে শত ছলনার লুক্কায়িত একটা গভীর গূঢ় ব্যথা, জলস্থল আকাশ ভরিয়া রাত্রির এই অন্ধকারের মত কান্না ধারণ করিয়া চরাচর ঢাকিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে।

সোমেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়িয়া রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া নত হইল ; এই অন্ধকার, এই নীরবতা, এই সুষুপ্তির ভিতর সে যেন এক অদৃশ্য শত্রুর সহিত অমিত বলে যুঝিতেছিল, তাহার ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল, নিঃশ্বাস গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল, যুগপৎ একটা অক্ষম অধীনতা ও জগদ্ধংসী বিদ্রোহের তাড়নার বেগে তাহার বিমূঢ় অন্তরাত্মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতে লাগিল।

(৯)

বেলা ৮টা বাজিয়াছে, তখনও সোমেন্দ্র উঠে নাই।

এমনটি কখনও হয় না। সোমেন্দ্র অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিত, শশীশেখর কচিৎ ৮টার আগে উঠিত ; এবং সোমেন্দ্রই তাহার নিদ্রাভঙ্গ ব্যাপারের পুরা চার্জ্জ লইয়াছিল। শীতকালে শীতল জলসংযোগে, অথবা মুখমণ্ডলে মস্তাধার শূন্য করিয়া, অকস্মাৎ হস্তপদাদি ধারণ করিয়া কূর্ম্মাকারে শয্যা হইতে ভূমিতে পাতিত করিয়া, মস্তকে নানারূপ কৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ও এই রকমের বহু উপায়ে তাহাকে জাগরিত করিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া বাহিরে লইয়া আসিত। ইহার কদাপি অন্যথা হইত না।

শশীশেখর আসিয়া মেসের বদ্ধ কপাটে মুষ্ট্যাঘাত প্রদান করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। তাহার আজ না ডাকিতে উঠিবার বিশেষ কারণ ছিল। গত রাত্রিতে ঠাকুরমা সহসা তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার আহারে অরুচি, প্রমোদে বিরতি ও সর্ব্বদা বিষণ্ণতার হেতু গোপনে বাহির করিয়া লইয়াছেন এবং সবিশেষ শুনিয়া আত্মিনের নিকটতম লগ্নেই বিয়ের দিন ধার্য্য করিয়াছেন।

সোমেন্দ্রকে এই শুভসংবাদ দিবার জন্য শশীশেখর ভোর (৭টার সময়) উঠিয়া আসিয়াছে।

"বলি কি গো এখনও যে বড় নিদ্রাভঙ্গ হয় নি" বলিয়া শশীশেখর নিদ্রিত সোমেন্দ্রের কেশাকর্ষণ করিয়া উঠাইল।

উঠিয়া বসিয়া চোখ কচলাইতে কচলাইতে সোমেন্দ্র কহিল, "কাল রাতে ঘুম হয় নি বোয়াদর ?"

"আপনার ব্যাপার কি ? এক আধ ডোজ পুপাসব পেটে পড়েছে বোধ হচ্ছে।"

বিয়ের নেমন্তন্ন কর্ত্তে এসেছি তোমাকে। সামনের এই ৭ই বিয়ে। মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক

উক্ত তারিখে আমাদের আলয়ে শুভাগমনপূর্ব্বক উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইবেন।

"নিশ্চিন্তাৎ তা হ'লে ?"

"নিঃসন্দেহ।"

"চল একবার ঠাকুরমার কাছে যাই তবে।"

সোমেন্দ্র উঠিয়া মুখ ধুইয়া আসিলে পর শশীশেখর কহিল, "কিন্তু কি একটা কথা—"

"কি"

"কথাটা বিশেষরূপে বিবেচ্য।"

"ব্যস্ ভূমিকাই চল্‌তে থাক্ দশ পৃষ্ঠা।"

"আরে না না, শোন না, কথাটা হচ্ছে কি, এক্ষেত্রে মতামত ত কিছু নেওয়া হ'ল না। সেটা দরকার ছিল মনে হচ্ছে।"

"ভূর্জ্জ পত্র অথবা কমল পত্র কি চাই অনুমতি হোক্।"

"তাও কি হয়"

"খুব হয়! না হয় কৃতাঞ্জলি পুটে গিয়ে বল্‌বে, হে সুন্দরী তদীয় দর্শনাবধি এ অভাজন—"

"মুখ দিয়ে যে তা বের হবে না। একটা কাজ কর্‌লে হয়, তুমি একবার—"

"আমি" ?

"তুমি ছাড়া আর হওয়ার সম্ভাবনা নেই"

"অতি চমৎকার! আমি গিয়ে কি বল্‌ব ?"

"তোমাকে আবার শিখিয়ে দিতে হবে না কি ;"

"দেখ শিক্ষানবীশ তোমায় আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি, প্রেমে মধ্যস্থতা নাই।"

"সে উপদেশ পালন কর্ব্বার পশ্চাৎ প্রচুর সুযোগ হবে, এখনকার মত তুমি একটু মধ্যস্থতা কর।"

"হুকুমের নৌকা ডাঙ্গায় চলে। আমি আত্মীয় তার নই, সখী নই, সঙ্গিনী নই, সে আমায় বল্‌বে কেন।"

শশীশেখর কিছুতেই সোমেন্দ্রের প্রদর্শিত যুক্তির সারবত্তা মানিল না, দুজনে তখন তর্ক করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সোমেন্দ্র ঘরে ঢুকিতেই ঝি আসিয়া বলিল যে, "রাধারাণী তাহাকে একবার ডাকিয়াছে। সে ২।৩ বার আসিয়া তাহাকে খুঁজিয়া গিয়াছে, পায় নাই।"

শুষ্ক পত্রপুঞ্জ-স্পৃষ্ট অগ্নি যেমন সহসা শিখা মেলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া পর মুহূর্ত্তে নিবিয়া যায়, তেমনি তাহার ললাটেও গণ্ডে একটা রক্তিম আভা প্রকটিত হইয়া মিলাইয়া গেল। সোমেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম, বল গিয়ে আস্‌ছি।" বিধ্বস্ত ঘরের ভিতর সোমেন্দ্র অনেকক্ষণ চেয়ারের মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর তেতালায় গেল। ঘরের কোণে একটা মৃৎ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, রাধারাণী তাহার সম্মুখে বসিয়া বায়ু বিতাড়িত নৃত্যপর শিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। নেত্রদ্বয় ঈষৎ আরক্ত ও স্ফীত, নিশীথের ললাট-গ্রন্থ মেঘ-স্তূপের মত মুখে বিষণ্ণতার প্রগাঢ় অন্ধকার।

সোমেন্দ্র জানালার গায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি ছিলাম না। আপনি আমাকে খুঁজেছিলেন ?" রাধারাণী একবার সোমেন্দ্রের দিকে চাহিয়া চক্ষু নত করিয়া বলিল "হাঁ।" সে কাতর, করুণ দৃষ্টিপাতে সোমেন্দ্রের অন্তর মথিত হইয়া উঠিতে লাগিল, সোমেন্দ্র বলিল, "অর হয়েছে বুঝি আপনার ?"

"না ভাল আছি। কিন্তু ভাল না হ'লেই ভাল ছিল।"

"এ কথা বল্‌ছেন কেন ?"

"কেন বল্‌ছি! আমার এ জীবনে কি প্রয়োজন ছিল! মনে কর্ব্বেন না তামি অকৃতজ্ঞ, আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা মুখে বলে প্রকাশ করবার নয়—তবু আমি না বলে পার্‌ছি না আমাকে আপনারা বাঁচালেন কেন? আমি পুরুষ নই। আমার নিজের ভার নিজে বহিবার ক্ষমতা নেই, যোগ্যতা নেই—মা বাপ আত্মীয় স্বজন তিনকুল শূন্য আমার—

জগতে মাথা রাখ্‌বার আমার ঠাঁই নাই! লজ্জার চেয়ে মরণ শ্রেয়ঃ, সেই মরণ হতে অধিক লজ্জা আমার চারিদিকে,—"

রুদ্ধ ক্রন্দনে রাধারাণীর স্ফীতকণ্ঠ থামিয়া গেল; একটু থামিয়া সে কহিল, "কোথায় আমার স্থান আছে—কোথায় আমি আজ দাঁড়াব। কেন আপনারা আমাকে এরূপ জীবন দান কর্ল্লেন।"

রাধারাণীর অশ্রুপ্লুত আর্ত্ত কণ্ঠ নিঃস্তব্ধ ঘরের ভিতর ধ্বনিত হইয়া দেওয়ালের গায়ে মিশিয়া গেল।

ঝঞ্ঝাবেগোন্মুক্ত অর্গলের মত সোমেন্দ্রের গোপন অন্তরের সযত্ন-রুদ্ধ একখানি কপাট সে ক্রন্দনের স্বরে সহসা বিচ্যুত হইয়া গেল, এবং একটা অবরুদ্ধ অকথিত বাণী তাহার মৌন ওষ্ঠপুটের পশ্চাতে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। আকিঞ্চনের দুর্লভ ধনকে হৃদয়ে ধারণ কামনায় তাহার বাহুযুগ স্পন্দিত ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, সোমেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার দৃষ্টি অশ্রুভারে ঝাপ্‌সা হইয়া পড়িল।

একটু পরে গম্ভীর পরিষ্কার স্বরে, সংযত চিত্তে সোমেন্দ্র কহিল, আপনার এটা বুঝবার ভুল হচ্ছে। আপনার কাছে আমাদের একটা নিবেদন ছিল, সেইটে বল্‌বার জন্য আমি আজ আপনার কাছে এসেছি। ভরষা করি আপনি মনে কর্ব্বেন না যে, সুবিধা পেয়ে আমরা আপনার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ কর্‌ছি। আপনার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা রুচি—সে আপনারই। এ ছমাস আগেও যেমনি ছিল এখন ও তেমনি আছে জান্‌বেন। এ সংসারে দুর্ভাগ্যই যে কেবল ভাগ্যবন্তের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তা নয়, অনেক সময় ভাগ্যবন্ত ও দুর্ভাগ্যের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। শশী আপনার পাণিপ্রার্থী, আপনার যদি এ প্রস্তাবে কিছু অমত না থাকে, তবে শীঘ্রই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হবে।"

সোমেন্দ্র আর সেস্থানে দাঁড়াইল না, অবশ দেহ-ভার বহন করিয়া নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(১০)

পরদিন সকালেই সোমেন্দ্র গিয়া শশীশেখরকে কহিল, "নাও হে তোমার প্রিয়ায় চার্জ্জ বুঝে নাও, আসি বাড়ী চল্লুম।"

"অনুনয়ের স্বরে শশীশেখর কহিল, "বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কোর না।"

"আমার যেতেই হবে যে! বাবার চিঠি এসেছে।"

"তাত কোন দিনই আসে না কি না।"

"মা ঠাকুর দুয়ারে মাথা কুটছেন।"

"মাকে বুঝিয়ে একখানা চিঠি লিখে দাও—এই একটি সপ্তাহ তার পরে যেও।"

"সুভাষিণীর অসুখ।"

"অসুখ ত কবে থেকেই।"

"এখন আমার না গেলেই হবে না।"

"কিছুতেই এখন যেতে পাচ্ছ না।"

"আমি—ওঁর কাছে বিকিয়ে গেছি কি না, উনি যেতে দিলে যেতে পার্‌ব, নইলে পার্‌ব না।"

"আমার কাছে বিকিয়ে গেছ তুমি একবারে। দর দিয়ে কেনা মানুষের সঙ্গে হাজার রকমের লেন-দেনের হিসাব রাখ্‌তে হয়, কিন্তু এই যে বিনি পয়সায় বিকান লোক—এঁদের সঙ্গে সম্বন্ধটা হচ্ছে—এই যাকে তুমি বল কি না অনাত্মন্ত—"

হাসিয়া সোমেন্দ্র বলিল, "বলি ব্যাপারটা কি হে, ভাবের মুখে যে আজ স্রোত ছুটেছে ?"

হাসিয়া শশীশেখর কহিল, "ছুটেছে নাকি ?"

"নিতান্তই। ঐরাৎ ভাসিয়ে নেবার মত প্রবল বেগ ?"

"তাই না কি ? তুমি মাতঙ্গ তবে পালাচ্ছ কেমন করে ?"

"না হে, তুমি বুঝ্‌তে পারছ না। গত ছুটিতে

বাড়ী যাই নাই, এবারও যদি না যাই, তবে বাবা চটে যাবেন! তা ছাড়া সুভাষিণীর অসুখ—"

"গণেন্দ্রই ত বাড়ীতে আছে?" সুভাষিণীর অসুখ ত কতদিন থেকে! তোমার সেখানে এখন বিশেষ ঠেকাটা কি! কিন্তু ভেবে দেখ দেখি এদিক্‌কার অবস্থাটা!"

"আমার জন্য কি ঠেক্‌বে!"

"আর কার কিছু না ঠেক্‌লেও তোমার আত্মীয়াটির ত বিশেষ ঠেক্‌বে! "দাদা" ছাড়া তিন ত আর কার সঙ্গে কথা কইবেন না! অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত লোকের মাঝখানে একমাত্র চেনা মানুষ তোমাকেও যদি সে দেখ্‌তে না পায় তবে—"

একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহ সোমেন্দ্রের অন্তরের ভিতর স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া তাহার বলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল, এ যুপ কাষ্ঠের ভিতর যাচিয়া সে আর মাথা দিবে না? সে পলাইবে এখান হইতে ধরণীর দূরতম এক প্রান্তে, যেখানে সে কণ্ঠস্বর তাহার কাছে আর পঁহুছিবে না; নব বর্ষার ঘন ঘটার সমস্ত কৃষ্ণরাগ লুণ্ঠন করিয়া নিবিড় পক্ষচ্ছায় দুটি কাল চোখের সজল চাহনি, যেখানে তাহার চিত্ত-মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিবে না! যে সুধা-সাগরের জল তাহার স্পর্শমাত্রে হলাহল হইয়া যাইবে, তাহার জল-কণার দিকে চাঁহিয়া নিমেষ গণিয়া অতল জীবন-রাত্রি পোহাইবার আশায় সে আর মরিবে না!

শশীশেখর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমাকে ভারী দুর্মনা দেখ্‌ছি? সুভাষিণীর অসুখ কি খুব বেশী না কি?"

সোমেন্দ্র, "হাঁ" বলিতে গিয়াও "না" বলিয়া ফেলিল।

শশীশেখর কাহল, "তবে থেকে যাও।"

"নিতান্তই আমায় নইলে চল্‌বে না?"

রাগ করিয়া শশীশেখর কহিল, "না, তোমার থাক্‌তে হবে না। যে বাড়ীতে সোমেন্দ্রবাবু নেই সে বাড়ীতে ত আর কার কোনও কাজ হয় না!"

হাসিয়া তখন সোমেন্দ্র কহিল, "না, না, যাব না।"

"উহুঁ, তোমার থাক্‌তে হবে না, তুমি এখনি যাও, চল আমি আগিয়ে দিয়ে আস্‌ছি।"

শশীশেখর সোমেন্দ্রকে ধাক্কা দিতে, ধাক্কা দিতে বারান্দায় আনিয়া ফেলিল।

সোমেন্দ্র চেঁচাইয়া কহিল, "ঠাকুর-মা দেখে যান এদিকে।"

ঠাকুর-মা আসিয়া যুধ্যমান দুইজনকে দেখিয়া কহিলেন, "এ কি হচ্ছে?"

সোমেন্দ্র বলিল, "দেখুন না শশী আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে।"

সোমেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া শশীশেখর দাঁড়াইয়া কহিল, "না ঠাকুর মা সোম আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল!"

ঠাকুরমা তাহাদিগকে বৃক্ষ-শাখা-বিহারী জীব বিশেষের নামে অভিহিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

সোমেন্দ্র বলিল, "দেখ, তোমার একটুও রসবোধ নেই, আমি হচ্ছি তোমার মেঘদূত, তোমার প্রিয়ার বারতা বহন করে এনেছি, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে আমাকে বরণ করে ঘরে নেবে না—"

"আহা বল্‌তে হয় সে কথাটা আগে! পরিপাটী করে অভ্যর্থনা কর্ত্তুম তা হ'লে। আরে এস এস, ঘরের ভিতর এস, কি খবর শুনি।"

সোমেন্দ্র গত রাত্রির বিবরণ সংক্ষেপে কহিল।

শশীশেখর আহ্লাদে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া তাহাকে অনেক বাহবা দিল।

সোমেন্দ্র বলিল, "নাও, তোমার ত কেল্লা ফতে, এখন আমাদের বক্‌সিসটা দিয়ে ফেল।"

"কেল্লা ত ফতে বটে। কিন্তু এতে যদি কোনও 'কিন্তু' থাকে?"

"কি কিন্তু?"

"ধর না, যদি মনে মনে সে তোমাকে—"

"তুমি একটি আস্ত গাধা! বালিকা সে, তার নারীত্ব তার ভিতর এখনও চোখ মেলে নি। তার হাতখানি যার হাতে তুলে দিবে, সেইখানেই সে আত্মসমর্পণ করবে। আজ্‌কে তোমার কথায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। শুভ লক্ষণ এটা, তোমার আশা-দিবার উষালোক!"

(১১)

সকাল বেলা রাধারাণী উঠিতেই সোমেন্দ্র গিয়া কহিল, "আজ আপনাকে এক জায়গায় যেতে হবে।"

রাধারাণী কহিল, "আপনি আমাকে নাম ধ'রে ডাকেন না কেন! আবার 'আপনি' বলেন! এবার থেকে আমাকে 'তুমি' বল্‌বেন ও 'রাধা' বলে ডাক্‌বেন।"

সোমেন্দ্র হাসিল, কিন্তু সে বেদনামাখা হাসি। পুষ্পাসবপানমত্ত মধুপের কল শব্দের মত তাহার হৃদয়ের ভিতর একটা প্রমত্ত গুঞ্জন ধ্বনিত হইতে লাগিল, তাহার নিঃশ্বাস প্রগাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল, অন্যদিকে চাহিয়া সে কহিল, "এ কি বিপ্লব আজ!"

"তবু আপনি আমার দাদার মত হয়ে আমাকে 'আপনি' বল্‌বেন, এ কি রকম।"

হাসিয়া সোমেন্দ্র বলিল, "দেখ্‌বেন, শেষে আবার মনে-মনে ভাবেন না যে এ লোকটা কি আনাড়ি সভ্যতা-জ্ঞান বর্জ্জিত, মেয়েদের মান রাখ্‌তে জানে না—'তুমি' বলে!"

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, "বাঃ!"

টেবিলের উপর হইতে টাইমপিস্‌টা উঠাইয়া দেখিয়া সোমেন্দ্র বলিল, "৯টা বেজেছে, ৮টার সময় গাড়ী আস্‌বে, আপনি তৈরি হন এর মধ্যে।"

"আবার আপনি!"

"আপনিটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে!"

"বড় ভাই'র কাছে লোকে স্নেহ পায়, সম্মান নয়।"

রাধারাণীর কথা সোমেন্দ্রের কাণে একটা দারুণ ব্যঙ্গের মত ধ্বনিত হইল। সোমেন্দ্র বলিল, "একেবারে যাওয়ার মত সব গুছাতে হবে, আর এখানে আস্‌বার দরকার হবে না।"

"কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?"

"যে বাড়ীতে তুমি কর্ত্রী হবে সেই বাড়ীতে।"

রাধারাণী মুখ নত করিল।

সোমেন্দ্র পুনশ্চ তাহাকে জিনিষপত্র সব গুছাইতে অনুরোধ করিয়া এবং শীঘ্রই সে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া চলিয়া গেল।

সোমেন্দ্র কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া যখন তেতালায় গেল, তখন দেখিল, রাধারাণী চুপ করিয়া জানালার ধারে বসিয়া আছে। প্রভাতে অরুণোদয়ের মত নিগূঢ় আনন্দের আভা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহার কয়েক দিন আগে রাধারাণী যে দিন সোমেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়াছিল, তাহার সেদিনকার অশ্রুসিক্ত মুখখানি তাহার মনে পড়িল। সোমেন্দ্রের হৃদয় বেদনা তাহার সম্মুখের এই আনন্দোৎফুল্ল চক্ষের জ্যোতিতে নিমজ্জিত হইয়া গেল। রাধারাণীর মুখের উপর চোখ রাখিয়া সোমেন্দ্র বলিল, "এর নাম বুঝি গুছান!"

রাধারাণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "কি গুছাব আমি জানি না।"

এই যে সব জিনিস পত্র ছড়ান রয়েছে, এগুলা বাক্সে ভরে ফেল্‌তে হ'বে।"

রাধারাণী তবু মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সোমেন্দ্র বুঝিল রাধারাণী কুণ্ঠিত হইতেছে, বলিল, "এ সব জিনিস ত তোমার, তোমার সঙ্গে এ সব যাবে।"

"আমি গোছাতে পার্ব্ব না" বলিয়া রাধারাণী সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল।

"এই সব সাড়ী জ্যাকেট সেমিজ ইত্যাদি; গুম্ফ

শ্মশ্রু-বিশিষ্ট প্রাণীদের যে ব্যবহার্য্য নয়, তা বোধ করি বুঝতে পার।"

রাধারাণী অন্য দিকে চাহিয়া রহিল কিছু বলিল না। সোমেন্দ্র বলিল, "তবে শশী এসে গুছিয়ে নেবে।"

রাধারাণীর মুখ দিয়া ছোট্ট একটি "না" বাহির হইয়া গেল। লজ্জায় গালটা টক্‌টকে লাল হইল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সোমেন্দ্র তখন সমস্ত জিনিষ পত্র একত্র করিয়া গোছাইয়া ট্রাঙ্কে ভরিয়া দিল।

আগের দিন বিকাল বেলা সোমেন্দ্র অনবধানতা বশতঃ চাবি ফেলিয়া গিয়াছিল, রাধারাণী তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিল। বালিসের তল হইতে চাবি আনিয়া সে বলিল, "আপনি কাল চাবি ফেলে গিয়েছিলেন ?"

"ওঃ! দেখিনি তা" বলিয়া সোমেন্দ্র হস্ত প্রসারণ করিল, রাধা তাহার হাতে চাবি দিল? মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চম্পক কোরকবৎ অঙ্গুলি সোমেন্দ্রের করতল স্পর্শ করিল। অকস্মাৎ সোমেন্দ্রের বুকের ভিতর রক্তধারা উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় প্লাবিত করিয়া অপূর্ব্ব পুলক-স্রোত বন্যার মত উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য সোমেন্দ্রের মনে হইল, ঐ হৃদয় মনোন্মাদক রূপ কোরক গুলি তাহার হাতের স্নিগ্ধ চাপিয়া ধরে,—

সোমেন্দ্রের বিকল-দৃষ্টি রাধার দৃষ্টির সঙ্গে সম্মিলিত হইল। বিস্মিত হইয়া রাধা বলিল, "ব্যথা পেলেন না কি? কি করে লাগল?'

"না, না কিছু নয়, আমি যাই" বলিয়া সোমেন্দ্র স্খলিত পদে দ্রুত নীচে নামিয়া গেল।

যমুনা

(গান)

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কবিগুণাকর, বি এ]

যমুনা,
তোমার তীরে আর না ফিরে
ব্রজের যত গোপ-নারী—
আর না রাধা—নামে সাধা
বাজায় বাঁশী বংশীধারী!
কুঞ্জে কোকিল গায়না তেমন—
ব্রজ বধূ বাজিয়ে কাঁকন,
আর না চলে "ভরা" কাঁখে—
ছল-ছলিয়ে ওঠে বারি!
আর ত রাধা যায় না ছুটে—
—রক্ত কমল নাহি ফুটে—
আর নাহি সে রসিক নাগর,
ডাকে—প্রিয়ে প্রাণ পিয়ারি!
আর নাহি সে ঝুলন খেলা—
রাসের হাটে রূপের মেলা—
আর নাহি সে মধুসবে
ছোটে হাজার পিচ্‌কারি!
শুক সারী ঐ বক্‌চে প্রলাপ—
আর করে না প্রলয় আলাপ—
স্মৃতি শুধু কেঁদে বলে—
একি নিঠুর—চতুরালি!

সদাশিবের দপ্তর।

নাস্তিকতা না আস্তিকতা ?

(শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম বি, এ, সি, লণ্ডন)

ভাই ধুতুরা ফুল তোমায় কোন্ বিধাতা গড়িয়াছে? তুমি বড় সুন্দর—অতি পবিত্র। বিদেশীয় কবিরা তোমার সহিত কুমারীগণের নির্ম্মলতার তুলনা দেন। আমাদের দেশের বিপত্তির মধুসূদন তোমাকে "যোগিনী" বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তোমার উৎপত্তি অতি সামান্য পদার্থ হইতে। চৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকা বিকৃত হইয়া তোমার জন্ম। মৃত্তিকা বিকৃত হইয়া তুমি জন্মিয়াছ কি না তাহা আমি বলিতে চাহি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তুমি পরমাণু-সমষ্টি, জগতের কতকগুলি ভৌতিক পদার্থের সংযোজন তোমার কারণ। তোমার বিশ্লেষণে জানা যাইবে যে, তোমার শরীরে অঙ্গার, অম্লজান, উদজান এবং যবক্ষারজান প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যমান। কোন পদার্থ কত পরিমাণে আছে তাহাও মনুষ্যবুদ্ধি স্থির করিতে সমর্থ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই সেই পরিমাণে ঐ সকল পদার্থ লইয়া মনুষ্য তোমার মত একটী ফুল প্রস্তুত করিতে অসমর্থ। এস ত ভাই জড়বাদী, আমাকে একটি ধুতুরা ফুল প্রস্তুত করিয়া দাও দেখি? তুমি যে যে ভৌতিক পদার্থ যত পরিমাণে চাহিবে তাহা আমি দিব, তথাপি তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। তবে কেন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না। অবশ্য একজন চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানময় ঈশ্বর আছেন, যিনি ভিন্ন আর কেহ ইহার সৃজন করিতে পারেন না। ধুতুরাও তাঁহার সৃষ্টি, আর নদ নদী হ্রদ সাগর মরু গ্রহ উপগ্রহ—এক কথায় বলিতে গেলে—সমগ্র জড় জগৎ, চৈতন্য জগৎ তাঁহারই সৃষ্ট। অবশ্য পরমাণু সৃষ্টির উপলক্ষ। কুম্ভের নির্ম্মাতা কুম্ভকার; কিন্তু যে মৃত্তিকার সাহায্যে ঐ দ্রব্য নির্ম্মিত—সেই উপাদানের স্রষ্টা সে নয়। সেইরূপ পরমাণু উপলক্ষ হইতে পারে, কিন্তু সেই পরমাণুর অবশ্য একজন স্রষ্টা আছেন। তুমি বলিবে যে পরমাণুই কুম্ভের স্রষ্টা, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরমাণু দিতেছি একটী কুম্ভ বা কুসুম প্রস্তুত করিয়া দাও। তুমি তাহা যখন পার না, তখন চৈতন্যময় ঈশ্বর মানিবে বা কেন? হিন্দুরা বলেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে এই চরাচর জগদ্ভণ্ডলের উৎপত্তি। জড়বাদী তাহা মানেন না, সে বলে যে একমাত্র প্রকৃতি হইতেই সকলের উৎপত্তি। কিন্তু প্রকৃতি কোথা হইতে আসিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, যে তাহার আদি নাই অন্ত নাই। সুতরাং বলিতে হয় যাহার আদি ও নাই, অন্তও নাই তাহা স্বতঃ ব্যাপ্ত, তাহার স্রষ্টাও নাই। জগৎ নিয়মের বাধ্য; প্রকৃতির কতকগুলি নিয়ম আছে এবং সেই নিয়ম সর্ব্বত্র কার্য্যকর। প্রকৃতি নিয়ম ফুরিয়াছে যে, বৃক্ষ হইতে পুষ্প হইবে। তাহা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। সুতরাং পুষ্প নির্ম্মাণ মানুষের সাধ্যাতীত। তাহারা কি বলিয়া তর্ক করে তাহা জানি না। অবশ্য বিশ্বের কারণ একটি নহে, আর জড়বাদী স্বীকৃত পরমাণু যে সৃষ্টির উপাদান তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়,—কিন্তু ইহার নিমিত্ত কারণ কি নাই? অবশ্য আছে। আমরা এই নিমিত্ত কারণকে চৈতন্যময় বলি। আমাদের দেশের দার্শনিকেরা জগতের দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মতে প্রকৃতি উপাদান কারণ, পুরুষ নিমিত্ত কারণ! আবার কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, নিত্য পরমাণুর সমবায়ে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে চৈতন্যময় ভগবানই জগতে একমাত্র নিমিত্ত

কারণ। আবার কেহ কেহ তাহাকেই জগতের উভয়বিধ কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। জড়বাদী যে নিয়মের দোহাই দেন, উহাই জগতের নিমিত্ত কারণ। ইহা যদি না স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, নিয়মের একজন নিয়ন্তা আছেন। সেই নিয়ন্তা কে? আমরা বলি না যে সকল কার্য্য তিনি বিনা নিয়মে যথেচ্ছভাবে সম্পাদন করিতেছেন। বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, তারা, জীব জন্তু যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম, নিয়মের অধীনে চলিতেছে। কোনও কোনও পাশ্চাত্য দার্শনিক জগদীশ্বরকে রাত দিনই খাটাইতে চান। জগতে perpetual creation অনবরত সৃষ্টি চলিতেছে। এই সকল মহাবেক্কিরা তাঁহাকে একটু তন্দ্রাও যাইতে দিতে চান না—নিদ্রা ত দূরের কথা। নিয়ম মানিলে অলৌকিক অদ্ভুত ক্রিয়া (miracle) স্বীকার করা চলে না। খৃষ্টধর্ম্মে তাহা করে, কিন্তু খ্যাতনামা খৃষ্টান পাদ্রীর সাহেব বলেন যে, নিয়ম ভিন্ন অলৌকিক দৈব ঘটনা কিছুই নাই এবং তাহাতে তিনি বিশ্বাসও করেন না ("I do not believe that there ever was a miracle, or that there ever can be one, for wherever I look, I only see law"). ডারউইন্ সাহেব না কি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জগদীশ্বর থাকিবার প্রয়োজন নাই। সৃষ্টি আপনা আপনি হইয়াছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রমাণ নাই। যাহার প্রমাণ নাই তাহা বিশ্বাস করিবারও প্রয়োজন নাই। প্রমাণাভাব বলিয়া তিনি কি থাকিতে পারেন না? হয়ত তিনি আছেন এবং মনুষ্যকে এমন জ্ঞান দেন নাই যাহার দ্বারা মনুষ্য তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে। তুমি বলিবে যে তিনি মনুষ্যকে এরূপ জ্ঞান না দিয়া অপরাধী হইয়াছেন। যদি তাহা হইয়া থাকেন, তাঁহাকে 'পিনাল কোডে' সোপরদ্দ করিতে পার।

সৃষ্টির আদি নাই, কারণ ইহাতে যে কত কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? এক জাতীয় ইন্দ্রিদ হইতে অন্য জাতীয় উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। এক শ্রেণীর (Natural order) বৃক্ষ হইতে অন্য শ্রেণীর বৃক্ষ উৎপন্ন না হউক, কিন্তু সেই শ্রেণীরই কোনও প্রকার বিকৃত বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। এক বৃক্ষের একটি ডাল হইতে দুইটি আঁটি বাহির হইল, তাহা হইতে দুইটি বৃক্ষ জন্মিল, একটির রীতিমত ফল হইতে লাগিল, কিন্তু অন্যটিতে জটা বাঁধিল। ডারউইনের মতে বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এ সকল কথা সত্য হইলে দেখা যায় যে, নিয়ম সর্ব্বত্র কার্য্য করিতে পারে নাই। নিয়মের অতিরিক্ত অনেক কার্য্য হইতেছে। সুতরাং সংসার আপনি হইয়াছে, প্রথমে কেবল পরমাণু ছিল; ক্রমে সকলের ক্রমবিকাশ হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিয়া ডারউইন সাহেবকে গুরু বলিয়া মানিতে অনেকের প্রবৃত্তি। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব বলিয়া জগতে অনেকে নাস্তিক। আবার এমন নাস্তিক আছে যাহারা বলেন যে, ঈশ্বর কেন মানিব। অনেক সময়েই ত তিনি ঈপ্সিত বস্তু আমাদের দেন না। কিন্তু যখন নদীতে নৌকাখানি ঝড়ে ও তুফানে বানচাল হইবার উপক্রম হয়, তখন দুর্ব্বল মানুষ আপনার বা অপর মানুষের শক্তিতে আস্থা না রাখিয়া, শ্লেচ্ছও শক্তিধর পুরুষকে ডাকিয়া থাকে—তা তিনি দুর্গাই হউন, কালীই হউন—আর ব্যোম ভোলানাথই হউন। তখন মানুষ কত হরির লুট মানে, কত সিন্নি দিতে চায়; কিন্তু ফাঁড়া কাটিয়া গেলে মানুষ সে অঙ্গীকার সর্ব্বত্র রক্ষা করে কি না তাহার সঠিক খবর বলিতে পারি না। দুর্ব্বলতা ভাবিয়া কেহ কেহ যে ঐরূপ অঙ্গীকার রক্ষা হইতে বিরত হন তাহা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। এরূপ চুক্তি আইন সঙ্গত নয়—without consideration বলিয়াও অনেকে রক্ষা করেন না।

মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কি না তাহা বলা বড় কঠিন। তবে মনে এবং বিশ্বাসে নাস্তিক এমন লোক বড়ই কম। অনেক নাস্তিক বিপদে পড়িয়া ঈশ্বরের শক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আস্তিক হন, আবার ঈশ্বর বিশ্বাসীকে বিপদে পড়িয়া মোহের বশে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেও দেখা যায়। অবিশ্বাস না করিলেও অনেক স্থলে তাঁহার প্রতি কতকগুলি দোষারোপ করিতে মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। এ সকল লোক অত্যন্ত দুর্ব্বলমনা। কিন্তু তাহাদের স্বপক্ষে একটা কথা বলিতে পারা যায় যে, লৌকিক ব্যবহারে আমরা দেখিতে পাই যে, যাহার সহিত অধিক আত্মীয়তা থাকে তাহার উপর অধিক দাবী আমরা করিয়া থাকি। আমাদের আবদারটাও তাহার উপর অধিক পরিমাণে থাকে। ভগবানে যাহাদের বিশ্বাস অধিক—প্রেম ও ভক্তি বেশী—তাহারা তাঁহার উপর একটু আব্দার করিলে যে মারাত্মক ব্যাপার হইয়া পড়ে তাহা নয়—অশোভন যে একেবারেই হয় তাহাও বলিতে পারি না। ভালবাসার অত্যাচার সহ্য করে নাকে?

ঈশ্বর যাহা করেন তাহা জীবের মঙ্গলের জন্য ভিন্ন অমঙ্গলের জন্য নয়; সুতরাং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য যদি সাময়িক কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলাম তবে আমি দুর্ব্বল নহি ত কি? যাহারা অন্য সময়ে ঈশ্বর নাই বলিয়া থাকে, কিন্তু বিপদের সময় বিশ্বাস ও ভক্তি করে তাহাদিগের ও পূর্ব্ব ইতিহাস অন্বেষণ করিলে, বোধ হয় পাওয়া যায় যে, তাহারা অধিকাংশ স্থলে প্রথমে বিপদে পড়িয়াই অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আবার দেখা যায় যে, কাহারও কাহারও বিপদের অন্ত নাই, একের পর অন্য একটি, পর্য্যায় ক্রমে উপস্থিত হইতেছে, কাহারও সমস্ত জীবন কষ্টে ও বিপদে অতিবাহিত হইতেছে। ইহাতে তাহাদের জন্য ঈশ্বর ভবিষ্যতের কি স্বর্ণসিংহাসন গড়িয়া রাখিতেছেন তাহা জানি না। কিন্তু মনুষ্য এমনি দুর্ব্বল যে তাঁহাকে গালিগালাজ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু কি জন্য যে কি হয়, তাহা কি আমাদের জানিবার কোনও উপায় আছে, না জানিবার সাধ্য আছে। সুতরাং স্বীকার কর কবি পোপ সত্যই বলিয়াছেন যে—

"—Presume not God to scan,
The proper study of mankind is man."

এখন দেখা যাউক ঈশ্বর এ জগৎ সংসার কেন করিলেন। তিনি মুক্ত পুরুষ নন—বদ্ধপুরুষ বলিলে, চারিদিক হইতে হয়ত দার্শনিকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের' ব্যবস্থা করিবেন, কারণ শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধিঃ' তাই দায়ে পড়িয়া এই মূর্খ তাঁহাকে মুক্ত পুরুষ বলিতেছে; কিন্তু একটা 'কিন্তু' থাকিয়া যাইতেছে—সত্য কথাটা, আমার ধারণাটা মন খুলিয়া বলি যা থাকে বরাতে। তিনি যে ইচ্ছার অধীন, ইচ্ছার বশীভূত। ইচ্ছা করিয়াই না নিখিল ভুবন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কবি গাহিয়াছেন, "ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, ঘোর দিগন্ত বিকাশি।" তিনি প্রবৃত্তির অধীন, সুতরাং কেমন করিয়া বলিব তিনি মুক্ত! সকল পণ্ডিতেই বলেন যে, তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিয়াই এ জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদেশীয় পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে ইচ্ছার অধীন বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু সত্য যে কি তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না—তিনি বদ্ধ হউন আর মুক্ত হউন "তিনি পুরুষ। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি জ্ঞানাতীত পুরুষ; কেন সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। এ কথার প্রতিবাদ করা অতি সহজ। অবশ্যই তাঁহার কোন অভিপ্রায় আছে। প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, ইহা সকল দেশের ন্যায় শাস্ত্রেই এক-বাক্য স্বীকার করে যেরূপ অগ্নি না দেখিয়াও কেবল মাত্র ধূম দেখিয়াই অগ্নির সত্তা স্বীকার করি, সেই-রূপ এ জগৎ দেখিয়াই বলা যায় যে ইহার কর্ত্তা আছে। যখন অভিপ্রায় আছে তখন অবশ্য সেই

অভিপ্রায়ের উপযোগী ইচ্ছা করিয়াছেন, নতুবা জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে শূন্য (chaos) ছিল তাহাই চিরকাল থাকিত। তুমি আমি কেহই আসিতাম না, আর আজিকেও কালী-কলমের শ্রাদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ শুনাইতাম না। যাহাই হউক সেই ইচ্ছাই আমার মতে পুরুষ এবং পরমাণুই প্রকৃতি। যাঁহারা পরমাত্মাকে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলেন, তাঁহাদের মত ঠিক। নাস্তিকতা ও আস্তিকতা কি সবই ঈশ্বরের লীলা নয়? *

* জমশেদপুর সাহিত্যসভার অষ্টম অধিবেশনে পঠিত।

ভুল

(শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ)

ভুল-বুঝো না প্রিয়া—
চক্ষে যদি পলক পড়ে' তোমায় নিরখিয়া।
দিনের শেষে বারেক তরে যদিই নাহি হয়—
তৃষ্ণাভরা দিঠির নীরব মধুর পরিচয়;
যদিই শত মোহন রূপের কুঞ্জঝটিকায়—
বন্দী আমার ব্যাকুল নয়ন পথ খুঁজে না পায়,
অশ্রু ঝরি ঝর্‌ঝরা করে দৃষ্টি খানি যদি—
ওই নয়নের আভায় উজল হইবে নিরবধি।

বৃথাই অভিমান—
কেমন ক'রে জানাই বল কেমন যে মোর প্রাণ!
দৃষ্টি মাপে মাপ্‌তে তোমা হৃদয় নাহি চায়—
তোমার পূজা কর্ত্তে মরি নিজের ক্ষুদ্রতায়!
দুঃখ এ নয়—অকারণের অশ্রু ঝরে কেঁপে—
এই বেদনা, আর পারি না পরাণটাকে চেপে!
মরম যাহা মর্ম্মে জানে তাও বোঝাতে হবে?—
মিলন যদি নাই—বিরহ কেমন ধারা তবে?

নারীর মন

(গল্প)

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

এক

বেচারী অরুণ যেদিন বিমর্ষ-অন্তঃকরণে নববধূর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে তাকাইতে প্রিন্সেপঘাটের জাহাজে গিয়া উঠিল, একথা স্বপ্নেও তাহার মনে হয় নাই যে, শনিবারের বারবেলায় যাত্রা করার দরুণ তাহাকে একটা মস্ত বড় আঘাত সহ্য করিতে হইবে। ভাল ছেলে বলিয়া চারিদিকে তাহার একটা সুখ্যাতি ছিল এবং সেই 'ভাল' হওয়ার কারণই যে নির্ম্মমের মত তাহাকে একদিন আত্মীয়-পরিজন বিশেষতঃ নববধূ সুহাসের কাছ হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যাইবে, একথা সে ভিগ্রি ও জলপানী পাইবার সময়ে কোন মতেই ভাবিতে পারে নাই। ফার্ষ্টক্লাশে থার্ড হইয়া এম এ পাশ করিবার পরই হঠাৎ একদিন পিতা বলিয়া বসিলেন, যে বিলাত ঘুরিয়া না আসিলে এত বিদ্যা এত অর্থ কোনটারই সাফল্য লাভ হইবে না, অরুণও কি জানি নেশার ঝোঁকে সে সময়ে বলিয়া ফেলিয়াছিল যে তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র আপত্তি ত নাই-ই বরং আগ্রহ-ই যথেষ্ট আছে। এ 'আগ্রহ' তাহার 'আপত্তি'তে পরিণত হইল সেইদিন—যেদিন নীরব রাত্রে পত্নীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অরুণ গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল—

আমাকে এতদিন ছেড়ে থাক্‌তে পারবে? বল সুহাস, লক্ষ্মীটী.....

তরুণী এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল শ্রাবণের জলধারার মত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া। অরুণের মন টলিয়া গেল, অশ্রুসিক্ত কপোলের উপর গাঢ়প্রীতি চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া অরুণ বলিল,—'শুধু দু'টী বচ্ছর সু, তারপরই আবার তোমায় এমনি করে'—বলিয়া অরুণ তরুণীর গণ্ডে একটী চুম্বন প্রদান করিল। অরুণ বলিতেছিল,—'জান ত বাবার মন, সুহাস!—আর সংসারে তিনি ছাড়া আর কেউই যে আমার নেই! তাঁর ওই একটী বাসনা, সেটী পূরণ করা প্রত্যেক সন্তানের-ই কি কর্ত্তব্য নয়? .....ওকি কাঁদছ? ছিঃ, শুধু দুটী বচ্ছর আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না? শুধু দুটী—'

মান-ভঞ্জনের পালা শেষ হইতে-না-হইতেই কখন যে সকাল হইয়া গিয়াছিল কেহই টের পাইল না, নির্ব্বোধ কাকের দল বৃথা চেঁচামেচি করিয়া মরিতেছিল।

সে আজ পাঁচ ছয় দিন আগের কথা, তাহার পরেই একদিন প্রাতঃকালে, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অরুণকে সুদূর বিলাত-গামী জাহাজে গিয়া উঠিতে হইল। যাইবার সময়ে সুহাসের পিতা বলিলেন—'দেখো বাবা, চিঠি পত্তর দিতে ভুলোনা যেন, বুঝলে?'

শ্বশুরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান অশ্রুমুখী সুহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনীত কণ্ঠে অরুণ বলিল—'আজ্ঞে, হাঁ।'

দুই

সে আজ ছয়মাসের কথা, এই দীর্ঘ ছয়মাস অরুণের নিকট ছয়টী বৎসরের মতই অনুভূত হইয়াছে। রাত্রে—সমস্ত লণ্ডন মহানগরী যখন স্তব্ধতার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিত,—ধীরে ধীরে দূর—কোন সে এক দূর আত্মীয়-পরিজন বেষ্টিত গৃহের কথা তাহার স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিত, তাহাতে পিতার আজ্ঞা থাকিত, নিজের বিবেক থাকিত, আর,—আর থাকিত লাজসঙ্কুচিতা সুহাসের সহাস্য আননখানি! ভাবিতে ভাবিতে অরুণ নিদ্রা যাইত।

বিলাতে পৌঁছিয়া প্রথমে অরুণের দিনগুলা কাটিতেছিল মন্দ নয়, প্রাতঃকালে সূর্য্য ওঠার সময়টা হাইড-পার্কেই তাহার কাটিত এবং সন্ধ্যা-বেলা কয়েকখানি ইংরাজী বইয়ের মধ্যে সে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিত, সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া তাহার জীবনখানি একরূপ চলিয়াই যাইতেছিল। সেদিন রাত্রেও সে বায়োস্কোপ দেখিয়া একাকী ফিরিতেছিল, এমন সময়ে একটী সুন্দরী ভিখারিণী আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে তাহার গোটা দুই তিনটা বাচ্চা শিশু! নির্জ্জন রাত্রে—সঙ্গী বিহীন অবস্থায় কে এ যুবতী নারী? অরুণের বুকখানি কাঁপিয়া উঠিল, বলিল, 'কি চাও তুমি?'

হাতের কাপড়টা সরাইয়া রমণী যাহা দেখাইল, তাহাতে সে যে কৃপার পাত্রী, তাহা অরুণ এক নিমেষেই বুঝিয়া লইল, দেখিল তাহার একখানি হাত-ও নাই। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর অরুণ জানিল যে সংসারে—শুধু সংসারে কেন পৃথিবীতে হতভাগিনী নারীর আর কেহই নাই। তিনটী অপগণ্ড রাখিয়া তাহাদের পিতাটীও সরিয়া পড়িয়াছেন। দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ হইয়াছে বলিয়া আর তাহাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহে না, তাহার অবস্থা দেখিয়া অরুণের মনে অত্যন্ত দয়া আসিয়া জাগিল, হইবে না-ই বা কেন? বিপন্না নারী, সঙ্গে সন্তানসন্ততি! নারীর প্রতি তাহার দয়া হউক-না-হউক, ছেলেগুলির কাতর ক্ষুধার্ত্ত মুখ দেখিয়া সেও

কাতর হইয়া উঠিল—বলিল, কত হলে তোমাদের একমাস চলে যায়?

ম্লানমুখে রমণী বলিল,—'চার শিলিং হ'লে চালাতে পারি বাবু!'

সমস্ত পকেট খুঁজিয়া অরুণের বাহির হইল মোটে, দশ পাউণ্ড। জামা কাপড় ক্রয় করিবার জন্য সেগুলা প্রদান করিয়া তাহার ঠিকানা লিখিয়া লইল এবং আশ্বাস দিল যে প্রতিমাসে তাহার কুটীরে সে পাঁচ পাউণ্ড যে কোন প্রকারেই হউক, পাঠাইয়া দিবেই। অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে ও এই উপকারের প্রতিদান দিতে চেষ্টা করিবে, বলিয়া নারী চলিয়া গেল।

দেশে ফিরিতে এখনও ছয়মাস। হঠাৎ একদিন চায়ের টেব্‌লে বসিয়া সে একখানি টেলিগ্রাম পাইল, বড় বড় অক্ষরে লেখা—Suhas expired. Come Soon—

"Father"

চায়ের কাপ পড়িয়া গেল, অরুণ চারিদিকে অন্ধকার দেখিল, তাহার সুহাস আর নাই? এ পৃথিবীতে আর সে তাহাকে পাইবে না, ওগো এ তাহার কি হইল? কেন সে তাহাকে ছাড়িয়া আসিল?

অরুণের মনে পড়িল আগেকার ডাকে সুহাস লিখিয়াছিল যে মাঝে মাঝে তাহার বুকে বড় ব্যথা হয় এবং ব্যথার তাড়নায় হতভাগিনী একদিন সংজ্ঞাও হারাইয়াছিল, অরুণের বুকখানি কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিল, তাহার মৃত্যু-বাণী আজ তাহার বুকে যে শেলাঘাত করিয়াছে, সে আঘাতের ক্ষত আর বোধহয় তাহার এ জীবনে শুকাইবে না, টেবিল ছাড়িয়া অরুণ বিছানায় শুইয়া পড়িল।

তিন

সুহাসের মৃত্যুর ঠিক একমাস পরেই একদিন বৈকালে অরুণ জিনিষপত্র লইয়া ভারত-গামী জাহাজে চড়িয়া বসিল, সঙ্গে সঙ্গে কতপ্রকারের কল্পনা আসিয়া তাহার অন্তরকে ছাইয়া ফেলিল, আজ ঘরে গিয়া দেখিবে ঘর তার শূন্য; গৃহদেবী নাই, এ ব্যথা সে সহ্য করিবে কি করিয়া!

পিতার আদেশ মত শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিতেই দেখিল বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে। সুখের ছায়া সরিয়া যাইলে তাহাতে যেমন একটা কাল গম্ভীর ভাব ছম্ ছম্ করিতে থাকে, চির উৎসবময় এই বাড়ীটাও আজ ঠিক তেমনি—বিধবার মত, সাজ নাই সজ্জা নাই, অনাদৃত পরিত্যক্তের মতই দেখাইতেছিল। উঠানের রোয়াকের উপর বসিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা কুটনা কুটিতেছিলেন, অরুণকে দেখিয়াই ক্রন্দনবিজড়িতস্বরে চেঁচাইয়া উঠিলেন—'সুহাস যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে অরুণবাবু? আর সে—'

অরুণকে দেখিয়া আরও দুই ভগ্নী চেঁচাইয়া উঠিল, অনেকক্ষণ পরে অরুণ বলিল—'মা কোথায়? বাবা?'

জ্যেষ্ঠ শালিকা শোভা কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম্ম এই, কন্যার মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহারা প্রায় একরূপ বিবাগী! দেশের বাড়ীতে দিন কাটাইতেছেন!

দিদিমা বলিলেন,—'আর দাদা! দুদিনের জ্বরেই সু যে আমার অমন করে ফাঁকি দেবে, তা কে জান্‌ত-বল?'

শোভা বলিল,—'মরবার ঘণ্টা দুই আগেও অরুণবাবুর ছবিখানি আঁকড়ে পড়েছিলো!—'

শোভা ফোঁপাইতে সুরু করিল।

সেদিন সন্ধ্যার মধ্যেই সে যাইতে চাহিল বটে, কিন্তু দিদিমা কিছুতেই ছাড়িলেন না। রাত্রিটা সেখানে থাকিতেই হইল!

শুধু দিদমা নয়, শালীকারাও তদ্রূপ আদেশ করিল, একটা রাত্রি বৈ ত নয়?

আহারে বসিলে দিদিমা বলিলেন,—'বাসনা দুধটা দিয়ে যাও তো দিদি!'

অরুণ জিজ্ঞাসিল, 'বাসনা কে দিদিমা?'

'ওমা বাসনাকে আমাদের দেখ নি?—না তা আর দেখবে কি করে বল? ও হচ্ছে আমাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে! সুহাসের খুব বন্ধু ছিল!'

আবার সুহাসের কথা? অরুণ যে ওইটে ভুলিবার জন্যই এত চেষ্টা করিতেছে!

বাসনা দুধ দিয়া গেল, তাহার শুভ্র পা দুইখানি অরুণের দৃষ্টি এড়াইল না!

আহার সমাপ্ত হইলে, অরুণ নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিল। মনে মনে আকাশ পাতাল কতই ভাবিতে লাগিল, এই ঘর সুহাসের, আজ সে এ জগৎ হইতে কত দূরে কে, জানে! ওই যে আলনাটি, ওই যে সুজ্জিত বইগুলি না জানি একদিন কত যত্নেরই সহিত সুহাস ওগুলিকে ঠিক ওই স্থানে রাখিয়া দিয়াছিল, ওই যে দেরাজের উপর শুষ্ক ফুলের মালা, উহার বুকেও তাহার প্রিয়তম সুহাসের স্মৃতি এখনও লাগিয়া আছে! এই ঘর সুহাসের—ইহার প্রতি চিহ্ন প্রতি নিদর্শন, তাহার স্মৃতির সহিত জড়াইয়া আছে, কে জানে—

সহসা খুট্ করিয়া একটা শব্দ হইল, ধীরে ধীরে বাসনা ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

অরুণও লাফাইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—'কে?.....'

অপরাধীর মত অস্ফুটস্বরে বাসনা বলিল,—'আমি, বাসনা!.....'

'—বাসনা? আপনি—এত রাতে—'

অরুণ আর বলিতে পারিল না, বিস্ময়নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি ধরিয়া কোমলস্বরে বলিল '—কি, লজ্জা করছে? তবে এসেছিলে কেন?—এস—'বলিয়া প্রবল উত্তেজনার সহিত তাহাকে একরূপ টানিয়া লইতে বাসনাও তাহার সুন্দর মুখখানি অরুণের স্কন্ধে হেলাইয়া দিল, হঠাৎ ঘরের বৈদ্যুতিক আলোটী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা হাসির হর্‌রা আসিয়া তাহার কাণে বাজিল।

'একি তুমি?'—অরুণ দেখিল, এ বাসনা নয়, তাহারই সুহাস! মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইতেছিল না, অস্ফুটস্বরে বলিল—'তুমি না—'

'—মরে গিয়েছিলুম, কেমন?'

'—সত্যি, এসব কি বল ত?'—বলিয়া অরুণ অবাক-নেত্রে পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

স্বামীর বুকের উপর মাথা রাখিয়া অভিমানরুদ্ধস্বরে সুহাস বলিল,—'তোমার আক্কেলখানা ত বেশ, —পরের মেয়েকে দয়া দেখাবার কি দরকার ছিল, তা আবার যে সে মেয়ে নয় সুন্দরী, বিবাহিত!'

'বিবাহিত, সুন্দরী? এসব কথা তুমি কি বলছো, সুহাস?'

—মাথা হেলাইয়া সুহাস বলিল,—'আহা, মশাই যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না গো!' সেই যে বিলেতে,—'বাবা সেই জন্যই ত বল্‌লেন—'

'মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অরুণ বলিল,—'কি বল্‌লেন, বাবা?'

'—বল্‌লেন, ছোক্‌রা বয়েস,—সেখানে ওরকম ভাবে থাকা মোটেই ভাল নয়!'

অরুণ সত্যসত্যই কিছু বুঝিতে পারে নাই, কোন্ বিবাহিত যুবতীর প্রতি কৃপা দেখাইয়াছিল কিছুই মনে করিতে পারিল না।

দেরাজের উপর হইতে একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া একটি অংশ দেখাইয়া হাসি হাসি মুখে সহসা বলিল—'পড় ত এটা!'

অরুণ পড়িল—'An Indian student's charity to a married young lady—'

তাহার নীচেই অরুণের নাম।

সুহাস বৃদ্ধদৃষ্ট দেখাইয়া স্মিতমুখে বলিল—, 'কেমন 'ম্যারেড্ ইয়ং লেডী'র ওপর আর দয়া দেখাবে? চুপ করে রইলে যে!'.....

বিস্মিতকণ্ঠে অরুণ বলিল,—'সেই জন্যই বুঝি,—

'হাঁ, গো, হাঁ, সেই জন্যই তোমায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে!—এ রকম না করলে—'

সুহাসকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অরুণ বলিল—'হাঁ সুহাস ঠিকই করেছ, কিন্তু ওটা তো 'ম্যারেড্' নয়—ওটা যে মারড্ (বিকলাঙ্গ)।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিলে অরুণ দেখিল—সুহাস বহু পূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছে।

গত রাত্রের সংবাদপত্রটীর দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে অরুণ আপনার মনেই একটু হাসিয়া লইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীশিবপ্রসাদ রায় বি এল]

ঔপন্যাসিকের আর্ট সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করে ঔপন্যাসিকের চরিত্র রচনা কৌশলের ভিতর দিয়া,—প্লটের ভিতর দিয়া নয়। প্লটের ক্ষমতা George Eliot, Dickens, Thackery প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক বিষয়েই বেশী। অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি ও বর্ণনার মাধুর্য্য ও চিত্তাকর্ষক গল্প বলিবার ভঙ্গীতে পূর্ব্বোক্ত তিনজন ঔপন্যাসিকের কেহই প্লটের সমকক্ষ নন; কিন্তু চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার ক্ষমতা এই তিন জনের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম ছিল বলিয়া, তাঁহার স্থান সাহিত্যের আসরে এই তিন জনের অনেকটা নীচে। সুতরাং উপন্যাস-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে যে চরিত্রাঙ্কন কৌশলেই অধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন একথা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই এ বিষয়ে দক্ষ-শিল্পী। তবে এবিষয়ে উভয়ের কলা-কৌশলের পার্থক্য যথেষ্ট বর্ত্তমান। চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব ও পূর্ণতা বজায় রাখিয়া তাহার ক্রমোন্নতি বা বিকাশ দেখাইতে পারিলে চরিত্রগত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ চরিত্রেই পূর্ণতা রক্ষিত হইয়াছে। ইহারা স্বাভাবিক চিত্র নয়—একটু অসাধারণ বটে, বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ দোষগুণ-বিজড়িত চরিত্র অপেক্ষা আদর্শ চরিত্রই বেশী আঁকিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের উপরে বোধহয় প্রতীচ্যের প্রভাবটা একটু বেশী মাত্রায় পড়িয়াছে; কিন্তু, এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের দেশীয় পদ্ধতি অধিকমাত্রায় অনুসরণ করিয়াছেন। য়ুরোপের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য, মহাকাব্য ও উপন্যাস অনুসন্ধান করিলেও নিখুঁত আদর্শ চরিত্র খুব কমই দেখা যায়; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের কবিরা আদর্শচরিত্র ব্যতীত অপর কোনও চরিত্রকে নায়ক নায়িকা হইবার উপযুক্তই মনে করিতেন না। এবিষয়ে তিনি সংস্কৃত কবিদিগেরই শিষ্য। তাঁহার আয়েষা মানবীর আদর্শ, রোহিণী ও মতিবিবি আদর্শ পাপী, তাঁহার প্রতাপ, তাঁহার অমরনাথ আদর্শ স্বার্থত্যাগী-প্রেমিক, তাঁহার গোবিন্দরাম, তোঁকীর্খা আদর্শ কৃতঘ্ন এবং তাঁহার শান্তি ও দেবী চৌধুরাণী আদর্শ সহধর্ম্মিণী। রবিন্দ্রনাথের নায়ক নায়িকার মধ্যে এরূপ আদর্শচরিত্র খুব কম দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র নিখিলেশকেই আদর্শ চরিত্র বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার চরিত্রের অনেকগুণ দুর্ব্বলতারই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের আদর্শের ধারণা অনুরূপ—নিখিলেশের সহিত তাহার কিছুমাত্র মিল নাই।

শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাস দিয়াছিলেন লোকাপবাদকে তুচ্ছ করিতে পারেন নাই বলিয়া, আর যাহাতে সেই লোকাপবাদ তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে স্পর্শ করিতে পারে সমস্ত জানিয়া শুনিয়া নিখিলেশের সেই বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নাই। 'গোরার' চরিত্রও আদর্শ বটে, কিন্তু তাহাও ভ্রম ও দুর্ব্বলতা শূন্য নয়। গোরার বিশাল সরল শরীরের মধ্যে শিল্পী অতি সুকৌশলে অনেকখানি দুর্ব্বলতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রমেশের স্বার্থত্যাগ অতি উচ্চ; সে যে কমলাকে ভালবাসিয়াও ধর্ম্মের জন্য, কমলার শ্রেয়ের জন্য, আপনার প্রেমকে বলি দিয়াছিল; ইহাতে মহত্ত্ব প্রকাশ পায় বটে, তথাপি অমরনাথ ও প্রতাপের স্বার্থত্যাগের মত ইহাকে আদর্শ বলা যায় না। আবার অপর পক্ষে সন্দীপের চরিত্র যেমন লালসা অহংকার ও আড়ম্বরের প্রতিমূর্ত্তি, তেমনি তাহার চরিত্রে প্রকৃত বীরত্ব ও স্বদেশ প্রেমিকতার চিহ্ন ও দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দরাম বা তোকী খাঁর মত তাহাকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় না। তাহার মধ্যে যে পশুত্বটা আছে, তাহার পাশে একটা দেবত্ব না হউক, বিরাট নরত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের অনেক সময়ে ধাঁধা লাগে বুঝি সন্দীপ যাহা বলিতেছে তাহাই সত্য, কারণ সে তাঁহার বাক্যের দৃঢ়তায় আমাদিগকে আকর্ষণ করে। মতিবিবি ও রোহিণীর চিত্রে যে লালসার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, বিমলা ও বিনোদিনীর চিত্রেও যে সেই লালসার কতকটা আভাস দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তথাপি এই দুইটী চরিত্রে যে একটা সূক্ষ্ম স্বাজাত্য বোধ, ধর্ম্মও সৌন্দর্য্যানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বোক্ত চরিত্র দুইটীতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিমলা ও বিনোদিনী যে অপরাধী তাহা সত্য; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভাবিয়া ঠিক করিতে পারা যায় না, তাহাদের এই পাপের জন্য দায়ী কে? তাহারা না আর কেহ? রোহিণী পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া ছিল, কেবল লালসার মোহে মুগ্ধ হইয়া। তাহার চরিত্রে ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রবৃত্তি আর কিছু দেখা যায় না, আর মতিবিবি আপনার স্বামী জীবিত থাকিতেও যে পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হইয়া বিলাস স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন, সে কেবল আপনার দুর্দ্দমনীয় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য। বিমলা কিন্তু যে পাপের পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে কেবল কতকটা ভ্রম ও স্বামীর প্রতি অভিমানের বশীভূত হইয়া। ধর্ম্মানুভূতি তাহার মন থেকে একেবারে লোপ পায় নাই। সন্দীপের অসাধারণ আকর্ষণী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সে তাহাকে কতকটা দেবতা বলিয়া ভ্রম করিয়া সে আপনার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন তাহার মনে যে একটা বিপুল স্বদেশ-প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল, আপনার নারীধর্ম্ম ভুলিয়া সেটাকেই সে প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া ভুল করিতেছিল। এখানে এই নারীধর্ম্ম ও স্বদেশ প্রেমিকতার দ্বন্দ্বের উপর বিমলা চরিত্রের সমস্ত সমস্যা টুকু নির্ভর করিতেছে। বিনোদিনীর অন্তরেও এইরূপ একটা ভাল মন্দের সংগ্রাম অহরহ চলিতেছিল। লালসা চরিতার্থ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, মহেন্দ্র তাহার নিকট অনেক আগেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে নাই;—সে আরও একটা উঁচুদরের কিছু আশা করিয়াছিল যেটা সে মহেন্দ্রের কাছে পায় নাই। বেহারীর প্রতি তাহার প্রেম শুধু প্রবৃত্তির তাড়না হইতে উদ্বুদ্ধ নয়, বরং কতকটা সৌন্দর্য্য ও গুণানুভূতি-সঞ্জাত বলিতে পারা যায়। বিনোদিনী মুগ্ধ হইয়াছিল বেহারীর গুণে, তাহার মনুষ্যত্বে সুতরাং তাহার ভালবাসাকে গুণজ বলিতে পারা যায়—ইহা রূপজ বা কামজ নয়। বিনোদিনী চরিত্রের উপসংহার করিতে গিয়া কবি অতি নিপুণ শিল্পকলার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার আর্ট এই খানে সার্থক হইয়াছে। বেহারী যখন বলিল—

"মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে তুমি সংযত হইয়া কথা কও।" বিনোদিনী তাহা শুনিয়া বলিল—'ছি ছি, একথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব এ কখন হইতে পারে না। ছি ছি, একথা তুমি মুখে আনিও না।' বেহারী বলিল, 'বিনোদিনী আমি তোমাকে ভালবাসি।' 'সেই ভালবাসার অধিকারে আমি একটী একটী মাত্র স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিব।' বলিয়া বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া বেহারীর পদাঙ্গুলি চুম্বন করিল। পায়ের কাছে বসিয়া কহিল, 'পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমরা অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম তবে তোমাকে হীন করিয়া আরও হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এই ইচ্ছা আমি ভূমিসাৎ করিব না।' বিনোদিনীর এই উক্তি অতি উচ্চ। ইহা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। রোহিণী বা মতিবিবির ন্যায় সামান্য ইন্দ্রিয়-পরায়ণা, আত্মসুখ নিরতা, চটুল স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া এরূপ কথা বাহির হইতে পারে না। ইহা তাহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে। তাহার চরিত্রের একদিকের এই উজ্জ্বলতা, আর একদিকের গাঢ় মলিনতা মোটেই অশোভন হয় নাই; শিল্পী সুকৌশলে তাহার সৌষ্ঠব বজায় রাখিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহার সৃষ্ট এই সমস্ত জটিল চরিত্র গুলির প্রতি যে বরাবর পাঠকের একটা সহানুভূতির ভাব জাগাইয়া রাখিয়াছেন, সেটাও তাঁহার পক্ষে বড় কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র অথবা তাঁহার সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের পুস্তকে যে এরূপ জটিল চরিত্র কতকটা বিরল তাহার একটা কারণও আছে। পূর্ব্বেকার সমাজ ও সামাজিক জীবনের ধারা হইতে এখনকার সমাজও সমাজ-জীবনের ধারা অনেকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক সমাজ ও সামাজিক সমস্যার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে ও মনুষ্য চরিত্রের জটিলতাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং কাব্যে নাট্যে এখন আর আগেকার মত সরল simple typeএর চরিত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিলে চলিবে না। এখনকার মনুষ্য চরিত্রে লালসা ও ভোগবৃত্তির পাশাপাশি একটা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি,স্বধর্ম্ম বোধ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পূর্ব্বে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইত না। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসই বর্ত্তমান সমাজ লইয়া। তিনি বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের এই পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য করিয়া সাহিত্যে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আগেকার সাহিত্যিকেরা তখনকার সামাজিক জীবনে যাহা পাঠ করিতে পারিয়াছেন তাহারই আলোচনা আপন আপন কাব্যে করিয়াছেন। তাই তখনকার শ্রেষ্ঠকাব্যে 'ম্যাকবেথ', 'হামলেট' 'লীয়র', 'ওফেলো' প্রভৃতি একরোখা চরিত্র গুলি দেখিতে পাই, কিন্তু এখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা আর তাহা লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। জর্জ্জ মেরিডিথের Egoist ডষ্টয়স্কির 'Crime and Punishment' যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। Egoistএর নায়ক সত্যই egoist কি না, 'Crime and Phnishment' এর নায়ক খুনী কি দেবতা এসম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের একটা দ্বিধা থাকিয়া যায়। আধুনিক সামাজিক জীবনের মনুষ্য চরিত্রের এই যে জটিলতা এইটুকু আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথমে সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সন্দীপ, বিমলা ও বিনোদিনী চরিত্রের উৎপত্তি হইতেই কথাটা বেশ বুঝা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ পুস্তকই অতীতের সমাজ, অতীতের ঘটনা লইয়া লিখিত; তাঁহার উপন্যাসে তাই আগেকার সমাজের চরিত্রই বেশী দেখা যায়। আধুনিক সমাজ

লইয়াও তাহার যে সব পুস্তক লিখিত, তাহাতেও যে সকল চরিত্র আছে সেগুলি অঙ্কিত করিবার সময়ও তিনি কতকটা আগেকার রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য আরও আগেকার কবিদিগের সৃষ্ট চরিত্রের সহিত তুলনা করিলে তাঁহার চরিত্র গুলিও অপেক্ষাকৃত জটিল বলিয়া মনে হয়। এই হিসাবে উভয়ের অঙ্কিত চরিত্র গুলিই স্বাভাবিক বলিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলি সম্বন্ধে এই হিসাবে যে, তাহাদের মধ্যে একটা সত্যকার জীবনের অভিব্যক্তি আছে; কিন্তু জীবনের যে একটা গতিবেগ আছে, সেটা এই সকল চরিত্রের মধ্যে খুব অল্পই দেখা যায়; কোন কোনও চরিত্রে নাই বলিলেও চলে। ভাস্কর বা চিত্রকর যেমন এক সময়ে কোনও একটা জিনিষের কেবলমাত্র একটা বিশেষ দিককে আপনার খোদিত মূর্ত্তিতে বা চিত্রে প্রতিফলিত করিতে পারেন, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি একটা fixed typeএর চরিত্র গড়িয়া আপনার কাব্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এরূপ চরিত্রকে আমরা fixed বা স্থিতিশীল বলিতে পারি। আয়েসা, তিলোত্তমা, ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, ওস্মান প্রতাপ প্রভৃতি কতকটা এই জাতীয় চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ চরিত্রের মধ্যেই কিন্তু একটা গতিবেগ আছে, যেটা তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত চরিত্রেই অত্যন্ত চঞ্চল ও তাহাদিগকে 'গতিশীল' করিয়া রাখিয়াছে এই সমস্ত উপন্যাসের চরিত্র গুলির মধ্য দিয়া মনস্তত্ত্বের আলোচনাই বোধ হয় মুখ্য কারণ। মানসিক বৃত্তিনিচয়ের বেগবান ঘাত-প্রতিঘাত ইহাদিগকে এত চঞ্চল ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও সেইজন্য যেখানে মনোবৃত্তি সমূহের নীলায়িত তরঙ্গাভিঘাত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল স্থানে তাঁহার সৃষ্ট অনেক চরিত্রও বেশ গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। গোরা ও সুচরিতা চরিত্রের চঞ্চলতা ও গতিবেগ বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও চরিত্রে না থাকিলেও গোবিন্দলাল ও শৈবলিনী চরিত্রেও আমরা অনেক স্থানে গতিশীলতা দেখিতে পাই। পটের চিত্র ও বায়োস্কোপের ছবিতে যেরূপ পার্থক্য, এই দুই প্রকারে চরিত্রের মধ্যেও কতকটা সেই রকমের ব্যবধান বর্ত্তমান।

রবীন্দ্রনাথের কলরীতির আর একটা বৈশিষ্ট এই যে, তিনি সময়ে সময়ে কোনও একটা বিশেষ ঘটনার উপর অতিরিক্ত আলোক সম্পাতে আলো এবং অন্ধকারের বিচিত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আর সমস্ত ঘটনা বা চরিত্র গুলিকে ব্যাখ্যা করেন। এই রীতিকে ইংরাজীতে impressionism বলে। ইহার উৎপত্তি ফ্রান্সে। ইহা খুব আধুনিক রীতি সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে এরূপ রীতির ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না। ফ্রান্সের এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশের অনেক বড় বড় সাহিত্যিকেরা আজ কাল অনেক স্থানেই এই রীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। টুর্গেনিভ, ফ্লাভ্যেয়ার, হথর্ণ, ডষ্টয়স্কি আনাতোল ফ্রান্স, গগন প্রভৃতি লেখকদিগের কাব্যে এই রীতির বিশেষ করিয়া প্রচলন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার অনেক ছোট গল্পের নানাস্থানে এই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার বড় উপন্যাসের মধ্যে 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'তে অনেক স্থানে এই রকমের নানাভাবে আলোক সম্পাতের ফলে অন্ধকার অংশগুলা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গোরা ও সন্দীপের উপর বিচিত্রভাবে আলোক ফেলিয়া রবীন্দ্রনাথ অনায় চরিত্রকে স্ফুটতর করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ঠিক এই রকম ভাবের রীতির প্রয়োগ কোথাও না থাকিলেও চরিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার তাঁহার নিজের একটা বিশেষ রীতিছিল, যাঁহার প্রচলন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের অতি তুচ্ছ ঘটনা ও কার্য্যের উপর জোর দিয়া অন্তরের কোনও একটা নিগূঢ় ভাবকে প্রকাশ করাই এ রীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। 'আনন্দ মঠ' ও 'দুর্গেশ নন্দিনী' হইতে দুইটা উদাহরণ দিই। জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই মেয়ে নিয়ে কি

কর্ব্বি।" তখন নিমাইমণি বলিল, 'আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, ক'লে করে মানুষ করিব'—বলতে বলতে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে, আবার হাসে।" (আনন্দমঠ)

আবার তিলোত্তমা যখন শৈলেশ্বর মন্দিরে জগৎসিংহকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বাটী আসিলেন, "কখন পড়েন, কখন ভাবেন, আবার পড়েন, আবার মনে ভাবেন; বাসবদত্তাও ভাল লাগিল না।...পরে নিরুর্ম্মা হইয়া শয্যার উপর বসিয়া রহিলেন। নিকটে একটা লেখনী ও মসীপত্র ছিল; অন্যমনে তাহা লইয়া পালঙ্কের কাষ্ঠে এ ওতা "ক" "স" "ম" ঘর, দ্বার গাছ মানুষ ইত্যাদি লিখিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে কাটের একবন্ধু কালীর চিহ্নে পরিপূর্ণ হইল; যখন আর স্থান নাই, তখন সে বিষয়ে চেতনা হইল। নিজ কার্য্য দেখিয়া হঠাৎ হাস্য করিলেন; আবার কি লিখিয়াছেন তাহা হাসিতে হাসিতে পড়িতে লাগিলেন। কি লিখিয়াছেন? "বাসবদত্তা" "মহাশ্বেতা" "ক" "ঈ" "ই" "প," একটা রুষ সেঁজুতির শিব, 'গীত-গোবিন্দ" "বিমলা," লতা পাতা হিজি বিজি, গড়— সর্ব্বনাশ আর কি লিখিয়াছেন?

"কুমার জগৎ সিংহ"।

লজ্জায় তিলোত্তমার মুখ রক্তবর্ণ হইল।" (দুর্গেশ-নন্দিনী)। এই দুই স্থলে বাহ্য ভাবভঙ্গী ও সামান্য সামান্য কার্য্য কলাপের বর্ণনা করিয়া শিল্পী নিমাইমণি ও তিলোত্তমার অন্তরের যে গভীর ভাব টুকু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা অতি মনোরম। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক পুস্তকেই শত শতবার এ রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; এবং এই রীতির সাহায্যে তিনি স্বীয় সৃষ্ট চরিত্র গুলিকে অতি সহজেই সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে এ রীতির প্রয়োগ একেবারেই দেখা যায় না, তাহা নহে—তবে খুব কম। রবীন্দ্রনাথের একটা সুবিধা এই যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। চরিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার আর একটা কৌশল বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই তাঁহার কাব্যে অবলম্বন করিয়াছেন,—সেটা হচ্ছে আর একটা বিপরীত চরিত্রের সাহায্য লইয়া চরিত্রের বিশেষত্ব প্রদর্শন। ইংরাজীতে ইহাকে Contrast বলে। একটা চরিত্রের পার্শ্বে, আর একটা বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট চরিত্রকে স্থাপন করিয়া প্রথম চরিত্রটাকে আরও উজ্জ্বল বা কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দেখানই ইহার কার্য্য। এরূপ কৌশল বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বেও প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় দেশের কবিরাই স্ব স্ব কাব্যে বহুবার অবলম্বন করিয়াছেন। 'আনন্দ মঠে' শান্তি চরিত্র কতকটা কল্যাণীর বিপরীত গুণ সম্পন্ন; 'মৃণালিনী'তে 'মৃণালিনী' ও মনোরমা চরিত্র বিপরীত; 'বিষবৃক্ষে' কুন্দ ও সূর্য্যমুখী; 'কপালকুণ্ডলা'র মতি বিবি' ও কপালকুণ্ডলা এবং চন্দ্র শেখরে প্রতাপ ও চন্দ্র শেখরের চরিত্র পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। রবিন্দ্রনাথও স্থানে স্থানে এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, যেমন 'চোখের বালি'তে বিনোদিনীর চরিত্র কতকটা অন্নপূর্ণার বিপরীত, 'গোরায়' বিনয়ের চরিত্র কতকটা গোরার উল্টা এবং 'ঘরে বাইরে'তে নিখিলেশের চরিত্র একেবারে সন্দীপের বিপরীত।

উপন্যাসের চরিত্র গুলিকে কিন্তু স্বাভাবিক, পরিপূর্ণ ও মনোরম করিয়া গড়িতে পারিলেই যে আর্টের চরম সার্থকতা সম্পন্ন করা হয়, এরূপ মনে করা উচিত নয়। আর্টের সার্থকতার জন্য "উপন্যাসের উপযোগী শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি এমন হওয়া চাই যাহাতে মানব জীবনের সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যাগুলি—যাহা অমীমাংসিত থাকিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে, তাহা বিবৃত, বিশ্লেষিত ও মীমাংসিত হইতে পারে।"—(শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাসে একটা তত্ত্ব বা সমস্যার আলোচনা থাকা চাই। কিন্তু সকল সময়েই যে ইহা গ্রন্থকারের চেষ্টাও ইচ্ছা প্রণোদিত হইবে তাহা নয়। উপন্যাস জীবনেরই অভিব্যক্তি। জীবন কতকগুলি সমস্যারই সমষ্টি; সুতরাং জীবনকে

সাহিত্যের মধ্যে দিয়া প্রকাশ করিতে হইলে এই সমস্যাগুলি অনেক সময়ে কবির অজ্ঞাতসারেই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। আবার কোন কোন ও সময়ে কবি কোন ও একটা বিশেষ তত্ত্বের প্রচার করিবার জন্য, কিংবা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্যার আলোচনা করিবার জন্যই একখানা উপন্যাস লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' 'আনন্দমঠ' 'সীতারাম','দেবী চৌধুরাণী', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' প্রভৃতি এই শ্রেণীর পুস্তক। এরূপ উদ্দেশ্য মূলক উপন্যাসের একটা দোষ হচ্ছে এই যে, উদ্দেশ্যটা যদি প্রথম দৃষ্টিতেই পাঠকের কাছে ধরা পড়িয়া যায়,তবে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য হানির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্য সুকৌশলে, চরিত্রগত সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়াই, চরিত্রের মধ্য দিয়া আলোচ্য সমস্যার অবতারণা বা তত্ত্বের প্রচার করাতেই আর্টিষ্টের প্রকৃত শিল্প চাতুর্য্য প্রকাশ পায় এবং উপন্যাসেরও সৌষ্ঠব বজায় থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতা এবিষয়ে অতুলনীয়। 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী'ও 'সীতারাম' প্রভৃতি পুস্তকে তিনি গীতা ও দর্শনের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিলেও উপন্যাসের সৌন্দর্য্য কোথাও একটু ব্যাহত হয় নাই, চরিত্রের স্বাভাবিকতাও সজীবতা কোথাও একটু বিকৃত হয় নাই, গল্পের স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও ভারাক্রান্ত বা প্রতিহত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতাও যে এ বিষয়ে নিতান্ত কম নয় তাহা তাঁহার 'গোরা' উপন্যাস খানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পুস্তকে যে সকল সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন তাহাদের একটা মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষে' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' প্রেম-সমস্যা ও 'সীতারাম', 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দ মঠে' ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সমস্যার একটা মীমাংসা আছে—অবশ্য এ মীমাংসাও গীতার অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও পুস্তকে কিন্তু সমস্যার আলোচনা আছে, অথচ তাহার কোনও মীমাংসা নাই। তিনি পাঠককেই তাহার সমাধান করিবার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। "ঘরে বাইরে" ও "চতুরঙ্গ" এই শ্রেণীর উপন্যাস। অনেক ছোট গল্পেও তিনি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই স্থানে আর একটা কথায় একটু খানি আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই শেষোক্ত পুস্তক তিন খানি লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি হিন্দু ধর্ম্মের আলোচনায় ভরপুর ছিলেন, গীতার ভাষ্যে তিনি মসগুল। তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও এই পুস্তক তিন খানি একই বৃক্ষের ফল। উদাহরণ স্বরূপ সীতারামের চরিত্রটা আলোচনা করা যাইতে পারে। এই চরিত্রের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার গীতার এই মহান্ নীতির প্রচার করিয়াছেন;

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
রাগদ্বেষ বিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥"

গীতা, ২অ; ৬২-৬৬ শ্লোক

আনন্দমঠ'ও 'দেবীচৌধুরাণী' গ্রন্থে সমাজধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা আছে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করাই যে ধর্ম্ম, ইহাই বোধ হয় দেবীচৌধুরাণীর মূলতত্ত্ব। গ্রন্থ শেষে গ্রন্থকার প্রফুল্লকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"এখন এস, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও —আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র। কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমার ভুলিয়াগিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় এই তত্ত্বটাই উপন্যাসের

আর্টের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই দেবীচৌধুরাণী লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও যে হিন্দুর ধর্ম্মও সমাজতত্ত্বে গভীর ও জটিল সমস্যা গুলি লইয়া তাহার উপন্যাসে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 'নৌকা ডুবীতে' তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটা নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে মধুর রহস্যময় সমন্ধ বর্ত্তমান এটা তাহারই ব্যাখ্যা। কমলা, রমেশকে আপনার স্বামী বলিয়া ভালবাসিতে আরম্ভ করিল কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে জানিতে পারিল রমেশ তাহার স্বামী নন, সেই মুহূর্ত্তে সে তাহার ভালবাসা ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল, কারণ সে ত রমেশকে, ভাল বাসিয়াই তাহার স্বামীকে ভালবাসিয়াছিল; তিনি ত আর কোনও ব্যক্তি নন। "ঘরে বাইরে"তে তিনি যে সন্দীপও নিখিলেশের চরিত্রে অহংএর দুইটী রূপ দেখাইয়াছেন—একটা বাইরের আত্মম্ভরিতা আর একটা ভিতরের সোহহংরূপ—এটাও হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব। গোরাতেও তিনি যে সমাজধর্ম্মও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের 'বিচার করিয়াছেন তাহাও সুগভীর হিন্দুধর্ম্মের ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াই করিয়াছেন তবে তিনি এখানে হিন্দুধর্ম্মটাকে সঙ্কীর্ণ বিধি নিষেধ প্রবর্ত্তিত হীনতা ও দুর্ব্বলতার দিক থেকে না দেখিয়া উদারতাও বিশালতার চক্ষে দেখিয়াছেন এই মাত্র প্রভেদ। তাঁহার ধর্ম্মানুভূতির ভিত্তি গীতা বা উপনিষদের উপর স্থাপিত নয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথা তুলিয়াদিতেছি :-

"আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম্ম হয়ে উঠে না। তার সঙ্গে কেবল মাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্ম্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই চিরকালের সাধনা যা মুখে বলচি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করচি তা আমার পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতেও পারিনে। এদিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইট নিয়ে গড়ে তুলচে" "সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে ·····সেই প্রীতি, সেই আত্মীয়তাকেই·····আমি যথার্থ এবং সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মবলে জ্ঞান এবং অনুভব করি। এ ছাড়া অন্যান্য যা কিছু dogma আছে যা আমি কিছু জানিনে এবং বুঝিনে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখিনে তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হইনে।" এই তত্ত্বই তাহার শিল্পের মধ্য দিয়া—তাঁহার কাব্যে, তাঁহার নাট্যে ও তাঁহার উপন্যাসে প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি dogmaর ও গোঁড়ামির সমর্থক নন সত্য; কিন্তু তিনি কেবল মাত্র আর্টের খাতিরে, কোন উদারতার দোহাই দিয়া কোথাও সমাজ ও ধর্ম্মের বিধি নিষেধকে উল্লঙ্ঘন করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ একথা মানিতেন না, যাহা আছে তাহাই বেশ আছে এবং থাকিবে—পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। কিন্তু তিনি জানিতেন যে সমাজে এইরূপ একটা পরিবর্ত্তনের প্রচার করিলেই সমাজের উন্নতিসাধন করা হয় না। তিনি বুঝিতেন যে সমাজকে শৃঙ্খলিত রাখিবার জন্য কতকগুলা বিধি নিষেধেরও প্রয়োজন আছে, এবং সমাজকে সুস্থ রাখিতে গেলে, সকল সময়ে অত্যুদার নীতির প্রচার সাহিত্যে করা চলে না। তিনি ইহাও জানিতেন সমাজের এইরূপ স্বেচ্ছাচারতারও প্রচারে সাহিত্যের আর্টের সুস্থতা হয় না; তাই তিনি বিনোদিনী-বেহারীর মিলন ঘটান নাই, তাই তিনি গোরাকে তাহার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেন নাই, তাই তিনি বিমলার আত্মম্ভরি-অনুধাবন ও অনুতাপের এবং সন্দীপের বিফলতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

আর একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই দুই জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আর্টের প্রকৃতিগত আর একটা পার্থক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টকে আমরা romantic বা আদর্শমূলক আর্ট ও রবীন্দ্রনাথের আর্টকে realistic বা বাস্তব আর্ট বলিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস লিখিবার জন্য আমাদের দেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন সেটা

অন্য কোনও দেশে না হউক বঙ্গ দেশে রোমান্সের যুগ ছিল। আর এখনকার যুগটা একেবারে বাস্তবের যুগ। উপন্যাস-সাহিত্যের তখন আমাদের দেশে শিশু-যুগ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আর তিনি ইহা পাইয়াছেন প্রতীচ্য সাহিত্য হইতে। সুতরাং তাঁহার উপর যে Scott, Dickens ও Shakespeareএর প্রভাব একটু বেশী ছিল, প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবে হউক, সে কথা বলাই বাহুল্য; যদিও তিনি আপনি হিন্দুর স্বাজাত্য ও স্বধর্ম্ম-বোধে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং এই বৈদেশীক প্রভাবটাকে আপনার ব্যক্তিত্বের আঁচে গলাইয়া বাঙালীর জাতীয়ত্বের রঙে রঞ্জিন করিয়া লইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তখনও বাঙালীর স্বাজাত্যবোধ ততটা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে নাই; সুতরাং তাঁহার উপন্যাসে বাঙালীর ঘরের কথা ততটা সহজ অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে নাই, যতটা পারিয়াছে এই বাস্তব যুগে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস গল্পে। এখনকার দিনে যে জোলা, ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি বিদেশী লেখকদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়ে নাই একথা বলা যায় না, কিন্তু যাহা পড়িয়াছে তাহা ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-প্রণালীর মূলে সেইজন্য এই রোমান্সের প্রভাবটা খুবই বেশী। তাঁহার পুস্তকের যে সব ঘটনা একটু অসাধারণ, সেগুলার মধ্যেও রোমান্স আছেই, তা ছাড়া যে সকল কাব্যের ব্যাপারই হইতেছে অতি-প্রাকৃত বিষয় সেগুলার মধ্যেও যথেষ্ট রোমান্স আছে। তাই তাঁহার উপন্যাসে 'আত্মহত্যা', 'খুনোখুনী' 'পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি', 'স্বপ্নদর্শন, 'প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী'র এত ছাড়াছাড়ি। যেমন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীর উইল চুরি, রোহিণীর বারুণীর জলে আত্মহত্যার চেষ্টা, গোবিন্দলালের রোহিণীকে হত্যাকরণ, 'রজনী'তে রজনীর দুইলাভ; 'বিষবৃক্ষে' কুন্দের স্বপ্ন দর্শন প্রভৃতি ভূরি ভূরি ব্যাপার আছে, যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রণালী কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহার 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবী' 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' ও ছোট গল্পগুলি পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, সেগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অতি পরিচিত ঘটনারই চিত্র। সত্যবটে তাঁহার 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি' ও 'নৌকাডুবীর' দু এক জায়গায় একটু আধটু রোমান্টিকের ছাপ (touch) আছে; কিন্তু বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগত মূল অবলম্বনটির তুলনায় নিতান্ত সামান্য। 'গোরা', 'বিনয়' ও মহেন্দ্রের চরিত্র আধুনিক বাঙ্গালীর গৃহে বিরল নয়, 'চোখের বালি'র ঘটনা আমাদের কাছে খুব বাস্তব বলিয়া মনে হয়, বিনোদিনীর চিত্র আমরা চোখের উপর শত শত দেখিতে পাই। কিন্তু রোহিণী-গোবিন্দলালের ব্যাপারে ও কুন্দ-সূর্য্যমুখীর চিত্রে যে একটা ঘোরাল রোমান্সের ভাব আছে, যাহার জন্য উহাদিগকে আমরা ঠিক আমাদেরই একজন মনে করিতে পারি না। কিন্তু 'চোখের বালি' অথবা 'ঘরে বাইরে'র বাস্তব আর্ট আমাদের ভুলাইয়া দেয় না যে, আমরা সত্য ঘটনার মধ্যে নাই—উপন্যাস পড়িতেছি মাত্র। আমরা মনে করি যে, আমরা এই সব ঘটনার মধ্যেই বিচরণ করিতেছি এবং এই সকল উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা আমাদেরই আত্মীয় স্বজন। এই জন্য এই সকল উপন্যাসের ঘেটুকু কুফল তাহার প্রভাবে আমরা শীঘ্রই অভিভূত হইয়া পড়ি। আমার মনে হয় এই জন্যই "চোখের বালি" অথবা "ঘরে বাইরের" অপকারিতা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অথবা 'বিষবৃক্ষে'র অপেক্ষা বেশী; নতুবা মূলে বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত পুস্তকদ্বয়ের পাপচিত্রের নগ্নতা শেষোক্ত পুস্তকদ্বয়ের অপেক্ষা কিছু বেশী নয়।

ফাগুন আগুনে

(শ্রীলীলা দেবী)

ডাক্‌ছে কোকিল ডাকুক্ না!
মাধবীর ওই মধুর বুকে
হাজার অলি থাকুক না!
ফুল ফোটা ওই কামিনী,
জাগুক্ সারা যামিনী;
চাঁদের কিরণ পারাবারে
মরুক্ ডুবে মরুক্ না!
মালঞ্চের ওই মন্তারী
স্বর্ণ মেঘের রঙ জরী
বসন্তের এই উন্মাদনায়
মাতুক্ ভুবন মাতুক্ না।
সাঁঝের আকাশ নয়নে
থাকুক্ চেয়ে শয়নে
জাগাক্ সখি আকুল ব্যথা
কাঁদুক্ পরাণ কাঁদুক্ না!
ডাক্‌ছে কোকিল ডাকুক্ না!
তরুর বুকে ললিত লতা
সোহাগ ভরে দুলুক্ না!
বকুল বনের সুবাসে
পথ ভুলাল উদাসে
মধুপ ও সে মল্লিকারে
হাজার চুমায় চুমুক্ না!
পাগল করা ফাগুনে,
আনন্দের এই আগুনে
মোরই হৃদয় পুড়বে না হয়
ক্ষতি কি তায় পুড়ুক্ না!

মুস্কিল আসান

(গল্প)

[শ্রীঅজয়কুমার সেন]

আমার বয়স যখন বার বৎসর, তখন পিতা আমাকে অকালে পিতৃহীন করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন;—আর রাখিয়া গেলেন আমাকে ও তাঁর—একমাত্র বিধবা, অনাথা ও আমার শোকদীর্ণা মাকে।

মার আদরে লালিত পালিত হইয়া আমি এতটা বড় হইয়া উঠিয়াছি। বাবার মৃত্যুর পর, মা অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার ভাইএর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। মামা ও মামী আমাদিগকে সাদরেই গ্রহণ করিলেন। আমি মামা ও মামির অপরিসীম স্নেহে ও যত্নে বাবার অভাব এক বিন্দুও বুঝ্‌তে পারিলাম না।

মামার অন্তঃকরণের মধ্যে যেটুকু স্নেহের অমিয়-ভাণ্ডার ছিল, তাহা আমাকে নিঃশেষ করিয়া দিয়া ছিলেন; কারণ তাঁহার কোন ও সন্তান ছিল না। মামীমার ও আমি একমাত্র স্নেহের শূন্য সিংহাসন দখল করিয়া বসিলাম—তিনি ও আমাকে স্নেহের অংশ দিতে কোন দিনই কার্পণ্য করেন নাই।

যাহাই হউক, তাঁহাদিগের যত্নে ও আদরে আমি নাবালক হইতে সাবালকে আসিয়া পৌঁছিলাম।

দেখিতে দেখিতে আমি স্কুল ও কলেজের পড়া শেষ করিয়া এম এ ডিগ্রী লইয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। মার বুক আনন্দে ও গর্ব্বে দশ হাত ফুলিয়া উঠিল।

দিনকতক বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া, আমার মন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি স্থির করিলাম যে, একটা সুবিধা হইলেই বাহির হইয়া পড়িব। কিন্তু যখনই বাহির হইবার উপক্রম করি, তখনই মার মুখ চোখের সাম্‌নে জল্ জল্ করে ফুটে উঠে, আমার সকল সঙ্কল্পকে অতল জলে ডুবাইয়া দিত।

হঠাৎ একদিন শুনিলাম আমার বিবাহের কথা। এতদিন পাঠে গভীর ভাবে মগ্ন ছিলাম বলিয়া বাহিরের কোন ও নিবিড়-বন্ধন অনুভব করিতে পারি নাই। তবে সহসা একদিন "নিঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ" হইল—তখন আমার মনের অবস্থা হইল—

"আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিঘরে পরাণ ঢালি।'
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।"

যখন মনের উপর দিয়া বসন্তের হাওয়া বহিতে-ছিল, তখন নূতনত্বের মাদকতায় রোমান্সের উপাসক হইয়া পড়িলাম।

একদিন আমি আমার পড়িবার ঘরে একটি বই এ একপ্রভাবে মগ্ন ছিলাম যে, মা যে কখন আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—সে খেয়াল ও আমার একেবারেই ছিল না! হঠাৎ মাকে আমার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমি চকিতে বলিলাম, "কি খবর মা?"

একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মা বলিলেন, "কি আর খবর বাছা—তোর মামীমা বোল্‌ছিল যে তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা যাক্।"

আমার তখনকার মানসিক অবস্থায় আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়াই রহিলাম।

আমাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া, মা চলিয়া গেলেন—বুঝিলেন আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।

দিন দুই পরে সহসা মা আসিয়া বলিলেন, "ওরে, তোর একটা বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে—তোর মামা ত যেতে পার্‌ছে না আফিসের কাজের দরুণ—তবে না হয় তুই-ই যা' দেখে শুনে আয়।"

কথাটা বলিয়া তিনি আমার উত্তরের আশায় রহিলেন। আমি কিছু উত্তর না দিয়া নীরব রহিলাম দেখিয়া, মা পুনরায় কহিলেন, "ভাল কোরে সব দেখে শুনে আস্‌বি—বুঝ্‌লি ত?"

হাসিয়া বলিলাম, "মা, তুমিই না হয় আমার বদলে যাও না—দেখে শুনে আস্‌বে?"

"সে কি হয় রে, তা যদি হোত, তবে কি আর তোকে বলি?" এই বলিয়া তিনি বিস্মিত-মুখে চলিয়া গেলেন।

তারপর অগত্যা আমাকেই যাইতে হইল। ভাল দিন ক্ষণ দেখিয়া মাতার আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া আমি আমার ভাবী পত্নীর উদ্দেশ্যে কলিকাতাভি-মুখে যাত্রা করিলাম। আমার একটা মনে মনে সঙ্কল্প ছিল যে, বিবাহটাকে একটা রোমান্স করিয়া তুলিব। কি করিয়া যে এইরূপ করিব—তাহার জন্য আমাকে কি কম খাটিতে হইয়াছে? পড়া-বইএর কোন পাতায় একটা বিচিত্র রকমের বিবাহের ঘটনা লেখা নাই; যাহার আমি অনুকরণ করিতে পারি? যাহাই হউক, আমি নিজেই একটা মতলব

বাহির করিয়া লইব স্থির করিলাম। এই সব ভাবিয়া টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম।

গাড়ী আট দশটা ষ্টেশন পার হইয়া, হঠাৎ একটি ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। আমি বেঞ্চিতে লম্বা হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা যেন আমি শুনিতে পাইলাম, "এই গাড়ীতে যায়গা আছে কিন্তু সকলেই এক একটা বেঞ্চি দখল ক'রে শুয়ে আছে—কি যে করি?"

এই রকমের দারুণ নৈরাশ্যের স্বর শুনিয়া আমার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। তথাপি আমি চুপটি করিয়া পড়িয়া রহিলাম। কেন বাবা, বেশী লোক ডেকে নিজের ঘুমটাকে মাটি করি? কিন্তু যখন দেখিব যে দৌড়াদৌড়ি করিয়া ও কোন স্থান পাইতেছেন না, তখন না হয় দেখা যাবে? এই সব শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় পুনরায় তরুণী-কণ্ঠে উত্তর হইল, "এই গাড়ীতে না হয় উঠুন—দাঁড়িয়েই যাব?"

আমি আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। তড়াক করিয়া বেঞ্চি হইতে উঠিয়া পড়িয়া একলাফে গাড়ীর দরজার নিকটে আসিয়া ব্যগ্র-কণ্ঠে কহিলাম, "কেন অত কষ্ট কোরছেন মশায়—এই গাড়ীতে ত যথেষ্ট স্থান আছে—উঠুন না?" কথাটা বলিয়া আমি গাড়ীর দরজাটি অতর্কিতে খুলিয়া দিলাম।

হঠাৎ আমার মতন অপরিচিতের মুখ হইতে এই প্রকারের আশ্বাস-বাণী শুনিয়া, ভদ্রলোকটি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

আমি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "যদি এই গাড়ীতেই যেতে চান ত উঠে পড়ুন—নচেৎ মহা-মুস্কিলে পোড়বেন?"

আমার কথা শুনিয়া সেই তরুণী-কণ্ঠ আবার বলিয়া উঠিল, "এই গাড়ীতেই না হয় উঠুন না কেন?"

ভদ্রলোকটি কোন প্রকারের উচ্চবাচ্য না করিয়া, আমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা মশায়, আপনাদের গাড়ীতেই না হয় উঠি?"

ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "বেশ ত!"

সকলকে গাড়ীর ভিতর উঠাইয়া দিয়া, আমি আমার বিছানাটিকে ওটাইয়া লইয়া বলিলাম, "মশায়, ওঁদের এখানে বোসতে বলুন।"

আমার দিকে বিস্ময়-পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া, ভদ্রলোকটি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন, "শেষকালে আপনার স্থানটা পর্য্যন্ত দখল কোরে বোসতে হ'বে—এটা যেন কি রকম……"

ভদ্রলোকটির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া আমি বলিলাম, "তা' হোক—আপনি আগে ওঁদের বোসতে বলুন! তারপর আমাদের যা হয় হবে?"

ভদ্রলোকটির সহিত যাঁরা যাঁরা ছিলেন, আমার স্থানটিতে আসিয়া বসিল; আমি অন্যত্র একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিলাম, "আসুন, আমরা ও এইখানে বসি।"

হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "আপনি দেখ্‌ছি নেহাৎই আমাদের জন্য কষ্ট কোর্‌বেন?"

প্রত্যুত্তরে বলিলাম, "এ আর কি এমন কষ্ট হোল?"

বিনীত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "না মশায়, এমন কষ্ট কেউ নিজে স্বীকার করতে চায় না—যেমনটি আপনি……"

কথাটা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইলাম। কোনরূপ উত্তর না দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

ভদ্রলোকটি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর মশায় বলেন কেন—আমার ঐ যে মেয়েটিকে দেখ্‌ছেন—ওর একটা সম্বন্ধ স্থির হোয়েছে—তাই কলকাতায় যাচ্ছি।"

পিতার কথায় মেয়েটির মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল। সে লজ্জিত হইয়া মুখটা অপর পার্শে ফিরাইয়া লইল।

ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া বলিলাম, "যা বোলেছেন মশায়, আজকাল মেয়েদের বিবাহ দেওয়া একটা সমস্যার বিষয় হোয়ে দাঁড়িয়েছে।"

সংক্ষেপে উত্তর দিয়া তিনি বলিলেন, "যা বোলেছেন মশায়! সামাজিক উৎপীড়নে দেশ ছারেখারে যাবার দশায় এসেছে!"

আর কোন প্রকারের প্রশ্ন না করিয়া চুপটি করিয়া আপন মনে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—যদি ঐ মেয়েটির সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয় তা' হোলে কিন্তু বড় মজা হবে দেখ্‌তে পাচ্ছি? কারণ আমি যাচ্ছি মেয়ে দেখ্‌তে—যদিই এই মেয়েটিই হয়! আর ভাবিতে পারিলাম না। আনন্দে বুকটা ফুলিয়া উঠিল।

সহসা ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আপনি কি কলকাতায় যাচ্ছেন?"

বলিলাম, "হ্যাঁ।"

"কলকাতায় কি আপনাদের বাড়ী—না অন্য কোন কাজে যাচ্ছেন?"

"না, নিজেরই কাজে।"

আমাদের কথোপকথনের মধ্য হইতে আমি এক একবার সেই মেয়েটির দিকে চঞ্চল-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিলাম যে, মেয়েটি আমাদের কথা মনোযোগসহকারে শুনিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে অল্পকালের মধ্যেই ভদ্রলোকটীর সহিত আমার বেশ হৃদ্যতা জন্মিয়া গেল। আমার দিকে তাকাইয়া নিম্ন-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "একটা কথা কি আপনাকে বোলতে পারি?"

কাল বিলম্ব না করিয়াই ব্যগ্র হইয়াই বলিলাম, "কি কথা বলুন?"

"দেখুন আমি কায়স্থের সন্তান—মেয়েদের বিবাহ দেওয়া কি যে কঠিন ব্যাপার তা ত বুঝ্‌তেই পারছেন?"

এই প্রকারের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, হয়ত আমাকেই বলিবেন—একটা পাত্র স্থির করিয়া দিতে। কিন্তু পরক্ষণেই আমি তাঁহাকে সহানুভূতি-পূর্ণ-কণ্ঠে বলিলাম, "আপনি অত ভাবছেন কেন—যখন হবার হবে, তখন কোথা থেকে যে কি রকমে হোয়ে যাবে—তা আপনি জান্‌তেও পার্‌বেন না।"

এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটী আমার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়াই বলিলাম, "ছেলেটি কি করে?"

"তা ত ঠিক জানি না—তবে আমার এক আত্মীয় কলকাতায় আছেন—তাই যাচ্ছি; এখন ভালয় ভালয় যা হোক একটা কিছু হোয়ে গেলে হয়?" কথাটা বলিয়া তিনি নীরব হইয়া রহিলেন।

কি জন্য জানি না একটু হতাশ হইয়াই বলিলাম, "সে জন্য কি—হোয়ে যাবে!"

এই কথা কয়টি বলিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, মেয়েটীত দেখিতে অনন্যসুন্দরী। এত বড় রূপসীর বিবাহ হয় না? বালিকাকে দেখিয়াই ত আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। অতি বিস্ময়পূর্ণ প্রস্তাবটা কি করে তুলি। ভরসার মধ্যে আমরা উভয়েই কায়স্থ। তবে কথাটা পাড়ি কি করে?

উপায় স্থির করিবার জন্য সাত পাঁচ ভাবিতেছি, এমন সময় একটা বড় ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। আমিও এই ফাঁকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নিজেকে একটু হাল্কা করিয়া লইলাম।

ভদ্রলোকটী আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার নামটা কি তা……"

তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলাম, "আমার নাম শ্রীপবিত্র কুমার সেন নিবাস হীরাপুর—ঢাকা জেলা।"

আমার পরিচয় পাইয়া তিনি উৎফুল্ল-চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কি সুরেন রায়কে চেনেন?"

"নিশ্চয়ই চিনি—তিনি যে আমার ভগিনীপতি!"

"ওঃ—তাই নাকি—তা বেশ—বেশ—বেশ!" এই বলিয়া তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

এতটা যখন জানাশুনা হইয়া গেল; তখন আমার যেন কেমন একটু বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। একবার মনে হইল—দূর ছাই—যাকে দেখ্‌তে যাচ্ছি; তাকেই ভালয় ভালয় দেখে আসি।

এই রকমের এলোমেলো চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোকটি আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "পবিত্রবাবু, এখানে গাড়ী বোধ হয় কিছুক্ষণ থামে—না?"

"বোধ হয় থামে, কারণ এটা যে জংসন ষ্টেশন।"

আমার পিঠেতে মৃদু স্পর্শ করিয়া নিম্ন-কণ্ঠে বলিলেন, "একবার বাইরে আসতে পারবেন কি?"

এইরূপ কথাতে আমার বুকটা হঠাৎ যেন ছ্যাঁৎ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমি থতমত খাইয়া বলিলাম, "বিশেষ কিছু বলবার আছে—তা বলুন?"

এই বলিয়া তিনি আমাকে প্লাটফরমের উপর একটা গাছের তলায় লইয়া গিয়া মিনতি-ভরা-কণ্ঠে বলিলেন, "পবিত্রবাবু, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌ব—তাতে আপনি কি……"

হাসিয়া বলিলাম, "আপনি বলুন না কি কথা?

"কথাটা কি জানেন"—বলিয়া তিনি আমাকে উদ্বেগ-পূর্ণ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "পবিত্রবাবু, আপনি কি অবিবাহিত—না……"

কথার উত্তর দিয়া বলিলাম, "আমি এখনও পর্য্যন্ত অবিবাহিত, তবে……"

উদ্বিগ্ন-চিত্তে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি?"

অগত্যা আমাকে বলিতে হইল, "আমিও পাত্রী দেখ্‌তে যাচ্ছি।"

"কার জন্য?"

হাসিয়া বলিলাম, "এ আর বুঝ্‌তে পারছেন না!" কথাটা বলিয়া ঘাড় হেট করিলাম।

"ওঃ,—কোথায়; কার বাড়ী?" এই বলিয়া তিনি আমার দিকে ব্যাকুল-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "ফণীবাবুর বাসায়।"

কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "ফণী বাবু; পটলডাঙ্গার ফণী সরকার কি?"

"হাঁ।"

আমার কথা শুনিয়া তিনি আমার হাত দুইটি সস্নেহে ধরিয়া বলিলেন, "তবে আমারি মেয়েকে দেখ্‌তে যাচ্ছেন।"

এই কথাতে আমার অন্তঃকরণ হইতে গুরু পাষাণের ভার এক নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম, "আপনার কন্যা!"

আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দ-বিগলিত-স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমারই কন্যা!"

"আমাদের আর্থিক অবস্থার বিষয় কি আপনি কোনরূপ শুনিয়াছেন। আমাদের অবস্থা খুব ভাল নয়—মাতুলালয়ে আমি মানুষ।"

"না বাবা আর বলিতে হইবে না আমি সব জানি; তোমার বাপ আমার সতীর্থ ছিলেন।"

কিছুকাল নীরব থাকিয়া আমি বলিলাম, "দেখুন, আমার একটা প্রস্তাব আছে। যখন সবই জানা শুনা—এমন কি দেখাশুনা পর্য্যন্ত হইয়া গেল, তখন আর বেশী কিছু বাকি রহিল না। তবে আমার ইচ্ছা যে, কলিকাতায় পৌঁছিয়া কোন একটা নিকট-বর্ত্তী দিনে বিবাহ ব্যাপার শেষ করিয়া আমি একেবারে আপনার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাই।"

আমার এই প্রকারের অসম্ভব প্রস্তাব শুনিয়া, তিনি যেন একটু বিস্মিত হইয়া পড়িলেন; এবং বলিলেন, "যদি ইহাতে আপনার মাতা বা মাতুল রাগ করেন?"

অদম্যোৎসাহে আমি বলিলাম "সে দায়িত্ব আমার—সেজন্য আপনি ভাব্‌বেন না; বরং নিশ্চিন্ত থাকুন।"

মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "তবে তাই হোক।"

অপর কোন প্রকারের আলোচনা না করিয়া আমরা গাড়ীতে আসিয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আমি নাগর দোলায় দুলিতে দুলিতে এক এক বার আমার ভাবী পত্নীকে দেখিতে লাগিলাম। যখন আমার উৎসুক চক্ষুদ্বয় তাহার উপর নিপতিত হইতে লাগিল, তখন সে চকিতে তাহার সরম মাখা মুখ খানিকে অপসারিত করিয়া অন্যদিকে চাহিতে লাগিল। তখন আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম।'

'আমি চিনি গো চিনি তোমায় বিদেশিনী।'

* * * *

এতটা পথ আনন্দের আবেগে কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া ফুরাইয়া গেল—তাহা আমি একবিন্দুও বুঝিতে পারিলাম না। মনে হইতে লাগিল—আরও একটু গাড়ী চলিলে যেন ভাল হইত।

* * * *

কলিকাতা পৌঁছিয়া তিন দিন পরে মামাকে টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম—আমরা সব যাইতেছি। গাড়ীর যেন সব বন্দোবস্ত থাকে।

আমার এই অদ্ভুত 'তার' পাইয়া মা ও মামা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হোয়ে যাবেন। কি করি—বার বার কি আর আসা যাওয়া চলে; একেবারেই সব কাজ শেষ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য!

বাঙ্গলার চাকুরীজীবী

(শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বসু এম, এ)

একথা খাঁটি সত্য যে, বহু দিন ধরিয়া বাঙ্গালী কোন ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। বাঙ্গালা দেশ জগতের মধ্যে একটী অতি উর্ব্বর দেশ বলিয়া খ্যাত। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকই জমির উৎপন্নের উপর নির্ভর করে। বাকী যাহারা ভদ্রলোক বলিয়া খ্যাত, তাহারা প্রকৃত পক্ষে সেই উৎপন্ন ফসলের ভাগ লইয়া জীবন ধারণ করে। বর্ত্তমানে ইহাদের অনেকে চাকুরীজীবী হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে চাকুরীজীবী নন, তাহাদেরও চাকুরীর প্রতি একটা বেশ আকর্ষণ দেখা যায়। যাহারা বাঙ্গালার জমিদার ও ব্যবসায়ী তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

বাঙ্গালী এখন চাকুরীর জন্য এত লালায়িত হইয়াছে কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, চিরদিনই চাকুরীজীবী। তবে ইহাদের চাকুরীর রকম-ফের এখন হইয়াছে। ধরুণ জমিদারের নায়েব গোমস্তার মাহিয়ানা পূর্ব্বে সাধারণতঃ তিন টাকার উপরে ছিল না। দেশে তখন খাদ্য শস্যাদির মূল্য যত সস্তাই থাকুক না কেন, অবশ্যই তিন টাকায় একটা পরিবারের কিছুতেই চলিত না। তখনকার দিনে নায়েব গোমস্তা জমিদারের নিকট হইতে মাসিক প্রত্যক্ষ ভাবে মাত্র তিন টাকা পাইলেও, অন্যভাবে অনেক রোজগার করিত। তাহারা প্রজাদিগকে অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া অনেক টাকা আদায় করিত। সে সময়কার নায়েব গোমস্তাদের প্রবল প্রতাপ, বর্ত্তমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের অপেক্ষা অধিক ছিল। তাহাদের ক্ষমতার কথা বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে প্রবাদের মত চলিয়া গিয়াছে। আজও একজন গোমস্তার সামনে দাঁড়াইয়া একজন সাধারণ কৃষি প্রজা মুখ তুলিয়া কথা বলিতে সাহস পায় না। সে-দিনকার নায়েব মহাশয়রা বর্ত্তমানের অনেক জমিদার বাবুদের অপেক্ষাও বেশী পরিমাণে বিলাস বিভব উপভোগ করিত। তাহাদের চুনুকো মানের কোণে সামান্য আঘাত লাগিলে হয়ত গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত। অতএব সে কালের

নায়েব গোমস্তাদের বর্ত্তমান কালের চাকুরীজীবীদের দলে ফেলা যাইতে পারে না।

বাঙ্গালার ভদ্র পরিবারদের সহিত ইংলণ্ডের প্রাচীন কালের ফিউডাল লর্ডদের অধীন মাতব্বর প্রজাদের কতকটা তুলনা হয়। ভদ্র পরিবারের সকলেরই কিছু কিছু জোত জমা ছিল। বর্ত্তমান কালের অনেক ছোট ছোট তালুকদার এই শ্রেণীর। পূর্ব্বে বড় বড় রাজারা বা জমিদারেরা কাহারও কোন কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া জমি দান করিতেন। যাহারা যেরূপ দান পাইত, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদানের চিন্তা পুরুষানুক্রমে আর বড় থাকিত না। অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার, পুরোহিত, কিংবা পণ্ডিত হিসাবে নিষ্কর জমা ভোগ করিতেন। তাঁহাদের অন্নের জন্য চাকুরীর চেষ্টায় বাহির হইতে হইত না। চিকিৎসক কবিরাজেরও সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এমন কি এ জমি দানের ব্যবস্থায় ধোপা, নাপিত, সাধারণ ভৃত্য, পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতি চাকরাণ জমি ভোগ করিত। যাহাকে চাকরাণ জমি একবার দেওয়া হইত তাহার মৃত্যুর পর তাহার সন্তানদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা হইত না। অতএব বর্ত্তমানকালের মত চাকুরী কাহারও করিতে হইত না; জমীর উপস্বত্বভোগীরা সাধ্যমত দাতা ও দাতার বংশধরদের কার্য্য করিতেন।

আত্ম-প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। সংসারের ঘটনা চক্রের মধ্যে যখন যে ভাবের সুবিধা ছুটিতেছে, মানুষ তাহার দ্বারাই আত্ম-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছে। এদেশে বংশগত জাতি বিভাগের চিরন্তন ব্যবস্থার ফলে, নিম্নশ্রেণীর পক্ষে উচ্চতর জাতির পারিবারিক সম্ভ্রম লাভ করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বর্ত্তমান আকারের সার্ব্বজনিক ব্যবসা বাণিজ্যের অভাবে এবং এই কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশে অর্থের প্রচলনও কম ছিল। এরূপ স্থলে সহসা অর্থবান হইয়া কাহারও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল না। শিক্ষিত হইয়া পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে সমাজের পূজা দাবী করিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। শিক্ষার ব্যবস্থাও জাতি-বিভাগের নিয়মের উপর নির্ভর করিত। শিক্ষা সাম্যাই ছিল; যাহা ছিল তাহাও জাতির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উঠিত না। যাহা ছিল তাহা দ্বারা মানসিকবৃত্তি নিচয়ের উন্মেষ সাধনই প্রকৃত প্রস্তাবে হইত না,—আত্মগরিমা প্রতিষ্ঠা ত দূরের কথা। আর একদিকে বংশগত জাতির শুচিতা রক্ষার চিন্তা এমন করিয়া সমাজের দৈনন্দিন সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকলাপের ভিতর ঢুকিয়াছিল যে, মানুষের তাহা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা করিবার অবসরই ছিল না। বর্ণশুচি রক্ষার প্রধান মাপকাটী ছিল বিবাহ। সহস্র বন্ধনীর ভিতর বাস করিয়া সমাজে নূতন কাহারও মাথা তুলিবার সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। কিন্তু অবস্থা বিশেষ সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাইত। ধরুণ কন্যা বিবাহের জন্য সর্ব্বদাই দূরে পাত্র অনুসন্ধান করিতে হইত। তখনকার দিনে সর্ব্বত্র যাতায়াত বা সংবাদ আদান প্রদান বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। দুই এক জেলা পার হইয়া কেহ আসিয়া পরিচয় ভাঁড়াইলে, তাহা ধরা বড় সহজ ছিল না। এ ভাবে অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক কোন দূর গ্রামে যাইয়া কোন উচ্চশ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিয়া বসিত; এবং ঘরজামাই থাকিয়া নিজের বংশমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করিয়া লইত। ইহা এক প্রকার বিপজ্জনক উপায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা; কারণ ধরা পারিলে এ সকল ক্ষেত্রে জীবন পর্য্যন্ত যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

প্রাচীনকালে আর এক প্রকারের প্রতিষ্ঠালাভের উপায় ছিল—গায়ের জোরে পরের জমী আত্মসাৎ করিয়া, এবং তাহা রক্ষা করিয়া,তখনকার জমিদারগণ জমীদারী রক্ষা করিতেন লাঠির দ্বারা। সকল জমিদারেরই এক এক পলটন লাঠিয়াল থাকিত। লাঠির সাহায্যে তাঁহারা অনেক সময় পরের জমি

আত্মসাৎ করিয়া বসিতেন। এ কার্য্যে কোন দোষ আছে বলিয়া কেহই বিবেচনা করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'বাঙ্গলার বর্ত্তমান জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষগণ ডাকাইত ছিলেন।' অতএব দরিদ্র, বুদ্ধিমান, বলিষ্ঠ লাঠিজীবী কতকগুলি লাঠিচালককে কোনগতিকে বশীভূত করিতে পারিলে, তখনকার দিনে সহজেই জমিদার হইয়া বসিতে পারা যাইত। অনেক ছোট বড় তালুকদারের উৎপত্তিও এই ভাবে হইয়াছিল। লাঠি খেলা শিক্ষা করাও লাঠিয়াল বশীভূত রাখিবার দিকে তখনকার দিনে অনেকের নজর থাকিত। ভাল ভাল লাঠিয়ালরা বড় বড় জমিদারগণের নিকটেও বিশেষ সম্মান পাইত। জমিদারেরা তাহাদিগকে হাতে রাখিবার জন্য তাহাদিগকেও জমিদান করিতেন। এরূপ ভাবেও অনেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। ইহা ছাড়া জমিদারের বড় বড় কর্ম্মচারী, নায়েব গোমস্তারা অনেক সময় ফাঁকি দিয়া অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া নিজেরাই এক একজন সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়া বসিত।

ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সহিত আত্ম-প্রতিষ্ঠায় তৎকাল প্রচলিত উপায়গুলিতেই ক্রমে বাধা পড়িতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে রাস্তা ঘাট রেল, লাইন, ষ্টীমার লাইন, প্রভৃতির ফলে অনেকটা স্থানের দূরত্ব কমিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে অতি দূর প্রদেশ হইতেও সংবাদ আসিতে লাগিল। পরিচয় ভাঁড়াইয়া বিবাহ আজকাল একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা আজ কাঁথাত সহস্রগুণে দৃঢ়তর বন্ধনীয় মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। এখন আর সেরূপ মিথ্যা পরিচয়ে সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ বা উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ, আর কেহ করিতে পারে না।

এক্ষণে আর লাঠিয়ালী করা আইন-সঙ্গত নয়; কিংবা কে-আইনী করিয়া লাঠির সাহায্যে পরের সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেও, আইন আদালতের বিশাল প্রাহারার সম্মুখে তাহা ভোগ করা সহজ নয়। অবশ্য আইন আদালতের ফাঁক বাহির করিয়া কেহ কেহ সফলকাম হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে পরিশ্রমানুরূপ লাভ সব সময় হয় না। তার পর আইনের নানারূপ ব্যবস্থার ভিতর জমিদারগণের সে স্বাধীনতা, সে প্রভুত্ব, সে রাজ-গরিমা আর নাই। এখন সাধারণ খাজনা ছাড়া জমিদারদিগের অন্যান্য বহুপ্রকারের আয়ের পথগুলিও একেবারে বন্ধ হইয়াছে। ফলে জমিদান আজ লোপ পাইয়াছে, এবং নায়েব গোমস্তাদেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের ন্যায় অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিবার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে বাঙ্গালার জমিদারদের ভিতর য়ুরোপের ন্যায় শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার কোন দিন স্বীকৃত হয় নাই। অতএব অধিকাংশ জমিদারী ক্রমে বহু অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের আত্ম-প্রভুত্ব, আত্ম মর্য্যাদা বজায় রাখা ক্রমে কঠিন হইয়া পড়িতেছে। আজ সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিবার সহজ পন্থাগুলি লুপ্ত হইয়াছে। এখন উপায়। মানুষ নিজের দুরবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়া নীরবে তাহা বহন করিতে পারে না। যতক্ষণ জীবন থাকিবে ততক্ষণ আশা আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে মানুষকে নানা-রূপে নানা কার্য্যের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী কেবলমাত্র একটী অবস্থার সন্ধান পাইয়া তাহাই ধরিয়া বসিয়াছে। তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমরা এতগুলি কথার অবতারণা করিলাম।

গবর্ণমেণ্ট বলিতে যাহা বুঝায় তাহা য়ুরোপের একটা বিরাট সৃষ্টি। ঠিক এরূপ ধরণের শাসন পদ্ধতি এমন সর্ব্ব ব্যাপারের সুশৃঙ্খলিত ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পরিচালনা, পূর্ব্বে এখানে ছিল না। ইহার জন্ম প্রাচীন রোমে, এবং বর্ত্তমান য়ুরোপ বহু আলোড়নের পর আজ ইহাকে গণিত শাস্ত্রের মত প্রায় ভুল ভ্রান্তি শূন্য করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বহুবিভাগ প্রাচীন কালের ধর্ম্মের ন্যায়, আজ মানুষের

জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মনুষ্য জীবন আজ একরূপ প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্কিত। এরূপ ভাবে কাজ করা আমাদের দেশে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা আমাদের দেশের অতীত অবস্থার ক্রম বিকাশের ফল নয়। মুহূর্ত্ত মধ্যে এদেশে এক নূতন ধরণের ব্যবস্থা সমস্ত যেন গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। অতর্কিত আঘাতের প্রথম ধাক্কা কাটিয়া গেলে সকলেই বুঝিল বর্ত্তমান যুগে গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক ব্যতিরেকে আর কোনও কার্য্য হইবে না। জীবন ধারণই অন্তত হইবে। সাধারণ ব্যবসায় বাণিজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ জীবন যাপন, সমাজে পদমর্য্যাদা, প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, সমস্তেরই মূল সূত্র গবর্ণমেণ্টের হাতে। গবর্ণমেণ্ট এই সর্ব্বদেশবাসী সমাজের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

সমাজে আত্ম-সম্মান-প্রতিষ্ঠার প্রাচীন সহজ পন্থাগুলি রুদ্ধ হইবার সহিত লোকের নজর পড়িল গবর্ণমেণ্টের দিকে। গবর্ণমেণ্টেরও এই বিরাট রাষ্ট্র পরিচালন যন্ত্রটার জন্য লোকের দরকার। লোকে দেখিল গবর্ণমেণ্টের সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইতে পারিলে সমাজে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার এক নূতন উপায় সহজ লভ্য হইয়া আসে। দলে দলে লোক তখন গবর্ণমেণ্টের আসরে আসিয়া নামিতে লাগিল। দেশের জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল। যে দেশের সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বকার্য্য ছিল সমাজের অনুরূপ সে দেশেলোক ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়া সমাজকে দূর করিয়া আপনার স্বার্থের দিকে অবহিত হইতে লাগিল। কোম্পানীর চাকুরীরজন্য সকলে লালায়িত হইল। যে ভাবে চলিতেছিল তাহাতে সমাজের পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইত তাহা কে বলিতে পারে!

চাকুরীর যত অসুবিধাই থাকুক না কেন, একথা যে চাকুরীতে আভিজাত্য লাভের এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া দিয়াছে। চাকুরী দাসত্ব হইলেও, যে দাসত্ব যাহার কাছে করিতে হয়, তাহার সহিত আমার নিত্য সমাজের কোন সম্পর্ক নাই। মানুষ তাহার জীবনেরসর্ব্ব ব্যাপারের সহিত সম্পর্কিত নিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা চায়। চাকুরীর ক্ষমতা প্রভুত্ব, চাকুরী লব্ধ অর্থ, সেই চাকুরী প্রাপ্ত ব্যক্তিকে সমাজের যে উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে তাহাতে একটা তৃপ্তিআছে। তাহার আকর্ষণ, তাহার মোহ কাটান সহজ নয়। প্রথম প্রথম যখন সকলে চাকুরীতে যাইতে লাগিল, তখন সকলেই যে শুধু অর্থের জন্য যাইত, তাহা নহে; বরং অধিকাংশ লোকই তখন যাইত মান সম্ভ্রম লাভের আকাঙ্ক্ষায়, এবং প্রথম প্রথম সে আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে তৃপ্ত হইবার সুবিধাও ছিল।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চাকুরী দাসের সহিত আর একটা বড় জিনিষ আমাদের দেশে আসিয়াছে। সেটা ইংরাজী-শিক্ষা। গবর্ণমেণ্টের কাজ কর্ম্ম রক্ষা মুখ দ্বারা চলিতে পারে না। চাকুরী যাহাদিগকে দিতে হইবে তাহাদিগকে উপযুক্ত করিয়া হইতে হইবে; এই উদ্দেশ্যেই এ দেশে প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার আমদানী হয়। সে সময় যাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষায় বিরোধী ছিলেন তাঁহারা সংস্কৃত দ্বারা লোকে যে জ্ঞানার্জ্জনে অক্ষম হইত তাহা বলিয়া বিরোধী নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজী শিক্ষা না পাইলে দেশের লোক শাসন পরিচালন হইতে দূরে পড়িয়া থাকিবে। তাঁহাদের ধারণা এবং উদ্দেশ্য মন্দ ছিল বলা যায় না। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারাই যে এদেশবাসীর প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষের পথ পরিষ্কৃত হইবে; এই কথাটি ঠিক এই ভাবে সে সময় এক রাজা রামমোহন রায় ভিন্ন আর কেহই বোধহয় বুঝিতে পারেন নাই। শিক্ষা জিনিষটা গতিবিহীন প্রাচীন ভাবও ধারণার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে মানুষের অন্তঃকরণকেও গতিবিহীন, ও কর্ম্মশক্তিহীন করিয়া তোলে।

একথা এখনও বোধহয় সকলে স্বীকার করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ—নূতন জ্ঞানলাভ করিলে যে মানুষের মনে একটা আত্ম-সম্ভ্রম জ্ঞান জাগিয়া উঠে—আত্ম গরিমায় প্রাণমন পুরিয়া উঠে—শ্রেষ্ঠত্ব-বোধের তৃপ্তি পাওয়া যায়, একথা এখনও অনেকে বোধ হয় মুখে মানিয়া লইতে চাহিবেন না। কিন্তু কথাটার সত্যতা আজই অন্ধ দেশের অধিকাংশ লোকেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারিতেছেন। আমরা চাহিয়াছিলাম চাকুরী। শিক্ষাটা অতিরিক্ত অনুগ্রহ দানের মত আসিয়া, আমাদিগের জ্ঞানের পথ খুলিয়া দিয়াছে। আমাদিগের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের অবাধ গতিতে মুক্তিদান করিয়াছে, আমাদিগকে কল্যাণ ধারায় পুত করিয়াছে। চাকুরীতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম মানুষের অন্তঃকরণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য। ইংরাজী শিক্ষার প্রবল আকর্ষণ সেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার মহামহিমময় মূর্ত্তির সর্ব্ব্যাপক মোহ।

আজ চাকুরীতে প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা সুদূর হইলেও সকলের ভাগ্যে চাকুরী পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজের ন্যায় শিক্ষিত জনগণ লইয়া একটা নূতন শ্রেষ্ঠ বর্ণের একটা জ্ঞানগত আভিজাত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। প্রাচীন জাতিগত বিভাগ সেইরূপ হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় এখনও সমাজের অশিক্ষিত সকল কে রাখিয়াছে। কিন্তু সময়ের গুণে অশিক্ষিতদের ও জনসাধারণের ভিতর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহারাও শিক্ষিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলি ইংরাজী শিক্ষা যে পথে যে ভাবেই আসিয়া থাকুক না কেন, মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভের যে সহজ উপায় দেখাইয়া দিয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবাসী ইহার রস গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। ইহার যে ভাবে যত পরিবর্ত্তন এখন ইহাকে ভারতবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলপ্রসূ করিতে ও যত সংস্কার সাধিতই হউক না কেন। ভারতবাসী তাহা করিতে কৃত সংকল্প, কিন্তু মূলে ইহা কখনও ত্যাগ করিতে পারিবে না। অবশ্য সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন যে করিতে হইবে না তাহা বলি না।

একটা কথা এই যে বাঙ্গালী গোড়া হইতে চাকুরী না করিয়া ব্যবসায়ের দিকে যায় নাই কেন? অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলিতে হয়। বাঙ্গলায় বরাবর যাহারা ব্যবসায় বাণিজ্য করিত, তাহারা কোনদিনই সমাজে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন পায় নাই। অতএব মানুষের মূল আকাঙ্ক্ষা যখন প্রতিষ্ঠালাভ, তখন যে কার্য্যে তাহা হইবে না সে কার্য্য করিয়া সে পণ্ডশ্রমের ভাগী হইতে যাইবে কেন? বণিক সম্প্রদায়ের সামাজিক পরিণত দেখিয়া সম্ভবতঃ বাঙ্গালী বাণিজ্যের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। দ্বিতীয়তঃ—ব্যবসায়ের ফলাফল কতকটা নিশ্চিত ব্যবসায় করিতে যাওয়া কতকটা ভাগ্য পরীক্ষার মত। ব্যবসা কতকটা জুয়াখেলার মত;—ব্যবসায়ে জুয়াখেলা আকর্ষণ আছে,—আবার এই কারণেই ব্যবসায়ের প্রতি জুয়াখেলার ন্যায় বিতৃষ্ণা আশা সম্পূর্ণ সম্ভব। বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার কার্য্য-কারণ সব বিশ্লেষণ করিতে গেলে স্বতঃই মনে হয়, বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে জুয়ার তীব্রতা বিদ্যমান নাই। বাঙ্গালী পল্লীগ্রামের শান্তিপূর্ণ নীড়ে অবস্থানুরূপ ব্যবস্থায় সুখশয্যা রচনা করাইয়া সমধিক তৃপ্তিকর বলিয়া বিবেচনা করে। বাঙ্গালীর এ প্রবৃত্তি এখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়। ইহার ফলে ভবিষ্যতে কি হইবে, বাঙ্গালী কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, সে কথা জোর করিয়া বলা কঠিন। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, স্বার্থান্ধ আকাঙ্ক্ষার অত্যুগ্র আবেগে বাঙ্গালী অন্তঃকরণ চাঞ্চল্য অভিভূত হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বাঙ্গালীর স্থৈর্য্য নষ্ট হয় নাই। তাহার আকাঙ্ক্ষা

এখনও সেই পারিবারিক বিশুদ্ধতার সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত হইয়া আছে। বাঙ্গালী তাহার মধ্যদিয়া স্থির ধীর শান্ত প্রকৃতির আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাহার পূর্ব্বের অনেক মলিনতা দূর হইয়া যাইতেছে। হয়ত এইভাবে একদিন তাহার একটা নিজস্ব সত্তা বিরাট মূর্ত্তিতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে।

শোক-সংবাদ।

আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক রাখালরাজ রায় মহাশয় ৫৩ বৎসর বয়সে বিগত ২রা পৌষ তারিখে মারা গিয়াছেন। তিনি মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমাবাসী ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বি এ পাশ করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় এম এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে কলিকাতায় আসিয়া রাখালরাজ পরীক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। সে সময় তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ী তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করেন —বালকদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার ও বান্ধব পরীক্ষকদিগের নিকট পরীক্ষা দিবার আবশ্যকতা যে নাই তাহা কেহ তাঁহাকে বুঝাইতে পারেন নাই। সে সময় বন্ধুবর অমূল্য বিদ্যাভূষণের সহিত ভাষাতত্ত্ব লইয়া তাঁহাকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের জন্যই তিনি পরীক্ষা দিয়াছিলেন, এবং ৫০ বৎসর বয়সে এম্, এ উপাধি লাভ করেন। তারপর এই তিন বৎসরকাল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ্চ স্কলারশিপ পাইয়া, তিনি বঙ্গভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। বহু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ সকল পাঠ করিলে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা বেশ বুঝা যায়। আশা করি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা সেগুলি মুদ্রিত করিয়া ভাষা-জননীর রাতুল চরণে উপহার দিবেন।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane and Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.

মা'ন-ভঞ্জন।

Mahila Press, Cal.

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

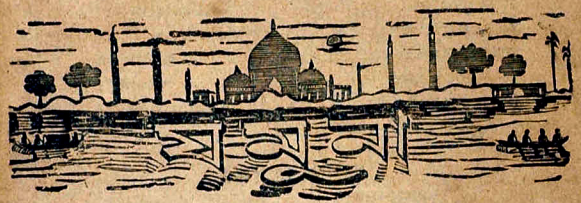

১৩শ বর্ষ, } চৈত্র, ১৩৩০ { ১২শ সংখ্যা

আমার গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

সৌবনেরি তান ধরিগো,
ধরার মরুতে,
ফুটিয়ে তুলি পলাশ-কলি
শুক্‌নো তরুতে!
সকাল দুপুর সাঁঝের বেলা,
সমান চলে সুরের খেলা,
জল্‌সা নিয়ে মন যে মাতিল,
চায়না জিরুতে—
গাইচি আমি ধরার মরুতে।

গানের দোলা দুল্‌চে কেবল
বিপুল পুলকে,
ছন্দে তোলে হিন্দোলিয়া
অন্ধ ভুলোকে!

নয় বেহাগের কাতর সাধন,
নেইকো বুকে শোকের কাঁদন,
জাগিয়ে তানে দখিন বাতাস
উড়োই ধুলোকে—
আকুল-করা বিপুল পুলকে!

সুরের আগুন জল্‌চে আমার
চিত্ত-মশালে,
হৃদয়-নাটে কোন্ ঝ্যাপা এ
নৃত্য বসালে!
বঙ্গ-শিরা তন্ত্রী ক'রে,
তন্দ্রাহারা যন্ত্রী ওরে,
অগ্নি-বীণের গিট্‌কিরিতে
স্বপ্ন খসালে,
দীপ্তি-গীতি চিত্ত-মশালে!

রক্ত-স্রোত-বহ্নি-ডাকায়
মত্ত রাগিণী,
মানসী মোর হয় চকিতে
ক্রুদ্ধ নাগিনী!
বিশ্বে যারা নিঃস্ব হয়ে,
কাঁপ্‌ছে ভয়ের শিষা হয়ে,
মর্‌তে তাদের মন্ত্রে কোন
দুঃখ রাখি-নি—
হিংস্র এ মোর ক্রুদ্ধ রাগিণী!

ওগো আমার গানের ঠাকুর,
তোমার লীলাতে,
জ্যান্ত প্রাণের মর্ম্ম জাগে
শুষ্ক শিলাতে,
আস ননিয়ে সুরের রথে,
এগিয়ে চলি অসীম পথে,
যৌবনের এই দীপক-শাখা
ধরায় বিলাতে—
রুদ্র তালের দৃপ্ত লীলাতে।

সদাশিবের দপ্তর

অভাব ও দুঃখ

(শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এমবি, এ, সি লণ্ডন)

রামচন্দ্রের অভাবে অযোধ্যার অধঃপতন হইয়াছে; অলকের অভাবে ফ্রান্সের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুদ্ধ বিস্তায় দগ্ধ পড়িয়াছে; একতার অভাবে ভারতবাসীর স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, পরহিত-ব্রতের অভাবে গ্রেস মরিয়াছে, ধর্ম্মের অভাবে ট্রয় ধ্বংস হইয়াছে, আর আমার উমার অভাবে আমার সুদৃশ্য কাঞ্চের তক্তাপোষখানি ছারপোকারূপ প্রেতাধিকার ভুক্ত হইয়াছে। যত বড় সামগ্রীই হউক না কেন, তাহার দরকারী কোন কিছুর একটু অভাব হইলেই বিপর্য্যয় ঘটে—কল বিগড়াইয়া যায়। এমন কৌশল বিশিষ্ট মনুষ্য দেহ একটু বায়ুর অভাবে অচল হইয়া যায়। ৬০ ঘোড়ার ক্ষমতাযুক্ত ষ্টীম এঞ্জিন সেও একটু জলের অভাবে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় গড়াগড়ি যায়। জগতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া কেহই কোন সামগ্রী গড়িতে পারে না; সম্পূর্ণতা সংসারের ধর্ম্ম নয়। ত্রিভুবনপতিও বোধ হয় সকল দ্রব্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন না। প্রত্যেক পদার্থেরই অভাব আছে। তুমি ধনের কাঙ্গাল, জয়চন্দ্র সুখের কাঙ্গাল, হরিদাস উচ্চপদের কাঙ্গাল, রাধামাধব সম্মানের কাঙ্গাল, রমণীরঞ্জন সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল, হরিহর ভাল কথার কাঙ্গাল, লক্ষ টাকা থাকিলেও বামুন কাঙ্গাল, আর আমি একটু হাসির কাঙ্গাল। বল্ ত ভাই কোন কাঙ্গালকে কখনও সুখী দেখিয়াছ? দেখিতে পার না, কারণ যাহার অভাব রহিল তাহার সুখ কোথায়? কামাবস্তুর অভাব মোচনের নামই সুখ। সর্ব্বশক্তিমান্ জগতের সর্ব্ব জীব ও পদার্থকেই সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু নিখুঁত করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। পারিলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতে আপত্তি ছিল না। তিনি আমার অভাব মোচন করিতে কেন অসমর্থ? প্রথমতঃ তিনি অভাব দিলেন কেন? ভাল, দিলেন যদি, তবে তাহা মোচন করিলেন না কেন? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে অবশ্যই কামাবস্তু আমার হাতে দিতেন, কিন্তু তাহা ত তিনি করেন নাই; সুতরাং হয় তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নন, না হয় ইচ্ছা করিয়া আমাকে অভাবশূন্য করেন নাই। তিনি ইচ্ছাময়! তিনি ইচ্ছা করিয়া আমাকে সুখী করেন নাই, আমার অভাব মোচন করেন নাই, এ কথাটায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না? জানি না কেন তাঁহাকে লোকে 'ইচ্ছাময়' বলিয়া থাকে। যদি নিজ হস্তের সামগ্রী, যাহাতে নিজের গুণপনা প্রকাশ করিবার সুবিধা অধিক, তাহাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে পারেন না, তখন গঠন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই কি তার বাতুলতা নয়? আর, না হয় বলিতে হয়, তিনি স্বকার্য্য সাধনে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

আমার নিপাতসাধন তাঁহার অভিপ্রেত, সুতরাং আমি যাহা চাহি তাহা আমাকে দিবেন কেন? যাহার বিনিময়ে প্রাণ দিতে পারি তাহাকে আমি পাই না কেন? দার্শনিক তুমি বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিতেছ, যাহা হইবে না তাহার জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও নিষ্ফল হইবে। তিনিই কর্ত্তা আমরা উপলক্ষ মাত্র, তিনি আমাদিগকে যাহাতে নিযুক্ত করেন তাহাই আমরা করিয়া থাকি,—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" বেশ কথা! আমি বলি তোমার ইচ্ছাময় মনে করিলেই ত, আমি যাহাকে টানি—প্রাণ দিয়া ভালবাসি—যাহার সহিত মিলনের জন্য ব্যগ্র হই—তাহার সহিত মিলন ঘটাইয়া দিতে পারিতেন। সেও আমাকে টানে, উভয়ের মধ্যে এক আকর্ষণী শক্তি আছে এবং সেই হেতু উভয়ে উভয়কে ডাকিতেছি; ডাকিতেছি অথচ মিলিতেছি না। কেন মিলি না! যদি মিলিত হইব না ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতে জানিতেন, তবে এমন আকর্ষণীশক্তি তাঁহাকে কে দিতে বলিয়াছিল? এটা অবশ্যই আমার নিপাতের জন্য! এই একের অভাবে আমার সব নষ্ট করিবার জন্য, তাঁর দেখছি প্রাণপাত চেষ্টা। তাহা হইলে—আমার প্রাণপ্রিয়কে পাইলে—আমার সব দিক যে বজায় থাকিত।

সংসারে কেহ দুঃখী, কেহ সুখী। এরূপ করিবার বিধাতার উদ্দেশ্য কি? সংসারে পাঁচ রংএর সুতার প্রচলনের আবশ্যকতা যে, কি তাহাও আমি বুঝি না। সকলকে সুখী করিলে কি তিনি অসুখী হইতেন? একজনকে সুখ দিয়া, অপরকে দুঃখ দিয়া যদি উভয়ের আচরণ পরীক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার রুচির প্রশংসা করিতে পারিব না। যাহা হউক তিনি স্বয়ংই ধরা পড়িয়াছেন। মানুষকে তুলাদণ্ডে বসাইতে গিয়া তিনি নিজেই তাহাতে বসিয়া পড়িয়াছেন। যদি তিনি সকলই করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মনুষ্যকে আপনার সমস্ত শক্তি প্রদান করাই তাঁহার উচিত ছিল। আমার বোধ হয় এরূপ করা তাঁহার ক্ষমতাধীন নয়। বালক আপনার মত করিয়া পুত্তলিকা গড়িতে পারে সত্য, কিন্তু যাহার অভাবে পুত্তলিকা পুত্তলিকা থাকিয়া যায়—মানুষ হইতে পারে না—তাহা দিতে পারে না। তিনিও তাই পারেন নাই।

তিনি যদি সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্ট জগতে ও মানুষের সৃষ্ট জগতে সংঘর্ষ ঘটতে পারিত। আর জগতে কে এমন মহাপ্রভু আছেন, যিনি আপনার শক্তি বিলাইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়েন। মানুষ ত প্রাণ থাকিতে শক্তির কণামাত্রও পরকে দিতে পারে না। বাইবেলেতে বলে, "তিনি মানুষকে তাঁর প্রতিচ্ছবি (image) করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন," কথাটা ত দেখিতেছি ঠিকনয়। তিনি অপূর্ণ তাই তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্যও অপূর্ণ। কিন্তু লোকে তাঁহাকে "পরিপূর্ণ আনন্দং" বলিয়া থাকে। একথাটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যে পরিপূর্ণ, সে কখনও অপূর্ণ করিয়া কোনও সামগ্রী রচনা করে না বা করিতে পারে না। আপন কার্য্যে আপনার শক্তির ও কৌশলের পরিচয় দিতে কি কখন কেহ কৃপণতা করে? ঈশ্বরও যে তাহা করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। তাঁহার প্রচুর সামগ্রী অভাবে পূর্ণ, সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে তিনিও স্বয়ং অভাবযুক্ত। এমনও হইতে পারে যে তিনি ইচ্ছা করিয়া এই অভাব রাখিয়াছেন। অবশ্য তিনি জানেন যে, অভাব আমাদিগের ঈপ্সিত নয় এবং এই হেতুই জগতের সমুদয় দুঃখ। তবে জানিয়া শুনিয়া তিনি এরূপ অভাবযুক্ত এবং দুঃখময়

জগৎ সৃজন করিয়াছেন। কথাটা যদি সত্য হয়, তবে তাহাকে দয়াময় বলিব কেন?

বাঞ্ছিত সামগ্রীর অভাবে যে দুঃখ হয়, তাহা ছাড়া আরও নানা প্রকারের দুঃখ আমাদিগকে আক্রমণ করে—বিব্রত করে; কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, অভাবই দুঃখের জনক। মানসিক ও দৈহিক দুঃখ অভাবজাত। যে কণ্টির জন্য দরখাস্ত করিলাম তাহা হইল না। যাহাকে পাইবার জন্য প্রাণপণ করিলাম তাহাকে পাইলাম না। এত করিয়াও ইহা পাইলাম না—উহা পাইলাম না, ইত্যাদি 'পাইলাম না'র, যে অন্তর্দাহকারী জ্বালা, তাহাই দুঃখ। আর অম্ল অরে ও কলা কাশ রোগে কষ্ট পাইতেছি, উহার স্লেটকটা বড় দুঃখ দিতেছে ইত্যাদি দৈহিক দুঃখের দৃষ্টান্ত। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন শরীরের কোনও সামগ্রীর অভাবে এই সকল বৈলক্ষণ্য ঘটে। পাকস্থলীতে, বৃহদন্ত্রে বা ক্ষুদ্রান্ত্রে যদি "হোরিণ" রসের অভাব হয় (অর্থাৎ লবণ ভক্ষণ না করিলে যে অভাব হয়) তাহা হইলে পেটে কৃমি রোগের উৎপত্তি হয়। কৃমি রোগে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হয় সন্দেহ নাই—অভাবই সেই কষ্টের হেতু। মন কিন্তু তাহাতে সুস্থির থাকে কি? থাকে না, কারণ শরীরের সহিত মনের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুতরাং এই উভয় প্রকার দুঃখ মানসিক দুঃখের অংশ অধিক, শারীরিকেরও অংশ নিতান্ত যে অল্প তাহাও বলিতে পারি না। যে দিন দশ সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজগুলা দিগম্বর হারাইয়া ফেলে, সে দিন বা তাহার পরেও সে যে অভাত আহার গ্রহণ করে করে নাই একথা বলিতে পারা না, তথাপি তাহাকে শীর্ণ দেখাইত। এই ঘটনার পর হইতে সেও দুর্ব্বল হইয়াছিল বলিয়া ধীরে ধীরে চলিত, বসিলে উঠিতে পারিত না, সর্ব্বদা মাথা ঘুরিত। ইহার কারণ মানসিক দুর্ব্বলতাই তাহার শরীরকে দুর্ব্বল করিয়াছিল। উভয়ের ভিতর এমন নিকট সম্বন্ধ থাকিতেও লোকে আত্মাকে পৃথক সামগ্রী বলে, আত্মাকে শরীর-জাত বলিলে পাগল বলে। এক বধির তাহার স্ত্রীকে ডাকিল, গৃহিণী তখন কার্য্যান্তরে গিয়াছিল কাজেই উত্তর দিতে পারে নাই। বধির আবার ডাকিল, গৃহিণী উত্তর দিলেন; কিন্তু সে শুনিতে পাইল না, অবশেষে সে বলিল "গিন্নি নিতান্ত বধির, এটাই ওর বড় দোষ নহিলে সুন্দরী বটে।" এইরূপে অনেক সময় লোকে নিজের দোষ বুঝিতে পারে না। শরীর ও আত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় করা বড় সোজা কথা নয়।

শারীরিক দুঃখ ও মানসিক দুঃখ উভয়েই মনুষ্যের অভ্যন্তর হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহাদিগকে "আধ্যাত্মিক" বলা হয়। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ হেতুজাত দুঃখ ভিন্ন, আর এক প্রকার দুঃখ আছে—যাহা বাহ্য হেতুজাত। ইহাকে আমরা "অনাধ্যাত্মিক" বলিয়া অভিহিত করিলাম। জগতের স্থাবর জঙ্গম দ্বারা যে সকল দুঃখ জন্মিতে পারে উহারাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিতেরা ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। সর্প দংশন জনিত কষ্ট বা দুঃখ আধিভৌতিক; এ শ্রেণীর দুঃখেরও কারণ সেই অভাব। সর্প দংশনে শরীরের শোণিতের অম্লজান দুষ্ট এবং নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং অভাব আসিল। অম্লজানের অভাবে শরীরের কষ্ট অবশ্যম্ভাবী; এমন কি সম্পূর্ণ অভাবে মৃত্যুও হইতে পারে। সর্প দংশনজনিত কষ্টেও মনের যে ক্লেশ হয় না তাহা নয়। শরীরের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ হেতু মনে উৎকণ্ঠা আশঙ্কা প্রভৃতি উপজাত হয়। তথাপি লোকে বলে আত্মা ও শরীর দুইটি পৃথক সামগ্রী।

যক্ষ-রক্ষ—গন্ধর্ব্ব—গ্রহ—উপগ্রহ প্রভৃতির অনুষ্ঠিত দুঃখকে পণ্ডিতেরা আধিদৈবিক দুঃখ বলেন, এবং এ বৎসর তুমি শনির কোপে পড়িয়াছ সুতরাং যে ডাল ধরিবে তাহাই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তুমি শারীরিক ও মানসিক নানা কষ্ট পাইবে। এ প্রকার দুঃখ হইতেও জগতে বিস্তর লোক কষ্ট পায়। যক্ষ রক্ষ

গ্রহেরা যে কি চান তাহা জানা যায় না বলিয়া অনেক সময় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। তাহাদের অভাবটা যে কি তাহাও বুঝিয়া ওঠা অনেক সময় যায় না। যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বকে ছাড়িয়া দিলেও গ্রহাদির যে আমাদের উপর প্রভাব আছে—সুদৃষ্টি বা কুদৃষ্টি আছে—একথা প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা মানিয়া আসিতেছেন। ধরুন তিথি বিশেষেই আমাদের শরীর রসস্থ হয়—শরীরের একটা অভাব হয়। উহাই দুঃখ। আর গ্রহ উপগ্রহেরা কি ভাবে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, তাহার সঠিক, বিবরণ জানা না থাকিলেও একথা বোধ হয় বলা অসঙ্গত হইবে না যে, উহারা একটা চাঞ্চল্য—একটা অভাবের সৃষ্টি করে। অতএব দেখা গেল, যে অভাবই সকল প্রকার দুঃখের হেতু; সুতরাং তদ্বিপরীত যে সুখ তাহা কাম্য-বস্তুর অভাব মোচনে যে উৎপন্ন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অভাব না থাকিলে যে সুখ হয় তাহার অপেক্ষা আরও একটি সুখের চরম অবস্থা আছে কিন্তু এখন সে কথা থাক্।

শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য

(শ্রীনলিনীকান্ত দে)

আজ ফাগুনের মুকুল সাথে
উঠুক মোদের চিত্ত ভরি,'
বঙ্গবাণীর দেউল মাঝে
তোমায় আমি বরণ করি।
শ্রদ্ধা-প্রীতির পুষ্পরাশি
অঞ্জলি আজ দিলাম তোমায়,
সিক্ত করি' চরণ তোমার,
আনন্দেরি অশ্রুধারায়।

গ্লানির তিমির আজ্‌কে নাশ'
বিমল হাসির উজল রাগে,
সব ক'টা ফুল ফুটিয়ে তোল'
শুক্‌নো হিয়ার গোলাপ-বাগে
বরণ করি কর্ম্মী তোমায়
বরণ করি জ্ঞেষ্ঠ ব'লে,
সকল ত্রুটির মার্জ্জনা ভাই
বন্ধু তোমার চরণ তলে। *

পরিচয়

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র)

শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন,

আজ তোমার সম্বর্দ্ধনায় আমি যে কতদূর আনন্দ লাভ করিয়াছি—তা তুমি ছাড়া অনেকে বুঝিতেই পারিবে না। কারণটা ইঙ্গিতে একটু বলি। সে আজ বিশ বছরের আগের—১৩১১ সালের—কথা, যে দিন প্রথম তোমার সহিত পরিচিত হই। তখন আমি গম্ভীর প্রকৃতির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিরত শিক্ষক। মাতৃভাষার সেবাকেই তখন আমি

* একাদশ বার্ষিক মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নলিনীরঞ্জন-সম্বর্দ্ধনা-সভার প্রেরক কর্ত্তৃক পঠিত।

জীবনের ব্রত করিয়াছি। যৌবনের সীমারেখা বহুদিন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ের সীমানায় প্রবেশ করিয়াছি; আর তুমি কৈশোর-যৌবনে সন্ধিস্থলে। যৌবনের উদ্দাম নেশায় ভরপুর—যৌবনের মাদকতায় তোমার প্রাণটা মসগুল। আনন্দের হাসিতে তোমার আনন উজ্জ্বল। তখন তোমাতে-আমাতে ব্যবধান ছিল খুব বেশী; কিন্তু তুমি আসিলে হাতে নিয়ে তোমার সম্পাদিত 'জাহ্নবী'। স্বপ্নেও তখন ভাবি নাই, আমার মাতৃভাষাকে অকপট প্রাণে একজন নিঃস্ব দরিদ্র যুবক এমন ভালবাসিতে পারে। তখনকার দিনে কাগজ বাহির করা লাভের ব্যবসা ছিল না। প্রথম দর্শনে বুঝিতে পারি নাই এটা তোমার খেয়াল কি না—কিংবা তুমি নামের কাঙাল। তাই তখন তোমায় বুকে করিয়া টানিয়া লইতে পারি নাই;

একনিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধু শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

কিন্তু তোমার প্রথম আলাপের সহজ, সরল ভঙ্গীতে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

তারপর যখন আমাদের সম্পাদিত ক্ষুদ্র 'বাণী'-তরণীখানি ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া বানচাল হইবার উপক্রম হইল, তখন তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সাহায্য করিবার জন্য আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে—আমাদের সহায়ক হইলে—আমাদের মুখ রাখিলে, তখন বুঝিলাম তোমার অকপট সাহিত্য সেবার গভীরতা।

তারপর যখন দেখিলাম দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া, লজ্জা মান-ভয়কে উপেক্ষা করিয়া, জীবনপথ সগর্ব্বে চলিতেছে—হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ, ব্রাহ্মণশিরকে তুমি অর্থ ও অভিজাত্যের পদে নত হইতে দিতেছ না—যখন দেখিলাম, প্রলোভন-আলেয়ার শিখা তোমাকে আদর্শপথ হইতে বিপথে লইয়া যাইতে পারিতেছে না, তখন সম্ভ্রমে তোমার দিকে মস্তক নত হইয়া পড়িল।

তারপর ১৩১৫ সালে যখন দেখিলাম তুমি আর্ত্তের বন্ধু—আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিয়া রুগ্ন বন্ধুর সেবা করিতেছে—যখন দেখিলাম বন্ধু নয়, জাতি নির্ব্বিশেষে সেবাধর্ম্মকে তুমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় করিয়া লইয়াছ, হে কর্ম্মী, হে বন্ধু, হে দয়িত; সেই দিন তোমার-আমার ভিতর প্রথম সাক্ষাৎ দিনের যে ব্যবধানটা ছিল সেটা দূর হইল। তোমার স্থান হইল আমার বুকে। সেইদিন হইতে তুমি আমার সখা।

তোমার প্রাণটা যে কত উঁচু তা তোমায় যিনি ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা পাইয়াছেন তিনিই জানেন—তোমার হৃদয় নিহিত অন্তঃসলিলা প্রেম-ফল্গুর যিনি সন্ধান পাইয়াছেন তিনি ধন্য হইয়াছেন—আর যিনি সেই কর্ম্মর উপরের বালিস্তূপ দেখিয়া, তোমার স্পষ্ট কথার ঝাঁঝ পাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তিনি সে সন্ধান পান নাই। পরার্থে তোমার জীবন উৎসৃষ্ট।

তোমার বাগ্মীতা, তোমার হৃদয়ের শুচিতা, তোমার ভাষা জননীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, তোমার সত্যনিষ্ঠা, তোমার কুশলতা, তোমার পরোপকার করিবার বাসনা, ও মুক্ত হস্তে দান, মঙ্গলপ্রসূ সদনুষ্ঠানগুলির প্রতি তোমার মমতা, সর্ব্বোপরি তোমার উদারতা, সর্ব্বদা সর্ব্বজনের আদর্শ হইবার উপযুক্ত।

কথা উঠিতে পারে তুমি সাহিত্যের কি করিয়াছ, যাহাতে সম্বর্দ্ধনার অধিকারী হইতে পার? মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষৎ কেন তোমাকে সম্মানিত করিতেছেন? উত্তরে কেবল মাত্র 'বন্ধুপ্রীতি' বলিলে বলিতে পারিতাম—বলিতে পারিতাম মেদিনীপুর-সাহিত্য পরিষদের সর্ব্বাঙীন মঙ্গল-কামনার জন্য তোমার প্রাণপাত চেষ্টার পুরস্কার তোমার সাহিত্যিক বন্ধুবর্গ তোমায় দিতেছেন। তা নয় বন্ধু তা নয়। কৈফিয়ৎটা আমার যা মনে হয় প্রাণ খুলিয়া বলি। এই নব-জাগরণের দিনে তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশের প্রাণে একটা চেতনা আসিয়াছে। সেই চেতনা—সেই ভাবটা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে মেদিনীপুরের সাহিত্যপরিষদের অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে। মাননীয় পূজনীয় আচার্য্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-প্রমুখ সাহিত্যিকদের হৃদয়-সূত্রের যে ভাবের লহর উঠিয়াছিল, তাহা মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদ্ কূলে আসিয়া পৌঁছিবা মাত্র, এখানকার অন্তরীয়া সে ভাবকে মূর্ত্তি দিয়া প্রাণবন্ত করিয়াছেন। জগতে মনীষীর পূজাই সর্ব্বত্র হয়। কর্ম্মীর পূজা কে করে? মনীষী ভাবের সন্ধান দেন। ভাবকে কর্ম্মের দ্বারা যে সফলতা দান করে সে কি বরণীয় নয়? যে সাহিত্যসেবীর অক্লান্ত সেবক, যে অমানীকে মান দান করিতে ব্যগ্র, যে অকিঞ্চন সাহিত্যের সাধককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সাহিত্যসাধনায় উদ্বুদ্ধ করে সে কি বরণীয় নয়? আর একটা কথা, সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবার দিক হইতে দেখিলেও আজীবন বন্ধু তুমি ত অন্যের ন্যায় ভাষা-জননীকে সেবা করিয়াছ, তাহার কি পুরস্কার নাই? তুমি মাতৃভাষাকে কি দিয়াছ তাহা দেখিয়া তুমি সম্বর্দ্ধনা পাইবার উপযুক্ত কি না তাহার বিচার করা চলে না—যদিও তুমি যাহা দিয়াছ তাহা অকিঞ্চিৎকর নয়। তোমার শ্রদ্ধার দান বঙ্গভারতীর রাতুল চরণে চির-উজ্জ্বল থাকিবে, ইহা আমার বিশ্বাস। তোমার 'কান্ত কবি

রজনীকান্ত' পড়িয়া রজনীকান্তকে বাঙ্গালী চিনিবে, বুঝিবে, সমাদর করিবে। তাঁহার 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায়' তুলিয়া লইয়া বাঙ্গালী ধন্য হইবে—আপনার জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে করায়ত্ত করিতে ছুটিবে। সে শুভদিন আগত প্রায়। আর একটা কথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ইংরাজী কবি 'গ্রে' একটী কবিতা Elegy লিখিয়া অমর; বাঙ্গালার স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র রায়, 'কতকাল পরে, বল ভারত রে দুঃখ সাঁতারি গায় হবে' ও 'নির্ম্মল সলিলে বহিছে সদা তটশালিনী সুন্দর নয়নে' দুইটি গীত রচনা করিয়া অমর; কে বলিতে পারে ভবিষ্যতে নলিনীরঞ্জন সেইরূপ হইবে না। অবশ্য ইহাও মনে রাখিতে হইবে এখনও নলিনীরঞ্জনের শক্তির উৎস শুষ্ক হয় নাই। এই সম্বর্দ্ধনা তাঁহাকে সাহিত্য-সেবার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট যে করিবে - সাহিত্য-সাধনায় উদ্বুদ্ধ যে করিবে—তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি।

এস ভাই, আজ যে যশ তুমি অর্জ্জন করিলে তাহাতে তুমি গর্ব্বিত হইবে না জানি—বন্ধুবান্ধবদের শুভাশীষ তুমি নত-মস্তকে গ্রহণ করিবে জানি; কারণ তুমি ও আমি যে একই গুরুর শিষ্য। সেই স্বর্গগত আশু-ভোলা, স্থিতধী ব্যোমকেশদা'র আদর্শ হইতে তুমি কখনও বিচ্যুত হইবে না। জান ত ভাই তিনি শোকেও কোন দিন বিহ্বল হন নাই, আনন্দেও কোন দিন আত্মহারা হন নাই। সুখ দুঃখকে ভগবানের অযাচিত দান বলিয়া তিনি গ্রহণ করিতেন। তুমিও ঠিক সেইভাবে এই সম্বর্দ্ধনাকে গ্রহণ করিবে। তাঁহার আদর্শকে লক্ষ্য রাখিয়া যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে। তোমার পথ মঙ্গলযুক্ত হউক। স্বর্গ হইতে তোমার মস্তকে তিনি শুভাশীস্ দান করিতেছেন। তোমার সাহিত্য-সাধনা জয়যুক্ত হউক। *

* একাদশ বার্ষিক মেদিনীপুর-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নলিনীরঞ্জন সম্বর্দ্ধনা সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মানস পূজা

(গান)

[শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল]

নাথ, আর যে আমি
ডা'কব না ভাষায়;
তোমায় যে পাইনা সাড়া
ছন্দে সুরে গাঁথায়।
এবে আমি নীরব হ'ব
মনের তলে তলিয়ে যাব;
দেখি যদি ধরা যায়।

প্রতিমা মম জগৎখানি
বিশাল বিরাট্ মূর্ত্তিখানি
মম মম, নীরবতা,
পূজা মানসময়।
(মম) আঁখিপরে, রবি শশী,
হৃদয় মাঝে উজল দিশি,
আরও জ্যোতির্ম্ময়

পাহাড়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদার]

পাহাড়ীদের ভাষা। পাহাড়ীদের ভাষা বিমিশ্র ভাষা। তাহাদের শব্দমালা কতক নেপালি, কতক হিন্দি, কতক বাঙ্গলা, কতক বা উড়িয়া। অনেক শব্দ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ। পাহাড়ীদের যে শব্দগুলির অন্য কোন দেশীয় কোন শব্দের সহিত সাদৃশ্য নাই সেই গুলি খাঁটি পাহাড়ী শব্দ। নিম্নে প্রদত্ত শব্দ তালিকা হইতে পাহাড়ী ভাষার উপরি বর্ণিত প্রকৃতির কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা পাহাড় অঞ্চলে বেড়াইতে যান অথচ পাহাড়ী ভাষা বোঝেন না, প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এই তালিকাভুক্ত শব্দগুলি জানা থাকিলে সে অসুবিধা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইতে পারে।

শব্দ তালিকা

বিশেষ্য পদ

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাচক

মাথার চুল—কেশ, কপাল
মাথা—টাউকো
মাথার খুলি—খপর
মাথার খি—গিডি
কপাল নিধার
রগ্—কাণপট্
কাণ কাণ
চক্ষু -আঁখা
চক্ষের পাতা—পলক
চক্ষের পাতার চুল—পরেলা
ভ্রূ -আঁখি ভুঁই

নাক—নাক
গাল—গালা
কাঁধ—কুম্, কাঁধ
গলা—ঘিস্‌রো
কণ্ঠা—শ্বকালি হাড়
মুখ গহ্বর—মুখ
মুখ—মোহোঁড়া
গোঁফ—ঝুম্বা
চিবুক—চিউঁড়া
দাড়ি—দারি
গলার নলি—ধোক্রো
জিহ্বা—জিব্রো
দাঁত—দাঁত (এক বচন) দাঁত হরু (বহু বচন)
দাঁতের মাড়ি—গোঁজা
চোঁয়াল—বংরা
বুক—ছাতি
পিঠ—আং, পিঠু
পেট—ভুঁড়ি
তল পেট—সানু ভুঁড়ি
নাড়িভুঁড়ি—আঁদ্রোহরু
কোঁক—পানি পেট
পাঁজর—করঙ্গ
নাভি—নাইটো
বগল—কাঁখি
বাহু—পাকুরা
হাত—হাত
কনুই—কুইনা
হাতের কব্জা—নারি

নাড়ী, শিরা—নসা

(হাতের কব্জাকে নারি বলে, পায়ের খিলকে গুলি গাঁঠা বলে, হাঁটুকে ঘড়া বলে। কিন্তু খিল বা কব্জায় সাধারণ নাম নসা।)

করতল—হৎকেলা
করপৃষ্ঠ—হৎকিয়ানা
আঙুল—ঙংলা
নখ—নঙ্
লোম—রুং
কোমর—কখর
পাছা—চাক্
উরু—তিখরা, জাং
হাঁটু—ঘুঁড়া
জঙ্ঘা—নলি হাড়, নলি খুঁটা
পায়ের ডিম—ছেপারি
পায়ের খিল—গুলিগাঁঠা
পা—খুঁটা
গোড়ালি—কুরকুচা
পদপৃষ্ঠ—গোড়া, লামখুঁটা
পদতল—পাঁয়তালু
শরীর—জিউ
পায়ের চামড়া—ছালা, বালো

সম্বন্ধ বাচক

বাবা—বাবু, বা
মা—আম্মা
খুড়া—কাকাবাবু
জ্যেঠা—জ্যেঠাবাবু

(খুড়া এবং জ্যেঠা উভয়কেই বাবু বলা হয়, কিন্তু সেই বাবুর পূর্ব্বে একটী বিশেষণ থাকে। অর্থাৎ খুড়া বাপের মেজ ভাই, সেজ ভাই বা ছোট ভাই হইলে যথাক্রমে মাইলা বাবু, সাঁইলা বাবু, কালা বাবু ইত্যাদি। জ্যেঠা সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম, সাঁইলা জ্যেঠা বাবু, কাঁইলা জেঠা বাবু, মাইলা জ্যেঠা বাবু, জ্যেঠা বাবু ইত্যাদি)

খুড়ি—কাহি আম্মা, সাঁইলি আম্মা ইত্যাদি।
জ্যেঠি—জ্যেঠি আম্মা, মাইলি জ্যেঠি আম্মা ইত্যাদি

(বলা বাহুল্য যে এই আম্মা শব্দ সংস্কৃত অম্বা শব্দের রূপান্তর)

মামা—মামা
মামি—মাইজু
মেসো—চবাজু, কালা বাবু
মাসি—ছেমা
পিসে—পাজু
পিসি—ফুপু, নিনি
দাদা—দাজু
দিদি—দিদি
স্বামী—লোগে
স্ত্রী—সোয়াসনি
ভাই—ভাই
ভগিনী—বহিনি
শ্বশুর—শ্বশুরা
শাশুড়ী—শাশু
শালা—শালা
শালি—শালি, জ্যেঠি শাশু
ভগ্নীপতি—ভেলা, জোঁয়াই

যে ভগ্নী বয়সে বড় সে ভগ্নীর পতিকে বলে ভেনা। যে ভগ্নী বয়সে ছোট সে ভগ্নীর স্বামীকে বলে জোঁয়াই।

জামাই—জোঁয়াই

(ভগ্নীপতি এবং জামাই এই উভয়কেই জোঁয়াই বলে। তবে যেখানে প্রভেদ বুঝাইয়া দিতে হইবে সেখানে ভগ্নীপতিকে বলে বহিনি জোঁয়াই, জামাইকে বলে ছোরি জোঁয়াই)

ছেলে—ছোরা
মেয়ে—ছোরি
ভায়রা ভাই, শ্যালিপতি ভাই—শাড়ু ভাই
পিতামহ—বাজে

পিতামহী—বজু
প্রপিতামহ বরাজু
প্রপিতামহী—বরাজু বজু
বৃদ্ধ প্রপিতামহ—জুজু
বৃদ্ধ প্রপিতামহী—জুজু বজু
অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ—চ্যাপজু
অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহী—চ্যাপজুবজু

(মাতামহ এবং মাতামহী ইত্যাদি পিতামহ পিতামহী ইত্যাদির অবিকল অনুরূপ)

পৌত্র—নাতি
পৌত্রী—নাতিনী
প্রপৌত্র—পনাতি
প্রপৌত্রী—পনাতিনী
কনিষ্ঠ প্রপৌত্র—জনাতি
কনিষ্ঠ প্রপৌত্রী—জনাতিনী
অতি কনিষ্ঠ প্রপৌত্র—খনাতি
অতি কনিষ্ঠ প্রপৌত্রী—খনাতিনী
কুটুম্ব—কুল কুটুম্ব
ভাইপো—ভদাই
ভাই ঝি—ভদাইনী
ভাগে—ভাঞা
ভাগী—ভাঞী
পুত্রবধূ—বহুড়ি
ভ্রাতৃবধূ—বহুড়ি
ভ্রাতৃজায়া, ভাইজ—ভউজী

বস্ত্র বাচক

পায়জামা—সুরাল
কাপড়—লুগা

(এই লুগা শব্দটী উড়িষ্যা দেশের ব্যবহৃত লুগা শব্দের রূপান্তর)

বিছানা—উছান
বালিস—শিরানি

(বালিসের খোল বলিয়া কোন স্বতন্ত্র শব্দ পাহাড়ী ভাষায় নাই)।

লেপ—সিবক্
ওয়াড়—খোল
চাদর—চাদর
মশারি—জালি
থালা—থাল
ঘটী—লোহোটা
বাটী—বটুকো
কলসী—গাগ্‌রে
হাতা—ডাক
খুন্তি—পুনিউ
কোদাল—কোড়োয়া
বেড়ি—বাউলি
সাবল—ঝাপল
বটি—চুলোস
হাতুড়ি—মার্ত্তোল
শিল—শিলোটা
নোড়া—লোহারো
কুমড়া—ফড়্‌সি
পেঁপে—মেওয়া
ঢেঁড়স্—ভিণ্ডি
ভাত—ভাত
ডাইল—ডা'ল
তরকারি—তিউন্
হলুদ—হল্‌দি
লঙ্কা—খোরসানি
ধনে—ধনিয়া
মৌরী—সোঁপ
সরিষা—তরি, রাংগো, সর্ষো
যোয়ান—যুয়ানো
দারুচিনি—সিনকোলি
মাটি—মাটো
কাদা—কাদো, হিলো
পাঁক—হিলো
পাথর—ঢোঙ্গ

পাথরের খোয়া—রোড়া

বৃক্ষলতাদি বাচক

গাছের কন্দ—আলু

গাছের মূল—জড়া

গাছের অঙ্কুর—টুসা

গাছের চারা—বাচ্ছা

গাছ—রুখ্

গাছের গুঁড়ি—মুরা, ডাঁট্

গাছের শাখা—হাঁগা

প্রশাখা—শাহু হাঁগা

পল্লব—পাঙলো

মুকুল—কলিলা

ফুল—ফুল

ফল—ফল

বীজ—গোঁড়, বিউ, বীজন

গাছের ছাল—বোগ্‌রা

গাছের আঠা—চেল

গাছের রস—ঝোল

গাছের পাতা—পাত্তি

লতা—লৎ, বোদ্

ঘাস—ঘাঁস

আলানি কাঠ—দাওরা

সরু সরু আলানি কাঠ—ঝিজা দাওরা

জীব জন্তু ও কীট পতঙ্গাদি বাচক

ছাগল—বাখ্‌রা, চেংরো

(সাধারণ ছাগলকে বাখ্‌রা এবং যাহাদের গায়ে লম্বা লোম আছে তাহাদিগকে চেংরো বলে)।

ভেড়া—ভেড়ো, ভেংরো

(যে জাতীয় ভেড়ার বড় বড় সিং আছে সেই জাতিকে ভেংরো বলে)।

শেয়াল—বুয়াঁসো

খেঁক শিয়ালি—শিয়াল

কাঠ বিড়ালী—লোখারকে

পিপড়ে—কমিলা

মাছি—ঝিঙ্গা

মশা—লাম খুঁটে

ছারপোকা—খাটমল

(পাহাড়ীদের দেশে ছারপোকা নাই। বিদেশ হইতে কখন কখন আমদানী হয়। তাহারাও বিদেশী নাম খাটমল ব্যবহার করে)।

উকুন—ছুমুগা

ফড়িং—সলাহা

ঝিঁ ঝি পোকা—ঝাঁউকিড়ি

জোনাকি পোকা—জুন্‌কিড়ি

পোকা—কিড়া, কিড়ি

পাখী—চড়া

পাখীর পালক—ভুৎলা

পাখীর ঠোঁট—চুচো

পাখীর ডিম—ফুল

মৌমাছি—মাউঁরি

প্রজাপতি—পুতলি

পাখীর বাসা—গুঁড়

কাক—কাগ

চিল—চিল

চড়ুই পাখী—ভঙ্গরা

শালিক পাখী—ময়না

শকুনি—গিধ

প্রাকৃতিক-বস্তু বাচক

আকাশ—আকাশ

মেঘ—বাদল

বৃষ্টি—পানি, হারি

রামধনু—ইন্দ্রেনী

সূর্য্য—সুরয, ঘাম

রৌদ্র—ঘাম

চন্দ্র—জুন

জ্যোৎস্না—জুন

নক্ষত্র—তারা

কুয়াসা—কুইরো

তুষার—তুষার

বরফ—হিউ

শিশির—সিং

বিদ্যুৎ—বিজুলি

শিলা—বজর

নদী—নদী

প্রণালী—খোলা, খোলচা

ঝরণা—ঝোরা

(ঝরণা যতদূর পর্য্যন্ত পাহাড়ের মাথায় ও পাহাড় গাত্রে থাকে ততদূর পর্য্যন্ত তাহার নাম ঝোরা; যখন পাহাড়ের উপত্যকায় আসে এবং ক্ষুদ্র নদীর আকার ধারণ করে তখন তাহার নাম খোলা; ফাঁকা সমতল ভূমিতে যখন আসে তখন তাহার নাম নদী। ঝরণা ও খোলা বর্ষাকালে খুব প্রবল থাকে। অন্যকালে কোনটা বা একেবারে শুকাইয়া যায়, কোনটা বা ক্ষীণকায় ও ক্ষীণস্রোতা হইয়া প্রবাহিত হয়। নদী ক্ষীণ হইতে পারে কিন্তু একেবারে শুকায় না, খোলা শুকাইয়া জল প্রবাহ হীন হইতে পারে। নদীর সঙ্গে খোলার প্রভেদ এইটুকু)।

বিশাল পর্ব্বত—পর্ব্বত

ক্ষুদ্র পর্ব্বত—পাহাড়

পর্ব্বত শিখর—চুলি

পর্ব্বতস্থ উচ্চ ভূমি—ডাঁড়া

পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র উচ্চ ভূমি—ডঙ্গা, ডিল

খাড়া উচ্চ বা খাড়া নিম্ন (Precipice)—ভীর

অপর কয়েকটী বিশেষ্য শব্দ

স্বদেশ—স্বদেশ

বিদেশ—বিদেশ

সমতল নিম্ন ভূমি (plain)—মদেশা

বড় রাস্তা—সটক

ছোট রাস্তা—বাট, চোরবাট

যকৃৎ—কলেজো

দুধ—দুধ

দধি—দহি

ঘোল—মহি

মন্থন ভাণ্ড—ঠেক

মন্থন দণ্ড—পাবন

দুগ্ধ বা দধি ভাণ্ড—ডুংরো

ফুসফুস—ফোকুসো

ক্রোধ—রিষ

ঘৃণা—ঘিণ

দুয়ার—দৈলা

লজ্জা—লাজ

সঙ্কোচ—কুরিকুরি

ক্লান্তি—থকাই

চুলকণা, পাঁচড়া—লুতো

সন্দেহ—সন্দে

মিনতি—বিনতি

দিব্য—কিরিয়া

কলঙ্ক—দোষ

চরিত্র—আনিবানি

ফোড়া—ফোকা

ব্যবহার—গরাই

সূচ—সিয়ো

হাঁচি—ছিউ

হোঁচট—ঠেস্

কৌতূহল—আচম্বক

কৌতুক, তামাসা—ফটি

বানান (spelling)—হিজ্জি

কাল-পরিমাণ বাচক

দিন—দিন

রাত্তি—রাত্

সেকেণ্ড—পোলা, পল

মিনিট,—মিনিট্, মিলিট

ঘণ্টা—ঘণ্ট, ঘরি

সপ্তাহ—সাতা

মাস—মহীনা

বৎসর—বর্ষ

অদ্য—আজু
গতকল্য—হিজু
গতপরশ্ব—পরশি
তৎপূর্ব্বে যে কোনদিন—আস্তি
আগামী কল্য—ভোলি
আগামী পরশ্ব—পরশি
তৎপরে যে কোনদিন আস্তি
প্রাতঃকাল—দিহান
মধ্যাহ্নকাল—দোপহরি, মধ্যেনি দিন
অপরাহ্ণ—বেলুকা
সন্ধ্যা—বিনিরিস, সাম্
মধ্যরাত্রি—আধারাতি
পরে—ভরে
দিনের মধ্যে—দি উসো
রবিবার—আইতবার
সোমবার—সে বার
মঙ্গলবার—মঙ্গলবার
বুধবার—বুধবার
বৃহস্পতিবার—বিহিবার
শুক্রবার—শুকবার
শনিবার—সচরবার

রক্তপীতাদি বর্ণ বাচক

শ্বেত—খেতো
রক্ত—রাতো
কৃষ্ণ—কাল
হরিৎ—হরিয়ো
পীত—পাঁহেলো, পেলো
বেগুনি—কুসুমে

কটুতিক্তাদি রস বাচক

ঝাল (কটু)—পিরো
তিক্ত—তিতো
কষায়—টরুরো
অম্ল—অমিলো
লবণ—নুনিলো
মধুর—মিঠো

সর্ব্বনাম শব্দ

আমি—ম
আমরা—হামিহরু

(পাহাড়ী ভাষায় বহুবচনের স্বতন্ত্র রূপ নাই। এক বচন শব্দের পর "হরু" শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন হয়)।

তুই—তঁ
তুমি—তিমি
তোমরা—তিমিহরু

(তঁ শব্দের বহুবচনে তঁহরু না হইয়া তিমিহরু হয়)।

আপনি তফাঁই, আফু
আপনারা—তফাঁইহরু, আফু হরু
তিনি, সে—উ
তাঁহারা, তাহারা—তিনি হরু

(উ শব্দের বহুবচন উ হরু হয় না তিনি হরু হয়)।

ইহা, তাহা—তিয়ো, ইয়ো
যাহা—জুন্, জো
কে—কো
কোন্‌টা—কুন্
প্রত্যেক—গোটা গোটা, সবৈ

ঐটা, এইটা, সেইটা এইরূপ "টা" কিংবা "টা" বুঝাইবার জন্য পাহাড়ী ভাষায় চাঁই ব্যবহার হয়। যথা,—

ইয়ো চাঁই—এইটা,
উয়ো চাঁই—ঐটা,
তিয়ো চাঁই—সেইটা

বিশেষণ শব্দ

অনেক—ধেরৈ, থুপ্রো

(সংখ্যা বুঝাইলে ধেরৈ এবং পরিমাণ বুঝাইলে থুপ্রো ব্যবহার হয়)।

অল্প—অলি
অল্প অল্প—অলিকতা, অলি অলি
অলস—অলছে
অহঙ্কার—লাঠা
অন্য—আরকো
ইতর—ন রাম্রো
উষ্ণ, গরম—তাতো
কপট কপটি
খল নজাতি
কঠিন—সারো
চালাক—চঙ্ক
ছোট—সানু
টাটকা—আলো
দুষ্ট ন রাম্রো
পরিশ্রমী—মিহোনতে
পটা—কুহেকু
পিছল—চিপ্‌লো
বড়—ঠুলো
বিমর্ষ—টুসিস্থ
মধ্যম—মাইলা
কোমল—কমেলো
মিহি—মসিনা
কোমল, ঠাণ্ডা, শীতল—চিসো
সুন্দর—জাতি, রাম্রো
অনুপস্থিত—গয়েল্
বিলম্ব—অবের্
লম্বা—লামো
সোজা—সোঝো
বাঁকা—বাঙ্গো
সুস্থ—সঙ্ক

তুলনার জন্য বাঙ্গলা ভাষায় যেখানে অপেক্ষা এবং ইংরাজীতে Than ব্যবহৃত হয় পাহাড়ীরা সেইখানে ভন্দা ব্যবহার করে। যথা—

ভানু অপেক্ষা চাঁদ সুন্দর—ভানু ভন্দা চাঁদলে রাম্রো হো।

রাম্রো এবং জাতি দুইটী শব্দের অর্থ, সুন্দর। প্রভেদ এই যে যাহা রূপে সুন্দর তাহা রাম্রো এবং যাহা গুণে সুন্দর তাহা জাতি।

ক্রিয়া পদ

পাহাড়ী ভাষায় ক্রিয়ার ধাতু "মু" কারান্ত হইয়া থাকে। যথা,—

করা—গরণ্
বলা—ভনুমু
দেখা—হেরমু, দেখমু
খাওয়া—খামু
আসা—আইমু
যাওয়া—যামু, হিঁড়মু, পালমু

(মান্যগণ্য গুরুজন সম্বন্ধে "পালমু" ব্যবহার হয়। সাধারণ ব্যক্তিকে কোথা যাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে কাঁহা যাহুস্ বা কতা যাহুস্ বলা যাইতে পারে। কিন্তু মাননীয় ব্যক্তিকে বলিতে হইবে কতা পালমু হুজ)।

বেড়ান—ডলমু
ফিরিয়া আসা—ফরকাউমু
চীৎকার করা—কড়াউমু
লাফালাফি করা—উফ্‌দেণ্
হাসা—হাসমু
ভাঙ্গা—ভাঁচমু
মারা—কুটমু, ছানমু
আছাড়মারা—হিড়কাউমু
বসা—বসমু, রাজগরণ্

(বাড়ীতে কেহ আসিলে আমু হোস্ বসমু হোস্ আসতে আজ্ঞা হউক, বসতে আজ্ঞা হউক বলা হয়। কিন্তু কোন উচ্চ দরের মাননীয় ব্যক্তি আসিলে বসমু হোস্ এর পরিবর্ত্তে রাজগরণ্ হোস্ বলা যায়। রাজ শব্দ বিরাজ শব্দের রূপান্তর মাত্র।)

বন্ধ করা—থুনমু
খোলা—উঘারমু

ভালবাসা - পিয়ারো করনু
হওয়া—হুনু
শেষ হওয়া—সকনু, তুরনু
পৌছান - পুরাউনু, পুকনু
কুলান—পুকনু
তাড়ান—লাগাড়নু, ধাবাউনু,
ঠেলা (Push) - ঘাঁড়ানু
টানা (Pull)—তানুনু
বাহির হওয়া—নিকনু
প্রবেশ করা—পশনু
ঢাকা দেওয়া—ছপনু
সরাইয়া দেওয়া—সারনু, সারিকিনু
উৎলে ওঠা—উমলাউনু
ধরিয়া যাওয়া, আঁকিয়া যাওয়া - ডরনু
চুলকান—চিলানু
বমি করা - ছাদনু, ঝাড়নু
হাতবুলান—মসারনু
হাঁচা - ছিঁউ করানু
হাইতোলা—হাইগরনু
দাড়িকামান—ফোরিনু
পড়িয়া যাওয়া—লড়নু
ধরা, ধারণকরা—সামাৎনু
দৌড়ান—ছুকুড়নু
তুলিয়া দেওয়া—উছালনু
আড়চখে চাওয়া—মড়্‌কনু
উত্তেজিত করা—উস্কাউনু
ভয় করা—ডরাউনু
জন্মান—জন্মনু
মরা—সরনু, খসনু
গাটেপা—ঠিসনু, মিচনু

ক্রিয়ার বিশেষণ

অক্রত—ঢিলো
অবশেষে—আখিরকাল, অন্তমা
ধীরে ধীরে—বিত্তারে বিত্তারে
শীঘ্র শীঘ্র—ছিট্টো
যথাসময়ে—বেলামা
অসময়ে—অবেলা
এককালে (at a time)—একৈ বাজি
ঠিক রকমে—ঠাঁমাই
হয়ত, সম্ভবতঃ—হোলা

অব্যয়

এবং—র, ঔ, পনি, তর
বা, অথবা—নভয়ে
কিংবা, না হয়—কিতা।
কিন্তু, তবে—অন্ত
যদি—ভনে
এখন—অইলে
কখন কইলে
এখনই, এইমাত্র—ভরকারে
এখন পর্য্যন্ত—অইলে সমা
একবার—এক ছিন্
এখনই, অর্থাৎ অবিলম্বে, এই অর্থেও এক ছিন্ ব্যবহার হয়
নিকটে; ছেউ মা
আশে আশে - ছেউ ছাউ
যখন—যব
তখন—তব

অন্যান্য ভাষার ন্যায় পাহাড়ী ভাষারও কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণাদি ভেদে সাতটী বিভক্তি আছে যথা,—

১মা—ম, মৈলে
২য়া—মলাই, হামিহরুলাই
৩য়া—ম বাট, হামিহরুবাট
৪র্থী—মলাই, হামিহরুলাই
৫মী—ম দেখি, মদেখিন, মবাট
৬ষ্ঠী—মেরো, হামিহরুকো
৭মী—মমা, হামিহরুমা।

১মা বিভক্তির রূপ "লে"

২য়া বিভক্তির রূপ "লাই"
৩য়া " " "বাট"
৪র্থী " " "লাই"
৫মী " " "দেখি," "দেখিন," "বাট"
৬ষ্ঠী " " "রো," "কো" "কো"
৭মী " " "মা"

দৃষ্টান্ত

আমাকে বলিয়াছিল—মলাই ভনেকো থিয়ো।
উহা দ্বারা হইবে না—তিয়ো বাট হুদৈন।
দাদাকে দিয়াছি—দাজুলাই দিয়েকোছু।
জঙ্গল হইতে আসিয়াছে—জঙ্গল দেখিন্ আয়েকোছ।
তোমার ভাগী কোথায়—তিম্রো ভাঞ্জি কতা হো।
কলসীতে অনেক জল আছে—গাগ্‌রামা থুপ্রো পানি ছ।

কোন ভাষায় কথা কহিবার অভ্যাস করিতে হইলে পদ রচনা শিক্ষা করা প্রয়োজন। পদ রচনার জন্য অন্ততঃ দুইটী জিনিষের প্রয়োজন, একটী বিশেষ্য পদ এবং একটী ক্রিয়াপদ। বিশেষ্য, সর্ব্বনাম ও তাহাদের বিভক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রিয়া বাচক ধাতুর তালিকাও দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সকল ধাতু ও তাহাদের অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করিতে শিক্ষা না করিলে বেশুল ধাতুজ্ঞান থাকিলে চলে না; সেই জন্য ধাতু হইতে শব্দ প্রস্তুত প্রণালীর কিছু কিছু সঙ্কেত দেওয়া গেল।

বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন কাল, এবং ধাতু মাত্রেই "নু"-কারান্ত। বর্ত্তমান কাল তিন ভাগে বিভক্ত। সামান্য বর্ত্তমান, তাৎকালিক বর্ত্তমান, সন্দিগ্ধ বর্ত্তমান। সামান্য বর্ত্তমানকালে ধাতুর অন্তে স্থিত "নু" কারের "ন্" লোপ হয় এবং উ লোপের পর হসন্ত 'ন' কারের সহিত উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের এক বচন ও বহুবচন ক্রমে "ছু, ছৌ; ছস্, ছো; ছু, ছন্" প্রত্যয় যোগ হয়। যথা,—

আমি খাই -ম খাঞ্,
আমরা খাই—হামি হরু খানছৌ
তুমি চিঠি লেখ—তঁ চিঠি লেখছস্
তোমরা চিঠি লেখ—তিমি হরু চিঠি লেখছো
সে করে—উ গরছ
তাহারা করে—তিনি হরু গরছন্

খানু, বসনু, লেখনু, গরনু, আউনু, যাউনু, হাসনু ইত্যাদি কার্য্যদ্যোতক শব্দের অন্তস্থিত "নু"কে ক্রিয়া সংজ্ঞা বলে। ধাতু হইতে শব্দ প্রস্তুত করিবার সময় কোন কোন ক্রিয়া সংজ্ঞার একাংশ, অর্থাৎ "নু"কারের "ু"কার মাত্র লোপ হইয়া হসন্ত 'ন্' বজায় থাকে আবার কোন কোন সংজ্ঞার পূর্ণ অবয়ব"নু"র লোপ হয় এবং 'নু' লোপের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার পর প্রত্যয়ের যোগ হয়। উপরি লিখিত খাঞ্, লেখছস্ এবং গরছ তাহার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যাহা দ্বারা ক্রিয়ার আরম্ভ সূচিত হয়, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়াছে, বুঝায় তাহাকে তাৎকালিক বর্ত্তমান বলে। তাৎকালিক বর্ত্তমানকালে ক্রিয়া সংজ্ঞা"নু" লোপ হইয়া তাহার স্থানে"ই" আদেশ হয় এবং তাহার পর প্রত্যয় যোগ হয়। যথা,—

আমি খাইতেছি—ম খাই রহেছু
আমরা খাইতেছি—হাসিহরু খাই রহেছৌ
তুমি হাসিতেছ—তঁ হাসি রহেছস্
তোমরা হাসিতেছ—তিনি হরু হাসি রহেছো
বুদান হাসিতেছে—বুদানলে হাসি রহেছে
বুদানেরা হাসিতেছে—বুদান হরুলে হাসি রহেছন্

সামান্য এবং তাৎকালিক উভয়বিধ বর্ত্তমান কালেরই ক্রিয়া আরম্ভ বা নিষ্পন্ন হওয়া সম্বন্ধে যেখানে সন্দেহ জ্ঞাপন করিতে হয়, সেখানে সেই বর্ত্তমান কালকে সন্দিগ্ধ বর্ত্তমানকাল বলে। এই সন্দিগ্ধ বর্ত্তমানে ক্রিয়া সংজ্ঞা "নু" লোপ হইয়া তাহার স্থানে পুংলিঙ্গ ও ক্লীব লিঙ্গের এক বচন ও বহু বচনে যথাক্রমে "দো" এবং "দা" আদেশ

হয়। স্ত্রীলিঙ্গের উভয় বচনেই "দী" আদেশ হয়। তাহার পর লিঙ্গ ও বচন ভেদে বিভিন্ন রূপের "হোলা" শব্দ যোগ হয়। হোলা শব্দের অর্থ "হয়ত," "বোধ হয়," "সম্ভব," ইত্যাদি। যথা,—

আমি খাই বোধ হয়—ম খাঁদো হুঁলা
আমরা খাই বোধ হয়—হামিহরু খাঁদা হোউঁলা
তুমি খাও বোধ হয়—তঁ খাঁদো হোলাস্
তোমরা খাও বোধ হয়—তিমি হরু খাঁদা হোউলা
সে খায় বোধ হয়—তিয়ো খাঁদো হোলা
তাহারা খায় বোধ হয়—তিনি হরু খাঁদা হোলান্

স্ত্রীলিঙ্গে হয় হুঁলা স্থানে হুঁলি

হোউলা " হোউলি
হোলাস্ " হোলিস্
হোলা " হোলি
হোলান্ " হোলিন।

গ্রাম্য ভাষায় কিন্তু হোলার বিভিন্ন রূপ ব্যবহার হয় না। সকল লিঙ্গ এবং সকল বচন নির্বিশেষে হোলা ব্যবহৃত হয়।

করিয়া, দেখিয়া, বলিয়া প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়া বুঝাইতে হইলে ক্রিয়ার পর "র" অথবা "কিনা" যোগ করিতে হয়। যথা,—করিয়া গরেঙ, শরি কিনা; দেখিয়া—হেরের, হেরি কিনা; বলিয়া—ভনের, ভনি কিনা।

যে অর্থ বুঝাইতে ইংরেজী ক্রিয়ার পূর্ব্বে ইংরাজী "টু" ব্যবহার করিতে হয় পাহাড়ী ভাষায় সেই অর্থ বুঝাইবার জন্য ক্রিয়ার পর "না" অথবা "নু" যোগ করিতে হয়। যথা,—প্রস্তুত করিতে—বনাউনা, বনাউনু; চীৎকার করিতে—কুড়াউনা; কুড়াউনু; ফিরিতে—ফড়কাউনা, ফড়কাউনু ইত্যাদি

ক্রিয়ার অকরণ বুঝাইতে হইলে ক্রিয়ার পূর্ব্বে "ন" অথবা ক্রিয়ার পরে "ছৈন" যোগ করিতে হয়। যথা,—আমি খাইতেছি না—ম ন খাই রহেছু, অথবা ম খাই রহেকো ছৈন।

নেপালী ব্যাকরণ অনুসারে অতীত কাল ছয় প্রকার। যথা,—সামান্য, আসন্ন, পূর্ণ, অপূর্ণ, সন্দিগ্ধ, হেতু-হেতু-মদ্ভূত। তন্মধ্যে প্রথম তিনটীর জ্ঞান হইলেই মোটামুটি পাহাড়ী ভাষায় কথা কহিতে পারা যায়। যে ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু কালের নির্দ্দেশ নাই তাহার নাম সামান্য ভূত, যে ক্রিয়া অল্পকাল পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়াছে তাহার নাম আসন্ন ভূত এবং যে ক্রিয়া বহুপূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে তাহার নাম পূর্ণ ভূত কাল।

সামান্য ভূতকালে ক্রিয়ার্থক সংজ্ঞার "নু" লোপ হইয়া পুরুষ ও বচন ভেদে "যেঁ," যৌ; ইস্, যৌ; যো, যেঁ" প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ হয়। যথা,—

আমি বসিয়াছিলাম—ম বসেঁ
আমরা বসিয়াছিলাম—হামিহরু বসৌঁ
তুমি বসিয়াছিলে—তঁ বসিস্, তৈলে বসিস্
তোমরা বসিয়াছিলে—তিমি হরু বসৌ
সে বসিয়াছিল—তিয়ো বস্যো
তাহারা বসিয়াছিল—তিনি হরু বসে

আসন্ন ভূতকালে "নু" স্থানে "একো" আদেশ হয়, তাহার পর সামান্য বর্ত্তমান কালের নিয়মানুসারে "ছু, ছ, ছস্, ছৌ প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ হয় যথা

আমি বলিয়াছি—ম ভনেকোছু
আমরা বলিয়াছি—হামিহরু ভনেকোছৌঁ
তুমি করিয়াছ—তৈলে গরেকোছস্
তোমরা করিয়াছ—তিমিহরু গরেকোছৌ
সে গিয়াছে—তিয়ো গয়েকো ছ
তাহারা গিয়াছে—তিনি হরু গয়েকোছন্

পূর্ণ ভূতকালে আসন্ন ভূতকালের ন্যায় "একো" আদেশ হইয়া তাহার পর "থিয়ে" "থিয়ৌ" থিইস্, থিয়ৌ, "থিয়ে।" থিয়ে প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ হয়? যথা,—

আমি বসিয়াছিলাম—ম বসেকো থিয়েঁ
আমরা বসিয়াছিলাম—হামিহরু বসেকো থিয়ৌঁ
তুমি দৌড়াইয়াছিলে—তৈলে ছুকুড়েকো থিইস্

তোমরা দৌড়িয়াছিলে—তিমিহরু ছুকুড়েকো থিয়ৌ
সে অপেক্ষা করিয়াছিল—উ পরখেকো থিয়ো
তাহারা অপেক্ষা করিয়াছিল—তিনি হরু পরখেকো থিয়ে

সাধারণ গ্রাম্য ভাষায় সকল পুরুষ এবং সকল বচনেই "ছ" এবং "থিয়ো" ব্যবহৃত হয়।

হওয়ার ধাতু বা ক্রিয়া সংজ্ঞা হুনু এবং যাওয়ার ধাতু যানু। শব্দ প্রস্তুত করিবার সময় বিকল্পে হু স্থানে ভ এবং যা স্থানে গ হয়। যথা

হইয়াছে—ভয়েকোছ। গিয়াছে—গয়েকোছ

ভবিষ্যৎকাল দুই প্রকার, সামান্য এবং সম্ভাব্য। সামান্য ভবিষ্যতে সংজ্ঞার নু স্থানে নে আদেশ হয়। যথা,—

আমি বসিব—ম বস্‌নে ছু। সে যাইবে—তিয়ো যানেছ

তুমি পড়িয়া যাইবে—তঁ লড়নেছস্, ইত্যাদি—

সম্ভাব্য ভবিষ্যৎকালে নু স্থানে পুরুষও বচন ভেদে "উঁলা, ওঁলা, লাস্, ঔলা; লা, লান" প্রত্যয় হয়। যথা, আমি যাইব বোধ হয়—ম যাউঁলা, সে বোধ হয় বসিবে না—তিয়ো ন বস্‌লা

অকরণে যাইব না, করিব না, দেখিব না ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়ার পর দৈন যোগ হয়। যথা,—

আমি যাইব না—ম জাঁ দৈন। আমি জানি না—ম জান্ দৈন। আমি করিব না—ম গরদৈন আমি দেখিব না, দেখি না—ম হের দৈন।

হেরনু এবং দেখনু এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই :—ম হেরছু—আমি দেখি; কিন্তু তিয়ো রাম্রো দেখ্‌ছ—ওটা দেখায় ভাল।

ভয়ো, ভয়েকোছ; গয়ো, গয়েকোছ; খায়ো, খায়েকোছ প্রভৃতির উভয় রূপেরই অর্থ এক। তবে এইমাত্র প্রভেদ যে প্রথম রূপটী প্রশ্নে এবং দ্বিতীয় রূপটী তাহার উত্তর দানে ব্যবহার হয়। যথা;

প্রশ্ন। উ গয়ো—সে গিয়াছে কি?
উত্তর। অঁ গয়েকোছ—হাঁ গিয়াছে

ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ

গরনু—করা। গরাউনু—করান
নাচনু—নাচা। নচাউনু—নাচান
ভাঁচনু—ভাঙ্গা। ভাঁচাউন—ভাঙ্গান
ভননু—বলা। ভনাউনু—বলান
পিনু—পান করা। পিয়াউনু—পান করান
সিউনু—সেলাই করা
সিয়াউনু—সেলাই করান
হাঁসনু—হাসা
হাঁসাউনু—হাসান
মিচনু—গা টেপা
মিচাউনু—গা টেপান
কাটনু—কাটা
কাটাউনু—কাটান
চম্‌কনু—চমকান
চম্‌কাউনু—চমকাইয়া দেওয়া

(ক্রমশঃ)

পান্থ

(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি, এ)

জানি শুধু যাব বহুদূর,
আসিয়াছি বহুদূর হ'তে,
জানিতে চাহিনা, কবে
এ ভ্রমণ কোথা শেষ হবে,—
আঁখি হবে তন্দ্রাতাতুর
স্নান করি বৈতরণী স্রোতে!

যত চলি তত ফিরে ফিরে,
চেয়ে দেখি দূর বন-রেখা,—
ফেলিয়া এসেছি যারে
রাতিশেষে আঁধিয়ারে,
তারে স্মরি' ভাসি আঁখিনীরে,
—আবার যে-একা সেই একা!

পড়ে' আছে নব-উষা গানে
দূর-দেশ, কোথা নাই কেহ!—
তারি মাঝে তরু-ছায়া
রচিবে নূতন মায়া!
পুনঃ কোন অচেনার গানে
ভুলে' যাব কালিকার স্নেহ!
শুধু চলা!—পিছনে সমুখে
পথখানি আদি-অন্তহীন!
সমুখেরে করি পিছে,
(কাল ছিল, আজ মিছে!)
মেতে উঠি ক্ষণিকের সুখে,
ভালবাসি,—তবু উদাসীন!
তবু এই জীবন-জঞ্জাল
চাহি না যে শেষ করিবারে!
জানিতে চাহিনা, কবে
এ ভ্রমণ শেষ হবে,—
আঁখি হবে তন্দ্রাভাতুর
স্নান করি' বৈতরণী-স্রোতে!

——

প্রপর্ণা

(উপন্যাস)

[শ্রীআমোদিনী ঘোষ]

বহু পীড়াপীড়ি ও সাধ্য সাধনা করিয়া ঠাকুরমা যখন শশীশেখরের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, সোমেন্দ্র তাহার এক জ্ঞাতি ভগিনীকে চীকিৎসার্থ আনিয়া স্থানান্তরে মেসের উপরকার ঘরে রাখিয়াছে, এবং তাহাকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সে সমুৎসুক, তখন ঠাকুরমা রাধাকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন। দিন কয়েকের মধ্যে রাধা ঠাকুরমা ও ঠাকুরদার নিকট হইতে ভর্ল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইল। মাতাপিতাহীন গরীবের মেয়ে বলিয়া ঠাকুরমা তাহাকে বধূ করিতে কোনও আপত্তি করিলেন না, এবং যার তার কাছেই বলিতেন, মেয়েটীর স্বভাবই মেয়েটির যৌতুক, তাহার আর অন্য যৌতুক না হইলেও চলিবে। ঠাকুরমা সেঁকরা ডাকিয়া রাধার গহনা গড়াইতে দিলেন এবং কি বর্ণের কোন্ সাড়ীতে কোন জ্যাকেটে তাহাকে ভাল মানাইবে তদ্বিষয়ে বহু গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া গেলেন।

রাধাকে ঠাকুরমা লইয়া গেলে পর, সোমেন্দ্র বহু দিনের অনাবৃত বইগুলি লইয়া বসিল। অনেক দিন বৃথায় কাটিয়াছে, এখন হইতে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইলে আর চলে না। সোমেন্দ্র কৃতসঙ্কল্প হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল।

মানুষ চিরকালই যাহা শ্রেয় তাহা পালন করিতে ব্যগ্র হয়, কিন্তু সে পথে বহু বাধা বিঘ্ন আসিয়া দাঁড়ায়। সোমেন্দ্রের অধ্যয়নরূপ তপশ্চরণে অসিদ্ধি-সংঘটক বিঘ্নরূপী বহু ঘূমকেতু আসিয়া উদিত হইতে লাগিল। ঠাকুরমার নিকট হইতে আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া দরোয়ানজীর হৃদয়ে আবির্ভাব ঘটিতে লাগিল, শশীশেখর নিজে আসিয়া বহুবার মল্লযুদ্ধ করিয়া গেল, অবশেষে রাধা তাহাকে যাওয়ার জন্য অনুনয় করিয়া এক চিঠি পাঠাইল; কিন্তু সোমেন্দ্র কিছুতেই টলিল না, একটা না একটা অছিলা করিয়া সে সব কাটাইয়া দিল। রাধাকে লিখিয়া দিল তাহার পা মচকাইয়া গিয়াছে, সে আপাততঃ চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, নহিলে

সে কখনই তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে ত্রুটি করিত না।

নির্জ্জন ঘরে কপাট আঁটিয়া সোমেন্দ্র যতই পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল, ততই অধীত বিদ্যার অর্থ তাহার কাছে দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়িতে লাগিল। এক একবার চমক ভাঙ্গিয়া সে দেখিত কতগুলা শব্দমাত্র সে উচ্চারণ করিয়া যাইতেছে, কি যে তাহার অর্থ,—তাহার এক বর্ণও তাহার মনের ভিতর প্রবেশ করে নাই! রাগ করিয়া সোমেন্দ্র তখন আরও বেশী করিয়া পড়িতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠের ইচ্ছা আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না—তাহার মনে অধীত পুস্তকের কিছুই ছাপ রাখিতে পারিল না। অবশেষে সোমেন্দ্র হার মানিয়া রুদ্ধ অর্গল খুলিয়া দিল, পুনশ্চ লড্ডুক ও মোদক বানাইয়া সতীর্থগণের রসনা ও চিত্তবিনোদনে প্রবৃত্ত হইল, এবং ঘরে ও বাহিরে গল্পের পরিত্যক্ত আসরগুলি জাঁকাইয়া তুলিয়া অনিদ্রা ও উন্মনা ভাবকে যুগপৎ বিদায় দিয়া দিল। কিন্তু তাহার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার অন্তরের শূন্যতা সে পূরণ করিতে পারিল না। তাহার আনন্দ ও উল্লাস তাহার নিকট হইতে যেন চির-কালের জন্য বিদায় লইল। সহস্র কোলাহলের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও তাহার মনে হইত যেন পৃথিবীর সকল রব নীরব হইয়া গিয়াছে, সমস্ত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে তাহার মনে হইত, যেন সকল মাধুর্য্য অবলুপ্ত হইয়াছে, এ নিখিল বসুন্ধরার কিছুতেই যেন বর্ণ নাই, আলোক নাই, উজ্জ্বলতা নাই সব যেন মৃত!

সোমেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া ভাবিত, চারিদিক একি নিস্তব্ধতা! সহসা এক প্রভাতে স্বপ্ন-সাগরের অতল তল হইতে দক্ষিণ হাওয়ার মেদুর হিল্লোলে যে গুঞ্জন, যে সঙ্গীত, যে বীণাগুঞ্জন তাহার নীরব হৃদয়কক্ষ পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া আসিয়াছিল, সহসা তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল! উষার আকাশে যে হিঙ্গুল রাগ মেঘের মৌক্তিকাভায় মিলিয়া দিবার ললাটে নবাম্বু-রঞ্জন রচনা করে,—তাহার চিত্তগগন হইতে সে রক্ত মণি রাগ কে অপহরণ করিয়া লইল! সহসা এক মায়া রজনীতে তাহার আনন্দ, তাহার উল্লাস কুহক মন্ত্রে যে পল্লবে পুষ্পে শাখায় শাখায় মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বিকচোন্মুখ কোমল দল রাশির উপর কে এ অজস্র লাক্ষা স্রাব ঢালিয়া দিল!

অন্ধকারে বালিশে মুখ গুঁজিয়া সোমেন্দ্র কেবল ভাবিত, তাহার মানসতরণী দুর্ব্বার চিন্তাস্রোতাবর্ত্তে পতিত হইয়া অন্ধকার অনির্দ্দেশের অকূল অসীম প্রবাহে ভাসিয়া যায়; থাকে শুধু তাহার হৃদয়ের একটা বেদনা—একটা জ্বালা!

একদিন শশীশেখর আসিয়া কহিল, "রাধার আবার জ্বর হইয়াছে। জ্বর খুব বেশী, ১০৫ এর উপরেও ওঠে। সে তাহার 'দাদা'কে দেখিতে চাহে।"

সোমেন্দ্র কিছু বলিল না, চাদরখানা পাড়িয়া কাঁদের উপর ফেলিয়া তখনই রাধার কাছে চলিল। রাস্তায় শশীশেখর বলিল, "কি হে তুমি যে একেবারে নীরব!"

সোমেন্দ্র বলিল, "বেসাণ্টের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম।"

"কি শুনলে?"

"বহুভাষণে শক্তির অপব্যয় হয়। প্রয়োজনা-তিরিক্ত কথা বলা অনুচিত।"

"সুতরাং—?"

"আমি শক্তি সাধনা কিংবা শক্তি প্রিজার্ভ কর্চ্ছি।"

"এক ঘুষিতে নাক উড়িয়ে দেব—সত্যি কথা বল।"

"বাইবেলে উক্ত আছে যে অবিশ্বাসীর সহিত বাক্যালাপ করিবে না।"

কথাটা বলিয়া সোমেন্দ্র শশীশেখরকে পিছে ফেলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

শশীশেখর হাসিতে হাসিতে দৌড়াইতে গিয়া চটি হারাইয়া খুঁজিতে লাগিল।

সোমেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরমা কহিলেন, "এমনি কি করতে হয় বাছা, এখানে আস্‌লাম আর তুমি একবার দেখ্‌তেও এস না! আমাদের কাছে লজ্জা পায় ত এখন! কিছু বলে না, মুখ বুজে থাকে, আপন জন তুমি, এমন সময় কি তোমার দূরে থাকা উচিত?"

"আমার অসুখ হয়েছিল ঠাকুরমা, ভাল থাক্‌লে কি আর আসি না!" বলিয়া সোমেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল, ঠাকুরমা পিছন হইতে ডাকিয়া কহিলেন "দেখ, আবার চলে যেয়ো না যেন; রাধারাণী ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত তোমায় এখানে থাক্‌তে হবে!

সোমেন্দ্র ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাধা কোন্ ঘরে?"

"দক্ষিণ দিক্‌কার ঘরে। শশীর দিদি এসেছে, সে আছে উপরে, তার সঙ্গে দেখা কোরো।"

"তিনি কবে এলেন?"

"পরশু। শশী বলে নি তোমাকে?"

"না, বলে নি ত!"

"ওর ঐ রকম, কিছুর খেয়াল নেই।"

ঠাকুরমা অপনার কাজে চলিয়া গেলেন।

রাধা যে ঘরে ছিল সে ঘরের বাহিরে কপাটের কাছে সোমেন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিল।

শশীশেখর উপরে উঠিয়া তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল, "শক্তিসাধক ধ্যানে নিমগ্ন হলে না কি ওখানে? ভিতরে যাও না।"

কম্পিত পদে সোমেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিল।

(১৩)

রাধারাণী বসন্তে আক্রান্ত হইল। বিবাহের আয়োজন ও উদ্যোগ থামিয়া গেল। বাড়ীশুদ্ধ সকলে ভয়-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

সর্ব্বাপেক্ষা বিচলিত হইলেন শশীশেখরের দিদি। পাছে তাঁহার পুত্র কন্যার মধ্যে কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং পথে কুড়ান একটা বলস্ত রোগীকে ঘরে আনিয়া কেন যে গোষ্ঠীগোত্র সহিত তাঁহারা মরিবেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া রাগিয়া বকিয়া অবশেষে অন্নত্যাগ করিলেন। গভর্ণমেণ্টের কৃপায় দেশে ত কোন অভাব দুঃখ নাই, হাঁসপাতাল ত একটা রহিয়াছেই; এমন কি বড় লোকের ঘরণা ঘর হতেই আনা হইয়াছে, বা যে তাহাকে সেখানে দিলে মান সম্ভ্রম সব নষ্ট হইবে। এ ছাড়া শশীশেখরের দিদি চাপা গলায় আরও কিছু কহিলেন, তাহা শুধু শয্যায় শয়না রাধা শুনিল, এবং ঠাকুরমা না শোনার ভাণ করিয়া শুনিয়া ও শুনিলেন না।

শশীশেখরের এই জ্যেষ্ঠা ভগিনীটীকে সকলেই বিশেষরূপে ভয় করিত, নিষাদ-ভয়-ভীত পক্ষিনীর মত ঠাকুর মা তাহার তীব্র বাক্যবাণে সর্ব্বদা বিদ্ধ ও ভয় প্রকম্পিত হইতেন। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইতেই ঠাকুরমা তাহাকে আসিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলেন; সুতরাং দায়ে পড়িয়া (নহিলে তাঁহার সংসার ফেলিয়া তিনি নড়েন এমন সাধ্য কি!) তিনি এখানে আসিয়া শুনিলেন যে এক চাল চুলা হীন দরিদ্রের বাপ মা খেকো এক সর্ব্বগ্রাসিনী কন্যার সঙ্গে শশীর সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, "সতীনের ঘরে থাকুলে মানুষ তাকে প্রাণে মারতে ও মায়া করে না। শশীর মত ছেলে—রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হতে পার্‌ত—তার এল পথে-কুড়ান বউ। অদৃষ্ট যার যেমন!"

শুনিয়া ঠাকুরমা শুধু চক্ষের জল ফেলিলেন।

সেদিন সোমেন্দ্র যখন রাধারাণীকে ঔষধ খাওয়াইতে গেল, তখন রাধারাণী বলিল, "আমি ঔষধ খাইব না।"

সোমেন্দ্র বলিল, "ইচ্ছা মরা পাপ।

তা ছাড়াও শুধু খেলেই যে লোক বাঁচে আর নইলে যে মরে, এমন কিছুর ঠিক্ নেই।"

"আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে।"

"এখান থেকে নিয়ে যাব?"

"আপনার পায় পড়ি, নিয়ে চলুন আমাকে"

"কোথায়?"

"হাঁসপাতালে।"

"হাঁসপাতালে!"

"সেখানে মানুষ যায় না?"

"যায়।"

"তবে?"

সোমেন্দ্র অধোমুখে বসিয়া রহিল।

রাধারাণী বলিল, "আমাকে হাঁসপাতালে দিয়ে আসুন। আজই নিয়ে চলুন।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সোমেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। রাধা বলিল, "কোথায় যান?"

"শশীর কাছে। সে যা বলে তাই হবে।"

না, না, কারও কথা শুন্‌বেন না, আপনি নিয়ে চলুন।"

"আমার সে অধিকার নাই। শশীর মত ছাড়া আমি নিয়ে যেতে পারি না।"

সোমেন্দ্র চলিয়া গেল, বিছানায় লুটাইয়া রাধারাণী কাঁদিতে লাগিল।

খানিক পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "শশী মত দিয়াছে। জোর করে সে তোমাকে এখানে রাখতে চায় না।"

(১৪)

অনেক ভুগিয়া রাধারাণী সারিয়া উঠিল; কিন্তু প্রপর্ণা বন্যার মত সকল শোভা ঝরিয়া গেল। নিদারুণ ব্যাধি তাহার সর্ব্বাঙ্গে আক্রমণের কদর্য্য চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়া গেল। নদী প্রবাহ শুকাইয়া গেলে পঙ্কিল মৃত্তিকা যেমন জাগিয়া ওঠে, তেমনি সেই অতুল সৌন্দর্য্য রাশির অবসানে শুধু মসী অঙ্কিত, ক্ষতচিহ্নময়, বিবর্ণ, একটা শোচনীয় বিকৃতি রাখিয়া গেল।

ক্ষতের জন্য রাধার মাথার চুল চাঁছিয়া ফেলা হইয়াছিল। শার্শির কাছে দাঁড়াইয়া রাধারাণী আপনার সেই ব্যাধিবিকৃত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে, এ তাহারই প্রতিচ্ছায়া! ভীতচক্ষে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল, এ কাহার মরণান্তের ব্যঙ্গ প্রেত-মূর্ত্তি! অরুণালোক-বিভাসিত বসুন্ধরার মত যৌবন-শ্রী-সমুজ্জ্বল তাহার সেই দিব্য কান্তি কোথায় গেল! বিদ্যুদ্বিলসিত জলদ পুঞ্জের ন্যায় চক্ষুর সেই উজ্জ্বল দীপ্তি, অঙ্গের সেই সুডৌল নিটোল গঠন, কাঞ্চন-সন্নিভ সেই চম্পককান্ত বর্ণ, সেই তরঙ্গায়িত কোমলকান্ত কেশদাম—দেবতার অভিশাপের মত কে সব পলকে হরণ করিয়া লইল! সার্শির উপর মাথা রাখিয়া রাধারাণী নীরবে অশ্রুপাত করিল। আজ প্রথম তাহার মনে হইল যে সে সুন্দরী ছিল। রাধারাণীর অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

পিছন হইতে সোমেন্দ্র ডাকিল, "রাধারাণী?" স্থির, পরিষ্কার সে কণ্ঠস্বর; তাহাতে আবেগের ঝঙ্কার নাই, হৃদয়োন্মথনকর ঝঞ্ঝার কম্পন নাই, ছিল শুধু এক নিবিড় স্নেহের কোমল লালিত্য। এই একমাস সোমেন্দ্র মাতার মত অক্লান্তভাবে তাহার সেবা করিয়াছে, বিনিদ্র চক্ষে অহর্নিশি তাহার কাছে জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছে, ক্ষতপূর্ণ অঙ্গে ঔষধ লেপন করিয়াছে, পথ্যপ্রদান করিয়াছে, ঔষধ সেবন করাইয়াছে—বিপদের রুক্‌শিখরে তাহার মোহমন্ত্র আকিঞ্চন পুড়িয়া পুত নিষ্ঠার রূপ ধারণ করিয়াছিল।

রাধার উত্তর না পাইয়া সোমেন্দ্র কহিল, "রাধা, আন ভ আজ যেতে হবে।"

রাধারাণী বলিল, "কোথায়?"

"শশীদের বাড়ীতে"

রাধারাণী বলিতে যাইতেছিল, "আবার সেখানে?" কিন্তু তাহা বলিল না, বলিল "কখন।"

"বিকালে।"

রাধারাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।"

সোমেন্দ্র বলিল, "সেখানে তোমার যেতে ইচ্ছা করে না"

রাধারাণী বলিল "না।"

সোমেন্দ্র বলিল "তোমাকে আমি আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারতুম। কিন্তু তাতে ত ঠিক কাজ করা হবে না। শশীর কথা আমি কিংবা তুমি কেউ এড়াতে পারি না। তুমি শশীর বাগ্‌দত্তা।"

"সেখানে এ মুখ দেখাবার চেয়ে আমার মরা ভাল ছিল।"

"ভাল কি ছিল, তার বিচারক তুমি আমি নই! যাঁর ভাল মন্দ তিনি নিজেই তা বিধান করেন।"

রাধারাণী চুপ করিয়া রহিল।

বাড়ীতে নামিতে না নামিতে রাধারাণীর চেহারা দেখিয়া শশীশেখরের দিদি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এস গো এস, তোমাদের বৌ এসেছে, বরণডালা নিয়ে এস। মাগো! এ কি শাঁকচুন্নি না পেত্নী! দেখ্‌লে যে মানুষের ভয় করে! শশী যদি এ মেয়ে বিয়ে করে, তবে আমার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হবে বলে দিচ্ছি।" ইতিমধ্যে শশীশেখরের ভগ্নিপতি কাশীতে সহসা কলেরায় মারা গিয়াছিলেন; এই অপয়া মেয়েটা যে আপনার এই অচিন্ত্য বৈধব্য দশা প্রাপ্তির মূল, তাহাও তিনি এই সঙ্গে বলিতে ছাড়িলেন না, এবং সঙ্গে সঙ্গে নবীভূত শোকজ্বালা প্রশমনের জন্য অশ্রুমোচন করিতে গিয়া শয়ন করিলেন।

গোলমাল শুনিয়া শশীশেখর ও ঠাকুরমা আসিলেন। শশীশেখর রাধারাণীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল।

ঠাকুরমা বাষ্পার্দ্র চক্ষুতে ভয়ে ও লজ্জায় ম্রিয়মান রাধারাণীর পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন।

(১৫)

টেবিলের কাছে চেয়ারে বসিয়া সোমেন্দ্র মুদিত চক্ষে একটী গানের অর্দ্ধ চরণ গুণ গুণ করিয়া গায়িতেছিল। সম্মুখে বই খোলা, কিন্তু সকাল হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার একটী বর্ণও সে পড়িতে পারে নাই। মনকে সে যতই শাসন করিতেছিল, তাহার প্রস্থির ফাঁকগুলি ছিঁড়িয়া ততই বড় হইয়া যাইতেছিল, এবং তাহার ভাসমান চিত্ত মানস-হংস বৃহচ্ছিদ্র জালে কিছুতেই ধরা পড়িতেছিল না।

"আজ যে তুমি আমাদের ওদিকে যাও নি," বলিয়া শশীশেখর সোমেন্দ্রের কাছে চৌকির উপর বসিল। সোমেন্দ্র বলিল, "কি করি বল, বইগুলি ত নতুনই রয়ে গেছেতে, এক আধটু চেনা শোনা না হলে তরি কি করে?"

সোমেন্দ্রের এক আধটু কলমচালাইবার অভ্যাস ছিল। সে মাঝে মাঝে একটু আধটু লিখিত, কিন্তু কখনও তাহা সমাপ্ত করিত না, অসম্পূর্ণ অবস্থায় সেগুলি টেবিলের উপর জমিত। মাঝে মাঝে দ্বিপ্রহরীয় আসরে তাহার সতীর্থবর্গ তাহার সমালোচনায় দিবাতিপাত করিত।

"এটা কি হে?"

বলিয়া সোমেন্দ্র একটা লেখা হাতে নিল। সোমেন্দ্র বলিল, "আহা! অনধিকার চর্চ্চা কোরো না।"

শশীশেখর ততক্ষণে জোরে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—"রূপ পারাপারের সেতু। ইহার উপর দিয়া-ই নরনারীর হৃদয়ের যাত্রা পথ। পরপারবর্ত্তী মনোমন্দিরে পঁহুছাইয়া দেওয়াই তাহার কাজ, তাহার পরে তাহার বিশেষ কোন ও প্রয়োজন থাকে না। দীপশলাকার মত ইহা প্রেমকে প্রজ্বলিত করে, তাহার পর আপনার ভস্মের ভিতর নির্ব্বাণ লাভ করে। এই পার করিয়া দেওয়া—

আত্মার মন্দির পথে পঁহুছাইয়া দেওয়া, নিশীথের অন্ধকারে আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়া তোলা—ইহাতেই তাহার সার্থকতা!"

"ওরে বাবা! বেজায় দর্শন ঝেড়েছ যে!"

"আরে ওটা সুধীর বাবুর ফরমাশ? ওটা নিয়ে আবার কি আরম্ভ কর্ল্লে। বল দেখি, টেষ্টের কি কর্ল্লে!" বলিয়া সোমেন্দ্র কাগজখানা টানিয়া সরাইয়া নিল।

"চুলোয় যাক্ তোমার টেষ্ট, এখন যে টেষ্ট নিয়ে পড়েছি, তা' থেকে উদ্ধারের পথ পেলে বাঁচি!"

"কি হোল আবার?"

"দিদি ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছেন, যে রাধারাণীকে বধূ কর্‌লে তিনি এ বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখ্‌বেন না। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে এইটা ভেদ করে ফেলেছেন, যে ঠাকুরমা তিনকুলে কেউ, নেই, ঘরে দুমুঠো ভাতের সংস্থান নেই, এমন একটা মেয়ে আমার জন্যে যে যোগাড় করেছেন, তার মানে হচ্ছে, এক ঢিলে দুই পাখী মারা। এমন সুচতুর সাপত্ন্য-বিদ্বেষ পরিতৃপ্তির উদাহরণ জগতে অতি বিরল। ঠাকুরমা দিনরাত কাঁদ্‌ছেন, ঠাকুরদাদার মুখ অন্ধকার, দিদি ভীমা ভৈরবী সেজে আছেন, বিয়ের আয়োজন শুভানুষ্ঠান চল্‌ছে ভাল।"

"ঠাকুরমা কি বলেন?"

"কিচ্ছু না, শুধু নীরবে অশ্রুত্যাগ। মাঝে মাঝে রাধারাণী দেখ্‌তে পাই, মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যেন সে মিলিয়ে আছে। সর্ব্বদা ভীত সচকিত ভাব। সে যেন একটা জীবন্মৃত দেহ মাত্র, উঠ্‌তে বল্লে ওঠে, বস্‌তে বল্লে বসে। যখনই দেখি তখনই অশ্রুপাতে চক্ষু রক্তস্ফীত। না সোম, এই গৃহে এই অনাদর অশান্তি নিগ্রহ ও অশ্রুজলের ভিতরে, এই নিত্যকলহ কৌটিল্য ও মিথ্যা গ্লানির মধ্যে আমি তাকে বলিদান দিতে নেব না!"

"একশ্চন্দ্র তমোহন্তি। পরিজনের গ্লানির ভয় এতই কি বেশী? তুমি পরশ পাথর সঙ্গে আছ ত।"

"ভুল সেটা, তোমাদের ভুল। আমাদের বন্ধুবধূর স্বামীর সঙ্গেই একমাত্র সম্বন্ধ নয়। পরিজনের সঙ্গে সম্বন্ধটাই তার চেয়ে অনেক বেশী। 'একশ্চন্দ্র স্তমোহন্তি' কিন্তু সে চন্দ্র শুধু মধ্য রাত্তের নিরালস নয়নের জড়তার ভিতর সমুদিত হন, এবং রাত্রির বিলীয়মান স্বপ্নেরই একটা অংশ,—তার বাস্তব জীবনে, যেখানে তার সমস্ত সুখ দুঃখের নাড়ী আত্যন্তিকভাবে সচেতন, সেখানে তার কোন ও অস্তিত্ব নেই। তার জীবনের সব চেয়ে নিরাশ্রয় সময়টা তার নিরুপায় অশ্রুজলে কাটে।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশীশেখর কহিল, "তার পর দেখ, ভাগ্যের কি ফের, রমেশ বাবু মারা গেলেন, দিদি কাশী থেকে চলে এলেন। রোজ রোজ এত কান্নাকাটি ঝগড়া কাঁহাতক বরদাস্ত হয়! ওঁকে ছেড়ে কোনও কাজ করা অসম্ভব; বাড়ীতে শান্তি স্বস্তি আর থাকে না তা হ'লে। এরূপ অবস্থায় রাধারাণীকে নিয়ে আমি কি করব! স্ত্রী স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, পরিবর্ত্তে স্বামী তাকে সংসারের সমস্ত আঘাত থেকে, দুঃখ কষ্ট, অভাবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু আমি তাকে গ্রহণ করার অপরাধেই তাকে এমন গুরু দণ্ডাধীন কর্‌ব, যে সে তার চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া আরেক কথা হচ্ছে ঠাকুরমা। আমার তাঁকে রক্ষা কর্‌তে হবে সোম! নিরীহ নির্ব্বাক ভালমানুষ বেচারা চিরজীবন এ গঞ্জনা সহ্য কর্ব্বেন। ঠাকুরমা যদি আমার নিজের ঠাকুরমা হ'তেন, তা হ'লে এসব কথা, আমি গ্রাহ্য কর্‌তুম না, কিন্তু যখন এর মধ্যে সাপত্ন্য বুদ্ধির কথা উঠেছে, তখন আমার তাঁকে বাঁচাতেই হবে।"

ধীরে সোমেন্দ্র বলিল, "দেখ, ভেবে দেখ ভাল করে, ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত না করাই ভাল।"

"তুমি আমার অবস্থাটা ভাল ক'রে হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারছ না। ঝোঁকের উপর আমি কিছুই বল্‌ছি না। আমি ভেবেছি, দিন রাত ভেবেছি,

চিন্তায় আমার হৃদয় জর্জ্জর হয়েছে। চোখে আমি কিছুই পরিষ্কার দেখ্‌ছি না, সব যেন ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। আর, শুনেছ?"

"কি?"

"তুমি আমাকে পাষণ্ড মনে করবে, কিন্তু কি কর্ম্ম ভাগ্যচক্রে পতিত হয়ে আমি কি যে হয়েছি, কি কর্‌ছি তা নিজেই কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। দিদি আর এক মেয়ে ঠিক করেছেন, –"

"ইতিমধ্যেই?"

"ইতিমধ্যেই! আর আমি তাতে কোন ও আপত্তি করি নাই। সাম্‌নের তারিখেই বিয়ে।"

"ঠিক হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

অনেকক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে সোমেন্দ্র কহিল, "তারপর?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া শশীশেখর কহিল, "সেটা সময়ে কেটে যাবে সোম! অঙ্কের একটা বিধরণ রেখা, সময়ে ঢাকা পড়ে যাবেই! এতগুলা লোকের সুখ শান্তি দলিত করে' নিজের অভিলাষ পূর্ণ করা অতি হীনতা!"

"সব ঠিক্ তবে?"

"সব ঠিক্!"

ঘরের ভিতর একটা গভীর নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

সহসা সোমেন্দ্র ডাকিল, "শশী!"

মাথা তুলিয়া শশীশেখর বলিল, "কি?"

"আমার একটা ভিক্ষা আছে তোমার কাছে।"

"কি ভিক্ষা?"

সোমেন্দ্র নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল।

বিস্মিত হইয়া শশীশেখর বলিল, "ব্যাপার কি? দয়া করে মনোভাব ব্যক্তই যদি কর্ল্লে, তবে খুলে বল না!"

সোমেন্দ্র শশীশেখরের মুখের দিকে চাহিল। সেই স্থির প্রশান্ত দৃষ্টির ভিতর দিয়া মহাযুধির গভীর ভাব জাগিয়া উঠিল।

শশীশেখর উঠিয়া আসিয়া সোমেন্দ্রের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "কি তোমার ভিক্ষা সোম?"

প্রগাঢ়, অবরুদ্ধ স্বরে সোমেন্দ্র বলিল, "রাধা-রাণীকে আমায় দাও!"

দুরন্ত আশা

(শ্রীলীলা দেবী)

মরণেতে যদি পাই চাহিনা রাখিতে
শুন্য এ জীবন,
দুঃখ বেদনায় পেলে হবো না যে কভু
সুখে নিমগন!
নিষ্করুণ কাঁটা বনে দেখা যদি মেলে
যাবো না যে আর—
—কুসুম কাননে, বেলা, বকুলের বনে,
মালঞ্চের ধার!
বজ্রাঘাতে হে প্রাণেশ পাইলে তোমায়—
সে ত মহা সুখ!
দামিনী হানিলে নভে দু'হাত বাড়ায়ে
পেতে দিই বুক!

অনুভূতি

(গল্প)

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(১)

সেই মাত্র ডাক্তার দেখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। লিভারের যন্ত্রণায় ও কলিকের বেদনায় নরেন্দ্রনাথ শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছেন। শরীরটা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভুগিয়া ভুগিয়া বেচারী উৎসাহহীন অবসন্ন জীবনটা যেন আর অকারণ টানিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছেন না। পদে পদে ঘাতাঘাত খাইয়া উপায়হীন প্রতিকারের কল্পনায় মাঝে মাঝে তাঁর অধরপ্রান্তে দুর্ব্বলের ক্ষীণ হাসির ক্ষণস্থায়ী রেখাটুকু অতি কষ্টে একবার ফুটিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। অনেক করিবার ছিল, কিন্তু, কিছুই করা গেল না, এমনই একটা নিঃফলতার বেদনা-করুণ দীর্ঘশ্বাস সময় সময় তাঁহার নিভৃত হৃদয়ের অন্তস্তল বিদীর্ণ করিয়া নির্জ্জন কক্ষের রুদ্ধ বাতাসের ভিতর আত্মহারা হইয়া ফিরিত।

ছাদের কার্ণিশের উপর একটা কাক অনেক-ক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টমনে তাহার বাসা নির্ম্মাণ করিতে ছিল। সহসা নরেন্দ্রনাথের শূন্যদৃষ্টি এই বায়সকুল-তিলকের কর্ম্মপটুতার উপর আকৃষ্ট হইল। নরেন্দ্র-নাথ দেখিলেন কাকটি প্রাণপণ শক্তিতে তাহার ঘর বাঁধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে সে এক একবার কোথায় উড়িয়া যাইতেছে, অল্পক্ষণ পরে ঠোঁটে করিয়া কতকগুলি বাসা প্রস্তুত করিবার সরঞ্জম খড় কুটি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় আরব্ধকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছে। কাকের কার্য্যকলাপ তাঁহার নিকট বেশ একটি অভিনব অনুষ্ঠান বলিয়া মনে হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথের গৃহের সম্মুখের কার্ণিশের উপরই কাক খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার বাসা নির্ম্মাণের নিরাপদ স্থান করিয়া লইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গ জীবনের রোগক্লিষ্ট, কর্ম্মহীন দিবসগুলি, অকস্মাৎ সচকিত, ত্রস্ত, বায়সের দৈনন্দিন কার্য্যগুলিকে বেশ করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটাইয়া দিল। তিনি দেখিতেন, এই বাসায় একটী নবজাত বায়স শিশু তার পিতা মাতার অপূর্ব্ব স্নেহ ও ভালবাসায় প্রতিপালিত হইতেছে। বুঝি এটি নিশ্চয় ওর মা হইবে? ঠোঁটে করিয়া আহার আনিয়া কেমন প্রীতি ও স্নেহভরে সন্তানের মুখে ভরিয়া দিতেছে।

সেদিন, কলিকের ব্যথা অত্যন্ত বাড়িয়াছে। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, "আপনি কবিরাজী করুন। আমি ত আপনার কোন উপকার করিতে পারিলাম না।" নরেন্দ্রনাথ সে বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেছেন। মনটা ও বড় ভাল নাই। নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্যটাই যেন, দিন দিন তাঁহাকে বেশী করিয়া তাঁহার অসহায় অবস্থাটা বুঝাইয়া দিয়া চিন্তার কারণকে গভীর হইতে গভীরতর করিতেছিল। নরেন্দ্র-নাথ, জমিদার সন্তান হইলেও শিক্ষিত, মিতব্যয়ী ও ধর্ম্মভীরু লোক। তাহার স্বর্গীয় পিতা যথেষ্ট অর্থ ও জমিদারী রাখিয়া গেলেও তিনি সাধারণ জমিদারের ন্যায় অলস শ্রমবিমুখ বিলাস-পরায়ণ জীবন অতিবাহিত করিতে পচ্ছন্দ করিতেন না। তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার একার্য্য আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহই সমর্থন করিতেন না; বরং সকলেই সম্মুখে পশ্চাতে তাঁহাকে কৃপণ অর্থপিশাচ ইত্যাদি

নানাবিধ অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে অণুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইত না।

নরেন্দ্রনাথের দেশ খুলনা জেলায়। তিনি কিন্তু অধিক সময় কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। দেশে স্বাস্থ্য বড় ভাল থাকিত না। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া আসিয়াছিল। ইহার উপর কিছু দিন হইল, তাঁহার একমাত্র পুত্র ইহধাম পরিত্যাগ করিলে তাঁহার স্ত্রী শোকাভিভূত হইয়া বংসর দুই মাত্র কোন মতে মরিয়া বাঁচিয়া ছিলেন। তিনিও স্বামীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া সকল দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার কঠিন পেষণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় নরেন্দ্রনাথ সাধারণের মত বাহিরে যদিও হা-হুতাশ করিলেন না; কিন্তু বিধাতা তাঁহার সমস্ত অস্থি পঞ্জর, আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ, চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিলেন। মানবের অপূর্ব্ব সম্পদ স্বাস্থ্য—তাহার নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইল। এত বড় আঘাতের পর ঔষধ চিকিৎসাদি কোন দিন তাহা ফিরাইয়া আনিয়া দিতে পারে? কন্যা কয়টীকে অবলম্বন করিয়াই নরেন্দ্রনাথের সংসার। তাহাদের মুখ চাহিয়া তিনি তাঁহার অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। বিধাতার বিচিত্র বিধান! বর্ষার অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্যুতের ক্ষণস্থায়ী আলোক-সম্পাত ক্লান্ত পথিকের নিকট যেমন আশ্বাসের পরম পবিত্র বার্ত্তা বহিয়া আনে, নরেন্দ্রনাথের শোকভারপীড়িত অবসন্ন অন্তরের নিকট এই মেয়েকয়টীর সহানুভূতি সেইরূপ আনন্দের বাণী বহিয়া আনিত।

(২)

"বাবা ডাক্তার কি বলিয়া গেলেন?" বলিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলামণি পিতার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রনাথ যেমন শুইয়াছিলেন, তেমনই নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল, এমন প্রাণহীন স্নেহশূন্য প্রশ্নের জবাব দিয়া অভিনয় করিতে আর যে পারা যায় না? দয়া-মায়া লেশহীন এমনই কতক-গুলি একঘেয়ে শব্দ দিবারাত্রি পরের পর শুনিয়া তিনি একপ্রকার অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডাক্তার কি বলিয়া গিয়াছেন, জানিয়া যে কন্যার বিশেষ কোন লাভ নাই, এবং তাহা জানিবারও প্রকৃত উদ্দেশ্য লইয়া যে সে একথা জিজ্ঞাসা করে নাই, তাহা নরেন্দ্রনাথ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। রোগীর ঘরে আসিলে সকলকেই এমনই একটা সহানুভূতিসূচক প্রশ্ন করাই যে শিষ্টাচার-সঙ্গত—তাহা নরেন্দ্রনাথ জানিতেন; কিন্তু, বহুদিন ধরিয়া আত্মীয়স্বজন, পরিচিত বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে এই একই প্রকার ব্যাকুলতাশূন্য মৌখিক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসার, অসীম অত্যাচার নিরুত্তরে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি রোগ যন্ত্রণায় যখন অধীর হইয়া পড়িতেছেন, প্রাণপণ সংযমে যখন তাহার কোন চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ হইতে দিতেন না, ভিতরের শিরা উপশিরা মাংসপেশীগুলি যন্ত্রণার কঠিন নিষ্পেষণে যখন ছিন্ন ভিন্ন হইবার উপক্রম হইত, তখন শোকার্ত্ত নরেন্দ্রনাথ মুখ ফুটিয়া সেবার জন্য সহানুভূতির জন্য তাহারও প্রতি তাঁহার বেদনা-কাতর করুণ নয়নদুটী তুলিয়া চাহিতেন না। কারণ তিনি মনে বুঝিতেন হয় ত কোনও নিকটতম প্রিয়জনের পরিহাস—উৎফুল্ল নয়নের মধ্যে ঘৃণাভরা অন্তরখানির জঘন্য নগ্নমূর্ত্তি তাঁহার সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সে দৃশ্য রোগ যন্ত্রণা অপেক্ষা যে সংস্রগুণে অসহ্য! আজকাল নরেন্দ্রনাথের নিকট এইরূপ একটা আশঙ্কা অহরহ পীড়া দিয়া থাকে। তাঁহাকে যাহারা দেখিতে আসিতেন, তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের প্রশ্ন সকলের ভিতর আন্তরিকতার অভাব যে রহিয়াছে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেন—তাঁহার মনে হইত এই সকল লোক যেন মিথ্যা অভিনয় করিয়া যাইতেছে। আর এরূপ বিশ্বাস করিবার তাঁহার যে যথেষ্ট যুক্তি

ও কারণ ছিল না তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন যাহাকেই তিনি প্রীতিভরে আপন করিয়া টানিয়া লইতে প্রাণপণ যত্নে অসঙ্কোচে শোকভার পীড়িত শীর্ণ বাহুদ্বয় বড় আশায় প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, সেখান হইতে পাইয়াছেন—অকারণ বিদ্বেষ, পুঞ্জীভূত প্রচ্ছন্ন ঘৃণা আর সহানুভূতির ঘৃণিত অভিনয়। বেচারীর নিকট সত্য মিথ্যা একাকার হইয়া গিয়াছিল। ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন যে থাকিতে পারে, এমন সত্যটাও তিনি উপেক্ষা করিতে মোটেই কুণ্ঠিত বা দুঃখিত হইতেন না, বরং কোনখান হইতে সত্য সত্যই যদি কোন প্রকার সেবা বা সমবেদনা আসিত, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে হইত এগুলি অধিকতর মার্জ্জিত এবং শিক্ষিত চেষ্টার অপূর্ব্ব অভিনয়। সেগুলিকে তিনি অধিকতর সন্দেহ ও শঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিতেন। আঘাত পাইয়া পাইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাঁহার এমন অবস্থা হইয়া গিয়াছিল যে, অনেক সময় তাঁহার উপেক্ষাভাব অনেককে ক্ষুণ্ণ করিত।

কমলমণি পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা ডাক্তার কি বলিয়া গেলেন? আগেকার চেয়ে ভাল বুঝেন ত?"

কন্যার কথায় এবার নরেন্দ্রনাথ একটু ম্লানহাসি হাসিয়া বলিলেন, "কবিরাজ দেখাইতে বলিয়াছেন।"

কথাটা শুনিয়া কমলমণির মুখ সাদা হইয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণের জন্য কন্যার মুখের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; পরে পার্শ্বে পতিত সংবাদপত্রখানি কষ্টে টানিয়া লইয়া তাহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

কমল আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা আজ কি খাবেন? রোজ যা রান্না হয় তাই হবে, না, মাগুর মাছের ঝোল, আর একটা নিম ঝোল, সুক্ত—"

নরেন্দ্রনাথ বাধা দিয়া বলিলেন "অত সব কিছুর প্রয়োজন নেই, খেতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছে না, যা হোক কর গে। তবে কিছু ভাতে দিতে বোলো।"

"আচ্ছা" বলিয়া কমলমণি পিতৃ সান্নিধ্য হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে নরেন্দ্রনাথ ডাকিলেন, "কমল?"

"কেন বাবা।"

"একবার এদিকে আয়, একটা কথা মনে পড়ে গেল।"

"কি কথা বাবা?"

"ডাক্তার যখন একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন, তখন একটা যা হোক ব্যবস্থা করা ত উচিত। চুপ করে পড়ে থাকলে ত আর কোন উপায় হবে না। আজ রবিবার বুঝি?"

"হ্যাঁ বাবা, আজ রবিবার। কেন? আজ কি মাছ খাবেন না?"

নরেন্দ্রনাথের আজ রবিবার মনে ছিল না। বলিলেন,—"তাই ত আজ আর মাছ করিস্ নি। কাল সতীশ এসেছিল কি? গত সপ্তাহে তার আস্‌বার কথা ছিল। কেন যে আসতে পারলে না, তার কোন সংবাদ কি তোমায় দিয়েছিল? কি যে, মাথা-মুণ্ড করছে, কিছুই বুঝতে পারি না।"

সতীশ কমলমণির স্বামী। কন্যা মস্তক অবনত করিয়া ঘরের মেঝের উপর পা ঘসিতে ঘসিতে বলিল,—"কাল রাত্রিতে এসেছেন যে।"

"বটে, তবু ভাল। কেন আসতে পারে নি কিছু বল্লে? আমার সঙ্গে ত কৈ একবার দেখা করে নি। অনেক রাত্রিতে বুঝি এসেছিল?" কথাটা বলিয়া নরেন্দ্রনাথ পুনরায় সংবাদপত্রখানি টানিয়া চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু, একটী অক্ষর যে তিনি পড়েন নাই, তাঁহার সহসা নির্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহা বুঝাইয়া দিতে কিছুমাত্র বাকি রাখিল না।

কমল বলিল, "কোথায় নাকি নেমেতন্ন ছিল, সেজন্য—"

কন্যার কথায় বাধা দিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আজকাল ছেলেদের ভিতর নিমন্ত্রণটা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। রোজ রোজ নিমন্ত্রণ খাওয়াটা ত সঙ্গত নয় বলে আমার মনে হয়, যা' তা' কতকগুলা খাওয়া বড় ভাল নয়—হঠাৎ একটা কঠিন অসুখও হ'তে পারে? সতীশদের বাড়ীর খবর সব ভাল ত?"

"হাঁ। আমার শ্বশুর নাকি শাশুড়ীকে নিয়ে বুধবার দিন পশ্চিমে হাওয়া খেতে যাবেন স্থির হ'য়ে গেছে।"

"তারা পারে, তা'দের শরীর ভাল আছে, মনে বল আছে। কথাটা বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ পুনরায় একটী সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীর ধীরে বলিলেন, "আমার অসুখ না হ'লে তোমাকে হয় ত তা'রা এই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সকলই অদৃষ্ট মা! একবার রাইচরণকে ডেকে দিস্ ত।"

এই সময় সতীশ আসিয়া শ্বশুরকে প্রণাম করিল। এ কথা সে কথার পর জানাইল, "বাবার ইচ্ছা এঁকে নিয়ে যাওয়া। বুধবার দিন আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি, আপনার মত কি?"

"আমার আর মত কি? কমলের ত শরীরটা ভাল নয়—একবার ঘুরে আসতে পারলে শরীরটা সেরে যাবে। তা, বেশ, কবে নিয়ে যেতে চাও?"

সতীশ, কমল মণির নিকট শ্বশুরের বর্ত্তমান অসুখের অবস্থার কথা, ডাক্তারের কথা সমস্তই অবগত হইয়াছিল এবং মনে মনে ভাবিয়াছিল, কেমন করিয়া কথাটা পাড়া যায়। হয়ত, তিনি কি মনে করিবেন, হয়ত তিনি রাগ করিবেন ও পাঠাইতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু, সতীশ দেখিল, শ্বশুর কিছুত মনে করিলেন না; বরং এ প্রস্তাব, তিনি যেন, আনন্দের সহিত অনুমোদন করিলেন। তখন সে মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ভাবিল অসুখের সময়, তাঁহাকে দেখিবার মত বাড়ীতে ত কেহ নাই যে একটু সেবা করে, তথাপি শ্বশুর মহাশয় একটী বারও কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। তবে কি, তাঁহার অসুখের কথা যতটা শুনা যায় ততটা কিছু নয়? তবে কি ব্যায়রাম একটা ভাণ মাত্র! না, বড়লোকের অসুস্থ হইয়া শুইয়া থাকা একটা চাল। সতীশকে অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার শরীর দুদিন পরেই সুস্থ হ'য়ে যাবে কোন চিন্তা নাই, "বাড়ীতে কেহ নাই ভাবচ!" তারপর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সেজন্য বিশেষ কিছু আসে যায় না। রাইচরণ আছে ঝি চাকর আছে, বামুন আছে। নীলার আসবার কথা আছে। তা হ'লে কবে দিন স্থির করেছ।"

"আজ বৈকালে মনে কর্‌ছিলাম! তা যা বলেন।"

"ওর আর বলা বলি কি? দিনটা ভাল থাক্‌লেই হ'ল। এখন সব গুছিয়ে গাছিয়ে নাও। কোথায় যাবে স্থির হ'য়েছে?"

"আঁজ্ঞে হাঁ। ঝাঁঝায় বাড়ী নেওয়া হয়েছে। সেখানকার জলবায়ু এখন নাকি খুব ভাল।"

তখন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, ঝাঁঝার পূর্ব্ব-নাম নোয়াড়ি ছিল। তিনি একবার সেখানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। জায়গাটী বেশ, তবে রেলের সাহেবদের একটা আড্ডা সেজন্য ষ্টেশনের দিক্‌টা মেয়েছেলেদের বেড়ানর পক্ষে বড় অসুবিধা। নদীর উপারটা খুব সুন্দর", এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা শ্বশুর জামাই এ অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। ইতিমধ্যে রাইচরণ আসিয়া দাঁড়াইল। রাইচরণ বাড়ীর সরকার। অনেকদিন এ বাড়ীতে আছে। কর্ত্তার আমলের লোক। বয়স হইয়াছে। লোকটী এ সংসারের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে, কারণে-অকারণে, অনেকখানি বেশী করিয়া জড়াইয়া ফেলিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের জন্য সে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বেশী কিছু না বলিলেও,

তাহার মুখেরও আচরণের ভিতর দিয়া তাহার অন্তরের অনেক কথাই জানা যাইতেছিল। রাইচরণকে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সতীশকে বলিলেন, "তাহ'লে বাবাজি সব ঠিকঠাক করে নাও গে, বেলা ত হ'ল।

(৩)

সতীশ চলিয়া গেলে, রাইচরণ জিজ্ঞাসা করলেন "আমায় ডেকেচেন?"

"ডাক্তার কি বলে গেছেন তা'ত তুমি শুনেছ? এখন কি করা যায় বল দেখি।"

"কবিরাজ দেখাতেই হবে, সুরেন কবিরাজকেই ঠিক করে এসেছি। ১১টার সময় তিনি আস্‌বেন। আমাদের গ্রামের নসীবাবু, কাছেই বাড়ী ভাড়া করে আছেন। তিনি আজকাল অজ হ'য়েছেন কি না, ছুটী নিয়ে চিকিৎসা করাতে কল্‌কাতায় এসেছেন। তিনি বল্লেন, সুরেন কবিরাজই কলকাতার ভিতর খুব বড় কবিরাজ। তাঁর বাড়ীতে ঐ কবিরাজ চিকিৎসা কর্‌চেন।"

"সুরেন কবিরাজ মশাই খুব ভাল কবিরাজ তা আমি জানি। বেশ তাই হোক্। আর একটা কথা কমলমণিকে সতীশ আজ বৈকালে নিয়ে যাবে তার একটা ব্যবস্থা করে দিও।"

বৃদ্ধ রাইচরণ নির্ব্বাক হইয়া কেবল বক্র দৃষ্টিতে একবার নরেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

"আমি মত দিয়েছি, রাইচরণ। কমলের শরীরটা বড় খারাপ হ'য়ে গেছে, ওর শ্বশুর, পশ্চিম যাচ্ছেন, সেই সঙ্গে যাবে—তা একবার যাক্।"

বিষণ্ণ রাইচরণের মুখ বর্ষার মেঘের মত নিবিড় কাল দেখাইতে লাগিল। চিত্তচাঞ্চল্যবশে বৃদ্ধ মনিবের কথায় উত্তর না দিয়াই সে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ পুরাতন কর্ম্মচারী রাইচরণের অন্তর যে তাহার জন্য কতদূর ব্যাকুল, কত দুঃখিত কত চিন্তিত তাহা সম্পূর্ণ অনুভব না করিতে পারিলেও কতকটা পারিতেন। রাইচরণের মুখের ভাবে তিনি বুঝিলেন, এখন কমলমণিকে পাঠাইতে সে রাজী নয়। কিন্তু উপায় কি? এ জগতে কে কাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে? কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, তাহাকে রাখিবার সাধ্যই বা তাহার কি আছে?" যাহা হউক যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন তখন নরেন্দ্রনাথের আত্মীয় অজয়চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "অনেক দিন পরে। সব ভাল ত? এ রাস্তা যে একবারে ভুলেই ছিলে? কেমন আছ ভাল ত?"

অজয়চন্দ্র সম্মুখের চেয়ারখানি নরেন্দ্রনাথের শয্যার নিকট টানিয়া লইয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন, "শুন্‌লাম তোমার বড় অসুখ, বাহিরে পর্য্যন্ত বেরুতে পার না। তুমি যাই কৈফিয়ৎ দাওনা কেন, শুয়ে শুয়ে শরীরটাকে যে একেবারে মাটি করে ফেল্লে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই?"

"তুমিও যেমন, মাটী টাটি ওসব বাজে কথা। শরীর যতদিন থাক্‌বার ঠিক থাক্‌বে। তবে সুস্থ আর অসুস্থ, যে কোন অবস্থায় হোক। এখানে তোমার হাত নাই, আমারও হাত নাই—নিয়তির হাত কে এড়াবে ভাই?"

"শুন্‌লাম ডাক্তারেরা নাকি কবিরাজী কর্‌বার কথা বলে গেছেন?"

এক ঘেয়ে রোগী দেখ্‌তে বোধ হয় তাদেরও ভাল লাগে না, তাই এই পরামর্শ দিয়ে গেছেন—যুক্তিটা বড় মন্দ নয়। ঘরে বসে বসে নূতন নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয়—আমি ত আর কার সঙ্গে বড় দেখা সাক্ষাৎ করতে পারি না,—শরীরে কুলায় না, জানই ত। আত্মীয়তা রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি কত দিন পরে এলে, তাই তোমার সঙ্গে তবু দেখা হ'ল। কবিরাজীর কথা যা' বল্‌চ ওসব আর কিছুতেই কিছু হ'বে না; তবে মন বোঝে না বলেই যা বল। বাড়ীর ভিত বসে গেছে হে, চারিদিকে এমন ফাট

ধরেছে, ওপর মেরামতে বড় একটা কিছু তার সুবিধা হবে না—গোড়া থেকে আবার নূতন ক'রে গড়ন দিতে পারে তবে যদি কিছু হয়।" কথাটা বলিয়াই নরেন্দ্রনাথ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সম্মুখের খোলা দরজার ফাঁক দিয়া মুক্ত নীল আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

তারপর অজয়বাবু তাঁর নিজের দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করিয়া দিলেন। নানা কথার পর কেবলই তাহার ছেলেদের কষ্টের কথা, সংসার একরূপ চলে না, একটা উপায় যা হোক শীঘ্র করা যে বিশেষ প্রয়োজন, এবং সে উপায়টা নরেন্দ্রের মত ধনী আত্মীয়দেরই করা কর্ত্তব্য তাহা জানাইলেন, এতদিন যে তিনি এ কাজ করেন নাই, সেজন্য বেশ একটুখানি অভিমান ও দুঃখ তার প্রতি কথার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতেছিল। আত্মীয়-স্বজনের উপকারে যদি তার অর্থ না লাগিল তবে আর উহা কি কাজে আসিবে? তাহার পুত্র নাই, স্ত্রী নাই, এবং তার বিশেষ কোন খরচ নাই। এমন অকরুণ কঠিন কথাগুলি খুব মোলায়েম করিয়া বলিতে চেষ্টা করিলেও, সেগুলি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র লেখার মতই নরেন্দ্রনাথের ব্যথিত বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যে শোণিতধারার উৎস প্রবাহিত করিতেছিল, তাহা অজয়চন্দ্র অনুভব করিতেও পারিল না। নরেন্দ্র নাথ বিনা প্রতিবাদে সব কথাই শুনিয়া যাইতেছিলেন। আর মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আদায় করা ব্যাপারটা বুঝি সর্ব্বত্রই এক রকম নজির নিয়েই হাজির হয়। খাজনা আদায় করার ভিতর, যে ভাব, পাওনা আদায় করার মধ্যেও সেই একই ভাব, আবার অনুগ্রহ আদায় করার মধ্যেও দেখি, ঠিক সেই কঠিন নিষ্পেষণ। নির্লজ্জ অনুগ্রহ-ভিক্ষা চিরদিন সম্ভ্রমহীন হইলে ও তাহার মধ্যে একটা তিক্তিহীন দাবী কেমন করিয়া আঘাত দিবার জন্য মাথা তুলিতে পারে—সে চিন্তাটাই নরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বদিক হইতে বেদনা দিতে লাগিল। চারিদিক হইতে এই প্রকার আচরণ মানুষের উপর তাঁহাকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ইদানীং সকলকেই উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতে সুরু করিয়াছিলেন। এজন্য প্রকৃত হিতৈষীগণ তাহার নিকট আসা একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ মনে করিতেন, ইঁহারা যত না আসে, ততই তার মঙ্গল; কারণ তাঁহাদের স্বার্থ তাঁহার নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহ করা। এমনই একটা মিথ্যা ধারণা তাঁহাকে, তাহার বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে অনেক দূরে রাখিয়াছিল। তিনিই ও প্রাণ খুলিয়া সরল ভাবে তাহাদের সহিত মিশিতে পারিতেন না। সকলেই যে তাহার সহিত মিথ্যা অভিনয় করিয়া থাকে এ ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাহার অর্থ ও ঐশ্বর্য্যকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও একমাত্র অবলম্বন বলিয়া যতই প্রগাঢ় ভাবে বক্ষে আকুল আগ্রহে চাপিয়া ধরিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, ততই বিশ্বনিয়ন্তার পবিত্র প্রীতি-স্নেহ ভালবাসা, করুণা, হইতে নির্দ্দয় ভাবে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া হৃদয়কে স্পন্দনহীন কঠিন পাষাণের মত, বারিশূন্য শুষ্ক মরুভূমির মত অকরুণ করিয়া অতিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছিলেন।

(৪)

একদিন বৈশাখের নবীন প্রভাতে, মেঘলেশহীন আকাশের গায়ে তরুণ অরুণের কনক রশ্মিচ্ছটা যখন বিশ্বে, জলে স্থলে, ফলে ফুলে, মধুর হাস্যলাস্যে জাগিয়া উঠিতেছিল, তখন রাঙইগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে সকলকে জানাইয়া দিল নায়েবের উপর জমিদারীর সকল ভার দিয়াও কলিকাতার বাড়ীর তত্ত্বাবধান ভার তাঁহার উপর রাখিয়া, হঠাৎ গত রাত্রিতে নরেন্দ্রনাথ কোন কথা কাহাকেও না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বহু আত্মীয়স্বজনের, ডাক্তার কবিরাজের পরামর্শে ও অনুরোধে যাহা এতদিন কোন মতে ঘটিয়া উঠা

সম্ভবপর হয় নাই, তাহা অকস্মাৎ যে কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে ঘটিয়া গেল, তাহা অনেকেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। নরেন্দ্রনাথ সঙ্গে কাহাকেও লইয়া যান নাই,—রাখিয়া গিয়াছেন কেবল একখানি ছইচক্র পত্র :—"বৃথা অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। আমাকে তোমরা একটু নিশ্চিন্ত হইতে দাও।" ইতি নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

বৃদ্ধ রাইচরণ মাথায় হাত দিয়া সেদিন বসিয়া অতীতের অনেক কথাই ভাবিল। সেই যেদিন আনন্দ তিলক-স্বরূপ নবজাত নরেন্দ্রনাথ জননী-কোল আলো করিয়া পিতার মুখে আনন্দ উল্লাসের প্রবল উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিয়া জমিদার গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আর একদিন যে দিন নবীন যৌবনের উষালোকে একটী প্রফুল্ল কমলকলিকা, শঙ্কিত-সম্ভ্রম-জড়িত চরণে, সম্ভ্রমপ্রীতিপূর্ণ নয়নে পরম কল্যাণকর বাহু বেষ্টনে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ পরিপূর্ণ নির্ভরে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। সে দৃশ্য স্মরণ করিতে বৃদ্ধ রাইচরণের নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। বৃদ্ধ জমিদার শশিকান্তবাবু নরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু-কালে নরেন্দ্রনাথকে একরূপ তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। হায় বৃদ্ধ! তুমি কি তখন জানিতে নরেন্দ্রনাথের ভাগ্যনিয়ন্তা তোমার স্নেহের দুলালের জন্য কি কঠিন মর্ম্মান্তিক অদৃষ্টলিপি লিখিয়া রাখিয়াছেন। তোমার বিপুল জমিদারী, প্রচুর ধনসম্পত্তি, যে নরেন্দ্র-নাথের অদৃষ্ট বিপর্য্যয়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম তাহা তুমি কোন দিন কি বুঝিতে পারিয়াছিল!

(৫)

যে দিন, নরেন্দ্রনাথ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি একটী বিচিত্র ঘটনা দর্শনে আত্মহারা হইয়া পড়েন। আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে পূর্ব্ব হইতেই বিরক্তিতে তাঁর মন একরূপ তিক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণাও তাঁহাকে সর্ব্বদিক হইতে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। এমন সময় তাহার গৃহের সম্মুখে কার্ণিশের উপর বায়ন দম্পতী যে বাসা বাঁধিয়াছিল, নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাহারা উহা সহসা স্থানান্তরিত করিতেছে,—ভাবিলেন, ইহার কারণ কি ও কেন ইহারা এত কষ্টে নির্ম্মিত বাসা অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতেছে? কেহ ত ইহাদের—সুখবাসে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ঘটায় নাই? তবে ইহারা কাহার উপর অভিমান বা রাগ করিয়া তাঁদের সুখ-নীড় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। এ দৃশ্যে নরেন্দ্রনাথের মনে বহুদিনের সুপ্ত একটী বেদনা-করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠিল। সুরের তালে তালে, গানের ছন্দে ছন্দে তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া অশ্রুধারা ঝলকে ঝলকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাঁহারই একটী দৌহিত্র কোথা হইতে একটি বেঁথারি আনিয়া কাকের বাসায় খোঁচা দিতেছে, ও মাঝে মাঝে ঢেল ছুড়িয়া তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। নরেন্দ্রনাথের বুঝিতে বাকি রহিল না, কেন তাহাদের সুখ-নীড় ভাঙ্গিয়া তাহারা চলিয়া যাইতেছে। ইহার পরদিন রাত্রিতেই নরেন্দ্রনাথ বোম্বাই যাত্রা করেন।

রেলে আসিতে আসিতে তাহার পুরাতন অনেক স্মৃতিই মনে পড়িয়াছিল। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে, যখন গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, ষ্টেশনের দৃশ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। যাত্রীরা নানাদিকে, নানা যানে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। কত আরোহীকে, তাহাদের আত্মীয়, স্বজন, স্ত্রী, কন্যা, পুত্র আসিয়া ব্যাকুল আগ্রহে আলিঙ্গন করিল। একটা জীবন্ত উৎসাহ, একটা অনাবিল—আনন্দ-স্রোত সমস্ত ষ্টেশনটাকে মুখরিত করিতে-ছিল। "সকলের জন্য সকলেই অপেক্ষা করিতেছে, আশা পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, সকলেরই এক একটা বিশ্রাম স্থান আছে, কাজ আছে, আনন্দ আছে, নাই শুধু আমার" বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অলসচরণে

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া বোম্বাইয়ের নৈসর্গ শোভা সম্পদ দেখিতে লাগিলেন, এমন সময়ে, একখানি ভিক্টোরিয়া গাড়ী তাহার সম্মুখে অযাচিত ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়োয়ান বলিল, বাবু গাড়িতে উঠুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তাজমহল হোটেলই এখানকার খুব বড় ও ভাল হোটেল, শীঘ্র চলুন। অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের মতই নরেন্দ্রনাথের কর্ণে এই শকট-চালকের স্বর মধুর শুনাইল।

নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, শকট-চালক ইতি মধ্যেই কুলীর মাথা হইতে জিনিসপত্র গাড়িতে উঠাইতেছে, সে, যেন সব জানে, যে নরেন্দ্রনাথ কোন হোটেলে উঠিবে। যেন কতবার তাঁহাকে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়াছে। তিনি বিস্মিত নয়নে শকট চালকের প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অসম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া সে বলিল, "উঠুন আর দেরী করবেন না; অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, স্নান আহার করতে হবে। ক'দিন গাড়িতে গাড়িতে না জানি, কত কষ্টই হ'য়েছে?" নরেন্দ্রনাথ যে মানুষের নিকট ব্যবহারে তাহার প্রতি কেবলমাত্র মূল্য ও উপেক্ষা লইয়াই কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছেন, কি আশ্চর্য্য! আবার কি না, একটা অশিক্ষিত গাড়োয়ান সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোন দিন যাহাকে স্বপ্নেও তিনি জানেন না, সেই, আজ তাহার প্রতি করুণ স্নেহপূর্ণ ব্যাকুল আহ্বানে বিদেশের জন্য অনুযোগ করিয়া অধীর হইয়া উঠিতেছে! নরেন্দ্রনাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। শকটচালক মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বিপুল বেগে ছুটাইয়া দিল। তিনিও অসহায় শিশুর মত চালকের ইচ্ছার উপর নির্ব্বিরোধে আত্মসমর্পণ করিয়া যেন অবলম্বনহীন শূন্য জীবনে কতকটা নিশ্চিন্ততা অনুভব করিয়া, অপরিচিতের আত্মীয়তাকে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভিক্ষুকের মত সবলে আঁকড়িয়া ধরিলেন। একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ স্রোত তাঁহার আত্মীয়তা-বিমুখ উত্তপ্ত অন্তরকে কোমল ও মধুর রসসিক্ত করিয়া তুলিল। নরেন্দ্রনাথ গদিতে হেলান দিয়া মুদিত নয়নে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, গাড়ী "ঘুমাও। কুলীকে পয়সা দেওয়া হয় নি।" চালক গাড়ী চালাইতে চালাইতে প্রসন্নমুখে মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনার ভুল হ'তে পারে আমার হয় নি, ব্যস্ত হবার আবশ্যক নাই।"

বিস্ময়-বিমূঢ় নরেন্দ্রনাথ আকুল কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি দিয়েছ?" আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার মত বুঝি কোন প্রশ্ন তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। কেবল মাত্র ব্যাকুল নয়নে চালকের মুখখানি দেখিবার বৃথা প্রয়াস পাইলেন। সেও কিন্তু অখণ্ডমনে সংযমের বন্ধন মানিয়া চলিতে উপদেশ দিবার ছলে সেই দিকে মুখ করিয়া চলিয়াছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে গাড়ি তাজমহল হোটেলের দ্বারদেশে আসিয়া থামিল। চালক দ্রুতপদে কোচবাক্স হইতে অবতরণ করিয়া হোটেলের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান একজন ইয়ুরোপিয়ান্‌কে ডাকিয়া কাণে কাণে কি বলিল। সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল এবং গাড়ীর নিকট আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে, তাহার সহিত হোটেলের ভিতর যাইবার জন্য সম্মান-সূচক ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া আহ্বান করিল। নরেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন, ইত্যবসরে চালক তাঁহার মোটঘাট লইয়া হোটেলের ভিতর চলিয়া গিয়াছে। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য একবার হোটেলটিকে দেখিয়া লইলেন। সত্যসত্যই কি সুন্দর মনোমুগ্ধকর সুবৃহৎ অট্টালিকা। মহীয়সী মহিমার নামের সহিত ইহার যেন অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। এমন সুদৃশ্য ও এতবড় সর্ব্বজাতির সম-অধিকার বিশিষ্ট হোটেল তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখেন নাই। ইয়ুর্ড তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট ঘর দেখাইয়া দিলেন। সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে তাহার দ্রব্যাদি সযত্নে যথাস্থানে সুন্দরভাবে রাখা হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ মুক্ত জানালার নিকট

দাঁড়াইবা মাত্র দেখিলেন, অম্বরে অনন্ত নীলাম্বু, নীল তরঙ্গরাজীর উপর শতশত অর্ণবপোত তরঙ্গান্দোলিত হইয়া অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে শ্যামল তরুলতাসমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ,—বিশ্বশিল্পীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রাণবিমোহন মনোরম চিত্র। মুহূর্ত্তের ভিতর নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অস্তিত্ব যেন ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার বিস্ময়বিমুগ্ধ ব্যাকুল দৃষ্টি প্রাণভরিয়া সেই দৃশ্য যেন আকণ্ঠ পান করিতেছিল।

পশ্চাত হইতে সম্মানসূচক মৃদুকণ্ঠে ইয়ুর্ড বলিল, "মহাশয় এ কামরা আপনার পছন্দ হইয়াছে? না, অন্য ঘরের ব্যবস্থা করব?"

স্বপ্নোত্থিত শিশুর মত লজ্জাশুভ্র ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে, নরেন্দ্রনাথ ইয়ুর্ডের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "না, এ ঘর আমার বেশ পছন্দ হ'য়েছে। ইয়ুর্ডের ইসারায় একজন খানসামা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রনাথকে সে তখন বলিল, "ইহার নাম, রঘুজি ইহাকে আপনার ভৃত্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। আপনার যাবতীয় প্রয়োজন ইহাকে জানাইবা মাত্র সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে। কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না।" রঘুজ সেলাম করিয়া প্রভুর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইয়ুর্ড নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। নরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি তাঁহার নিজের ভ্রমের জন্য লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে, যে গাড়ী আমাকে নিয়ে এসেছিল, তাহার ভাড়া এবং কুলীর পয়সা কিছুই দেওয়া হয় নাই। অনুগ্রহ ক'রে, একবার তাহাকে ডেকে দিন।" মনে মনে, ভাবিলেন, ষ্টেশনের কুলীর ভাড়াও ত, সে, দিয়েছে। এতক্ষণ অনর্থক তাকে অপেক্ষা করান বড় অন্যায় হ'য়েছে, আহা বেচারী আমার ব্যবহারে না, জানি কত ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে।

"তা'কে কি ভাড়া দেন নাই? তবে কি সে ভাড়া না নিয়েই চলে গেছে? সে ত বেশ গাড়ী নিয়ে চলে গেছে।"

অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা' হলে তাহাকে ভাড়া দিবার কি উপায় হ'বে? আপনি কি তা'কে চেনেন?" লোকটার চরিত্র প্রথম হইতে, তাঁহার মনে এক অভিনব ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল।

"আমি তাকে চিনি না। মনে করেছিলাম, আপনার কোন লোক। কেন না, এখানকার কুলীর পয়সা ত সেই দিয়া গিয়াছে।"

"না, না, আমি এর পূর্ব্বে আর কোন দিন তা'কে দেখি নি। অদ্ভুত লোক ত? নরেন্দ্রনাথের বিস্ময় রাখিবার স্থান রহিল না। এ অদ্ভুত রহস্যের কোন মীমাংসাই তাহার মনে আসিল না। এতদিন তিনি দেখিয়া আসিতেছেন, সকলেই পয়সার জন্যই পাগল। পয়সার জন্যই আত্মীয়তা, বান্ধবতা, এ আবার কি? ইয়ুর্ড চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, "যদি দেখা পাইত ডেকে দিব। এখন আসিতে পারি?"

"আসুন, আবার আপনার সঙ্গে কখন দেখা হইবে?"

"আমি যথাসময়ে নিজেই আপনার সন্ধান নেব। এইটাই আমার চাকুরী মহাশয়।" তখন পুনরায় সসম্ভ্রমে অভিনন্দন করিয়া ভৃত্যের প্রতি যথা কর্ত্তব্য আদেশ দিয়া সে চলিয়া গেল।

বৈকালবেলা, ৫টার সময় একখানি ভিক্টোরিয়া গাড়ী তাজমহল হোটেলের দ্বারে অন্যান্য গাড়ীর ভিড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আরোহীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় সকল গাড়ী একে একে নিজ নিজ আরোহী লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু, ঐ ভিক্টোরিয়া গাড়ী-খানির আরোহী যখন কেহ আসিল না, তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে ও ব্যাকুল দৃষ্টিতে শকট-চালক কাহার নিমিত্ত ঘন ঘন হোটেল হইতে সান্ধ্য-বায়ু

সেবন-নির্গত ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। এই সময়, দুইজন ভদ্রলোক তাঁড়া সাইবার জন্য প্রশ্ন করিলে, চালক, অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল, "গাড়ী হাজির আছে।"

যাহার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গ অবগত না—থাকিলেও, চালকের ধৈর্য্যের অবধি ছিল না। সে ক্রমেই অতিষ্ট হইয়া উঠিল। সহিসের উপর গাড়ির ভার দিয়া চালক উৎকণ্ঠিত অন্তরে হোটেলের নির্দ্দিষ্ট কামরায় গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল তাহার প্রভাতের আরোহী নীরবে শয্যায় শুইয়া শুইয়া নিবিষ্টমনে কি ভাবিতেছেন।

সহসা গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সে বলিল, "কখন গাড়ী নিয়ে এসেছি, আসুন বেড়িয়ে আসবেন। এখানে কি এমনি করে শুয়ে থাকতে এসেছেন? দুঘণ্টা অপেক্ষা করে মনে হ'ল দেখি, অসুখ করে নি ত? রেলে এসে কি শরীরটা বড় খারাপ হ'য়েছে? সমুদ্রের ধারে একটু বেড়িয়ে এলে মনটা প্রফুল্ল হ'বে এখন?" তারপর "বেহারা" বলিয়া ডাকিবা মাত্র রমুভি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। "বাবুর মুখ ধোবার জল দাও, বেরোবার কাপড় শুকিয়ে দাও।"

নরেন্দ্রনাথের মনে হইল, একি স্বপ্ন! অনেক দিন ত এমন মধুর অভিযোগ সে কাহারও নিকট হইতে শোনে নাই। মনে মনে ভাবিল, এমন মধুর প্রকৃতির লোক কেমন করিয়া গাড়ীচালকের অদৃষ্ট লাভ করিল? তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া ইহার কুল কিনারা খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রতিবাদ করিবার মত কোন কারনাই তাঁহার মনে আসিল না। এই লোকটীর অপূর্ব্ব স্নেহের অভিযোগ নরেন্দ্রনাথের সমস্ত অন্তরটিকে এক অননুভূত আনন্দধারায় পরিপ্লুত করিয়া দিতে ছিল। এমন কি, তাহাকে যে ভাড়া দেওয়া হয় নাই, একথাটা পর্য্যন্ত তখন তাহার মোটেই স্মরণ হইল না। অনেকদিন পরে তিনি যেন একটা স্বস্তি পাইলেন।

নরেন্দ্রনাথ বিনা প্রতিবাদে মুখ হাত ধুইয়া কাপড়গারিতে সুরু করিলেন। কাপড় পরিতে পরিতে বলিলেন "আমি তোমায় কি বলে ডাক্‌ব?"

এ প্রশ্নে চালক যেন একটু চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া পড়িল। তাহার মুখখানি সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে তাঁহার দিক হইতে মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া ধরা গলায় উত্তর করিল, "আমাকে মাধব বলিয়া ডাকিবেন।"

সিঁড়ি দিয়ে নামিতে নামিতে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মাধব, তুমি কতদিন গাড়ি চালাচ্ছ? গাড়ি চালাতে তোমার তোমার কষ্ট হয়? বৃষ্টি ও রৌদ্রের মাথায় ক'রে গাড়ি হাকান বড় কষ্টকর।" কথাগুলা বলিয়া নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এ প্রশ্নের মাধব কোন উত্তর দিল না। তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটা পুরাতন সুপ্ত-স্মৃতি অকস্মাৎ জাগিয়া তাহার নয়ন জলভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

আপোলো বন্দরে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়। নরেন্দ্রনাথ সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বদা বিষাদ ভারাক্রান্ত মনে কোথা হইতে কাহার মোহন যাদুস্পর্শে এক নবীন আনন্দের কনকবন্যা ছুটিল—নূতন আশার মধুময় বাণী তাঁহার মনে উদ্ভূত হইল। আপোলো বন্দরের চরণ চুম্বন করিয়া দিগন্ত বিস্তৃত নীলজল রাশি। সীমাহীন গগনা প্রান্তে প্রেমোচ্ছ্বাসে কি মধুর মিলনেই বিহ্বল হইয়া পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রহিয়াছে। সমুদ্রতীররস্থ পাষাণ নির্ম্মিত সুন্দর ঘাট। সিঁড়িগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডে বাঁধান। দলে দলে নরনারী হাস্যোচ্ছল আননে বেড়াইতেছে। বৈদ্যুতিক আলোক মালায় সমস্ত বন্দরটী আলোকিত হইয়া উঠিল। ব্যাণ্ডের মধুর বাজনা বাজিতে সুরু

হইল। নরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া তাহার কলিকাতার নিঃসঙ্গ দুর্ব্বহ বন্দীজীবনের কত কথাই আলোচনা করিতে করিতে একরূপ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। অনেকে চলিয়া গিয়াছে, দুই এক স্থানে মাঝে মাঝে যুবক-যুবতীরা বসিয়া বসিয়া গল্প গুজব করিতেছে। খুঁজিয়া খুঁজিয়া যেখানে নরেন্দ্রনাথ বসিয়া ছিলেন, সেখানে আসিয়া মাধব বলিল "রাত হ'য়েছে, বাসায় যেতে হবে না, আমি আর কতক্ষণ থাক্‌ব বলুন?" নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ দৃষ্টিতে চমকিয়া উঠিলেন। কি বলিবেন কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন, "তুমি কি এখনও আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছ? তা ত আমি জানি না।"

"সে আপনার জানার বিশেষ প্রয়োজন নেই, এখন বাসায় যেতে হবে না, এই সমুদ্রের ধারে সারা রাত্রি ধরে ভাব্‌বেন? আচ্ছা, চুপ করে একা ভাবতে পারেন ত? আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকতে পারে। আমি ত আর সেটা একরারে ত্যাগ কর্ত্তে পারি নি?"

নরেন্দ্রনাথ বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "মাধব আমার উপর রাগ কর্‌লে? চল যাচ্ছি।"

নরেন্দ্রনাথ জানিতে পারেন নাই, কেমন করিয়া তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে, ওই লোকটার নিকট যেন ধীরে ধীরে কতখানি ধরা দিয়া বসিয়াছেন। এই অপরিচিত লোকটীর মধুর আচরণ তাহাকে পর বা গাড়িচালক কথাটি পর্য্যন্ত স্মরণ করিবার অবসর দেয় নাই। তাই চালককে সরল ভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাধব আমার উপর রাগ করিলে।" কত আত্মীয় স্বজনের অভিমান বা রাগ বিরাগ নরেন্দ্রনাথের মনে কোন দিন ত এমন ব্যাকুল প্রশ্ন জাগিয়া তোলে নাই।

মাধব দেখিল, নরেন্দ্রনাথের কাতর নয়ন দুটি বড় অসহায় করুণ আবেদন লইয়া একদৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়া রহিয়াছে।

"রাগ কর্‌ব কেন? রাগ করা ত আমাদের অভ্যাস নাই; তবে সবে আজ এসেছেন। বেশীক্ষণ সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস লেগে পাছে কোন অসুখ করে সেই কথাই বল্‌ছিলাম।"

নরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিলেন, আমার জন্যে এত চিন্তা। কথার ভিতর কি আন্তরিকতা স্বর কি মিষ্ট!

গাড়ী হোটেলের দরজায় আসিবামাত্র, ষ্টার্ড উৎকণ্ঠিত আগ্রহে গাড়ির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "এই যে এসেছেন। নটা বে'জে গেছে। খাবার ঘণ্টা হ'য়ে গেছে। কিছু খিয়ে রে'খে যান নাই। বড় ভাব্‌ছিলাম। চলুন।"

নরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি আপনার কামরায় চলিয়া গেলেন। আহার করিতে বসিয়া তাহার মনে পড়িল। আজও ত মাধবকে গাড়ী ভাড়া দেওয়া হইল না, বড়ই লজ্জার কথা। ছি! ছি! লোকটা নিশ্চয় কাল আর আসিবে না। তাহাকে দেখিলেই আমি সব যেন ভুলিয়া যাই। গরীবলোক, খাটিয়া খায়, ভাড়া না পাওয়ায় নিশ্চয় তার খুবই অসুবিধা হচ্ছে; কাল আসিবা মাত্র তার ভাড়া চুকাইয়া দিব।

(৬)

যথারীতি সেদিন সকালে মাধব গাড়ী লইয়া হোটেলের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেন্দ্রনাথ তাহার জন্যেই, অত্যন্ত ব্যাকুল অন্তরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। জানালা দিয়া তাহাকে দেখিয়া কাপড় ছাড়িতে সুরু করিয়া দিলেন। মাধব সেদিন তাহার একটী কন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। কন্যাটীর বয়স প্রায় ১৪।১৫ বৎসর। অত্যন্ত সুন্দরী। সে একটী সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের তোড়া লইয়া আসিয়াছিল। মাধব নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া কন্যার কাণে কাণে কি বলিল। কন্যা অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাবে অভিবাদন করিয়া পুষ্পস্তবকটী তাহার

হস্তে প্রদান করিল। নরেন্দ্রনাথ এই প্রকার অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া মাধবের প্রতি চাহিয়া বলিলেন তোমার সঙ্গে "মেয়েটি কে?"

এতক্ষণ মেয়েটি একদৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিতেছিল। যেন তাহার চেহারার সহিত মনে মনে কাহার চেহারার মিল করিতেছিল।

"মেয়েটি আমার! আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে?"

নরেন্দ্রনাথ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। একটী যুবতী কন্যাকে একজন অপরিচিত বিদেশীর সহিত কন্যার পিতা যে কোন দিন পরিচয় করাইয়া দিতে পারে এ ধারণা তাঁহার ছিল না। এমন একটী সম্পূর্ণ অসম্ভব আচরণ তাঁহার নিকট কেমন কেমন ঠেকিল। কি বলিয়া এই সুন্দরী কন্যাটিকে যে তিনি অভ্যর্থনা করিবেন তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না।

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল, "এই তোড়াটি আমি বাঁধিয়াছি। ফুলগুলি সব আমাদের বাগানের। ফুলগুলি যেমন সুন্দর, তোড়াটি কিন্তু তেমন সুন্দর হয় নি।"

নরেন্দ্রনাথ উপহার লইয়া ধন্যবাদ দিলেন; কিন্তু কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া তিনি যে অন্যায় করিয়াছেন, মনে হইতেই তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আপনার ফুলগুলি যেরূপ সুন্দর তোড়া প্রস্তুতের কারুকার্য্যও তদ্রূপ; আর শিল্প চাতুর্য্যের মাধুর্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।"

প্রশংসাসূচকবাক্য শুনিয়া মেয়েটি দৃষ্টি অবনত করিল।

নরেন্দ্রনাথ সে দিন, প্রাতঃরাশ সমাপন করিয়া মাধবের কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। সে দিন প্রতিভার কথামত, নানাস্থান ঘুরিয়া ক্রফার্ড বাজারে যাওয়া হইল। মেয়েটার নাম প্রতিভা। নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, মেয়েটির নামকরণ খুব সঙ্গত হইয়াছে। তাহার মুখে চোখে প্রতিভা এমন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। স্বচ্ছ চঞ্চল তরঙ্গের মত একটী অনাবিল মধুর হাস্য সর্ব্বদাই তাহার মুখে লাগিয়াছে। সামান্যক্ষণের ভিতর নরেন্দ্রনাথের সহিত সে বেশ পরিচয় করিয়া লইয়াছে। তাহার এখন কোন বাধা বা সঙ্কোচ নাই। সহোদরা ভগিনীর মত তাহার সহিত আলাপ করিতে করিতে বেশ স্বচ্ছন্দ মনে সে বাজারের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নরেন্দ্রনাথকে সে অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিতেছিল। একটী রেশম ব্যবসায়ীর দোকানের নিকট আসিয়া নরেন্দ্রনাথ সিল্ক দেখিতে লাগিলেন এবং প্রতিভাকে বলিলেন, "কোন্‌টি রং আপনার পছন্দ হয় বলুন দেখি। সেও একখানি সুন্দর আসমানী রংএর থানের উপর হাত দিয়া বলিল, "এ রংটা আমার খুব পছন্দ হয়। এই নিন।" দরদস্তুর করিতে প্রতিভাই অগ্রবর্ত্তিনী হইল। নরেন্দ্রনাথ সেই থানটি কিনিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে, গাড়ী হোটেলের দ্বারে আসিলে, নরেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার সময় সেই থানটি প্রতিভার হাতে দিয়া বলিলেন, "এখন এটা নিন, আপনাকে দেশ থেকে সুন্দর ঢাকাই কাপড় এনে দিব।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া "নমস্কার" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ হোটেলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শুধু তাহার কাণে গেল, "সামান্য ফুলের মূল্য এতটাকা মূল্যের কাপড় নয়।"

[৭]

তারপর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। মেয়েটী সে দিনের পর আর আসে নাই। তাঁহাকে বোম্বাই সহরের নানাস্থান ঘুরাইয়া দেখান যেন মাধবের দৈনন্দিন কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। বেশ একটা আনন্দের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথের কর্ম্মহীন দীর্ঘ গ্রীষ্মের অলস দিন গুলি কাটিয়া যাইতেছিল। সহরের নূতন নূতন দৃশ্যাবলী দেখিয়া তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য অনেকটা

সারিয়া আসিয়াছে। এখন বেড়াইবার নেশা তাঁহার মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। নিত্য নূতন স্থানের আবিষ্কার চেষ্টাই তাহার এই অভিনব জীবনের প্রধান চিন্তা। এই চিন্তার সহায় ও পরামর্শদাতা একমাত্র মাধব। মাধব যতই দেখিতে পাইল, যে নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বের মত কি এক দারুণ চিন্তাভারনত অবসন্ন অন্তরে, উৎসাহ শূন্য অলস দৃষ্টিতে, কেবলই শয্যায় পড়িয়া থাকেন না, ততই তাহার আনন্দের মাত্রা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। মাধবের সহিত নরেন্দ্রনাথের বেশ একটী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ভাব উভয়ের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছিল। এই ভাবটি নরেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেইজন্য, সে মাধবকে একজন সাধারণ গাড়ীচালক বলিয়া ভাবিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিত। আজ কাল ভাড়ার কথা উঠিলে নরেন্দ্রনাথ সে চিন্তাকে কোন দিক দিয়া সমর্থন করিতে সাহস পাইতেন না। কেমন করিয়া ভাড়ার কথা, তিনি তুলিতে পারেন। অমন অকপট বন্ধু মাধবের কাছে ভাড়ার কথা তুলিলেও তাহাকে যে কতখানি ছোট করিয়া দেওয়া হইবে, নরেন্দ্রনাথ তাহা অন্তরের অনুভূতি দিয়াই বুঝিতেন। হয় ত নরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে মাধব এইরূপ অকরুণ আঘাত পাইলে তাহার অভিমান ও অপমান রাখিবার মত স্থান বুঝি সারা বিশ্বে খুঁজিয়াও সে পাইবে না। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই ভাড়া দেওয়ার কথাটা আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রনাথ এ বিষয় অধিক করিয়া ভাবিতে পারিতেন না।

বেলা ৯ টার সময় মাধব গাড়ী লইয়া আসিল। নরেন্দ্রনাথ প্রস্তুতই ছিলেন। ষ্টীমারে করিয়া তিনি আজ বেড়াইতে যাইবেন এবং সন্ধ্যায় ৭ টার সময় ফিরিয়া আসিবেন। নূতন স্থান দেখিবার আনন্দ ও উৎসাহ তাঁহাকে অধীর করিয়া রাখিয়াছে। মাধব আসিবা-মাত্র নরেন্দ্রনাথ নামিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "ষ্টীমার পাওয়া যাইবে ত!"

"এখন আধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে।"

যথা সময়ে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ জাহাজের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বোম্বাই সহরের নয়ন-মোহকর দৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। জাহাজধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকে রুমাল উড়াইয়া বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে আনন্দ উল্লাস প্রদান করিতে লাগিলেন। সহসা নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়িল, সেই ভিক্টোরিয়া গাড়িখানির প্রতি—তিনি দেখিলেন মাধব তখনও গাড়ীর কোচবাক্সে বসিয়া, জাহাজের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। নরেন্দ্রনাথ মাধবের স্নেহ ও ভালবাসার কথা ভাবিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। জাহাজের ডেকের উপর চেয়ারে বসিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; আচ্ছা মাধব আমার কে? সে কেন আমার জন্য এত কষ্ট করে? আমি আসিয়া পর্য্যন্ত সে ত আর কাহাকেও গাড়িতে তোলে না? কোন দিন ভাড়া পর্য্যন্ত চায় না? আমার সহিত ত তাহার কোন পরিচয় কোন দিন ছিল না? তবে কেন সে, আমার জন্য এতটা উদ্বিগ্ন? এতটা অনাবিল স্নেহ কোথা হইতে আমার জন্য তাহার অন্তর ভরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। অনেক সময় সে যেন তন্ময় হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। যেন আমার মুখের ভিতর সে কোন বিচুর সন্ধানে ব্যস্ত! আমি সে দৃষ্টির দিকে ত মোটেই তাকাইতে পারি না, মনে হয় তাহার অন্তরের নির্জ্জন প্রদেশে কি যেন কি একটা প্রচ্ছন্ন হাহাকার, সর্ব্বদা তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছে। কতদিন মনে করিয়াছি কারণ কি জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু তখনই আশঙ্কায় প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছে। মনে হইয়াছে, যদি মাধব আমার মতই হতভাগ্য হয়! যদি তার একমাত্র—নরেন্দ্রনাথের নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া আসিল—সে আর ভাবিতে পারিল না। ধীরে ধীরে জাহাজ বহুদূরে চলিয়া গেল—শেষে দৃষ্টির অগোচর হইয়া আসিল।

তখন মাধব আস্তে আস্তে গাড়ী লইয়া গৃহে ফিরিল। পথে তাহার অনেক দিনের পুরাতন কথা স্মরণ হইতে লাগিল—সে আমাদের এত দুঃখ দিয়া চলিয়া গিয়া না জানি, কত কষ্ট পাইয়াছে! সে যদি, থাকিত তবে কত সুখ হইত। সে, গেল কিন্তু, আর ত ফিরিল না! তাহার অন্তর ত এত কঠিন কোন দিন ছিল না—পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা সে একেবারে অকৃতজ্ঞতার নির্ম্মম হস্তে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়াছে? না, না, তাকি সে পারে? আজ ষোল বৎসর হ'য়ে গেল, তার জন্য প্রতিদিন ত গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করে থাকি। তার' অন্তর কি আমাদের অন্তরের ব্যথা জান্‌তে পারে না! তবে বুঝি তার কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাক্‌বে। নইলে সে, নিশ্চয় ফিরে আস্‌ত। সে ত জানে, সে ছাড়া আমাদের আর দ্বিতীয় পুত্র নাই। না-এতদিন পরে তাই বুঝি তাজমহল হোটেলে এসে উঠেছে! ঠিক তার মত, বয়সের জন্য যা কিছু একটু আধটু পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সেই মুখ, সেই কান, সেই বিনয় নম্র মধুর ভাষ, তাই বুঝি সে, আমাকে দেখে লজ্জায় চোখ তুলে দেখ্‌তে সাহস পায় না। তাই বুঝি আমার সমস্ত পরামর্শ নির্ব্বিবাদে মানিয়া চলে? প্রতিভাও সে দিন, দেখে বল্লে ঠিক দাদার মত। বাঙ্গালা দেশে থেকে থেকে, অনেকটা বাঙ্গালীর মত হ'লেও, সেই মিষ্ট কণ্ঠস্বর, সেই ছোট বোনটী বলে, কত আদর করে আসমানী রং কাপড় কিনে দিল। অন্য কাহারও দান হ'লে কি আমি কাপড় নিতে দিতাম। মনে হ'ল অনেক দিন পরে দাদার দেওয়া বড় আদরের জিনিষ যে——'মাধব আর ভাবিতে পারিল না। একটা অকস্মাৎ উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। এই—সে না হইয়া যায় না। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "নূতন কিছু খবর জোগাড় কর্‌তে পার্‌লে কি?"

"না, সেই এক ভাব—সন্ধান করে জেনেছি, এই কয় মাসের ভিতর তার কোন পত্রাদি হোটেলে আসে নাই—সন্দেহটা সেজন্য আরও বেড়ে চল্‌ছে? তোমায় বল্লাম ওকে একদিন বাড়ীতে নেমন্তন্ন কর—আমার চক্ষুকে সে ফাঁকি দিতে পার্‌বে না।"

"যদি সে না হয়, তাহ'লে কি আমাদের নিমন্ত্রণ তিনি নেবেন—যদি তাই হয় তবে ত দুঃখ রাখ্‌বার স্থান থাক্‌বে না। তার চিন্তা নিয়ে—তার কথা নিয়ে এক রকম সব ভুলে আছি—এই স্বপ্ন ভাঙ্‌তে আমার যে ইচ্ছা হয় না।"

"এতখানি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে যে আর থাকা যায় না, কালই তাকে নেমন্তন্ন কর, আজ যখন তিনি ফিরে আস্‌বেন, সন্ধ্যার সময় বলে রাখ্‌তে ভুল না।

"আচ্ছা বল্‌ব, ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে!"

[৮]

সে দিন বৈকাল হইতে আকাশে মেঘ জমিতে সুরু করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সমস্ত আকাশ ঘন মসীবর্ণ ধারণ করিল। একটা আসন্ন ঝড়ের রুদ্র মূর্ত্তি সকলের চিন্তার মধ্যে জাগিয়া উঠিল। পোর্ট অফিসের মাথার উপর যথারীতি ঝড়ের আশঙ্কা জনক চিহ্ন টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল।

মাধবের বুকের মধ্যে একটা ভীষণ আশঙ্কার কাল মেঘ দেখা দিল। সে গাড়ী লইয়া দ্রুত ষ্টীমার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। দলে দলে লোক আসিয়া জেটির উপর ব্যাকুলদৃষ্টিতে জাহাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কেহ কেহ দূরবীণের সাহায্যে জাহাজ কতদূরে দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের নিরাশ মুখ হইতে একটা আখাসবাণী শুনিতে পাওয়া যায়। নিষিড় ঘন অন্ধকারে আকাশ ও সমুদ্রে যেন এক হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে প্রবলবেগে ঝড় হুঙ্কার দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল, সমুদ্র তাহার সহিত যোগ

দিয়া মহোল্লাসে তাণ্ডব নৃত্য করিতে সুরু করিয়া দিল। পর্ব্বত প্রমাণ উত্তাল তরঙ্গ রাক্ষসের মত ছুটিয়া আসিয়া রোষে, ক্ষোভে, দুঃখে, পাষাণ-সংবদ্ধ তটভূমির উপর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া দর্শকের অন্তরে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে লাগিল। আসন্ন-বারি বর্ষী মেঘরাজি ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণে অচিরে তাহার আগমন বার্ত্তার ত্রাস উৎপাদন করিতে করিতে, মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। যে যেদিকে পাইল ছুটিয়া পলাইল। যাহাদের ঘরের গাড়ি ছিল তাহারা গাড়ীর মধ্যে গিয়া আত্মরক্ষা করিল। ভাড়া পাইবার আশায় যাহারা গাড়ী লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা এ দুর্যোগে কেহই অপেক্ষা করিল না। জাহাজ আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় প্রায় একঘণ্টা অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি জাহাজ আসিল না, অনুসন্ধানে জাহাজের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। মাধব তখন এক-রকম পাগলের মত হইয়া পড়িল। বহুদিনের রুদ্ধ-বেদনা, সংযত-শোক আজ প্রবল বেগে তাহাকে নূতন করিয়া আঘাত দিয়া তাহার আশার ক্ষীণ আলোটুকু পর্য্যন্ত কি লোপ করিতে চলিল? এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে সে যে আজ চার মাস বড় আশায় আনন্দ-মরীচিকার পশ্চাতে মায়া-মমতার কোমল স্নেহ শৃঙ্খলটি হাতে করিয়া তাহার শূন্য জীবনের প্রীতি বন্ধনটীকে বড় আদরে বাঁধিবার প্রয়াস পাইতেছিল, সে চেষ্টাও কি অঙ্কুরে বিনষ্ট হইবে।

মাধব আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না। নরেন্দ্রনাথের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং তার-অপিসে গিয়া জাহাজের কোন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, জাহাজের কোন সংবাদ এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ঝড় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

মাধব মূর্চ্ছিতের মত তার-অপিসের দেওয়াল ঠেস দিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল তাহা সে কিছুই জানিতে পারে নাই। তাহার মনে ছিল না, তার গাড়ী ঘোড়ার কথা, তার সহিসের কথা। মাধব যাহাকে সহিস বলিয়া পরিচয় দিত, আসলে সে একজন দক্ষ কোচম্যান। আর এ গাড়ী ঘোড়া মাধবের বড় সখের।

রাত্রি প্রায় ১টার সময় চারিদিকে একটা বিষম আনন্দোল্লাস দেখা গেল। সকলের মুখে মুখে প্রচারিত হইল, জাহাজ দেখা গিয়াছে, আর আসিতে বিলম্ব নাই। মাধবের মনে হইল সে বুঝি স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। এ কিসের চীৎকার? তবে কি সত্য সত্যই ঝড়ে জাহাজ মারা গিয়াছে, তবে কি একটী ও আরোহী রক্ষা পায় নাই। সে চীৎকার করিয়া আপনাপনি বলিয়া উঠিল, "ঐ যে নরেন্দ্রনাথ, সাঁতার দিয়া তীরের দিকে আসিতেছে! অ্যাঁ! ভগবান রক্ষা করিয়াছেন।" কথাটা বলিয়া যেমন সে চক্ষু চাহিল, দেখিল তার-অপিসের ভিতর সে দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে জাহাজ আসিয়াছে বলিয়া লোকে ছুটাছুটি করিতেছে। মাধবের বিস্ময় ও আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না। বাহিরে আসিতে দেখিল ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া নক্ষত্র-রাজি সুশোভিত হইয়াছে। সমুদ্রের সে ভীষণ আস্ফালন আর কিছু নাই।

মাধব তাড়াতাড়ি গাড়ী জেটির ধারে লইয়া গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া ভাবিতেছিল, এখন কি গাড়ী পাওয়া যাইবে? এত রাত্রে, কি জানি, হোটেল খোলা আছে কি না? ৭টার সময় ফিরবে ভাবয় সে ত, কিছু লিখিয়া রাখিয়া আসা মোটেই প্রয়োজন মনে করে নাই।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, কয়েকখানি মাত্র ঘরের গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। এই দুর্যোগে, কেহ কি ঘরের বাহির হইতে পারে? প্রাণের মমতা ত

সকলেরই আছে? এমন সময়, মাধব নিকটে আসিয়া অত্যন্ত অভিমান পূর্ণ স্বরে বলিল, "বিদেশে এতটা স্বাধীনতা লওয়া কোন রকমেই ভাল হয় নাই। এই সব দুঃসাহসিক কাজ করতে যে আপনার কোন অধিকার নাই—সেটা ভুলে যান কেন? ভগবান রক্ষা করেছেন, তাই, নইলে আজ কি হ'তো বলুন দেখি? সেই ৭টা থেকে, কি দুর্ভাবনায় যে সময় কেটেছে। তার-অফিসে থেকে যখন জানলাম জাহাজের কোন খবর পাওয়া যায় নাই, তখন—থাক্, গাড়িতে উঠে পড়ুন। বাড়ী থেকে দু'বার লোক এসে সংবাদ নিয়ে গেছে। তারা আমার মতই দুর্ভাবনার দুঃসহ যন্ত্রণা এখনও ভোগ করছে?" তারপর "চলুন," বলিয়া মাধব গাড়ীর কোচবাক্সের উপর চড়িয়া বসিল।

সেদিন নরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না। সে, নীরবে গাড়িতে গিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার সমস্ত অন্তর মাধবের অপূর্ব্ব স্নেহ-করুণ আচরণে বিস্ময়ে আনন্দে, ভক্তিতে বিশ্ব-নিয়ন্তার চরণ প্রান্তে নিঃশেষে বিলুণ্ঠিত হইয়া কেবল আর্ত্তকণ্ঠে বলিতেছিল, "আমায় ক্ষমা কর প্রভু, আমায় ক্ষমা কর।"

গাড়ী হোটেলের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাধব গাড়ী হইতে নামিয়া হোটেলের দ্বার খুলাইল।

নরেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে নামিয়াই প্রবল আবেগে, মাধবের দুই হাত নিজ দুই হাতের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমি যে তোমাকে বড় কষ্ট দিয়াছি, মা, বোনকে ত, বাড়ীতে কি উৎকণ্ঠায় রাখিয়াছি, তুমি এখনি যাও। তোমার হুকুম ছাড়া আর এক পা'ও কোথায় যাব না। আমাকে ক্ষমা কর মাধব। তা'দের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে আসব। যাও আর বিলম্ব করো না।"

মাধব সে কথার কোন উত্তর দিল না। কেহ দেখিল না যে মাধবের নয়ন তখন আনন্দাশ্রুতে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কেবল বলিল, "কাল আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ রহিল।"

(১)

ভোরের সময় ষ্টুয়ার্ড আসিয়া একখানি টেলি-গ্রাম টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি নিজের নাম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার হোটেলের বর্ত্তমান ঠিকানা ত কেহ অবগত নয়। তাহার নামে এই চারি মাসের ভিতর কোন পত্রাদি বা টেলিগ্রাম ত আসে নাই। নিশ্চয় ভুল হইয়াছে! এই নামের অপর কেহ বোধ হয় এখানে আসিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ড ভুল করিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে। তখনি ষ্টুয়ার্ডকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ তার তাহার নয়, তাহার নামের অপর কোন লোকের, তাহাকে দাও গে।"

ষ্টুয়ার্ড যথারীতি অভিবাদন করিয়া বলিল, "উপস্থিত হোটেলে তিনি ছাড়া অন্য কোন বাঙ্গালী নাই—সুতরাং এ তার সম্ভবতঃ তাহারই। খুলিয়া দেখিলেই অবশ্য বুঝিতে পারিবেন। রাইচরণ যে ব্যাঙ্ক হইতে নরেন্দ্রনাথের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া-ছিল, তাহা নরেন্দ্রনাথ কোন দিক দিয়াই মনে করিতে পারেন নাই।

নরেন্দ্রনাথ তার খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার মুখ মুহূর্ত্তের ভিতর বিবর্ণ হইয়া গেল। টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া নির্ব্বাক হইয়া অনেক-ক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। ষ্টুয়ার্ড দুঃসংবাদ অনুমান করিয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া আদেশের অপেক্ষা করিতে ছিল। নরেন্দ্রনাথ নিজে নিজে বলিয়া উঠিলেন, "আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে, যদি কস্তার সহিত দেখা না হয়।" কথাটা বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিবা মাত্র দেখিলেন, সম্মুখে ষ্টুয়ার্ড তাহার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!

"তুমি ঠিক বলিয়াছ। এ টেলিগ্রাম আমরাই।

বড় দুঃসংবাদ! আমার কন্যা মৃত্যুশয্যায় শায়িত আমাকে আজ এখনি যেতে হ'বে। তোমাদের বিলের টাকা অনুগ্রহ করে এখনি চুকিয়ে নাও। কলিকাতা যাবার গাড়ী কখন ছাড়ে?"

"বেলা ৯টার সময়। আজই যাবেন?"

"হাঁ, এখনি। আমি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করতে পারব না। তুমি যাও। বিল করে নিয়ে এসো।"

কিছুক্ষণ পরে ষ্টুয়ার্ড বিল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

তাড়াতাড়ি নরেন্দ্রনাথ সমস্ত গুছাইয়া লইয়া গাড়ীর জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ষ্টুয়ার্ডকে দিয়া কলিকাতার একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট ইতি মধ্যে কিনাইয়া আনাইলেন। আটটার ভিতর স্নানাহার কোনমতে একরূপ সারিয়া লইলেন।

ষ্টুয়ার্ডকে দিয়া এক হাজার নগদ টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিয়া একটী থলির ভিতর আবদ্ধ করিয়া নিজের সুট কেসের উপর রাখিলেন।

বেলা ৮।০ সাড়ে আটার সময় মাধব গাড়ী লইয়া আসিল। সেদিন, মাধবের আসিতে যতই বিলম্ব হইতেছিল, নরেন্দ্রনাথ ততই উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। মাধব যে নিশ্চয় আসিবে, সে বিষয় তাহার সন্দেহ না থাকিলেও, গত রাত্রির ভীষণ কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া, তাহার আশঙ্কা হইতে-ছিল। তবে কি মাধবের কোন অসুখ করিয়াছে? নিশ্চয় করিয়াছে! সে ত কোন দিন আসিতে এত দেরী করে না। অসুখ না করাই আশ্চর্য্য। আহা! বেচারী আমার জন্য যাহা করে, তা বুঝি কোন পিতাও পুত্রের জন্য করিতে পারে না। মাধবের অন্তরটী স্বচ্ছ নির্ম্মল পবিত্র স্রোতস্বিনীর মত স্নেহ-ধারায় প্রবাহিত। আজ তাহার নিকট কি বলিয়া বিদায় লইব? একথা ভাবিতে ভাবিতে নরেন্দ্রনাথের নয়ন পল্লব আর্দ্র হইয়া আসিল। বড় আনন্দ করিয়া সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। কিন্তু যখন সে জানিতে পারিবে আমি যাইতে পারিব না—যাওয়া আমার পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নয়, তখন তাহাদের মনে না জানি, কি ভীষণ দুঃখ হইবে?

এই সময়ে মাধব গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত বিছানা পত্র বাঁধা দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে, মাধব কেবল নরেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। একটি কথাও জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করিল না। নরেন্দ্রনাথ ব্যথিত অন্তরে মাধবের হাত ধরিয়া বলিল, এই দেখ, কি টেলিগ্রাম বাড়ী থেকে এসেছে। বলিয়া তাহার হাতে টেলিগ্রামখানি দিয়া তাহার মুখের দিকে অপরাধীর মত ক্ষমা প্রার্থণা করিয়া কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

মাধব নিমিষের মধ্যে টেলিগ্রামটী পড়িয়া লইয়া যেন কি ভাবিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আর বিলম্ব করলে গাড়ী পাওয়া যাবে না।" তারপর চাকরের দিকে ইঙ্গিত করি জানাইল যেন "সে সমস্ত জিনিষ গাড়ীতে উঠাইয়া দেয়।

গাড়ী ছাড়িবার ৫ মিনিট থাকিতে নরেন্দ্রনাথ ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলেন। সমস্ত জিনিষপত্র মাধবনিজ হাতে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। তাহার মুখে হাসি নাই। অকস্মাৎ যেন মাধবের সমস্ত হৃদয়টা তোলপাড় করিয়া কি একটা ভীষণ ঝড় বহিতেছিল। কে যেন, তাহার অপূর্ব্ব সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া ঘোর অন্ধকারের তট-ভূমির দিকে দৃঢ় বলে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহার যেন নিষেধ করিবার মত শক্তি বা সাহস ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই সে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিল আজ যে, তাহাদের সন্তুষ্ট পরিবারটি অনাবিল স্নেহ ধারায় নরেন্দ্রনাথকে বরণ করিয়া অনন্ত আনন্দো-চ্ছ্বাসে সুখের তরণী বাহিয়া চলিবে মনে করিয়া-ছিল—এত দিনের দুঃখকে পরাজয়ের বিজয় মাল্যে, বিদ্রূপের নিষ্ঠুর হাস্যে, দূর করিবার কল্পনায় যে আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে, সে পরিবার

নরেন্দ্রনাথকে চিরদিনের মত বিদায় দিয়া কেমন করিয়া বাঁচিবে ?

সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গার্ড হুইসিল দিয়া গাড়ী ছাড়িবার জন্য প্ল্যাট ফরমে দাঁড়াইয়া ঘড়ির দিকে লক্ষ করিতেছিল।

এই সময় নরেন্দ্রনাথ সেই টাকার থলিটি মাধবের হাতে দিয়া অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত বলিলেন, "আমি তোমার ত কিছু করিতে পারিলাম না। এ অতি সামান্য—কিছু মনে করো না,—এইটী আমার জন্য তোমাকে নিতেই হ'বে।"

মাধব অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা ভাবিতে ছিল। নরেন্দ্রনাথের কথায় সে যেন চমকিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ, যে তার স্নেহের প্রতিদান—এইরূপে সামান্য অর্থ দিয়া, কোনদিন করিতে পারেন, এ ধারণা তাহার ছিল না। স্নেহের বিনিময় যে, এমনি অপমান বহন করিয়া আনিতে পারে সে কথা, যে মাধব স্বপ্নেও কোনদিন ভুলিয়াও মনে করিতে সাহস পায় নাই। কত বড় দুঃখ, কত বড় নিষ্ঠুর আঘাত যে, এই টাকার থলিটির অভ্যন্তরে নিহিত ছিল, নরেন্দ্রনাথের অনুভূতি সে সন্ধান পাইলে হয় ত এমন কাজ করিতে মোটেই দুঃসাহস প্রকাশ করিত না।

"টাকা!" বলিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখার মত মাধব একবার হাসিয়া পর মুহূর্ত্তে শিহরিয়া উঠিল। পলকের জন্য নরেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে থলিটি প্ল্যাটফরমের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া সে ষ্টেশনের বাহির হইয়া গেল।

সেদিন, সে আর গাড়ীর কোচ বাক্সে বসিল না। আগেকার আসনের উপর অবসন্নভাবে ঢলিয়া পড়িল। মাতালের মত উচ্চ কণ্ঠে কেবল বলিল, "জোরে চালাও।" সমস্ত বিশ্বসংসার তাহার চক্ষে এক মুহূর্ত্তে নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল। মাধব তখনও পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছিল।

নরেন্দ্রনাথ নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পর মুহূর্ত্তে অত্যন্ত করুণ কাতর কণ্ঠে ডাকিলেন, "মাধব, মাধব, একটি কথা বলে যাও।'

মাধব সে কথা শুনিতে পাইল কি না, বলিতে পারি না।

গার্ড হুইসিল দিল—গাড়ী ছুটিল—নরেন্দ্রনাথ গাড়ীর জানালার ভিতর হইতে গলা পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন, মাধব তখনও তাহার গাড়ীর দিকে, কি সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে!

নিমাইর নিষ্ক্রমণ।

(শ্রীযামিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত।)

কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথি, অন্ধকারে ভরেছে ভুবন,
ত্রিযামী যামিনী শেষ, সচকিত তারার নয়ন
চেয়ে আছে অনিমেষ, আঁধারা প্রকৃতি সুন্দরী
কণ্ঠে শুধু উঠে তার ঝিল্লীরব নীরবতা ভরি'।
নিদ্রা-মোন জলস্থল, সমুদিত মহেন্দ্র লক্ষণ
মুক্ত আজ যাত্রাপথ ছেড়ে যাবে সর্ব্বপ্রিয়জন
নবদ্বীপচন্দ্র গোরা। ভাবে যুবা পুরীর মন্দিরে
বিরাটের ক্ষুব্ধ মূর্ত্তি শুনি মহাসিন্ধু তীরে
বিশাল সে কৃষ্ণ বপু, দ্যুলোক ভূলোক গেছে ভরে;

ধরা যেন ঝিল্লীকণ্ঠে ডাকে তাঁর বাঁশরীর স্বরে।
অসীম অনন্ত বক্ষে দেখিতেছে ঊর্দ্ধে চাহি তার
জ্বলিছে তারার রাজি সংখ্যাতীত কৌস্তুভের হার;
আলিঙ্গিতে চাহে মোরে কেমনে এ ক্ষুদ্র গৃহমাঝে
আপনারে রাখি বাঁধি দিবসের ধূলি খেলা কাজে;
অনন্ত ডাকিছে যারে—ছিঁড়ে তার সীমার বন্ধন
বিশ্বের বেদনাবুকে সে কি শুনে ঘরের রোদন?
ও ঘরে আছেন মাতা নিদ্রাভরা আমার স্বপনে;
গেছে দাদা আমি শুধু জ্যোতিঃ তাঁর অন্ধের নয়নে।
তাঁরেও ছাড়িতে হবে, কোটী কোটী ধরার জননী
ডাকিছে আকুল কণ্ঠে আনি দিতে নীলকান্ত মণি।
প্রিয় সহচরী পাশে যৌবনের জ্যোছনা সুন্দরী,
কি জাগ্রতে কি স্বপনে রাখে মোরে চোখে চোখে ধরি
এ মিলনে তৃপ্তি কোথা! শুনি বিশ্বে তীব্র পিপাসার
উঠে সকরুণ সুর, সান্ত্বনার মহাপারাবার
বহাব ধরণীবুকে, কি আনন্দে অয়ি বিষ্ণুপ্রিয়া
বিরহ ব্যথিত আঁখি দেখি লবে এ বিশ্ব ভরিয়া
উঠিয়াছি আমি তব; জানি আমি জাগিবে যখন
নিদ্রিতা জননী মোর বরষিবে ধরার রোদন
স্নেহ ভরা আঁখি দুটি, কিন্তু আজ পশ্চাতে তাহার
মুছাতে ডাকিছে মোরে রমণীর শত অশ্রুধার।
অন্তর বাহির ভরি প্রিয় হতে প্রিয়তম যেই,
সুন্দরের অন্তি সুন্দর ডাকিতেছে মোরে সেই।
ছেড়ে দাও যাই আমি নবদ্বীপ প্রিয় ভাগীরথী,
বরষ আশীষ পুষ্প আধারের অভিসার পথি।

সমালোচনা

(শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র)

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক "ভারতে শিল্প-বিদ্যা" - এ পুস্তকখানি সুপণ্ডিত ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের ইংরাজী পুস্তকের। বাঙ্গানুবাদ। অনুবাদক শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার মূল্য ১৲ টাকা। পত্র-সংখ্যা ১২৫+অনুবাদকের নিবেদ ।/০+মূল ইংরাজী পুস্তকের উপক্রমণিকা ১।০+সূচনা ৵+সূচীপত্র ৪+নির্ঘণ্ট ২৫।

অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। য়ুরোপীয়গণের এ দেশ আগমনের সময় হইতে অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত

শিক্ষার বিস্তারকল্পে তাহারা যে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রচলন করিয়া লোকশিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিয়াছেন, তাহার ধারাবাহিক বিবৃতি আলোচ্য পুস্তকে আছে। দক্ষিণ ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে, উত্তর ভারতের, প্রধানতঃ কলিকাতা ও তাহার সন্নিহিত স্থানগুলির প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সেরূপ বিদশভাবে আলোচনা দেখিতে না পাইয়া আমরা একটু দুঃখিত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে ডাক্তার লাহা মহাশয়ের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফল আমরা তাহার নিকট চাহিতে পারি। কলিকাতার প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকারী যে কে তাহার আলোচনা কালে, তিনি মতদ্বৈধের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, —'এইরূপ নানাবিধ দাবীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্মান পাইবেন,—তাহার সিদ্ধান্ত করা কঠিন। এই সিদ্ধান্তভার অন্য লোকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া ইত্যাদি। কঠিন বলিয়া আমরা তাহার নিকট একটা মীমাংসা চাই। গ্রন্থাগারের বিবরণটী ও একটু বিশদ হইলে ভাল হইত। আলোচ্য পুস্তক হইতে ঐতিহাসিক অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা যায়। পরিশিষ্টে বিষয় নাম ও কাল বাচী নির্ঘণ্ট থাকায় পুস্তকখানির উপাদেয়তা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

প্রলব্বা—এখানি সামাজিক উপন্যাস। সুকবি শ্রীলীলা দেবী ইঁহার রচয়িত্রী। লেখিকার কবিত্বের পরিচয় যমুনার পাঠক পাঠিকারা প্রায়ই পাইয়া থাকেন। উপন্যাস ক্ষেত্রে ইহা তাহার প্রথম পুস্তক। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। সে সেবা ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'হারানিধি', 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়াছেন; কবিবর নবীনচন্দ্র 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে তৃতীয় স্বর্গে আর্ত্ত আহতের সেবারূপ নারীধর্ম্মের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান দিয়াছেন ও শৈলজা চরিত্রে যে সেবাধর্ম্মের মহিমাজ্জ্বল চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন মহাপুরুষদিগের পদানুসরণ করিয়া উপন্যাসের ভিতর দিয়া তদনুরূপ চিত্র আলোচ্য উপন্যাস-লেখিকা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর সে চেষ্টা যে সফল হইয়াছে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। গত বৎসর চৈত্র মাসের যমুনা পত্রিকায়, 'কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য প্রতিভা' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের একস্থলে আমরা লিখিয়াছিলাম,—"সেবাব্রতে রমণীর ন্যায় অচঞ্চল হৃদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই সুসভ্য জগতে নার্স অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রমণীর মঙ্গলহস্ত পরদুঃখ মোচনে সর্ব্বদাই ব্যগ্র। তাহাদিগকে এ কার্য্যের ভার অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। তাই মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাহাদিগকে সেবাব্রতে অধিকার দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব একদিন রমণীকে সংঘের ভিতর প্রবেশাধিকার দেন নাই; কিন্তু পরে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন এই কার্য্যে অগ্রসর হউন—পরমহংসদেবের পরমভক্ত গিরিশচন্দ্রের ইঙ্গিত মত তাঁহারা কার্য্য করুন।" সুখের বিষয় অল্পদিনের মধ্যেই মনস্বিনী লীলা দেবী এই উচ্চ আদর্শকে তাঁর সুন্দর তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। জানি না কবে কোন্ শুভ-মুহূর্ত্তে কোন রমণীর মঙ্গল হস্ত গঠিত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁর মনঃকল্পিত আশ্রমকে কার্য্যে পরিণত করিবে।

সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশে ধ্রুবার জন্ম। সে অল্প বয়সে পরিণীতা হইয়া স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়। স্বামী বিবাগী হইয়া চলিয়া গেলে, অল্পবয়সেই ধ্রুবা নরনারীর সেবার জন্য আত্মপ্রাণ নিয়োজিত করিল। একাগ্র অধ্যবসায় সহিত সে শিক্ষাকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া উচ্চ শিক্ষিত হইয়া ডাক্তারি পাশ করিল। তারপর কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার সময় ধ্রুবা ভাবিল, ডাক্তারি কার্য্যে মন দিলে কয়জন

রোগীর সে উপকার করিতে পারিবে। তাই সে কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া সে 'নার্সিং' কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তাঁর জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দেখিয়া রোগী আশ্বাস পাইত—সুস্থ হইত। এই কার্য্য করিয়া যে অর্থাগম হইতে লাগিল, তাহা সে অনাথ-আশ্রম, অন্ধাশ্রম, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে ব্যয় করিতে লাগিল। একদিন রমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'ডাক্তারি না করিয়া তিনি 'নার্সিং করেন কেন? উত্তরে ধ্রুবা বলিয়াছিল,—'আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে যথার্থ সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠান এক রকম লোপ পেতে বসেছে। সে ভারটা স্ত্রীলোকদেরই নেওয়া উচিত—যাদের সংসারের বন্ধন ঈশ্বর নিজ হাতে কেটে দিয়েছেন তাদের। ডাক্তার ত অনেক আছেন; আর তাতে পুরুষদের পারদর্শিতা যত, স্ত্রীলোকের তা হ'তেই পারে না। তবে ব্যবসার হিসাবে না ক'রে ডাক্তারি শিক্ষা মেয়েদের পক্ষেও ভাল। কিন্তু এই একটা কাজ—সেবার কাজটা আমার বোধ হয় আমরাই বেশী ভাল পারি।" কথাটা খুব সত্য। তারপর সে বুঝাইয়া দিল বৈরাগ্য ও ত্যাগের উপর এই সেবাব্রত প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। আর এই মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই ধ্রুবা একটী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিল। ধ্রুবা বাল-বিধবা। স্বামীর গৃহত্যাগের পর তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পায়িয়া ছিল। স্বামীর কিছুমাত্র স্মৃতি তাঁর মনে পড়িত না, সে ভগবানকে আপনার স্বামী বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিল। জগতের সকল নর-নারীই যে ধ্রুবার ও ধ্রুবার স্বামী শ্রীভগবানের সন্তান। তাই মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ হৃদয়া ধ্রুবা সকলকে কোল দিতে পারিয়াছিল —দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে পারিয়াছিল। একদিন স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ রামশরণ পণ্ডিত মহাশয় যিনি ধ্রুবার শিক্ষায় সমুদায় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ধ্রুবাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। কথাটা শুনিয়া—ধ্রুবা চমকিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কন্যা ললিতাকে ত একথা ত বলেন না? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, —'সে যে তাঁর স্বামীর স্মৃতিতে ডুবে আছে।" উত্তরেও দৃপ্তকণ্ঠে ধ্রুবা বলিল,—"ললিতা তার স্বামীর স্মৃতি নিয়ে আছে—আর আমি যে আমার প্রত্যক্ষীভূত স্বামীকে নিয়ে আছি। এটা কি আরো বেশী নিরাপদ নয়।" ধ্রুবার এই অসম্ভব কথায় রামশরণ বাবুর 'বার্দ্ধক্য-শীতল রক্ত-স্রোত ও চঞ্চল হইয়া উঠিল।' তিনি রাগিয়া বলিলেন,— "ধ্রুবা, এ কি কথা?"

উত্তরে সে বলিল,—"ঠিক কথা! জগতের যিনি স্বামী—তিনি আমার ও স্বামী। একথা না মেনে আমাকে আপনি বার বার বিবাহের অনুরোধ করিবেন না।" বৃদ্ধ কথাটা বুঝিয়া হাসিলেন। কারণ, বাৎসল্যভাবে বাল-গোপালের প্রতি আগ্রহ যেরূপ স্বাভাবিক, ও সহজ গোপীভাবে তাঁহাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা ততটা সহজ নয়। কিন্তু এই সেবাব্রতধারী হইতে গেলে, সংযমী ও ব্রহ্মচারিণী হওয়া আবশ্যক। তাই ধ্রুবার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে এই সকল শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

ধ্রুবার আদর্শ চরিত্রের ভিতর দুর্ব্বলতা একবার মাত্র লক্ষিত হয়। এক সময় অরিন্দম বন্ধুভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তারপর অরিন্দম যখন, একটু ভালবাসার প্রত্যাশায় আবেগভরে তাঁহার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়াছিল, তখন দৃপ্ত সিংহিনীর ন্যায় ধ্রুবা বলিয়াছিল,—"দেখুন এ রকম কর্‌লে আমাদের সদ্ভাব আবার নষ্ট হয়ে যাবে। এ হৃদয়ে ঈশ্বর ভিন্ন আর কারও স্থান নেই। সমুদ্রের ঢেউ যে বুক পেতে নিতে পেরেছে সামান্য নদীর ঢেউ-ও সে পড়ে যায় না, ঈশ্বরের প্রেম যে একবার হৃদয় ভরে নিতে পেরেছে, মানুষের প্রেমে সে বিচলিত হয় না। আমায় ভালবেসে আপনার লাভ কি?" তার পর সদ্ধ-পত্নী

বিয়োগ বিধুরা অরিন্দমকে যখন সান্ত্বনা দিতে ধ্রুবা আসিয়াছিল, তখন 'গার্গী অরুন্ধতীয় মত ব্রহ্মজ্ঞানে গরয়সী মহিয়সী' মহিলার একবার মাত্র চিত্ত-চাঞ্চল্য হইয়াছিল। ধ্রুবার মুখোচ্চারিত "বন্ধু" শব্দে ও তাহার মৃদুমধ স্পর্শে অরিন্দম বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তখন সে জানিয়াছিল ধ্রুবা—তার বন্ধু পিণাকলালের বিবাহিতা পত্নী। বন্ধুর প্রতি অবিশ্বাসী সে হইতে পারে না। অলিকের মোহ কাটিয়া গেলে ধ্রুবা আবার নির্মেঘ আকাশের ন্যায় স্থির অচঞ্চল হইল। ভগবানে অর্পিত-চিত্ত সন্ন্যাসিনী ধ্রুবার শান্ত মূর্ত্তি আবার উদ্ভাসিত হইল।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রও বেশ যথাযথ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

আলোচ্য উপন্যাসে দু' এক স্থলে বর্ণনার আতিশয্য আছে। লেখিকা যে সকল স্থানে সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন প্রায়ই সেইখানে অর্থ লিখিয়া দেন নাই। অনেকের ইহাতে রসবোধ করিবার অসুবিধা হইবে। ধ্রুবার ভাগুর কর্ত্তৃক—ললিতার অপহরণ ব্যাপার ও তাহাকে জানিয়া শুনিয়া গৃহে রাখার আবশ্যকতা কিছুই ছিল না। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে এরূপ ঘটনার স্থান থাকিলে ও এরূপ উপন্যাস যে নাই তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

পুস্তকের ছাপা কাগজ ভাল। বর্ণাশুদ্ধি ও ছাপাখানার ভূতের দৌরাত্ম্যের নমুনা প্রতি পৃষ্ঠায় অজস্র দেখিতে পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ৪৪০। মূল্য ২৲ টাকা। বাঁধাই ভাল নয়।

জনশ্রুতি ও রহস্য—আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। হৃষীকেশ সিরিজ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত। মূল্য ৫৲ টাকা। পত্র সংখ্যা ২১১-২১।

পূজ্যপাদ আচার্য্য সরকার মহাশয়ের কৃতীপুত্র অজয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাহার পিতার লিখিত রসরচনাগুলি সংগ্রহ করিয়া উপহার দিয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। পুস্তকের প্রারম্ভে তিনি 'গ্রন্থ পরিচয়' ও দিয়াছেন। অবশ্য লেখক মহাশয়ের জীবনের কাহিনী ছাড়া প্রবন্ধ গুলি কোন্ সময়ে কোন্ উদ্দেশে লিখিত হইয়াছিল, তাহার অনেক পুরাণ কাহিনী ও বলিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানির সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই। তবে একথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না যে, বাঙ্গালী যদি এই রস রচনা পড়িয়া আলোচনা করেন,—তাহা হইলে বাঙ্গলার রসের প্রকৃতি কি তাহা বুঝিতে পারিবেন—রসের যে উদ্দেশ্য যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষা দান তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবেন—আর বুঝিবেন রহস্য বাক্যবাণ নয়। অপরকে অযথা কষ্ট দেওয়া রসের কার্য্য নয়। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ রহস্যের মধ্যে স্থান পায় না। আচার্য্যদেব স্বয়ং পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন,—

"রহস্য লিখিনু মাত্র, রহস্য বুঝিবে।
বিদ্রূপে বিরূপ করি কোপ না করিবে।"

বাস্তবিকই রচনাগুলির ভিতর বিদ্রূপের চিহ্ন মাত্র নাই। এ রস রচনায় শ্লীলতার অভাব নাই—সরল প্রাণের অভিব্যক্তি, সহজ সরল প্রাণের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সমাজের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া মহানুভব আচার্য্যদেবের প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই সেগুলিকে দূর করিবার জন্য সরল ভাষায় কতকগুলি রহস্য লিখিয়াছেন। সমাজের উন্নতি যাহারা কামনা করেন, তাহারা তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্ম বুঝিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন আশা করি।

স্নেহাস্পদ নলিনরঞ্জন পণ্ডিত ভায়া, গত পৌষমাসের পত্রিকায় আচার্য্যদেবের রস রচনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপর আমরা আর নূতন কিছু বলিতে পারিব না। তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত।

আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এ পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পুস্তকখানির ছাপা কাগজ ভাল মূল্যটা একটু বেশী হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় এমন পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত।

ভ্রম সংশোধন

গত ফাল্গুন মাসের পত্রিকায় ৫৮৪ পৃষ্ঠায় শ্রীলীলাদেবীর অনবদ্য সুন্দর 'ফাগুন আগুনে' কবিতায় ভুলক্রমে 'মঞ্জরী' স্থলে 'মস্তারী' হইয়াছে।

Printed by P. N. Pal, at the Shastraprachar Press, 5 Chidammudi Lane and Published by P. N. Pal. 26-3 Scott Lane, Calcutta.